সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সপ্তচত্বারিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গাব্দ ১৩৪৭

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

২৪৩।১, অপার সার্কুলার রোড,

কলিকাতা

বিষয়-সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৭শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
১৩৪৭

রামমোহন রায়ের বিলাত-যাত্রা

শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি.লিট.

ভূমিকা

ইংরাজেরা মারাঠাদের হাত হইতে দিল্লী অধিকার করিয়া লইবার পর (১৮০৪ সাল) হইতে দিল্লী-জেলা শাসন এবং মুঘল বাদশাহের পালন রক্ষণ করিবার জন্য দিল্লীতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। তিনিই সেখানকার ছোটলাটের পূর্ব্ব-আভাস। এই রেসিডেণ্টের মুসলমান সেক্রেটরি (মুন্শী) একখানি ফারসী ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ১৮৩৫ পর্য্যন্ত ঐ রাজদরবারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং দেশের মোটামুটি অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। উহার একমাত্র হস্তলিখিত পুথি ব্রিটিশ মিউজিয়মে স্থান পাইয়াছে (নং Or. 1752)। তাহা হইতে রামমোহনের ইংলণ্ডে দৌত্যের যে আভ্যন্তরিক সংবাদ পাওয়া যায়, তাহার অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল। মূলের পৃষ্ঠাসংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।

অনুবাদ

[১৭৭খ] "বাবু রামমোহনের বিলায়েৎ-লণ্ডনে গমনের বর্ণনা। মির্জা আফজল বেগ খাঁ দুই বৎসর কলিকাতায় কাটাইলেন, এবং এই সময়ের মধ্যে বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্যগণের সহিত বাদশাহের দাবী সম্বন্ধে* যে তর্কবিতর্ক হইল এবং কাউন্সিল যে সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহাতে বাদশাহের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার আশা একেবারে নষ্ট হইল। আর, বাদশাহজাদা মির্জা সলীম-বখ্ৎ এবং রাজা সোহনলাল বারংবার মির্জা আফজলকে পত্র লিখিতে লাগিলেন, 'তোমার চেষ্টা এবং আমাদের ফন্দিগুলি সত্ত্বেও আমাদের ইচ্ছা সফল হইল না। আমরা এখানে [অর্থাৎ দিল্লী প্রাসাদে] এতদিন পর্য্যন্ত হজরৎ বাদশাহকে তাঁহার ঐ সব দাবী সফল হইবার আশা দিয়া তোমার প্রতি সদয় রাখিয়াছিলাম। আমার

* অর্থাৎ বাদশাহের বাৎসরিক পেন্সন বাড়াইয়া দেওয়া এবং বড়লাট আগেকার মত বাদশাহকে প্রভুর ন্যায় সম্মান করিয়া দেখা করিবেন, এই ইচ্ছা

[অর্থাৎ বাদশাহজাদা সলীম-বখ্‌তের] প্রতিদ্বন্দ্বীরা [১৭৮ ক] আমি যে বাদশাহের প্রতিনিধি এবং প্রধান মন্ত্রী হইয়াছি, ইহা চাহে না, তাহারা এতদিন ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষায় সময় কাটাইতেছিল। এখন এখানকার ছবি অন্যরূপ দেখা যাইতেছে, তাহারা হজরতের মন আমার বিরুদ্ধে ঘুরাইয়া দিয়া অপরের [অর্থাৎ অন্য বাদশাহজাদার] দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আর মম্‌তাজমহল বেগম ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছেন যে, গভর্ণর জেনেরাল বাদশাহের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া থাকিবার ফলে এই সম্রাটের মান জগতে নষ্ট হইয়া গেল; এবং যে আশা করিয়া কলিকাতায় দূত (অর্থাৎ আফ্‌জল বেগকে) পাঠাইয়াছিলাম, তাহাও নির্মূল হইল। এক্ষণে ইহা ঘটিবার ফলে পৃথিবীর সব লোক আমার ও তোমার প্রতি এমন ঘৃণার সহিত দৃষ্টিপাত করিতেছে যে, আমি কাহারও চোখের দিকে তাকাইতে পারিতেছি না। সুতরাং এখন তোমার উচিত যে, মনে যে-কোন অন্য ব্যবস্থা উদয় হয়, তাহা কাজে লাগাও। নচেৎ তুমি নিজেকে কর্ম্মচ্যুত জানিবে; কারণ, এখন বাদশাহের মনের উপর আমার কোন প্রভাব অবশিষ্ট নাই।'

মির্জা আফ্‌জল বেগ খাঁ নিজের চাকরি থাকা সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া ভাবনায় পড়িলেন। তিনি সর্ব্বদা দেখিয়াছিলেন যে, কলিকাতার লোকেরা, বিশেষতঃ বংগালীরা কানুন জানার ফলে সমস্ত ছোট বড় ব্যাপারে, ইংরাজ সরদারগণের—অর্থাৎ গভর্ণর জেনেরাল এবং কাউন্সিলের সদস্যদের সামনে বাধ্যতায় মাথা নীচু করে না; কারণ, তাহারা জানে যে, নিজের কাজের উপর কর্ত্তৃপক্ষের ধমকানি বা প্রশংসা নির্ভর করে। আর কলিকাতার সাহেব শাসন-কর্ত্তারা কানুনে বাঁধা আছেন, তাঁহারা কানুনের আজ্ঞার সামনে অসহায় [অর্থাৎ নবাবী আমলাদের মত খামখেয়ালী করিতে পারেন না]; ১৭৮খ—এই কথা জানিয়া বাঙ্গালীরা "জুনস্"* সাহেবদের দ্বারা বিলাতে মোকদ্দমা রুজু করিত এবং নির্ভয়ে ইংলণ্ডের বাদশাহের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়া, যে সব কাজ কোম্পানীর ভারতস্থ কর্ম্মচারীদের মতের বিরুদ্ধ, তাহাতে "জুনস্"-সাহেবদের অর্থাৎ লণ্ডনের বাদশাহের আমলাদের আশ্রয়ে, গভর্ণর জেনারালের সঙ্গে উচিত-অনুচিত তর্ক বিতর্ক করিত। অথচ এই ব্যবহার তাহাদের প্রাণ বা মান হানির কারণ হইত না।

অতএব আফ্‌জল বেগ খাঁ কলিকাতাবাসী বংগালীলোকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়া, নিজের দৌত্যের ঘটনা এবং বাদশাহের অবস্থা জানাইয়া, ইহাদের নিকট এমন সমৃদ্ধি পাইলেন যে, বাবু রামমোহন বংগালী মির্জা আফ্‌জল বেগের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এই বাবু রামমোহন নিজ জাতির মধ্যে অত্যন্ত দক্ষ বলিয়া গণ্য ছিলেন এবং ইংরাজী, ফারসী ও একটুকু (কদর্-এ) আরবী জানিতেন। তিনি ভাবিলেন যে, "হিন্দুস্থানের বাদশাহের ব্যাপার নিশ্চয়ই বিলাতের লোকদের নিকট শ্রবণযোগ্য হইবে, এবং

* ফারসী হস্তলিপিতে বিকৃত এই শব্দটি বোধ হয় "জুনিয়ার মেম্বরস্, বোর্ড অব কণ্ট্রোল" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; ক্যাবিনেট হইতে পারে না।

আমাকে ত আল্লাহ্ তালা প্রচুর প্রতিপত্তি দিয়াছেন, যখন মধ্যবিত্ত লোকের মোকদ্দমায় হাত দিয়া অল্প পরিমিত অর্থ উপার্জন করিতেছি, তখন যদি হিন্দুস্থানের বাদশাহের মামলার মধ্যে প্রবেশ করি, তবে নিশ্চয়ই লাখ লাখ টাকা ইনাম পাইব। এমন কি, আমাকে জাগীর ও মন্‌সব্ দেওয়া হইবে, [১৭৯ক] এবং উচ্চ কর্ম্মসহ উজীরী আমার হাতে আসিবে। আর, দূতের কাজও কম সম্মানের নহে, ইহাতে লাভও কম নয় ?"

অতএব, তিনি আফ্‌জল বেগকে কথা দিয়া তাহার দ্বারা বাদশাহ ও বাদশাহজাদা [সলীম বখ্‌ৎ]-এর নিকট দরখাস্ত পাঠাইয়া জানাইলেন—"যদি আপনারা গভর্ণর জেনেরাল এবং কাউন্সিলের সদস্যগণকে কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, এবং রেসিডেণ্ট সাহেবের স্তোকবাক্যে কোন মতেই না ভুলিয়া, এমন কি, বাদশাহের বর্ত্তমান পেন্সন জপ্ত করিবার ধমকও অগ্রাহ্য করিয়া, খুদার উপর নির্ভর করিয়া, আমার দৌত্যের ফলের অপেক্ষায় দৃঢ় হইয়া থাকিতে পারেন, তবে যাহাই ঘটুক না কেন, আমি নিজ মাথা বিক্রয় করিয়া দিব এবং বিলাতে ইংলণ্ডের বাদশাহের নিকট আপনার দূতের কাজ নির্ব্বাহ করিব।"

দিল্লীর বাদশাহ এইরূপ নির্ব্বোধ পরামর্শের প্রতীক্ষায় ছিলেন, যাহাতে গভর্ণর-জেনারালের ও তাঁহার মধ্যে ঝগড়া বাধে। তিনি রামমোহনের সহিত তাঁহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিলেন। তাহার ফলে বাবু রামমোহন বংশপরম্পরায় দিল্লীর বাদশাহের নিকট মাসিক দু-হাজার টাকা পাইবার সর্ত্তে, এখন কোন টাকার সাহায্য (অর্থাৎ অগ্রিম) না লইয়া জাহাজে চড়িয়া ইংরাজের দেশে রওনা হইলেন।

[১৮০ ক] বাবু রামমোহন রওনা হইবার পর কাউন্সিলের সদস্যগণ জানিতে পারিলেন যে, হিন্দুস্থানের বাদশাহের দূত বিলাত গিয়াছে। অতএব রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকট হুকুম পৌঁছিল যে, বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করিবে, বাবু রামমোহন বাদশাহের পরামর্শে ও ইঙ্গিতে রওনা হইয়াছেন কি না, এবং ইহার [১৮০ খ] কারণ কি ?

এ সময় কোলব্রুক সাহেব দিল্লীর রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং এই লেখকও সেই সময় দিল্লীতে তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করিত। রেসিডেণ্ট সাহেব প্রথমে বাদশাহের কর্ম্মচারীদের জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা সোহনলাল এবং বাদশাহজাদা সলীম বখ্‌ৎ একেবারে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু কোন কোন লোক বাদশাহকে বলিল যে, "যখন এই দূত প্রেরণ ব্যাপার নিঃসন্দেহ (সাহেবদের মধ্যে) উঠিয়াছে এবং বাবু রামমোহন যে চিঠিতে বাদশাহকে সর্ত্তবদ্ধ করান—'ভয় পাইবেন না এবং কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদের মুখামুখি দৃঢ় হইয়া থাকিবেন—সেই চিঠি ইহার পূর্ব্বেই* পৌঁছিয়াছে, অতএব এ বিষয় এখন অস্বীকার করা অনুচিত ও অশোভন হইবে। সুতরাং হজরৎ বাদশাহ রেসিডেণ্টের চিঠির এই উত্তর দিলেন,—"আমার দাবীগুলি প্রথম গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের নিকট পাঠাই, এবং তথা হইতে নিরাশা-পূর্ণ উত্তর পাই। অতএব, নিশ্চয়ই

* রেসিডেণ্টের হাতে, চরের দ্বারা

আমার দূতকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছি; কারণ, লর্ড লেক্ [দিল্লী অধিকার করিবার পর ইংরাজের পক্ষে] যে সন্ধি করেন, তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে এবং রেসিডেণ্ট ও এজেণ্ট এ বিষয়ে কোন মনোযোগ করিতেছেন না।" কোলব্রুক সাহেব সদরে জানাইলেন যে, বাদশাহ [১৮১ ক] এই কথা স্বীকার করিতেছেন।

কয়েক বৎসর পরে জানা গেল যে, বাবু রামমোহন বিলায়েৎ-লণ্ডনে পৌছিয়া ইংলণ্ডের প্রবলপ্রতাপ বাদশাহের কোন সভাসদের মারফৎ সেই সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন, এবং হিন্দুস্থানের বাদশাহের দূত, এই নামের ফলে অতি উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হন, বিলাতের বাদশাহের সম্মুখে চেয়ারে বসিবার অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, এবং স্বয়ং কথা বলিয়া [অর্থাৎ উজীরের জবানীতে নহে!] রামমোহনকে সান্ত্বনা দিলেন। অন্যান্য রাজাদের দূতের অপেক্ষা উচ্চ স্থানে রামমোহনের বসিবার হুকুম হইল।

রামমোহনের দরখাস্ত অনুযায়ী দিল্লীর বাদশাহের অবস্থা ভাল করিবার জন্য অনুরোধপত্র, পার্লিয়ামেণ্টের লোকদের মারফৎ গভর্ণর জেনেরালকে লেখা হইল। এবং দিল্লীর রেসিডেণ্টের নিকটও সম্রাটের হুকুম পৌছিল।

ইতিমধ্যে দুই তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল, কোলব্রুক রেসিডেণ্ট পদ হইতে অবসর লইলেন। তাঁহার স্থলে ফ্রেজার সাহেব আসিলেন। গবর্ণর জেনেরালকে এই মর্ম্মে এক রাজীনামা বাদশাহকে দিয়া সহী করিবার জন্য পাঠাইলেন যে, মাসিক পেন্সন ২০ হাজার বা ২৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি করিবার বদলে তিনি আর সব দাবী ছাড়িয়া দিবেন। বাদশাহ প্রথমে অস্বীকার করেন, পরে বাবু রামমোহনের মৃত্যুসংবাদ [১৮১ খ] পৌছিলে পর অগত্যা সম্মত হইলেন।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—২

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অলঙ্কার-শ্রেণী

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল হইতে কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মাসিক ৬০৲ বেতনে অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি এই পদে তিন বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের বেতনের হিসাব-বইয়ে প্রকাশ, তিনি ১৮২৭ সনের মে মাস পর্য্যন্ত সহি করিয়া ৮০৲ বেতন লইয়াছিলেন। বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর আদালতের জজ-পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ২৮ জুলাই ১৮২৭ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

> শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত পাঠশালার অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন তিনি জিলা মেদিনীপুর আদালতের পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন…।—'সমাচার চন্দ্রিকা'।

নাথুরাম শাস্ত্রী

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার পদত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর গমন করিলে তাঁহার স্থলে ১৮২৭ সনের জুলাই মাস হইতে গুজরাটী পণ্ডিত নাথুরাম শাস্ত্রী অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি তৎপূর্ব্বে কিছু দিন কাশী সংস্কৃত কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ২৪ জুলাই ১৮২৭ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী প্রাইস সাহেব শিক্ষা-বিভাগকে লিখিয়াছিলেন :—

> . . . . . Kamalakanta the Professor of Rhetoric in the Sanskrit College, has been appointed Law Pundit of the Zillah Court of Midnapoor.
>
> In order to supply the vacancy thus occasioned in the establishment, the Secretary begs to propose Nathu Rama a Pundit of considerable abilities for the office, as a fit person to succeed to the appointment, and in the meantime he has been directed to take charge of the class, until the pleasure of the Committee is known.
>
> The individual in question was in the College of Benares, where he bore a high character. He lost his appointment there, in consequence of exceeding his leave of absence, which it subsequently appeared was owing to family distresses, and not to any improper neglect.

বেদান্তশাস্ত্রেও নাথুরাম ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে বেদান্ত পড়াইয়াছিলেন। জয়নারায়ণ তাঁহার সম্পাদিত সভাষ্য ন্যায়দর্শনে নিজ পরিচয় বর্ণনে লিখিয়া গিয়াছেন :—

বেদান্তাদীনি শাস্ত্রাণি নাথুরামস্য শাস্ত্রিণঃ।
সকাশাদাপ্তবানস্মি পুরা গুর্জ্জরবাসিনঃ॥

অধ্যাপক হিসাবে নাথুরামের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় নাথুরাম সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

> সংস্কৃত কলেজে খোট্টা পণ্ডিত এক জন না এক জন বড় গোছের বরাবরই প্রায় নিযুক্ত হইতেন। খোট্টা পণ্ডিত নাথুরাম এক জন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন নাথুরামের ছাত্র।···শুনিয়াছি, তারানাথের চাঞ্চল্য দেখিয়া নাথুরাম বলিতেন—'তারা তু পবন এব।' যখন মল্লিনাথের টীকার কোনও manuscript বাঙ্গালাদেশে প্রবেশলাভ করে নাই তখন সংস্কৃত কলেজের যে তিনজন পণ্ডিত মিলিয়া একখানা চলনসই টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নাথুরাম তাঁহাদিগের অন্যতম। আমরা সেই টীকা পাঠ করিতাম।— 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৯৮।

সংস্কৃত কলেজের যে-তিন জন পণ্ডিত রঘুবংশের টীকা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম— গোবিন্দরাম উপাধ্যায়, নাথুরাম শাস্ত্রী ও প্রেমচন্দ্র ন্যায়রত্ন (পরে 'তর্কবাগীশ')। রঘুবংশের এই টীকা ১৮৩২ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল।* গ্রন্থশেষে একটি শ্লোকে টীকাকারদের নাম দেওয়া আছে। শ্লোকটি এইরূপ :—

কৃত্বা কিঞ্চিদ্রামগোবিন্দসূরৌ
নাথুরামপ্রাজ্ঞবর্জ্জ্যেপ্যনল্পং।
যাতে স্বর্গং প্রেমচন্দ্রো মনীষী
টীকামেতাং পূর্ণতাং সংনিনায়॥

ইহা ছাড়া, ১৮২৯ সালে জেনারেল কমিটির অনুজ্ঞায় নাথুরাম আর একখানি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা মম্মটাচার্য্য-বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশ'।

১৮৩১ সনের জুলাই মাস পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিবার পর নাথুরাম অসুস্থ হইয়া পড়েন। স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য তিনি ছয় মাসের ছুটি লইলে সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র প্রেমচাঁদ ন্যায়রত্ন (পরে তর্কবাগীশ) সেপ্টেম্বর মাস হইতে নাথুরামের স্থলে অস্থায়িভাবে অধ্যাপক নিযুক্ত

* The Raghu Vansa, or Race of Raghu, A Historical Poem, By Kalidasa. A Prose Interpretation of the Text, By Pundits of the Sanscrit College of Calcutta. Prepared and Printed under the authority of the Committee of Public Instruction. Calcutta: Printed at the Education Press, Circular Road; and sold at the Depository, Pataldanga. 1832. (Pp. 638).

সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের একাধিক খণ্ড আছে।

হন। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ তারিখে কর্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন :—

The Secretary begs to submit to the Committee of the Sanscrit College an application from Nathuram the Pandit of the Alankara Class, requesting 6 months leave of absence on account of his health, which for some time past has beeh in a declining state, with the sanction of the Committee, the Secretary proposes to appoint Premchand a young man of very considerable attainments, and who is the most distinguished scholar in the College, to take charge of the Alankara Class during the absence of Nathuram.

পর বৎসর—১৮৩২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে নাথুরামের মৃত্যু হয়। ৮ মার্চ ১৮৩২ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী লেখেন :—

The Secretary to the Government Sanscrit College requests to inform the Committee that accounts have been received of the death of Nathuram, late Pundit of the Alankara Class who was permitted to proceed on leave of absence on account of his health in September last . . . . .

Premchand has been acting as Pundit of the Alankara class since Nathu Ram's departure on leave and as it appears from the accompanying memorandum of the late Secretary that his qualifications are superior to those of the other candidate, the Committee will probably think proper to appoint him permanently to the vacant office.

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ

১৮০৫ সালে (২ বৈশাখ ১৭২৭ শকাব্দ) বর্দ্ধমান-রাজ্যের অন্তর্গত দামোদর নদের পশ্চিমে শাকরাঢ়া বা শাকনাড়া গ্রামে প্রেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ। নৈষধচরিতের টীকার শেষে প্রেমচন্দ্র এই ভাবে পিতৃপরিচয় দিয়াছেন :—

রাঢ়ে গাঢ়প্রতিষ্ঠঃ প্রথিতপৃথুযশাঃ শাকরাঢ়ানিবাসী
বিপ্রঃ শ্রীরামায়ণ ইতি বিদিতঃ সত্যবাক্ সংযতাত্মা।

তিনি দেশে জয়গোপাল তর্কভূষণের চতুষ্পাঠীতে কয়েক বৎসর ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, তৎপরে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে দর্শনাদি শাস্ত্র পড়িতে অভিলাষী হইয়া এখানে আগমন করেন। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র পাঠে জানা যায়, তিনি সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। এই শ্রেণীতে তখন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার অধ্যাপনা করিতেন। প্রেমচন্দ্র ১৮২৭ সালের আগষ্ট হইতে ১৮২৮ সালের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত এই শ্রেণীতে ছিলেন। সাহিত্য-শ্রেণীর পর তিনি অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই শ্রেণীতে তিনি নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকট ১৮২৮ সালের ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮২৯ সালের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠ করেন। অলঙ্কার-শ্রেণীর পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি ন্যায়-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। তথায় ১৮২৯ সালের ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি নিমাইচন্দ্র শিরোমণির নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

অলঙ্কারের অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রী অসুস্থ হইয়া ছয় মাসের ছুটি লইলে, ১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে প্রেমচন্দ্র অস্থায়িভাবে অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন; তিনি তখনও ন্যায়-শ্রেণীর এক জন ছাত্র। পর-বৎসর (১৮৩২) ফেব্রুয়ারি মাসে নাথুরামের মৃত্যু হইলে প্রেমচন্দ্রই ঐ পদে পাকাপাকি ভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন— এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ন্যায়-শ্রেণী হইতে অধ্যাপক-পদে উন্নীত হওয়ায় অধ্যাপকেরা না কি তাঁহাকে "প্রেমচন্দ্র ন্যায়রত্ন" নামে ডাকিতেন। তিনিও "প্রেমচন্দ্র শর্ম্মা" বা "প্রেমচন্দ্র ন্যায়রত্ন" নামে স্বাক্ষর করিতেন। ১৮৩৫ সালের জুন মাসের মাহিনা লইবার সময় তিনি মাহিনা-বইয়ে সর্ব্বপ্রথম "প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ" নাম স্বাক্ষর করেন।*

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ তারিখে প্রেমচন্দ্র সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ:—

No. 33.

Government Sanscrit College of Calcutta.

We hereby certify that Premchandra Nyayaratna has attended at the Government Sanscrit College for four years six months and studied the following branches of Hindoo Literature

Poetry, Rhetoric, Law and Logic,

that he has attained very considerable proficiency on the subject of these studics and that he conducted himself well.

Fort William

20th February 1832.

H. Shakespear
G. Saunders
W. W. Bird
G. A. Bushby
H. H. Wilson
Members, General Committee of Public Instruction.

H. Todd
Secretary.

প্রেমচন্দ্র ৩১ বৎসর ৯ মাস অতীব সুনামের সহিত সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তিনি ৬ অক্টোবর ১৮৬৩ তারিখে "বার্দ্ধক্য, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ও ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য" কর্তৃপক্ষের নিকট পেন্‌সনের আবেদন করেন। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৮ বৎসর, ৫ মাস, ২০ দিন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ই. বি. কাউয়েল প্রেমচন্দ্রের আবেদন-পত্র শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরকে পাঠাইয়া, নিজে যে সুপারিশ-পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রেমচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন:—

* কিন্তু ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত 'নৈষধচরিতে' তাঁহার নাম "প্রেমচন্দ্র ন্যায়রত্ন" দেওয়া আছে। ইহার কারণ বোধ হয়, গ্রন্থের মুদ্রণারম্ভকালে তিনি "ন্যায়রত্ন"ই ছিলেন। গ্রন্থখানির আখ্যা-পত্রে প্রকাশ,

Commenced under the auspices of the General Committee of Public Instruction; Transferred to the Asiatic Society with other unfinished Oriental works in 1835; and completed by the Asiatic Society in 1836.

October 29, 1863

To

The Director of Public Instruction.

Sir,

I have the honor to forward an application for pension from Pundit Prem Chandra Tarkavagish, the Professor of Rhetoric in the Sanskrit College. He was originally appointed to this post by the late Professor Wilson, and has discharged its duties in a very able manner. He has also written a series of commentaries on various difficult Sanscrit classics which are well known to Oriental scholars in Europe and have reflected honor on the Institution to which he belongs. In these works he has not merely edited a correct text from a collation of MSS. but has accompanied it by an original commentary, and in this kind of labor he is quite unrivalled among the modern Pundits of Bengal. I know of no Pundit who has an equal power of writing elegant Sanscrit poetry and prose. Among the Sanscrit classics which he has edited and explained I would particularly name the following :

The Raghuvansa of Calidas

The Purva Naishadha of Sri Harsha (one of the six so called "great poems" of the Hindus)

The Raghava Pandaviya by Kaviraja

The Sakuntala, a drama by Calidas

The Anargha Raghava, a very difficult drama by Murari

The Uttara Ramcharita, a drama by Bhavabhuti

The Kavyadarsa, an old work on Rhetoric by Dandi—this last work was published in the Bibliotheca Indica of the Asiatic Society.

I think I am justified in saying that a career of literary activity like this, in a man whose daily duties at the College took up much of his time and energies, is not very common in this country, and I do hope that Government may see fit to express its approbation of such well employed native scholarship by some extra reward in addition to the pension he applies for.

If it is possible, I would respectfully request that he be allowed a retiring pension of two-thirds. His salary has been only ninety Rupees until the last two or three months, so that this would only involve an additional payment of 15 Rupees per mensem. Should this be unpracticable, then might I be allowed to suggest that in addition to the pension of one half, he might perhaps be allowed a sum say of 1,000 Rupees from the large surplus of the College allowance in part years as an acknowledgment of the value of his original labors in Sanscrit literature.

I have etc.
Edwd. B. Cowell
Principal, Sanscrit College.

কিন্তু বঙ্গের ছোটলাট প্রেমচন্দ্রের ক্ষেত্রে পেন্‌সনের নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম করিতে সম্মত হন নাই; তিনি তর্কবাগীশকে মাসিক ৫০্ পেন্‌সন মঞ্জুর করেন। প্রেমচন্দ্র ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪ তারিখ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার স্থলে পরবর্ত্তী ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে মাসিক ১০০্ বেতনে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন নিযুক্ত হন।

শেষজীবনে প্রেমচন্দ্র কাশীবাস করিয়াছিলেন। তথায় ২৫ এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে ওলাউঠায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রথম জীবনে প্রেমচন্দ্র রীতিমত বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিবার কিছু দিন পরেই কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। গুপ্ত-কবি ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'সংবাদ প্রভাকরে'র শিরোদেশে যে দুইটি শ্লোক শোভা পাইত, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশই তাহা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

। সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ।
। উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ ।

।...। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্‌ভ্রামংভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।...।
।...। অদ্যোদ্যদ্বিমলপ্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরাঃ স্বান্তদ্বিরেফা রসং ।...।

'সংবাদ প্রভাকরে' প্রেমচন্দ্রের অনেক বাংলা রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন :—

> শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাঁহার রচিত শ্লোকদ্বয়, অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে।

'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের জন্য তিনি গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশকেও একটি কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলেন। ১৮ মার্চ ১৮৪৫ তারিখ হইতে এই কবিতাটি 'সম্বাদ ভাস্করে'র কণ্ঠদেশে মুদ্রিত হইত :—

ভ্রাতর্ব্বোধসরোজ কিং চিরয়সে মৌনস্য নায়ং ক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ ন তেঽবস্থানমত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরাদ্গৌরীশঙ্করপূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ ।

১৮৫৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি 'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তাহার শিরোভাগে "কিং চান্দ্রী বিশদপ্রভা কিমথবা প্রাভাকরী চাতুরী" ইত্যাদি যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তাহাও প্রেমচন্দ্রের রচনা।

প্রেমচন্দ্র এক জন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের পর প্রকৃত কবিতা-পদবাচ্য সংস্কৃত শ্লোকরচনা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।" প্রেমচন্দ্র-রচিত কবিতার অনেকগুলি তাঁহার ভ্রাতা রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় 'প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত' (৪র্থ সংস্করণ) পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

সকলেই জানেন, এইচ. এইচ. উইল্‌সন সংস্কৃত কলেজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি যত দিন এদেশে ছিলেন, তত দিন সংস্কৃত কলেজের গৌরবের দিনই ছিল। তিনি স্বদেশ-যাত্রা করিলে, মেকলে-প্রমুখ সাহেবেরা সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। এই সময় প্রেমচন্দ্র বিলাতে উইল্‌সন সাহেবকে যে শ্লোকটি রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

গোলশ্রীদীর্ঘিকায়া বহুবিটপিতটে কোলিকাতানগর্য্যাং
নিঃসঙ্গো বর্ত্ততে সংস্কৃতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরঙ্গঃ কৃশাঙ্গঃ।
হন্তুং তং ভীতচিত্তং বিধৃতখরশরো মেকলে-ব্যাধরাজঃ
সাশ্রু ব্রূতে স ভো ভো উইলসন-মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ।

—কলিকাতা নগরীতে গোলদীঘির বহুবিটপি-শোভিত তটদেশে সংস্কৃত-পঠনগৃহ নামে একটি কৃশাঙ্গ কুরঙ্গ নিঃসঙ্গ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সংপ্রতি মেকলে নামক ব্যাধরাজ তীক্ষ্ণ শর ধারণ করিয়া, ভীতচিত্ত সেই কুরঙ্গকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া সেই কুরঙ্গ সাশ্রু নয়নে বলিতেছে,—ভো ভো মহাভাগ উইলসন, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।

উত্তরে উইল্‌সন সাহেব যে শ্লোকটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

নিষ্পিষ্টাপি পরং পদাহতিশতৈঃ শশ্বদ্‌বহুপ্রাণিনাং
সন্তপ্তাপি করৈঃ সহস্রকিরণেনাগ্নিস্ফুলিঙ্গোপমৈঃ।
ছাগাদ্যৈশ্চ বিচর্বিতাপি সততং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈঃ
দূর্ব্বা ন ম্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দয়া দুর্বলে।

—নিরন্তর বহু প্রাণীর পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট, অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ সূর্য্যের কিরণসমূহের দ্বারা সন্তপ্ত, সতত ছাগ প্রভৃতি কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও কোদাল দ্বারা পরামৃষ্ট হইয়াও কৃশকায় দূর্ব্বা মরে না ; কেন না, দুর্ব্বলের প্রতি বিধাতার কৃপা বর্ষিত হইয়া থাকে।

উপরের শ্লোক দুইটি হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন তাঁহার স্মৃতিকথায় উদ্ধৃত করিয়াছেন ('প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৩২, পৃ. ৬৪৭)। কবিরত্ন মহাশয় প্রেমচন্দ্র সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন :—

তিনি যোগসাধন করিতেন, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি ; আসন হইতে একটু উর্দ্ধে উঠিতে পারিতেন তাহাও আমরা ভগ্ন জানালা দিয়া দেখিয়াছিলাম। তাঁহার অনুবৃত্তি করিয়া বিদ্যাসাগর, শ্রীশ বিদ্যারত্ন ও আমার পিতৃদেব [গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন] ঠন্‌ঠনিয়ার ৺কালীতলা হইতে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কলেজে যাইতে আরম্ভ করেন। প্রায় ৬ মাসে ৫ মিনিট বন্ধ করিতে পারিতেন। তিনি এক বৎসরে সমগ্র সাহিত্য-দর্পণ শেষ করিয়া দিতেন। তদ্ভিন্ন প্রায় নয়খানি নাটক পড়াইতেন।…ইহা ছাড়া প্রতি শনিবার আমাদিগকে এক-একটি সমস্যা দিতেন। ঐ সমস্যা আমরা সোমবারে পূর্ণ করিয়া আনিয়া দিতাম। (পৃ. ৬৪৯)

সংস্কৃত রচনার জন্যই প্রেমচন্দ্র সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত যে কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম :—

১। **রঘুবংশের টীকা**। ১৮৩২।

ইহার কথা নাথুরাম শাস্ত্রীর প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

২। **নৈষধচরিতং**। পূর্ব্বভাগঃ। শ্রীপ্রেমচন্দ্রন্যায়রত্নবিরচিতান্বয়বোধিকাসমাখ্য-টীকাসহিতঃ। ১৮৩৬। পৃ. ৯১৩।

৩। **অভিজ্ঞানশকুন্তলম্**। ১৮৩৯।

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৭৮১ শকে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পুস্তকের বিজ্ঞাপনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কাউয়েল সাহেব লিখিয়াছেন :—

NOTICE.

The present edition of Sakuntala has been prepared by Pundit Prem Chunder Tarkabagish, the learned professor of Rhetoric in the Government Sanskrit College of Calcutta. A few copies have been printed for European Scholars, as it was thought that an edition of the Gauriya recension, prepared by an eminent Pundit, might be acceptable in Europe where this recension has been hitherto known only by Chezy's very imperfect work.

Calcutta, Edw. B. Cowell,
March. 7. 1860. Acting Principal, Sanskrit College.

৪। **রাঘবপাণ্ডবীয়ম্**। কবিরাজপণ্ডিতবিরচিতম্। শ্রীপ্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্য বিরচিতয়া কপাটবিপাটিকাখ্যয়া টীকয়া সহিতম্। ১৮৫৪। পৃ. ৪৩৫।

৫। **অষ্টম কুমার**।

আমি ইহা দেখি নাই। রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

"কালিদাসকৃত কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল। সমুদায় গ্রন্থ পাওয়া যাইত না। পরে কাপ্তেন মার্সেল সাহেব ও স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যত্নে অষ্টমাদি সর্গ-সহ সম্পূর্ণ গ্রন্থ পশ্চিম দেশ হইতে আনীত হইলে তর্কবাগীশ উহার টীকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই টীকাসহ অষ্টম সর্গ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। আদর্শখানি অপরিশুদ্ধ এবং নবম আদি সর্গের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে কালিদাসপ্রণীত কি না সন্দেহ করিয়া অবশিষ্ট অংশে হস্তার্পণ করেন নাই।"—জীবনচরিত, পৃ. ১০৩-০৪।

৬। **অনর্ঘরাঘবং নাম নাটকং**। শ্রীপ্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যকৃত বিষমপদ-ব্যাখ্যাসহিতং। শকাব্দাঃ ১৭৮২। ইং ১৮৬০। পৃ. ২৪১। (বঙ্গাক্ষরে)

৬। **সপ্তশতীসার নামক দেবীমাহাত্ম্য**। শকাব্দাঃ ১৭৮০। পৃ. ১২।

বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত এই পুস্তকখানির প্রারম্ভে প্রেমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

এতদ্দেশে পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের প্রচার ছিল না প্রায় পঞ্চদশবৎসরের অধিক কাল হইল পঞ্চনদদেশহইতে একজন বহুদর্শি পণ্ডিত আসিয়াছিলেন তিনি এতদ্দেশীয় কোন ধনিলোকের স্বস্ত্যয়ন কার্য্যে উক্ত স্তোত্রপাঠের ব্যবস্থা করেন তাহাতে তিনি যশস্বীও হইয়াছিলেন তিনি উক্ত স্তোত্রের মাহাত্ম্য এরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন যে এই স্তোত্র পঞ্চনদাদি দেশে মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সপ্তশতীস্তোত্রের তুল্য আদরণীয়, ইহা যে ভগবন্মহাদেবপ্রণীত ইহাতে কোন ব্যক্তিই সন্দেহ করে না ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই স্তোত্র পাঠ করিয়াই অসামান্য প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি। পরে কোন মান্য ব্যক্তি ইহার টীকা করিতে আমাকে অনুরোধ করেন আমি যথাবুদ্ধি টীকা করিয়াছি সংপ্রতি তৎসহিত উক্ত সপ্তশতীসার মুদ্রিত হইল প্রার্থনা যে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহাতে নয়নার্পণ করেন ইতি। (শ্রীপ্রেমচন্দ্রশর্ম্মণঃ)।

৭। **মুকুন্দমুক্তাবলীনামকং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং চাটুপুষ্পাঞ্জলিনামকং শ্রীরাধা-স্তোত্রঞ্চ**। শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিতং। ময়মনসিংহনিবাসি শ্রীযুত হরমোহনরায়-

শর্ম্মানুরোধপ্রবৃত্ত শ্রীপ্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যকৃতটীকাসহিতং। শকাব্দাঃ ১৭৮১। পৃ. ২২+১২। (বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত)

৮। **উত্তররামচরিতম্।** মহাকবি শ্রীভবভূতি বিরচিত। শ্রীপ্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যকৃত সংক্ষিপ্তটীকাসহিত। Edited at the request of Edward B. Cowell, M. A., Principal of the Sanskrit College of Bengal. শকাব্দাঃ ১৭৮৩। ইং ১৮৬২। পৃ. ১৭৭।

৯। **কাব্যাদর্শ।** মহাকবি শ্রীদণ্ডাচার্য্য বিরচিত। শ্রীপ্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যবিরচিত মালিন্যপ্রোঞ্ছনী নামক টীকাসহিত। ইং ১৮৬২-৬৩। Bib. Indica.

১০। **সমস্যাকল্পলতা।** ১৩০৭। পৃ. ১১২+৯।

১৭৬৭ শক (=ইং ১৮৪৫) হইতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সময়ে সময়ে পূরণার্থ কতকগুলি সমস্যা দিতেন। এই সমস্যা পূরণের জন্য যে-সকল কবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহা একটি পুস্তকে লিখিত হইত। এই পুস্তকের নাম 'সমস্যাকল্পলতা'। জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাতে প্রেমচন্দ্রের অনেক কবিতা আছে।

পুরাবৃত্ত-শ্রেণী

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার

ছাত্রাভাবে বেদান্ত-শ্রেণী লোপ পাইলে ১ অক্টোবর ১৮৪২ তারিখ হইতে সংস্কৃত কলেজে 'পুরাবৃত্ত' নামে একটি নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মাসিক ৮০৲ বেতনে এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিদ্যালঙ্কার প্রথমে সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন; ১৮২৭ সালে এই পদ ত্যাগ করিয়া তিনি মেদিনীপুর আদালতের জজ-পণ্ডিত হন—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তৎপরে তিনি কিছু দিন এশিয়াটিক সোসাইটিতেও পণ্ডিতের কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ১৮৪৩ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত পুরাবৃত্ত-শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি পীড়িত হইয়া ৮ই অক্টোবর তারিখে দেহত্যাগ করেন।* সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কলেজ হইতে পুরাবৃত্ত-শ্রেণীও লুপ্ত হয়।

* *General Report on Public Instruction in the Lower Provinces,....*for 1843-44, p. 34.

দ্রষ্টব্য ঃ—এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ মুদ্রিত হইবার পর জানিতে পারিয়াছি, নাথুরাম শাস্ত্রী জেনারেল কমিটির অনুজ্ঞায় ১৮২৮ সালে বিশ্বনাথ-রচিত 'সাহিত্যদর্পণ' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে এই গ্রন্থের একাধিক খণ্ড আছে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮১৩-১৮৪০)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৫ সনে ইহধাম ত্যাগ করেন। এই দুইটি সনই ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয়। ১৮১৩ সনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নূতন করিয়া সনন্দ লাভ করেন। এই সময়েই স্থির হয় যে, ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য কোম্পানীকে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে কোম্পানীর তরফে এই খাতে নিয়মিত ভাবে অর্থব্যয়ের কোনই ব্যবস্থা ছিল না। ১৮১৩ সনের পর হইতে শিক্ষাবিষয়ক কতকগুলি প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। কৃষ্ণমোহন এই প্রচেষ্টারই অন্যতম সুফল। ১৮৮৫ সন প্রসিদ্ধ অন্য কারণে। এই বৎসর ভারতবাসীর রাষ্ট্র-চেতনার মূর্ত্ত প্রতীকরূপে ইণ্ডিয়ান নেশ্যন্যাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুইটি বিশেষ সনের মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ বাহাত্তর বৎসর; এই কালের মধ্যে কৃষ্ণমোহন নানা বিষয়ে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্রগণ বহু বিষয়ে তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছেন। তবে তাঁহার মত দীর্ঘ জীবন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী বাদে আর কেহই লাভ করেন নাই। কৃষ্ণমোহন যৌবনে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও কয়েক বৎসরের মধ্যে ধর্ম্মযাজক পদে অধিষ্ঠিত হন। এজন্য তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ইঁহাদের হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেও মূল উদ্দেশ্যে তাঁহাদের মত তিনিও বরাবর দৃঢ় ও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন।

ভারতবাসীদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগরূক করাইবার জন্য যাঁহারা একনিষ্ঠ ভাবে তৎপর হন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে নাম করিতে হয় রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ইঁহাদের কাহারও কাহারও উৎসাহদাতা ছিলেন—বৃদ্ধ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে তাঁহার আত্মজীবনীতে (পৃঃ ৬১) লিখিয়াছেন,—

"The Rev. Krishna Mohan Banerjee (better known as K. M. Banerjee) was among the earliest recruits to Christianity. A scholar and a man of letters, it was not till late in life that he began to take an active part in politics. He was associated with the Indian League and became president of the Indian Association . . . . He was then past sixty; and though growing years had deprived him of the alertness of youth, yet in the keenness of his interest, and in the vigour and outspokenness of his utterances, he exhibited the ardour of the youngest recruit to our ranks. Never was then a man more uncompromising in what he believed to be the truth, and hardly was there such amiability combined with such strength and firmness."

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রমুখ হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ যৌবনেই রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাজেই কৃষ্ণমোহন পরবর্ত্তী যুগের যুবক রাজনীতি-চর্চ্চাকারীদের উৎসাহদাতা হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? শিশিরকুমার ছিলেন ইণ্ডিয়ান লীগের প্রাণ ; আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ইণ্ডিয়ান এ্যসোসিয়েশ্যানের প্রতিষ্ঠাতা।

যৌবনে ও প্রৌঢ়ে উগ্র খ্রীষ্টান মতবাদ প্রচারের ফলে কৃষ্ণমোহন সাধারণ দেশবাসীর বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেশপ্রেম ছিল অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দেশপ্রেম সাধারণ্যে প্রকট হইয়া পড়ে। শুধু রাজনীতি নহে—শিক্ষা, সাহিত্য, পৌরসংস্কার প্রভৃতি বিষয়সমূহের প্রগতিমূলক নানা প্রচেষ্টায় তিনি নিজেকে একেবারে লিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার সম্বন্ধে ঐ সময়কার যুবকদের মনে একটা অত্যুচ্চ ধারণাও জন্মিয়াছিল। কৃষ্ণমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে যত আলোচনা হইয়াছে এবং পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হইয়াছে, এমনটি বোধ হয়, শীঘ্র কাহারও সম্বন্ধে হয় নাই। তথাপি তাঁহার জীবন-কথা এখানে কেন নূতন করিয়া আলোচনা করিতে যাইতেছি, তাহার একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে বহুতর আলোচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সমসাময়িক কাগজপত্রাদি হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারা যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এ সময়ের বিভিন্ন প্রচেষ্টার মূলেরও সন্ধান পাইতেছি। কৃষ্ণমোহনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী বাহির হয় ১৮৪২ সনের অক্টোবর সংখ্যা 'ইণ্ডিয়া রিভিয়ু' মাসিকে। এই কাহিনীটি পরবর্ত্তী ১লা নবেম্বর 'বেঙ্গল হরকরা' হুবহু উদ্ধৃত করেন। কৃষ্ণমোহনের জীবনীকারদের কেহ কেহ যে ইহার সন্ধান না জানিতেন, তাহা নহে, কিন্তু কেহই ইহার পুরাপুরি ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অনেকের ধারণা, এই কাহিনীটি কৃষ্ণমোহনের স্ব-রচিত। ইহা হইতেও পারে। ইহার রচনা-ভঙ্গী ও কৃষ্ণমোহন-জীবনের কয়েকটি খুঁটিনাটি তথ্যের উল্লেখ হইতে মনে হইতে পারে যে, ইহা তাঁহারই লেখা। যাহা হউক, আমি এখানে কাহিনীটির প্রায় সবটারই অনুবাদ দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সময়ের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র হইতে প্রাপ্ত কাহিনীর পরিপূরক নূতন তথ্যও এখানে সন্নিবিষ্ট করিলাম। ইহা হইতে প্রথম ত্রিশ বৎসরের পরিপূর্ণ মানুষটিরই পরিচয় আমরা পাইব। বলা বাহুল্য, এই সময়কার প্রগতিমূলক আন্দোলনসমূহের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায় তাহাদের উপরও প্রসঙ্গতঃ যথেষ্ট আলোকপাত করা সম্ভব হইবে। ইণ্ডিয়া রিভিয়ুতে প্রকাশিত বিবরণটি আগে দিতেছি।—

'ইণ্ডিয়া রিভিয়ু'তে প্রকাশিত বিবরণ

কৃষ্ণমোহন ১৮১৩ সনে [২৪শে মে] জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার হাতে খড়ি হয়। ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি হেয়ার সাহেবের

শিমলা পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তাঁহার উপনয়ন সংস্কার হইল।

১৮২৪ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষ্ণমোহন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন।* তিনি এখানে ইংরেজীর সঙ্গে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম সংস্কৃত পাঠে তাঁহার মন বসিত না। ইহার দুইটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমতঃ যে-সব পণ্ডিতের উপর সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল, তাঁহারা ছাত্রদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারিতেন না। ছাত্রদের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতেও তাঁহারা সমর্থ হইতেন না। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যাপনায় যে রীতি অবলম্বিত হইত, তাহাতে পঠিতব্য বিষয় ছাত্রদের বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর ছিল না। আবার প্রতিদিন সমানে পাঁচ ঘণ্টা ইংরেজী পড়িয়া সংস্কৃত অধ্যয়নে মনও বসিতে চাহিত না।

কৃষ্ণমোহনের পিতা ১৮২৮ সালে কলেরা রোগে তিন দিন ভুগিয়া পরলোকগমন করেন। যাহাতে মৃত্যুকালে অন্তর্জলি হইতে পারে, এজন্য গঙ্গার ধারে একটা গুদাম-ঘরে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল। ইহার পর দুই দিন তিনি জীবিত ছিলেন।

১৮২৮ সনের প্রথমে কৃষ্ণমোহন হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। তিনি এই সনের মধ্যভাগে শিক্ষা কমিটি হইতে মাসিক ষোল টাকা বৃত্তি লাভ করেন। পর বৎসর দিল্লী কলেজে মাসিক আশী টাকা বেতনে শিক্ষকতা কর্ম্মের একটি প্রস্তাব তাঁহার নিকট আসে। আত্মীয়-স্বজনের অনুমতি না লইয়াই তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাইবার প্রস্তাবে অন্যকে যদি বা অতিকষ্টে রাজী করান গেল, তাঁহার অগ্রজ কিন্তু তাঁহাকে বিবাহ না করিয়া যাইতে দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা এই সময়ে কৃষ্ণমোহনকে বিবাহ করিতে হয়। কিন্তু যাহার জন্য বিবাহ করা, তাহা আর হইল না। কলিকাতার জেনারল কমিটির (General Committee of Public Instruction) মত না লইয়া দিল্লীর স্থানীয় কমিটি এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কলিকাতার কমিটি এরূপ নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন না। ইহাতে কৃষ্ণমোহন নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

এই সময় একটা অপরাধের জন্য কলেজের ভিজিটর অধ্যাপক এইচ্. এইচ্. উইলসন কর্ত্তৃক কৃষ্ণমোহন বিশেষভাবে ভর্ৎসিত হন। কৃষ্ণমোহনের একজন সহপাঠী হুঁকা ধরাইবার জন্য কলেজের এক ভৃত্যের নিকট আগুন চান। কলেজে ধূমপান নিষিদ্ধ। নিয়মভঙ্গ

---

* কৃষ্ণমোহন তাঁহার প্রথম পুস্তক 'দি পারসিকিউটেড'-এর ভূমিকায় হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ সম্বন্ধে বলেন,—

"His [K. M. Banerjea's] knowledge of the English language depends solely upon the education afforded to him by the Hindoo College through the recommendation of the Calcutta School Society."

"As the following is the author's first production of the kind, his feelings impel him to give his warmest thanks to the Visitor, Managers and Teachers of the Hindoo College, and the Secretary and members of the Calcutta School Society, for their favours and superintendence."

হইবার ভয়ে ভৃত্যটি আগুন আনিয়া দিতে অস্বীকৃত হয়। তাহার এইরূপ অবাধ্যতার উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণমোহন বন্ধুদিগকে ডাকিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে তিনিও তাহাকে কিঞ্চিৎ মারপিট করিলেন। ভৃত্যটি কর্তৃপক্ষের নিকট ইঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে ইঁহাদের মাসিক বৃত্তি দুই মাসের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং কলেজের একটি প্রকাশ্য স্থানে ইঁহাদের অপরাধ ও শাস্তির কথা লিখিয়া টাঙাইয়া রাখা হয়।

১৮২৯ সনের ১লা নবেম্বর তারিখে কৃষ্ণমোহন হিন্দুকলেজ ত্যাগ করিলেন। ইহার পর তিনি স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। লোকে এই স্কুলটিকে হেয়ার সাহেবের স্কুল বলিত। বাহ্যতঃ পিতৃপিতামহের ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইলেও কৃষ্ণমোহন এই সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস করিতেন না। ভগবানের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। আত্মা অমর—এই ধারণাকে তিনি ভিত্তিহীন মিথ্যা সংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। ইহাপেক্ষা অধিকতর নৈতিক অধঃপতন কল্পনা করাও কঠিন। মানুষের ভিতরকার পশুভাবগুলি দমনকল্পে কোন নীতির যে আবশ্যকতা আছে, একথা তিনি স্বীকার করিতে চাহিতেন না।

এই সময় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দর্শন আলোচনার ধুম পড়িয়া যায়। কলেজের সহকারী শিক্ষক মিঃ এইচ এল ভি ডিরোজিও দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি ছাত্রদের মনেও এই বিষয়ে প্রেরণা দিতেন। কৃষ্ণমোহন কলেজে ডিরোজিওর নিকট কখনও পড়েন নাই, তিনি এই সময় কলেজের বাহিরেই ছিলেন। তথাপি তাঁহাতেও ডিরোজিও-প্রবর্ত্তিত দর্শন আলোচনার ছোঁয়াচ লাগে, এবং তিনি নব্য হিন্দু সংস্কারক দলে যোগদান করিয়া তাঁহাদের আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। এই সব যুবক আপনাদিগকে সত্যের বন্ধু এবং মিথ্যার শত্রু বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহারা দর্শন আলোচনায় নিবিষ্ট হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন, তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য হিন্দু পৌত্তলিকতার বিলোপ-সাধন। তাঁহারা নৈতিক আদর্শের উপরই জোর দিতেন। যদিও খেয়াল ছাড়া অন্য কোন উচ্চতর ভাব দ্বারা তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হন নাই, তথাপি তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্ম ত্যাগ করিতে এবং মনুষ্য-প্রকৃতির কলুষিত বাসনাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিতে লাগিয়া গেলেন। দেশবাসীরা দুইটি কারণে তাঁহাদের নিকট অবজ্ঞার পাত্র ছিল—(১) পৌত্তলিকতা ও (২) পাপকর্ম্ম ও দূষিত চরিত্র। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সোৎসাহে ও সাহসের সঙ্গে অভিযান চালাইতে তাঁহারা পরস্পরের সহিত পাল্লা দিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, ধর্ম্মের রীতিনীতি মানিয়া চলিলে তাঁহাদের মর্য্যাদাহানি ঘটিবে। যে-সব বিষয় কতকটা মানিয়া চলা আবশ্যক (যেমন, পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে শ্রদ্ধাভক্তি বা সম্মান প্রদর্শন), তাহা নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

যে-সব মতবাদ দ্বারা তাঁহারা প্রভাবান্বিত হন, তাহার ফল শুভ অশুভ দুই ই

হইয়াছিল। পাপকর্ম্ম এবং কুসংস্কার—এসবের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহা খুবই সুফলপ্রদ হইয়াছিল বলিতে হইবে। কৃষ্ণমোহনের মধ্যে পরে তাহা পবিত্রীকৃত হইতে পারিয়াছিল। সত্যের প্রতি অনুরাগ (যদিও ইহার মূল কারণ তাঁহাদের অজানা ছিল) এবং সর্ব্বদা সত্য পথে চলার প্রবৃত্তি কোন মানবহিতৈষীই তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অজ্ঞাত সত্যের প্রতি তাঁহাদের এতাদৃশ শ্রদ্ধা একগুঁয়েমিপূর্ণ নাস্তিকতা দ্বারা সংমিশ্রিত ছিল। এসবের প্রত্যেকটি স্মৃতি আজ কৃষ্ণমোহনকে ঈশ্বরের সম্মুখে অপমানে ও হীনতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। এখন তিনি তাঁহার অপার মহিমার কথা স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইতেছেন। মানুষের মন হইতে হীন নাস্তিকতা তিনি কত তাড়াতাড়ি বিদূরিত করিয়া দেন!

নাস্তিকতার স্রোত প্রতিরোধ কল্পে প্রথম কার্য্য হইল—বিভিন্ন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে পাদ্রীদের বক্তৃতায় যোগদানের জন্য ইহাদিগকে আমন্ত্রণ। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কলিকাতার আর্কডীকন রেভাঃ টি ডিয়াল্‌টি, রেভাঃ মিঃ (এক্ষণে ডক্টর) ডাফ এবং রেভাঃ জে. হিল। নিমন্ত্রণ-গ্রহণ সম্বন্ধে নব্যদলের মধ্যে আলোচনা হইল। মিঃ ডিরোজিও বলিলেন যে, তাঁহারা সত্যের নামে কিছু শুনিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং বক্তৃতায় কি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তাহা তাঁহাদের শ্রবণ করা উচিত। হেয়ার সাহেব ভাবিলেন, পাদ্রী-বক্তৃতায় তাঁহাদের উপস্থিতি এদেশীয়দের মনে ভীষণ ভীতির উদ্রেক করিবে, আর ইহার ফলে শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি হইবে। তাঁহার নিজের কথা বলিতে গেলে, তিনিও কিন্তু ডিরোজিওর সঙ্গে এবিষয়ে একমত ছিলেন যে, যদি স্বাধীনভাবে আলোচনার অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহাতে যোগদানে কোনরূপ আপত্তি করা উচিত নয়। হেয়ার মনে করিতেন, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের সপক্ষে যতই না যুক্তির অবতারণা করা হউক, তাহাতে ইহাদের প্রত্যয় জন্মিবে না। সুতরাং পাদ্রীরা শীঘ্রই চুপ হইয়া যাইবেন। যাহা হউক, হিন্দু কলেজ হইতে কড়া আদেশ হইল—ছাত্ররা এই সব সভায় উপস্থিত হইতে পারিবে না। পাদ্রীদের চেষ্টা এইরূপে ব্যাহত হইল।

এই সময় হিন্দুসমাজে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হইল। এক দিকে নব্যদলের পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম-ধ্বংসের চেষ্টা, অন্য দিকে সতীদাহের উচ্ছেদ জন্য আন্দোলন—উভয় ব্যাপারেই গোঁড়া হিন্দুরা ভীষণ বাধা দিতে লাগিল। নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু-সভা হিন্দু-সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিলেন।

হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিও নব্যদলের বিরোধিতা খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। বন্ধুদের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনও কয়েক রাত্রি কলিকাতার বড় বড় রাস্তায় ঘুরিয়া খ্রীষ্টান পাদ্রীদের নানা ভাবে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইলেন। তাঁহারা কখনও গস্‌পেল প্রচার করিবার ভাণ করিতেন, কখনও পাদ্রীদের বাংলা শব্দের ভুল উচ্চারণ অনুকরণ করিতেন, কখনও বা ভাষার বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যাংশগুলির ভুল প্রয়োগ দর্শাইয়া দিতেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরিচালনায় ১৮৩১ সনে 'রিফর্ম্মার' সংবাদপত্র

স্থাপিত হয়। ইনি সংস্কারপন্থী ছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের সব কিছুরই বিরোধিতা করিতে হইবে (যাহা নব্যদল করিত), ইহা তিনি চাহিতেন না। নব্যদলের কোন মুখপত্র ছিল না। এ অভাব মিটাইবার জন্য ঐ বৎসর মে মাসেই কৃষ্ণমোহন 'এন্‌কোয়ারার' নামে একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। হিন্দুধর্ম্মের সমুদয় রীতিনীতির বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালান হইত বলিয়া ইহার উপর গোঁড়া হিন্দুসমাজ ভীষণ খাপ্‌পা হইয়া উঠিল। পত্রিকা-সম্পাদক ও সাহায্যকারীদের উপর সর্ব্বপ্রকার গালি-গালাজ বর্ষিত হইতে লাগিল।

কিন্তু এযাবৎ তাঁহারা খোলাখুলি ভাবে এমন কিছু করেন নাই, যাহার জন্য হিন্দু-সমাজের মধ্যে থাকা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িতে পারে। শীঘ্রই এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যে জন্য, সে ঘটনা যতই সামান্য হউক, এক গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হইল। একদা কৃষ্ণমোহনের কয়েক জন বন্ধু একখণ্ড গো-হাড় তাঁহার বাড়ী হইতে প্রতিবেশী হিন্দুর বাড়ীতে ছুঁড়িয়া ফেলেন। এই বাড়ীর কর্ত্তা এক জন গোঁড়া হিন্দু, নব্যদলকে সর্ব্বদা কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেন। এই ব্যাপারে ঐ বাড়ীর লোকজন এতই চটিয়া গেল যে, তাহারা ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিল। মারপিট আরম্ভ হইল, কৃষ্ণমোহনের গায়েও আঘাত লাগিল।* ইতিমধ্যে বিরাট্ জনতা জড় হইয়াছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রটিয়া গেল যে, একদল যুবক হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া গর্হিত কর্ম্মে লিপ্ত হওয়ায় ধরা পড়িয়াছে। যদিও কৃষ্ণমোহন এ ব্যাপারে নির্দ্দোষ ছিলেন, তথাপি তাঁহাকেই নির্যাতন ভোগ করিতে হয় সকলের চেয়ে বেশী। নিষিদ্ধ মাংস কৃষ্ণমোহনের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে—এই কথা কিছু সময়ের মধ্যে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল এবং হিন্দুগণ এই পরিবারের উপর খড়্গহস্ত হইল। পরিবারের লোকেরা জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে কৃষ্ণমোহনকে কয়েকটি কঠিন সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে বলিলেন। বিবেকবুদ্ধি অনুসারে তিনি ইহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না, কাজেই তাঁহাকে নূতন আশ্রয় খুঁজিতে হইল। জনৈক বন্ধু তাঁহার বাড়ীতে কৃষ্ণমোহনের স্থান করিয়া দিলেন। কৃষ্ণমোহন এখানে কয়েক সপ্তাহ থাকেন। গৃহ-তাড়িত কৃষ্ণমোহনকে ঐ বন্ধুর আত্মীয়-স্বজন বেশী দিন বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। এমন কি, বন্ধুটির পিতা কৃষ্ণমোহনকে মারধর করিতেও উদ্যত হইলেন। এমতাবস্থায় এই আশ্রয়-স্থান ত্যাগ করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। কৃষ্ণমোহন একটা বাড়ী ভাড়া করিবার কথা ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা যাহা শুনিয়াছে, তাহাতে এতই ভীত হইয়া পড়িল যে, কেহ তাঁহাকে বাড়ী ভাড়া দিতেও রাজী হইল না।† পুরা

* কেহ কেহ বলেন, এই সময় কৃষ্ণমোহন বাড়ী ছিলেন না। তিনি ঐই ঘটনার অব্যবহিত পরে বাড়ী ফেরেন। সেই সময় তাঁহার উপর মারপিট হইয়া থাকিবে।

† এই সময়কার দুর্দ্দশার কথা কৃষ্ণমোহন তাঁহার 'এন্‌কোয়ারার' পত্রে এইরূপ বর্ণনা করেন,—

"Persecution has burst upon us so vehemently, that on Wednesday last at 12

একদিন গৃহহীন অবস্থায় থাকিয়া বন্ধুদের পরামর্শে অবশেষে একজন ইউরোপীয়ের বাড়ীতে বাসা ভাড়া করিলেন এবং নিশীথে তাঁহার জিনিসপত্র সেখানে লইয়া গেলেন। একটা তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য কৃষ্ণমোহন শুধু হিন্দুধর্ম্ম নহে, আত্মীয়-স্বজন হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন।

প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্ম্মের নিয়মাদি ভঙ্গ করার ফলে এসময় সমাজে যেরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, এমনটি পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। কিছুকাল যাবং অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা প্রায় স্থগিতই রহিল। মাসের পর মাস বাংলা পত্রিকাগুলি কটুকাটব্য ও গালমন্দ করিতে লাগিল। হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যাও কমিয়া গেল। যাহারা এতদিন হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে ইহার বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে বাধ্য করান হইল। ইহার ফল কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হইল না। উত্তেজনার প্রথম ধাক্কা কাটিয়া গেলে আবার হিন্দু কলেজ জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ আদর্শই কার্য্য করিতেছে।

এই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি কৃষ্ণমোহনের মন আকৃষ্ট হয়। পাদ্রী ডাফের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে তাঁহার খ্রীষ্টশাস্ত্র চর্চ্চার ইচ্ছা হইল। তাঁহার জনৈক বন্ধু (এক্ষণে আগ্রা কলেজের অধ্যক্ষ) একদিন তাঁহাকে উক্ত পাদ্রীর নিকট লইয়া যান। ডাফ কৃষ্ণমোহনকে বলিলেন, যেহেতু তিনি জাতি ও ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, সে জন্য এখন শুধু মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত না থাকিয়া যেন সত্যেরও অনুসন্ধান করেন। কৃষ্ণমোহন তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন যে, ভাল হউক, মন্দ হউক, তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী নহেন, কাজেই তিনি (ডাফ) তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলিতে পারেন না। ডাফ বলিলেন, নিশ্চয়ই না, তবে খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য, কি মিথ্যা, তাহার তত্ত্ব লইতে শুধু আপনাকে বলিতেছি। কৃষ্ণমোহন এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার কথার ন্যায্যতা স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, যদি তিনি (ডাফ) খ্রীষ্টতত্ত্ববিষয়ক বক্তৃতা দেন, তাহা হইলে তিনি তো উপস্থিত থাকিবেনই, তাঁহার বন্ধুদিগকেও উপস্থিত করাইতে চেষ্টা করিবেন। ডাফ সাহেব সপ্তাহে একদিন করিয়া বক্তৃতা দিতে মনস্থ করিলেন। এই সকল বক্তৃতার সমূহ ফল ফলিল। কৃষ্ণমোহনের মন হইতে নাস্তিকতা বিদূরিত হইল, তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে আস্তিক্য-বোধও ফিরিয়া আসিল।

---

o'clock we were left without a roof to cover our head. At last in spite of the bigot's rage and the fanatic's fulminations, we have been able to be settled in a commodious place, through the exertions of two affectionate friends and warm advocates for truth. We were, however, so troubled in settling our domestic affairs that we have not been able to start our present number to our satisfaction. If our readers conceive the difficulties we were placed in, without a house to lodge in, excepting nothing but the rage of bigots and foes, and suffering the greatest hardships for the sake of truth and liberation, they will undoubtedly excuse our present defects . . . ."

—১৮৩১, ১লা অক্টোবরের 'জনবুল' পত্রিকায় উদ্ধৃত

ধর্ম্মবিষয়ক অনুসন্ধান আমাদের নৈতিক মনোবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত, দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধানের সম্পর্ক বুদ্ধিবৃত্তিরই সঙ্গে, এই জন্য এযাবৎ কৃষ্ণমোহন যাহা করিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনের উপর তেমন কোন রেখাপাত করে নাই।...কর্নেল পাউলি ও অন্য একজন বন্ধুর সঙ্গে তিনি সাগরে বেড়াইতে যান। সেখানে তিনি কিছু সময় সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন এবং তাঁহার ধারণা হয়, তিনি হয়ত মারা যাইবেন। এই সময় সান্ত্বনা দান কালে তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে যে সব কথা বলেন, তাহাতে তাঁহার মন খুবই অভিভূত হয়। কলিকাতায় ফিরিবার সময় পাউলি তাঁহার হাতে একখানা টেষ্টামেণ্ট দেন। কৃষ্ণমোহন ইহা পড়িবার জন্য সহজাত ঔৎসুক্য অনুভব করেন। আগে খ্রীষ্টধর্ম্মকে তিনি যে ভাবে দেখিতেন, ইহার পর হইতে তিনি সম্পূর্ণ অন্য ভাবে দেখিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণমোহন 'এন্‌কোয়ারার' পত্রে তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। ইহাতে হিন্দুসমাজে কোনরূপ উত্তেজনা দেখা দেয় নাই। হিন্দুগণ তাঁহাকে স্বধর্ম্মচ্যুত বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিদের ভিতর কিন্তু ইহাতে বেশ একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়। অনেকে তাঁহাকে এক কুসংস্কার হইতে আর এক কুসংস্কারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে নিষেধ করিলেন। কয়েক জন অবশ্য তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন, পরে আরও অনেকে বুঝিয়াছেন।

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশের অল্পকাল পরেই কৃষ্ণমোহন চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটির কলিকাতা কমিটি কর্ত্তৃক মির্জাপুর ইংরেজী স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিয়োজিত হন। পরলোকগত ডেভিড হেয়ার (কৃষ্ণমোহন যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, তাহা হেয়ার সাহেবের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল ও সে জন্য তাঁহার সঙ্গে কম বাধ্যবাধকতা ছিল না। অন্য ভারতীয়ের প্রতি যেমন, কৃষ্ণমোহনের প্রতিও তেমনি পিতৃতুল্য অনুরাগ ও স্নেহ মমতা তাঁহার হইল) তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।* হেয়ার সাহেবের স্কুলে খ্রীষ্টতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল, কাজেই কৃষ্ণমোহন চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটির স্কুলেই কর্ম্ম গ্রহণ করা সমীচীন মনে করিলেন। এ স্কুলে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষয়ও ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হইত।

* কৃষ্ণমোহন প্রকৃত প্রস্তাবে পটলডাঙ্গা স্কুল হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ছিলেন এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনিও সমদোষে দোষী ছিলেন, সুতরাং তাঁহারও চাকরি গিয়াছিল। তাঁহাদের কার্য্যকলাপের জন্য হিন্দুপ্রধানগণ কিরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, ডেভিড হেয়ারকে লেখা রাধাকান্ত দেবের চিঠি তাহার প্রমাণ। তিনি লিখিলেন,

"I think you might have heard the particulars of the dinner of the two teachers of the Putuldanga School, and consequently wish to know whether you are determined upon removing those outcasts from the school, or retaining them to corrupt the Hindu pupils."

ডেভিড হেয়ার রাধাকান্ত দেবকে দুঃখ করিয়া লেখেন,—

"They were so well qualified as teachers that he would certainly be sorry to lose them." Proceedings of the Calcutta School Society (1818-1831). Unpublished.

খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। খ্রীষ্টানগণ তখন নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, তাহা লইয়া তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কাহার নিকট দীক্ষা লইবেন, তাহাও ভাবিতে লাগিলেন। অন্য অনেক খ্রীষ্টানের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল একমাত্র ডাফ সাহেবের সঙ্গে। ডক্টর ডাফ সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে খ্রীষ্টের কথা শোনান। এই সকল কারণে কৃষ্ণমোহন তাঁহার নিকটই দীক্ষা গ্রহণ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কৃষ্ণমোহন কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, সে সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইতে না পারায় ডাফের গৃহে বসিয়াই দীক্ষা গ্রহণ করেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর কয়েক মাস তিনি প্রতি রবিবারে স্কচ্ চর্চ্চ ও ইংলিশ চর্চ্চ, উভয় গীর্জ্জায়ই গমন করিতেন। তিনি সাধারণতঃ পুরাতন গীর্জ্জায় (ইংলিশ চর্চ্চ) সকালে ও সেণ্ট এণ্ড্রুজ গীর্জ্জায় সন্ধ্যায় যোগদান করিতেন। কিন্তু স্কচ্ চর্চ্চের দণ্ডায়মান অবস্থায় উপাসনা এবং বাইবেল পাঠ অপেক্ষা ধর্ম্মোপদেশ দানে অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ তাঁহার আদৌ মনোমত হইল না। ইংলিশ চর্চ্চের প্রার্থনা ও স্বীকারোক্তি এবং ধর্ম্মগ্রন্থের বিভিন্ন অংশসম্বলিত সারগর্ভ উপদেশ তাঁহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল। এজন্য তিনি সেণ্ট এণ্ড্রুজের বদলে পুরাতন গীর্জ্জায়ই বেশী করিয়া যোগ দিতে লাগিলেন।

সেণ্ট এণ্ড্রুজ গীর্জ্জায় মিলনোৎসব হইত বৎসরে মাত্র দুইবার, কিন্তু পুরাতন গীর্জ্জায় হইত প্রতি মাসে একবার করিয়া। কৃষ্ণমোহন শেষোক্ত স্থানের উৎসবেই যোগদান করিলেন। পরে যখন সেণ্ট এণ্ড্রুজ উৎসব আরম্ভ হইল, তখন তিনি সেখানে আর গেলেনই না। তিনি এই সময় সম্যক্ বুঝিতে পারিলেন যে, খ্রীষ্টশিষ্যগণ যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারেই গীর্জ্জা পরিচালনার বর্ত্তমান প্রণালী নির্ণীত হইয়াছে। তিনি বহু দিন এই বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন এবং এপিস্‌কোপালিয়ান ও প্রেস্‌বিটারিয়ান, উভয় সম্প্রদায়ের মতামতও শুনিয়াছেন। যদিও টিমথি, টাইটাস ও সাতটি এশিয়াটিক চর্চ্চের প্রতিষ্ঠাতাদের মত এবিষয়ে সুস্পষ্ট, তথাপি প্রেস্‌বিটারিয়ানগণ এই বলিয়া একথা অগ্রাহ্য করিতে চাহেন যে, একেসাস ও ক্রীটের বিশপগণ অনন্যসাধারণ পাত্রী ছিলেন, তাঁহাদের কার্য্যকাল তাঁহাদের সঙ্গেই শেষ হয়। তাঁহারা আরও বলেন যে, সাতটি এশিয়াটিক চর্চ্চের নেতারা আধুনিক অর্থে কতকগুলি পরিষদ্ বা সমিতির সভাপতি ছাড়া আর কিছুই নহেন। যদিও তাঁহাদের এই সব কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং সত্যানুগ অপেক্ষা কৌশলপূর্ণই বেশী, তথাপি এসব যে একেবারে মিথ্যা, তাহা প্রতিপন্ন করিতে কৃষ্ণমোহন অক্ষম ছিলেন। যাহা হউক, বিশপ করী এমন বিশিষ্ট যুক্তি প্রয়োগে এবিষয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন—যে যুক্তি তিনি ১৮৩৩ সনে কলিকাতায় লর্ড বিশপের মুখে বিশদ ভাবে বিবৃত হইতে শুনিয়াছেন,—যে, ইহার ফলে তিনি প্রেস্‌বিটারিয়ান পদ্ধতির অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। তিনি আরও বুঝিলেন যে, এই

পদ্ধতি খ্রীষ্টতত্ত্বের ইতিহাসের বিরুদ্ধে অনাস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য ইহার ফলও বিষময়।

কৃষ্ণমোহন সুতরাং চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের সভ্য হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। যে বিশ্বাসবলে তিনি ইহার সভ্য হইতে চাহিলেন, তাহা আরও দৃঢ় হইল—যখন দেখিলেন, তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবার জন্য প্রতিপক্ষগণ বহু হীন অপচেষ্টায় লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডকে 'বেবিলন', 'অর্দ্ধপোলিস' প্রভৃতি 'মধুর' বিশেষণে বিশেষিত করা হয়!

১৮৩৩ সনের মধ্যভাগে বর্ত্তমান আর্কডিকনের অনুরোধে যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার পক্ষে নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়া কৃষ্ণমোহন বিশপকে একখানা পত্র লেখেন। পত্র প্রাপ্তির কয়েক মাস পরে বিশপ মহোদয় তাঁহাকে যাজক বিভাগের একজন প্রার্থী গণ্য করিলেন এবং জানাইলেন যে, উপযুক্ত বয়স হইলে তিনি সানন্দে তাঁহার উপর এই গুরু কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিবেন।

যে বৎসরের কথা আমরা বলিতেছি, সে-বৎসরে হেবিয়াস কর্পাস বিধি অনুসারে সুপ্রিম-কোর্টের বিচারপতিদের সম্মুখে কৃষ্ণমোহনকে হাজির করান হইয়াছিল—এই প্রশ্নের জবাব দিবার জন্য যে, কেন তিনি তাঁহার একজন ছাত্রকে (বাবু ব্রজনাথ ঘোষ, বর্ত্তমানে ছোটনাগপুরের অন্তর্গত চাইবাসা স্কুলের শিক্ষক) খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে সরাইয়া আনিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ যুবকটি যে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে সম্মত ছিল, সে সম্বন্ধে কৃষ্ণমোহন নিঃসন্দেহ ছিলেন। বিচারপতিদের মধ্য হইতে একজন (সর্ এড্ওয়ার্ড রায়ান) বিচারাসন হইতে বলিলেন যে, কৃষ্ণমোহন বালকটিকে পিতৃগৃহ হইতে ভুলাইয়া আনিয়াছেন, এবং যদিও ঐ যুবক বাবুটি তাঁহার বা অন্য কোন খ্রীষ্টানের তত্ত্বাবধানে আগেও ছিল না, এখনও নাই, [তবুও পিতা বলেন যে, বালকটি নাবালক] তথাপি আদালত আদেশ দিতেছেন যে, 'হেবিয়াস কর্পাস' অনুসারে একজন বুদ্ধিমান্ সচ্চরিত্র লোক—যিনি সাবালক হইয়াছেন—তাঁহার পিত্রালয়ে থাকিবেন, যতদিন তাঁহার হিন্দু আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে নিজ বিবেকবুদ্ধি মত চলিবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য না করিবেন। ঐ স্থান কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের হুদ্দার বাহিরে।

এই বৎসর শীতকালে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পর্য্যটনে বাহির হন। এই সময় তিনি ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রসার লাভ না করিলে পার্থিব দিক্ দিয়াও এ বিরাট দেশের উন্নতির আশা নাই।

১৮৩৫ সনে ফিরিয়াই তিনি চব্বিশ পরগণার উদ্যোগী ও খ্রীষ্টপরায়ণ ম্যাজিষ্ট্রেটের (মিঃ জে. এইচ্. পেটন) সাহায্যে স্ত্রীকে তদীয় পিতামাতার হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। বৎসরখানেকের মধ্যেই ইনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে আস্থাবান্ হইলেন এবং কৃষ্ণ-মোহনের আশাআকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ সহায়ক হইলেন।

১৮৩৬ সনে মেডিকেল কলেজের কয়েক জন যুবক ছাত্র একই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন

করেন। যে ব্যাপারে দেবদূতগণ পর্য্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন এবং যাহাতে খ্রীষ্টান মিশনরী সোসাইটিতে অবিমিশ্র আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাওয়া উচিত ছিল, মানবের পরম শত্রু তাহাকেই উপলক্ষ করিয়া সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে ভীষণ দলাদলির সৃষ্টি করিল! সোসাইটির সেক্রেটরী শ্রদ্ধেয় আর্কডিকন ডিয়াল্‌ট্রি পদত্যাগ করিলেন, কৃষ্ণমোহনকেও চাকরি হইতে অপসারিত করা হইল। আর্কডিকন মহোদয়ের সহায়তায় কৃষ্ণমোহন বিশপ কলেজে একটি বৃত্তি লাভ করিয়া সেখানে কয়েক মাস অধ্যয়নে রত থাকেন। শেষে ১৮৩৭ সনে সেণ্ট জন ব্যাপটিষ্ট ডে উপলক্ষে বেগম শমরুর গীর্জ্জায় পাদ্‌রি হইলেন।*

কৃষ্ণমোহন সর্ব্বপ্রথম ইংরেজীতে যে প্রার্থনা করেন, তাহা তাঁহার খ্রীষ্টান বন্ধু বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু উপলক্ষে। এই রাত্রেই তিনি যদুনাথ ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। যদুনাথ এখন বিশপ কলেজে পড়িতেছেন।

১৮৩৮ সনের শেষ দিকে অস্থায়ী অধ্যক্ষের অসুস্থতা হেতু বিশপ কলেজে ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কলেজের সংলগ্ন গীর্জ্জার উপাসনাদি কার্য্যে এবং প্রাচ্য বিদ্যা আলোচনাতেই কৃষ্ণমোহনকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কলেজে অবস্থান কালে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ কালীকে (কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে) সেণ্ট্ জন্ ডে-তে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা দান করেন।

১৮৩৯ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর ক্রাইষ্ট চর্চ্চের দ্বার উন্মোচন হইল, এবং কৃষ্ণমোহন ইহার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। ঐ বৎসরই সেণ্ট লিউক ডে-তে তিনি ইহার আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হন।

কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার একটি প্রবন্ধ হইল, এ দেশের স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে। তিনি এই প্রবন্ধ লিখিয়া একটি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তিনি উদার ও উন্নত মতবাদ পোষণ করেন। তাঁহার ব্যক্তিগত ও সাধারণ আচরণ

* এই গীর্জ্জাটি বেগম সমরুর প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইহার মালিক বিশপ কলেজ। দ্বিভাষী সাপ্তাহিক 'জ্ঞানান্বেষণ' লেখেন,—

"বিশপ কলেজের যে গীর্জ্জা আছে সেইখানে শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাদ্‌রি করিয়াছেন সকলেই জানেন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু হিন্দুরদিগের মধ্যে প্রধান ব্রাহ্মণ-জাতির সন্তান তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষা করিয়া শেষে শ্রীযুত হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়াছিলেন এবং শিক্ষা প্রদান কালে অতি সাহসিক ও নৈপুণ্যরূপ ইনকোয়েরার নামক এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিতেন তাহার পরেই বাবু খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তদবধি ঐ ধর্ম্মের অত্যন্ত সপক্ষ আছেন এবং চর্চ মিসন সোসাইটির কর্ত্তারাও তাঁহাকে মীর্জ্জাপুরের বিদ্যাগারে শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন আমারদিগের বোধ হয় ঐ বাবু মীর্জ্জাপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকিতে ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য উত্তম রূপেই চলিয়াছিল অনন্তর এক মাস গত হইল চর্চ মিসন সোসাইটি বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা যে কারণে সম্পর্ক ত্যাগ করেন আমরা সমাচার পত্রে তাহা প্রকাশের আবশ্যকতা বুঝিলাম না পরে বাবু গঙ্গাপারে গিয়া দুই তিন মাস পর্য্যন্ত বিশপ কলেজে থাকিয়া বিবিধ ভাষাজ্ঞানের প্রতি মনোযোগ দিলেন অবশেষে যে পাদ্‌রি হইলেন ইহাতে অনেকে অনেক প্রকার মনে করিবেন...।" ১৮৩৭, ৮ জুলাই তারিখের সমাচারদর্পণ।

সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, এই তমসাচ্ছন্ন দেশে বিশ্ব-বিধাতা তাঁহাকে আলো বিকীরণ কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন। আমাদের বিশ্বাস আছে, তিনি শীঘ্রই দেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া তৎশ্রুত বার্ত্তা প্রচার করিবেন। গ্রাণ্ট-অঙ্কিত ছবিখানি অত্যুত্তম।

কৃষ্ণমোহন সম্পৃক্ত এই সময়কার অন্যান্য ঘটনা

একাডেমিক এসোসিয়েশ্যন

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার বিখ্যাত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন যে, ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়টিকে ভারতের নবযুগ বা রেনেসাঁস্ বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ এই বিশ বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষের উন্নতি-মূলক বহু প্রচেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছিল। কৃষ্ণমোহনের জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটে। কাজেই এ সময়কার বিবিধ প্রচেষ্টার সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের যোগ থাকাই স্বাভাবিক। আমি এই সব বিষয় কিছু কিছু এখন আলোচনা করিব।

এ সময়ের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই একাডেমিক এসোসিয়েশ্যনের বিষয় উল্লেখ করিতে হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা ও বক্তৃতাশক্তির উন্মেষ এই সভা দ্বারাই যে সম্ভব হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে ঐ ছাত্রগণ এবং আরও অনেকে তাহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এই সভাটির প্রতিষ্ঠার সঠিক তারিখ আমাদের জানিবার বোধ হয় আর উপায় নাই। প্যারীচাঁদ মিত্র ইহার এক জন সভ্য ছিলেন। তিনি 'ডেভিড হেয়ার' জীবনীপুস্তকে ১৮২৮ বা ১৮২৯ ইহার প্রতিষ্ঠার সন বলিয়াছেন। কৃষ্ণমোহন ১৮২৯ সনের নবেম্বর মাসে কলেজ ত্যাগ করেন। কলেজ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বা পরে, যে কোন সময়েই এই সভার প্রতিষ্ঠা হউক না কেন, কৃষ্ণমোহন যে এই সভার সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ইহাতে যে-সব আলোচনা হইত, তাহা দ্বারা সবিশেষ উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহার আভাস উপরে উদ্ধৃত বিবরণে স্পষ্টই রহিয়াছে। সুতরাং এই সভা সম্বন্ধে আমাদের কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

একাডেমিক এসোসিয়েশ্যনের সভাপতি ছিলেন—নব্য-দলের শিক্ষাগুরু হেন্‌রি ডিরোজিও। ইহার সম্পাদকের নাম উমাচাঁদ বসু। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলার বাগান-বাড়ীতে প্রথম প্রথম সভার অধিবেশন হইত, পরে ডিরোজিও নিজ গৃহে ইহা লইয়া যান। সে সময়কার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌গণ ইহার অধিবেশনগুলিতে যোগদান করিতেন। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মিল্‌স্, বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল বীটসন ইহাদের মধ্যে অন্যতম। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ সোৎসাহে ইহাতে যোগদান করিতেন। ধর্ম্ম, সমাজ,

শিক্ষা, দেশপ্রেম প্রভৃতি নানা বিষয়ে এখানে আলোচনা হইত। 'ডেভিড হেয়ার'-জীবনীকার প্যারীচাঁদ মিত্র ও 'ডিরোজিও'-জীবনীকার এডওয়ার্ডস্ কার্টস্ উভয়েই নিজ নিজ পুস্তকে ইহার বিবরণ দিয়াছেন। এডওয়ার্ডসের পুস্তক হইতে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"In the meetings of the Academic Association . . . subjects were broached and discussed with freedom, which could not have been approached in the class-room. Free-will, fate, faith, the sacredness of truth, the high duty of cultivating virtue, and the meanness of vice, the nobility of patriotism, the attributes of God, and the arguments for and against the existence of deity as these have been set forth by Hume on the one side, Reid, Dugald Stuart and Brown on the other; the hollowness of idolatry, and the shams of the priesthood, were subjects which stirred to their very depths, the young, fearless, hopeful hearts, of the leading Hindu youths of Calcutta.

কৃষ্ণমোহনের উপর এই সব আলোচনার প্রভাব কিরূপ পড়িয়াছিল, তাহা আগে আমরা জানিয়াছি।

এই সময়ের আর একটি বিষয়ের কথা পরবর্ত্তী লেখকেরা বোধ হয়, উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ লেখক টমাস পেনের 'এজ অফ রীজন' নামক বইখানি এই সময় প্রথম কলিকাতায় আসে। এই বইখানির আলোচনা প্রসঙ্গে সমসাময়িক সংবাদপত্র-গুলি বলেন যে, দ্বিগুণ, কি তিনগুণ দামে ইহা বাজারে বিক্রয় হইয়াছে, এখন আর মিলিতেছে না; কেন না, হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা প্রায় প্রত্যেকেই এক একখানা কিনিয়াছেন। এই বইখানিতে বাইবেল ও খ্রীষ্টীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ছিল। কৃষ্ণমোহন অন্যান্যের ন্যায় ইহা দ্বারাও খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া থাকিবেন।

ডিরোজিওর নেতৃত্বে কলেজের ছাত্রগণ তাঁহাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য 'পার্থেনন' নামে একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পরই কলেজ-কর্তৃপক্ষ ইহা বন্ধ করিয়া দিতে তাহাদিগকে বাধ্য করান। একাডেমিক এসোসিয়েশ্যন ও 'পার্থেনন' সম্পর্কে দ্বিভাষিক 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' পত্রিকা ১৮৪৩, ১লা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। এ সবের সঙ্গে যাঁহারা যুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের দ্বারাই এই পত্রিকাটি প্রকাশিত ও পরিচালিত হয়। কাজেই তাঁহাদের নিকট হইতে এবিষয়ে সঠিক বর্ণনাই আমরা পাইব। ইহা হইতে আবশ্যক অংশ এখানে দিলাম,—

এই সময় মৃত হেনরি ডিরোজিউ স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও উৎসাহ প্রকাশ করত হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগকে সদাসর্ব্বত্র সুশিক্ষা দান ও মেং হিয়ার মহোদয়ের স্কুলে লেক্চার অর্থাৎ উপদেশ প্রদান এবং একাডেমিক ইনষ্টিটিউসান নামক সভায় নিয়মিতাধিষ্ঠান ও সদ্বক্তৃতা, বিশেষতঃ অতি সুখজনক অথচ জ্ঞানদায়ক কথোপকথন দ্বারা হিন্দু যুবকগণের অন্তঃকরণে আশ্চর্য্য প্রবোধোদয় করিয়াছিলেন যাহা অনেকের মনে অদ্যাপি প্রতিভান্বিত হইয়া আছে; আর তৎকালে উক্ত মহাত্মা ব্যক্তির সাহায্যে 'পারথিয়ন' নামক ইংরাজী সমাচারপত্র বাঙালীদিগের দ্বারা প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস এই দুই বিষয়ের

প্রস্তাব ছিল এবং হিন্দুধর্ম্ম ও গবর্ণমেণ্টের বিচারস্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্বিষয়ের উপর দোষারোপ হইয়াছিল ; কিন্তু যদিও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়েরা তদ্দর্শন মাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতঃ তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকট প্রেরিত হইতে দেন নাই ; তথাপি পত্রপ্রকাশক যুবক হিন্দু-দিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই, তন্নিমিত্ত হিন্দু মণ্ডলীস্থ তাবৎ লোক ভীত হইয়াছিল··· ।

হিন্দু যুবকগণ ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার মানসে যে-সব পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রথম প্রথম খুবই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পাইয়াছিল। কৃষ্ণমোহনও ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন, আমরা জানিয়াছি। তবে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই কতকটা স্থিতধী হন। অতঃপর তাঁহার সংস্কার প্রচেষ্টা অন্য পন্থায় ধাবিত হয়। নব্যদলের মধ্যে তিনিও রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার কার্য্যের সমর্থক ছিলেন। একাডেমিক এসোসিয়েশ্যনের শিক্ষা ইহার জন্য নিশ্চিত বহু অংশে দায়ী। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহপ্রথা নিবারণের জন্য যে আন্দোলন চালান, তাহা এই সময় পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। এজন্য তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দানের প্রস্তাব করিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ব্রহ্মসভা-গৃহে ১৮৩২ সনের ১০ই নবেম্বর একটি সভা আহূত হয়। কৃষ্ণমোহন এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। 'সমাচার দর্পণ' (১৮৩২,২৪ নবেম্বর) প্রদত্ত বিবরণে প্রকাশ,—

> "পরে এই ব্যাপারে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিলেন এবং এদেশের কুরীতি নীতি বহিষ্কৃত করণে উক্ত বাবু অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবিষয়েও প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন।—কৌমুদী।"

১৮৩২,১৪ই নবেম্বর তারিখের 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে' এই সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিবরণ পাই—

> "Babu Krishna Mohan Banerjea in seconding the above, spoke of the Raja's perseverance against the Sutee. He referred to the Raja's moral strength in standing, the first Hindoo, against some of the glaring superstitions of the country, and, above all, against the [in]human rite of Suttee. He said that the Rajah, though abused and ridiculed by the Chundrika and others, yet remained firm in his career against idolatry and superstition : and spoke, wrote and preached against the Suttee with a fortitude which must command the admiration of all good men."

সংবাদপত্র-সেবা

কৃষ্ণমোহন দীর্ঘকাল সংবাদপত্র-সেবা করিয়া গিয়াছেন। প্রথম জীবনেই তিনি এ বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা ইংরেজী ভাষা যে বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এ কথা সে কালের ইংরেজী-বাংলা নানা কাগজেই বিঘোষিত হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার সময় তাঁহারা ইংরেজী

নাটকের অংশবিশেষের সুন্দর অভিনয় ও আবৃত্তি করিতেন। তাহা দেখিয়া ইংরেজগণও মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে, পরে সংবাদপত্র-সেবায় ও সাহিত্য-চর্চ্চায় মন দিবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ডিরোজিওর অধিনায়কত্বে ছাত্রগণ 'পার্থেনন' কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, আগে বলিয়াছি। 'পার্থেনন' সংবাদপত্র বাহির হয় ১৮৩০, ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে। কৃষ্ণমোহন তখন কলেজ ত্যাগ করিলেও, একাডেমিক এসোসিয়েশ্যনের ন্যায় ইহার সঙ্গেও নিশ্চয়ই যুক্ত ছিলেন। কিন্তু প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পরই ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কৃষ্ণমোহন অতঃপর স্বয়ং 'এন্‌কোয়েরার' পত্র প্রকাশ করেন।

নব্যদলের মুখপত্ররূপে 'এনকোয়েরার' আবির্ভূত হইল ১৮৩১ সনের ১৭ই মে। ইহার প্রথম সংখ্যা পাইয়া রাজা রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' নিম্নলিখিত ভাবে ইহাকে অভিনন্দিত করিলেন। ১৮৩১, ২৮শে মে তারিখের 'সমাচার দর্পণে'* এই বিষয়টি উদ্ধৃত হইয়াছিল।—

> "গত ১৭ই মে অবধি ইনকোয়েরের নাম ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় সম্বাদপত্র এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত অল্পবয়স্কেরদের দ্বারা প্রকাশারম্ভ হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান সম্পাদক হন তৎপত্রের ভূমিকার শেষভাগ অবলোকনে আমরা বোধ করিলাম যে পত্রের প্রথম ভাগের লিখিত সম্পাদকের স্বীয় উক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয় তৎপত্রস্থিত বক্তৃতা এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকেরদের দ্বারা রচিত হইয়াছে এবং রচকেরদের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বৎসরের উর্দ্ধ নহে ইহাতে আমরা অবশ্যই আহ্লাদিত হইলাম এবং তাঁহারদের এতাবৎ অল্প বয়সে যে এরূপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ করিলাম।"

'এন্‌কোয়েরার' পত্রের কোন সংখ্যা দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে 'সমাচার দর্পণ', 'জ্ঞানান্বেষণ' ও অন্যান্য বিবিধ পত্রিকায় ইহা হইতে মধ্যে মধ্যে যে-সব অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠে জানিতে পারি, শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ই ইহার আলোচনার বিষয়ীভূত ছিল। তবে সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারের প্রতিই কাগজখানির বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সতীদাহ নিবারণ, শিক্ষার বাহন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাতেও ইহা সাগ্রহে যোগদান করিত। কৃষ্ণমোহন যেমন ইংরেজী 'এনকোয়েরার' বাহির করিলেন, তেমনি তাঁহার বন্ধু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকও ইহার কিছুকাল পরে 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে একখানা দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। তবে উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা বর্ত্তমান ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাগজখানা খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারেও নিয়োজিত হইয়াছিল। ১৮৩৫, ১৮ই জুন শেষ সংখ্যা বাহির হইবার পর ইহা উঠিয়া যায়।

---

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে 'সামাচার দর্পণ' হইতে উদ্ধৃত অংশসমূহ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় ও ৩য় খণ্ড হইতে গৃহীত।

কৃষ্ণমোহন 'হিন্দু ইউথ' নামে আর একখানা কাগজ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৮৩১, ১৯ নবেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ', 'প্রভাকরে' প্রকাশিত কোন দেশীয় লোকের রচনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করেন। ইহা কৃষ্ণমোহনের প্রতি কটুকাটব্যে পূর্ণ। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, যদিও কৃষ্ণমোহন তখনও খ্রীষ্টান হন নাই, তথাপি দেশীয় লোকেরা তাঁহাকে খ্রীষ্টান বলিয়াই গণ্য করিতেছেন,—

"...মেং বাবু কৃষ্ণা ক্রিঙ্গি হিন্দু ইউথনামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুষ্য পুত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন যেহেতু তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ইনকোয়েরর পত্রেই বা এ পর্য্যন্ত কি করিলেন যে এইক্ষণে ঐ বচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের হানি করিবেক ভাঙ্গ২ বন্দা জেনো তাহার সাধ্যমতে কশুর করে না কিন্তু আমারদিগের বোধ হইতেছে যে ঐ বচ্ছা পত্র বন্দ বা পার অভিমতে স্বজন হয় নাই এ হায়াহীন ড্রজো ভায়ার কর্ম্ম... ।"

সাধারণের এরূপ মনে হওয়া অসম্ভবও ছিল না। কেন না, ডিরোজিও ও তাঁহার শিষ্যগণ সর্ব্বদা একযোগে কর্ম্ম করিতেন। কৃষ্ণমোহন পরে অন্যান্য কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান আলোচনা-কালের বহির্ভূত।

সাহিত্য-চর্চ্চা

সংবাদপত্র-সেবা ও সাহিত্য-চর্চ্চা, এ দুইয়ের মধ্যে এক সময়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ইদানীং সংবাদপত্র সম্পাদন একটি বিশিষ্ট আর্ট বা বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে। তখন কিন্তু ইহা সাহিত্য হইতে আলাদা হইয়া পড়ে নাই, তাই তখনকার সাংবাদিকদের অনেকে বিশিষ্ট সাহিত্যিকও ছিলেন। কৃষ্ণমোহনের জীবনে এই দুইয়েরই সমাবেশ হইয়াছিল। সংবাদপত্র-সেবা ও সাহিত্য-চর্চ্চা, দুই-ই পাশাপাশি চলিয়াছিল। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। আর এই সময়েই ইহার স্থচনা লক্ষ্য করি।

কৃষ্ণমোহনের প্রথম পুস্তক একখানা ইংরেজী নাটক, নাম—'দি পারসিকিউটেড'। হিন্দুসমাজের তাৎকালিক অবস্থার একটি বিশেষ চিত্র তিনি ইহাতে আঁকিয়াছেন। ১৮৩১ সনের ১২ই নবেম্বর তিনি ইহা হিন্দু যুবকদের নামে উৎসর্গ করেন। যুবকদের নামে উৎসর্গ করিবার একটি বিশেষ হেতু আছে। যুবকরাই নূতনের পূজারী। তিনি ও তাঁহার বন্ধুরা যুবক। তাঁহার বয়স তখন উনিশও পার হয় নাই। এই অল্প বয়সেই তাঁহারা হিন্দুসমাজে আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিলেন ও নানা রকম নির্যাতনেরও সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ন্যায় অন্য যুবকগণও যাহাতে কুসংস্কারমুক্ত হইয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতে পারে, এই উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়াই কৃষ্ণমোহন পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন। তাঁহারাই পুরাতন ও নবীন দলের মধ্যে আদর্শ ও মতবাদের দ্বন্দ্ব, কর্ম্মে ও আচারে-ব্যবহারে প্রথম প্রকাশ করিতে থাকেন। এই সব বিষয় ইহাতে বিশেষভাবে

স্থান পাইয়াছে। বিপ্লবী কৃষ্ণমোহন ইহা যে নিপুণহস্তে চিত্রিত করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি! 'সমাচার দর্পণ' (৩ ডিসেম্বর, ১৮৩১) পুস্তকখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—

"তাড়িত [The Persecuted] নামক নাটক।—ঐ গ্রন্থকর্ত্তা বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর স্থানে আমরা তাড়িতনামক এক নাটক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম ঐ গ্রন্থ তিনি অতি নৈপুণ্যরূপে রচনা করিয়াছেন। ইঙ্গরেজী ভাষা ঐ বাবুর দেশীয় ভাষা নহে অতএব ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহার ঐ ভাষাতে লিখন অত্যুত্তম জ্ঞান হয় কিন্তু কলিকাতাস্থ লোকেরা এইক্ষণে যে রকম দলাদলে বিভক্ত আছেন তদ্দৃষ্টে ঐ পুস্তকের মর্ম্ম প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন। তাহাতে লেখেন যে ব্রাহ্মণেরা আপনার শিষ্যেরদিগকে দিয়া ও ঐ শিষ্যেরদের ভ্রান্ততা প্রযুক্ত ধনোপার্জ্জনে প্রাণ ধারণ করেন। আবার লেখেন যে হিন্দুরদের ভাগ্যবানলোকেরা ধর্ম্মবিষয়ক বিধি পরিত্যাগ করিয়া লাম্পট্যাদিতে আসক্ত আছেন যদ্যপি তাঁহার এতদ্রূপ দোষ অর্পণ করা কঠিন বোধ হয় তথাপি তাহা যে অযথার্থ নহে তাহা কহিতে আমাদের সঙ্কোচ নাই। রাজধানী লোকেরদের আচার ব্যবহার সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে। এবং যাঁহারা নাস্তিক বলিয়া হিন্দুধর্ম্ম ত্যক্ত ব্যক্তিরদিগকে তিরস্কার করেন তাঁহারা যদি আপনারদের পরমমান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা বিচারিত হন তবে তাঁহারাই পরম দোষী হইতে পারেন।"

'পারসিকিউটেড' পঞ্চাঙ্ক নাটক। 'এনকোয়েরর' পত্রিকার গ্রাহকদের নিকট দুই টাকায় ও অন্যান্যদের নিকট তিন টাকায় বিক্রী হইত। ইহার এক খণ্ড কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারেই অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর পুস্তকাদি রচনায় আর তাঁহাকে প্রবৃত্ত হইতে দেখি না। তবে তিনি যে জ্ঞান-চর্চ্চায় নিরত ছিলেন, তাহার নিদর্শন অবশ্য খুবই পাওয়া যায়। তিনি অতঃপর কতকটা একদেশদর্শী হইয়া পড়েন। তিনি সব বিষয়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাধান্য প্রমাণ করিতে চাহিতেন। পরে অবশ্য এই একদেশদর্শিতা দোষ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মবিষয়ে কিন্তু পূর্ব্বাপর গোঁড়াই রহিয়া গেলেন।

কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার বন্ধুগণ সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা [The Society for the Acquisition of General Knowledge] নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী হইলেন ইহার সভাপতি। ১৮৩৮, ২৩শে মে তারিখে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। কৃষ্ণমোহন এই অধিবেশনে 'পুরাণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এখনকার 'ইতিহাস' অর্থে তখন 'পুরাণ' শব্দটি ব্যবহৃত হইত। কৃষ্ণমোহনের প্রবন্ধ পাঠ সম্বন্ধে 'জ্ঞানান্বেষণ' লেখেন,—

"এক পত্র সকল সমীপে যাহা প্রেরিত হইয়াছিল তদনুসারে গত বুধবারে হিন্দু কালেজে সর্ব্বসাধারণের বিদ্যোপার্জ্জনার্থ যে সভা সেই সভা হইয়াছিল। পাদরি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাণ পাঠে যে লভ্য হয় তদ্বিষয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে উত্তম ভাব আর উত্তম তর্ক ছিল। আমরা ঐ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়কে ধন্যবাদ করি কেননা তিনি যে বিষয় প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা সফল হইয়াছে এবং তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে জুনমাসে আর সকলে পত্র লিখিবেন···তৎকালীন অতিশয় দুর্য্যোগ ও মেঘ গর্জ্জন হওয়াতেও ঐ পাদরি বাবুর বক্তৃতা শুনিতে শতাধিক মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন···।"
(সমাচার দর্পণ, ২৬শে মে ১৮৩৮)

কৃষ্ণমোহন যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা আমরা পরে বিশেষ ভাবে জানিতে পারিব। তিনি গীর্জ্জায়ও বাংলা ভাষায় বক্তৃতাদান প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার এই বক্তৃতাগুলি 'উপদেশ কথা' নামে ১৮৪০ সনের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। ১৩ই জুলাই 'দি ক্যালকাটা কুরিয়র' এই পুস্তক সম্বন্ধে লেখেন,—

"Oopodesh Kotha—during the last week, Srijut Baboo Krishno Mohon Bandopadhya, who generally goes by the name of 'Reverend Krishno Mohon,' and who preaches the Christian religion in the new Church on the East (?) of Hedue, has been so kind as to present us with a copy of the above mentioned work 'Oopodesh Kotha.' This book contains two hundred and twelve pages. We have not, however, from want of sufficient time, been able to peruse it throughout. As far as we have read, we are of opinion, much praise is due to Baboo Krishna Mohan, whose composition in the Bengalee language is excellent. In the first part of the work, his observations on the existence of a supreme Being are certainly very just, and his arguments in favour of the truth of Christianity do him great credit. He has not failed to exert all his powers in placing in a proper light the religion which he has embraced."

কৃষ্ণমোহন স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক যে প্রবন্ধ লিখিয়া দুই শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন, সে সম্বন্ধে ঐ পত্রিকা (৩ ডিসেম্বর ১৮৪০) লেখেন,—

"The Prize Essay—We understand that the committee appointed to decide on the merits of essays on the subject of "Native Female Education" have unanimously accorded the prize (Two hundred Rupees) to the Reverend Krishna Mohana Banerjee. It is, we have been informed, an admirable production which like the other writings of the reverend gentleman, is characterized by much good sense and a vigorous and elegant diction. We wish it to be published."

স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক এই প্রবন্ধটি পুরস্কার প্রাপ্তির আট বৎসর পরে তৎকালীন ভারতীয় সৈন্যাধ্যক্ষের পত্নী লেডী নিকলাসের আনুকূল্যে কিঞ্চিৎ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার সমালোচনা ১৮৪৮, ১৪ই নবেম্বর তারিখের 'ইংলিশম্যান' কাগজে বাহির হয়। এ পুস্তকখানিও এখন দুষ্প্রাপ্য।

শিক্ষার বাহন—সংস্কৃত-আর্বী-ফার্সী ? ইংরেজী ?—না, বাংলা ?

নব্যদল সকল বিষয়েই প্রগতিপন্থী ছিলেন। এ সময়ে শিক্ষার বাহন লইয়া যে যে আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহাতেও তাঁহারা সোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের মুখপাত্র ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার মতামত মোটামুটি

নব্যদলের মতামত হইলেও বিশেষ করিয়া তাঁহারও মতামত। বিশেষতঃ তিনি পূর্ব্বে খ্রীষ্টান হইয়াছেন, এ কারণে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য হইতে কতকটা স্বতন্ত্রও হইয়া থাকিবে।

শিক্ষার বাহনবিষয়ক আন্দোলন রাজা রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথম সুরু করেন। তিনি ১৮২৩ সনে তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে চিঠি লিখিয়া জানান যে, ইংরেজী শিক্ষা দ্বারাই ভারতে নবযুগের সূচনা হইবে, ভারতবাসীরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় লাভ করিবে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার বাহন হইলে ইহা সম্ভব হইবে না। তৎকালে সরকার এবিষয়ে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। কর্ত্তৃপক্ষ এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, জাতির মনোবাঞ্ছা রামমোহন কি বুঝিবেন? যাহা হউক, ইহার পর হইতে এই আন্দোলন ক্রমশঃ ব্যাপক হইয়া পড়িল। শিক্ষা কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্যই যদিও প্রাচ্য প্রাচীন ভাষাসমূহকেই শিক্ষার বাহন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি সরকার পক্ষ ইহার বিরোধী হইলেন। তাঁহারা ছিলেন ইংরেজীরই পক্ষপাতী। শেষে সরকার পক্ষের অভিপ্রায়ই বলবৎ রহিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে সরকার স্থির করেন যে, ইংরেজী শিক্ষার প্রতিই অধিকতর মনোযোগী হইতে হইবে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি বৎসর এদেশীয়দের শিক্ষার জন্য যে লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার কথা হয়, তাহা ইংরেজী শিক্ষাদানে ব্যয়িত হইবে স্থির হইল। এবিষয়ে কৃষ্ণমোহনের কি মতামত ছিল, একবার দেখা যাক।

নব্যদল, বিশেষতঃ কৃষ্ণমোহন যে এই ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতেই পাই। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডক্টর টাইটলার ছিলেন প্রাচ্য ভাষাসমূহকে শিক্ষার বাহন করিবার পক্ষপাতী। তিনি কলেজ-গৃহে ছাত্রদের সম্মুখে একদিন এবিষয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কৃষ্ণমোহনকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—"An ill bird fouls the nest।" কৃষ্ণমোহনের কর্ণে এই কথা পৌঁছিলে তিনি ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়া ডক্টর টাইটলারকে পত্র লেখেন। টাইটলারও জবাব দেন। উভয়ের এই সব পত্র ১৮৩৪, ১২ই এপ্রিল অতিরিক্ত সংখ্যা 'ক্যালকাটা কুরিয়র' কাগজে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত, আর্বী ও ফার্সীর বাহন হইবার বিপক্ষে এবং ইংরেজীর সপক্ষে বহু সুযুক্তি কৃষ্ণমোহনের পত্রাবলীতে উল্লিখিত হয়। তবে একদিন যে বাংলা, ইংরেজীর স্থান অধিকার করিবে, তাহারও ইঙ্গিত ইহার মধ্যে আছে।

তখন ইংরেজী সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি সংস্কৃত, আর্বী, ফার্সীতে অনূদিত হইয়া ছাত্রদের পড়াইবার ব্যবস্থা হইত। টাইটলার এই অনুবাদকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। ইহাতে অর্থব্যয়ও হইত প্রচুর। কৃষ্ণমোহন বলেন যে, বাঙালীর নিকট ইংরেজী শেখা যেমন কষ্টসাধ্য, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শেখাও তেমনি কষ্টসাধ্য। কারণ, প্রাচ্য ভাষাসমূহ মৃত ভাষা বলিয়া সাধারণে এসব একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদের এগুলি নূতন করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। কাজেই

এরূপ অনুবাদে শক্তি, সময় ও অর্থ বৃথাই ব্যয়িত হইয়া থাকে। তাহা না করিয়া সরাসরি ইংরেজী শিখিলে অল্প সময়ে বেশী সুফল পাওয়া যাইবে। বরং প্রাচ্য ভাষা হইতে ইংরেজী ও বাংলায় অনুবাদ হইতে থাকুক। এমন দিন শীঘ্র আসিবে, যখন ইংরেজী হইতেও বাংলা ভাষায় নানা বিষয় অনূদিত হইবে। ইহার ফলে ক্রমে মাতৃভাষাগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। কৃষ্ণমোহন এখানে সংস্কৃতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। আর্বী, ফার্সী সম্বন্ধেও ইহা সমভাবে প্রযোজ্য।

কৃষ্ণমোহন সংস্কৃত ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবারই বিপক্ষে ছিলেন, কিন্তু ইহার চর্চ্চা ও অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা কখনও অস্বীকার করেন নাই। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—

". . . . . that no man may say I have left the subject half-considered, I here take notice of the call upon us to do something for a language so comprehensive and so valuable for its containing the antiquities of this country and the wisdom of a large body of subtle philosophers. That our poets possessed of lively imagination; our theologians of subtle talents; and our philosophers of acute and profound thoughts; are truths very flattering to our country."

কৃষ্ণমোহন কিন্তু বিশ্বাস করিতেন, এবং ক্রমে তাঁহার এই বিশ্বাস দৃঢ়ই হইতেছিল যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোক না পাওয়ায়, সংস্কৃত বিদ্যা ও শাস্ত্র যতখানি পরিণতি লাভ করিতে পারিত, ততখানি পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই! যাহা হউক, তিনি আজীবন সংস্কৃত চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। ইহার পরিচয় আমরা পরে বহু পাইব।

ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগেই কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার বন্ধুগণ একটি বিষয়ে দৃঢ় মত পোষণ করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার উন্নতি না হইলে কি ইংরেজী, কি সংস্কৃত, কোন কিছু দ্বারাই জনশিক্ষা কার্য্যকরী হইবে না। কৃষ্ণমোহন এ সম্বন্ধে বলেন,—

"Mr. Tytler has taken much pains to show that no great improvement can be made in the country unless the spoken dialect is raised. There are some who bring plausible arguments against the doctor's position. The reading class of the country, infer they, is but a small body after all, and they may be certainly taught English; as for the other orders of the people, they would not read even if the native dialects were improved. Therefore, infer they, there is no necessity of taking the trouble of enriching Bengalee. I however differ in opinion from such persons, for I think the day may be expected when under god's blessing the meanest clown will pass his leisure hours in the intellectual reading; and I therefore agree with Mr. Tytler that no general improvement can be effected in the country without raising its dialects . . . ."

কৃষ্ণমোহন এই মত বরাবর পোষণ করিতেন। এই উদ্দেশ্যে কার্য্যও করিয়াছেন অবিরত। বাংলা-ভাষা-বাহন প্রচেষ্টার ইতিহাসে কৃষ্ণমোহন তথা নব্যদলের কথা উপেক্ষণীয় নহে।

খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার

নব্যদলের বিপ্লবী যুবকগণ একে একে সমাজের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইলেন, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত রীতি-নীতিও কতকটা ধোপদুরস্ত হইয়া, ধীরে ধীরে হইলেও, সমাজে চালু হইয়া গেল। ইঁহারা ক্রমে জনপ্রিয় হইয়াও উঠিলেন। কৃষ্ণমোহনের ভাগ্যে ইহা ঘটে নাই। তিনি গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া ফিরিঙ্গী মহলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ক্রমশঃ খ্রীষ্টান সংস্পর্শে আসিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ও খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারের জন্য মরিয়া হইয়া উঠিলেন। ১৮৩২, ১৭ই অক্টোবর তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতে ধর্ম্মপ্রচারকল্পে তিনি কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোল্লিখিত বিবরণীতে তাহার কিছু তথ্য আমরা পাইয়াছি। তিনি এই কার্য্যে হিন্দু সমাজের বড়ই অপ্রিয় হইয়া উঠেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি গোঁড়া হিন্দু পত্রিকাগুলি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাচ্ছিল্যভরে 'কৃষ্ণা বান্দা' বলিয়া উল্লেখ করিত। কৃষ্ণমোহন যখন স্থিরনিশ্চয় হইলেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের সেরা এবং ইহা গ্রহণই ভারতবর্ষের সর্ব্বৈব মুক্তির একমাত্র পথ, তখন তিনি এ ধর্ম্ম প্রচারে সর্ব্বস্ব পণ করিলেন। কারণ, তিনি খুব দৃঢ়চেতা লোক ছিলেন, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহাই করিয়া যাইতেন, কোন বাধাবিঘ্ন তাঁহাকে টলাইতে পারিত না। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি 'খ্রীষ্টিয়ানী' কখনও পছন্দ করিতেন না। তিনি মনে প্রাণে ভারতীয়ই ছিলেন, এবং নিজ শিক্ষা-দীক্ষা অনুসারে বরাবর ভারতবর্ষেরই সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য কতটা কি করিয়াছিলেন, বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের দুইটি বিবরণ হইতে এখানে কিছু কিছু উল্লেখ করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিতে চাই। ১৮৩৩, ৬ই জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণ' 'সমাচার চন্দ্রিকা' হইতে এ বিষয়ে একটি বিবরণ উদ্ধৃত করেন। তাহার অংশবিশেষ এই,—

"আমার জ্ঞান বালক কলিকাতায় মাতুলালয়ে থাকে, কোন্ স্থানে বিদ্যাভ্যাস করে তাহার বিশেষ কিছু জ্ঞাত ছিলাম না আট মাস তথায় পাঠ হইলে শুনিলাম মিশনারি স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে তৎপরে আপন ভবনে আনিয়া আটক করিলাম কিঞ্চিৎকাল পরে জাতিভ্রষ্ট অপকৃষ্ট কৃষ্টা বান্দা-নামক পাতি-ফিরিঙ্গি এক জন গত স্নানযাত্রার দিবসে আমার বনহুগলীর বাটীতে যাইয়া ঐ চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালককে ছল করিয়া আনিয়া বগীগাড়ীতে আরোহণ করাইয়া বালক শিক্ষকের বশীভূত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে গেলে তৎকালে আমার গৃহে পুরুষ মাত্র ছিল না......তৎপরে কয়েক দিন আমি তত্ত্ব করত ঐ পাঠশালায় আছে জানিতে পারিয়া বাটী মধ্যে প্রবিষ্ট হওনের চেষ্টা করিলাম। কোন মতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলাম না পরে পোলিসে নালিস করিলাম মাজিষ্ট্রেট সাহেবও তাহাতে মনোযোগ করিলেন না ফলতঃ আমার বালককে ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিলেন না...মিশনরি এতন্নগর মধ্যে অত্যন্ত বলবান্ হইয়াছে...আমার মত অনেকে সন্তান হারাইয়াছে...বড়বাজার নিবাসী নীলমণি নন্দির একটি পুত্রকে ঐ মত কৃষ্টা বান্দা আর কয়েক জন মিশনরি বাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায় আর কলিঙ্গানিবাসি রামমোহন ঘোষের পুত্রকেও তাদৃশ প্রকারে লইয়া গিয়া খ্রীষ্টিয়ান

করিয়াছে অপর কাশীনাথ চক্রবর্ত্তীর এক পুত্র অপর কালু ঘোষ নামে অপর এক গরীব কায়স্থের পুত্রকে খ্রীষ্টিয়ান করিয়াছে……।"

আমরা ক্রাইষ্ট চর্চ্চের উল্লেখ আগে পাইয়াছি। এই গীর্জ্জাটির প্রথম পাদ্রী হইলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার প্রতিষ্ঠা-কালেও কলিকাতায় খুব আন্দোলন দেখা দেয়। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা চুঁচুড়া-নিবাসী গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় এই সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি পুত্রের 'নবজীবন' মাসিকে (ভাদ্র, ১২৯৪) কৃষ্ণমোহন-জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে এই সম্পর্কে নিজ অভিজ্ঞতা হইতে অনেক কথা লেখেন। বলা বাহুল্য, তিনিও কৃষ্ণমোহনের প্রতি সদয় ছিলেন না। তিনি লিখিয়াছেন,—

"এই গির্জ্জার স্থান নির্ণয়ের সময়ে কৃষ্ণমোহন বুদ্ধির প্রখরতা দেখাইলেন…। তিনি মিশনরী সাহেবদিগকে পরামর্শ দিলেন যে হিন্দুকলেজের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এই গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে পারিলে কলেজের ছাত্রেরা অন্তত তামাসা দেখিবার জন্য গির্জ্জাতে না আসিয়াও প্রচারের বাক্য না শুনিয়া থাকিতে পারিবে না; হেয়ার সাহেব বা কালেজের অধ্যক্ষগণ কতদিন তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া রাখিবেন?…এই মন্ত্রণা করিয়া কৃষ্ণমোহন অতি গোপনে হিন্দু কলেজের পশ্চিমের বারাণ্ডার পশ্চিমের ধারে, যেখানে এক্ষণে হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজ হইয়াছে, সেই স্থানটি ক্রয় করিয়া তাহাতে গির্জ্জা নির্ম্মাণের কল্পনা করিলেন। এই স্থানে পূর্ব্বে একটা বৃহৎ বস্তী ছিল, খোলার ঘর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, আমরা কলেজে আসিয়া এই স্থানের লোহার কর্ম্মকারদিগের দ্বারা লাটিমের আল বসাইয়া লইতাম। এদিকে ভিতরে ভিতরে কৃষ্ণমোহন মহা সমারোহের সহিত প্রস্তাবিত গির্জ্জার ভিত্তি সংস্থাপনের আয়োজন করিলেন, কিন্তু হেয়ার সাহেব কিংবা হিন্দু কলেজের কোন অধ্যক্ষই ইহার কোন সংবাদ জানিতেন না। অবশেষে ভিত্তি সংস্থাপনের অতি অল্প সময় পূর্ব্বে, এক কি দুই দিন পূর্ব্বে, কি ঠিক সেই দিন প্রাতে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। ভিত্তি গাড়ার কার্য্যটা বৈকালেই সাধারণতঃ হইয়া থাকে। আমরা কলেজে আসিবার সময় দেখিলাম যে সেই বস্তীর মধ্যে একটি স্থান পরিষ্কৃত হইতেছে, কয়েক গাড়ী বাঁশ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আসিয়াছে এবং কুলী-মজুর সেইখানে সমবেত হইয়াছে। আমার উত্তম স্মরণ আছে যে, কলেজ বসিবার পরে কলেজের অধ্যক্ষদিগের নিকট হইতে হুকুম আসিল যে সেই দিবস নিয়মিত ৫টার সময় ছুটি হইবে না, সন্ধ্যার পরে ছুটি হইবে এবং কোনও বালক সন্ধ্যার পূর্ব্বে কলেজ গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিবে না।…কিন্তু কৃষ্ণমোহনের এত আয়োজন ও দর্শকদিগের এত আশা সকলই নিষ্ফল হইল। সে দিবস ভিত্তি গাড়া হইল না। শুনিলাম যে হেয়ার সাহেব, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, মতিলাল শীল প্রভৃতি হিন্দু সমাজের প্রধান কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ স্যর এডওয়ার্ড রায়ানের সহকারে বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার দ্বারা লাট পাদ্রীকে সেই দিবস প্রস্তাবিত গির্জ্জার ভিত্তি গাড়ার কার্য্য স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন এবং লাট পাদ্রীও সেই অনুরোধ মতে ভিত্তি সংস্থাপন করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন।…নির্দ্ধারিত দিবসে ভিত্তি সংস্থাপিত না হওয়াতে হেয়ার সাহেব ও কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া পাদ্রী-দিগের সেই কার্য্য রহিত করিতে কৃতকার্য্য হইলেন এবং অবশেষে অধ্যক্ষগণ পাদ্রী সাহেবদিগের নিকট সেই ভূমিখণ্ড উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া তাহার উপরে এক বাঙ্গালা পাঠশালা সংস্থাপন করিলেন। পাদ্রী সাহেবেরা হেদুয়া পুষ্করিণীর নৈর্ঋত কোণে ভূমি সংগ্রহ করিলেন এবং তাহার উপর ক্রাইষ্ট চার্চ্চ নামে সুন্দর এক গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া কৃষ্ণমোহনকে সেই গির্জ্জার প্রধান পাদ্রী পদে বরণ করিলেন। এইরূপে উভয় কুল বজায় রহিল।

ঐ সময়কার 'সমাচার দর্পণে' (২১ জুলাই, ১৮৩৮) এই সম্পর্কে যে সংবাদ বাহির হয়, তাহার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে অমিল থাকিলেও মূলতঃ গঙ্গাচরণের কথাই সমর্থিত হইতেছে

——

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়

(৬) ঋগ্‌বেদের আদিত্য

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ঋগ্‌বেদের ঋষি শক্তির উপাসনা করিতেন। জগতে শক্তির অসংখ্যপ্রকার প্রকাশ আছে। যে বস্তুতে প্রকাশ, যাহা শক্তির আশ্রয়, তাহাকে ধরিয়া শক্তির নাম হইয়াছিল। সূর্য এক। কিন্তু তিনি কভু বিষ্ণু, কভু ইন্দ্র, কভু আদিত্য। যখন তাঁহার বার্ষিক গতি ধ্যান করি, তখন তিনি বিষ্ণু। যখন তিনি বারি বর্ষণ করেন, বিশেষতঃ উত্তরায়ণ সমাপ্ত করিয়া বার্ষিক বর্ষা আনয়ন করেন, তখন তিনি ইন্দ্র। আর যখন এক এক ঋতুর কর্তা, তখন তিনি আদিত্য। অতএব যত ঋতু, তত আদিত্য। অর্থাৎ আদিত্য ঋতুর অধিপতি।

ঋগ্‌বেদের ঋষি কভু তিন ঋতু, কভু পাঁচ ঋতু, কভু ছয় ঋতু গণিতেন। বৎসরে তিন ঋতু ধরিলে আদিত্য তিন। পাঁচ ঋতু ধরিলে আদিত্য পাঁচ, ছয় ঋতু ধরিলে আদিত্য ছয়। তিন ঋতু ধরিলে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা। পাঁচ ঋতু ধরিলে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত। এখানে হেমন্ত চারি মাস। ছয় ঋতু ধরিলে হেমন্ত দুই মাস, অপর দুই মাস শিশির।

ঋগ্‌বেদে এত দীর্ঘকালের, সহস্র সহস্র বৎসরের ইতবৃত্ত আছে যে, তিন ঋতুর আদিত্য, পাঁচ ঋতুর আদিত্য ও ছয় ঋতুর আদিত্য পৃথক্ করিতে পারা যায় না। মানুষের স্বভাব, পুরাতন নাম নূতনে প্রয়োগ করে। এই কারণে ঋগ্‌বেদের প্রধান প্রধান দেবতাদের সকল লক্ষণ বুঝিতে পারা যায় না।

যেমন কৃষ্ণ-যজুর্বেদ (৬।৫।৬) লিখিয়াছেন, আদ্যকালে চারি আদিত্য ছিল। ইহাতে তিন মাসে এক ঋতু হইতেছে। সে চারি আদিত্যের নাম লিখিত হয় নাই। বোধ হয়, সে চারি আদিত্য একত্রে 'বিষ্ণু' নাম পাইয়াছিলেন। কিন্তু যজুর্বেদে আদিত্য অষ্ট ও দ্বাদশ। দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ সৌর মাসের কর্তা। ব্রাহ্মণে ও পুরাণে আদিত্য দ্বাদশ। কিন্তু ইহাঁদের নামে ঐক্য নাই। নাম যাহাই হউক, আদিত্য-কল্পনার মূল পাওয়া যাইতেছে। ঋগ্‌বেদে সূর্য ঋতু বিধান করেন। সূর্যের যে শক্তি ঋতু-বিধানের কর্তা, তিনি আদিত্য।

ছয় ঋতুর ছয় আদিত্য বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সাত ও আট কেন?

ইহার হেতু অনুমান করিতে হইবে। সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয়-কাল, সাবন দিন। ৬০ সাবন দিনে এক ঋতু। ৩৬০ সাবন দিনে ছয় ঋতু। কিন্তু বৎসরে ৩৬০ দিন গণিলে বৎসরের পরিমাণ ছয় দিন কম হয়। পাঁচ বৎসরে ৩০ দিন কম হয়। অতএব

৩৬০ দিনে বৎসর ধরিলে প্রত্যেক ঋতু ৩০ দিন বা এক মাস পিছাইয়া পড়িবে। যদি আজি কোন নক্ষত্রের উদয় দেখিয়া বৎসরের ও কোন ঋতুর আরম্ভ ধরি, আর বৎসরে ৩৬০ সূর্যোদয় গণিয়া যাই, পাঁচ বৎসর পরে সে নক্ষত্রের উদয় হইতে এক মাস বিলম্ব হইবে। দশ বৎসর পরে দেখা যাইবে, যে সময়ে বর্ষা-আরম্ভ হইয়া থাকে, দিন-গণনায় সে ঋতু দুই মাস পিছাইয়া গিয়াছে। এই অনৈক্য লক্ষ্য করিতে বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি আবশ্যক হয় না। কৃষিকর্ম ব্যতীত প্রাণধারণের উপায় নাই। বর্ষা ঋতু কবে আসিতেছে, তাহা পূর্বে না জানিলে যথাকালে হলকর্ষণ ও বীজবপন হইতে পারে না।

অর্থাৎ, ঋগ্‌বেদের ঋষি ৩৬০ দিনে বৎসর গণিতেন বটে, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে পরে অতিরিক্ত এক মাস গণিতেন। সেই এক মাসের এক আদিত্য কল্পিত হইয়াছিল। আদিত্য যেন অশ্ব। ছয় অশ্ব রবিকে পরে পরে ছয় ঋতুর স্থানে লইয়া যায়। সপ্তম অশ্ব ন্যূন মাসটি অতিক্রম করে। এই হেতু সূর্য সপ্তাশ্ব।

এইরূপে ৩৬৬ দিনে বৎসর পাইলাম। এখানে একটু ভুল থাকিতেছে। বৎসরে ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিন না হইয়া $\frac{৩}{৪}$ দিন অধিক ধরা হইতেছে। ৪০ বৎসরে $\frac{৩}{৪}\times$৪০ = ৩০ দিন অর্থাৎ এক মাস অধিক দাঁড়াইবে। এই এক মাস পরিত্যাগ না করিলে নক্ষত্রের উদয়ে কিংবা বর্ষা ঋতুর আরম্ভে গণনার সহিত প্রত্যক্ষের ঐক্য হইবে না। এই অধিক মাসটির আর এক আদিত্য কল্পিত হইয়াছিল। এই আদিত্য উৎপন্ন হইলেই পরিত্যক্ত হইত। এই আদিত্যের নাম 'মার্তণ্ড' ছিল। এটি মৃত-অণ্ড। এটির উল্লেখ ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে আছে। ঋগ্‌বেদের অন্তিম কালে উক্ত অনৈক্য সংশোধিত হইয়াছিল।

এখানে ছয়, সাত, আট আদিত্য গণিবার যে ব্যাখ্যা দেওয়া গেল, ঋগ্‌বেদে তাহার সমর্থক আছে। সে সকল উক্তির সংগ্রহ দিতে হইলে প্রত্যেক উক্তির ব্যাখ্যা আবশ্যক হইবে, প্রবন্ধটিও গাঢ় হইয়া উঠিবে। এই কারণে সপ্তম ও অষ্টম আদিত্যকল্পনার সমর্থক প্রমাণ তুলিলাম না।

ছয় আদিত্যের পরে পরে নাম কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেক স্থানে অর্যমা, মিত্র, বরুণ, এই তিন আদিত্যের নাম একত্র আছে। পূষা ও সবিতা, আর দুই বিখ্যাত আদিত্য। মিত্র ও বরুণ মিলিয়া 'মিত্রাবরুণ' নাম বহু স্থানে আছে। অতএব অর্যমার পর মিত্র, মিত্রের পর বরুণ। পূষা ও সবিতার সম্বন্ধ পাওয়া যায়। পরে দেখাইতেছি, অর্যমা বসন্ত ঋতুর, মিত্র গ্রীষ্ম ঋতুর, বরুণ বর্ষা ঋতুর, পূষা হেমন্ত ঋতুর, সবিতা শীত ঋতুর আদিত্য। শরৎঋতুর আদিত্যের কি নাম ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। ঋগ্‌বেদের এক স্থানে (২।২৭।১) ছয় আদিত্যের নাম মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ, অংশ। এখানে পরে পরে ছয় আদিত্যের নাম নাই। পূষা এক বিখ্যাত আদিত্য, তাঁহারও নাম নাই। কিন্তু আমরা পাঁচ ঋতুর পাঁচ আদিত্যের নাম পাইলাম। উক্ত ছয় আদিত্যের মধ্যে ভগ ও অংশের কর্ম পাওয়া যায় না। বোধ হয়, ভগ শরৎ ঋতুর আদিত্য ছিলেন। অংশের নামে পৃথক্ স্তুতিও নাই। অংশ ও ভগ শব্দের অর্থ

একই। বোধ হয়, একই আদিত্যের কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ। দক্ষ, সপ্তম আদিত্য। এক স্থানে (১০।৬৪।৫) মিত্র, বরুণ ও অর্যমার সহিত দক্ষের উল্লেখ আছে। আর এক স্থানে (১০।৭২।৪) লিখিত আছে, অদিতি হইতে দক্ষের ও দক্ষ হইতে অদিতির জন্ম হইয়াছিল।

আটটি আদিত্যই অদিতির পুত্র। এই হেতু তাঁহাদের নাম আদিত্য। আমরা জানি, অদিতি পুনর্বসু নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী। ইহা হইতে পাইতেছি, যে কালে পুনর্বসু নক্ষত্রের উদয়কালে যজ্ঞ হইত, সে-কালে আদিত্য-কল্পনা হইয়াছিল। সে ঋতু বসন্ত ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। ইহা হইতে খ্রি-পূ ৬০০০ অব্দে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি। কালান্তরে দুই সহস্র বৎসর অতীত হইলে মৃগনক্ষত্রে রুদ্রদেব কল্পিত হইয়াছিলেন। তখন অদিতি অর্থাৎ পুনর্বসু নক্ষত্রে পূর্ণিমায় শরৎঋতু আরম্ভ হইত না। মৃগনক্ষত্রে পূর্ণিমায় আরম্ভ হইত। এই বিসম্বাদ হেতু প্রাচীন কালের দক্ষযজ্ঞ রহিত হইয়াছিল। যজ্ঞাগ্নিরূপা সতী নূতন যজ্ঞাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। ইহা খ্রি-পূ ৪০০০ অব্দের ঘটনা। দক্ষযজ্ঞ-নাশের পৌরাণিক বৃত্তান্তের মূল এই।

উপরে ছয় ঋতুর ছয় আদিত্য পাইয়াছি বৎসরে তাঁহাদের অধিকারকাল এইরূপ,—

সবিতা—শিশির ঋতু	(২৭০°-৩০০°-৩৩০°)	বরুণ—বর্ষা (৯০°-১২০°-১৫০°)
অর্যমা—বসন্ত	,, (৩৩০-৩৬০-৩০)	ভগ—শরৎ (১৫০-১৮০-২১০)
মিত্র—গ্রীষ্ম	,, (৩০-৬০-৯০)	পূষা—হেমন্ত (২১০-২৪০-২৭০)

সূর্যই কর্মভেদে 'আদিত্য' নাম পাইয়াছিলেন। সামান্য লক্ষণে সকলেই সমান। বিশেষ লক্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে পৃথক্ করিতে হইবে। এখানে এক এক আদিত্যের দুই একটি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা আদিত্য-তত্ত্ব প্রমাণ করিতেছি। প্রোফেসর মেকডোনেল-কৃত Vedic Mythology এক অমূল্য গ্রন্থ। আমি এই গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া লক্ষণ তুলিয়া বাহুবন্ধের মধ্যে ব্যাখ্যা করিতেছি।

সবিতা

সবিতা হিরণ্যদ্যুতি (৩।৩৮।৮)। [শীতকালের উদীয়মান রবি যেমন স্বর্ণবর্ণ দেখায়, অন্য কালে তেমন প্রায় দেখায় না]। তিনি উষার পূর্বে অশ্বিদ্বয়ের রথ চালনা করেন (১।৩৪।১০)। [পরে দেখাইব, অশ্বিনী নক্ষত্রে দুইটি তারা, দেবতা অশ্বিদ্বয়ের গৃহ। ঋগ্বেদের কালে অশ্বিদ্বয় শীত ঋতুর আরম্ভে পূজিত হইতেন। অশ্বিনী নক্ষত্রের উদয়কালে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে যজ্ঞ হইত অর্থাৎ সবিতা শীতঋতুর আদিত্য]। সবিতা তাঁহার হিরণ্ময় রথে নিম্নগতি হইয়া ঊর্ধ্বগতি হন (১।৩৫।২-৩)। [অর্থাৎ রবির দক্ষিণায়ন সমাপ্ত ও উত্তরায়ণ আরম্ভকালীন আদিত্য]। সবিতা মৃতকে সুকৃতলোকে লইয়া যান (১০।১৭।৪)। [অর্থাৎ দেবযানের পথে। উত্তর দক্ষিণ দিগ্-বিন্দু ও অয়নান্তদ্বয়-গত-বৃত্ত

দেবযান ও পিতৃযান। দক্ষিণায়নান্ত হইতে উর্দ্ধদিকে দেবযান, উত্তরায়ণান্ত হইতে নিম্নদিকে পিতৃযান]। সবিতা প্রসবিতা (১।১৫৭।১ ; ৫।৮১।৫)। [পাঞ্জাবের অত্যন্ত শীতে বৃক্ষ-লতা জীব-জন্তু অবসন্ন হয়। সবিতার আগমনে সঞ্জীবিত হয়]। তিনি প্রজাপতি (৪।৩৫।২)। [প্রজাপতি, বৎসর ও যুগের অধিপতি। হেমন্ত অন্তে বৎসর আরম্ভ হইত। এই হেতু প্রজাপতি। এই কারণে]। বিশ্বামিত্র গায়ত্রীচ্ছন্দে সবিতার স্তব করিয়াছিলেন (৩।৬২।১০)। সবিতার স্তুতিহেতু সেই ঋকৃটির নাম সাবিত্রী।

আমরা সেই দেব সবিতার বরণীয় তেজ ধ্যান করি,
যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন।

পূষা

পূষা রথীশ্রেষ্ঠ, [কারণ] তিনি সূর্যের হিরণ্ময় রথকে নিম্নদিকে চালিত করেন (৬।৫৬।৩)। [এখানে পূষার অধিকার স্পষ্ট নির্দেশিত হইয়াছে। সূর্যের দক্ষিণায়নের শেষ ঋতু তাঁহার কাল, অর্থাৎ হেমন্ত]। তিনি ছাগ-বাহন (১।৩৮।৪ ; ৬।৫৫।৩-৪)। [তাঁহার রথ নিম্নদিকে গমন করে। এই কারণে অশ্বের পরিবর্তে ছাগ। নিম্নদিকে যাইতে ছাগের পদস্খলন হয় না, অশ্বের হয়। এই কারণে] তিনি পথ-বেত্তা (৬।৫৩ ; ৬।৪৯)। পূষা করম্ভ অর্থাৎ দধিমিশ্রিত সক্তু (ছাতু) ভোজন করেন। [কারণ, তাঁহার অধিকার-কালে যব পাকিত ও লোকে ছাতু খাইত। এই কারণে শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৭।৪।৭) পূষা দন্তহীন]। স্বর্গের অতি দূরপথে পূষার জন্ম (৬।১৭।৬)। [এই কারণে] তিনি পিতৃযান অবগত আছেন, এবং মৃতকে পিতৃলোকে লইয়া যান (১০।১৭।৩-৫)। [এখানেও পূষার অধিকার পাওয়া যাইতেছে। লাহোরে দক্ষিণায়নান্তকালে মধ্যাহ্নসূর্য মাত্র ৩৪° অংশ উচ্চে থাকেন। পূষা ও ভগ একত্র স্তুত হইয়াছেন। যেমন মিত্রের পর বরুণের, তেমন ভগের পর পূষার অধিকার]। সূর্যা সবিতার কন্যা। দেবগণ পূষার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন (৬।৫৮।৪)। [এখানে পূষার সহিত সবিতার সম্বন্ধ পাওয়া যাইতেছে। 'পূষ্‌' ধাতু পোষণ হইতে 'পূষা' নাম নিষ্পন্ন। তিনি পক্ক শস্য দ্বারা মানুষকে পোষণ করেন।

বরুণ

বরুণ অন্তরিক্ষের জলকে প্রমুক্ত ও প্রবাহিত করেন (৭।৬৪।২ ; ৮।২৫।৬)। [বরুণ বর্ষাঋতুর আদিত্য]। তিনি সূর্যকে হিরণ্ময় দোলার ন্যায় দীপ্তির জন্য নির্মাণ করিয়াছেন (৭।৮৭।৫)। [অর্থাৎ বরুণের রাজত্বের আরম্ভকালে সূর্য দোলায় আরোহণ করেন।] মিত্র ও বরুণ সর্বোচ্চ স্বর্গে রথে আরোহণ করেন (৫।৬৩।১)। [এখানেও বরুণের স্থান স্পষ্ট নির্দেশিত হইয়াছে]। বরুণ পাপীর দণ্ডবিধান করেন (৭।৮৬।৩।৪)। [বর্ষাকালের

রোগ দ্বারা। আর অদ্যাপি আমরা জানি, পাপের দেশে সুবৃষ্টি হয় না, ঋতুর বৈপরীত্য হয়।] বৃ ধাতু আবরণ হইতে 'বরুণ' শব্দ নিষ্পন্ন। তিনি অন্তরিক্ষকে মেঘদ্বারা আবৃত করেন।

মিত্র

মিত্র বরুণের সহচর। উভয়ে একত্র স্তুত হইয়াছেন, 'মিত্রাবরুণ' নামে যুগল-দেবতা হইয়াছেন। [কারণ, মিত্র গ্রীষ্ম ঋতুর আদিত্য এবং বরুণ গ্রীষ্মের পর বর্ষা ঋতুর আদিত্য। মিত্র ও বরুণ যুগল-দেবতা কল্পিত হইয়া ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে মিত্র দিবার ও বরুণ রাত্রির দেবতা হইয়াছিলেন]। মিত্র কৃষকদিগকে একত্র আহ্বান করেন, এবং তাহাদের কর্ম পরিদর্শন করেন (৩।৫৯ ;৭।৩৬।২)। [ঋগ্‌বেদের কালে যবই প্রধান কৃষিশস্য ছিল। ইহা বর্ষাঋতুর শস্য ছিল। অপর শস্যও বর্ষাঋতুতে জন্মিত। মিত্র, কৃষকের মিত্র। তিনি হলকর্ষণ ও বীজবপনের কাল জানিতেন।] বসিষ্ঠ ও অগস্ত্য মিত্রাবরুণের পুত্র। [এই বসিষ্ঠ ও অগস্ত্য দুই তারার নাম। মিত্রের তিরোধান ও বরুণের আগমনের সময়ে অর্থাৎ উত্তরায়ণান্তকালে এই দুই তারা লক্ষ্য হইত এবং তাহাদের দ্বারা ঋতু অনুমিত হইত।]

অর্যমা ও ভগ

মিত্র ও বরুণের সহিত অর্যমা বহু বার স্তুত হইয়াছেন। কিন্তু অর্যমার বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় না। পাঞ্জাবে বসন্ত ঋতু স্পষ্ট নয়। শীতান্ত হইলেই গ্রীষ্ম পড়ে। সে সময়ে কৃষিকর্ম থাকে না। অর্যমা শব্দের অর্থ সহচর। তিনি বসন্ত ঋতুর সহচর। ভগ নামক আদিত্যেরও কোন বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় না। এই নামের অর্থ দাতা। বোধ হয়, তিনি শস্যরূপ ধনদাতা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত

প্রোফেসর মেকডোনেলের বিবেচনায় সবিতা সূর্যের দৈবী শক্তির রূপক। তিনি কর্মশক্তির উদ্বোধয়িতা। কিন্তু এই নির্বচন পর্যাপ্ত নয়। সবিতা প্রতিদিনের সূর্য নহেন। প্রোফেসর মনে করিয়াছেন, বরুণ বিস্তীর্ণ আকাশের দেবতা। কিন্তু আকাশের কর্ম কি আছে ? তাঁহার মতে পূষা সূর্যের কল্যাণকর শক্তি। তিনি পশুপালকদিগের সহায়। কিন্তু পূষা পথবেত্তা, এই কারণে তিনি পশুরক্ষক। তাঁহার মতে মিত্র সূর্যদেবতা। কিন্তু এতদ্দারা কিছুই পাইলাম না। তিনি লিখিয়াছেন, আদিত্যেরা দিব্যজ্যোতির দেবতা। কিন্তু সে কোন্ জ্যোতি এবং তাঁহার এতগুলি নাম কেন ? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অন্ধের হস্তি-দর্শন করিয়াছেন। ঋষিগণ ঋতুবিভাগ করিতেন, করিতে জানিতেন, ইহা স্বীকার না করিলে আদিত্যতত্ত্ব বুঝা যাইবে না।

সোহুরি গ্রামে পাথরের যাঁত-কুণ্ডি
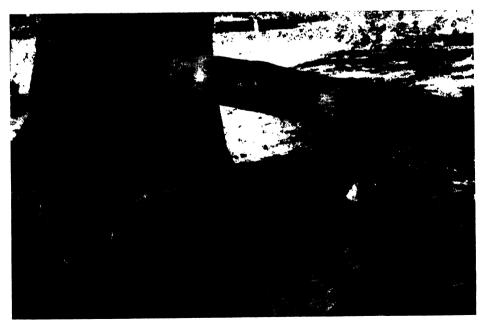
ভাহুয়া গ্রামে কাঠের যাঁত-কুণ্ডি, নীচে কয়েকখানি পিঁড়া

গর্তের মধ্যে নীচের হাঁড়ি বসান হইতেছে

উপরের ফুটাবিশিষ্ট হাঁড়ি বসান হইতেছে

ঘুঁটের উপরে খড় চাপা দিয়া আগুন ধরান হইয়াছে

তৈলনিষ্কাশনের আরও কয়েকটি উপায়

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৪৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) আমরা সড়ইকলা রাজ্যে তৈল-নিষ্কাশনের কয়েকটি উপায়ের বর্ণনা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি উপায়ের সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে সড়ইকলার মত চাপ দিবার যাঁত এবং ঘানি, উভয়েরই যথেষ্ট প্রচলন আছে। কিন্তু তদ্ভিন্ন তৈল বাহির করিবার জন্য আরও দুইটি উপায় প্রচলিত রহিয়াছে। কয়েক প্রকার বীজ হইতে শুধু শুখ্‌না তাতের দ্বারা তৈল বাহির করা হয়, আবার কয়েকটিকে ছেঁচিয়া, জলে সিদ্ধ করিয়া তৈল নিষ্কাশিত হয়। প্রথমে এই দুই উপায়ের সম্বন্ধে বলি।

শুখ্‌না তাতের দ্বারা তেল বাহির করা

গত বৎসর ১১ই মাঘ তারিখে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে বারিপদা হইতে এগার মাইল উত্তরে কুলিঅনা নামক গ্রামে আমরা স্থানীয় কয়েকজন চাষীর সাহায্যে শুখ্‌না তাতের দ্বারা বাঘনখী ফল (Myrtinia Diandra) হইতে তেল বাহির করিয়াছিলাম। ইহার জন্য দুইটি হাঁড়ি, একটি সরা বা হাঁড়ি, শাবল ও কোদাল, কিছু জল ও কাদা, ঘুঁটে এবং খড়ের প্রয়োজন। প্রথমে প্রায় দুই সের বাঘনখীর ফল সংগ্রহ করা হইল। একটি ছোট হাঁড়িকে জলে ভিজান হইল। তাহার পর মাটিতে খানিক গর্ত্ত করিয়া, সেই হাঁড়িটি বসাইয়া, পাশে আলগা মাটি দিয়া তাহার প্রায় কানা পর্যন্ত পুঁতিয়া দেওয়া হইল। তাহার উপরের হাঁড়িটির তলায় ছোট একটি ছিদ্র করিয়া তখন বসাইয়া দেওয়া হইল। উভয় হাঁড়ির সংযোগস্থলে ভাল করিয়া কাদার প্রলেপ মাখানো হইল, যেন তাহাতে ধূলা-বালি প্রবেশ করিতে না পারে।

এইবার দ্বিতীয় হাঁড়িটির কানার কিছু নীচে পর্যন্ত মাটি ঢাকিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর সেই হাঁড়িটিতে শুখ্‌না বাঘনখীর ফলগুলি ভরিয়া, তাহার উপরে আর একটি হাঁড়ি উপুড় করিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। তৎপরে তাহার উপরে ঢিপির মত ঘুঁটে সাজানো হইল। শুখ্‌না ঘুঁটের উপরে কিছু খড় বিছাইয়া তাহাতে আগুন দিতেই অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুঁটেগুলি ধরিয়া উঠিল। বেলা সাড়ে চারিটা হইতে রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্যন্ত আগুন ছিল। তাহার পরদিন মাটি খুঁড়িয়া দেখা গেল যে, নীচের হাঁড়িতে দুই আউন্সের কিছু বেশী ঘন কৃষ্ণবর্ণ তেল জমিয়া আছে। তেলের অল্প অংশ মাটির

হাঁড়িতে শুষিয়া গিয়াছিল। তেলের গন্ধও কেমন পোড়া পোড়া হইয়াছিল। যে ব্যক্তিরা তেল তৈয়ারি করিয়াছিল, তাহারা বলিল, উপরের হাঁড়িটি আরও কিছু দূর পর্যন্ত মাটির ভিতরে পুঁতিয়া দিলে আঁচ কম লাগিত, তেলও ক্ষরিয়া যাইত না। অপর এক ব্যক্তি বলিল, ফলগুলিকে আগে ভিজাইয়া লইলে তেল কিছু বেশী হইত, পোড়া গন্ধও থাকিত না। যাহাই হউক, শুখ্‌না তাতের দ্বারা যে তেল বাহির করার রীতি এদেশে প্রচলিত আছে, ইহাই আমাদের পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইল।

বাঘনখীর তেল খোস পাঁচড়ার ঔষধ। এদেশে খোস পাঁচড়া হইলে লোকে নিমপাতা-সিদ্ধ জলে ভাল করিয়া তাহা ধুইয়া ঐ তেল পালকের সাহায্যে লাগাইয়া দেয়। তাহাতে নাকি খোস সারিয়া যায়। ভেলার তেলও (Semecarpus anacardium) এই ভাবে নিষ্কাশিত হয়। সে তেল গায়ে লাগিলে ঘা হয়, কিন্তু গরুর গাড়ীর চাকায় দিবার পক্ষে উপযোগী। ময়ূরভঞ্জের বনে প্রচুর ভেলা গাছ জন্মায়, অতএব গরুর গাড়ীর জন্য তাহা ব্যবহার করিলে পয়সা খরচ করিতে হয় না।

সাহাবাদ জেলায় শিয়াল কাঁটার (Argemone mexicana) বীজ হইতে উপরোক্ত উপায়ে তৈল নিষ্কাশিত হয় বলিয়া শুনিয়াছি। শিয়ালকাঁটার বীজ সরিষার মত, আকারে সামান্য বড়। সেই জন্য উপরের হাঁড়িতে ভরিবার পূর্বে ছিদ্রে সামান্য খড় গুঁজিয়া দিতে হয়। উত্তাপের ফলে তৈল বাহির হইয়া সেই খড় বাহিয়া নীচের হাঁড়িতে চোয়াইয়া পড়ে। শিয়ালকাঁটার তেল খোস পাঁচড়ার মহৌষধ। তদ্ভিন্ন পশ্চিম অঞ্চলে জল তুলিবার জন্য যে-সকল চামড়ার পাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাতে শিয়ালকাঁটার তেল মাখাইলে চামড়া পচে না, ভাল থাকে। হয় ত এই তেল ফুটবলের খোলে মাখাইলে তাহাকে ওয়াটারপ্রূফ করিতে পারে।

২৮এ ফাল্গুন সংবাদ পাইলাম, বাঙলা দেশেও তৈলনিষ্কাশনের এই প্রথাটি প্রচলিত আছে। শ্রীযুক্ত অনুকূল চক্রবর্ত্তী মহাশয় হুগলী জেলায় আরামবাগ মহকুমার এক জন বিশিষ্ট কর্মী। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। তিনি বড়ডোঙ্গল গ্রামে থাকেন। সেখানে গ্রামের হাতুড়ে কবিরাজেরা ঠিক এই ভাবে **কাঠ তেল** নামক একপ্রকার খোসের ঔষধ প্রস্তুত করেন। কলুর ঘানিতে জাঠ সচরাচর বাব্‌লা কাঠে নির্মিত হয়। বহু দিন ব্যবহারের পরে সেই জাঠ অকেজো হইয়া পড়িলে কবিরাজেরা তাহার তৈলসিক্ত অংশ ধারাল যন্ত্রের সাহায্যে চাঁছিয়া কুচি কুচি করিয়া ফেলেন। সেই কাঠ হইতে উপরোক্ত উপায়ে তৈল বাহির করিয়া খোসের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

বীজ সিঝাইয়া তেল বাহির করা

ময়ূরভঞ্জে রেড়ী হইতে দুই ভাবে তেল বাহির করা হয়। ঘানিতে পিষিলে পাৎলা তেল বাহির হয়, কুলিঅনা অঞ্চলে তাহার বিশেষ চলন নাই। এখানে রন্ধা-জড়া-তেল,

অর্থাৎ রান্না করা রেড়ীর তেলের ব্যবহার বেশী। তাহা নিম্নোক্ত উপায়ে প্রস্তুত হয়।

প্রথমে রেড়ীর বীজগুলিকে ধান সিঝানার মত উত্তমরূপে সিঝাইয়া, দুই তিন দিন ধরিয়া রৌদ্রে খুব ভাল করিয়া শুখাইতে হয়। তাহার পর তেল বাহির করিবার সময়ে নিম্নলিখিত বস্তুগুলির প্রয়োজন: মুড়ি ভাজিবার মত খোলা ও নাড়িবার তাড়ু, আগুন, ঢেঁকি, হাঁড়ি ও জল।

সিঝান রেড়ীর বীজগুলি শুখাইয়া গেলে তাহাদের মুড়িভাজা খোলায় শুখ্‌না ভাজিতে হয়। বালি দিতে নাই, শুধু খোলায় চাপাইয়া বীজগুলিকে খুব ঘন ঘন নাড়িতে হয়। নাড়িতে নাড়িতে যখন বীজের খোসাগুলি ক্ষরিয়া ফাটিতে আরম্ভ করে, অথবা খোসা বাদামী রঙের মত হইয়া আসে, তখন তাড়াতাড়ি সেগুলিকে ফেলিয়া ঢেঁকিতে পাট দিতে হয়। দ্রুতবেগে পাট দিতে দিতে মনে হয়, যেন বীজ হইতে তেল বাহির হইয়া আসিতেছে। সেই অবস্থায় তাহাদিগকে উনানের উপরে হাঁড়িতে চাপাইয়া জল দিয়া ফুটাইতে হয়। বীজের উপরে প্রায় চার আঙুল জল থাকা প্রয়োজন। সেই জল ফুটিয়া মরিয়া আসিতে আসিতে তেল উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন তাহা ঢালিয়া লইলেই হইল। অবশিষ্ট তেলের জন্য আর একবার জল দিয়া ফুটাইতে হয়।

এইরূপে নিষ্কাশিত রেড়ীর তেল ঘন এবং বাদামী রঙের হইয়া থাকে। স্থানীয় চাষীরা বলে, সারাদিন পরিশ্রমের পর ইহা মাখিলে নাকি গায়ের ব্যথা মরিয়া যায়। রোগীর ব্যারাম সারিয়া গেলে এই তেল মাখাইলে খুব শীঘ্র স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে। রন্ধনাদি কার্যেও রন্ধা-জড়া-তেল নিয়ত ব্যবহৃত হয়। তরকারি সিদ্ধ হইলে পর রেড়ীর তেলে পিঁয়াজ ও মশলা ভাজিয়া তাহা সাঁৎলানা হইয়া থাকে।

রেড়ী ভিন্ন কুসুমের (Schleichera Trijuga) তেলও উপরোক্ত উপায়ে কুলিঅনাতে তৈয়ারি হয়। কুসুমের তেল প্রদীপে জ্বালান হইয়া থাকে। ইহা অতিশয় গরম, মাথায় মাখিলে সর্বশরীর গরম হইয়া উঠে, এইরূপ প্রবাদ আছে। শিয়ালকাঁটার তেল (ওড়িয়া **হড়ুপ**) সাহাবাদ জেলায় শুখ্‌না তাতের দ্বারা নিষ্কাশিত হইলেও ময়ূরভঞ্জে সিঝাইয়া নিষ্কাশিত হয়। তাহা প্রদীপে অথবা ঘায়ের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উড়িষ্যায় চামড়ার জলপাত্র ব্যবহৃত হয় না, সেই জন্য তাহাতে শিয়ালকাঁটার তেল প্রযুক্তও হয় না।

গণ্ডী-ঘাঁত

কুলিঅনার নিকটবর্তী সোহরি এবং কামতা গ্রামে এক প্রকার ঘাঁত দেখিয়াছি, তাহাতে একটি গাছের সাহায্য লওয়া হয়, এবং দুইখানি পাটার পরিবর্তে একটিমাত্র

দণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বুঢ়াবলঙ্গা নদী পার হইয়া ভাতুয়াবেড়ার নিকটে ভাদুয়া গ্রামে সাঁওতালদের মধ্যে এইরূপ আরও একটি গণ্ডী-ঘাঁত দেখিয়াছি। ১৯৩৮ সালে] অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন ময়ূরভঞ্জের পূর্বাঞ্চলে মুরুডা গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি নিকটবর্তী একটি গ্রামে প্রথম একটি গণ্ডী-ঘাঁত আমাকে দেখাইয়াছিলেন। সে বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

গণ্ডী-ঘাঁতের কয়েকটি অংশ আছে। গাছের মধ্যে ছিদ্রটির বিশেষ কোনও নাম নাই। গুঁড়ির মধ্যে গর্ত্তটি নয় দশ ইঞ্চি খুঁড়িয়া গভীর করা হয়। লম্বা পেষণদণ্ডের নাম **গণ্ডী** (সাঁওতালি—**গুণ্ডীপাটা**) ইহা গোলাকার হইয়া থাকে। গণ্ডীর নীচে **ঘাঁতকুণ্ডি** বা **কুণ্ডি** বা **পটা-পথর**। ইহার উপরিভাগ সমতল এবং তাহাতে গৌরী-পট্টের মত একটি নালি কাটা থাকে, তাহার নাম **চকৃকি**। (সাঁ°—**চাজোয়া**) ঘাঁতকুণ্ডি পাথরের বা কাঠের হইয়া থাকে। তৈলবীজগুলিকে ভাপাইয়া শিয়ালিলতায় (Bauhinia scandens ?) তৈয়ারি **পোটোম** নামক ছোট চুবড়িতে ভরিয়া পেষা হয়; পোটোম ঘাঁতকুণ্ডির মাঝখানে বসাইয়া, তাহার উপরে দুই তিনটি **পিঢ়া** বসানা হয়। পিঢ়ার উপরে গণ্ডীর চাপ পড়ে। গণ্ডীতে চাপ দিবার জন্য মহিষের চামড়ার ফাঁস, **চম্‌ঠা** ও দুইটি দীর্ঘ দণ্ড বা **তড়ার** (সাঁ°—**টাড়া**) প্রয়োজন।

কামতা গ্রামের গণ্ডী ১০′-৯″, ঘের ২′-৩″ হইতে কমিয়া ১′-৯″। চক্কির ঘের ১′-৯″। পিঢ়ার মাপ ১′-৫″ × ১′ × ৪″।

উপরোক্ত যন্ত্র ছাড়া গণ্ডী-ঘাঁতে তেল পিষিবার জন্য একটি চওড়া-মুখবিশিষ্ট হাঁড়ি, একটি ঝুড়ি ও কিছু কাদামাটি, মাদুর, বাঁশের বাঁখারি এবং ঢেঁকির প্রয়োজন। নিম্ন-লিখিত উপায়ে তৈল নিষ্কাশিত হয়।

গণ্ডী-ঘাঁতে সচরাচর মহুয়ার ফল অর্থাৎ কচড়ার তেল বাহির করা হয়। প্রথমে কচড়ার বীজগুলি উত্তমরূপে ঢেঁকিতে কুটিতে হয়। তাহার পর চওড়া মুখবিশিষ্ট হাঁড়ির উপরে ঝুড়িতে একবার নিষ্কাশনের যোগ্য গুঁড়া চাপাইয়া দেওয়া হয়। ঝুড়ি এবং হাঁড়ির সংযোগস্থলে বেশ করিয়া মাটির লেপ দিতে হয়। ঝুড়ির গায়েও মাটি মাখান হয়, তবে নীচে নয়। হাঁড়িতে জল ফোটে। সেই ভাপ ঝুড়ির ভিতর দিয়া বাহির হইবার সময়ে কচড়ার চূর্ণগুলি সিদ্ধ হইয়া ডেলা পাকাইয়া যায়। তখন সেই জমাট ডেলাটি মাদুরের উপর নামাইয়া এক খণ্ড সরু বাঁশের ছিলা বা বাঁখারির সাহায্যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পোটোমে ভরা হয়। পোটোমগুলি ঘাঁতকুণ্ডির মধ্যে বসাইয়া পিঢ়া চাপা দেওয়া হয়। এইবার পিঢ়ার উপরে গণ্ডী নামাইয়া চাপ দিতে হয়।

গণ্ডীতে চাপ দিবার জন্য চম্‌ঠাটি নীচে কোনও শিকড়ের সহিত ফাঁসাইয়া দিতে হয়। সুবিধামত শিকড় না থাকিলে কাঠের একটি দণ্ডেও আটকান চলে। কামতা এবং সোহরি গ্রামে বটগাছে গর্ত করিয়া গণ্ডী-ঘাঁত বসান হইয়াছে। সেখানে চম্‌ঠার জন্য নীচে সুবিধামত শিকড় আছে। কিন্তু ভাদুয়ার গাছটি অসনের, তাহার

সে রকম শিকড় নাই। অতএব সেখানে চমুঠা বাঁধিবার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল।
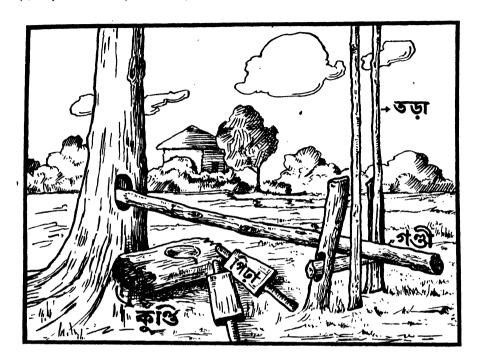
চমুঠাটি গণ্ডী এবং নীচের কাঠে জাপটাইয়া তাহার ফাঁসের ভিতর দিয়া দুইটি তড়া গলাইয়া দুই দিকে টান দিতে হয়। সজোরে টান দিলে চক্কির নালি বাহিয়া তেল গড়াইয়া পড়ে। কচড়া গুড়ের ডেলাটি গরম থাকিতে থাকিতে চাপ দিতে হয়। ঠাণ্ডা অবস্থায় তেল বাহির হইতে চায় না, তখন তাহাকে আবার ভাপাইয়া গরম করা প্রয়োজন।

গণ্ডী-যাঁতের দোষগুণ সম্পর্কে স্থানীয় লোকদের ধারণা এইরূপ। সঢ়ইকলার মত দুই খণ্ড পাটার দ্বারা নির্মিত যাঁতকে এখানে **পটা-যাঁত** বা **রাণী-যাঁত** বলে। স্থানীয় লোকেদের ধারণা, গণ্ডী-যাঁত অপেক্ষা রাণী-যাঁত ভাল। রাণী-যাঁতে উপর নীচে সমতল বলিয়া সমান চাপ পড়ে। পাথরের যাঁত-কুণ্ডি কাঠের মত সমতল হয় না, তাই পোটোমে অনেক সময়ে অসমানভাবে চাপ পড়ে। তখন অর্ধব্যবহৃত কচড়ার ডেলাটিকে ভাপাইয়া পুনরায় চাপ দিতে হয়, ইহা হাঙ্গামার ব্যাপার। রাণী-যাঁতে একবার ভাপাইলেই কাজ হইয়া যায়। তবে রাণী-যাঁত নির্মাণ করিতে হইলে রাজ্যের বন-বিভাগ হইতে দুইখানি কাষ্ঠখণ্ডের জন্য ছাড়পত্র লইতে হয়, তাহার জন্য পয়সা লাগে। গণ্ডী-যাঁতে একখানি যেমন-তেমন গুঁড়ি লাগে বলিয়া খরচ অনেক কম হয়।

সোহরি গ্রামের গণ্ডী-ঘাঁত গৌর নায়েক নামক জনৈক বাথুড়ির সম্পত্তি। সে ব্যক্তি চারি বৎসর হইল, ইহা নির্মাণ করিয়াছে। অপরে ইহাতে তেল পিষিলে গৌরকে কিছু বাটা দেয়। গৌরের সম্বৎসরের তেলের খরচ তাহাতেই কুলাইয়া যায়।

বাঙলা দেশে বেথ্‌লা

বাঙলা দেশেও গণ্ডী-ঘাঁতের মত যন্ত্রের প্রচলন আছে, তবে তাহা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। ত্রিপুরা-রাজ্যের সীমানার নিকট নোয়াখালি জেলায় পরশুরাম নামে একটি গ্রাম আছে। পরশুরামের বাজারে দুই তিনটি কলুর ঘানি চলে। কিন্তু গ্রামে কিছু দিন আগেও ময়ূরভঞ্জের গণ্ডী-ঘাঁতের মত উপায়ে তৈল নিষ্কাশিত হইত। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিবাস নিকটবর্তী এক গ্রামে। তিনি এবং তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী পাল ইহার সাহায্যে সরিষার তৈল নিষ্কাশিত করিয়াছেন। পরশুরাম অঞ্চলে সরিষা ভিন্ন অপর কয়েকপ্রকার বীজ হইতেও ইহার সাহায্যে তেল বাহির করা হয়।

প্রথমে উনানের উপরে কড়াই বা মাটির হাঁড়ি বসাইয়া, তাহাতে তৈলবীজ ভাজিয়া, সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁকিতে চূর্ণ করিতে হয়। নোয়াখালি জেলায় ভাপানোর প্রথাটি চলিত নাই। তাহার পর এক ফুট উচ্চ ও ছয় ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট বেত অথবা পাটী-পাতায় নির্মিত **বেথলের** (=বেতের থলে?) মধ্যে সেগুলিকে ভরিয়া, মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। নীচে কুমীর মুখাকৃতিবিশিষ্ট শিলা বা কাঠের খণ্ড থাকে। তাহার উপর বেথলেটিকে বসাইয়া উপরের দণ্ডের সাহায্যে চাপ দিতে হয়। ময়ূরভঞ্জের মত কিন্তু চম্‌ঠা ও তড়ার প্রচলন নাই। পরশুরামে তৎপরিবর্তে গৃহস্থ সপরিবারে পেষণদণ্ডের উপরে বসিয়া চাপ দিতে থাকে। পড়িয়া যাইবার ভয়ে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ এক এক খণ্ড লাঠি ধরিয়া থাকে।

বেথলের মধ্যস্থিত চূর্ণকে দুই, তিন, এমন কি, চারি বার পর্যন্ত শুখ্‌না খোলায় উত্তপ্ত করিয়া চাপ দিতে হয়, তবে সব তেল বাহির হইয়া যায়। বেথলের সাহায্যে এক মণ সরিষা হইতে ১০৷৷০ বা ১১ সের তেল বাহির হয়। ঘানিতে নাকি ১৩।১৪ সের পর্যন্ত পাওয়া যায়। বেথলের তেলের বিশেষত্ব হইল, ইহা অতিশয় সুস্বাদু এবং বহু দিন পর্যন্ত রাখা চলে, সহজে খারাপ হয় না। বেথলের খইল গরুর খাদ্য হিসাবে অন্য উপায়ে লব্ধ সরিষার খইল অপেক্ষা বেশী উপকারী বলিয়া লোকের বিশ্বাস। বেথলেগুলি বেশী বার ব্যবহার করা চলে না। কিছু দিন পরে সেগুলিকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়; কেন না, সেগুলি অগ্নিসংযোগে অতি সহজে ধরিয়া উঠে।

হরিদাস তর্কাচার্য্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম.এ.

স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বের সহমরণপ্রকরণে বিস্মৃতপ্রায় বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধকার হরিদাস তর্কাচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন :—

"যত্তু,—যদা নারী বিশেদগ্নিং স্বেচ্ছয়া পতিনা সহ।
অশৌচমুদকং তস্যাঃ সহ ভর্ত্রেতি নিশ্চিতম্।
তিথ্যন্তরমৃতায়াস্তু পৃথক্ শ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে। ইতি

চতুর্ভুজভট্টাচার্য্যধৃতযমবচনাৎ ভিন্নতিথিমৃতায়া অপি পত্যুর্মৃততিথৌ শ্রাদ্ধমিতি হরিদাস-তর্কাচার্য্যাঃ, তন্ন।"

শুদ্ধিতত্ত্বের পর্ণনরদাহপ্রকরণেও হরিদাসের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত হরিদাসের কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধকারগণের মধ্যে হরিদাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন,[১] কিন্তু তাঁহার চূড়ান্ত গবেষণায় এই মাত্র নির্ণীত হইয়াছিল যে, হরিদাস স্মৃতিটীকাকার অচ্যুত চক্রবর্ত্তীর পিতা ছিলেন এবং অচ্যুতের হারলতাটীকায় "পিতৃচরণাস্তু" বলিয়া তাঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্প্রতি হরিদাস-রচিত একাধিক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁহার বিষয়ে এবং প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্রচর্চ্চার ইতিহাসে কিছু নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা সঙ্ক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে কৃপারাম (তর্কভূষণ?) নামক স্মার্ত্ত পণ্ডিত "নব্যধর্ম্মপ্রদীপ" নামে এক বিপুলায়তন স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে এই গ্রন্থের দুইটী খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে এবং দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের পুথি-সংগ্রহমধ্যেও একটী খণ্ডিত প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি। গ্রন্থমধ্যে রচনাকালের এইরূপ নির্দ্দেশ আছে,—

"ইদানীং কলের্গতাব্দাঃ ৪৮৬৫···শকনরপতের্গতাব্দাঃ ১৬৮৬ ষড়শীত্যধিকষোড়শশতানি।"[২]

এই গ্রন্থে অনেক স্থলে হরিদাস তর্কাচার্য্য ও তদ্রচিত শ্রাদ্ধবিবেকটীকা হইতে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"এবমেব শ্রাদ্ধবিবেকটীকায়াং তর্কাচার্য্য-চূড়ামণী" (পত্র ২১খ)
"হরিদাসতর্কাচার্য্যস্তু শ্রাদ্ধবিবেকটীকায়াং অন্বিতাভিধানবাদমনুস্থৃত্যাহ" (৩৮ক)

---

১) *J. A. S. B.*, 1915, pp. 313, 362, 374.

২) সাহিত্য-পরিষদের ১৬০২ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি।

সৌভাগ্যক্রমে হরিদাসরচিত শ্রাদ্ধবিবেকটীকার সম্পূর্ণ একটি প্রতিলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেই রক্ষিত আছে ; ইহার অন্য কোন প্রতিলিপি এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না।৩ এই দুর্লভ গ্রন্থের শেষে আছে :—(৭১খ)

"দোষং বিহায় মম বাচি গুণগ্রহেণ
সানুগ্রহা ময়ি সদা সুধিয়ো ভবন্তি।
দেবা যথা কিল কলঙ্কলবং বিহায়
পীযূষভাসিসুধয়া মুদিতা ভবন্তি।
অজ্ঞাত্বা নির্ণয়ং টীকামপ্রাপ্য মৎকৃতামিমাং।
বদ শ্রাদ্ধবিবেকে তু কস্য ব্যাখ্যানকৌশলং॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীশরণভট্টাচার্য্যাত্মজহরিদাসাপরনাম্না শ্রীরামচন্দ্রতর্কাচার্য্য-ন্যায়-বাচস্পতিনা বিরচিতঃ শ্রাদ্ধবিবেকপ্রদীপঃ সম্পূর্ণঃ ওঁ নমো গণেশায় শুভমস্তু শকনরপতেরতীতাব্দাঃ ১৬৮২ ওঁ নমো দুর্গায়ৈ ওঁ গুরবে নমঃ।"

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ পৃথক্ দুইটি নাম ও পৃথক্ দুইটি উপাধি ছিল, কিন্তু "হরিদাস তর্কাচার্য্য" নামই প্রসিদ্ধি লাভ করে, "রামচন্দ্র ন্যায়বাচস্পতি" নামের উল্লেখ পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই টীকাগ্রন্থ সম্ভবতঃ হরিদাসের শেষ রচনা এবং ইহার পূর্ব্বে তিনি অন্ততঃ তিনখানি নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন :—

১) **শ্রাদ্ধনির্ণয়ঃ** পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে 'অজ্ঞাত্বা নির্ণয়ং' বলিয়া হরিদাস এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন এবং গ্রন্থমধ্যেও কয়েক বার এই স্বরচিত গ্রন্থের দোহাই দিয়াছেন —"ইতি তীরভুক্ত্যাদিসম্মতং অস্মাভির্নিরূপিতং শ্রাদ্ধনির্ণয়ে" (৪৮-৯ পত্র) ইত্যাদি।[৪]

২) **অশৌচনিবন্ধঃ** যথা—"অশৌচনিবন্ধে অস্মাভির্নিরনায়ি" (৬৪খ)

৩) **সংস্কাররত্নাবলীঃ** যথা "অধিকন্তু সংস্কারহারাবল্যাং দ্রষ্টব্যং সুরিভিঃ" (৫৫খ)

এতন্মধ্যে 'শ্রাদ্ধনির্ণয়' ও 'অশৌচনিবন্ধ' আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে শ্রাদ্ধনির্ণয়ের নাতিপরিশুদ্ধ সম্পূর্ণ একটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, তাহার প্রারম্ভ ও শেষ বাক্য উদ্ধৃত হইল :[৫]—

নত্বা গোপবপু (শ্ছদ্ম) চিদানন্দস্বরূপিণং।
শ্রীরামচন্দ্রধীরেণ ক্রিয়তে শ্রাদ্ধনির্ণয়ঃ।
আকৃষ্য যদ্যপি ময়াক্তকৃতান্নিবন্ধান্নির্ণীয়তে তদপি মে সফলঃ প্রয়াসঃ।
সন্ত্যেব নাম কুসুমেষু মধূনি নূনমন্যাদৃশো মধুরিমা সরঘাকৃতেষু॥

শেষ :—ইতি মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীশর(ণ)ভট্টাচার্য্যাত্মজ শ্রীহরিদাস-তর্কাচার্য্যবিরচিতং শ্রাদ্ধ-নির্ণয়ং সমাপ্তং।

---

৩) সাহিত্য-পরিষদের ১৫৯১ সংখ্যক পুথি।

৪) ১৪খ, ৪৯খ, ৫৬খ, ৫৯খ, ৬২খ ও ৭১ক পত্র দ্রষ্টব্য।

৫) সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত স্মৃতিশাস্ত্রীয় ২৩৬ সংখ্যক পুথি।

পুথিখানির পত্রসংখ্যা ১০২ এবং প্রতি পৃষ্ঠে পঙ্‌ক্তিসংখ্যা ৭—ইহা তাঁহার টীকা-গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ বৃহদায়তন।

অশৌচনিবন্ধের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি (মাত্র ২২ পত্র) নবদ্বীপ পাব্‌লিক লাইব্রেরির পুথিমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহার প্রারম্ভ এই :—[৬]

সম্যগ্‌ বিভাব্য হৃদি হারলতারহস্যং
তত্তন্নিবন্ধশতবাচমথাবধৃত্য।
ক্ষোদক্ষমং সুমনসাম্নিতরামশৌচে
শ্রীরামচন্দ্রসুমতিঃ কুরুতে নিবন্ধম্‌।

হরিদাসের কালনির্ণয় সহজসাধ্য। কারণ, শ্রাদ্ধবিবেকের মলমাসপ্রকরণের ব্যাখ্যাকালে তিনি ১৪২৪ শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। বচনটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল, প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকারের গুরুর নামও ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রাচীন মতানুসারে "তুলাদিষট্‌কে" পতিত অধিমাস "মলমাস" নহে, কিন্তু "ভানুলঙ্ঘিত" মাস, এই মত খণ্ডনাবসরে লিখিত হইয়াছে :—

"অতএব চতুর্ব্বিংশত্যধিক-চতুর্দ্দশ(শত)শাকসম্বৎসরে মধুমাসেপি
মলমাসোঽস্মাভির্দৃষ্টঃ, মলমাসত্বেনৈব ব্যবস্থাপিতশ্চাস্মদ্‌গুরু
ধরণীধরাচার্য্যসিংহচরণৈঃ।" (৩০ক)

শ্রাদ্ধনির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত মলমাসপ্রকরণেও এই শকাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; যথা :—

"নাপি···নারায়ণমতং যুক্তং পঞ্চবিংশত্যধিক-চতুর্দ্দশশতশাকসম্বৎসরে চৈত্রেপি সকলশিষ্টপরিগৃহীতমলমাসদর্শনাৎ।" (৪৫ক)

লক্ষ্য করিবার বিষয়, শ্রাদ্ধনির্ণয়ে চৈত্রাদিগণনায় যে বৎসর ১৪২৫ শক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই পরে বৈশাখাদিগণনায় ১৪২৪ শক বলিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন। ১৪২৪ শকে অর্থাৎ ১৫০৩ খৃঃ বস্তুতই চৈত্র মাস মলমাস ছিল। তুলাদিগত মলমাসঘটিত বিচার অনেক স্মৃতিনিবন্ধেই পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গোবিন্দানন্দকবিকঙ্কণাচার্য্য-রচিত "শুদ্ধিকৌমুদী" গ্রন্থে তিনটী শকাব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় :—[৭] ১৪২৪, ১৩৯৭ (ফাল্গুন) এবং ১৪৪৩ (কার্ত্তিক)। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার শ্রাদ্ধবিবেকটীকায় গোবিন্দানন্দনির্দ্দিষ্ট তিনটি বৎসরেরই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, হরিদাসের উভয় গ্রন্থই ১৪৪৩ শকাব্দের পূর্ব্বে খৃঃ ১৫০৫-২০ সনের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। নতুবা তিনিও গোবিন্দানন্দের ন্যায় শেষোক্ত শকের কার্ত্তিক-মলমাসের উল্লেখ করিতেন। এতদনুসারে হরিদাস গোবিন্দানন্দের প্রায় এক পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। গোবিন্দানন্দের পিতা গণপতি ভট্ট ৪৬১৩ কল্যব্দে (খৃঃ ১৫১২ সনে) "জ্যোতিষ্মতী" নামক জ্যোতির্গ্রন্থ রচনা

৬) ৯৭৭ সংখ্যক পুথি।
৭) শুদ্ধিকৌমুদী (Bibl. Ind. Ed.) পৃ. ২৬৮

করেন[৮] এবং শুদ্ধিকৌমুদীতে ১৪৫৭ শকাব্দের শ্রাবণ-মলমাসের পর্য্যন্ত উল্লেখ দৃষ্ট হয়[৯], অথচ শুদ্ধিকৌমুদী তাঁহার শেষ রচনা নহে।

হরিদাস সম্ভবতঃ নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি স্মৃতিশাস্ত্রীয় গ্রন্থের (মিতাক্ষরার) লিপিকাল ৩৯৯ লক্ষ্মণাব্দ (১৫১৩ খৃঃ)—গ্রন্থের ৪৬ক পত্রে *গ্রন্থাধিকারীর নাম লিখিত আছে "শ্রীরামচন্দ্র-ভট্টাচার্য্য-বাচস্পতীনাং নবদ্বীপনিবাসিনাং পুস্তীয়ম্।"*[১০] ইনি হরিদাসতর্কাচার্য্য হইতে অভিন্ন বলিয়া আমাদের ধারণা।

তাঁহার গ্রন্থত্রয়ে স্থানে স্থানে নিজস্ব অভিনব মতের অবতারণা আছে এবং পূর্ব্ব-মতখণ্ডনকালে তাঁহার লেখনী বিচিত্রমুখরতা অবলম্বন করিয়া তাঁহার রসিকতা প্রকটিত করিয়াছে। শ্রাদ্ধনির্ণয়ের গন্ধদানপ্রকরণে তিনি পূর্ব্বতন নিবন্ধকারদের তিনটি বিভিন্ন মত বিবৃত করিয়া "অস্মাকন্তু তুরীয়ঃ পক্ষঃ" বলিয়া নিজের মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং *উপসংহারে প্রগল্ভতা সহকারে লিখিয়াছেন :—*

"অত্র শাস্ত্রার্থবিপরীতং বদন্ স্বনামাক্ষরবিপর্য্য(য়)মপি স্পষ্টমঙ্গীচকার ইতি হরিনাথোপি নাথ-হরিঃ, রুদ্রধরস্তু রুদ্রধর এব, অপিপালোপি বালঃ, ভাষ্যমতমপি ভাষ্যারতনং (?), শূলপাণিস্তু শ্রাদ্ধ-বিবেকে দেবতাত্রয়মঙ্গীকৃত্যাপি **গোভিলভাষ্যে** তথা গন্ধানিতি সূত্রব্যাখ্যানে "তথা তেন প্রকারেণ পিতুর্নাম গৃহীত্বা ইতরয়োর্ণ তু প্রকৃতেষু পাত্রেষু" ইতি বদ(ন্) পিণ্ড (?) ইব স্বোক্ত-বিরোধং নাকলিতবান্। নারায়ণোপ্যত্র কিমপ্যবদন্ ততএবাভূৎ অনিরুদ্ধস্তু গোভিলবচনানামন্তার্থ-কল্পনাং প্রদর্শয়ন্নপি বচনান্ন তত্ত্ববিবেচনবিশিখৈর্নিরুদ্ধঃ প্রাক্তনাচারমপি পরিহৃতবানিতি কিমতি-জল্পনেন।" (২১ ক)

উদ্ধৃত বচনে বোধ হয়, শূলপাণি-রচিত একটি নূতন গ্রন্থ গোভিলভাষ্যের নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

হরিদাস-রচিত গ্রন্থাদি হইতে কতিপয় প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধকারের বিষয়ে নূতন তথ্য সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল।

নারায়ণ উপাধ্যায়

শ্রাদ্ধবিবেকটীকার শেষে নারায়ণোপাধ্যায়ের মতোল্লেখকালে হরিদাস লিখিয়াছেন :—

"কিন্ত্বত্র নারায়ণমতমেব প্রাচীনসম্মতমস্মদ্গুরুসম্প্রদায়সিদ্ধং ব্যবস্থাপিতঞ্চাস্মাভির্নির্ণয়ে দ্রষ্টব্যম্।" (৭১ক)

---

৮) গোবিন্দানন্দ-রচিত বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, (Bibl. Ind. Ed.) ভূমিকা।

৯) শুদ্ধিকৌমুদী, পৃ. ২৭০

১০) *Descr. Cat. of Sans. MSS, A. S. B.*, Vol. III, p. 13

এই নারায়ণ ও শূলপাণির উপর হরিদাসের পরম শ্রদ্ধা, শ্রাদ্ধবিবেকটীকার অন্যত্র একটি শ্লোকে প্রকটিত হইয়াছে :—

গৌড়স্মার্ত্তসমূহমৌলিমুকুটালঙ্কারমাণিক্যয়োঃ
শ্রীনারায়ণশূলপাণিবিদুষোর্ব্বাচাভিলাপা (দিকং) ।
চাঞ্চল্যেন ময়া সপিণ্ডনবিধৌ যৎকিঞ্চিদুদ্ভাবিতং
তৎ সন্তঃ পরিশোধয়ন্তু বিমলজ্ঞানাবধানাদিভিঃ । (৬০ খ)

যাঁহারা শূলপাণির শ্রাদ্ধবিবেক টীকার সাহায্যে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, শূলপাণি বহুতর স্থলে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নারায়ণ উপাধ্যায়ের মত খণ্ডন করিয়াছেন। এই নারায়ণ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত মত প্রচার লাভ করিয়াছে। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় নারায়ণ উপাধ্যায়কে গোভিলভাষ্যকার নারায়ণ ভট্ট বা ভট্ট নারায়ণের সহিত অভিন্ন ধরিয়া[১১] বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। নারায়ণ উপাধ্যায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ" অংশত মুদ্রিত হইয়াছে—এই গ্রন্থে বহু স্থলে ভট্টভাষ্যের মত উদ্ধৃত হইয়াছে[১২] এবং এক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে :—

"ইতি গোভিলভাষ্যকারাভ্যাং ভট্টনারায়ণ-বলুগুসোমাভ্যামুক্তং।"[১৩]

সুতরাং নারায়ণ উপাধ্যায় ভট্ট নারায়ণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও পরবর্ত্তী। পরিশিষ্ট-প্রকাশে "কল্পতরু"র মত উদ্ধৃত হইয়াছে।[১৪] পরিশিষ্টপ্রকাশের উপর শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণি-রচিত টীকা "সারমঞ্জরী"র এক খণ্ড সম্পূর্ণ প্রতিলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত আছে। তৎপাঠে জানা যায়, নারায়ণ এক স্থলে হারলতাকার অনিরুদ্ধ ভট্টের মত খণ্ডন করিয়াছেন।[১৫] সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, নারায়ণ উপাধ্যায় খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন এবং শূলপাণির পূর্ব্বগামী হওয়ায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরবর্ত্তীও নহেন। নারায়ণের পিতামহের পৃষ্ঠপোষক "রাজা জয়পাল"কে ঐতিহাসিকগণ বিনা বিচারে পালবংশীয় জয়পাল কিম্বা শিলিমপুরপ্রস্তরশাসনের জয়পালের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন, তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। নারায়ণ-রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ "সময়প্রকাশ" হইতে হরিদাস প্রভৃতি টীকাকারগণ বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১৬] এই গ্রন্থের উপরও শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণি টীকা রচনা করিয়াছিলেন,[১৭] কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, "সময়প্রকাশ" গ্রন্থের একটি প্রতিলিপিও এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই।

---

১১) *J. A. S. B.* 1915, p. 367

১২) কর্ম্মপ্রদীপ (Bibl. Ind. Ed.) pp. 71, 136, 176, 178 ; Fasc. II (1923), p 31

১৩) কর্ম্মপ্রদীপ, Fasc. II, p. 8

১৪) ঐ (Fasc. I) p. 15, 32.

১৫) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫০৮ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি, ৩৯খ পত্রে :—"হারলতাকারোক্তং দূষয়িতুমুপক্রমতে"

১৬) শ্রাদ্ধবিবেকটীকার (১৫৯১ সংখ্যক পুথি) ১৩ক, ৩১ক, ৩২ক, ৩৮ক দ্রষ্টব্য।

১৭) "ইত্যুক্তমস্মাভিঃ সময়প্রকাশটীকায়াং" শ্রীনাথরচিত "বিবেকার্ণব" (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫৩৬ সংখ্যক পুথি) ১০খ পত্রে।

বিশারদ

রঘুনন্দন [১৮] ও গোবিন্দানন্দ[১৯] তাঁহাদের গ্রন্থে "বিশারদ" নামক স্মৃতিনিবন্ধকারের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। হরিদাসের শ্রাদ্ধনির্ণয়ে একবার (১৮খ পত্রে) এবং খণ্ডিত অশৌচনিবন্ধে দুই বার (৪খ ও ৯খ পত্রে) বিশারদের মত উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় বিশারদের মত বহু বার উদ্ধৃত হইয়াছে। একটি বচনে বিশারদের কালসূচনা ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, এই মূল্যবান্ বচন উদ্ধৃত হইল :—

"তথা গৌড়প্রৌঢ়পরিবৃঢ়ে **বারবকে** রাজ্যং শাসতি সপ্তনবত্যধিকত্রয়োদশশতীমিতশকাব্দে চান্দ্রাশ্বিনসংক্রান্তিং কৃত্বা প্রতিপদ্যেব সংচর্ষ্য রবেরমাবস্যায়াং কুম্ভসংক্রমে প্রতিপদি মীনসংক্রান্তাবেকস্মিন্নব্দে দ্বয়োঃ সংক্রান্তিশূন্যত্বং দৃষ্টমিতি **বিশারদেনোক্তং**।" (৩৪-৩৫)

সুতরাং বারবক সাহার রাজত্বকালে এবং সম্ভবতঃ তাঁহার উৎসাহে বিশারদ ১৩৯৭ শকাব্দের (১৪৭৬ খৃঃ সনের) অল্প পরেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। হরিদাসধৃত বিশারদের দুইটি উক্তি[২০] হইতে বুঝা যায়, বিশারদ শূলপাণির মত খণ্ডন করিয়াছেন, আবার অন্য দুই স্থলে শূলপাণিও বিশারদের মত খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।[২১] টীকাকারগণ প্রায়শঃ পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা না করিয়াই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তথাপি ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, বিশারদ শূলপাণির সমসাময়িক ও কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী ছিলেন। এই বিশারদ সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতির পিতা নরহরি বিশারদ। স্বর্গত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় "নবদ্বীপমহিমা" গ্রন্থে যে প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদনুসারেও বাসুদেবের পিতা স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন জানা যায়।[২২]

রায়মুকুট

রঘুনন্দন বহু বার[২৩] রায়মুকুটের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। হরিদাসের তিন গ্রন্থেই তাঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে,[২৪] তন্মধ্যে তিন স্থলে "মুকুটরায়" রূপেও উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

---

১৮) *J. A. S. B.* 1915, p. 372

১৯) শুদ্ধিকৌমুদী, পৃ ৮৭-৮৮, ১৪৫, ২১৫

২০) ২৯খ, ৩৩ক (বিশারদদূষণং চিন্ত্যং)

২১) 'ইতি বিশারদদূষণমাশঙ্ক্যাহ' (৩৪ক); 'বিশারদাদিমতমাশঙ্ক্যাহ' (৩৭খ)

২২) নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং (১২৯৮), পৃ ৩৪ ; ২য় সং (১৩৪৪), পৃ ১২০

২৩) *J. A. S. B.*, 1915, p. 371

২৪) শ্রাদ্ধনির্ণয়—১৭ খ, ৫৭ক, ৯০খ, ৯১ক ; শ্রাদ্ধবিবেকটীকা—৩৭ক-খ, অশৌচনিবন্ধ—২খ, ১৩ক। অশৌচনিবন্ধের উভয় স্থলে এবং শ্রাদ্ধনির্ণয়ের ৫৭ক পত্রে 'মুকুটরায়' পাঠ পাওয়া যায়।

তিনি সম্ভবতঃ একটি পূর্ণাঙ্গ "পদ্ধতি" রচনা করিয়াছিলেন, শ্রাদ্ধনির্ণয়ের এক স্থলে পাওয়া যায় :—

"রায়মুকুটেনাপি যজুর্বেদিপদ্ধতৌ সারসংগ্রহশ্লোকত্রয়ং লিখিতং যথা—"অক্ষয্যোদকদানে চ প্রীয়ন্তামিতি নির্দ্দিশেৎ। তস্মৈবৈবোদকং দদ্যাৎ স্বধোক্তাবীদৃশো বিধিঃ।" (৯৯ ক)

এই রায়মুকুট অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকাকার হইতে অভিন্ন সন্দেহ নাই। কিন্তু অমরকোষের টীকা "পদচন্দ্রিকা"র রচনাকাল সম্বন্ধে আদ্যন্ত সকলেই আমরা ভ্রান্ত মত পোষণ করিতেছি বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে যে কালনির্দ্দেশ পাওয়া যায়, তাহা এই :—[২৫]

"ইদানীন্তু শকাব্দাঃ ১৩৫৩, দ্বাত্রিংশদধিকপঞ্চবর্ষোত্তরচতুঃসহস্রাণি কলিসন্ধ্যায়া ভূতানি ৪৫৩২। তথা চ গণিতচূড়ামণৌ ইত্যাদি"

এই শকাব্দ গ্রন্থকারের অপরোক্ষ হইলেও ইহা গ্রন্থরচনার প্রকৃত কালসূচক নহে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির পুথিশালায় "পদচন্দ্রিকা"র একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আছে—তাহার শেষে এই শ্লোকটি পাওয়া যায় :—

সেনানীবদন-গ্রহাগ্নি-বিধুভিঃ শাকে মিতে হায়নে
শুক্রে মাস্যসিতে দিনাধিপতিথৌ সৌরেঽহ্নি মধ্যন্দিনে।
সদ্যঃসংশয়সঙ্করাপচয়কৃদ্ব্যাখ্যাবিশেষোজ্জ্বলা
পর্য্যাপ্তা পদচন্দ্রিকাভবদিয়ং সংরক্ষণীয়া বুধৈঃ।

এই তারিখ, ১৩৯৬ শক জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাদ্বাদশী শনিবার, (১১ জুন ১৪৭৪ খৃঃ) প্রতিলিপির তারিখ বলিয়া ধরা হইয়াছে। সম্প্রতি পদচন্দ্রিকার উত্তরাংশের একটি প্রতিলিপি ঐ পুথিশালায় সংগৃহীত হইয়াছে—প্রতিলিপির তারিখ ১৬০১ শকাব্দ এবং লেখক রামজীবন। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটির পর তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোকও পাওয়া যায় : (১৬৫ ক পত্র)—

যাবচ্ছ্রুতি বিষমস্মরমণেঃ প্রাচ্যপ্রতীচ্যাচলৌ
যাবন্মণ্ড(ল)মৈন্দবং দ্যুতি(? দ্রুত)তমস্কাণ্ডং জগন্মণ্ডনং।
যাবজ্জহ্নুসুতাম্বুধেরনুভবত্যাশ্লেষলীলাসুখং
তাবন্মে কৃতিরাতনোতু কৃতিনামানন্দ(বৃন্দা)মিয়ং।
যাবচ্চন্দ্রকচিশ্চকোরনিচয়ৈশ্চঞ্চ ভিরাচম্যতে
যাবচ্চণ্ডরুচো রুচঃ পরিচয়াচ্ছূক্রঃ শুচং মুঞ্চতি।
যাবচ্ছ্রুতি স্রাচলাব্ধিরচলা চক্রী(শ)চূড়ামিয়ং
তাবচ্চারুবিচারণাভিরচিতা টীকা চকাস্ত চ্চকৈঃ।

এই মনোহর শ্লোকত্রয় লিপিকারের রচনা নহে, স্বয়ং রায়মুকুটেরই রচনা, এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে রায়মুকুটের রচিত স্মৃতিনিবন্ধ

২৫) অমরকোষ (A. Barooah's Ed., 1887-88) p. 144, I. 6. p. 271

"স্মৃতিরত্নহারে"র অতিজীর্ণ একটি প্রতিলিপি আছে, এই গ্রন্থের প্রারম্ভভাগ অনেকাংশে ত্রুটিত হইলেও রায়মুকুটের একজন পৃষ্ঠপোষকের পরিচয় তাঁহা হইতে উদ্ধার করা যায়। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে[২৬] যে বিবরণ দিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাহা গ্রন্থের বিবরণী[২৭] দ্বারা সর্ব্বত্র সমর্থিত হয় না। জগদ্দত্ত নামক "মূর্দ্ধাভি(ষিক্তা)-ন্বয়ে" জাত কোন ব্যক্তির পুত্র "শ্রীরায় রাজ্যধর" একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। চতুর্থ শ্লোকের ত্রুটিত পাঠ হইতেও পাওয়া যায়,—"জলালদীননৃপতির্ম্মুদিতো গুণোঘৈঃ" অর্থাৎ রাজ্যধরের গুণে মুগ্ধ হইয়া 'সৈন্যাধিপত্য' প্রভৃতি পদাদিদানে তাঁহাকে গৌড়াধিপতি জলালদ্দীন সম্মান করিয়াছিলেন। স্বর্গত শাস্ত্রী মহাশয় ভ্রমক্রমে জগদ্দত্তকে রাজা গণেশের সহিত এবং রায় রাজ্যধরকে তৎপুত্র জলালদ্দীনের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শ্লোকে উক্ত রাজ্যধরের স্তুতিবাদ রহিয়াছে। সপ্তম শ্লোকটী এই :—

আচার্য্য ইত্যভিমতং কবিচক্র(বর্ত্তি)
* * * ত্বিতয়মধ্যগমত্তুতো যঃ।
স শ্রীবৃহস্পতিরিমং বত্নসংগ্রহার্থৈঃ
নির্ম্মাতি নির্ম্মলমতিঃ স্মৃতিরত্নহারম্।

পদচন্দ্রিকার পুষ্পিকায় রায়মুকুটের সমস্ত উপাধি উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,—

"ইতি মহিন্তাপনীয়-কবিচক্রবর্ত্তি-পণ্ডিতসার্ব্বভৌম-পণ্ডিতচূড়ামণি-মহাচার্য্য-রায়মুকুটমণি-শ্রীমদ্-বৃহস্পতিকৃতায়াম্"...

ছয়টি পাণ্ডিত্যের উপাধির মধ্যে আচার্য্য এবং কবিচক্রবর্ত্তী উপাধিদ্বয়, বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম, রায় রাজ্যধরের নিকট প্রাপ্ত। স্মৃতিনিবন্ধ রচনাকালে তাঁহার অন্য উপাধি তখনও অর্জ্জিত হয় নাই, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে এবং তাঁহার রচনার ভঙ্গীতে মনে হয়, জলালদীন তখন জীবিত ছিলেন না। সুতরাং ১৪৩১ খৃঃ তাঁহার এই প্রাথমিক রচনা স্মৃতিনিবন্ধও প্রণীত হইয়াছে কি না সন্দেহ। পদচন্দ্রিকা, বহু পরে তাঁহার বার্দ্ধক্যে রচিত হইয়াছিল নিঃসন্দেহ ; কারণ, গ্রন্থারম্ভের সপ্তম শ্লোকে রায়মুকুটের পুত্রদের কীর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে[২৮] :—

যৎপুত্রা নৃপমন্ত্রিমৌলিমণয়ো বিশ্বাসরায়াদয়ঃ
খ্যাতা দিগ্‌জয়িনামপীহ জয়িনো লোকে কবীন্দ্রাশ্চ যে।
ব্রহ্মাণ্ডামরপাদপাদিসহিতং যেঃ তুলাপুরুষং
তত্তদ্‌গ্রন্থবিশেষনির্ম্মিতকৃতঃ কৃৎস্নেষু শাস্ত্রেষু তে।

২৬) "বৃহস্পতি রায়মুকুট," সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃ ৫৭-৬৪

২৭) *Descr. Cat of Sans. MSS, A. S. B,* Vol. III, pp. 226-30

২৮) অমরকোষ, A. Barooah's Ed., p. 2.

এই শ্লোকপাঠে সন্দেহ থাকে না যে, পদচন্দ্রিকারচনাকালে তাঁহার পুত্রগণই যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং রায়মুকুট স্বয়ং সুতরাং পূর্ণ বার্দ্ধক্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ষষ্ঠ শ্লোকে তাঁহার 'রায়মুকুট' উপাধি প্রাপ্তির অতি উজ্জ্বল বর্ণনা রহিয়াছে এবং অষ্টম শ্লোকে পাওয়া যায়, তিনি "গৌড়াবনীপার্থিবাৎ" পণ্ডিতসার্ব্বভৌম পদবী লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অতিপরিণত বয়সের এই শেষ গ্রন্থ রচনার তারিখ যদি ১৪৩১ খৃঃ ধরা যায়, তবে তাঁহার স্মৃতিনিবন্ধাদি পূর্ব্বতন গ্রন্থের রচনাকাল জলালদ্দীনের রাজত্বকালের অনেক পূর্ব্বে হইয়া পড়ে, যাহা একেবারেই অসম্ভব। গ্রন্থ রচনা করিতে (১৩৫৩ শক হইতে ১৩৯৬ শক) ৪৩ বৎসর লাগিয়াছিল, তাহাও সম্ভব মনে হয় না। সুতরাং অনুমান হয়, পুত্রের জন্মকাল কিম্বা তাদৃশ কোন পারিবারিক ঘটনা অথবা গৌড়াধিপতি (জলালদ্দীনের) মৃত্যুকালরূপ কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার নির্দ্দেশক একটা তারিখই (১৩৫৩ শক) গ্রন্থমধ্যে উদাহরণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। রায়মুকুটের এই নূতন কালনির্দ্দেশ (১৪৭৪ খৃঃ) প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইলে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক গৌড়াধিপতি বারবাক সাহা প্রতিপন্ন হইতেছেন এবং বিদ্বৎপ্রিয়তা কিম্বা প্রাদেশিক সাহিত্যের অনুপ্রেরণা বিষয়ে তিনিই সম্ভবতঃ হুসেন সাহা প্রভৃতিকেও পরাস্ত করিয়া গৌড়াধিপগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন বলিয়া মনে হয়।

হরিদাসের গ্রন্থত্রয়ে আরও কতিপয় বিস্মৃত স্মৃতিনিবন্ধকারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে দুই জনের নাম করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব—**চতুর্ভুজ মিশ্র** এবং **চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্য**। অশৌচনিবন্ধে ইঁহাদের মতবাদ পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং ইঁহারা অভিন্ন নহেন। চতুর্ভুজ মিশ্রের গ্রন্থের নাম "অশৌচপ্রকাশ" (অশৌচনিবন্ধ, ৮ খ)।

উপসংহারে, হরিদাসের পুত্র **অচ্যুত চক্রবর্ত্তীর** সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ নূতন তথ্য লিখিত হইল। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।[২৯] সম্প্রতি তদ্রচিত শ্রাদ্ধবিবেকটীকার আদ্যন্তহীন প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩০] এই গ্রন্থেও আচার্য্যচূড়ামণির মতবাদ নামোল্লেখপূর্ব্বক বহু স্থানে খণ্ডিত হইয়াছে।[৩১] স্বরচিত হারলতাটীকারও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা :—

"বিশেষো হারলতা-সন্দর্ভহরিকারামনুসন্ধেয়ঃ" (২৫ ক)

---

২৯) *J. A. S. B.*, 1915, pp. 345 & 362.

৩০) নবদ্বীপ পাবলিক লাইব্রেরির ৯৬৪ সংখ্যক পুথি (২১-৫৪ পত্র)—পার্শ্বে "শ্রা বি অচ্যু টী" লিখিত আছে। তত্রত্য সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় পুথি দেখার ও আবশ্যক বচন উদ্ধার করার সুযোগ ও অনুমতি দিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

৩১) ২৬ খ, ২৮ খ, ৪২ ক, ৪৪ ক, ৪৯ ক ও ৫১ খ পত্র দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে তিন স্থলে (৩৯ ক, ৪৭ ক) এই টীকার উল্লেখ আছে, সর্ব্বত্র টীকার নাম "সন্দর্ভসূত্রিকা" লিখিত হইয়াছে—"সূতিকা" নহে এবং তাহাই হারলতা নামের সহিত যোজনার উপযোগী বটে। স্বর্গত চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, এই টীকাই হারলতার উপর প্রাচীনতম টীকা, বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে। হরিদাসরচিত 'অশৌচনিবন্ধে' এক স্থলে (৫ খ পত্রে) পাওয়া যায়,—"হারলতা-ব্যাখ্যা * * মুক্তং"। এই পূর্ব্বতন ব্যাখ্যা হরিদাসের স্বরচিত হওয়াও অসম্ভব নহে, কিন্তু ত্রুটিত পাঠ হইতে স্থিরনিশ্চয় করা কঠিন। কোলব্রুকের মতে অচ্যুত, রঘুনন্দনের প্রায় সমসাময়িক[৩২] এবং তাহাই প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

৩২) Eggeling : *Ind. Off. Cat.*, p. 461.

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৯)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

গোলোকনাথ শর্ম্মা

'হিতোপদেশ'-প্রণেতা গোলোকনাথ শর্ম্মার কোনও পরিচয় এতাবৎকাল কেহ প্রকাশ করেন নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, সহকারী পণ্ডিত অথবা মুন্‌শীদের তালিকাতেও গোলোকনাথের নাম নাই। তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা আছে যে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে সংস্কৃত হিতোপদেশের যে বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়, গোলোকনাথ পণ্ডিত বা গোলোকনাথ শর্ম্মা তাহার লেখক। এই পুস্তকের দুই-চারি খণ্ড এখনও এখানে-সেখানে বিদ্যমান আছে এবং এতকাল পর্য্যন্ত এই পুস্তকের পরিচয়ই গোলোকনাথ শর্ম্মার একমাত্র পরিচয় ছিল।

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীদের 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউন্টসে' (প্রথম দুই খণ্ড) প্রকাশিত জন টমাস ও উইলিয়ম কেরীর বিভিন্ন সময়ে লিখিত পত্রাবলী হইতে গোলোকনাথ শর্ম্মার সামান্য কিছু পরিচয় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি, কিন্তু ইহাও এত যৎসামান্য যে, আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি হয় না। এই সামান্য পরিচয়টুকুও আবার সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মত অনেক ধাপ ভাঙিয়া বাহির করিতে হইয়াছে।

মালদহ হইতে জন টমাসের আহ্বানে মদনাবাটীর নীলকুঠির অধ্যক্ষের চাকুরি লইয়া কেরী যখন নৌকাযোগে সুন্দরবন অঞ্চল হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার মুন্‌শী রামরাম বসু সঙ্গে ছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি মদনাবাটী পৌঁছেন; টমাস তখন বারো মাইল দূরে মহীপালদীঘির নীলকুঠিতে অধ্যক্ষতা করিতেছেন। জন টমাস বাংলা ও সংস্কৃত শিখিবার জন্য এই সময়েই এক জন স্থানীয় পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন। এই পণ্ডিতই যে গোলোকনাথ শর্ম্মা, তাহা মনে করিবার পরোক্ষ কারণ আছে। ১৭৯৫ সনের ১লা নবেম্বর হইতে ১৭৯৬ সনের ২৬ জানুয়ারি তারিখের মধ্যে লেখা টমাসের ডায়ারি 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউন্টস' প্রথম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার ২৭৮-২৯৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। ইহার এক স্থলে টমাস লিখিয়াছেন, আমার পণ্ডিত যে "হিন্দু ফেব্‌ল্‌স" অনুবাদ করিতেছেন, তাহার মধ্য হইতে তিনটি গল্প বাছিয়া আমি তাহার ইংরেজী অনুবাদ ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট পাঠাইলাম। গল্প তিনটি এই—(1) Crow and the Deer, (2) Old Dove and the young ones—Snare, (3) Jackals and Elephant. ১৮০১ সনের ১৫ই জুন উইলিয়ম কেরী ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে যে পত্র লেখেন, তাহার এক স্থলে আছে—

Our Pundit has, also, nearly translated the Sunscrit fables, one or two of which brother Thomas sent you, which we are going to publish.

১৮০১ সনেই এই গল্পগুলি প্রকাশিত হয় এবং ইহাই গোলোকনাথ শর্ম্মার 'হিতোপদেশ'। ইতিপূর্ব্বে সকলেই কেরীর এই পত্রে লিখিত "Our Pundit" অর্থে ভুল করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে বুঝিয়াছেন।

এই গোলোকনাথ পণ্ডিতের ভ্রাতা কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭৯৫ সনের প্রারম্ভেই কেরীর পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন, ইনি কিশোরবয়স্ক ছিলেন এবং ইহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল। এই কাশীনাথ পরবর্ত্তী কালের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন নহেন।

সুতরাং অনুমান করা যায়, গোলোকনাথ শর্ম্মার সম্পূর্ণ নাম গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মহীপালদীঘির (বর্ত্তমানে দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত) কাছাকাছি কোনও স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল। ইনি ১৭৯৪ সন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মিশনরীদের সহিত যুক্ত ছিলেন; কেরী যখন মালদহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে আগমন করেন, গোলোকনাথও তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। টমাসের নির্দ্দেশে রচিত হিতোপদেশের গল্পগুলিই ১৮০১ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউন্টসে'র ত্রয়োদশ সংখ্যায় (২য় খণ্ড) ৪০৯-৪১২ পৃষ্ঠায় জোশুয়া মার্শম্যানের জার্নালে এই মৃত্যুর উল্লেখ আছে। ২রা জুলাই (১৮০৩) তিনি লিখিয়াছেন—

Our brahman (not a professor, but employed by them) Golook Naut is dead, at his own house, whither he had gone for his health. He died in all the superstition of Hindoo idolatry.

১৩ই আগষ্ট লিখিতেছেন—

We learnt by a letter from brother Fernandez* to-day, that our brahman's wife was *burnt with him*. Although we have his two brothers and other relations about us, they so sedulously concealed it, that we were totally ignorant of it till now. We, however, thought it now our duty to bear a testimony against this infernal practice, by discharging the elder brother who kindled the fire, from our service for ever, as a man whose hands are stained with blood.

গোলোকনাথ সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু জানিবার উপায় নাই। 'হিতোপদেশ' ছাড়া গোলোক শর্ম্মা লিখিত অন্য কোনও পুস্তক বা পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায় না। 'হিতোপদেশে'র আখ্যাপত্র এইরূপ—

হিতোপদেশ।—
সংগ্রহ ভাষাতে—
গোলোক নাথ শর্ম্মণা ক্রিয়তে।—
শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—
১৮০১—

---

* ইনি দিনাজপুরের একজন মোমবাতির ব্যবসায়ী ছিলেন, পরে মিশনের কাজে যোগদান করেন।

আখ্যাপত্র সহ পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪৭।

গোলোকনাথের 'হিতোপদেশে'র অংশবিশেষ যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য লিখিত বাংলা পুস্তকাবলীর প্রাচীনতম রচনা (১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ), তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল। সংস্কৃতের অনুবাদ বলিয়া ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও গোলোকনাথের নিজস্ব বাক্যরীতি প্রশংসনীয়। মৃত্যুঞ্জয়ের দুরূহ পাণ্ডিত্য এবং রামরাম বসুর নিরঙ্কুশ বিজাতীয় শব্দপ্রয়োগ গোলোক শর্ম্মার 'হিতোপদেশে' নাই। কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।

কোন নদীর তীরেতে পাটলীপুত্র নামধেয় এক নগর আছে সে স্থানে সর্ব্ব স্বামী গুণোপেত সুদর্শন নামে রাজা ছিল। সেই রাজা এক কালে কোন কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন তাহার অর্থ এই শাস্ত্র সকলের লোচন অতএব যে শাস্ত্র না জানে সেই অন্ধ। আর যৌবন ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব অবিবেক ইহার যদি এক থাকে তবেই অনর্থ সমুদয় থাকিলে না জানি কি হয়। ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমার পুত্রেরা অতি মূর্খ অতএব ইহারদের কি হবে এমন পুত্র থাকা না থাকা তুল্য। যে পুত্র অবিদ্বান ও অধার্ম্মিক সে পুত্রের কি কার্য্য যেমন কানার চক্ষু পীড়া মাত্র। যদি পুত্র হইয়া মরিত কিম্বা না হইত সে কেবল একবার দুঃখ কিন্তু মূর্খ পুত্র প্রতি পদে। বিদ্যাযুক্ত এবং সাধু যদি এক পুত্র হয় তিনি পুরুষের মধ্যে সিংহ। যেমন চন্দ্র। যাদৃশ রজনীতে চন্দ্র উদয় না হইলে কোটি২ নক্ষত্রে অন্ধকার নাশ করিতে পারে না তাদৃশ এক শত মূর্খ পুত্র জানিবা এক সুপুত্রের তুল্য নহে। অপর যে ব্যক্তি অনেক দান ও পুণ্য করে তাহার পুত্র ধনবান ও ধীবান ও ধার্ম্মিক হয়। ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রু মাতা অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা রূপবতী পুত্র অপণ্ডিত। উচ্চ বা নীচ হউক গুণবান সকল স্থানে পূজনীয়।—পৃ. ৪-৫

গোলোকনাথ শর্ম্মা-প্রণীত 'হিতোপদেশে'র পরবর্ত্তী কোনও সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রসঙ্গে বাংলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উল্লেখ বার-বার করিতে হইয়াছে। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এই পুণ্যনাম আরও বহুবার উচ্চারণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ বাংলা গদ্যের এই প্রস্তুতির কালে তাঁহার মত একজন শিল্পীর অভ্যুদয় না ঘটিলে ইতিহাস ভিন্নরূপে লিখিত হইত। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত তাঁহার রসজ্ঞান যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া বাংলা ভাষার নিতান্ত অন্ধকার-যুগেও একটা নির্দ্দিষ্ট গদ্যরীতির উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। আদর্শের অভাবের জন্য মৃত্যুঞ্জয় ভীত হন নাই। সুদুর্জ্জয় সাহস ও আত্মনির্ভরতাবলে তিনিই সর্ব্বপ্রথম অধুনাপ্রচলিত প্রায় সকল রীতি লইয়াই পরীক্ষা

করিয়াছিলেন। তাঁহার একার সাধনা প্রায় এক যুগের সাধনা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

দুঃখের বিষয়, বাংলা গদ্যের এই প্রথম স্রষ্টা পুরুষের সম্পূর্ণ জীবনী ও কীর্ত্তি-কাহিনী কালের ভগ্নস্তূপ ঠেলিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। যতটুকু হইয়াছে, তাহার জন্য সম্পূর্ণ গৌরব ঐতিহাসিক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্য। তিনিই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় সহকারে মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত এ যুগের বাঙালীর পরিচয় সাধন করাইয়াছেন। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় তিনি মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রমুখ অনেকের মতে মৃত্যুঞ্জয় ওড়িয়া ছিলেন; কেহ কেহ তাঁহাকে মেদিনীপুরবাসী বলিয়াছেন। আমরা সন্ধান করিয়া যত দূর জানিয়াছি, তাহাতে অনুমান হয়, রাঢ় দেশ হইতে তাঁহার কোনও পূর্ব্বপুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত ভদ্রকে গিয়া বসবাস করিয়া থাকিবেন। এই কারণে তাঁহার ওড়িয়া-খ্যাতি হওয়া স্বাভাবিক। ভদ্রক সেকালে মেদিনীপুর এলাকার অন্তর্ভুক্ত থাকাও অসম্ভব নহে। অনুমান ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি চট্টোপাধ্যায়বংশ-সম্ভূত কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ১২৯৫ সালের মাঘ মাসের 'নবজীবন' পত্রিকায় সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মৃত্যুঞ্জয়-সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে উল্লিখিত আছে যে, মৃত্যুঞ্জয় ১৭৬২।৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন; কৈশোরে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা নাটোরে তত্রত্য সভাপণ্ডিতের নিকট এবং যৌবনে তিনি কলিকাতার অধিবাসী। জীবনের পরবর্ত্তী কাল তিনি কলিকাতাতেই অতিবাহিত করেন।

১৮০১ সনের ৪ঠা মে তারিখে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার পাদরি উইলিয়ম কেরীর অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন; মাসিক বেতন দুই শত টাকা। কলেজে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কেরীর অনুরোধে মৃত্যুঞ্জয় কলেজের ছাত্রদের জন্য বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম পুস্তক 'বত্রিশ সিংহাসন'—ইহার জন্য তিনি কেরীর সুপারিসে কলেজকর্ত্তৃপক্ষের নিকট পুরস্কারস্বরূপ দুই শত টাকা পাইয়াছিলেন। 'বত্রিশ সিংহাসন' ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের নূতন ব্যবস্থানুসারে সিবিলিয়ান ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী করিবার জন্য এক জন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রেও কেরীর সুপারিসে মৃত্যুঞ্জয়কে বহাল করা হয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রায় পনরো বৎসর অধ্যাপনা করিবার পর মৃত্যুঞ্জয়ের পাণ্ডিত্যখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া তদানীন্তন সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁহাকে কোর্টের পণ্ডিতরূপে গ্রহণ করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। মৃত্যুঞ্জয় দুই শত টাকা বেতনে কলেজে ঢুকিয়াছিলেন, পনরো

বৎসরেও তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হয় নাই। ইহার কারণ, কলেজের আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইয়াই চলিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় এই সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না; ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুলাই তারিখে তিনি কলেজে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন।

ইহার পর মৃত্যুঞ্জয় সুপ্রীম-কোর্টের বিচারপতি সার্ ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেনের অধীনে জজ-পণ্ডিতের কাজ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি এই কাজ হইতে চারি মাসের অবসর গ্রহণ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন এবং কাশী, প্রয়াগ, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিবার পথে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মুর্শিদাবাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮১৯ সনের ১৯এ জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুঞ্জয় শুধু অধ্যাপক পণ্ডিতই ছিলেন না, সেকালের অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের পূর্ব্বে উক্ত কলেজের নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য দেশী বিদেশী পণ্ডিতদের লইয়া যে সমিতি গঠিত হয়, তিনি তাহার সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটিরও পরিচালক-সমিতির এক জন সদস্য ছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সে যুগে প্রবাদবাক্যের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপনা এবং সুপ্রীম-কোর্টে জজ-পণ্ডিতী ছাড়াও তিনি তাঁহার বাগবাজারের গৃহে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত চতুষ্পাঠীতে ১৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। রামমোহন রায়ের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, সে যুগে মৃত্যুঞ্জয় উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শন রীতিমত চর্চ্চা করিতেন। রাজপুরুষেরা তাঁহার নিকটে নানাবিধ সামাজিক ও আইনঘটিত ব্যাপারেও বিধান লইতেন। তন্মধ্যে সহমরণবিষয়ক বিধান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুঞ্জয় ১৮১৭ সনেই বিধান দিয়াছিলেন যে, "চিতারোহণ অপরিহার্য্য নয়,—ইচ্ছাধীন বিষয় মাত্র। অনুগমন এবং ধর্ম্ম-জীবনযাপন, এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্ত্তে না।" ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের সহমরণ-বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচিত বাংলা পুস্তকগুলির সহিতই আমাদের এই ইতিহাসের সম্পর্ক। ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার সকল পুস্তক লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। তাহার তালিকা এইরূপ—

১। বত্রিশ সিংহাসন, ১৮০২
২। হিতোপদেশ, ১৮০৮
৩। রাজাবলি, ১৮০৮
৪। বেদান্ত চন্দ্রিকা, ১৮১৭
৫। প্রবোধ চন্দ্রিকা, ১৮৩৩ (রচনা ১৮১৩)

ইহা ছাড়া তিনি উইলিয়ম কেরীকে তাঁহার কথোপকথন, সংস্কৃত হিতোপদেশ ও

সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কারের 'সাংখ্য ভাষা সংগ্রহ' পুস্তকের রচনাতেও মৃত্যুঞ্জয়ের যথেষ্ট হাত ছিল। লং ১৮০৫ সনে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয়ের 'দায়রত্নাবলী'র উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সে পুস্তক পাওয়া যায় নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাগজপত্রে ব্রজেন্দ্রবাবু "Literary Notices" বিভাগে হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে লিখিত মৃত্যুঞ্জয়ের একটি পুস্তকের নাম পাইয়াছেন। সে পুস্তকের উল্লেখও অন্যত্র তিনি দেখেন নাই।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয়ের খ্যাতি বিশেষ করিয়া তাঁহার 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র জন্য। 'রাজাবলি' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস এবং 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় নানা কৌতুকের গল্পচ্ছলে বাংলা গদ্যরীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র গুরুত্বও বড় কম নয়। এতাবৎকাল আমাদের ধারণা ছিল—বাংলা ভাষাতে দুরূহ শাস্ত্রীয় বিচার এবং দার্শনিক যুক্তিমূলক রচনা রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করেন। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' 'বেদান্ত গ্রন্থে'র দুই বৎসর পরে প্রকাশিত হইলেও ইহার ভাষা ও রচনাভঙ্গী হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, ঐ ভাষা ও ভঙ্গী সম্পূর্ণ মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব এবং বেদান্তাদি দুরূহ বিষয়ের চর্চ্চা মৃত্যুঞ্জয় স্বাধীনভাবে পূর্ব্ব হইতেই করিতেছিলেন।

'বত্রিশ সিংহাসন'—কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়া ১৮০২ সনে প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

বত্রিশ সিংহাসন।— | সংগ্রহ ভাষাতে।— | মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০২ |

উপক্রমণিকা ও বত্রিশটি পুত্তলিকার বত্রিশটি কাহিনী, পৃ. ২১০। ভাষা সহজ, সরল; রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষার সহিত ইহার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মৃত্যুঞ্জয় রামরাম বসুর আদর্শে রচনা করেন নাই। 'বত্রিশ সিংহাসনে' তিনি সংস্কৃতানুসারিণী এবং চলিত-ঘেঁষা, উভয়বিধ রীতিই প্রয়োগ করিয়াছেন, অথচ শেষোক্ত পদ্ধতিতে বৈদেশিক বা বিজাতীয় শব্দ কদাচিৎ ব্যবহার করিয়াছেন। 'বত্রিশ সিংহাসন' হইতেই মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষায় লক্ষ্য করিবার বিষয়—তাঁহার সতেজ প্রকাশভঙ্গী এবং সরল শব্দবিন্যাস। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপিমালা'; কেরীর 'ডায়ালগ্‌স··' এবং গোলোক শর্ম্মার 'হিতোপদেশ'—'বত্রিশ সিংহাসনে'র পূর্ব্বগামী ও সাময়িক হইলেও পরবর্ত্তী বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু 'হিতোপদেশ,' 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় 'বত্রিশ সিংহাসনে'র ভাষাই উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরী রীতিতে স্থায়ী হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয়ই প্রাণবান্ গদ্যের প্রথম স্রষ্টা।

বেতালপঞ্চবিংশতি এবং বত্রিশ সিংহাসন জাতীয় গল্প বহুকাল হইতেই এদেশে প্রচলিত। সংস্কৃত গদ্য-পদ্যে রচিত একাধিক বত্রিশ সিংহাসন এখনও দেখা যায়।

এই গল্পগুলিতে অনেকে বৌদ্ধ প্রভাব দেখিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের নামেও একটি বত্রিশ সিংহাসন প্রচলিত আছে। মৃত্যুঞ্জয় ইহার কোনটিকে তাঁহার আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়া অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। অনুবাদ হইলেও ভাষা অত্যধিক সংস্কৃত-প্রধান নয়—মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম রচনার ইহাই বিশেষত্ব এবং গোলোক শর্ম্মার উপরে এখানেই তাঁহার প্রাধান্য। ভাষার নমুনা-স্বরূপ কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা সর্ব্বত্র দেওয়া হইল।

১। দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বদকর নামে এক শস্য ক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত সেই কৃষক শস্য ক্ষেত্রের চতুর্দিগে পরিখা করিয়া তাল তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধবী মালতী যুথী জাতী সেবতী কদলী দাড়িমী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকে। সেই উপবনের নিকট নিবিড় ভয়ানক বন ছিল সে বনহইতে হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ গাণ্ডার বানর বনশূকর শশক ভালুক হরিণাদি অনেক পশু জন্তু আসিয়া শস্য প্রত্যহ নষ্ট করে এ জন্য যজ্ঞদত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শস্য রক্ষার কারণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি তথাতে থাকিল। মঞ্চের উপর যতক্ষণ বসিয়া থাকে ততক্ষণ রাজাধিরাজের যেমত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা সেই মত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা কৃষক করে যখন মঞ্চহইতে নামে তখন জড়ের প্রায় থাকে। ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন লোকেরা বড়ই বিস্মিত হইয়া পরস্পর কহে এ কি আশ্চর্য্য। এই বৃত্তান্ত লোক পরম্পরাতে ধারাপুরীর রাজা ভোজ শুনিলেন। অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রী সামন্ত সৈন্য সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়া কৃষকের ব্যবহার প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র এক মন্ত্রীকে মঞ্চের উপরে বসাইলেন। সেই মন্ত্রী যাবৎ মঞ্চের উপরে থাকে তাবৎ রাজাধিরাজের প্রায় প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা করে। ইহা দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া বিচার করিলেন যে এ শক্তি মঞ্চের নয় এবং কৃষকেরো নয় এবং মন্ত্রীর নয় কিন্তু এ স্থানের মধ্যে চমৎকার কোনহ বস্তু আছেন তাহারি শক্তিতে কৃষক রাজাধিরাজ প্রায় হয়। ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রব্যের উদ্ধার কারণ সেই স্থান খনন করিতে মহারাজ আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা খনন করিল। তৎপর সেই স্থান হইতে প্রবাল মুক্তা মাণিক্য হীরক সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত বত্রিশ পুত্তলিকাতে শোভিত তেজোময় এক দিব্য রত্নসিংহাসন উঠিলেন। —উপক্রমণিকা, পৃ. ৩

২। এই কালে এক ব্যাঘ্র সেখানে আইল ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বিজয়পাল গাছের উপরে চড়িলেন সেই গাছে এক বানর ছিল। সেই বানর রাজপুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু ভয় নাহি উপরে আইস। বানরের কথা শুনিয়া রাজপুত্র উচ্চেতে গেলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য দেখিয়া বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের নামতে ব্যাঘ্র আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও। রাজপুত্র সেইরূপ নিদ্রা গেলেন। —প্রথম পুত্তলিকার কথা, পৃ. ৯

৩। হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্তমাংস মলমূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি করা জ্ঞানী জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদে ততোধিক

দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেক কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার কারাগার হইতে মুক্ত হন। —পঞ্চদশী পুত্তলিকার কথা, পৃ. ২৭

১৮০৮ সনে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৯৮) এবং ১৮১৮ সনে তৃতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৪৪) প্রকাশিত হয়। ১৮১৬ সনে "লন্দন মহা নগরে চাপা" একটি সংস্করণ বাহির হয়।

'হিতোপদেশ'—১৮০৮ সনে প্রকাশিত হয়, পৃ. ২৪৩। আখ্যাপত্র এইরূপ—

পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রহইতে উদ্ধৃত। | মিত্রলাভ সুহৃদ্ভেদ বিগ্রহ সন্ধি। | এতচ্চতুষ্টয়াবয়ব বিশিষ্ট হিতোপদেশ।— | বিষ্ণুশর্ম্মকর্ত্তৃক সংগৃহীত। | বাঙ্গালা ভাষাতে। | মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০৮।— |

'হিতোপদেশে'র ভাষা 'বত্রিশ সিংহাসন' অপেক্ষা অধিক সংস্কৃত-ঘেঁষা। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের ভাষা এমন সরল ও সুখপাঠ্য যে, অনুবাদে মৃত্যুঞ্জয়কে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন সাধনের পরিশ্রম করিতে হয় নাই; তিনি যথাযথ মূলের আদর্শ বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। গোলোকনাথও তাহাই করিয়াছেন, কিন্তু উভয় অনুবাদের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব সাহিত্যবুদ্ধি অনুবাদকেও কতখানি সরস করিয়া তুলিয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

নর্ম্মদাতীরে এক অতিবড় শাল্মলি বৃক্ষ থাকে সেই তরুতে আপন চঞ্চুকরণক নির্ম্মিত নীড়-মধ্যে পক্ষিরা বর্ষাতেও সুখেতে বাস করে। অনন্তর নীলবর্ণ ছবির তুল্য মেঘসমূহেতে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইলে পরে স্থূল ধারাতে অতিবড় বৃষ্টি হইল সেই তরুতলেতে বানরেরদিগকে আর্দ্রীভূত শীতার্ত্ত কম্পিতকলেবর দেখিয়া করুণাপ্রযুক্ত পক্ষিরা কহিল ওহে বানরেরা শুন আমারদিগের কর্ত্তৃক চঞ্চুমাত্রেতে আহৃত তৃণকরণক নীড় নির্ম্মিত হইয়াছে পাণি পাদাদিবিশিষ্ট তোমরা কেন এই প্রকারে অবসন্ন হইতেছ তাহা শুনিয়া জাতক্রোধ বানরেরা আলোচনা করিল বায়ুরহিত নীড় মধ্যে অবস্থান-প্রযুক্ত সুখী পক্ষিরা আমারদিগকে নিন্দা করিতেছে ভাল বৃষ্টির উপশম হউক। তাহার পর জলবর্ষণ নিবৃত্তি হইলে সেই মর্কটেরা বৃক্ষ আরোহণ করিয়া সকল বাসা ভাঁগিল তাহারদিগের অণ্ড সকলও নীচেতে ফেলাইয়া দিল। পৃ. ৮৭-৮৮

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিষ্ণু শর্ম্মা রচিত প্রসিদ্ধ পঞ্চতন্ত্র পুস্তকের অন্ততঃ দশখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদের পর যে অনুবাদগুলি বাহির হয়, সেগুলি যেন হুবহু মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদেরই পুনর্মুদ্রণ। বস্তুতঃ মৃত্যুঞ্জয়ের এই 'হিতোপদেশ' দীর্ঘকাল বাংলা দেশে প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিল।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৯৭) প্রকাশিত হয়।

'রাজাবলি'—১৮০৮ সনে বাহির হয়, পৃ. ২৯৫। আখ্যাপত্র এইরূপ—

রাজাবলি।— | সংগ্রহ ভাষাতে।— | মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০৮।— |

'রাজাবলি'কে অনেকে মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা ধরিয়া বিচার করিয়াছেন, কিন্তু আখ্যাপত্রে "সংগ্রহ ভাষাতে" দেখিয়া সন্দেহ হয়, ইহারও কোনও সংস্কৃত আদর্শ থাকা অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ গত বৎসরের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এক সংস্কৃত 'রাজাবলি'র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় ঐতিহাসিক ছিলেন না এবং 'রাজাবলি'তে আলোচ্য বিষয়সমূহ লইয়া তিনি যে গভীর গবেষণা করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবারও হেতু নাই। সুতরাং এই বইখানিকেও অনুবাদের কোঠায় ফেলিতে হইবে। তবে ইহা যে বাংলা ভাষায় ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ মনে করেন, মৃত্যুঞ্জয় অন্য প্রাদেশিক ভাষা হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'হিতোপদেশে' মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার রীতিজ্ঞানের পরিচয় দিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু 'রাজাবলি'তে পাইয়াছেন। এই পুস্তকে একাধিক রীতি অনুসৃত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে তিনি বিজাতীয় শব্দ প্রয়োগেও ইতস্ততঃ করেন নাই। 'রাজাবলি'তে প্রথম গদ্যস্রষ্টা হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের ক্ষমতার নিদর্শন বিশেষভাবে বিদ্যমান। এই পুস্তকের আরম্ভ ও সমাপ্তি অংশ উদ্ধৃত করিলেই বাক্যপদ্ধতির ক্রমপরিবর্ত্তন স্পষ্ট হইবে। আরম্ভ এইরূপ—

ব্রহ্মপ্রভৃতি কীট পর্য্যন্ত জীবলোকের ও ঐ জীবলোকেরদের ভূর্লোকাদি সত্য লোক পর্য্যন্ত উর্দ্ধতন সপ্তলোক অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত অধস্তন সপ্তলোকরূপ নিবাস স্থানের ও অমৃত যব ব্রীহি তৃণাদিরূপ তাবদ্ভোগ্যবস্তু সকলের ও স্বস্বকর্ম্মানুসারে স্বর্গ নরক বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার ও কল্প মন্বন্তর যুগাদিরূপ কাল বিভাগের কর্ত্তা পরমেশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। পৃ. ১১৭

সমাপ্তি এইরূপ—

এইরূপে সুবে বাঙ্গালাদিতে কম্পনি বাহাদুরের অধিকার সুস্থির হইল। মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর বাঙ্গালা ১২০৪ সন পর্য্যন্ত বরাবর কম্পনি বাহাদুরের খেদমত গুজারি করিয়া এই কলিকাতাতে মরিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ মুকুন্দবল্লভ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। এইরূপে ঐ মহারাজ দুর্ল্লভরাম নিঃসন্তান হইলেন ঐ আপন মুনীব নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামী বৃক্ষের ফল পাইলেন অতএব স্বতঃ নিমখারাম অথচ এক ক্ষুদ্রের ঔরসেতে মহারাজ দুর্ল্লভরামের জন্ম অতএব বিপরীত খচরস্বরূপ ঐ মহারাজ রাজবল্লভের ভাগিনেয়েরা প্রতি পুরুষের ক্রমাগত যে কিছু ধন তাহা অধিকার করিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের পুত্রবধূ ঐ মহারাজ মুকুন্দবল্লভের স্ত্রীকে এক বস্ত্রে কএক দাসী সমেত কৌশলক্রমে বাটীহইতে বাহির করিয়া দিয়া নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় আপনাকে মহারাজ করিয়া মানিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভেরদের ঐহিক সম্ভ্রম ও পারমার্থিক সকল ধর্ম্ম লোপ করত আছে। ঐ রাজা রাজবল্লভের পুত্রবধূ এক ব্রাহ্মণের বাটীতে দুঃখেতে কাল ক্ষেপণ করত আছেন। পৃ. ১৮৯

আরম্ভ ও সমাপ্তির মাঝে মাঝে 'রাজাবলি'তে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা যে শিল্পাদর্শের দিক্ দিয়া কত উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটি হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। রসিক পাঠক ইহার মধ্যে বঙ্কিমী ভঙ্গীর সন্ধান পাইবেন।

যে সিংহাসনে কোটি কোটি লক্ষ স্বর্ণদাতারা বসিতেন সেই সিংহাসনে মুষ্টিমাত্র ভিক্ষার্থী অনায়াসে বসিল। যে সিংহাসনে বিবিধপ্রকার রত্নালঙ্কারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে

ভস্মবিভূষিতসর্ব্বাঙ্গ কুযোগী বসিল। যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল। যে সিংহাসনস্থ রাজারদের সম্মুখে অঞ্জলীকৃত হস্তদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিত সেই সিংহাসনের রাজা স্বয়ং উর্দ্ধবাহু হইল। পৃ. ১৩৪

১৮১৪ সনে 'রাজাবলি'র দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ২২১) প্রকাশিত হয়।

'প্রবোধ চন্দ্রিকা'—রচনার তারিখ (১৮১৩ খ্রীঃ) হিসাবে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র স্থান 'রাজাবলি'র পরেই, কিন্তু ইহা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই। ১৮১৯ সনের ৫ জানুয়ারি তারিখে কলেজের কর্তৃপক্ষকে লেখা কেরীর একখানি পত্র হইতে জানা যায়—

Mritoonjuya, formerly Chief Pundit of the College, some years ago at my suggestion undertook the abovementioned work, to which he has given the name of Prabodha-Chundrika. It is a sketch of the whole cycle of Hindoo Literature, illustrated by familiar examples and interspersed with anecdotes intended to exemplify the different sciences described therein..... The work is now in the Serampore Press and will be printed.......

এই পত্রে মৃত্যুঞ্জয়কে এই সকল গ্রন্থরচনার পরিশ্রমের জন্য পুরস্কৃত করিবার সুপারিশ ছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ পঞ্চাশ খণ্ড 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' কিনিয়া লেখককে পুরস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তাহার জন্য অপেক্ষা করেন নাই। ইহার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। ঠিক ১৪ বৎসর পরে ১৮৩৩ সনের মে মাসে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

'প্রবোধ চন্দ্রিকা' মৃত্যুঞ্জয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বই। পরবর্ত্তী কালে বাংলা-সাহিত্যের বহু সমালোচক ও ঐতিহাসিক এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ অধ্যয়ন না করিয়াই ইহার ভাষার নিন্দাবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজনই মনে করেন নাই যে, মৃত্যুঞ্জয় নানা গদ্য-রীতির নমুনা দ্বারা এই গ্রন্থখানিকে স্বয়ং সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' দীর্ঘকাল কলিকাতার বাঙালী ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক ছিল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এটিকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া নিজেরাই ইহার একটি সংস্করণ (১৮৬২ খ্রীঃ) প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে যুগের বাঙালীদের অনেকেরই এই পুস্তকখানির সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল। এই বই লইয়া অনেক আলোচনাও হইয়াছে। কিন্তু যে কারণেই হউক, এই সকল আলোচনাতে মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার প্রাপ্য সম্মান পান নাই। পরবর্ত্তী কালে মৃত্যুঞ্জয়কে যাঁহারা সমধিক সমাদর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় অনুসৃত (১) মৌখিক রীতি, (২) সাধু বা সাহিত্যিক রীতি, এবং (৩) সংস্কৃত রীতি লইয়া বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, তিনি প্রধানতঃ অনুবাদস্থলেই সংস্কৃত রীতি ব্যবহার করিয়াছেন।

বস্তুতঃ মৌখিক রীতির প্রতি যে তাঁহার প্রবণতা ছিল, 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' পাঠে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। পুস্তকের ভূমিকায় জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিয়াছেন—

This work was composed by the late Mrityunjoy Vidyalunkar, one of the most profound scholars of the age..... The work, which he left unpublished at his death, consists chiefly of narratives from the Shastrus, written in the purest Bengalee, of which indeed it may be considered one of the most beautiful specimens. The writer anxious to exhibit a variety of style, has in some cases indulged in the use of language current only among the lower orders; the vulgarity of which, however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour. In other parts of the work he has drawn so freely on the Sungskrit, that the uninitiated student may possibly find it difficult to comprehend some of the sentences at the first glance. All words of foreign parentage, however, he has carefully excluded, which adds not a little to the value of this compilation.

Considering how confined is the number of works written by natives of the country in pure Bengalee which we possess, it is to be hoped that the present work will form a valuable addition to the library of the student. Though he should be occasionally interrupted, in the perusal of it, by words and phrases of unusual occurrence, yet he will be amply repaid for his labour by the purity of its diction, and by the opportunity which it will afford him of appreciating the resources of the Bengalee language. Any person who can comprehend the present work, and enter into the spirit of its beauties, may justly consider himself master of the language.

'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র বিবিধ গদ্যরীতির নমুনা স্বল্পপরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি, ইহা হইতেই পাঠক মৃত্যুঞ্জয়ের ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন।

১। মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো ছেলেপিলাগুলি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মশুর শাক পাত শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিল ঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিজী পাইজ করি চরকাতে সূতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পোণেক দশগণ্ডা যা পাই। ও মিন্সা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস্ খাটিয়া দুই চারি পোণ যাহা পায় তাহাতে তাঁতির বাণী দি ও তেল লুণ করি কাটনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠুকরিয়া খায় তেল বিহনে মাতায় খড়ি উড়ে। পৃ. ২৮৯

২। এক স্থানে অনেক বক বসিয়াছিল অকস্মাৎ সেই স্থানে মানস সরোবরনিবাসী এক রাজহংস আসিয়া উপস্থিত হইল। বকেরা ঐ হংসকে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া লোহিত লোচন লপন চরণ ধবল শরীর তুমি কে হে। হংস কহিল আমি রাজহংস। বকেরা কহিল ওহো তুমিই রাজহংস বটে ভাল এক্ষণে কোথাহইতে আইলা। মানস কাসারহইতে। সে স্থানে কি আছে। স্বর্ণ বর্ণ রাজীবরাজী পীযূষতুল্য জল নানা রত্নেতে নিবদ্ধ আলবাল যারদের এতাদৃশ পাদপপংক্তি প্রতীরেতে বহুবিধ মণিখচিত হিরণ্ময় সোপানাবলি এই সকল তথা আছে। এতদ্রূপ উত্তর প্রত্যুত্তরানন্তর ক্রুঞ্চেরা কহিল সেখানে শামুক আছে হংস কহিল না। এই কথা শ্রবণমাত্রে কহ্বেরা হংসকে হাহী করিয়া উপহাস করিল। পৃ. ২৬৬

৩। দক্ষিণ দেশে উজ্জয়িনী নামে নগরীতে দাক্ষিণাত্য রাজরাজীশিরোরত্নরঞ্জিতচরণ উজ্জয়িনী বিজয় নামে এক সার্ব্বভৌম মহারাজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরকেশরিনামা এক দিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো বন ভ্রমণজনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণিস্তনসুন্দর ইন্দীবর কৈরবকোরক সুন্দরীমুখমনোহরান্দোলিতোৎফুল্লরাজীব নির্ম্মল সুস্নিগ্ধজল পুষ্করিণী তটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবাবসান সময়ে বটজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজভৃত্যজনসমাজাগমন প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর রাজদ্বারস্থিত ঘটীযন্ত্রস্থ দণ্ডতাম্রীতুল্য দিবাকর জলনিমগ্ন প্রায় অস্তমিত হইলেন। পৃ. ২৭১-৭২

'বেদান্ত চন্দ্রিকা'—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্র এইরূপ—

An/Apology/for/The Present System/of/Hindoo Worship. /Written in the Bengalee Language, and Accompanied by/an English Translation. /Calcutta : /Printed by A. G. Balfour, at the Government Gazette/Press, No. I, Mission Row. /1817./

মৃত্যুঞ্জয়ের নাম না থাকিলেও ইহা যে তাঁহারই রচনা, কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক (১৮১৯-২০) বিবরণ ও 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে (১৮৪৫, জুলাই) প্রকাশিত "Vedantism—, what is it ?" প্রবন্ধ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'বেদান্ত চন্দ্রিকা'য় মৃত্যুঞ্জয় এক নূতন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। অতি দুরূহ বেদান্ত-দর্শনও যে বাংলা ভাষায় আলোচ্য হইতে পারে, রামমোহন রায় তাহা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে কঠোর শাস্ত্রীয় বিচারও যে বাংলা ভাষায় করা যায়, ইহা মৃত্যুঞ্জয়ই প্রমাণ করিলেন। ইঁহাদের উভয়ের চেষ্টায় বাংলা ভাষার বনিয়াদ পাকা হইল; পাঠ্য পুস্তকের স্তর হইতে বাংলা ভাষা একেবারে শাস্ত্রচর্চ্চার আসরে উন্নীত হইয়া সকলের শ্রদ্ধার বস্তু হইয়া উঠিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখন পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় বিচারে মৃত্যুঞ্জয়ের এই ভাষাই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' হইতে দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। দুর্গম বন পর্ব্বতে কণ্টকোদ্ধার করিয়া প্রথম পথপ্রবর্ত্তক প্রাচীনতর বিদ্যাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতেরদের কর্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া সেই পথের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমত্বকারীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেরা তথাপি তাদৃশ প্রাচীনতর পণ্ডিতেরদের হইতে বড় হন না যে প্রথম পথপ্রবর্ত্তক সেই বড় ও তৎপ্রবর্ত্তিত ও তদুত্তর পণ্ডিতপরিষ্কৃত যে পথ সেই পথ। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ইতি। আধুনিক ধনমদমত্ত ভ্রান্তেরদের স্বাহঙ্কার কুজ্ঞানেতে কৃত যে পথ সে কেবল লোকবিনাশার্থ কিম্বা তারদের রাজপথ পরিত্যাগে নূতনপথগামীরা বিপদ্‌গ্রস্ত অবশ্য হয় ও গমনকালে নানা নিষেধবাক্য না মানিয়া তৎপথগামীরা ততোধিক বিপত্তিভাগী হয়। পৃ. ২০৯

২। পরমার্থদর্শী ধার্ম্মিক সৎপুরুষেরদের নির্ম্মলজলবদ্‌বুদ্ধিতে বেদান্তসিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে তৈলকণাবৎ বেদান্তসিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতি যত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ক বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন। পৃ. ২১৩

বাংলা গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের কীর্ত্তি বিচার এখনও সুষ্ঠু ও যথাযথ ভাবে হয় নাই; ইহার প্রধান কারণ, মৃত্যুঞ্জয়ের সকল দিক্‌ একত্র করিয়া বিবেচনা করিবার সুযোগ এত দিন আমাদের ছিল না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মৃত্যুঞ্জয়ই সর্ব্বপ্রথম জড় বাংলা গদ্যে প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছিলেন; সেই প্রদোষান্ধকারে ইহা যে কত বড় কাজ, বর্ত্তমান সমৃদ্ধির উপর চাপিয়া বসিয়া তাহা হয়ত আমরা অনুভব করিতে পারিব না। তথাপি বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পিরূপে মৃত্যুঞ্জয়কে পূজা নিবেদন করিতেই হইবে। মৃত্যুঞ্জয়ের বিরাট্‌ত্ব যিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সে যুগের সেই শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক এবং বঙ্গভাষাবিদ্‌ জন ক্লার্ক মার্শম্যানের প্রশস্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা মৃত্যুঞ্জয় প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি—

At the head of the establishment of Pundits [at the College of Fort William] stood Mritunjoy, who, although a native of Orissa, usually regarded as the Bœtia of the country, was a colossus of literature. He bore a strong resemblance to our great lexicographer [Dr. Johnson], not only by his stupendous acquirements and the soundness of his critical judgment, but also in his rough features and unwieldy figure. His knowledge of the Sanscrit classics was unrivalled, and his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity, and vigour.

—*The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*, i, 180.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৭শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
১৩৪৭

প্রগল্‌ভাচার্য্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ.

বাঙ্গালার মহানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির প্রতিভামূলে নব্য ন্যায়ের অনুমানখণ্ডের চর্চ্চা নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া যে ভাবে চারি শত বৎসর ধরিয়া (১৫০০-১৯০০ খ্রীঃ) ভারতের নানা স্থানে প্রসার লাভ করে, জগতের সারস্বত ইতিহাসে তাহা প্রায় অতুলনীয়। বাঙ্গালার এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি এখন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং তাহার বিবরণ সঙ্কলনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। রঘুনাথ শিরোমণির অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠাহেতু তাঁহার পূর্ব্বগামী বঙ্গদেশীয় নব্য ন্যায়ের মহাগ্রন্থকারগণের নাম ও গ্রন্থ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে—একমাত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ক্ষীণ স্মৃতি এখনও বাঁচিয়া থাকিয়া নানাবিধ কাহিনীর সৃষ্টি করিতেছে। আমরা অপর একজন বাঙ্গালী মহানৈয়ায়িকের পরিচয় এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিতেছি।

রঘুনাথ শিরোমণির "অনুমানদীধিতি"র বহু স্থলে "প্রগল্‌ভ" নামক নব্য নৈয়ায়িকের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ নব্য ন্যায়ের প্রায় প্রত্যেক অধ্যাপক ও অধ্যেতা দীধিতির "ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব" ও "পক্ষতা" প্রকরণে উল্লিখিত প্রগল্‌ভ-লক্ষণের সহিত সুপরিচিত। কিন্তু কেহই বোধ হয় ঘুণাক্ষরেও অবগত নহেন যে, এই প্রগল্‌ভ বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালার এই হারানো ছেলেকে যুগযুগান্তর পরে আমরা ঘরে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিব।

কাশীর সুবিখ্যাত সরস্বতী-ভবন গ্রন্থাগারে প্রগল্‌ভ-রচিত চিন্তামণি-ব্যাখ্যার ৪ খণ্ড নাগরাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

১। ন্যায় বৈশেষিক ২৯৭ সংখ্যক পুথি—শব্দখণ্ডের ১২ পত্র মাত্র। গ্রন্থারম্ভ এই :—

> নারায়ণস্য চরণং শরণং প্রণম্য মাতঃ সরস্বতি তবাপি পদারবিন্দং।
> ধ্যাত্বা পিতুর্নৃপতেশ্চরণদ্বয়ঞ্চ শ্রীমৎপ্রগল্‌ভ ইহ কিঞ্চিদহং ব্রবীমি।

২। ঐ ৩০০ সংখ্যক পুথি—প্রত্যক্ষখণ্ড, ১-১৭৯ পত্র, খণ্ডিত, আরম্ভবাক্য যথা—

> ওঁ নমো গণপতিগীর্ভ্যাং।
> বাণীসংসেব্যমানং তমজমক্ষয়মব্যয়ং।
> নারায়ণমনাথৈকনাথং নত্বা সহস্রধা।
> আচার্য্যশ্রীপ্রগল্‌ভেন জাহ্নবীগর্ভসংভুবা।
> পিতুর্নৃপতের্ব্যাখ্যাং হৃদি কৃত্বা নিরুচ্যতে।

৩। ঐ ২৯৯ সংখ্যক পুথি—প্রত্যক্ষখণ্ডের আদ্যন্তহীন ৩৯-১০৪ পত্র, প্রাচীনতর প্রতিলিপি, ৯২ পত্রে আছে "ইতি জপ্তিবাদঃ সমাপ্তঃ।"

৪। ঐ ২৯৮ সংখ্যক পুথি, আদ্যন্তসমন্বিত অনুমানখণ্ড, ১-২০৮ পত্র। আরম্ভ-বাক্য অবিকল শব্দখণ্ডের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক। গ্রন্থশেষে পাওয়া যায়:—

বন্দে শ্রীনন্দপুত্রস্য পাদাম্ভোজমহর্নিশং।
যৎপ্রসাদাবহশ্চ (?) মুক্ত (ঃ) স্যাং ভবসাগরে।
অনেকেষাং লিপিং দৃষ্ট্বা স্বয়ং কিঞ্চিদ্বিচার্য্য চ।
লিখিতং যৎ প্রগল্ভেন তেন তুষ্যতি কেশবঃ।

ইতি শ্রীনরপতিমহামিশ্রতনয়-জাহ্নবীগর্ভসম্ভব-রুক্মিণীপতিশ্রীপ্রগল্ভাচার্য্যবিরচিতেঽনুমান-পরিচ্ছেদব্যাখ্যা সমাপ্তা। (২০৮ পত্র)

আদ্যন্তসমন্বিত হইলেও দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রতিলিপি অশুদ্ধিবহুল এবং স্থানে স্থানে বহু অংশ বাদ পড়িয়াছে। প্রগল্ভের অপর এক নাম ছিল "শুভঙ্কর"। কারণ, "কেবলান্বয়ী" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়:—

কেবলান্বয়িগোবিন্দং প্রণম্য শ্রীশুভঙ্করঃ।
রুক্মিণীকৃতনির্ব্বাহঃ কশ্চিদাহ যথামতি। (৬৫ক পত্র)

ইহা অসম্ভব নহে যে, নৈয়ায়িকসুলভ প্রগল্ভতাহেতুই তাঁহার দ্বিতীয় নাম উৎপন্ন হইয়াছিল এবং প্রগল্ভতা সহকারে নিজপত্নীর নাম গ্রন্থমধ্যে কীর্ত্তন করিয়া তিনি আত্মনামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন!

হেত্বাভাসের পরবর্ত্তী ঈশ্বরবাদের টীকা তিনি বিস্তৃতভাবে করিয়াছেন—বোধ হয়, চিন্তামণির কোন প্রসিদ্ধ টীকাই এতদংশে এত বিস্তৃত নহে। বাধগ্রন্থ শেষ করিয়া তিনি পৃথক্ মঙ্গলাচরণ এই ভাবে করিয়াছেন:—

নমামি পরমানন্দমানন্দায় পুনঃ পুনঃ।
বাধাদিদোষে নিস্তীর্ণো যস্যানুস্মরণাদহং।
কার্য্যত্বমীশ্বরে লিঙ্গং হেত্বাভাস(বি)বর্জ্জিতং।
উক্তগ্রন্থপ্রবন্ধেন সাধিতং বোধ্যতেঽধুনা। (১৪৭ ক পত্র)

১৭৫ক পত্রে আছে,—

এবং ভক্ত্যা পরমপুরুষস্থাপনে যুক্তি(রুক্তা)
নানাশাস্ত্রপ্রথিতমতিনা শ্রীপ্রগল্ভেন যত্নাৎ।
এতজ্জন্যৈঃ সুকৃতনিচয়ৈ(স্তর্পিতঃ) সোঽত্র দেবঃ
শ্রীমান্ রামঃ সকল(জগতী)নায়কঃ প্রীয়তাং মে॥

অন্যান্য প্রকরণের শেষেও এইরূপ পৃথক্ শ্লোক রচিত হইয়াছে, আমরা বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।[১] বাঙ্গালার যে বিখ্যাত কুলীনবংশ প্রগল্ভাচার্য্য অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, আমরা আশা করি, প্রগল্ভের লুপ্ত স্মৃতির উদ্ধারকল্পে তদ্বংশীয় কেহ তাঁহার ঈশ্বরবাদের টীকাংশ মুদ্রিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন। এ যাবৎ প্রগল্ভ-রচিত চিন্তামণি-ব্যাখ্যার প্রতিলিপি বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা পরিজ্ঞাত নহি।

১। কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ডাঃ শাস্ত্রী এবং পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীযুত নারায়ণ শাস্ত্রী মহোদয়ের অনুগ্রহে আমরা পুথি দেখিতে সমর্থ হইয়াছি এবং তজ্জন্য আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পুথির বিবরণীতে দেখা যায়, কাশী ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যত্র এবং লাহোরেও এই টীকার প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[২]

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে এই প্রগল্‌ভরচিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকার এক প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। সম্প্রতি খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের নানা টীকাসমন্বিত যে সংস্করণ কাশী চৌখাম্বা গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইতেছে, এই টীকাও তাহার অন্তর্ভূত। গ্রন্থারম্ভে প্রগল্‌ভের পরিচয়সূচক শ্লোকত্রয় উদ্ধৃত হইল :—

যস্মিন্ দেবা অপি সুরপুরীবাসমাস্বাদয়ন্তো
ধন্যাঃ স্মঃ কিং বয়মিতি জনিং সাদরং কাময়ন্তে।
লাট়ীবংশে কলুষরহিতে তত্র পুণ্যপ্রভাবাৎ
ধীরঃ শ্রীমন্নরপতিমহামিশ্রবর্য্যো বভূব।
তস্যাত্মজঃ সকলশাস্ত্রনিরূঢ়চেতাঃ
শ্রীমচ্ছুভঙ্কর ইতি প্রথমঃ কবীনাম্।
আবির্ভূব ভুবি বিশ্রুতকীর্ত্তিচন্দ্রো
লাট়ীয়বংশসরসীরুহবাসরেশঃ।
তেনাক্ষুণ্নবিচারমন্থমথনৈরুদ্ধৃত্য বিদ্যার্ণবাৎ
প্রজ্ঞানেত্রতয়া নিরূঢ়বিলসৎসৎখণ্ডনার্থামৃতং।
শ্রীমচ্ছঙ্কর-বর্দ্ধমান-রচিতোপায়ান্ বিলোড্যাপি চ
শ্রীহর্ষস্য কৃতের্মম কৃতিমুদে শ্রীদর্পণো রচ্যতে ॥[৩]

শেষ শ্লোকটিতে একটি মূল্যবান্ নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, শঙ্কর মিশ্রের খণ্ডন টীকা দেখিয়া তিনি খণ্ডনদর্পণ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যেও বহু স্থলে শঙ্করবচনের অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রগল্‌ভের নাম কিম্বা তাঁহার "খণ্ডনদর্পণে"র বচন "খণ্ডনভূষামণি" টীকায় উদ্ধৃত হয় নাই। সুতরাং "খণ্ডনভূষামণি"কার রঘুনাথ দীধিতিকার নহেন বলিয়া যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় সন্দেহ করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। দীধিতিকার প্রগল্‌ভের মত বহু স্থলে অন্যত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রগল্‌ভ যাহাকে "লাট়ীবংশ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বিখ্যাত "লাহিড়ী" নামক কুলীন-বংশ বটে। লাহিড়ী-বংশের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত প্রায় সমস্ত বংশাবলীতে নরপতি মহামিশ্র ও তাঁহার অন্যতম পুত্র প্রগল্‌ভ ভট্টের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। "নরপতি" নাম ও "মহামিশ্র" উপাধি অত্যন্ত বিরলপ্রচার সন্দেহ নাই, তদুপরি ঠিক লাট়ী বা লাহিড়ী বংশেই প্রগল্‌ভ ভট্টের পিতৃরূপে এবং অভিন্ন সময়ে তাঁহার উৎপত্তির

২। Aufrecht. *Cat. Cat.* Vol. 1, p. 216.

৩। Descr. Cat. of Sans. Mss., Cal. Sans. College, philosophy, p. 196. মুদ্রিত সংস্করণে প্রথমোদ্ধৃত শ্লোকের দুই স্থলে ভুল পাঠ আছে।

প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই বস্তুপঞ্চকের একত্র সমাবেশবলে আলোচ্য গ্রন্থকারের সহিত কুলশাস্ত্রোক্ত ব্যক্তির অভেদানুমান অপরিহার্য্য এবং তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

স্বর্গত রায় বাহাদুর যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি-প্রণীত "কুলশাস্ত্রদীপিকা" (২য় সংস্করণ, ১৩১৪) বারেন্দ্রব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রামাণিক কুলগ্রন্থ। এই গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হইল :—

পিতাম্বরস্য ত্রিভিঃ পুত্র সাধু রুদ্র লোকনাথ।

লোকনাথ লাহিড়ীর পুত্র ভূতনাথ পুত্র দিগম্বর পুত্র বেদগর্ত্ত পুত্র সনাতন পুত্র টুটু ওঝা পুত্র হলি, বলিবৎস অর্থাৎ বল্লভাচার্য্য, প্রভৃতি। বল্লভাচাৰ্য্য পুত্ৰ আকাই, কেশাই, দনাই।...কেশাই গেলেন নকৈড়...। কেশাইর পুত্র খেথাই পুত্র আমুয়াই, মাধাই, প্রভৃতি। (১৬৪ পৃঃ)

মাধাইর পুত্র **নরপতি, মহামিশ্র,** বারকড়ি, নিত্যানন্দ মিশ্র, তরুণ। মহামিশ্র পুত্র সর্ব্বানন্দ, গোঁসাই মিশ্র, **প্রগর্ভ ভট্ট,** রঘুপতি, মুকুন্দ। (১৬৬ পৃঃ)

প্রগর্ভ ভট্টের পুত্র রামচন্দ্র আং, শ্রীকণ্ঠ, হরিভট্ট। (১৬৭ পৃঃ)

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে (১২৩ পৃঃ) এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণখণ্ডে (২২৪ পৃঃ) সংক্ষিপ্তাকারে এই বংশাবলী মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মহামিশ্র এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যাপতির নাম পাওয়া যায়। লঘুভারতকার এই বিদ্যাপতির বংশধর ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংগৃহীত কুলপঞ্জীর মধ্যে আমরা লাহিড়ীকুলের এক খণ্ড বংশাবলী এবং পৃথক্ "করণ"-গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি (২১৬৪এ—'গ' এবং 'ঘ' পুথি)। কুলশাস্ত্রদীপিকার সহিত তুলনার জন্য এখানে কুলক্রিয়া সহ প্রয়োজনীয় অংশ অবিকল উদ্ধৃত হইল[৪] :—

লাড়িকুলের বংশাবলী লিক্ষতে।

লোকনাথ হইলা লাহিড়ি। লোকনাথ পুত্র ভুতনাথ পুত্র দিগাম্বর পুত্র ভুগর্ভ পুত্র বেদগর্ভ পুত্র সোনাতন পুত্র টুটুওঝা পুত্র হলি বলি বৎস্য সোম দিবাকর। বল্লভ আং হইলা কুলিন। (কু॰ উদনা-চার্য্যভা॰ 'গ' গ্রন্থের ১ক পত্র) পুত্র আকাই কেসাই দনাই। কেশাইর বংশ নকড়ি। (কু॰ পসুপতি ভা॰) কেসাইর পুত্র শ্রীনারায়ণ তস্য নাম খেথাই (কু॰ সিকাই সাং তপস্যভুবনা মৈ॰ ইসান ওঝা ঝায়াল মধুয়াই মৈ॰)

পুত্র আমুআই মাধাই কবাই শ্রীবৎসাই সারঙ্গাই প(ক্ষে) ইসান দামোদর। (মাধাইর কু॰ নন্দাই মৈ॰ আন্দাই মৈ॰ ডাকুয়াই কালিয়াই—'গ' ১৭ক পত্র) মাধাইর পুত্র (১২ক পত্রে) বাড়কৈড় সভানন্দ-নিত্যানন্দতরুন পক্ষে **নরপতি মহামিশ্র**।

মহামিশ্রের কুলক্রিয়া :—(১৭ ক—খ পত্রে, 'গ' পুস্তক)

"ধবাই সা॰ উমাপতি কুদিপুখরিয়া চকাই সা॰ বিক্কাই মৈ॰ পিথাই ভা॰ সরবানন্দ মিশ্র সাতটা মহেশ

৪। ঢাকা পুথিশালার কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বিশেষতঃ পুথিশালাধ্যক্ষ সুযোগ্য শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এর নিকট আমরা বিশেষভাবে ঋণী। তাঁহার সাহায্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতিরেকে এই প্রয়োজনীয় পুথি দেখা অসম্ভব হইত।

সা' মহেশ্বরাব (?) সা' সুলপানি মৈ' সুলপানি সা' উপলিসর বাসুদেব পাঠ(ক) সা' শ্রীনিবাষ মৈ' বৈষ্ণব মিশ্র সা' জগাই রুম্বি (?) ত্রিলক্ষনাথ মৈ' মধ্যগ্রাম। মহামিশ্রর পুত্র বিদ্যাপতি মিশ্র, সর্ব্বানন্দ মিশ্র, গোসাই মিশ্র, রঘুপতি, **প্রগৃ(ভ)ভট্ট** (কু' বিজয় গুড়নৈই বৎস্য সা'), মুকুন্দ"।

উদ্ধৃত তিনটি বংশাবলীতেই কুলশাস্ত্রসুলভ বর্ণাশুদ্ধিবশতঃ প্রগল্ভ নামই প্রগর্ভ, প্রগৃভ এবং প্রগভ ('গ' পুস্তকের পাঠ) রূপে লিখিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। 'গ' চিহ্নিত করণ-গ্রন্থটির লিপিকাল ১১৯৫ সাল—ইহাতে উল্লিখিত কুলক্রিয়ার বিবরণ হইতে অনেক মূল্যবান্ বস্তু পাওয়া যাইতেছে—যাহা কুলশাস্ত্র-দীপিকায় মুদ্রিত হয় নাই। বল্লভাচার্য্য লাহিড়ী বংশের আদি কুলীন এবং তাঁহার সহিত সুবিখ্যাত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর কুলক্রিয়া হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা উভয়ে সমসাময়িক। নরপতি মহামিশ্রের নাম কুলশাস্ত্রদীপিকায় বিচ্ছেদচিহ্ন সহ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা অনবধানতা-প্রযুক্ত সন্দেহ নাই। কুলগ্রন্থানুসারে তিনি আদি কুলীন বল্লভাচার্য্যের অধস্তন ৫ম পুরুষ এবং তাঁহার মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার কুলক্রিয়ার বিস্তৃত বর্ণনা হইতে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, তিনি তৎকালীন বারেন্দ্রসমাজের অতি শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন। প্রগল্ভ ভট্টের তিন পুত্রের নাম ব্যতীত কুলশাস্ত্রদীপিকায় তাঁহার অধস্তন বংশাবলী মুদ্রিত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত হস্তলিখিত 'ঘ' পুস্তক হইতে তাঁহার বংশাবলী প্রকাশিত করিতেছি—বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধর কেহ কোথাও বিদ্যমান আছেন কি না, তদ্বিষয়ে গবেষণা হওয়া আবশ্যক।
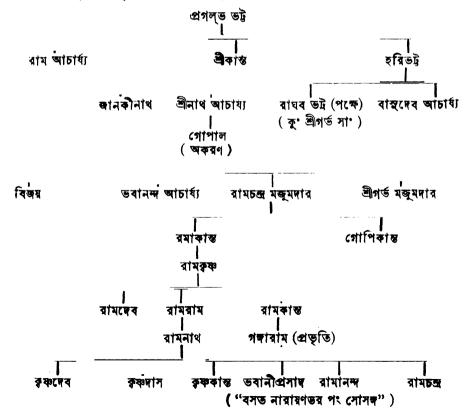
চিন্তামণিব্যাখ্যা ও খণ্ডনদর্পণ ব্যতীত প্রগল্‌ভাচার্য্য অন্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। নবদ্বীপগৌরব জগদীশ তর্কালঙ্কারের বংশসম্ভূত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের বাড়ীতে হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের বিরাট্ সংগ্রহ বিদ্যমান আছে—এত পুথি এক বাড়ীতে আমরা কোথাও দেখি নাই। অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তাঁহার নিকট রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে একটি অজ্ঞাত গ্রন্থের আদ্যন্তহীন কতিপয় পত্র (৮৮-১০৪) আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম; "পরমাণুবাদ" প্রকরণের এক স্থলে পাওয়া গেল,—

"প্রগল্‌ভাস্তু কামিনীচরণসংযোগধ্বংসজন্যাশোকপুষ্পে ব্যভিচারবারকমেতৎ—তদপি তুচ্ছং।" (১০৩খ পত্র)

সম্প্রতি নবদ্বীপ পাবলিক লাইব্রেরির সংগৃহীত পুথি মধ্যে আকস্মিক ভাবে প্রগল্‌ভরচিত "**দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশটীকা**"র প্রায় সম্পূর্ণ একটি প্রতিলিপি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা তাড়িপত্রে লিখিত (৩৫৪ সংখ্যক পুথি), পত্রসংখ্যা ১৬৪ (একটি পত্র, ১৬৩, নাই), প্রতি পত্রে পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা ৬।[৫]

গ্রন্থারম্ভ যথা,—

নত্বা নারায়ণন্দেবং মাতরঞ্চ সরস্বতীং।
আচার্য্য শ্রীপ্রগল্‌ভেন জাহ্নবীগর্ভসম্ভুবা।
পিতুর্ন্নরপতের্ব্যাখ্যাং হৃদি কৃত্বা পুনঃ পুনঃ।
দ্রব্যে চ তদুপায়ে চ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিরুচ্যতে।

গ্রন্থশেষে পুষ্পিকা নাই এবং লিপিকারের লিখিত অংশের অনেক অক্ষর মুছিয়া গিয়াছে। যথা,—

"লসং ৩৮৬ আশ্বিনস্য শু··· (উপা)ধ্যায়শ্রীমদ্ধরিকেশেন লিখিতৈষা পুস্তিকেতি।"

৩৮৬ লক্ষণসম্বৎ তৎকালপ্রচলিত গণনানুসারে ১৪৯৩-৪ খ্রীষ্টাব্দ হইবে; সুতরাং ইহাই প্রগল্‌ভরচিত গ্রন্থের প্রাচীনতম প্রতিলিপি সন্দেহ নাই। গ্রন্থমধ্যে বহু স্থলে স্বরচিত চিন্তামণি টীকার ৩ খণ্ডের দোহাই দেওয়া আছে। তিনি যে গুণগ্রন্থের উপরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়: যথা,—

"কর্ম্মবতি যথা ন কর্ম্মোৎপদ্যতে তথা গুণোপায়প্রকাশে বক্ষ্যতে।"—(১৬০খ পত্র)

গ্রন্থকার যে বাঙ্গালী ছিলেন, এক স্থলে তাঁহার ব্যাখ্যা হইতে তাহা অনুমান করা যায়। কিরণাবলীর মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের ব্যাখ্যায় "উপায়"কার বর্দ্ধমানোপাধ্যায় রাত্রিপদের লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"নিরস্তৈতদ্দ্বীপবর্ত্তিরবিরশ্মিজালস্য কালবিশেষস্য রাত্রিত্বাৎ" (কিরণাবলী, সোসাইটি সং, ২ পৃঃ) রুচিদত্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"দ্বীপশ্চাত্র ভারতো বর্ষো বিবক্ষিতঃ।"

বস্তুতঃ উদ্ধৃত লক্ষণ "অন্ধকার" প্রকরণে উদয়নাচার্য্য স্বয়ংই লিখিয়া গিয়াছেন (কিরণাবলী,

৫। নবদ্বীপ লাইব্রেরির সুযোগ্য বহুদর্শী সম্পাদক শ্রীযুত জনরঞ্জন রায় মহাশয়ের নিকট আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

১০৪ পৃঃ) এবং তৎস্থলে বর্দ্ধমানও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"দ্বীপোত্র ভারতং বর্ষং"। এই সাম্প্রদায়িক মতের বিরুদ্ধে প্রগল্‌ভের টীকা উল্লেখযোগ্য :—

অত্র দ্বীপে কঃ কালবিশেষো রাত্রিপদবাচ্য ইতি প্রশ্নে এতল্লক্ষণং। তথা চ, এতদ্দ্বীপবিনষ্টসম্বন্ধ-প্রাগভাবকরবিরশ্মিসমূহবালসূর্য্যাধিকরণং কালো রাত্রিরিত্যর্থঃ। **এতদ্দ্বীপপদং বিশিষ্য গৌড়-দেশপরং** ন চানমুগমঃ লক্ষ্যাণামপ্যাসন্নগতত্বাৎ, এবঞ্চ তত্তদ্দেশগর্ভে তত্তদ্রাত্রিলক্ষণং বোধ্যং। যত্তু, ভারতভূমিপর(মিতি তন্ন) উৎকলদেশে একদণ্ডরাত্রৌ রাত্রিদণ্ডদ্বয়ে বাহ্যব্যাপ্তেঃ, তদা কামরূপাদৌ সূর্য্যরশ্মিসত্বাৎ তত্র জ্যোতিঃশাস্ত্রস্য প্রমাণত্বাৎ।" (১-২ পত্র)

সম্ভবতঃ রুচিদত্ত প্রগল্‌ভের মতই 'কেচিত্তু' বলিয়া কিছু পরিবর্ত্তিতাকারে উল্লেখ করিয়াছেন (কিরণাবলী, ৩ পৃঃ)। প্রগল্‌ভাচার্য্য মৈথিল হইয়া থাকিলে কখনও উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিতেন না।

প্রগল্‌ভাচার্য্যের কালনির্ণয় বিচারসাপেক্ষ। আমরা সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি। "খণ্ডনদর্পণ" গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রের উল্লেখ থাকায় প্রগল্‌ভ তাঁহার কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন ধরা যায়। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে শঙ্কর মিশ্রের অভ্যুদয়কাল খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর ২য় ও ৩য় পাদ (১৪২৫-৭৫ খৃঃ)।[৬] ১৪১০ শকেও তিনি জীবিত ছিলেন। কারণ, ঐ বৎসর তাৎপর্য্যটীকার এক প্রতিলিপি—"সর্ষপগ্রামে মহামহো-পাধ্যায়-সন্মিশ্র-শ্রীমচ্ছঙ্করাণাং চৌপাড্যাং গৌড়ীয়াম্বষ্ঠশ্রীমদ্‌বাসুদেবেন" লিখিত হইয়াছিল।[৭] নব্যবর্দ্ধমানের অধ্যাপক বিধায় শঙ্কর মিশ্রের গ্রন্থরচনার কাল ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে নহে ধরা যায় এবং প্রগল্‌ভের অভ্যুদয়কালও তাহার পূর্ব্বে নহে ধরিতে হইবে।

অপর পক্ষে, প্রগল্‌ভাচার্য্য বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বয়োজ্যেষ্ঠ, সমসাময়িক ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমরা প্রবন্ধান্তরে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের চিন্তামণি ব্যাখ্যার বিবরণ প্রদান করিয়াছি।[৮] এই টীকার আদ্যন্তহীন একমাত্র নাগরাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপি কাশীর সরস্বতী-ভবন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। সার্ব্বভৌম "ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব" প্রকরণে একটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"**উক্তামাস্তু** সাধ্যাভাববতি যদ্‌বৃত্তৌ প্রকৃতানুমিতিবিরোধিত্বং নাস্তি তত্ত্বং লক্ষণমাহুঃ, তন্ন⋯" ইত্যাদি। (সরস্বতীভবনস্থ ন্যায়বৈশেষিক ২৮০ সং পুথির ১৪ক পত্র)।

রঘুনাথ শিরোমণিও "অনুমানদীধিতি" গ্রন্থে অবিকল এই ব্যাপ্তিলক্ষণই 'যত্তু' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং একমাত্র মথুরানাথ তর্কবাগীশ ব্যতীত দীধিতির সমস্ত টীকাকারগণ ইহা প্রগল্‌ভের তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মথুরানাথের মতে উহা বিশারদের লক্ষণ :—

৬। J. A. S. B., 1915, pp. 270 & 395.
৭। H. P. Sastri : *Darbar Library Cat.* (1905), p. 49.
৮। I. H. Q., XVI., pp. 63-64.

"বিশারদলক্ষণমুপন্যস্য দূষয়তি যত্ত্বিত্যাদিনা।"[৯]

কিন্তু মথুরানাথের উক্তি সম্প্রদায়বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য, আর সার্ব্বভৌমও 'উত্তানাস্ত' বলিয়া নিজপিতৃদেবের উপর কটাক্ষ করিতে পারেন না, বিশারদ পদে যদি তাঁহার পিতাকেই বুঝাইয়া থাকে। উত্তান পদে সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর কটাক্ষ সূচিত হয় এবং প্রগল্‌ভ, সার্ব্বভৌমের প্রথম অভ্যুদয়কালে রচিত নব্যন্যায়গ্রন্থে উল্লিখিত হওয়ায় আমরা অনুমান করিতে পারি যে, প্রগল্‌ভের গ্রন্থরচনার কাল ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে যাইবে না। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য-কিরণাবলীপ্রকাশ টীকার লিপিকালদ্বারাও ইহা সমর্থিত হয়—ঐ টীকা চিন্তামণি টীকার পরে লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং আপাততঃ প্রগল্‌ভাচার্য্যের গ্রন্থরচনার কাল আমরা ১৪৬০-১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ণয় করিলাম।

কুলশাস্ত্রের বিবরণের সহিত এই কালনির্ণয়ে বিরোধ ঘটে না। বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রে লেখা আছে, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কুল্লুক ভট্টাদির সহিত একযোগে কৌলীন্য ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন :—

স এবোদয়নাচার্য্যো বৌদ্ধবিধ্বংসকৌতুকী।
কুল্লুকং ভট্টমাশ্রিত্য ভট্টাখ্যং ময়ূরস্তথা।
মঙ্গলোঝেতি বিখ্যাতং শ্রোত্রিয়ং শুদ্ধবংশজং।
কুলগৌরবরক্ষার্থং কৃতবান্ কুলীনেষু চ।
করণং পরিবর্ত্তঞ্চ তিলকং শ্রোত্রিয়েষু চ। (গৌড়ে ব্রাহ্মণ ধৃত, ১০৪ পৃ.)

লঘুভারতকারের মতে কুল্লুক ভট্ট উদয়নাচার্য্যের ছাত্র ছিলেন :—

ছাত্রৈঃ কুল্লুকভট্টাদ্যৈঃ সহ তীর্থেষু পর্য্যটন্।
ব্যচারীত্তাহিরপুরে বৌদ্ধনিগ্রহহেতবে।
স এবোদয়নাচার্য্যশ্চিকায় কুসুমাঞ্জলিং।
তীর্থপর্য্যটনে লব্ধং তস্মাদ্ গৌড়ে প্রচারিতং।
(লঘুভারত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬০-৬১)

লঘুভারত গ্রন্থে এত কল্পিত বস্তু স্থানলাভ করিয়াছে যে, ইহার উক্তির প্রামাণ্য অন্যান্য গ্রন্থের সমর্থন ব্যতিরেকে গ্রহণীয় নহে। পূর্ব্বোক্ত কুলগ্রন্থের উক্তির সহিত এখানে সামঞ্জস্য থাকায় উদ্ধৃত হইল। কুল্লুক ভট্টের আবির্ভাবকাল বর্ত্তমানে অনেকটা নিশ্চিত—চণ্ডেশ্বর রাজনীতিরত্নাকর গ্রন্থে[১০] তাঁহার মনুটীকার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং কুল্লুক ভট্ট ও উদয়নাচার্য্যকে খৃঃ ১৩শ শতাব্দীর শেষ পাদে স্থাপন করা যায় এবং উদয়নাচার্য্যের সম্মানভাজন কুলীনাগ্রগণ্য বল্লভাচার্য্যের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ প্রগল্‌ভাচার্য্যও ১৫শ শতাব্দীর

৯। অনুমানদীধিতির মাথুরী টীকা দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ইহার পূর্ব্বখণ্ডের (সামান্যাভাব পর্য্যন্ত) এক প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। (সংস্কৃত ১০৩৮ সংখ্যক পুথি)—ব্যাপ্তিবাদের ৪৩ক পত্র দ্রষ্টব্য।

১০। রাজনীতিরত্নাকর, ২য় সং, (পাটনা,) পৃঃ ২।

পরার্দ্ধে স্থাপিত হইতে পারেন। কুলগ্রন্থানুসারে বল্লভাচার্য্য উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (গৌড়ে ব্রাহ্মণ, পৃ. ১৫৫)

বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং রঘুনাথ শিরোমণি ব্যতীত অন্ততঃ দুই জন মৈথিল মহা-নৈয়ায়িক প্রগল্‌ভের বচন স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। দ্বারভাঙ্গা রাজবংশের আদি পুরুষ মহেশ ঠক্কুর-রচিত "আলোকদর্পণ" গ্রন্থের প্রত্যক্ষখণ্ডে কতিপয় স্থলে প্রগল্‌ভের উল্লেখ আছে। যথা,—

"শ্রীপ্রগল্‌ভস্তু উভয়বাদিসিদ্ধং প্রামাণ্যগ্রাহকত্বং যদাস্তদ্ভিন্না
যাবতী জ্ঞানগ্রাহিকা সামগ্রী তদ্‌গ্রাহ্যত্বং স্বতস্ত্বমিত্যাহ।" ১১

এই মহেশ ঠক্কুরের ভ্রাতা ভগীরথ বা মেঘ ঠক্কুরও বিখ্যাত টীকাকার বটেন এবং পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন। এতদ্ভিন্ন মহানৈয়ায়িক পদ্মনাভ মিশ্র প্রশস্তপাদভাষ্যের "সেতু" টীকায় এবং "কিরণাবলীভাস্করে" প্রগল্‌ভ ভট্টাচার্য্যের মত উল্লেখ করিয়াছেন। পদ্মনাভের পিতা বলভদ্র মিশ্র প্রগল্‌ভের ছাত্র ছিলেন।[১২]

বাঙ্গালার নৈয়ায়িক-সমাজের চিরপ্রচলিত প্রবাদ যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌমই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম নব্য ন্যায়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাসুদেবের পূর্ব্বগামী প্রগল্‌ভাচার্য্য তাঁহার পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়া পিতার ব্যাখ্যানুসারেই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং মৈথিল গ্রন্থকারগণও নামোল্লেখপূর্ব্বক যে ভাবে প্রগল্‌ভের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং কেহ কেহ তাঁহার শিষ্যত্বও স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অনুমান হয় যে, গঙ্গেশের সময় হইতেই নব্য ন্যায়ের চর্চ্চায় গৌড়-মিথিলার মধ্যে আদান-প্রদান চলিয়াছে, যদিও সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকরূপে মৈথিল পণ্ডিতদের প্রভাব স্বতঃসিদ্ধ ছিল।

১১। কাশীর সরস্বতীভবনস্থ ন্যায়বৈশেষিক ৩০১ সং ও ৩৫১ সং পুথির যথাক্রমে ৪২খ ও ৪৩-৪৪ পত্র দ্রষ্টব্য। ৩০১ সং পুথির পরিচয়লিপি "মাহেশী আলোকটীকা" কাটিয়া অনবধানতাবশতঃ 'প্রত্যক্ষমণিমাহেশ্বরী' লিখিত হওয়ায় অমূলক কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে যে, ইহা সার্ব্বভৌম-পিতা মহেশ্বর বিশারদ-রচিত।

১২। কিরণাবলীভাস্কর, Introd. p. 6. পদ্মনাভ মিশ্রের অভ্যুদয়কাল খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ পাদ বলিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় নির্ণয় করিয়াছেন। *Ibid*, p. 9.

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৩

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তকাধ্যক্ষ

প্রতিষ্ঠাকাল হইতে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে একটি পুস্তকাগার ছিল। এই পুস্তকাগারে মুদ্রিত পুস্তক ছাড়া হস্তলিখিত বহু মূল্যবান্ পুথিও সংগৃহীত হইয়াছিল। এখনকার ন্যায় তখনও পুস্তকাগারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক জন পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিলেন। খ্যাতনামা পণ্ডিতেরাই এই পদে নিযুক্ত হইতেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার

১৮২৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভ হয়। ১১ই জানুয়ারি তারিখ হইতে মাসিক ৬০৲ বেতনে লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

লক্ষ্মীনারায়ণের পিতার নাম গদাধর তর্কবাগীশ। গদাধর ১৮০৫ সনের নবেম্বর মাসে *ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের এক জন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।* ২১ মে ১৮৩০ তারিখ হইতে তাঁহাকে মাসিক ৫০৲ পেন্সন দিবার ব্যবস্থা হয়, এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর। পেন্সনের টাকা তিনি কটক কালেক্টরীর খাজানাখানা হইতে মাসে মাসে লইবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল।* ইহা হইতে মনে হয়, গদাধর উৎকল-নিবাসী ছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ ১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তাহার পর তিনি পূর্ণিয়া জেলা-আদালতের জজ-পণ্ডিত হন। তিনি এই পদে অনেক দিন যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়াছিলেন। ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এক জন পত্রপ্রেরক লেখেন :—

> শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পণ্ডিত ন্যূনাধিক দশ বৎসর হইল পূরণিয়া জিলায় থাকিয়া পাণ্ডিত্য ও মুনসেফী ও সদর আমিনী এই তিন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করত অধিকন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমাও অপক্ষপাতিত্বরূপে অনেক নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন কিন্তু কেবল সদর আমীনের বেতন মাত্র প্রাপ্ত হন…।

লক্ষ্মীনারায়ণ স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নহে; আমরা যতগুলির সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে তাহাদের তালিকা দিলাম :—

(১) **দায়াধিকারিক্রমসংগ্রহকৌমুদী**। ১৮২২ সন। (সংস্কৃত শ্লোক ও পয়ারে বঙ্গানুবাদ সহ)

* Proceedings of the College of Fort William.—*Home Dept. Miscellaneous No. 571,* p. 49.

(২) **মিতাক্ষরা দর্পণ।** ১৮২৪। পৃ. ৪৩৬।

(3) *Daya Krama Sangraha,* A Compendium of the Order of Inheritance, by Krishna Terkalankara Bhattacharya. *Daya Tatwa,* a Treatise on the Law of Inheritance, by Raghunandana Bhattacharya. *Vyavahara Tatwa,* A treatise on Judicial Proceedings, by Raghunandana Bhattacharya. 1828.

তিনখানি পুস্তক একত্রে বাঁধা ও প্রকাশিত। সমগ্র অংশ দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত।

(4) *Dayabhaga,* or Law of Inheritance, by Jimutavahana, with a commentary by Krishna Terkalankara. 1829.

(5) *The Mitakshara:* A Compendium of Hindu Law; by Vijnaneswara. Founded on the text of Yajnawalkya. The Vyavahara Section, or Jurisprudence. 1829.

(৬) **হিতোপদেশ।** ১২৩৭ সাল (= ১৮৩০)। পৃ. ৫১৪।

শ্লোকগুলি দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত; বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ-সম্বলিত।

(৭) **ব্যবস্থারত্নমালা।** ১৭৫২ শক (= ১৮৩০)। পৃ. ১৩০।

(৮) **কবিকল্পদ্রুম।** বোপদেবকৃত ধাতুপাঠঃ দুর্গাদাসকৃতা ধাতুপাঠদীপিকা চ। ১৭৫২ শক, ২ পৌষ।

(৯) **কবিরহস্যং**—হলায়ুধ। ১৭৫২ শক।

(১০) **ব্যবহার বিচার শব্দাভিধান।** সম্বত ১৮৯৫, আষাঢ় ১০ (= ১৮৩৮), পৃ. ৩৬।

"ব্যবহার বিচারোপযোগি পারস্য শব্দের সাধুগৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদ।"

১৮৩০ সনের মাঝামাঝি লক্ষ্মীনারায়ণ 'শাস্ত্রপ্রকাশ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে কেবল শাস্ত্রীয় আলোচনাই স্থান পাইত। ১৮৩১ সনের মার্চ মাসে তিনি পূর্ণিয়া আদালতের জজ্‌-পণ্ডিত হইলে 'শাস্ত্রপ্রকাশে'র প্রচার বন্ধ হইয়াছিল। 'শাস্ত্রপ্রকাশ' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থের ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মাধব রাও

চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের শূন্য পদে তাঁহার সহকারী মাধব রাও, এবং চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন যুগ্ম-পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উভয়েরই বেতন মাসিক ৩০৲ হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ১৬ মার্চ ১৮৩১ তারিখে কর্ম্মে যোগদান করেন। এই প্রসঙ্গে ১১ মার্চ ১৮৩১ তারিখে লিখিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী প্রাইস সাহেবের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি:—

The Secretary of the Sanskrit College begs to apprize the Committee that Lakshminarayan, the Librarian of the Institution, has been appointed Law Pundit of the Zillah Court of Purneah.

In order to supply the vacancy thus occasioned in the establishment, the Secretary would propose that Madhava Rao, the present assistant Librarian, and one of the former pupils of the College, who has passed through it with credit Chaturbhuja, be appointed Joint Librarians the salary of the Librarian being divided equally between them or 30 Rupees a month each.

11 March 1831.

Wm. Price
Secretary.

চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের নিবাস আটপুর; তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। ২ মার্চ ১৮২৯ তারিখে সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনি যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, তাহাতে প্রকাশ, তিনি কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঁচ বৎসর স্মৃতিশাস্ত্র রীতিমত ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন ৬ এপ্রিল ১৮৩৬ তারিখ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে সংস্কৃত কলেজে যুগ্ম-পুস্তকাধ্যক্ষের পদ লোপ পায় এবং মাধব রাওই পুস্তকাধ্যক্ষ থাকেন।

মাধব রাও সংস্কৃত কলেজের এক জন প্রাক্তন ছাত্র। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর একখানি পত্রে (১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২) তাঁহার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রে প্রকাশ:—

...his general knowledge of Sanscrit books and his particular acquaintance with the various alphabets of India are best known to you. His former good conduct under Colonel Mackenzie and since he has been employed in the College, his great age, and the miserable dissoluteness to which he would find himself reduced by the loss of his situation far from his native place which is Tellicherry on the Malabar Coast ...

মাধব রাও অনেক দিন পুস্তকাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ৭ জুলাই ১৮৪৪ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নীলমাধব শর্ম্মা

মাধব রাওয়ের স্থলে ১ আগষ্ট ১৮৪৪ তারিখ হইতে নীলমাধব শর্ম্মা মাসিক ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১ আগষ্ট ১৮৪৪ তারিখে লিখিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্তের পত্রে প্রকাশ:—

F. J. Mouat Esq.
Secy. to the Council of Education.

Sir,

I beg to report that in conformity to the orders of the Council of Education Nilmadhav Sarmana has been this day appointed Librarian of

the Sanscrit College in the room of Madhavam Rao deceased, on a salary of thirty Company's Rupees per month. I have etc.
Calcutta Sanscrit College, Russomoy Dutt,
The 1st August 1844. Secy. Sanskrit College

নীলমাধব অল্প দিনই এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্ত্তী ৯ই নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

নীলমাধব শর্ম্মার মৃত্যু হইলে তাঁহার শূন্য পদে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১৬ই নবেম্বর ১৮৪৪ তারিখে মাসিক ৩০৲ বেতনে পুস্তকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। তিনি এই প্রতিষ্ঠান হইতে যে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাশ :—

....Dwarakanath Vidyabhusan ... studied for twelve years seven months .... Grammar, Belles-lettres, Rhetoric, Arithmetic, Logic, Theology, Law and English .... "On quitting the College he held a Senior Scholarship of the first grade. He left the College in January 1844.
Fort William
1st January 1845.

১৩ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখ পর্য্যন্ত গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে কাজ করিবার পর দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

দ্বারকানাথের পর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে মাসিক ৩০৲ বেতনে গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের এক জন প্রাক্তন ছাত্র।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে ২৪-পরগণার অন্তঃপাতী রাজপুর গ্রামে গিরিশচন্দ্রের জন্ম হয়। কলিকাতায় তাঁহার পিতা রামধন বিদ্যাবাচস্পতির চতুষ্পাঠী ছিল। গিরিশচন্দ্র ৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পিতার নিকট আগমন করেন। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বিদ্যাবাচস্পতির চতুষ্পাঠীতে আসিয়া নানা গল্প করিতেন।* তাঁহারই প্রস্তাবে বিদ্যাবাচস্পতি গিরিশচন্দ্রকে

* গিরিশচন্দ্র স্বরচিত "বাল্যজীবনে" তর্কবাগীশ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"হালিসহর—কুমারহট্ট-নিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ব্যাকরণশাস্ত্রের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন।··· গঙ্গাধর ৪০৲ টাকা বেতন পাইতেন এবং কলিকাতা সিমুলিয়া শিবচন্দ্র দাসের গলির ভিতর একখানি ক্ষুদ্র বাটী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার

সংস্কৃত কলেজে পাঠ করিতে দেন। এই প্রতিষ্ঠানে ১২ বৎসর ৫ মাস রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া গিরিশচন্দ্র যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, তাহার অনুলিপি দিতেছি :—

No. 125

Government Sanscrit College of Calcutta

We hereby certify that Greesh Chunder Bedyaratna has attended at the Government Sanscrit College for 12 years 5 months and studied the following branches of Hindoo Literature Grammar, Belles-lettres, Rhetoric, Arithmetic, Logic, Theology and Law, that he has attained considerable proficiency on the subject of these studies and that he conducted himself well. On quitting the College he held the Senior Scholarship of 2nd grade and was adjudged entitled to a first grade Senior Scholarship at the time of quitting the College in January 1844.

Fort William
1st Jany. 1845.

C. H. Cameron
F. Millett
Charles C. Egerton

James Alexander
F. J. Mouat
Raja Radhakanta Deb
Russomoy Dutt.

Members Council of Education.

Russomoy Dutt
Secretary.

১৮৫১ সনের জুন মাস হইতে গিরিশচন্দ্র পঞ্চম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গিরিশচন্দ্র ৩৭ বৎসর ১১ মাস ১৮ দিন সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার চাকুরি-জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিতেছি :—

পদ	বেতন	কার্য্যকাল
পুস্তকাধ্যক্ষ ও ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক	৩০৲	১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫—১১ নবেম্বর ১৮৫১
৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক	৪০৲	১২ নবেম্বর ১৮৫১—১৪ জুন ১৮৫৫
৩য় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক	৪৫৲	১৫ জুন ১৮৫৫—৩১ মার্চ ১৮৬০
২য় ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক	৫০৲	১ এপ্রিল ১৮৬০—১১ জুন ১৮৬৩
ঐ	৬০৲	১২ জুন ১৮৬৩—২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪
সংস্কৃত, অলঙ্কার ও ব্যাকরণের অধ্যাপক	৭৫৲	২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪—২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬
ঐ	৮০৲	১ মার্চ ১৮৬৬—৩০ জুন ১৮৭৩
সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক	১০০৲	১ জুলাই ১৮৭৩—১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
সংস্কৃত-সাহিত্য ও ব্যাকরণের অধ্যাপক	১৫০৲	২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪—৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২

৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখ পর্য্যন্ত চাকরি করিয়া গিরিশচন্দ্র পর-বৎসরের ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখ হইতে পেন্সন গ্রহণ করেন। তাঁহার পেন্সনের পরিমাণ ছিল ৭৫৲ টাকা। ৩ ডিসেম্বর ১৯০৩ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পুত্র গোবিন্দ বাস করিতেন। ঐ গোবিন্দ সংস্কৃত কালেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ১২ বৎসরের পর শিরোমণি উপাধি পাইয়া তৎকালে স্থাপিত জেলা হুগলীর কালেজে পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।"—'৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবন-চরিত'—হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (১৯০৯), পৃ. ৯।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৬ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৭৯-৮০) আলোচনা করিয়াছি।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অল্প দিন পরে ১৩০৯ সনে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিতার যে 'জীবন-চরিত' প্রকাশ করেন, তাহাতে "পিতৃদেবের গ্রন্থ" সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

সংস্কৃত কালেজে চাকরি করিবার সময় পিতৃদেব কতকগুলি সমস্যা পূরণ করিয়াছিলেন। ঐগুলি "সমস্যাকল্পলতা" নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।…

পিতৃদেব কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কতকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষা হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, আর কতকগুলি গ্রন্থ টীকাসমেত প্রকাশ করিয়াছেন। ইং ১৮৫২ সালে মল্লিনাথ-কৃত সঞ্জীবনীটীকাসমেত সমগ্র "রঘুবংশ" প্রকাশিত করেন…। পরে ইং ১৮৫৬ (সন ১২৬৩) সালে আশ্বিন মাসে সংস্কৃত দশকুমার-চরিতের বঙ্গানুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন। "বিধবা বিষম বিপদ" নামে একখানি ক্ষুদ্র নাটক—বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময় বিধবাবিবাহ-প্রচলনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সেই সময়—(ইং ১৮৫৮ সালে) রচনা করেন। পরে ইং ১৮৬০ (১৭৮২ শাক) সালে বৈশাখ মাসে "শব্দসার" নামক একখানি ব্যুৎপত্তিযুক্ত সংস্কৃত-বাংলা অভিধান প্রকাশ করেন। "উৎকর্ষবিধান" নামে একখানি বালকপাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তক ইং ১৮৭০ (সন ১২৭৭) সালে শ্রাবণ মাসে প্রণয়ন করেন। ইং ১৮৭১ সালে জানুয়ারি মাসে "মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ" সরল টীকা, পদান, শব্দ ও ধাতুসাধন এবং পাণিন্যাদি ব্যাকরণের সূত্রোল্লেখসমেত প্রকাশ করেন। প্রথমশিক্ষার্থী বালকদিগের জন্য "মুগ্ধবোধসার" নামক একখানি ব্যাকরণও ইং ১৮৮০ সালে মে মাসে প্রকাশ করেন। "কাদম্বরী কথা" সরল-টীকা-সম্বলিত উত্তরভাগ ইং ১৮৮৩ সালে অগ্রহায়ণ মাসে ও পূর্ব্বভাগ ১৮৮৫ সালে শ্রাবণ মাসে প্রকাশ করেন। উত্তরভাগটী বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্য হওয়াতে উহা প্রথমেই প্রকাশ করেন। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এল্, এ, পরীক্ষার্থ সংস্কৃত দশকুমার-চরিত হইতে একটী সংগ্রহ করিয়া ইং ১৮৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত করেন। উহা চারি বৎসর পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকে।…

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, পিতৃদেবের চক্ষুতে ছানি পড়িয়াছিল। পরে যখন তিনি চক্ষু পুনর্লাভ করেন, তখন স্বহস্তে ভগবদ্গীতাখানি লিখিয়াছিলেন, এবং "শ্রীকৃষ্ণাষ্টক" নামে ৮টী শ্লোকও রচনা করেন।

পেন্‌সন লইবার পর পিতৃদেব আরও ২খানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ১ম—মনুসার, ২য়—কাশীখণ্ডসার। (পৃ. ৯৬-৯৭)

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পর কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ হন। তিনি ১২ মার্চ ১৮৪৭ তারিখে মাসিক ৪০৲ বেতনে ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বয়স অধিক হওয়ায় তাঁহার দ্বারা পাঠনার সুবিধা হইতেছিল না; এই কারণে ১৮৫১ সালের জুন মাস হইতে তাঁহাকে পুস্তকাধ্যক্ষের পদে বদলি করিয়া, পুস্তকাধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ দেওয়া হয়। এই পরিবর্ত্তনের কয়েক মাস পরে ৮ই নবেম্বর তারিখে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন পরলোক গমন

করেন। সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি-শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনাকালে কাশীনাথ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন

কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলে ১২ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখ হইতে তারাশঙ্কর (চট্টোপাধ্যায়) তর্করত্ন মাসিক ৩০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তারাশঙ্করকে এই পদের জন্য সুপারিশ করিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১০ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

... Tarasankar Sharma be appointed to succeed Pundit Kasinath Tarkapanchanan.

Tarasankar is one of the most distinguished students of the Institution. He left the college in September last completing the full period allowed for study. He held a senior scholarship of the first class for five years and, for the last three years successively, kept the first place in the General list. His character is unexceptionable. In addition to his eminent proficiency in Sanscrit, he possesses a fair knowledge of English literature. When, in June last, the overcrowded state of the Grammar classes required a subdivision of the pupils he was temporarily appointed to take charge of a class and discharged his duties very satisfactorily. Of all the ex-students of the Institution, who are still employed, he is decidedly the best. If the Council be pleased to appoint Tarasankar to the Librarian's post I shall derive great assistance from him.

তারাশঙ্কর সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় তিনি একবার কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া রবার্ট কাষ্ট্ সাহেব-প্রদত্ত ৫০৲ টাকার পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয় ২১ নবেম্বর ১৮৪৫ তারিখে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। এই পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে পরীক্ষক জি. টি. মার্শেল শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লিখিয়াছিলেন :—

F. J. Mouat, Esq.
Secy. to the Council of Education.

Sir,

I have the honor to report for the information of the Council that on the 21 Nov. I examined 10 candidates for the Annual Prize of 50 Rupees given by Mr. [R. N.] Cust to be awarded to the author of the best Sanscrit Poetical Essay.

The subject proposed by me was "What are the advantages and disadvantages of a Town and Country Life and which of the two deserves the preference ?"

Only two of the candidates, Tarasunker and Srish Chunder gave in the prescribed number of verses namely 25. I am of opinion that the Essay of Tarasunker deserves the Prize...

College of Fort William
27 Decr. 1845.

I have the etc.
Sd. G. T. Marshall

তারাশঙ্কর সংস্কৃত কলেজে তের বৎসর রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, নিম্নে তাহার অনুলিপি দিতেছি :—

No. 150

Government Sanscrit College of Calcutta.

We hereby certify that Tarasankar Tarkaratna has attended at the Sanscrit College for thirteen years and studied the following branches of Sanscrit Literature—Grammar, Belles-lettres, Rhetoric, Mathematics, Law and Logic, that he has attained eminent proficiency on the subject of these studies; that he has made fair progress in the English Language and Literature; and that his conduct has been perfectly satisfactory. At the time of leaving the College he held a Senior Scholarship six years.

Fort William
The 9th January 1852.

James Wm. Colville
President, Council of Education.
F. J. Mouat
Secretary, Council of Education
Eshwar Chandra Sharma
Principal.

তারাশঙ্কর ১৪ মে ১৮৫৫ তারিখ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই পদ ত্যাগ করিয়া তিনি মাসিক ১০০৲ বেতনে নদীয়ার সাব-ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন। ১ মে ১৮৫৫ তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ ছাড়া, দক্ষিণ-বঙ্গের অ্যাসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর-অব-স্কুলস-এর পদ লাভ করেন। শহরে ও গ্রামে গ্রামে মডেল স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শন জন্য তাঁহাকে জন-কয়েক সাব-ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল, তন্মধ্যে তারাশঙ্কর তর্করত্ন অন্যতম। তারাশঙ্করের স্থলে সংস্কৃত কলেজে পরবর্ত্তী ১৫ই জুন হইতে জগন্মোহন শর্ম্মা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৫৮ সালে যখন 'কাদম্বরী'র ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখনও তারাশঙ্কর জীবিত। ইহার অল্প দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৬০-৬১ সালের শিক্ষা-রিপোর্টের শেষে, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬০ তারিখে বিদ্যমান শিক্ষা-বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা আছে; এই তালিকায় তারাশঙ্করের নাম পাওয়া যাইতেছে না; সম্ভবতঃ তিনি ইহার পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন।

তারাশঙ্কর বাংলায় এক জন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত যে কয়খানি বাংলা পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম :—

(১) ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা। ১৮৫০।

এই পুস্তিকা সম্বন্ধে ৭ নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্র লেখেন :—

স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক পুস্তক।—শ্রীযুত তারাশঙ্কর শর্ম্মা পণ্ডিত মহাশয় ডেবিড্‌ হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সভার দত্ত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব রচনা করিয়া গত বৎসর শত মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছেন এবং উক্ত সভাহইতে তাঁহার সেই রচনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে উক্ত পুস্তকের এক খণ্ড এপর্য্যন্ত অস্মদাদির হস্তগত না হওয়াতে আমরা তদ্বিষয়ে আপনারদের অভিপ্রায় ব্যক্ত

করিতে পারি নাই সংপ্রতি জনৈক বন্ধুর দ্বারা তাহার এক খানি পাওয়াতে পাঠ করিয়া দেখিলাম পণ্ডিত মহাশয় এতদ্দেশীয় অবলাদিগের সকল প্রকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহারদের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে শাস্ত্র ও প্রাচীন ব্যবহার প্রমাণ দর্শাইয়া শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক ইহা সংস্থাপন করিয়াছেন।...

১৮৫১ সালে এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ৫৮) প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে ইহার এক খণ্ড আছে।

(২) **পশ্বাবলী**। ১৮৫২।

এই পুস্তকখানি প্রথমে ১৮২৮ সালে লসন্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও পীয়র্স কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তারাশঙ্কর কর্ত্তৃক আমূল পুনর্লিখিত হইয়া, এই পুস্তকের একটি সংস্করণ কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি কর্ত্তৃক ১৮৫২ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির ১৬শ কার্য্যবিবরণে (পৃ. ১) প্রকাশ :—

The new edition of Lawson's Animal Biography, in Bengali, re-written by Pandit Tarasankar, appeared in June last,...

(৩) **কাদম্বরী**। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। ১৮৫৪।

পুস্তকে "প্রথম বারের বিজ্ঞাপন"-এর তারিখ "৩রা আশ্বিন, সংবৎ ১৯১১"।

(৪) **রাসেলাস**। ১৮৫৭। পৃ. ২৪২।

পুস্তকে প্রথম বারের "বিজ্ঞাপন"-এর তারিখ "২৫এ ভাদ্র। সংবৎ ১৯১৪।" "ইঙ্গরেজী ভাষায় জনসন প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রাসেলাস গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত"।

শিবচরণের গীতপদ

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া এম্‌-এ, ডি-লিট্

উদাসী শিবচরণের নাম জানে না, এমন কেহ পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা বৌদ্ধসমাজে নাই। এই সমাজের গায়ককুল ও কথকগণ "গেঙ্কুলি" নামে পরিচিত। তাঁহারাই শিবচরণ-রচিত অথবা তাঁহারই নামে প্রচলিত গীতপদগুলি ভক্তিভরে ঘরে ঘরে গান করিয়া তাঁহার অক্ষয় অবদান আজ পর্যন্ত জাগাইয়া রাখিয়াছেন। গীতপদগুলির সংখ্যা সাত বলিয়া জনশ্রুতি থাকিলেও, মাত্র ছয়টাই চাক্‌মা জাতির ইতিবৃত্তলেখক ৺সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সাগ্রহে সংগ্রহ করিয়া সযত্নে তাঁহার পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়াছেন।[১] গীতগুলি সমস্তই "গোজেন" বা "গোঁসাই"-বিষয়ক এবং পালাক্রমে "তান-লয়সমন্বয়ে" গীত হইয়া থাকে। এ সকল গীত গাহিবার রীতি ও অবকাশ সচরাচর "গোজেন লামা" বা "গোঁসাই পালা" নামে সুবিদিত। "গোজেনর লামা"[২] অর্থে "গোঁসাইর (পরমেশ্বরের) স্তোত্র" অভিমত প্রকাশ করিয়া ঘোষ মহাশয় আংশিক ভুল করিয়াছেন। "লামা" শব্দের অর্থ "স্তোত্র" নহে, "পালা"। প্রথম লামার শেষে উক্ত হইয়াছে, "গীত এক লামা পূরেয়ে", দ্বিতীয় লামার শেষে—"গীত দ্বি লামা ফুরেল", তৃতীয়ের শেষে "গীত তিন লামা ফুরেলুং", চতুর্থের শেষে "গীত চার লামা ফুরেই যায়", পঞ্চমের শেষে "গীত পাঁচ লামা ফুরেই যায়", এবং ষষ্ঠের শেষে "গীত ছয়[৩] লামা ফুরেয়ে"। এ স্থলে "গীত এক লামা" অর্থে "গান এক পালা", "গীত দ্বি লামা" অর্থে "গান দুই পালা", "গীত তিন লামা" অর্থে "গান তিন পালা" ইত্যাদি।

গেঙ্কুলি ভেদে গীতগুলির পাঠভেদ হইবারই কথা। মদীয় ছাত্র শ্রীমান্ বিপুলেশ্বর দেওয়ান বি-এ সংগৃহীত পুথিগুলি হইতে পাঠভেদের স্বরূপ ও পরিমাণ পরে বুঝিতে পারা যাইবে। ঘোষ-প্রদত্ত পাঠ হইতে উহাদের ভাষা ও ভাবগত বিশেষত্ব নির্ণয় করা চলে। ভক্ত সাধকের খেদব্যঞ্জক ও মর্মস্পর্শী ভাবগুলি বিভিন্ন আকার ও পদব্যঞ্জনে প্রায় প্রত্যেক গীতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। কাজেই সমস্ত একত্রে মিলাইয়া পড়িলে উহাদের উক্তিগুলি কি হইতে পারে, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। আমরা প্রধানতঃ এ ভাবেই উহাদের যথার্থ বিচার করিতে পারি। উহাদের বিচারের অপর এক প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে—চাক্‌মাসমাজে প্রচলিত এবং প্রায় সমভাবে আদৃত "ধনপতি রাধামোহনের উপাখ্যান", "কির্বাবিবির (কৃপা বিবির) বারমাস" এবং

১। চাক্‌মা জাতি, পৃ. ৩৭০-৭৮।

২। চাক্‌মারা প্রায়ই "গোজেন লামা"ই বলেন, "গোজেনর লামা" নহে।

৩। ঘোষ মহাশয়ের ভুল পাঠ "গীত হয় লামা"। ভুলটী আপাতদৃষ্টিতে ছাপারই।

"উভগীত"[৪] প্রভৃতির সহিত সঙ্গতি স্থাপন করিয়া গীতগুলি হইতে চাক্‌মা জাতির ভাষা, ভাব ও চরিত্রের, আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিচয় লাভ করা। উহাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, উহাদের মধ্যে বাংলার ভাগ্য-বিপর্যয়গ্রস্ত বৌদ্ধ ভাবধারা কি পরিমাণে রক্ষিত আছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আলোচনা করা আবশ্যক, শিবচরণের জীবনী সম্বন্ধে আমরা কি জানি, তাঁহার নামে পরিচিত গীতগুলি তাঁহার স্বরচিত কি না, উহাদের সংখ্যা সাত কিংবা ছয়, উহাদের রচনাকালই বা কত এবং উহারা সর্বাংশে ঠিক কোন্ জাতীয় রচনা?

শিবচরণের জীবনী সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই জানি। তবে যৎকিঞ্চিৎ যাহা জানি, তাহা আমাদের উপস্থিত প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। কথিত আছে যে, চাক্‌মা জাতির "কান্তেই" বা "কান্তী" গোছায় তাঁহার জন্ম হয়। চাক্‌মা "গোছা" জৈন "গুচ্ছ" শব্দেরই অনুরূপ শব্দ। চাক্‌মাদের মূল চারি গোছা কালে নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া একত্রিশ গোছায় পরিণত হয়। কান্তেই বা কান্তী গোছা এই একত্রিশের অন্যতম।[৫]

শিবচরণ আশৈশব উদাসভাবাপন্ন ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের[৬] এরূপ ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহার পিতামাতা চিন্তিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে হইলে বিবাহবন্ধনই পরীক্ষিত উপায় ভাবিয়া তাঁহারা তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। নিরুপায় দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, তাহাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। তিনি তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাবলে কখন কোথায় চলিয়া যাইতেন, কেহ তাহা জানিতে পারিত না। আহারের সময় স্নেহশীলা জননী পুত্রকে কাছে না পাইয়া তাঁহার জন্য ভাতের পুটলীতে আহার্য রাখিয়া দিতেন। দুই তিন মাস পরেও তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলে দেখা যাইত, পুটলীবদ্ধ অন্ন-ব্যঞ্জন বেশ গরম আছে; এমন কি, সদ্য পাক করা অন্নব্যঞ্জনের ন্যায় তাহা হইতে বাষ্প উঠিতেছে। অবশেষে তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগী এবং চিরতরে নিরুদ্দেশ হন। তিনি ঠিক কত বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই এবং ঠিক কত বৎসর জীবিত ছিলেন, তাহা বলা অসম্ভব।

এ স্থলে প্রশ্ন উঠে—প্রচলিত গীতগুলি তাঁহার স্বরচিত হইলে, উহারা তাঁহার জীবনের কোন্ অংশের রচনা? এবং বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় যে, উহারা তাঁহার গৃহত্যাগের পূর্বেরই রচনা। ইহার অনুকূলে এই মাত্র বলা চলে যে, গীতগুলি উদাসভাবব্যঞ্জক ও আক্ষেপসূচক। ইহাদের মধ্যে মানবচিত্ত "জ্ঞানী ধ্যানী" "তপস্বী ধর্ম্মশীল সন্ন্যাসী"র প্রতি আকৃষ্ট এবং গুরুচরণ সেবা দ্বারা কূল পাবার জন্য ব্যাকুল। স্বতঃই মনে হয়, যেন গীতগুলি কোন সিদ্ধাইর বা সিদ্ধ পুরুষের উক্তি অথবা রচনা নহে।

৪। চাক্‌মা জাতি, পৃ. ৩৩৬-৪৪, ৩৪৭-৫১, ৩৭৯-৮০।

৫। চাক্‌মা জাতি, পৃ. ৫৯ ৩৭০।

৬। ঘোষ মহাশয়ের মতে একমাত্র পুত্রের। গৈরিকায় প্রকাশিত জীবনী হইতে জানিতে পারা যায়, শিবচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণের বংশধরগণ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন।

আসল প্রশ্নের এখনও উত্তর দেওয়া হয় নাই। প্রচলিত গীতগুলিকে আমরা নির্বিবাদে উদাসী শিবচরণের স্বরচিত পদ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি? প্রশ্নটী গুরুতর, ইহার সদুত্তর প্রদানও দুষ্কর। ঘোষ মহাশয় গীতগুলিকে সরাসরি শিবচরণের রচনা বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন।[৭] গানের সভায় গায়কগণ সচরাচর যে আকারে ও যে ভাবে পালাগান করেন, ঠিক সে আকারে ও সে ভাবে গীতপদগুলি রচিত। প্রত্যেক পালারম্ভে আছে--নতশিরে এবং অতি বিনীতভাবে প্রধান গায়কের ইষ্টদেবতার চরণবন্দনা, শেষে আছে পালাসমাপ্তিসূচক উক্তি। যদি গীতগুলি এই আকারে শিবচরণেরই রচনা হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে বুঝিতে হয়—আসামের বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেবের ন্যায় শিবচরণ নিজেই গীতপদগুলি রচনা করিয়া গেঙ্কুলিবেশে তাহা গান করিয়া লোকসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ গীতপদগুলির মধ্যে কোথাও উহারা শিবচরণের রচনা বলিয়া দাবী অথবা সঙ্কেত করা হয় নাই। কেবলমাত্র দ্বিতীয় গীতের তৃতীয় চরণে উক্তি আছে—"আগে ছালাম্ দেয় শিবচরণ।" অপরাপর গীতে এ জাতীয় উক্তিতে বচনটী থাকে "ছালাম্ জং", "সেলাম্ দিতেছি।" এ স্থলে "দেয়" পাঠ শুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইলে, উহার অর্থ দেবের পরিবর্ত্তে "দেয়" বা "প্রদাতব্য" মনে করাই সমীচীন। চাক্‌মা "দেয়" শব্দ "দাও" অর্থেও গ্রহণ করা চলে। তাহা এ স্থলে প্রসঙ্গবিরুদ্ধই মনে হয়। শিবচরণ আপাতদৃষ্টিতে শিবের চরণ। অথবা যদি মনে করি, গায়ক উদাসী শিবচরণকে উদ্দেশ করিয়াই প্রণাম জানাইয়াছেন, তাহা হইলে বুঝিতে হয়, প্রচলিত গীতগুলি আদৌ শিবচরণের স্বরচিত পদ নহে; জনপ্রসিদ্ধ শিবচরণের কতকগুলি উদাস ভাব এবং খেদোক্তি অবলম্বনেই কোন প্রতিভাশালী গেঙ্কুলি গীতপদগুলি রচনা করিয়া থাকিবেন। ৬ষ্ঠ গীতে গীত সাধনার সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে "এগার হাজার চৌরাশী সন"; বারের নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।[৭ক] এই সন চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত মঘী সন অথবা বঙ্গাব্দ। মঘাব্দ গণনা করা হয় ৬৩৭ কিংবা ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। ঘোষ মহাশয় সত্যই ধরিয়াছেন যে, উদ্ধৃত উক্তিতে "হাজার" সংখ্যাটী "শত" অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সহস্র শব্দে শত এবং শত শব্দে সহস্র বুঝায়, এরূপ উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যেও বিরল নহে। শ্রীমান্ বিপুলেশ্বর দেওয়ানের পুথিতে "শত" পাঠই আছে। এ ভাবে এগার হাজার চৌরাশীকে ১১৮৪ মঘাব্দে পরিণত করিয়া বলিতে পারা যায়—গীতগুলির প্রথম রচনার কাল ১৮২১ কিংবা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ। তাহা শিবচরণের জীবিতকাল হওয়া আদৌ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই সমস্ত বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করা চলে—শিবচরণ গীতগুলির ঠিক রচয়িতা না হইলেও তাঁহার জীবদ্দশায় এবং তাঁহারই চিরস্মরণীয় অবদান অবলম্বনে ঐ সমস্ত রচিত ও গীত হয়। তখন ধরম বক্স খাঁ (১৮১২—৩২ খ্রীঃ অব্দ)

৭। চাক্‌মা জাতি, পৃঃ ৩৭৮।
৭ক। কোন কোন পুথিতে বারের নাম আছে বলিয়া জানিতে পারিয়াছি।

চাক্‌মা রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। বঙ্গাব্দ মনে করিলে, গীতগুলির রচনাকাল ১৭৭৬ কিম্বা ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।

গীতগুলির সংখ্যা সাত কিংবা ছয়, তাহা এখনও আলোচনা করা হয় নাই। শ্রীমান্ বিপুলেশ্বর দেওয়ানের পুথিতে সাতটী গীতই রক্ষিত আছে। সাত সংখ্যার প্রতি চাক্‌মাসমাজের বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় গীতে আছে—"সাত বার সাধিলে", চতুর্থে ও ষষ্ঠে "সাত ভেই সাত ভোন্" এবং পঞ্চমে "সাত পুত চাই।" সাত বার গীত সাধনার জাতীয় প্রেরণা থাকিবারই কথা। এ ভাবে দেখিলে গীতপদগুলির পূর্বসংখ্যা সাত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু চাক্‌মাসমাজের অনেকের মতে পূর্বে গীতপদগুলি ছিল সংখ্যায় পাঁচ এবং উহাদের সঙ্গে পরের রচিত দুইটী যোগ করিয়া হইয়াছে সাত। প্রথম পাঁচ, ক্রমে ছয় এবং শেষে সাত হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। আমরা ছয়টী গীত যে ভাবে বিন্যস্ত আছে দেখিতে পাই, তাহাতে সপ্তম গীতের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। প্রথম গীতে পালারম্ভের এবং ষষ্ঠে পালা শেষের উপযুক্ত ভণিতা আছে। মধ্যের চারিটীতে এরূপ দীর্ঘ ভণিতা নাই। অতএব ছয় গীতেই "গোজেন লামা" সম্পূর্ণ মনে করিতে বাধা দেখি না। লামা শব্দের অর্থ ভুল করিয়া ঘোষ মহাশয় গীত বা গীতপদগুলিকে স্তোত্র আখ্যা দিয়াছেন। এখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, লামা শব্দের অর্থ স্তোত্র নহে, "নামা",[৮] "অবতরণ", "দফা", "পালা"। প্রথম গীতে গায়ক মা সরস্বতীকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছেন, যেন তিনি সভায় গান করিবার জন্য গীতপদ কণ্ঠে যোগাইয়া দেন। উহার শেষ ভাগে আছে গীত সাধনার কথা। অপরাপর গীতে আছে "তঁদা সাধনা" বা "কণ্ঠ (অর্থাৎ সুর) সাধনা"র কথা, এবং তৃতীয়ে আছে ধর্মসাধনার কথা। তদনুসারে গীত, কণ্ঠ এবং ধর্ম, এই তিনই সাধনার বস্তু, সাধনার বিষয়। গীতগুলির মধ্যে আছে—গোঁসাইর চরণ ভজনার কথা, চন্দ্র-সূর্য্যের বন্দনার কথা, গুরু ও পিতামাতার চরণ ভজনার কথা, বিবিধ বর প্রার্থনার কথা। তথাপি উহারা সর্বাংশে স্তোত্র নহে। ভজনা ও বন্দনা উহাদের ভণিতা মাত্র। প্রধান উক্তিসমূহ হইতে বিচার করিলে উহারা নীতি উপদেশাত্মক ভাবের গীত।

রচনা হিসাবে গীতপদগুলি গান নহে, কবিতা। ঘোষ মহাশয়ের ভাষায় বলিতে হইলে, উহারা কবিতা হইলেও "সঙ্গীতের পাশ" হইতে মুক্ত নহে; নানা রাগরাগিণীতে উদ্গীত হইলেও রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যায়িকাগুলিকে যেমন কবিতাসমষ্টি ধরা হয়, এই-গুলিও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। বৌদ্ধ সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে বলিতে গেলে, এই গীতপদগুলি 'গাথা' জাতীয় রচনা। পক্ষান্তরে এই গীতগুলিকে বৌদ্ধ চর্য্যাপদ এবং দোঁহার ছায়া বলা যায়। দ্বিপদী শ্লোকেই গীতগুলি রচিত এবং প্রত্যেক শ্লোকের দুই চরণের শেষ শব্দে মিত্রাক্ষর পয়ারের ন্যায় মিল আছে। কিন্তু অক্ষরসংখ্যায় প্রায় সর্বত্রই অমিল।

৮। প্রথম গীতোক্ত "লামনি ধার" হইতে লামা শব্দের ঠিক এই অর্থই প্রতিপন্ন হয়।

কাজেই বর্ণবৃত্তির দিক্ হইতে ছন্দের বিচার করা চলে না, মাত্রাবৃত্তির দিক্ দিয়াই তাহা বিচার করিতে হইবে। অতএব গায়কের উচ্চারণ-ভঙ্গীর উপরে অনেকাংশে ছন্দরক্ষার জন্ম নির্ভর করিতে হয়। আবার গায়কের উচ্চারণভঙ্গীও সংযোজিত সুর ও তালের অধীন।

গীতগুলির রচনা সরল, সহজ, প্রাণস্পর্শী এবং স্থানে স্থানে গভীরভাবদ্যোতক। উহাদের ভাষা বাঙ্গালা হইলেও, চাক্‌মা কথ্য ভাষার ছাঁচে ঢালা। রচনার মধ্যে কোথাও কষ্টকল্পনা নাই। ভাষার গতিও স্বচ্ছন্দ। নিহিত ভাবগুলি স্বভাবসিদ্ধ, দ্যোতনা চমৎকার। স্বভাবকবি ও গায়কের স্বভাবসুলভ ভাবস্ফুর্ত্ত রচনায় এই গীতপদগুলি প্রোজ্জ্বল। সত্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে প্রস্ফুটিত মধুভরা সুন্দর বনকুসুমের ন্যায় গীতপদ-গুলি সুন্দর ও মধুর।

গীতগুলির মধ্যে প্রাণের যে ব্যাকুলতা পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সমগ্র চাক্‌মা বৌদ্ধ জাতিরই নিভৃত হৃদয়ের বেদনা। এই অনুভূত বেদনায় আমরা দেখি, অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা, এবং সর্ব্বজাতি ও সম্প্রদায়ের শাস্ত্র ও ভাষা অধ্যয়নের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞানী, ধ্যানী, শিক্ষার্থী, শিক্ষিত ও পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁহাদের অভাবে বিশেষ আক্ষেপ অনুভব। দ্বিতীয় গীতে গায়ক বলিতেছেন, "অপার পানি সাগরে। ত্রিশ তিন জাতি ভাজ পড়তুম্ গই আগরে॥" আধুনিক বাঙ্গালায় বলিতে গেলে,

"সাগরে অপার জল, প্রবল জ্ঞানের তৃষা,
তেত্রিশ জাতির ভাষা শিখিতে কতই আশা!"

ধনপতি রাধামোহনের উপাখ্যানে উক্ত আছে যে, রাজা বিজয়গিরি দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া এমন এক দেশে গিয়া পড়িলেন, যেখানে শিক্ষার্থী ও পণ্ডিত কেউ ছিল না। তাহা জানিয়া তিনি সৈন্যগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন:

"পড়োয়া পণ্ডিত নেই যে দেশৎ
যেদং নয় সৈন্যগণ সে দেশৎ।"

"যে দেশে বিদ্যার্থী ও পণ্ডিত নাই, হে সৈন্যগণ! সে দেশে যাইব না।"

৫ম গীতে বর্ণিত গৃহীর প্রত্যাশিত জাগতিক পদমর্য্যাদাগুলি সমস্তই চাক্‌মা জাতির মধ্যে তখনও বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে। সকলের উপর রাজপদ, রাজার নীচে দেওয়ান, দেওয়ানের নীচে জুমিয়া (জুম্মোয়া) এবং জুমিয়ার নীচে কৃষক (হাল্যা)।

গীতগুলিতে আমরা যে চাক্‌মা কথ্যভাষার ব্যবহার পাই, তাহা বহু স্থলে চট্টগ্রাম জিলার কথ্যভাষার অনুরূপ। এই দুই কথ্যভাষার "ন" অব্যয় পদটী ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে, যথা: ন আছিল—নহি ছিল (শূন্যপুরাণ), ছিল না; ন বুঝে—বোঝে না; ন বুঝি—বুঝি না; ন কদ=কহিত না; ন কত্ত=করিত না; ন ধত্ত=ধরিত না; ন পিদুং—পাইতাম না; ন হদুং—হইতাম না; ন হদ—হইত না; ন শুন্দুং—শুনিতাম না। কতিপয় স্থলে ক্রিয়ার পূর্ব্বে "ন"র অবস্থান বাংলা ভাষায় সর্বত্র সাধারণ, যথা: ন পেয়ে—না পাইয়া; ন পারে—না পারিলে; ন র'লে—না রহিলে, না থাকিলে।

বহু স্থলে চাক্‌মা কথ্যভাষার শব্দগুলি গদ্য ও পদ্যে সমান, কতিপয় স্থলে ছন্দ রক্ষার জন্য বিভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে, গদ্যে "ভাই" শব্দের উচ্চারণ "ভাই", কিন্তু ছন্দের খাতিরে এবং দুই চরণের শেষ শব্দের মিল রক্ষার জন্য গীতপদগুলিতে স্থল-বিশেষে আমরা পাইতেছি 'ভেই'। দ্বিতীয় গীতে "মায়া"র অপভ্রংশে পাই "মেইয়া"—শুধু পূর্ব্বচরণের শেষ শব্দ "দিয়া"র সহিত মিল রাখিবার জন্য। পূর্ব্ববঙ্গের "মাইয়া" = পশ্চিমবঙ্গের "মেয়ে" অথবা মায়া (দয়ামায়ার মায়া)। চাক্‌মা "ন হদ"—হ'ত না, কিন্তু তৃতীয় গীতে শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের "ন শুন্দুং"এর সহিত মিল রাখার জন্য প্রথম চরণে "হ'ত না" অর্থে পাই "ন হদুং"। গদ্যে "হাতী" শব্দের উচ্চারণ "হাতী", কিন্তু পঞ্চম গীতে ছন্দের খাতিরে "হাতী" হইয়াছে "হেৎ"। এই গীতের এক শ্লোকের প্রথম চরণে "মনের সাধে"র স্থলে পাই "মনের সাধ," শুধু দ্বিতীয় চরণের "হাদে হাদ্" কথার সহিত সঙ্গতি স্থাপনের জন্য। যদিও "চমৎকার" শব্দের সহিত সাদৃশ্য বিধানে প্রথম গীতে "জলৎকার" শব্দটী নির্ম্মিত হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাও ছন্দপ্রসূত। এরূপে ছন্দের খাতিরে কবিতায়, বিশেষতঃ গাথা জাতীয় রচনায় শব্দের কত কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত ললিতবিস্তরের দীর্ঘ ভূমিকায় তালিকা করিয়া দেখাইয়াছেন। ছালাম, দজগ্, হুজুর ও খাজানা ব্যতীত মুসলমানী শব্দ গীতগুলিতে নাই বলিলেও চলে। সম্ভবতঃ বর্মিজ শব্দ "সিকুফয়া" ("নমস্কার") রূপান্তরিত হইয়া "সেখাভূয়া" হইয়াছে।

গীতগুলির মূল ও অনুবাদ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে বিচার্য্য—উহাদের মধ্যে বাংলার বৌদ্ধ চিন্তাধারা কি পরিমাণে রক্ষিত আছে? আমরা প্রত্যেক গীতের প্রারম্ভে দেখি, গায়ক "গোজেনর" বা "গোঁসাইর" চরণ ভজনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কতকগুলি বর ভিক্ষা করিতেছেন। চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণ বৈষ্ণব প্রভাবে "গোঁসাই" শব্দে ভগবান্ বুদ্ধকে বুঝেন। কিন্তু গীতগুলিতে "গোঁসাই" শব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা মায়াময় ঈশ্বর বা পরমেশ্বরই জ্ঞাপিত হইয়াছেন। তিনি হইতেছেন প্রধানতঃ শিবরূপী, "দেবকমল" বা বিষ্ণুও বটেন। তবে তিনি পার্ব্বতীর সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ শিব অথবা কমলার সহিত যুক্ত বিষ্ণু নহেন। প্রথম গীতের প্রারম্ভে গায়ক যে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শূন্যপুরাণ এবং বাংলা দেশে প্রচলিত শৈব আগমাদিতে প্রদত্ত সৃষ্টিবর্ণনার অনুরূপ। তাহা মূলতঃ ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তের বর্ণনারই অনুযায়ী। গায়ক কবি বলিতেছেন—তখন নদী সরিতাদি সৃষ্টি কিছুই ছিল না, ছিল সমস্তই জলাকার। গোঁসাই জলের উপর স্থল নির্মাণ করিলেন। পূর্ব্বে নিজের জন্ম প্রস্তুত করিয়া পরে সকল জীব সৃজন করিলেন। ঈশ্বর-নির্ম্মাণবাদ বৌদ্ধ চিন্তার প্রায় সর্ব্বস্তরে খণ্ডিত হইলেও, চট্টগ্রামবাসী গৃহস্থ বৌদ্ধগণ এই ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারেন নাই। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ কিংবা ৭ম শতকে বিরচিত গুণকারণ্ডব্যূহে আদিবুদ্ধ বৈদিক প্রজাপতির এবং সমাধি বৈদিক তপের স্থান অধিকার করিয়াছে। যেমন প্রজাপতি তপঃপ্রভাবে বিশ্বসংসার ও জীবসকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন

আদিবুদ্ধ সমাধিপ্রভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবপ্রমুখ সকল দেবতা, মানব ও চরাচর সৃজন করিয়াছেন। বাংলার বৌদ্ধগণের নিকট শিব প্রধান উপাস্য দেবতা হওয়ার পক্ষে বাধা দেখি না। কারণ, পালযুগে পূর্ব্বাঞ্চলে, বিশেষতঃ যবদ্বীপে, এই লোকমত দাঁড়াইয়াছিল যে, যে-ই বুদ্ধ সে-ই শিব, যে-ই শিব সে-ই বুদ্ধ।[৯]

প্রথম গীতে চন্দ্রসূর্য্যকে দুই সহোদর ভাই বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা যেমন একদিকে ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের দীর্ঘতমা সূক্তে পাওয়া যায়, তেমন বাংলার সাধারণ লোকের মুখেও প্রতিদিন শুনা যায়। পালি দেবধম্মজাতকেও প্রায় এইরূপ বর্ণনাই দৃষ্ট হয়। অতএব ইহা দ্বারা ধর্ম্মের বিশেষত্ব প্রমাণিত হয় না।

গীতগুলিতে বুদ্ধ অথবা সঙ্ঘের উল্লেখ আদৌ নাই। ধর্ম্ম সাধনার কথা অবশ্যই আছে। তথাপি স্বীকার করিতে হয় যে, গীতগুলির অন্তর্নিহিত চিন্তার ধারা বৌদ্ধ, মহাযানী ও হীনযানী বিমিশ্রিত। ৬ষ্ঠ গীতে গায়ক, মা বসুমতী বা বসুন্ধরাকে দানের সাক্ষী করিয়া হস্তে পাত্র হইতে জল ঢালিবার কথা বলিতেছেন। ইহা সম্পূর্ণভাবে অতি প্রাচীন বৌদ্ধ প্রথা। তৃতীয় ও চতুর্থ গীতে "হীনকুলে ন যিদুং" (হীন কুলে যাইতাম না, অর্থাৎ জন্ম হইত না), "দুখ্যাকুলে ন হদুং" (দুঃস্থ পরিবারে জন্মিতাম না), "হাদে ন করতুম্ জীববধ" (স্বহস্তে জীবহত্যা করিতাম না), "যুগে যুগে ন পড়্তুম্ দজগং" (যুগে যুগে, বিভিন্ন জন্মে নরকে পতিত হইতাম না), ইত্যাদি যে সকল খেদোক্তি আছে, উহার পশ্চাতে আছে পালিভাষায় সন্নিবদ্ধ গৃহী জনের উচ্চ অভিলাষ: "হীনকুলে ন যায়ামি জাতি জাতি ভবাভবে" যাহা সঙ্ঘের সমক্ষে স্বহস্তে পাত্র হইতে জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে দায়কগণ ব্যক্ত করেন। 'কানে ন শুন্দুং কুকথা" (কানে কুকথা শুনিতাম না), "পরে ন কথ কুকথা" (অপরে কুবাক্য বলিত না), "পড়োয়া পণ্ডিত যেই দেশে, জন্ম হদুং গৈ সেই দেশে" (যে দেশে বিদ্বান্ ও পণ্ডিত আছেন, সে দেশে গিয়া জন্ম লইতাম), ইত্যাদি আক্ষেপ-সূচক উক্তির পশ্চাতেও রহিয়াছে পালিভাষানিবদ্ধ বৌদ্ধ গৃহী জনের পুণ্যানুষ্ঠানের ফল-স্বরূপে হৃদয়ের কামনা:

"ইমিনা পুঞ্ঞকম্মেন মা মে বাল-সমাগমো।
সতং সমাগমো হোতু যাব নিব্বান-পত্তিয়া।"[১০]

"এই পুণ্যকর্ম্মের ফলে নির্বাণ না পাওয়া পর্যন্ত যেন মূর্খের সহিত আমার সংসর্গ না হয়, সতের সহিতই সম্পর্ক হয়।"

অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সমস্তেই পালি শাস্ত্রোক্ত শ্রাবকযানীয় বা হীনযানীয় গৃহস্থ বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিদ্যমান আছে। নীতির প্রাধান্যেও এই ধর্ম্মের প্রভাব বিলক্ষণ সূচিত হয়। প্রথম গীতে জম্বুদ্বীপে জন্মলাভের গৌরবও এই সিদ্ধান্তের

৯। Indian culture, Vol. 1, p. 284, শ্রীযুক্ত হিমাংশুভূষণ সরকারের Siva Buddha in old Javanese Records শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১০। শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির-সঙ্কলিত বুদ্ধবন্দনা, পৃ. ৪২।

অনুকূলে। পক্ষান্তরে গীতগুলিতে পরবর্তী মহাযানের অন্তর্গত সহজসিদ্ধির প্রভাবও সুস্পষ্ট। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, এই গীতপদগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের চর্য্যাপদের ছায়া। তাহা ছাড়া উহাদের মধ্যে আছে গুরুবাদ, গুরুনামের মাহাত্ম্য, গুরুপদসেবার উপকারিতা ও একান্ত প্রয়োজনীয়তা। দ্বিতীয় গীতে আছে—নিজের সর্বস্বদানে সকল মানুষের উদ্ধার সাধনের সঙ্কল্প। চিত্ত ও মনের একীকরণের ব্যগ্রতার মধ্যে আমরা দেখি, ঐ একই পরবর্তী মহাযান বৌদ্ধধর্মের যুগনদ্ধবাদের অভিব্যক্তি। অধিকন্তু, চর্য্যাপদের ভাবে দেহ বা আত্মভাবকে পরমবৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে লৌকিক মহাযান ও হীনযান বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণ হইতে পারিল কিরূপে? তাহার উত্তরে আমি বলিব—তাহা না হইলেই বরং আশ্চর্যের কথা হইত। চট্টগ্রাম জেলার বহু স্থান হইতে, বিশেষতঃ আনোয়ারা থানার অন্তঃপাতী বটতলী ও ঝিয়ারী হইতে প্রাপ্ত ও সংগৃহীত বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলির মধ্যে আমরা বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত একত্র সমাবেশে অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী ও তারা প্রভৃতি মহাযানীয় বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি দেখিতে পাই। ইহাদের কোন কোনটীর পাদপীঠে অথবা পৃষ্ঠে সংস্কৃত ভাষায় লেখাও উৎকীর্ণ আছে। ঐ লেখানিবদ্ধ দাতৃগণ প্রবর মহাযানসম্প্রদায়ী আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন। মূর্ত্তি ও লেখাগুলির বৈচিত্র্য পরীক্ষা করিলে উহাদিগকে পালযুগের নিদর্শন বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্তে ইহারা খ্রীষ্টীয় ৮ম কিংবা ৯ম এবং ১১শ কিংবা ১২শ শতকের মধ্যে চট্টগ্রামেই নির্মিত হয়।[১১] এই মূর্ত্তিগুলির দেহাবয়বের বৈচিত্র্যের মধ্যে বঙ্গদেশ ও ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের মিলনক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ১৪শ কিংবা ১৬শ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে আরাকান হইতে পালিশাস্ত্রমূলক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হয়। আরাকান হইতে আনীত এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত পালিসূত্রগুলি চাক্‌মাসমাজে "আগরতারা" নামে পরিচিত। রাজা ধরমবক্স খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিভান্বিতা, মহীয়সীকীর্ত্তি, প্রাতঃস্মরণীয়া ও অলোক-সামান্যা পত্নী রাণী কালিন্দী ঐ সমস্ত সংগৃহীত করিয়া রক্ষা করেন। তারাগুলির নাম চাক্‌মা, ভাষা আরাকানী-উচ্চারণ-বিকৃত পালি এবং বড়ুয়া ও চাক্‌মা উচ্চারণ-বিকৃত বর্মিজ। উহাদের কোন কোনটীতে মূলের পাশে পাশে বর্মিজ ভাষায় তর্জমা সন্নিবেশিত আছে।

শিবচরণের গীতপদগুলির ঐতিহাসিক বিশেষত্ব এই যে, উহাদের মধ্যে আমরা সরল ও সহজ ভাষায় হীনযান ও মহাযান, এই উভয় যানেরই লৌকিক ধারার সুন্দর সমাবেশ পাই,

১১। Indian Historical Quarterly, Vol. VIII, pp.332 f. ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার Some images and traces of Mahayana Buddhism in Chittagong শীর্ষক প্রবন্ধ এবং Archaeological Survey of India, Reports for 1927—28, p. 184; 1928—29 p. 125; 1929—30, pp.194—95. দ্রষ্টব্য।

এবং তাহা গায়ক, কবি ও ভক্ত সাধকের স্বাধীন অনুভূতি দ্বারা সঞ্জীবিত ও প্রদ্যোতিত হইয়াছে।

(১)

গোজেন লামা

মূল—চাক্‌মা ভাষা

উজানি ছরা লামনি ধার,[12]
ন আছিল সৃষ্টি, জলৎকার।
জল উপরে গর্ধ্যে স্থল,
বানেল গোজেনে জীব সকল।
আরেয়ে বানেয়ে জনম যার,
আগে ছালাম্ দ্যং চরণ তার।[12ক]
চানে সূর্য্যে সহোদর ভেই,
ছালাম্ দ্যং উদ্দিশে ভূমিৎ থেই।
সমুর্খে ছালাম্ দ্যং পুগেদি,
পছিমে ছালাম্ দ্যং পিজেদি।
উত্তরে ছালাম্ দ্যং বাঙেদি,
দক্ষিণে ছালাম্ দ্যং দেনেদি।
মোরে বিধিয়ে দয়া হোক,
তিনদেবচরণৎ ছালাম্ রোখ।
ন বুঝে তিন দেবে যেই সকল
সেই সকল বড় কমল ফুলকমল।[13]
মা সরস্বতী ছালামৎ
যোগাই দিত গাই গীতপদ্।
ছালাম মানেই তপাসী[14]
ধর্মশীলা সন্ন্যাসী
একা মনে গুজঙর;
ছালামৎ জানেলুম্ দেব কমল।
পূজার গুরু মানেলুং,
হাজার ছালামে জানেলুং।
মর্ত্ত্যে পড়ি জনম যার
তার চরণে নমস্কার।
দশমাস দশদিন দুখ পিয়ে
জম্বুদিবৎনি জম্মিয়ে।

গোঁসাই পালা

অনুবাদ—আধুনিক বাংলা

উজান স্রোত, নিম্নগ ধার,
ছিল না সৃষ্টি, সব জলাকার।
জলের উপরে স্থল নির্মাণ করিল,
সর্বজীবে গোসাই ত সৃজন করিল।
সর্ব অগ্রে নির্মাইল জনম যাঁহার
প্রথম প্রণাম দিই চরণে তাঁহার।
চন্দ্রসূর্য্য যাঁরা দুই ভাই সহোদর
উদ্দেশে প্রণাম দিই ভূমির উপর।
সম্মুখে প্রণাম দিই যাহা পূর্বদিক,
পশ্চিমে প্রণাম দিই যাহা পৃষ্ঠ দিক।
উত্তরে প্রণাম দিই যাহা বাম দিক,
দক্ষিণে প্রণাম দিই যাহা ডান দিক।
বিধির হউক দয়া সদা মোর প্রতি,
ত্রিদেব চরণে যেন সদা রহে নতি।
ত্রিদেবে বুঝে না যেই মনুষ্য সকল
তারা বড় কমল, আসলে ফুলকমল।
বন্দি মাতা সরস্বতী, [বন্দি তাঁর পদ]
যোগাইতে কণ্ঠে গাহিবারে গীতপদ।
সেলাম জানাই যত তপস্বী সুজন
ধার্মিক সন্ন্যাসী যাঁরা উদাসীন রন।
একমনে ভজিতেছি তাঁদের সকলে,
সেলামে জানাই তাহা শ্রীদেবকমলে।
যথার্থ পূজার গুরু করিনু স্বীকার,
জানামু সবারে করি সেলাম হাজার।
মর্ত্যে অবতরি হইল জনম যাঁর
তাঁহার চরণে শত শত নমস্কার।
দশ মাস দশ দিন গর্ভদুঃখ পেয়ে,
জম্বুদ্বীপ মাঝে (শেষে) জনম লভিয়ে,

১২। অর্থ সুস্পষ্ট নহে। মনে হয়, এ স্থলে উজানি ছরা অর্থে উজান স্রোত বা জোয়ার এবং লামনি ধার অর্থে নিম্নগ ধার (ধারা) বা ভাটা। আদিতে জলাকারে সং নিশ্চল অবস্থায় ছিল।

১২ক। ঘোষ মহাশয়ের পাঠে—যার জনম ও তার চরণ। পাঠভেদে ১ম চরণের প্রথমাংশ—আরিয়ে বানিয়ে, আরিয়ে মিতি। কোন কোন পুথিতে এই শ্লোকটী গীতের প্রথমেই আছে।

১৩। ফুলকমল শব্দের অর্থ বোকা বাবু। ১৪। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—তপসী।

মূল	অনুবাদ
পুরি চেলুং চোখ ভরি,	অগ্রভাগে চাহিলাম আমি চোখ ভরি,
মা বাপ পারা নেই দেশভরি ।	মাতাপিতার অপেক্ষা নাই দেশভরি ।
পড়োয়া বুঝে আখরৎ,	বিদ্বান্ পণ্ডিত যাঁরা বুঝেন অক্ষরে,
এজের মানেই লোক সংসারৎ ।১৫	কেমনে আসিছে নর এ ভবসংসারে ।
মাবাপ চরণে ভজিলেই	ভজনা করিলে মাতাপিতার চরণ
সকল তিথাফল পাই ভেই ।	সর্বতীর্থফল ভাই পাই রে তখন ।
জ্ঞানী ধ্যানী ছালাম্ দাং,	জ্ঞানী ধ্যানী সকলেরে করি নমস্কার,
পড়োয়া পণ্ডিত বুঝিলং ।	বিদ্বান্ পণ্ডিত বুঝি লও মানে তার ।
সবায় ছালাম মুই দিলুং,	আপামর সকলেরে সেলাম দিলাম,
গীতসাধনান সাধিলুং ।	গীতসাধনার কার্য আমি সাধিলাম ।
গীত একলামা পূরেয়ে,	গীত এক পালা এবে পূর্ণ হইয়াছে,
বুঝিল বুঝিব মানেয়ে ।	বুঝিব মানবগণ সবে বুঝিয়াছে ।

(২)

মূল	অনুবাদ
উদাৎ বেরেই ধোপ কাপর	শুভ্র বসন জড়িয়ে গলে
গোজেন চরণৎ ভজঙর ।	ভজি গোঁসাইর চরণ তলে ।
আগে ছালাম দেই শিবচরণ,	প্রথমে প্রণমি শ্রীশিবচরণ
মাগং গোজেনত্তুন্ দুই চরণ ।	মাগি [পরে] গোঁসাইর দু' চরণ ।
ছেয়ার তলে রখে-দ,	পদছায়াতলে রেখে দাও মোরে,
একালে ওকালে তরে-দ ;	একালে ওকালে তরে নাও মোরে ।
জন্মে জন্মে দেখা হক্,	জন্মে জন্মে তব দেখা যেন হয়,
চিত্তে মনে একা হক্ ;	ধ্যানে যোগে চিত্ত-মন যেন এক হয়,
দেবাংশি গোজেন ন দুঝি,১৬	দেবর্ষি গোঁসাইরে দোষিতে কি পারি ?
অবুঝা মনেরে ন বুঝি ।	অবোধ মনুষ্যে আমি বুঝিতে না পারি ।
শুন শুনরে পড়োয়া ভেই,	শুন শুন যত সুশিক্ষিত ভাই,
দ্বি-বা অক্ষরে তরি যেই ।	দ্বি-অক্ষর [গুরু] নামে চল তরি' যাই ।
গুরু সাধি ন পেয়ে,	না পাইয়া গুরপদ সাধিতে এবার,
অনাগুরুয়ে পার হয়ে ।	গুরু বিনা যাইতেছি মরণের পার ।
সাধি আনং আর জনম,	সাধি আনিতেছি আর এক জনম,
সকল দান করঙর এই জনম ।	সব দান করিতেছি এই যে জনম ।
জুরি ন পালে কুয়ৎ পেব ?	যোগাতে না পারি যদি কোথায় পাইব ?
ভজিলে চরণে কুল পেব ।	চরণ ভজিলে কুল অবশ্য পাইব ।

১৫ । ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—সংসারে । ইহাতে প্রথম চরণের সহিত সঙ্গতিরক্ষা হয় না ।

১৬ । ঘোষ-প্রদত্ত পাঠ "দোষি" । কিন্তু দ্বিতীয় চরণের শেষ শব্দের সহিত মিল রাখিতে হইলে "দুঝি" পাঠই ...য় ।

মূল	অনুবাদ
ন র'লে ধনমান সাধনে,	ভাগ্যে যদি নাহি থাকে বহু ধনমান,
তরিব মানেই লোক ফুল-দানে।	তরাইব সর্ব্ব নরে করি পুষ্পদান।
গুরুচরণ সার করে,	তরাইব করি গুরুচরণই সার,
বংশ-ধন কি পার করে?	বংশ-ধন যশোমান করে কিহে পার?
একা মনে ভজিলে	একমনে গোঁসাইর চরণ ভজিলে
সকল তিথ্যফল পাইবিলে।	সকল তীর্থের ফল তোরা পাইবিরে।
দয়া দে-লে সার করে,	সর্বজীবে দয়া, ধরমের সার,
সাধিলে দজগং পার করে।	সাধিলে নরক হতে করেন বটে পার।
অপার পানি সাগরে,	সাগরে অপার জল, [প্রবল জ্ঞানের তৃষা,]
ত্রিশ তিন জাতি ভাজ্	তেত্রিশ জাতির ভাষা শিখিতে কতই আশা!
পড়তুম্ গই আগরে।	নরে যদি ভজে পদ সবে ইহকালে,
ভজে মানেই লোক এই কালে,	যমে তবে ধরিবে না কভু পরকালে।
যমে ন ধরিব ঐ কালে।	যে বর চায়রে তারা সেই বর পায়,
যে বর মাগে সে বর পায়,	গোঁসাই বর দিলে তাহা না ফুরায়।
গোজেনে বর দিলে ন ফুরায়।	গোঁসাইর মায়ার অন্ত কিছু নাই,
গোজেন মেইয়া উদ'নেই	বুঝিতে পারি কি তাহা, ক্ষুদ্র আমি ভাই!
বুঝি পারি কি ভাই সেই?	ভাবিয়া পরম বৃক্ষ মূল্যহীন কায়া
পরম বৃক্ষে[১৭] ভর দিয়া	কেহ কি বুঝিতে পারে তাঁর সেই মায়া?
বুঝি পারে কে সেই মেইয়া?	সকল জীবের সনে হউক দর্শন,
সকল জীবে বেদায় হক্	ধ্যানযোগে এক হউক মোর চিত্ত মন।
চিত্তে মনে একা হক্।	
পরম গোজেন কিয়ৎ থায়?	থাকেন কোথায় পরম গোঁসাই?
সাতবার সাধিলে সেই ন পায়!	সাতবার সাধি সারা যে না পাই!
উঁদা সাধি আনিব,	'আমি কণ্ঠ সাধি' আনিব,
পরম গোজেনে ভুজিব।	পরম গোঁসাই ভজিব।
চরণে ছালামে ভুঝিলে	প্রণমি চরণ ভজিলে।
ধর্ম সাধনান পাইবিলে।[১৮]	ধর্মসাধন পাইবি রে।
ছালাম দিবার কাছেল যে,	সেলাম দেবার সময় এল যে,
গীত দ্বিলামা ফুরেল যে।	গীত দুই পালা শেষ হল যে।
দ্বিলামা ফুরেলে[১৯] ন যেবং,	যাব না দুপালা শেষ হ'লে পর,
গোজেন-সমুকুখে বর লবং।	গোঁসাইর কাছে লইব যে বর।

১৭। এ স্থলে 'পরম বৃক্ষ' অর্থে দেহে স্থিতি, আত্মভাব। বৌদ্ধ চর্য্যাপদে আছে—"কায়া তরুবর পঞ্চবি ডাল," অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধবিশিষ্ট জীবদেহ বা ব্যক্তিত্ব।

১৮। ঘোষ-প্রদত্ত পাঠ—পাই বেলে (=পাই বলিয়া)। তাহা এ স্থলে অসঙ্গত। পূর্বচরণের শেষ শব্দের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে 'পাইবিলে' পাঠই গ্রহণীয়।

১৯। ঘোষপ্রদত্ত পাঠ—ফুরেলে, অর্থাৎ সমাপ্ত হইলে।

(৩)

মূল	অনুবাদ
ঔঁদাৎ বেরেই কাপড়ে	জড়িয়ে গলে [শুভ্র] বসন
আরাধন করঙর হাত যোড়ে।	করযোড়ে করি আরাধন।
দুখ্যাকুলে যার জনম	দীনকুলে জনম যাহার
ঔঁদা সাধঙর তার২০ জনম।	বর্ণিতেছি জনম তাহার।
হীনকুলে ন যদুং,২১	হীনকুলে যেতে নাহি হ'ত।
দুখ্যাকুলে ন হদুং।	দুঃখিকুলে জনম না হ'ত।
হাদে ন করতুম্ জীববধ,	জীববধ না করিতাম স্বহস্তে কখন,
যুগে যুগে ন পড়তুম্ দজগৎ।	যুগে যুগে নরকেতে হ'ত না পতন।
পরম বৃক্ষি মোর ন হদ,	হ'ত না পরমবৃক্ষ দেহের ধারণ,
চিদাচঙ্গা ন থদ২২।	থাকিত না চিন্তচর্য্যা চিন্তার কারণ।
কথা ন কদ তলদি২৩	নীচু হয়ে কথা নাহি কহিতে হইত,
লোকে ন কত্ত কলঙ্কি।২৪	করিতে না পারিত রে লোকে কলঙ্কিত।
রোগে বেদে ন ধত্ত,	রোগ ব্যাধি [জরা মৃত্যু] কভু না ধরিত,
অজল নীজ দাৎ ন হদ।	উচ্চ নীচ অসমান দন্ত না হইত।
পোড়া ন পিদুং ধনেদি২৫	ধনধান্যে পোড়া ভাগ্য পেতে নাহি হত,
উনা ন হদুং গই২৬ জনেদি।	জনভাগ্যে কম হয়ে জন্ম না হইত।
অবুঝ জনম ন হুদুং২৭	অবোধ জনম মোর হ'ত না কখন,
তিতা কথা ন শুন্দুং।	তিক্ত বাক্য কর্ণে মম হ'ত না শ্রবণ।
কানে না শুন্দুং কুকথা,	কানে না শুনিতে হ'ত কখনো কুকথা,
পরে ন কথ কুকথা।	অপরেও কহিত না আমারে কুকথা।
পড়োয়া পণ্ডিত যেই দেশে	শিক্ষিত পণ্ডিত আছে যেই দেশে
জন্ম হদুং সেই দেশে।	জন্ম লভিতাম আমি সেই দেশে।
আরনি রাজার দেশ২৮ লাক্ ন পাং,	পাগল রাজার দেশ দেখা নাহি হ'ত,
অগাধে অপথে যে ন পাং।	অগাধে বিপথে কভু যেতে নাহি হ'ত।

২০। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—পায়। তাহা এ স্থলে অর্থ শূন্য।

২১। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ যেদুং। ইহাতে মিল রক্ষা হয় না।

২২। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—খেদ। পূর্ব্বচরণের হদের সহিত খেদের মিল থাকে না।

২৩। তলেদি।

২৪। কলঙ্কী।

২৫। ধনেদি, অর্থ "ধান্যে"।

২৬। হদুং গোই।

২৭। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—জন্ম ন হদুং। ইহাতে পরচরণের "শুন্দুং"এর সহিত মিল থাকে না।

২৮। আরনি=বাং আরণি। ঘোষ মহাশয়ের মতে, আরনি অর্থ আরও।

মূল	অনুবাদ
দেজক্ চিন্দা থায় ন জান্লুং,	আছে যত চিন্তা নাহি জানিতাম,
জেদক্ পোড়া ধোয়া ন পাদুং[২৯] ।	পোড়া বাসি যত নাহি পাইতাম ।
গীত তিন লামা ফুরেলুং	গীত তিন পালা হ'ল অবসান,
সভায় হুজুর জানেলুং ।	সভায় জানাম্, [কর অবধান] ।

(৪)

মূল	অনুবাদ
উঁদাৎ বেরেই কাপড়ান	জড়িয়ে গলে বসনখানি
ভজিলুং গোজেন-চরণান ।	ভজি গোঁসাইর চরণ খানি ।
গীতে রঙে উল্লাসে	গীতে বাদ্যে নৃত্যরঙ্গে উল্লাসে
সাধঙর সাধনান খোলাসে ।	গীত সাধনা সাধিরে বিলাসে ।
দুখ্যা জনম্ ন হদুং গোই,[৩০]	হ'ত না মোর দুঃখের জনম,
সুখ্যা জনম্ হদুং গোই,	হ'ত আমার সুখের জনম
বারে এ-দ গম্ দেনে[৩১] ;	ভাল বারে শুভদিনে, [সুক্ষণে] ;
জন্ম দিত সুক্ষেণে ।	পিতা জন্ম দিত মোরে সুক্ষণে ;
সাদি ধরৎ উবশ্ তুম্ ।	ভাল ঘরে জন্মিতাম,
মন খোলাসে খেলে দুং ।	খোলা মনে খেলিতাম ।
জাতে কুলে হদুং গোই,	জাতে আর কুলে উচ্চ হইতাম,
থানে ঠমগে[৩২] হদুংগোই ।	স্থানে ও ঠমকে জন্ম লইতাম ।
ধর্মি[৩৩] মাবাপ লাগ্ পেদুং[৩৪]	ধর্ম্মশীল মাতাপিতা দেখা পাইতাম,
চিদসুখে মনসুখে দুধ খেদুং ।	চিত্তসুখে মনসুখে দুধ খাইতাম ।
সাত ভেই সাত ভোন লাগ্ পেদুং,[৩৫]	সাত ভাই সাত বোন দেখা পাইতাম,
ননেয়া খুলা বো'য়া মুই হদুং ।	স্নেহপাত্র ছোট বউ আমি হইতাম ।
সোনা-ধুলনৎ ধুলেদাক্,	সোনার দোলায় মোরে দুলাইত,
দ্যার ভঙানি ভঙেদাক্ ।	দেবতার ভাবে মোরে ঘুরাইত ।
জেত্তা সমারে জেদেঙা,	জেঠার সহিত মিলিত জেঠীমা,
খুত্তা সমারে খুড়েঙা[৩৬] ।	খুড়ার সহিত থাকিত খুড়ীমা ।
কালি কুখ্যারি[৩৭] বের বাড়ক্ ,	কালিকুখ্যারি ধানগাছ বাড়েরে যেমন
গুত্তি গুদরি ঢেল বাড়ক্ ।	জ্ঞাতিগোষ্ঠী আত্মজন বাড়িত তেমন ।
ধনে জনে হদ মোর,	ধনে জনে পূর্ণ গৃহ হইত আমার

২৯। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—পেদুং।

৩০। ঘোষ মহাশয়ের অসম্পূর্ণ পাঠ—হদুং।

৩১। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—দিনে।

৩২। স্থানে ও ঠমকে, অর্থাৎ পদমর্য্যাদায়।

৩৩। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—ধর্ম্মী।

৩৪। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—পিদুং।

৩৫। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—পেদুং।

৩৬। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—খুড়াঙা।

৩৭। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—কালী কুখ্যারী। কালীকুখ্যারী ধানগাছ শাখাপ্রশাখা সহ সহজে বাড়িতে থাকে।

মূল	অনুবাদ
পান খুজি দুধ খুজি দুবাবোর৩৮।	
সমারি বন্ধু পাং পুরা,৩৮ক,	সঙ্গী বন্ধু সখা পূর্ণভাবে পাইতাম,
লোকে কুদুমে সব পুরা।	আত্মীয় কুটুম্বে সবে পূর্ণ হইতাম।
কথানি হলে মু-মেদা।৩৯	কথাগুলি হ'লে মুখ মিষ্ট হ'ত,
গীতে রঙে গম তেঁদা।৪০	গীতোৎসবে কণ্ঠস্বর ভাল হ'ত।
মাদাজগা চুল ধরোক্,	সমস্ত মাথায় গজাইত চুল,
ঝুর্গা হদ দ্বিবা চোক্।৪১	দ্বিচক্ষের দৃষ্টি হইত মধুর।
বেঙা হদ চোখ-ভং,	চক্ষুভ্রূ হইত বক্র [সুবঙ্কিম],
মুজুং দাতভুন হদ সং।	সম্মুখের দাঁতগুলি সম [অপ্রতিম]।
চেবার গম্ হদ উত্তানি,	চাহিতে সুন্দর হইত ওষ্ঠখানি,
গোজেনে বানেদ হাত্তানি।	গোঁসাই স্বয়ং নির্মাইত হাতখানি।
তুঁদা পেচুং দেবগড়ন,	দেবের গড়া কণ্ঠ মিলিত।
বারা অজার বুকভরণ।	মাংসল বক্ষ হ'ত বিস্তৃত।
ছানে শিক্যায় গড়নে,	সৌন্দর্য্যের ছাঁচে গড়া দেহের বেলা,
রূপে রঙে পিচুং সবখনে।৪২	সর্বত্র হইত রূপরঙের মেলা।
রাজা বাদার পান খেচুং,	রাজার বাটা হ'তে পান খাইতাম,
গুরু সাধি নাম৪৩ পেচুং।	গুরু সাধি আমি নাম পাইতাম।
সাদি ঘরৎ উবুস্তুং,৪৪	বড় ঘরে আমি জন্মিতাম,
পড়োয়া পণ্ডিত মুই হুচুং।৪৫	বিদ্বান্ পণ্ডিত হইতাম।
দগ্যা করলি পাই গণং,	সমুদ্রবালি যত গণিতে পারিতাম,
আকাজে চান তারা হাদে গণং।	আকাশের চন্দ্রতারা হস্তে গণিতাম।
সাধি পেচুং মুই বিয়া,	মনসাধে কন্যা বিবাহ দিত,
লোকে মাদেত হাজিয়া।	হাসিমুখে লোকে কথা কহিত।
সর্বলোকে পূজিতাক্৪৬	সর্বত্র সকলে পূজিত,
দে'লে শত্তুরে ভজিদাক্।৪৭	দেখিলে শত্রুও ভজিত।
হাতে পেচুং লেখা বর,	হাতে পাইতাম লেখা বর,
কেইয়াৎ পেচুং রূপ বর।	দেহে পাইতাম রূপ বর।

৩৮। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—দুবাবের অর্থ আমার নিকট সুস্পষ্ট নহে।

৩৮ক। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—পারা।

৩৯। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—মিদা।

৪০। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—গলা।
এস্থলে তেঁদা=তুঁদা, "কণ্ঠ"।

৪১। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—মদুরগা হদ দ্বিবা চোখ্।

৪২। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—সবখানে।

৪৩। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—নাং।

৪৪। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—উবুস্তুম্।

৪৫। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—হুচুং।

৪৬। নিহিত চিন্তা—বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।

৪৭। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—ভজদাক্।

মূল	অনুবাদ
গীত চার৪৮ লামা ফুরেই যায় ।৪৯	গীত চারি পালা ফুরিয়ে যায়,
ওঁদা সাধওর আর বার ।	সযত্নে সাধি কণ্ঠ পুনরায় ।

(৫)

মূল	অনুবাদ
ওঁদাৎ বেরেই কাপড়ান,	জড়িয়ে গলে বসনখানি
ভজিলুং গোজেন৫০ চরণান ।	ভজি গোঁসাইর চরণখানি ।
চরণে ছালামে ভজিলে	প্রণমি শ্রীচরণ ভজিলে
সকল তিথ্যফল পাইবিলে ।৫১	সব তীর্থফল পাইবিরে ।
পাঁচফুল দানফল পেদুংগোই,	পঞ্চপুষ্পদানের ফল পাইতাম,
রথে৫২ বলে৫৩ হদুংগোই ।	রথে বলে শক্তিশালী হইতাম ।
গোজেন সম্মুখে কর পাদং,	গোঁসাই সকাশে পাতিয়া কর
সাতপুত চাই যদি বর মাগং ।	সপ্ত পুত্র চাই, যদি মাগি বর ।
ডেনে মাগং ধন বর,	ডানে চাহি বর মণি-মুক্তা-ধন,
বাঙে মাগং জন বর ।	বামে চাহি বর আত্মীয়স্বজন ।
ধনে সম্পদে সব পুরা	ধন সম্পদ্ সব পূর্ণ ভাণ্ডার
জুরি পাত্তুংগোই হেৎ ঘূড়া৫৪ ।	হাতি ঘোড়া যত হইত যোগাড় ।
যে বড় মাগওর মনের সাধ	মনসাধে মাগিতাম যেই বর
সেই বর পেদুংগোই হাদে হাদ ।	হাতে হাতে লভিতাম সেই বর ।
হাল্যা উবুজিলে৫৫ লেই সাধি,	জন্মিলে কৃষক ঝুড়ি লাভ হ'ত,
জুম্মোয়া৫৬ উবুজিলে তং৫৭ সাধি ।	জুমিয়া হইলে টংঘর মিলিত ।
দেওয়ান উবুজিলে বীর৫৮ সাধি,	যদি দেওয়ান তবে শক্তিমান,
রাজা উবুজিলে সেথাভূয়া৫৯ সাধি ।	জনমিলে রাজা হইত সম্মান ।
কেইয়াৎ পেদুং সাজানা,	অঙ্গে বেশভূষা অতি মনোহর,
ত্রিশতিন জাতিখুন পেদুং গোই খাজানা ।	তেত্রিশ জাতিতে পাইতাম কর ।

৪৮। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—চারি।

৪৯। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—যায়।

৫০। ঘোষপ্রদত্ত পাঠ—গোজেনের।

৫১। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—পাই বেলে। ইহাতে প্রথম চরণের সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হয় না।

৫২। অর্থাৎ, গমনশক্তিতে।

৫৩। অর্থাৎ, দৈহিক শক্তিতে।

৫৪। ঘোষ মহাশয়ের পাঠ—ঘোড়া।

৫৫। উবুজিলে=উপজিলে, উৎপন্ন হইলে, জন্মিলে।

৫৬। জুম করে যে, সে জুম্মা, জুম্মোয়া, জুমিয়া। হলকর্ষণের সাহায্যে জুম করা হয় না।

৫৭। তং=টংঘর, নহবৎখানার ন্যায় উচ্চাকারে নির্ম্মিত ক্ষেত্র পাহারা দেওয়ার মঞ্চবিশেষ। পালি টংকিতমঞ্চ, টং আকারে নির্ম্মিত মঞ্চ।

৫৮। অর্থাৎ পলোয়ান।

৫৯। বর্মিজ 'সিকুক্যা' (নমস্কার)।

মূল	অনুবাদ
খাদে পালঙে ব-থচুং,	খাটে ও পালঙে দিব্বি বায়ু সেবিতাম।
ত্রিশত্রিন জাতি ভাজ, মুই পত্তু,ং।	তেত্রিশ জাতির ভাষা আমি শিখিতাম।
যে বর মাগঙর মনের সাধ	মনসাধে চাহিতেছি যেই বর
সে বর পেদুং হাদে হাদ।	হাতে হাতে লভিতাম সেই বর।
গীত পাচলামা ফুরেই যার,	গীত পাচ পালা হইতে চলিল শেষ,
ভঁদা সাধঙর আরবার।	কণ্ঠ সাধিতেছি পুনঃ, [পাবে নাক ক্লেশ]

(৬)

মূল	অনুবাদ
ভঁদাৎ বেরা কাপড় লই	গলার বসন লয়ে গলে
গোজেন ভজঙর গুজি হই।৬০	গোঁসাইরে ভজি নতশিরে।
মাথা পাতি বত্তা লং,	মাথা পাতি আমি আশীর্বাদ লই,
সাত ভেই সাত ভোন্ বর মাগং।	মাগি বর সাত বোন সাত ভাই।
হাদে ঢালি পানিয়ে	হস্তে ঢালি পাত্র হতে জল অনিবার
দিব মা বশ্বমতী সাক্ষিয়ে৬১।	সাক্ষী দিব বসুন্ধরা জননী সবার।
এগার হাজার চোরাশী সন৬২,	এগার হাজার চৌরাশী চলিত সনে,
কল্না বারে সাধঙর একা মন।	বিশিষ্ট বারেতে সাধি গীত একমনে।
চরণে ছালামে ভজঙর,	গোঁসাইর চরণে ভজি করিয়া প্রণাম,
যেবার ছালাম মেলঙর।	চাহি ভিক্ষা অবসর, বিদায় প্রণাম।
গীত ছয়৬৩ লামা ফুরেয়ে,	ফুরাইল জান এবে পালা ছয় গীত,
বুঝিলে বুঝিব মানেয়ে।	বুঝিলে বুঝিব সত্য মানুষের হিত।
দেবর কুলে দেব মানাই,	দেবকুলে রাজি করি দেবতা সকলে,
মানেই কুলে লোক মানাই ;	নরকুলে রাজি করি এবে সর্ব নরে,
কুনি গেলা সঙ্গী ভেই ?	কোথা গেলে আছ যত মোর সঙ্গী ভাই ?
সাধি সমারি চলি যেই।	সাধি গীত, সাঙ্গ করি চল চলি যাই।

৬০। গুজি হই=কুব্জ হইয়া, নত হইয়া, নত শিরে।

৬১। পাত্র হইতে অবিরল ধারায় জল ঢালিয়া দানীয় বস্তু উৎসর্গ করা চিরপ্রচলিত বৌদ্ধরীতি; আর্যপ্রথাও বটে। উদ্দেশ্য—পৃথিবী-দেবতা মা বসুন্ধরাকে সাক্ষী করিয়া রাখা। কথিত আছে যে, বোধিসত্বও মারজয়ের পূর্বক্ষণে তাঁহার পূর্বকৃত দান বিষয়ে মারের সন্দেহ দূরীকরণের জন্য বসুন্ধরাকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন এবং তাঁহার আহ্বানে পৃথিবী দেবতা সশরীরে আবির্ভূতা হইয়া অজস্র ও বিপুল ধারায় জল প্রবাহিত করিয়া তাঁহার অতুলনীয় দানমাহাত্ম্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়াছিলেন। জাতকাদি বহু পরবর্তী বৌদ্ধগ্রন্থে ইহা বর্ণিত আছে।

৬২। শ্রীমান্ বিপুলেশ্বর দেওয়ান আমাকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পুথিতে 'এগার হাজার'এর পরিবর্তে 'এগার শত' পাঠই আছে। ৺সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঠিকই মন্তব্য করিয়াছেন যে, গীতোক্ত "এগার হাজার চোরাশী সন" সম্ভবতঃ উহার রচনার সময়, এ স্থলে 'শত' অর্থেই "হাজার" সংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং প্রচলিত সন মঘাব্দকেই লক্ষ্য করিয়াছে। ১১৮৪ সন বা মঘাব্দ=১৮২১-২২ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়েই শিবচরণ বাঁচিয়া থাকার কথা। কারণ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে ছয় পুরুষ গত হইলে তাহা মাত্র ১২০।১৩০ বৎসরের কথা। গীতোক্ত সন বঙ্গাব্দ হওয়াও বিচিত্র নহে। তাহা বঙ্গাব্দ হইলে গীতগুলির রচনাকাল মনে করিতে হইবে ১৭৭৬।১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। ৬৩। ঘোষপ্রদত্ত ভুল পাঠ "হয়"।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসচর্চ্চা

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, এম. এ.

১

ইতিহাস রচনার ইচ্ছা অর্থাৎ নিজের, পূর্বপুরুষের, স্বদেশের ও স্বজাতির কীর্তি-রক্ষার আকাঙ্ক্ষা মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এ কথা সর্বদেশের ও সর্বকালের মানুষের পক্ষেই খাটে। একমাত্র ভারতবাসীরাই আদিম কাল হ'তে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বস্তুত অতি পুরাকালে ভারতবাসীদেরও ইতিহাস রচনা এবং ইতিহাস রক্ষার আগ্রহ ছিল, এমন প্রমাণ আছে। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার যে অজস্র প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, তার থেকেই ওই সুপ্রাচীন যুগেও ঐতিহাসিক সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বেদগুলি পার্থিব ঘটনার বিবরণ নয়, ওগুলির উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। তাই বৈদিক সাহিত্যে ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না। তথাপি যে বৈদিক সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঘটনার বহু প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, তার থেকে অনুমান হয়, বেদ-রচনার সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাস-রচনার কার্যও অব্যাহত গতিতেই চলছিল। সুখের বিষয়, এ অনুমানের সমর্থক প্রকৃষ্ট প্রমাণও ওই বৈদিক সাহিত্যেই রয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় ইতিহাস কথাটির অস্তিত্ব এবং তার প্রাচীনতার দ্বারাও প্রমাণিত হয়, প্রাচীন ভারতে ঐতিহাসিক চেতনা ও ইতিহাসচর্চ্চার একান্ত অভাব ছিল না। বস্তুত অথর্ববেদ-সংহিতাতেই (১৫।৬।১১-১২) ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি কথার উল্লেখ আছে। যথা—"তমিতিহাসশ্চ পুরাণং চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্যচলন্। ইতিহাসস্য চ বৈ পুরাণস্য চ গাথানাং চ নারাশংসীনাং চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ।" সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, অথর্ববেদের যুগেই ইতিহাস, পুরাণ, গাথা ও নারাশংসী—এই চার প্রকার লৌকিক সাহিত্য সুপ্রচলিত ছিল। এই চারটি নামের অর্থগত পার্থক্য যথাযথ ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। নারাশংসী শব্দের অর্থ সম্ভবত মহান্ নর বা বীরের প্রশংসাপূর্ণ স্তুতি অর্থাৎ এক ধরণের প্রশস্তি-কাহিনী। গাথা শব্দের অর্থ খুব সম্ভব, লোকচিত্তাকর্ষক কোনো বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে রচিত গীতিকবিতা বা ব্যালাড্। ইতিহাস (=ইতি+হ+আস= ইহাই ছিল অর্থাৎ ইতিবৃত্ত) এবং পুরাণের পার্থক্যটাই সব চেয়ে অস্পষ্ট। মহাভারতে বহু স্থলে দ্বিতীয়ার একবচনে "ইতিহাসং পুরাতনম্" কথার ব্যবহার দেখা যায়। পুরাণ অর্থেই পুরা-কালের আখ্যান বা কাহিনী বুঝায়। সুতরাং 'পুরাতন ইতিহাস' এবং পুরাণ অভিন্নার্থক বলেই মনে হয়। যদি তাই হয়, তবে স্বীকার করতে হবে যে, পুরাণ শব্দের আসল মানে সম্ভবত (tradition-মূলক) প্রাচীন ঘটনার কাহিনী এবং ইতিহাস অপেক্ষাকৃত

অর্বাচীন ঘটনার বিবরণ। মহাভারত গ্রন্থখানি ইতিহাস নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে; আর এ কথাও সুবিদিত যে, উক্ত গ্রন্থের বিশ্রুতনামা রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মহাভারতের মূল ঘটনা অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সমকালবর্তী বলেই কথিত আছে। তার থেকেও অনুমান হয় যে, অনতিপুরাকালের বিবরণই মূলত ইতিহাস নামে কথিত হ'তো। কিন্তু ক্রমশ এই অর্থগত পার্থক্য তিরোহিত হয়েছিল। কারণ, অথর্ববেদে ইতিহাস এবং পুরাণ স্বতন্ত্র ব'লে স্বীকৃত হ'লেও পরবর্তী কালে ও-দুটি কথা সমাসবদ্ধ হ'য়ে একবচনান্ত শব্দ-রূপেই (পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ, উভয় রকম প্রয়োগই দেখা যায়) ব্যবহৃত হয়েছে (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।১,২,৭ দ্রষ্টব্য)। তা ছাড়া, 'ভবিষ্যৎ পুরাণ' নামটার মধ্যেই যে অর্থগত বিরোধ রয়েছে (ভবিষ্যৎ শব্দের দ্যোতনা হচ্ছে ভাবী কালের দিকে এবং পুরাণ কথার ইঙ্গিত হচ্ছে অতীত কালের দিকে), তার থেকেও মনে হয়, অতি পুরাকালেই পুরাণ শব্দের মৌলিক অর্থের ব্যত্যয় ঘটেছিল। ভবিষ্যৎ পুরাণের নাম আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্রেই (২।৯।২৪।৬) উল্লিখিত হয়েছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, উক্ত গ্রন্থ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, সেই প্রাচীন কালেই 'পুরাণ' শব্দটি তার মৌলিক অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। কালক্রমে 'ইতিহাস' কথাটিও খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হ'তে থাকে এবং পুরাণও ইতিহাসেরই অন্তর্গত বলে গণ্য হয়; কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেই তার প্রমাণ আছে; যথাস্থানে এ বিষয়ের আলোচনা করা যাবে। যা হোক, ওই সুপ্রাচীন কালে অর্থাৎ অথর্ববেদ-সংহিতার যুগেই ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার থেকে সহজেই বুঝা যায়, ভারতবাসীরা আদিকালে ঐতিহাসিক চেতনা-হীন বা ইতিহাস রচনায় উদাসীন ছিলেন না। শুধু তাই নয়, শতপথ ব্রাহ্মণে ইতিহাস-পুরাণকে নিত্যপাঠ্য 'স্বাধ্যায়' পর্যায়ভুক্ত ব'লে গণ্য করা হয়েছে (যথা—ইতিহাস-পুরাণং গাথা নারাশংসীরিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে—১১।৫।৬।৮); এমন কি, উক্ত ব্রাহ্মণেই পুরাণকে বেদ ব'লে স্বীকার করতেও কুণ্ঠা বোধ হয় নি (যথা—পুরাণং বেদঃ সোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত—১৩।৪।৩।১৩)। বায়ুপুরাণে (৬০।২১) আছে,—

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কুলকর্মভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥

এর থেকে জানা যাচ্ছে যে, আখ্যান, উপাখ্যান এবং গাথা নিয়ে পুরাণ রচিত হ'তো। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩।২৫) 'আখ্যানবিদ্' কথার উল্লেখ পাই। শতপথ ব্রাহ্মণে (৫।২।৩) 'সূত'কে 'রাজকৃৎ' এবং রাজসভার অন্যতম 'রত্নী' ব'লে অভিহিত করা হয়েছে; আর বায়ু-পুরাণে (১।৩১-৩২) বলা হয়েছে, ঋষি এবং রাজগণের বংশানুচরিত রক্ষা (ঋষীণাং রাজ্ঞাং চামিততেজসাং বংশানাং ধারণম্) অর্থাৎ ইতিহাস-পুরাণ রক্ষা করাই হচ্ছে সূতগণের মুখ্য 'স্বধর্ম'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বৈদিক সংহিতা ও বৈদিক ব্রাহ্মণ রচনার কালে ইতিহাস-পুরাণ বেদতুল্য 'স্বাধ্যায়' ব'লে গণ্য হ'ত এবং 'সূত' বা 'আখ্যানবিদ্' নামধেয় এক শ্রেণীর লোক ইতিহাস-পুরাণ রচনা ও রক্ষার কার্যে নিযুক্ত ছিল। উপনিষদের যুগেও ইতিহাস-

পুরাণের প্রচুর মর্যাদা ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।৪ ; ৭।১,২,৭) তার প্রমাণ আছে। উক্ত উপনিষদের এক স্থলে বলা হয়েছে, ইতিহাস-পুরাণ হচ্ছে পুষ্প এবং অথর্ববেদ হচ্ছে মধুকর (অথর্বাঙ্গিরস এব মধুকৃত ইতিহাস-পুরাণং পুষ্পম্) ; এবং অন্যত্র ইতিহাস-পুরাণকে 'পঞ্চম বেদ'রূপে গণ্য করা হয়েছে ; নারদ স্বীয় অধীত বহু বিদ্যার মধ্যে ইতিহাস-পুরাণকে চতুর্বেদের পরেই স্থান দিয়েছেন—তার থেকেই তৎকালপ্রচলিত বিদ্যাসমূহের মধ্যে ইতিহাস-পুরাণের স্থান কত উচ্চে ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তৎপরবর্তী 'সূত্র' রচনার যুগেও ইতিহাস-পুরাণের ভূয়সী প্রতিষ্ঠার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সাংখ্যায়ন (১৬।২।২৭) ও আশ্বলায়ন (১০।৭) শ্রৌত সূত্র, আপস্তম্ব (২।৯।২৪।৬) ও গৌতম (১১।১৯) ধর্মসূত্র এবং বৌদ্ধ সুত্তনিপাত (৩।৭) গ্রন্থে এই শ্রেণীর সাহিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থে 'ইতিহাস'কে 'পঞ্চম' (বেদ) ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবত-পুরাণেও (১।৪।২০) বলা হয়েছে, "ইতিহাস-পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে"।

কিন্তু ইতিহাসের সব চেয়ে বেশি মর্যাদা দেখা যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে—"সামর্গ্‌যজুর্বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী। অথর্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ" (১।৩) অর্থাৎ সাম, ঋক্ ও যজুঃ, এই তিন বেদ নিয়ে ত্রয়ী ; এই ত্রয়ী এবং অথর্ববেদ ও ইতিহাস-বেদকে নিয়ে সমগ্র বেদ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কৌটিল্যের মতেও ইতিহাসবেদ প্রকারান্তরে পঞ্চম বেদ ব'লেই স্বীকৃত হয়েছে। পূর্বে দেখেছি, শতপথ ব্রাহ্মণে পুরাণকে বেদ ব'লে মানা হয়েছে এবং ইতিহাস-পুরাণকে নিত্যপাঠ্য স্বাধ্যায়রূপে গণ্য করা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রেও এই ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে যে, ক্ষত্রিয় বা রাজন্যগণ প্রত্যহ পূর্বাহ্ণে হস্তী, অশ্ব, রথ ও প্রহরণ চালনার বিদ্যা শিক্ষা করবে এবং অপরাহ্ণে ইতিহাস শ্রবণ করবে—"পশ্চিমমিতিহাসশ্রবণে" (১।৫)। এই উপলক্ষে "জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা" ইত্যাদি মহাভাতের শ্লোকটি (উদ্যোগ, ১৩৬।১৮) স্মরণীয়। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি—অথর্বসংহিতা এবং শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সময় থেকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সময় পর্যন্ত যে যুগ, সে যুগে ভারতবর্ষে ইতিহাস রচনা ও ইতিহাসচর্চার কখনও বিরাম ঘটে নি। বস্তুত সেটাই ছিল ভারতবর্ষে ইতিহাস-চর্চার সব চেয়ে গৌরবের যুগ।

এই প্রসঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে 'ইতিহাস' কথার ব্যাখ্যাটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। অর্থশাস্ত্রের মতে "পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ" (১।৫)। অর্থাৎ এই মতে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র, সবই ইতিহাসের অন্তর্গত। অতএব দেখা যাচ্ছে, কৌটিল্যদত্ত ইতিহাস শব্দের সংজ্ঞার্থ খুবই ব্যাপক। কিন্তু ইতিহাস কথার এই ব্যাপক সংজ্ঞা সকলে স্বীকার করতেন না। মনুসংহিতায় (৩।২৩২) আছে—

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি ।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ ॥

অতএব মনুর মতে ইতিহাস শব্দের সংজ্ঞা খুবই সংকীর্ণার্থক ; কেন না, স্বাধ্যায় (অর্থাৎ বেদ) এবং খিল (যথা—হরিবংশ), এ দুটি ছাড়াও আখ্যান, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, কোনোটিই ইতিহাসের অন্তর্গত ব'লে গণ্য হয় নি। ইতিহাস শব্দের সংকীর্ণার্থক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অর্থশাস্ত্রেও (৫।৬, পৃ. ২৫৭) আছে—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বোধয়েদর্থশাস্ত্রবিৎ"। পাঠান্তরে আছে—"ইতিবৃত্ত-পুরাণাভ্যাম্"। এই পাঠান্তরটিকে স্বীকার করলে একই শব্দের দ্বিবিধার্থক প্রয়োগের দোষ ঘটে না। লক্ষ্য করার বিষয়, এখানে অর্থশাস্ত্রবিৎকে ইতিবৃত্ত ও পুরাণজ্ঞানের অধিকারী ব'লে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ইতিবৃত্ত, পুরাণ ও অর্থশাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে। আধুনিক কালেও অর্থশাস্ত্রবিৎ অর্থাৎ রাজনীতিজ্ঞগণের পক্ষে ঐতিহাসিক জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক ব'লে গণ্য হয়। যা হোক্, ইতিহাস শব্দের কৌটিল্য-ধৃত ব্যাপক সংজ্ঞার্থের সার্থকতা কি, যথাস্থানে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। আপাতত এ শব্দটির পূর্ব্বোক্ত বৃহত্তর অর্থ গ্রহণের এই সুবিধা দেখা যায় যে, তাতে ইতিহাসের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা কিছু সহজ হয়। প্রথমত ইতিবৃত্ত বল্‌তে বুঝা যায় কোনো অনতিপ্রাচীন ঘটনার বিবরণ অর্থাৎ ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু। যেমন, মহাভারতে (১।১।১৫ ১৬) পাই—

ব্রবীমি কিমহং দ্বিজাঃ ।
পুরাণ-সংহিতাঃ পুণ্যাঃ কথা ধর্ম্মার্থ-সংশ্রিতাঃ ।
ইতিবৃত্তং নরেন্দ্রাণাম্ ঋষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥

এখানেও পুরাণকে ইতিবৃত্ত থেকে স্বতন্ত্র ব'লে গণ্য করা হয়েছে। বুঝা যাচ্ছে, রাজা ও ঋষিদের বিবরণ ইতিবৃত্তের আলোচ্য বিষয়। আর পুরাণ মানে প্রাচীন কাহিনী এবং এ রকম কাহিনী প্রায়শই ধর্মবিষয়ক হ'তো ব'লে মনে হয়। অর্থাৎ ইতিবৃত্তকে history proper এবং পুরাণকে mythological ও legendary কাহিনী ব'লে গ্রহণ করাই সঙ্গত বোধ হয়। কৌটিল্য-কথিত আখ্যায়িকা (বৃত্তান্ত) এবং উদাহরণ (দৃষ্টান্ত-চ্ছলে কথিত উপাখ্যান বা episode), এই বিষয় দুটির সার্থকতা কি, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কৌটিল্য ধর্মশাস্ত্র (অর্থাৎ আইন-শাস্ত্র বা code of laws) এবং অর্থশাস্ত্র (অর্থাৎ পলিটিক্‌স্‌কেও) ইতিহাসের অন্তর্গত ব'লে গণ্য করেছেন। তার ফলে ইতিহাসের পরিধি খুবই বিস্তৃত হয়েছে। এদিক্ থেকে বিবেচনা করলে কৌটিল্যের ইতিহাস এবং আধুনিক হিস্‌টরি অর্থের ব্যাপকতায় ও বিষয়ের বৈচিত্র্যে প্রায় সমকক্ষ ব'লেই মনে হবে। কেন না, আধুনিক কালে হিস্‌টরি বল্‌তে আমরা যেমন রাজা-প্রমুখ রাষ্ট্র-নায়ক এবং ধর্ম-প্রবর্তক ও সংস্কারক ঋষিদের (যেমন যীশু, মহম্মদ, লুথার, ক্যাল্‌ভিন) ইতিবৃত্ত বুঝি, তেমনি পৌরাণিক legendসমূহ, রাষ্ট্র-প্রবর্ত্তিত বিবিধ আইন (অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র) এবং রাজনীতি বা পলিটিক্‌স্ (অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র)-ঘটিত সমস্ত বিষয়ের আলোচনাও

বুঝি। সেই প্রাচীন যুগেও যে কৌটিল্য ইতিহাস-বেদকে প্রায় সমগ্রভাবেই আধুনিক অর্থে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, সেটা খুবই বিস্ময়ের বিষয়। ইতিহাস কথাটিকে এমন ব্যাপক অর্থে গ্রহণের অন্য দৃষ্টান্তও আছে ; যথা—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ববৃত্তং কথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।

—আপ্তেকৃত সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানে পূর্ববৃত্ত মানে পুরাবৃত্ত বা ইতিবৃত্ত এবং কথা মানে আখ্যান বা আখ্যায়িকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কৌটিল্যের সংজ্ঞার সঙ্গে এটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পার্থক্য শুধু এই যে, কৌটিল্যের সংজ্ঞা অনুসারে পুরাণকে ইতিবৃত্ত থেকে স্বতন্ত্র ব'লে গণ্য করা হয়েছে এবং কাম-মোক্ষকে ইতিহাসের অন্তর্গত ব'লে ধরা হয় নি। কিন্তু এই সংজ্ঞার মতে পূর্ববৃত্ত বল্‌তে পুরাণকেও বোঝাচ্ছে ব'লে মনে হয় এবং কাম ও মোক্ষ-বিষয়ক উপদেশকে স্পষ্টতই ইতিহাসের অন্যতম উদ্দেশ্যের মধ্যে গণনা করা হয়েছে। বস্তুত এই সংজ্ঞা অনুসারে মানুষের জীবনের সমস্ত বিষয়ই ইতিহাসের আলোচ্য ব'লে ধরা হয়েছে ; এদিক্ থেকে এ সংজ্ঞা আধুনিক ইতিহাসের ধারণা থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়।

যা হোক, এ কথা আর বলা চলে না যে, প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের চর্চা ছিল না কিংবা ভারতবাসীর ঐতিহাসিক চেতনাই কখনও জাগরিত হয় নি। বরং তখন ইতিহাসকে অন্যতম বেদ এবং মানব-জীবনের সকল বিষয় সম্বন্ধে বিপুল জ্ঞানের ভাণ্ডার ব'লে গণ্য করা হ'তো, তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আরও দেখেছি, সাঙ্গ চতুর্বেদের সঙ্গে ইতিহাস-পুরাণও নিত্যপাঠ্য স্বাধ্যায়ের অন্তর্গত ব'লে গণ্য হ'তো। শুধু তাই নয়, ইতিহাস-পুরাণ পাঠ না করলে বেদপাঠও অসম্পূর্ণ থাকৃত ব'লে মনে করা হ'তো। "পুরাণ-পূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতি-জ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ", মহাভারতের এই উক্তি (আদি, ১৷৮৬) থেকেই ওই কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। তা-ছাড়া, বায়ুপুরাণেও (১৷১১৯-২০) স্পষ্টই বলা হয়েছে—

যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্‌বিচক্ষণঃ।
ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।

মহাভারতেও অনুরূপ শ্লোক আছে (আদি, ২৷৩৮২ এবং ১৷২৬৭)। বস্তুতঃ ইতিহাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা এর চেয়ে বেশি হওয়া সম্ভব ছিল না। ইতিহাস-বেদকে যে ঋক্ প্রভৃতি চতুর্বেদের পরেই স্থান দেওয়া হয়েছিল এবং ইতিহাস-পাঠ ব্যতীত শুধু সাঙ্গ বেদপাঠের দ্বারা যথেষ্ট বিচক্ষণতা হয় না, বরং তাতে বেদেরই ক্ষতি সাধন করা হয়, এই যে উক্তি করা হয়েছিল—এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়, প্রাচীন ভারতে ইতিহাসকে কত উচ্চে স্থান দেওয়া হ'তো। বস্তুতঃ আধুনিক ইতিহাসের জন্মভূমি প্রাচীন গ্রীস্ ব্যতীত আর কোথাও ইতিহাসের এতখানি মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে কি না, জানি না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে,

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসকে যেমন অন্যতম বেদ ব'লে গণ্য করা হ'তো, প্রাচীন গ্রীসেও তেমনি ইতিহাসকে বেদ ব'লেই স্বীকার করা হ'তো। কেন না, history বা গ্রীক্ historia শব্দের মৌলিক অর্থই হচ্ছে বেদ বা বিদ্যা। অর্থাৎ 'history' শব্দ এবং 'বেদ' শব্দ উভয়ই মূলত এক ; কারণ, উভয় শব্দেরই মূলে রয়েছে বিদ্ ধাতু, যার অর্থ হচ্ছে 'জানা' (বৃহৎ অক্স্ফোর্ড-অভিধান এবং ওয়েবস্টারের অভিধান দ্রষ্টব্য)। history এবং বেদ শব্দের এই মৌলিক একার্থতা খুবই বিস্ময়কর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যবন (অর্থাৎ গ্রীক) এবং ভারতবাসী, এই উভয় আর্য জাতিই ইতিহাসকে বেদ-জ্ঞানে চর্চা করত। তফাৎ এই যে, যবনদের বেদ মানেই হচ্ছে ইতিহাস এবং ইতিহাসই ছিল তাদের একমাত্র বেদ বা জ্ঞানের ভাণ্ডার, আর আমাদের বেদ মানে ইতিহাস নয় এবং ইতিহাস ছিল আমাদের কাছে পঞ্চম বেদ মাত্র, প্রথম বা একমাত্র বেদ নয়। অর্থাৎ গ্রীকদের কাছে ইতিহাসই ছিল মুখ্য বেদ এবং আমাদের কাছে ইতিহাস ছিল গৌণ বেদ অথবা মুখ্য বেদের অনুষঙ্গ বা অনুপূরক মাত্র। এর থেকেই ইতিহাসের প্রতি গ্রীক ও ভারতীয় মনোভাবের পার্থক্য যায়।

আমরা দেখলাম, বৈদিক ও বেদোত্তর সাহিত্যে পঞ্চম বেদস্বরূপ ইতিহাস-পুরাণের বহু উল্লেখ আছে। তাতে সহজেই অনুমান হয়, তৎকালে ইতিহাস ও পুরাণের বহুল প্রচলন ছিল। এ অবস্থায় স্বভাবতই তৎকালপ্রচলিত ইতিহাস ও পুরাণ-বিষয়ক গ্রন্থাদির পরিচয় জান্‌তে মনে ঔৎসুক্য জাগে। আঠারোটি পুরাণ ও অনেকগুলি উপপুরাণ আধুনিক কালেও প্রচলিত আছে। কিন্তু এগুলি যে পুরাণ-সাহিত্যের আদি রূপ নয়, এ কথা মনে করার হেতু আছে। আদিম পুরাণ-সাহিত্য বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং বর্তমান পুরাণগুলি আদিম পুরাণের পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত অর্বাচীন সংস্করণ মাত্র। আপস্তম্বধর্মসূত্রে (২।৯।২৪।৬) 'ভবিষ্য' পুরাণের উল্লেখ আছে ; কিন্তু তৎকালপ্রচলিত ভবিষ্য পুরাণ ও আধুনিক ভবিষ্য পুরাণ অভিন্ন বলে মনে হয় না। এই ভবিষ্য পুরাণ ছাড়া আর কোনো পুরাণের নাম ঐ সময়কার সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এই তো গেল পুরাণের কথা। ইতিহাস-সাহিত্যের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রাচীন সাহিত্যে তো কোন ইতিহাস-গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়ই না, অষ্টাদশ পুরাণের ন্যায় প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থের কোনো আধুনিক সংস্করণও আমাদের কাছে পৌঁছেনি। তা হ'লে কি এত বহুল উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তৎকালে ইতিহাস-বিষয়ক কোনো গ্রন্থ প্রচলিত ছিল না ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সে সময়ে অনেকগুলি ইতিহাসই প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা যায়, কিন্তু একখানি মাত্র প্রাচীন ইতিহাসের নাম পাওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, ইতিহাস-বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থগুলি সবই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং যে ইতিহাসখানির নাম পাওয়া গিয়েছে, সেখানিকেও অজস্র রূপ পরিবর্তনের ফলে এখন আর চেনা যায় না।

এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি হচ্ছে 'মহাভারত'। মহাভারতের যথার্থ সাহিত্যিক রূপ কি, এ বিষয়ে প্রাচীন কাল থেকেই বহু সংশয় দেখা দিয়েছে। মহাভারতেরই নানা স্থানে দেখতে পাই, এই গ্রন্থ পর্য্যায়ক্রমে পুরাণ, আখ্যান, ইতিহাস, সংহিতা ইত্যাদি বহু নামে অভিহিত হয়েছে (আদি, ১।১৭-২১ দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থকে বেদ, ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতি বহু বিদ্যা-সমন্বিত 'কাব্য' ব'লেও দাবী করা হয়েছে (আদি, ১।৬১-৭২,২।৩৯০)। শুধু তাই নয়, ধর্ম্মার্থ-কাম-শাস্ত্রত্বের দাবীও ছাড়া হয় নি (আদি, ২।৩৮৩)। যথা—

অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা।

এমন কি, কোথাও কোথাও মোক্ষশাস্ত্রত্বের অর্থাৎ বেদত্বের দাবীও উত্থাপিত হয়েছে ; এক স্থলে এই গ্রন্থ 'কাষ্ণ´ বেদ' অর্থাৎ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-রচিত বেদ ব'লেও বর্ণিত হয়েছে (আদি, ২।২৬৮)। যা হোক, এই রকম বহু বিভিন্ন নামে অভিহিত হ'লেও ইতিহাস নামের দাবীটাই যে সর্ব্বাগ্রগণ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রথমতঃ মহাভারতে অন্যান্য নামের ব্যবহার যত বার দেখা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি বার এই গ্রন্থ ইতিহাস ব'লে কথিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সুত্তনিপাত ও অর্থ-শাস্ত্রে ইতিহাসকে পঞ্চম বেদ ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। আর, মহাভারতেও পঞ্চম বেদ ব'লে গণ্য হবার দাবী আছে, যথা—"বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্" (আদি, ৬৩।৮৯)। সুতরাং মহাভারত যে মূলত ইতিহাস, সে বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে না। অর্থাৎ কাষ্ণ´বেদই হচ্ছে পঞ্চম বেদ ; কেন না, কাষ্ণ´ বেদ হচ্ছে মূলত ইতিহাস-বেদ। ভাগবত-পুরাণেও (১।৪।২০-২২) মহাভারতকে প্রকারান্তরে ইতিহাস ব'লেই বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও তদীয় টীকায় বলেছেন, "ভারতাখ্যমিতিহাসং বা।...... কাষ্ণং বেদং পঞ্চমঞ্চ যন্মহাভারতং বিদুঃ।" ইতিহাস শব্দের পরে যে কথাটি মহাভারতের প্রতি সব চেয়ে প্রযোজ্য ব'লে মনে হয়, সেটি হচ্ছে 'আখ্যান'। একাধিক স্থলে এই গ্রন্থ 'আখ্যান-বরিষ্ঠ' ব'লে অভিহিত হয়েছে (আদি, ১।১৮,৫৫)। কিন্তু আখ্যান কথাটি ইতিহাস অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ব'লে মনে হয়। কেন না, একাধিক স্থলে এই গ্রন্থকে 'ইতিহাসোত্তম' ব'লেও বর্ণনা করা হয়েছে (আদি, ২।৩৯,৩৮৫)। আখ্যান-বরিষ্ঠ এবং ইতিহাসোত্তম কথা দুটিকে অভিন্নার্থক ব'লেই বোধ হয়। তা ছাড়া, আখ্যানকেও পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে ("আখ্যান-পঞ্চমৈর্বেদৈঃ"—উদ্যোগ, ৪৩।৪১)। সুতরাং পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও আখ্যান একই বস্তু ব'লে গ্রহণ করাই সমীচীন। অন্যত্র (আদি, ১।৫৪-৫৫) আছে,—

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনম্।
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ।
তমাখ্যান-বরিষ্ঠং স কৃত্বা দ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ। ইত্যাদি। (আদি, ৬৩।৫২ দ্রষ্টব্য)

মহাভারত যখন ইতিহাস-বেদ অর্থাৎ পঞ্চম বেদ, তখন এর কার্ষ্ণ বেদ ব'লে গণ্য হবার দাবী অসঙ্গত নয়। আর পূর্বে ইতিহাসের "ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্" ইত্যাদি যে সংজ্ঞার্থ উদ্ধৃত করা হয়েছে, তদনুসারে মহাভারতের যুগপৎ বেদ (বা মোক্ষশাস্ত্র), ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র ব'লে গণ্য হবার দাবীও অগ্রাহ্য নয়। সুতরাং কৌটিল্য ইতিহাস শব্দের যে ব্যাপক সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন, তাকে অসমীচীন মনে করা যায় না এবং ওই সংজ্ঞার্থ মহাভারতের পক্ষে সর্বতোভাবেই প্রযোজ্য। কৌটিল্য লিখেছেন, রাজন্যগণের পক্ষে প্রত্যহ অপরাহ্ণে ইতিহাস শ্রবণ কর্তব্য। আর, মহাভারতেও আছে—"ইতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা"। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে কৌটিল্যের গ্রন্থের উদ্দিষ্ট রাষ্ট্র-নায়ক হচ্ছেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। যদি তাই হয়, তবে স্বীকার করতে হবে, চন্দ্রগুপ্তের পক্ষেও প্রত্যহ অপরাহ্ণে মহাভারত (বা অন্য কোন ইতিহাস) শ্রবণ করা কর্তব্য ব'লে গণ্য হ'তো।

এই সিদ্ধান্তের একটি বিশেষ সার্থকতাও আছে। পণ্ডিতেরা নানা প্রমাণ সহ দেখিয়েছেন যে, মহাভারত কালক্রমে বিপুলায়তন হ'য়ে উঠেছে এবং ক্রমে ক্রমেই এই গ্রন্থে বহু উপাখ্যান সংযুক্ত হয়েছে। আদিতে এই গ্রন্থে উপাখ্যানাদি ছিল না এবং কাজেই গ্রন্থও খুবই ক্ষীণ-কলেবর ছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কলেবর-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থের নামও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে যখন এটি ক্ষীণকায় ছিল, তখন তার নাম ছিল "জয়" অর্থাৎ তখন পাণ্ডবগণের বিজয়-কাহিনীই ছিল মূল মহাভারতের বিষয়-বস্তু। এই গ্রন্থের আদি নাম যে "জয়" ছিল এবং তখন যে এটি "ইতিহাস" ব'লেই গণ্য হ'তো, তার প্রমাণ মহাভারতেই আছে (আদি, ৬২।২০ ; উদ্যোগ, ১৩৬।১৮)। তা ছাড়া, মহাভারতের প্রথমেই আছে,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

এখানেও 'জয়' শব্দটিকে 'জয়-নামক ইতিহাস' অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন মনে হয়। টীকাকার নীলকণ্ঠও এটিকে অন্যতর অর্থ ব'লে স্বীকার করেছেন। যা হোক্, মহাভারতে যে বিজিগীষুর পক্ষে জয়-নামক ইতিহাস শ্রবণের বিধান দেওয়া হয়েছে এবং অর্থশাস্ত্রেও যে রাজন্যগণের পক্ষে ইতিহাস শ্রবণের বিধান আছে—এটা কিছুই বিচিত্র নয়। কেন না, "মহীং বিজয়তে ক্ষিপ্রং শ্রুত্বা শত্রুংশ্চ মর্দতি" ; চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে বিজিগীষু আখ্যা খুবই প্রযোজ্য, আর তিনি শত্রু-মর্দন এবং মহী-বিজয়ও করেছিলেন। অতএব তিনি যদি মহাভারত অর্থাৎ জয়-নামক ইতিহাস থেকে বিজিগীষার প্রেরণা লাভ ক'রে থাকেন, তা হ'লে সেটা খুব সঙ্গতই হয়েছিল।

যা হোক, আধুনিক মহাভারতের মধ্যে সেই মূল 'জয়'-নামক ইতিহাসখানি বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই জয় ছাড়া আরও ইতিহাস তৎকালে প্রচলিত ছিল ব'লে অনুমান হয়। কেন না, মহাভারতকে একাধিক স্থলে 'ইতিহাসোত্তম' ও 'আখ্যান-বরিষ্ঠ' ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। বহু ইতিহাস বা আখ্যান বিদ্যমান না থাক্‌লে

এ অভিধার কোনোই সার্থকতা থাকে না। অন্যত্র বলা হয়েছে, "যেমন দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদ-সমূহের মধ্যে আরণ্যক, ওষধি-সমূহের মধ্যে অমৃত, হ্রদ-সমূহের মধ্যে সমুদ্র এবং চতুষ্পদ জীবের মধ্যে গোরু শ্রেষ্ঠ, তেমনি ইতিহাসসমূহের মধ্যে (ইতিহাসানাম্) মহাভারত শ্রেষ্ঠ" (আদি, ১।২৬৪-৬৫)। এখানে স্পষ্টতই বহু ইতিহাসের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। বস্তুত প্রাচীন সাহিত্যে ইতিহাস শব্দের বহুবচনান্ত প্রয়োগের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওসব ইতিহাসের নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। আমরা পুরাণ পেয়েছি আঠারোখানি, কিন্তু ইতিহাস পেয়েছি মাত্র একখানি অর্থাৎ 'জয়'। কিন্তু ওই একখানি ইতিহাসও বিপুল মহাভারতের মধ্যে এমন ভাবেই লুপ্ত বা গুপ্ত হ'য়ে আছে যে, ওখানিকে থেকেও নেই ব'লেই মনে করতে হয়। অবশ্য এমনও হ'তে পারে যে, ও সব বিলুপ্ত-নামা ইতিহাসগুলির মধ্যে অনেকগুলিই মহাভারতের বিপুল পরিসরের মধ্যে আত্মগোপন ক'রেই কোনো মতে অস্তিত্ব বজায় রাখ্‌ছে, অর্থাৎ বিশ্ব-কোষ-রূপী মহাভারতের অঙ্গীভূত হ'য়ে গিয়েছে ব'লেই হয়তো আমাদের কাছে তাদের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

৪

সুতরাং দেখা গেল, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস রচনার সূচনা হয়েছিল খুব সগৌরবেই, কিন্তু ইতিহাস রচনা ও রক্ষার উৎসাহ ওই সূচনার পরে আর অগ্রসর হয় নি। যদি ওই উৎসাহ অব্যাহত থাকৃত, তা হ'লে তৎকাল-রচিত ইতিহাসগুলি লুপ্ত হ'তো না, 'জয়'-খানিও বিরাট মহাভারতের মধ্যে চাপা পড়ত না এবং ইতিহাস-রচনার ধারা ক্রমশ পরিপুষ্ট হ'য়ে, সংস্কৃত সাহিত্যে আরও অনেক ইতিহাস-গ্রন্থ আবির্ভূত হ'তো। পুরাণগুলি সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। পুরাণগুলির যে অংশ বস্তুত ইতিহাস, সেই বংশানুচরিতগুলি চর্চার অভাবে ক্রমশ ক্ষীণ ও বিকৃত হয়েছে এবং মহাভারতের ন্যায় ক্রম-বর্ধমান অবান্তর বিষয়-বস্তুর মধ্যে ক্রম-ক্ষীয়মাণ ঐতিহাসিক অংশগুলি গৌণ হ'তে গৌণতর স্থান দখল করেছে। তথাপি সুখের বিষয় এই যে, ওই বংশানুচরিত রচনার ধারা প্রাক্‌-মৌর্য যুগেই থেমে যায় নি, বরং গুপ্ত-যুগের পূর্বকাল পর্যন্ত কোনক্রমে অগ্রসর হয়েছিল; তার পরে ওই ক্ষীণকায় ও শুষ্ক বংশ-তালিকার ধারাও থেমে গেল। সুতরাং বলা যায় যে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকেই ভারতবর্ষের ইতিহাস-রচনার দীপ-নির্বাণ ঘটেছিল। কাজেই তৎপরবর্তী যুগের ইতিহাসের উপর অজ্ঞানতার অন্ধকার ঘনতর হ'য়ে উঠেছিল, এটা কিছুই বিচিত্র নয়। তাই খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম ভাগে বৈদেশিক মনস্বী আবু রিহান মুহম্মদ অল্‌বিরুনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন,—

"Unfortunately the Hindus do not pay much attention to the historical order of things; they are very careless in relating the chronological succession of their kings, and when they are pressed for information and

are at a loss, not knowing what to say, they invariably take to tale-telling" (Dr. E. C. Sachan-সম্পাদিত Alberuni's India, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০-১১)।

এই উক্তির সার্থকতা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে এই উক্তির সমর্থক বহু প্রমাণ আছে।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস-পুরাণ রচনার যে সূচনা হয়েছিল, কালক্রমে তা পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর না হ'য়ে বিপরীত পথ ধ'রে বিনাশের দিকেই অগ্রসর হয়েছিল। তাই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন,—

"The *rudiments* of history are preserved in the Puranas and the Epics" (Ancient Indian History and Civilisation, পৃঃ ১০)।

এই উপলক্ষ্যেই স্বর্গীয় ঐতিহাসিক র‍্যাপসন সাহেব বলেছেন,—

"The struggles between native princes, the rise and fall of empires, have indeed not passed into utter oblivion. Their memory is *to some extent* preserved in the epic poems, in stories of sages and heroes of old, in genealogies and dynastic lists. Such in all countries are the *beginnings* of history; and *in ancient India its development was not carried beyond this rudimentary stage.*" (Camb. History of India, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭-৫৮।)

এই উক্তির সার্থকতা সর্বতোভাবেই স্বীকার্য।

কিন্তু ভারতবর্ষে ইতিহাস-রচনার উদ্যম এই ভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'ল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরদান উপলক্ষ্যে র‍্যাপসন সাহেব বলেছেন,—

"The explanation of this *arrested progress* must be sought in a state of society which, as in mediaeval Europe, tended to restrict intellectual activity to the religious orders. Literatures controlled by Brahmans, or by Jain and Buddhist monks, must naturally represent systems of faith rather than nationalities. They must deal with thought rather than with action, with ideas rather than with events." (ঐ)।

এই উক্তিকে সম্পূর্ণ সত্য ব'লে স্বীকার করা যায় না। যে সামাজিক অবস্থায় (State of Society) ইতিহাস-রচনার প্রাথমিক সূচনা হ'তে কোনো বাধা হ'লো না, সেই সামাজিক অবস্থায় ঐতিহাসিক সাহিত্য-রচনা আর অগ্রসর হ'লো না কেন, র‍্যাপসন সাহেবের উক্ত মন্তব্যে তার সন্তোষজনক উত্তর মেলে না। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতেরা ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, কাব্য, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি সকল বিষয়েই অজস্র গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কিন্তু ইতিহাস-রচনায় কেউ উৎসাহ বোধ করেন নি। সেই জন্যেই দেখি, 'অশ্বমেধ-পরাক্রম' সমুদ্রগুপ্তের কথাও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে স্থান পায় নি এবং বৌদ্ধ ধর্মের গৌরবস্থল রাজর্ষি অশোকের রাজত্ব-কাহিনী লিপিবদ্ধ করার জন্যেও একজন বৌদ্ধ ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হ'লো না। তার কারণ কি? র‍্যাপসন সাহেবের মতে মধ্য যুগের ইউরোপের মতো ধর্মচর্চার একান্ত প্রাধান্যই এই ইতিহাস-বিমুখীনতার জন্যে দায়ী। কেন না, তৎকালে ব্রাহ্মণগণ, বৌদ্ধ শ্রমণ এবং জৈন সন্ন্যাসীরাই প্রধানত সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের কর্ণধার ছিলেন এবং তাঁরা স্বভাবতই সাহিত্যের ধারাকে ধর্মের খাতে

প্রবাহিত করেছিলেন। তার ফলে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই ধর্মের অনুষঙ্গ হিসাবেই চর্চা করা হ'তো, ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে কোনো শাস্ত্রেরই আলোচনা হ'তো না। আমরা জানি, প্রাচীন কালে সবগুলি প্রধান শাস্ত্রই বেদ-চর্চার অঙ্গ হিসাবেই আবির্ভূত হয়েছিল এবং সে ভাবেই ওগুলি স্বীকৃত ও আলোচিত হ'তো। শিক্ষা (উচ্চারণ-তত্ত্ব), ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দার্থ-পরিচায়ক শাস্ত্র বা অভিধান), জ্যোতিষ এবং কল্প (শ্রুতি-সম্মত যাগ-যজ্ঞের বিধানমূলক 'শ্রৌত'-সূত্র, যজ্ঞ-বেদী প্রভৃতির পরিমাপ-বিধায়ক 'শুল্ব'-সূত্র, গার্হস্থ্য জীবনের বিধি-বিধান-বিষয়ক 'গৃহ্য'-সূত্র এবং রাষ্ট্র ও সমাজ-নিয়ামক 'ধর্ম'-সূত্র অর্থাৎ আইন-শাস্ত্র নিয়েই এই 'কল্প'), এই ছয়টি প্রধান শাস্ত্রকেই যে তৎকালে 'বেদাঙ্গ' ব'লে অভিহিত করা হ'তো, তার থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তখন কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই বেদ তথা ধর্ম-নিরপেক্ষ ব'লে গণ্য করা হ'তো না। এই ষড়্‌বেদাঙ্গের মধ্যে কয়েকটি শাস্ত্র (যেমন—শিক্ষা এবং কল্পান্তর্গত তিনটি শাখা) কখনও বৈদিক ধর্মের প্রভাব-মুক্ত হ'তে পারে নি। তন্মধ্যে কল্পান্তর্গত শুল্ব-সূত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন না, এই শুল্ব-সূত্রেই ভারতীয় ক্ষেত্রগণিত বা জ্যামিতির সূচনা হয়েছিল; কিন্তু বেদের প্রভাব-মুক্ত হ'তে পারে নি ব'লেই এই শাস্ত্র গ্রীসের ন্যায় ভারতবর্ষে কখনও স্বতন্ত্র লৌকিক শাস্ত্র ব'লে গণ্য হ'তে পারে নি। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের ষড়্‌দর্শনও অভ্রান্ত বৈদিক আপ্তবাক্যের অধিকারকে কখনও অস্বীকার করতে পারে নি, সে চেষ্টাও করে নি; চার্বাক-দর্শন সে চেষ্টা ক'রে বহু অপবাদ নিয়ে প্রায় বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে; বৌদ্ধ দর্শনও বৈদিক আশ্রয় ত্যাগ ক'রে আত্ম-রক্ষা করতে পারে নি, ভারতবর্ষ থেকেই তিরোহিত হয়েছে। এমন কি, অর্থশাস্ত্র এবং কাম-শাস্ত্রকেও আত্মরক্ষার্থে বেদ ও ধর্মের আবরণে দেখা দিতে হয়েছিল। তথাপি এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, ভারতবর্ষেও কয়েকটি ধর্ম-নিরপেক্ষ বিজ্ঞান সগৌরবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল; যেমন—পাটীগণিত, বীজগণিত, শল্য ও ভৈষজ্য চিকিৎসা-শাস্ত্র (অর্থাৎ আয়ুর্বেদ), নাট্যশাস্ত্র, অলঙ্কার-শাস্ত্র ইত্যাদি। এমন কি, পূর্বোক্ত ষড়্‌বেদাঙ্গের অন্তর্গত কয়েকটি শাস্ত্রও কালক্রমে বেদ তথা ধর্মের প্রভাব-মুক্ত হ'য়ে স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পেরেছিল; যেমন—ছন্দ, ব্যাকরণ, অভিধান এবং জ্যোতিষ। সুতরাং ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ধর্মের আওতাতেই গ'ড়ে উঠেছিল, র‍্যাপ্‌সন সাহেবের এই উক্তি সম্পূর্ণ স্বীকার্য্য নয়। তাই যদি হয়, তা হ'লে একমাত্র ইতিহাসই কেন অর্ধ-বিকশিত হ'য়েই শুকিয়ে গেল, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তো মিলল না। চারটি বেদাঙ্গ কালক্রমে বৈদিক আশ্রয় ত্যাগ ক'রে লৌকিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ইতিহাসের স্থান বেদাঙ্গেরও উপরে ছিল; কেন না, ইতিহাস-বেদ পঞ্চম বেদ ব'লেই গণ্য হ'তো (পূর্বোদ্ধৃত "যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্‌" ইত্যাদি শ্লোক-দ্বয় স্মরণীয়)। কিন্তু পঞ্চম বেদরূপ ইতিহাস-শাস্ত্র ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ হ'য়ে গেল। বহু বিরোধের পর অথর্ববেদ চতুর্থ বেদ ব'লে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেল। কিন্তু ইতিহাস-বেদ পঞ্চম বেদ ব'লে স্বীকৃত হ'য়েও আত্মরক্ষা করতে পারল না। স্বতন্ত্র লৌকিক শাস্ত্ররূপে না হোক্, অন্তত

ধর্মের আশ্রয়েও তো ইতিহাসের ধারা অক্ষুন্ন থাক্‌তে পারত। বস্তুত পুরাণগুলির আশ্রয়ে ধর্মের আবরণের মধ্যে রাজবংশের তালিকাসমূহ অত্যন্ত ক্ষীণ ধারায় কিয়দ্দূর অগ্রসরও হয়েছিল। কিন্তু তার পরেই উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের মরুভূমিতে এই ক্ষীণ ধারাটি হারিয়ে গেল। বৈদিক যুগের বিখ্যাত অগাধ-সলিলা সরস্বতী নদীটি পরবর্তী কালে যেখানে মরুভূমির নীরস বালুকারাশিতে বিনষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল, প্রাচীন ভারতে ঐ স্থানটি 'বিনশন' নামে পরিচিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের যে যুগটিতে বৈদিক কালের ইতিহাস-পুরাণ-সরস্বতীর ক্রমক্ষীয়মাণ ধারাটি চিরতরে বিলুপ্ত হ'য়ে গেল, সে যুগটিকেও আমরা ভারতবর্ষের 'ঐতিহাসিক বিনশন' নামে অভিহিত করতে পারি। কবি বলেছেন,—

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

তত্ত্বের ক্ষেত্রে কবির এই বাণী খুবই সত্য হতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিনষ্ট ধারাটি সম্বন্ধেও কি কবির ওই উক্তি প্রযোজ্য ?

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

শ্রীবিদ্যারণ্য স্বামী (ডক্‌টর শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত)

আচার্য্য বল্লভ-কর্ত্তৃক প্রখ্যাত ব্রহ্মবাদই আজকাল সাধারণত 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন দার্শনিক আচার্য্য শঙ্কর-কর্ত্তৃক প্রখ্যাপিত অদ্বৈতবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষাদ্বৈতব্রহ্মবাদকেই ঐ নামে অভিহিত করিয়াছেন দেখা যায়। যথা 'ব্রহ্মসূত্রে'র স্বকৃত ভাষ্যে—যাহা 'শ্রীকরভাষ্য' নামে পরিচিত,[১] আচার্য্য শ্রীপতি পণ্ডিত (১৪০০ খ্রীষ্টাব্দোপলকাল) লিখিয়াছেন,—

"অতএব ভগবতা ব্যাসেন জগন্মিথ্যাত্ববারণায় 'তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্য' ইতি তজ্জগৎপ্রপঞ্চস্য তৎস্বরূপত্বং নির্দিষ্টং। অধ্যারোপস্ত তস্য তদনন্যস্য বা। নাদ্যঃ। ব্রহ্মণঃ শরীরেন্দ্রিয়শূন্যত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ। শ্রু। 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসী'দিত্যাদৌ সৃষ্টেঃ প্রাক্ দ্বিতীয়বস্তুনিষেধদর্শনাৎ। তদনন্যস্য স্বীকারে শুদ্ধাদ্বৈতভঙ্গপ্রসঙ্গাচ্চ।… অদ্বৈতানামধ্যাসাসম্ভবাৎ…।"[২]

"ততো রজ্জুসর্পবজ্জগজ্জীবমিথ্যাত্ববোধকশুদ্ধাদ্বৈতং…।"[৩]

"…নির্ব্বিশেষব্রহ্মসান্নিধ্যেন প্রধানস্য জগৎকারণত্বব্যবস্থাপকং সর্বদা জীবব্রহ্মাভেদপ্রধানশুদ্ধাদ্বৈতমতং…।"[৪]

"তথা শুদ্ধাদ্বৈতমতং দর্শয়তি। উৎক্রমিষ্যতঃ স্বাবিদ্যোপাধিকং ত্যজতঃ জীবস্য ঘটাকাশমহাকাশবৎ ব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ সর্বদা ব্রহ্মাভিন্নতয়া জীবোপক্রমণং।…অথবা রজ্জ্বারোপিতসর্পভ্রান্তিনিবৃত্তৌ রজ্জুমাত্রপরিশেষবৎ।…"[৫]

"শুদ্ধাদ্বৈতমতস্থানামবিরোধিতয়া অদ্বৈতব্রহ্মণি দ্বৈতপ্রপঞ্চস্বীকারাদ্ভেদাভেদয়োর্ন চৈকত্র বিরোধঃ।"[৬]

আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। এই সকল উক্তিমূলে শুদ্ধাদ্বৈতবাদের যে কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এই,—ব্রহ্ম নির্বিশেষ। অবিদ্যাবশত উহা জীব ও জগৎ-রূপে প্রতিভাসিত হইতেছে। রজ্জুসর্পভ্রান্তি স্থলে সর্পভাব যেমন রজ্জুতে আরোপিত, তেমনই জীব ও জগদ্ভাব ব্রহ্মে অধ্যারোপিত। রজ্জুসর্প যেমন মিথ্যা, জীব এবং জগৎও সেইরূপ মিথ্যা। ব্রহ্মে কোনপ্রকার ভেদ নাই। প্রতীয়মান ভেদপ্রপঞ্চ ঔপাধিক। একই আকাশ যেমন ঘট উপাধিবশত ঘটাকাশ ও মহাকাশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তেমন একই ব্রহ্ম অবিদ্যোপাধিবশত জীব ও ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঘটাকাশ যেমন বস্তুত আকাশই, তেমন জীবও বস্তুত ব্রহ্মই। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন। সর্পভ্রান্তি নিবৃত্ত হইলে যেমন কেবলমাত্র রজ্জুই পরিশেষ থাকে, তেমন অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে নির্বিশেষ অদ্বৈত ব্রহ্মই থাকে। ইহা অদ্বৈতবাদ বা নির্বিশেষাদ্বৈতবাদই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উহাকেই শ্রীপতি শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলিয়াছেন।

১। শ্রীকরভাষ্য, অধ্যাপক সি, হয়বদন রাও কর্ত্তৃক সংশোধিত, বাঙ্গালোর, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ।
২। ঐ, ১। . ১। ১; ৬ পৃষ্ঠা।
৩। ঐ, ১। ১। ১০, ৫৭ পৃষ্ঠা।
৪। ঐ, ১। ৪। ১৫; ১৭১ পৃষ্ঠা।
৫। ঐ, ১। ৪। ২০-২১; ১৭৪ পৃষ্ঠা।
৬। ঐ, ১। ৪। ২০-২১, ১৭৭ পৃষ্ঠা।

বল্লভ ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। স্বমতের প্রচারকালে তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর হইয়াছিল ধরিলেও দেখা যায়, তাঁহার শতাধিক বর্ষ পূর্বে শ্রীপতি শঙ্করমতকেই শুদ্ধাদ্বৈতমত বলিয়াছেন। এইরূপে জানা যায়, বল্লভ একটা প্রাচীন নামেই আপনার মতবাদকে অভিহিত করিয়াছেন।[৭] তাহার কারণ কি? শঙ্করকর্তৃক প্রখ্যাপিত মতবাদকে যে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা হইত, এ কথা কি তিনি জানিতেন না? শ্রীপতির ব্রহ্মসূত্রভাষ্য কি তিনি দেখেন নাই? এই সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর আমরা জানি না। তবে এই কথা বলা উচিত যে, শ্রীপতি ব্যতীত অপর কাহাকেও শঙ্করের মতকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলিতে আমরা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই।

আচার্য্য শঙ্করের মতে, মায়াশবল ব্রহ্মই জগতের কারণ। উহার খণ্ডন প্রসঙ্গে বল্লভের বংশধর গোস্বামী গিরিধর লিখিয়াছেন যে, "তন্মতে কার্য্য ও কারণের সাঙ্কর্য্য আপতিত হয়। উহা নিবৃত্তির জন্যই আচার্য্য (বল্লভ তাঁহার অদ্বৈতবাদকে) 'শুদ্ধ' বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন।"

> "এতন্মতে সুনিষ্পন্নং সাঙ্কর্য্যং কার্য্যকারণে।
> তন্নিবৃত্ত্যর্থমাচার্য্যৈঃ পদং শুদ্ধং বিশেষিতম্॥" ('শুদ্ধাদ্বৈতমার্তণ্ড', ২৬ শ্লোক)

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম মায়াসম্বন্ধরহিত বলিয়াই শুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। শুদ্ধ ব্রহ্মই কার্য্য ও কারণ, মায়িক ব্রহ্ম নহে।

> "মায়াসম্বন্ধরহিতং শুদ্ধমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
> কার্য্যকারণরূপং হি শুদ্ধং ব্রহ্ম ন মায়িকম্॥"—(ঐ, ২৮)

বল্লভের মতে, একমাত্র ব্রহ্মই যে মায়ারহিত শুদ্ধ, তাহা নহে; নাম ও রূপ, জীব ও ঈশ্বর, এবং কার্য্য ও কারণও সেই প্রকার মায়ারহিত শুদ্ধ ব্রহ্ম (অনুভাষ্য, ১।১।৯)। তাই গিরিধর বলেন, শুদ্ধাদ্বৈত পদের সমাসবিশ্লেষণ হয় ত "শুদ্ধং চ তৎ অদ্বৈতং" (কর্ম্মধারয়) অথবা "শুদ্ধয়োঃ অদ্বৈতং" (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) করিতে হইবে।

'শুদ্ধ' পদের 'মায়াসম্বন্ধরহিত' অর্থ গিরিধর 'কঠরুদ্রোপনিষৎ' (৩৮।২ শ্লোক) হইতে গ্রহণ করিয়াছেন মনে হয়। তথায় আছে—,

> "মায়োপাধিবিনির্ম্মুক্তং শুদ্ধমিত্যভিধীয়তে॥"

৭। বিষ্ণুস্বামীর (ত্রয়োদশ খ্রীষ্টশতক) প্রাচীন মতের আধারে বল্লভ আপন মতবাদ প্রপঞ্চিত করেন, তাহা সুবিদিত আছে। কিন্তু বিষ্ণুস্বামী স্বমতকে 'শুদ্ধাদ্বৈতমত' বলিতেন কিনা জানা নাই। তাই আমরা বলিয়াছি যে, ঐ নামকরণ বল্লভই করিয়াছেন। যদি ঐ নাম প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুস্বামীই দিয়া থাকেন, তবে বল্লভের প্রতি কোন অভিসন্ধি আরোপ করা যায় না। কিন্তু বল্লভবংশীয় পণ্ডিত গিরিধরের মতে, ঐ নাম বল্লভই দিয়াছেন। (পরে দেখ)।

কিন্তু ঐ শ্রুতির মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ। যথা—

"তদ্বিদ্যাবিষয়ং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানসুখাদ্বয়ম্।
সংসারে চ গুহাবাচ্যো মায়াজ্ঞানাদিসংজ্ঞকে॥"—(কঠরুদ্র, ১০)
"সদ্রূপং পরমং ব্রহ্ম ত্রিপরিচ্ছেদবর্জিতম্॥"—(ঐ, ২৭।২)
"নির্বিশেষে পরানন্দে"—(৩।১)
তদ্ব্রহ্মানন্দমদ্বন্দ্বং নির্গুণং সত্যচিদ্ঘনম্।"—(৩৪।১)
"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যত্বাদিলক্ষণে।
নির্ভেদং পরমাদ্বৈতং বিন্দতে যো মহাযতিঃ॥"—(২৬)

তথায় আরও ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, ঐ নির্বিশেষ ব্রহ্মই মায়া, অবিদ্যা এবং অন্তঃকরণ উপাধিসম্পর্কে ব্যবহারদৃষ্টিতে ("ব্যবহারতঃ") শুদ্ধ ঈশ্বর, জীব, প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় ও ফল—এই সপ্তবিধ ভেদরূপে কথিত হইয়া থাকে (ঐ, ৩৭-৩৮।১)। মায়োপাধিবিনির্মুক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মই শুদ্ধ ব্রহ্ম।

'মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষদে'ও নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই "শুদ্ধাদ্বৈতব্রহ্ম" বলা হইয়াছে।

"শুদ্ধাদ্বৈতব্রহ্মাহমিতি ভিদাগন্ধং নিরস্য" ইত্যাদি। (২।৪)

"শুদ্ধাদ্বৈতাজাড্যসহজামনস্কযোগনিদ্রাখণ্ডানন্দপদানুবৃত্ত্যা জীবন্মুক্তো ভবতি।"—(২।৫)

"শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধির্ভেদাভাবাৎ। এতদেব পরমতত্ত্বম্।"—(৫)

এখানে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে যে, শুদ্ধাদ্বৈতব্রহ্মে কোন প্রকারের ভেদ নাই। অন্যত্র ইহাও স্পষ্টত বলা হইয়াছে যে, ভেদপ্রপঞ্চ মনঃকল্পিত, মিথ্যা। জ্ঞান হইলে উহার বিলয় হয়।

"প্রপঞ্চলয়ঃ সম্পদ্যতে প্রপঞ্চস্য মনঃকল্পিতত্বাৎ। ততো ভেদাভাবাৎ কদাচিদ্বহির্গতেঽপি মিথ্যাত্বভানাৎ" ইত্যাদি।—(২।৩)

অপর পক্ষে 'ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণোপনিষদে' সবিশেষ ব্রহ্মসম্পর্কে "শুদ্ধাদ্বৈত" বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে মনে হয়।

"ততঃ পিতামহঃ পরিপৃচ্ছতি ভগবন্তং মহাবিষ্ণুং ভগবন্ শুদ্ধাদ্বৈতপরমানন্দলক্ষণ-পরব্রহ্মণস্তব কথং বিরুদ্ধ-বৈকুণ্ঠপ্রাসাদপ্রাকারবিমানাদ্যনন্তবস্তুভেদঃ। সত্যমেবোক্তমিতি ভগবান্ মহাবিষ্ণুঃ পরিহরতি। যথা শুদ্ধসুবর্ণস্য কটকমুকুটাঙ্গদাদিভেদঃ। যথা সমুদ্রসলিলস্য স্থূলসূক্ষ্মতরঙ্গফেনবুদ্বুদকরকলবণপাষাণাদ্যনন্তবস্তুভেদঃ। যথা ভূমেঃ পর্বতবৃক্ষতৃণগুল্মলতাদ্যনন্তবস্তুভেদঃ। তথৈবাদ্বৈতপরমানন্দলক্ষণপরব্রহ্মণো মম সর্বাদ্বৈতমুপপন্নং ভবত্যেব। মৎস্বরূপমেব সর্বং মদ্ব্যতিরিক্তমণুমাত্রং ন বিদ্যতে।"—(৮ম অধ্যায়)

বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতসংজ্ঞা এবং বাদ পরিকল্পনার মূল এইখানে বলা যাইতে পারে। উহার পরিচয় দিতে গিরিধর লিখিয়াছেন,—

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি পঠ্যতে॥৪॥
সর্বং ব্রহ্মাত্মকং বিশ্বমিদমাবোধ্যতে পুরঃ।
সর্বশব্দেন যাবদ্ধি দৃষ্টশ্রুতমদো জগৎ॥৫॥
বোধ্যতে তেন সর্বং হি ব্রহ্মরূপং সনাতনম্।
কার্যস্য ব্রহ্মরূপস্য ব্রহ্মৈব স্যাত্তু কারণম্॥৬॥"—(শুদ্ধাদ্বৈতমার্তণ্ড)

সুবর্ণ এবং সুবর্ণনির্মিত অলঙ্কারের দৃষ্টান্তও তিনি দিয়াছেন (২০ শ্লোক)[৮]। কিন্তু ঐ শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্মৈক্যভাবনার এবং ব্রহ্মভবন বা ব্রহ্মনির্বাণের সুস্পষ্টোল্লেখ আছে।

"উপাসকস্ততোঽহমেবেত্যেবংবিধং নারায়ণং ধ্যাত্বা প্রদক্ষিণনমস্কারান্ বিধায় বিবিধোপচারৈরভ্যর্চ্য নিরতিশয়াদ্বৈতপরমানন্দলক্ষণো ভূত্বা তদগ্রে সাবধানেনোপবিশ্যাদ্বৈতযোগমাস্থায় সর্বাদ্বৈতপরমানন্দলক্ষণাখণ্ডামিততেজোরাশ্যাকারং বিভাব্যোপাসকঃ স্বয়ং শুদ্ধবোধানন্দময়ামৃতনিরতিশয়ানন্দতেজোরাশ্যাকারো ভূত্বা মহাবাক্যার্থমনুস্মরন্ ব্রহ্মাহমস্মি অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা। অহং ব্রহ্মেতি ভাবনয়া যথা পরমতেজো মহানদীপ্রবাহপরমতেজঃপারাবারে প্রবিশতি। যথা পরমতেজঃপারাবারতরঙ্গাঃ পরমতেজঃপারাবারে প্রবিশন্তি তথৈব সচ্চিদানন্দাত্মোপাসকঃ সর্বপরিপূর্ণাদ্বৈত-পরমানন্দলক্ষণে পরব্রহ্মণি নারায়ণে ময়ি সচ্চিদানন্দাত্মকোঽহমজোঽহং পরিপূর্ণোঽহমস্মীতি প্রবিবেশ। তত উপাসকো নিস্তরঙ্গাদ্বৈতাপারনিরতিশয়সচ্চিদানন্দসমুদ্রো বভূব। যস্ত্বনেন মার্গেণ সম্যগাচরতি স নারায়ণো ভবত্যসংশয়মেব।"

—(ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণোপনিষৎ, ৮ অধ্যায়)

কিন্তু বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে ঐগুলি স্বীকৃত হয় না। বরং উহার নিন্দা আছে। অপর পক্ষে শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈতবাদে উহারা যথাযথ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। ক্রমভেদাভেদবাদ এবং শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদেও অভেদ উপাসনা এবং ব্রহ্মনির্বাণ স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং একমাত্র ঐ দুই বিষয়ের সদ্ভাব হইতে অনুমান করা যায় না যে, 'ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণোপনিষদে' অদ্বৈতবাদের উল্লেখ আছে। তাই আমরা অধিক প্রমাণ দিতেছি। "মূলাবিদ্যাপ্রলয়" বর্ণনা প্রসঙ্গে তথায় বিবৃত হইয়াছে যে,—

"ততঃ সবিলাসমূলাবিদ্যা সর্বকার্যোপাধিসমন্বিতা সদসদ্বিলক্ষণানির্বাচ্যা লক্ষণশূন্যাবির্ভাবতিরোভাবাত্মিকানাদ্যখিলকারণকারণানন্তমহামায়াবিশেষণবিশেষিতা পরমসূক্ষ্মমূলকারণমব্যক্তং বিশতি। অব্যক্তং বিশেদ্ব্রহ্মণি নিরিন্ধনো বৈশ্বানরো যথা। তস্মান্মায়োপাধিকং আদিনারায়ণস্তথা স্বস্বরূপং ভজতি। সর্বে জীবাশ্চ স্বস্বরূপং ভজন্তে। যথা জপাকুসুমসান্নিধ্যাদ্রক্তস্ফটিকপ্রতীতিস্তদভাবে শুদ্ধস্ফটিকপ্রতীতিঃ। ব্রহ্মণোঽপি মায়োপাধিবশাৎ সগুণপরিচ্ছিন্নাদিপ্রতীতিরুপাধিবিলয়ানির্গুণনিরবয়বাদিপ্রতীত্যুপনিষৎ।"—(৩য় অধ্যায়)

অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপে নির্গুণ ও নিরবয়ব। কিন্তু মায়োপাধিবশত সগুণ ও সাবয়ব বলিয়া প্রতীত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্ফটিক ও জপাকুসুম। স্ফটিক স্বভাবত শুদ্ধ বা বর্ণহীন। কিন্তু লাল জপাকুসুমের সান্নিধ্যে শুদ্ধ স্ফটিক লাল বলিয়া প্রতিভাত হয়। ঐ জপাকুসুম অপসারিত হইলে স্ফটিক যেমন আপন শুদ্ধ স্বরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ মায়োপাধি বিনাশে ব্রহ্ম স্বস্বরূপে অবস্থান করে। জীবসমূহও তখন স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ব্রহ্মের প্রতীয়মান ধর্মসমূহ অধ্যস্ত, তাঁহার স্বরূপগত নহে। সমগ্র জগৎ মূলাবিদ্যাবিলাস মাত্র। উহা

৮। সুবর্ণ ও সুবর্ণনির্মিত অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত আচার্য্য শঙ্করও দিয়াছেন :

"সুবর্ণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বং চ শাশ্বতম্।

ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বং চ তথা ভবেৎ।"—(অপরোক্ষানুভূতি, ২১)

এই বচনটি বস্তুত 'যোগশিখোপনিষদে'র (৪।৭)। কিন্তু উহার তাৎপর্য্য ব্রহ্মকে সর্বাত্মক বা সর্বকে ব্রহ্মাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করা নহে। সর্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করত একমাত্র ব্রহ্মবুদ্ধি উদ্বোধিত করাই, শঙ্করের মতে, উহার তাৎপর্য্য :

সর্বকার্যোপাধিসমন্বিতা, সদসদ্বিলক্ষণা, অনির্বাচ্যা এবং লক্ষণশূন্যা। উহা অনাদি, আবির্ভাবতিরোভাবাম্বিতা, অখিলকারণকারণ, অনন্ত এবং মহামায়াবিশেষণবিশেষিতা। ইহাই উপনিষৎ।

অনন্তর "মহামায়াতীত অখণ্ডাদ্বৈতপরমানন্দলক্ষণ পরব্রহ্মের পরমতত্ত্বস্বরূপ নিরূপণ" শ্রুতি এই প্রকারে করিয়াছেন,—

"ওঁ ততস্তস্মান্নির্বিশেষমতিনির্মলং ভবতি। অবিদ্যাপাদমতিশুদ্ধং ভবতি। শুদ্ধবোধানন্দলক্ষণকৈবল্যং ভবতি। ব্রহ্মণঃ পাদচতুষ্টয়ং নির্বিশেষং ভবতি। অখণ্ডলক্ষণাখণ্ডপরিপূর্ণসচ্চিদানন্দস্বপ্রকাশং ভবতি অদ্বিতীয়মনীশ্বরং ভবতি।... কার্য্যকারণোপাধিভেদাজ্জীবেশ্বরভেদোঽপি দৃশ্যতে।

কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ

ঈশ্বরস্য মহামায়া তদাজ্ঞাবশবর্ত্তিনী

...এতাং মহামায়াং তরন্ত্যেব যে বিষ্ণুমেব ভজন্তি নান্যে তরন্তি কদাচন। বিবিধোপায়ৈরপি অবিদ্যাকার্য্যাণ্যন্তঃকরণান্যতীত্য কালানন্তরং তানি জায়ন্তে। ব্রহ্মচৈতন্যং তেষু প্রতিবিম্বিতং ভবতি। প্রতিবিম্বা এব জীবা ইতি কথ্যন্তে। অন্তঃকরণোপাধিকাঃ সর্বে জীবা ইত্যেবং বদন্তি। মহাভূতোত্থসূক্ষ্মাঙ্গোপাধিকাঃ সর্বে জীবা ইত্যেকে বদন্তি। বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যং জীবা ইত্যপরে মন্যন্তে। এতেষামুপাধীনামত্যন্তভেদো ন বিদ্যতে। সর্বপরিপূর্ণো নারায়ণস্তনয়া নিজয়া ক্রীড়তি স্বেচ্ছয়া সদা।"—(৪র্থ অধ্যায়)

(অবিদ্যাবিলয়ে) ব্রহ্ম অতিনির্ম্মল এবং নির্বিশেষ হয়। উহা অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও সপ্রকাশ হয়। অদ্বিতীয় এবং অনীশ্বর হয় অর্থাৎ ঈশ্বরভাব তখন থাকে না।...কেন না, ব্রহ্মের ঈশ্বরভাব ও জীবভাব ঔপাধিক। কার্য্যোপাধি সম্পর্কে ব্রহ্ম জীব এবং কারণোপাধি সম্পর্কে ঈশ্বর বলিয়া কথিত হয়। মহামায়া ঈশ্বরের অধীন, (আর জীব মহামায়ার অধীন)।...বিষ্ণুর ভজন দ্বারা জীব মহামায়ার কবল হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। বিবিধ উপায়ে জীব অবিদ্যাকার্য্য অন্তঃকরণসমূহ অতিক্রম করিতে পারে। ঐ সকল কালে উৎপন্ন হয়। অনন্তর ব্রহ্মচৈতন্য উহাদিগেতে প্রতিবিম্বিত হয়। জীবসমূহ প্রতিবিম্ব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণোপাধি অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যই জীব, এমনও বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চমহাভূতাত্মক সূক্ষ্মাঙ্গোপাধি অবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব। অপরে মনে করেন, বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। ঐ সকল উপাধিও অত্যন্ত ভিন্ন নহে। কেন না, ঐ সকল নারায়ণই (ব্রহ্মই)। ব্রহ্মই উপাধিরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছেন।

এই নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, মায়াবাদ, উপাধিবাদ, বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ এবং জীবেশ্বরজগন্মিথ্যাবাদ একমাত্র শঙ্করের অদ্বৈতবাদেই স্বীকৃত হইয়া থাকে, অপর কোন বাদে নহে। এইরূপে দেখা যায়, 'ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণোপনিষদো'ক্ত শুদ্ধাদ্বৈতব্রহ্মবাদও বস্তুত নির্বিশেষাদ্বৈতবাদই। সবিশেষাদ্বৈতবাদের সঙ্গে উহার সমন্বয় তথায় কি প্রকারে সাধিত হইয়াছে, তাহার আরও বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (১০)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

তারিণীচরণ মিত্র

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সহিত কোনও সম্পর্ক না থাকিলেও হিন্দুস্থানী বিভাগের দ্বিতীয় মুন্‌শী তারিণীচরণ মিত্র ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ জন্ গিল্‌ক্রাইষ্টের উৎসাহে তৎসম্পাদিত *The Oriental Fabulist or Polyglot Translations of Esop's and Other Ancient Fables from The English Language*...পুস্তকের বাংলা অংশ অনুবাদ করিয়া বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন দখল করিয়া আছেন। 'দি ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট' পুস্তকের ফার্সী ও হিন্দুস্থানী অনুবাদও তারিণীচরণকৃত।

তারিণীচরণ মিত্রের কীর্ত্তি ও জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর জানা যায় না। কলিকাতা রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ৫ সংখ্যক গ্রন্থ 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট'-এর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তারিণীচরণ সম্বন্ধে যতটুকু সংবাদ দিয়াছেন, ততটুকুই আমাদের উপজীব্য। তারিণীচরণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সেখান হইতেই সঙ্কলিত হইল।

তারিণীচরণ কলিকাতার লোক ছিলেন। কলিকাতার উত্তর-সিমলা বা পুরাতন-সিমলা অঞ্চলে কোথাও তাঁহার বাস ছিল। আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি তাঁহার যুগের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন; ইংরেজী, উর্দ্দু, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষাতে তাঁহার কয়েকটি মূল ও অনুবাদপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে তারিখে তারিণীচরণ জন্ গিল্‌ক্রাইষ্টের অধীনে মাসিক এক শত টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের দ্বিতীয় মুন্‌শীরূপে নিযুক্ত হন। প্রধান মুন্‌শী হন মীর বাহাদুর আলী। তারিণীচরণ কলেজের দক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন, স্বীয় কর্ম্মনিপুণতায় তিনি দ্রুত উন্নতি করেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর হিন্দুস্থানী বিভাগের তৎকালীন প্রধান মুন্‌শী মীর সের আলী আফশোষের মৃত্যু হইলে তারিণীচরণ মাসিক দুই শত টাকা বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩০ সনের মে মাস পর্য্যন্ত তিনি দক্ষতার সহিত এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মাসিক এক শত টাকা পেন্‌শনে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর।

'দি ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি' ১৮১৭ সনের ৪ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। তারিণী-চরণ সূত্রপাত হইতেই এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের

প্রথম বার্ষিক বিবরণে পরিচালক-সমিতির সদস্যরূপে তিন জন বাঙালীর নাম পাওয়া যায়; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্র। তারিণীচরণ সমিতির দেশীয় সম্পাদক (নেটিব সেক্রেটরী) ছিলেন। এই সমিতির উদ্যোগে বাংলা, উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষায় কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়; অধিকাংশই অনুবাদ। অনুবাদে তারিণীচরণের হাত ছিল। তারিণীচরণ দীর্ঘকাল কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির সহিত যুক্ত ছিলেন; ১৮৩০-৩১ সনের কার্য্যবিবরণেও সদস্য হিসাবে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে এদেশীয় হিন্দু বাঙালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান ব্যক্তিরা মিলিত হইয়া "ধর্ম্মসভা" নামে এক সভা স্থাপন করেন; সতীনিবারণ-আইনের বিরুদ্ধে ইহারা আন্দোলন করিয়াছিলেন। তারিণীচরণ এই সভার সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, জানা যায় নাই।

দুইখানি বাংলা অনুবাদ-পুস্তকের সহিত তারিণীচরণের নাম সংযুক্ত আছে। ১। 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট'। ২। 'নীতিকথা'।

ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট (**The Oriental Fabulist** ··) জন্ গিল্‌ক্রাইষ্টের তত্ত্বাবধানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে কলেজের অর্থানুকূল্যে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে মূল ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দুস্থানী, ফার্সী, আর্বী, ব্রজভাষা, বাংলা ও সংস্কৃত, এই ছয় ভাষার অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। সমগ্র পুস্তকটি রোমান হরফে মুদ্রিত। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ—

The /Oriental Fabulist /or/ Polyglot Translations /of/ Esop's and other/ Ancient Fables /from/ The English Language, /into / Hindoostanee, Persian, Arabic, /Brij B,hak,ha Bongla, /and/ Sunskrit, /in the/ Roman Character, /By/ Various Hands /Under/ The Direction and Superintendence /of/ John Gilchrist, /For The Use of/ The College of Fort William. /Calcutta, /Printed At The Hurkaru Office./ 1803./

এই পুস্তকের বাংলা অংশ যে তারিণীচরণের অনুবাদ, তাহা গিল্‌ক্রাইষ্টের ভূমিকা হইতে জানা যায়। তিনি বলিতেছেন—

The names of the Learned Natives who have generally been employed on this Polyglot Translation, are as follows :
Tarnee Churun Mitr,　　Bungla, Persian & Hindoostanee.
It behoves me now more particularly to specify, that to TARNEE CHURUN MITR's patient labour and considerable proficiency in the English Tongue, am I greatly indebted for the accuracy and dispatch, with which the Collection has been at last completed. The public may yet feel, and duly appreciate the benefit of his assiduity and talents, evident in The Bungla Version, ... (Pp. xxiv-xxv).

গিল্‌ক্রাইষ্টের ভূমিকা হইতে আরও জানা যায় যে, বাংলা অংশকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। অনুবাদের দিক্ দিয়া বাংলা অংশকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন। এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানা যায় না। রেভারেণ্ড লঙের বাংলা পুস্তকতালিকায় স্বতন্ত্র বাংলা সংস্করণের উল্লেখ নাই।

তারিণীচরণ মিত্রের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল; মাঝে মাঝে ইংরেজী বাক্যভঙ্গী অনুসৃত হইলেও কমা সেমিকোলেন প্রভৃতি বিরামচিহ্ন প্রয়োগে সহজেই অর্থবোধ হয়। দৃষ্টান্ত-

'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট' পুস্তকের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

FROM THE ANCIENTS. 103

mahin nak,hyo. Kifan kuhyo, re koo jati kritug,hnee! tuen mohi b,hulo fik,ha,yo ki oopukar ujog uo upatru pue kurnon ketee mooruk,hta hue. Yih kuhi, bufoola oot,ha,e famp kuo took took ki,yo.

Sid-d,hant, K,hoten kee fuha,yuta kurnee, kue du,ya oonpue kurnee jo upatr huen fo apnee fujjunuta,ee gunwa,onee hue.

BONGLA.

Ushto doshbo kot,ha Grohust,ho o Shorper.

Ek bishishto Grohost,h,oo dek,hilek je ek Shorp ek berar tula,e sheete jora ho,i,ya pra,e mrityoo bot ho,i,yach,he, ihate tahar du,ya ho,ilo; ebong tahake g,hure ani,a, ognir nikot rak,hilek ar tatka doogd,ho k,hawa,ilek. E,iprokar ahar o poshone Shorpo tok,honi shojeeb ho,ilo kintoo hingsha koroner bilok,hyon shamort,ho na pa,ite,i Grohost,her streer proti duorilo, ebong tahar pootrodiger ek jon ke dongshilek; pore shomosto poribar ke byost,hotate o b,ho,yete p,helilek. Grohost,ho kohilek, ore kritog,hno pashondo! too,i amake bilok,hyon shik,ha,ili je neech o ojogyer proti oopokar koron kemon obichar. E,i kohi,ya, ek koot,haree oot,ha,i,ya shorpoke kati,ya k,hondo k,hondo korilek.

P,hol, dooshter pooshti koron ot,hoba ojogyer proti onoogroho koron amardiger shoob,hoch inton brit,ha noshto koron iti.

SUNSKRIT.

Ushtadushu kut,ha Grameenu B,hoojungumu,yoh.

Eko Grameenus sumeecheennu munooshyuh kusyashchit tiruskurinyas tule ekum Sureesripum sheetartum murunapunnum drishtwa, unookum-

স্বরূপ 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্টে'র "তৃতীয় কথা পেট ও শরীরের খণ্ডের" কাহিনী অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি।

একবার এমন সঙ্ঘটন হইল যে শরীরের খণ্ড সকল পেটের চরিত্র হইতে রুষ্ট হইয়া এই স্থির করিলেক, যে পূর্বাপর মতে ইহাকে আর খাদ্য যোগাইব না। প্রথম জিহ্বা দুষ্ট ভাষাতে তাহাদিগের দুঃখ বিস্তারিত কহিলেক; এবং হাতে পায়ের কৃতিত্ব ও পরিশ্রম অত্যন্ত বাখানিয়া কহিলেক, এ কি প্রমাদ আর অসঙ্গত হইল যে এমন স্থূল ও অলস উদর, যে নিতান্ত অকেজুয়া, আপনার কর্ম্ম আপনি করিতে অশক্ত, এবং অতিশয় লোভী তাহার নিমিত্তে আমাদিগের শ্রমের ফল নষ্ট হইবেক। এই কথা সকল অঙ্গেরা একত্র হইয়া প্রশংসাপূর্বক গ্রহণ করিলেক তৎক্ষণাৎ হস্ত কহিলেক আমি আর

শ্রম করিব না ; পা বলিলেক নাড়াভুঁড়ীর ভার, যাহাতে অদ্যাবধি আমি আক্রান্ত ছিলাম আর বহিব না ; বরং সেই দাঁত অমান্ত হইল যে তাহার কারণ এক গ্রাসও চাবাইব না। এমত উৎপাতে পেট তাহাদিগে ব্যগ্রতা করিলেক যে তোমরা অবধানপূর্বক বিচার করহ ; আর নিবুর্দ্ধি ন্যায় হুলস্থুল করিও না। তোমারদিগের মধ্যে এমন কেহ নাহি যে জানে না, তোমরা আমাকে যাহা দেও তাহা তৎক্ষণাৎ তোমাদিগের কর্মে আইসে, আর তোমাদিগের সকলের হিতের নিমিত্তে আমার উপলক্ষ্যে সকল শরীরে প্রবেশ হয়। কিন্তু তাহার এ বাদানুবাদ বৃথা হইল, তাহার কারণ এই যে যতক্ষণ রাগের প্রাদুর্ভব থাকে জ্ঞানের কথা প্রায় অনবধান করে। অতএব এ উপদ্রব থামান তাহার অসাধ্য হইল। তাহাদিগের অসহায়তায় সে উপবাস করিলেক, শরীর শুখাইয়া অস্থিসার হইল। অঙ্গ সকল ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া শেষে আপনাদিগের ভুল বুঝলেন, এবং স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত হইতে মনস্থ করিলেন···

এই পুস্তকের কোনও পরবর্ত্তী সংস্করণ আমরা দেখি নাই।

'নীতিকথা'—(*Fables, in the Bengalee Language, for the use of Schools.* First part.) এই পুস্তকখানি তারিণীচরণ একেলা লেখেন নাই। ইংরেজী ও আর্বী হইতে তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন ৩১টি কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করিয়া কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির উদ্যোগে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'নীতিকথা' প্রকাশ করেন।

পুস্তকটির আখ্যাপত্র এইরূপ—

নীতিকথা | পাঠশালার নিমিত্তে | কলিকাতা স্কুল | বুক সোসাইটী | দ্বারা | বাঙ্গলা ভাষায় | তর্জ্জমা করিয়া সংগ্রহ ও মুদ্রিত করা গেল। C. S. B. S. | কলিকাতা | শ্রীবিশ্বনাথ দেবের | ছাপাখানায় ছাপা হইল | ইং ১৮১৮ | এপ্রিল মাস |

পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩৫। কোন্ কাহিনী কাহার অনুবাদ, নির্ণয় করিবার উপায় নাই। আমরা ভাষা ও রচনারীতি দেখাইবার জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

কোন সময় এক সিংহ একটা বলদ শিকার করিতে মনস্থ করিলেক কিন্তু বলদের বলাধিক্য হওন প্রযুক্ত নিকটে যাইতে পারিলেক না পরে তাহাকে ছলিবার জন্যে নিকটে গিয়া কহিলেক ওহে বলদ আমি একটা হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার ছা মারিয়াছি অতএব আমার বাসনা এই যে অদ্য রাত্রে তুমি আমার গৃহে অধিষ্ঠান হইয়া ভোজন কর বলদ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেক···

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দেই 'নীতিকথা' প্রথম ভাগের তিনটি সংস্করণ হয়, ১ম সং ৫০০, ২য় সং ১০০০ এবং ৩য় সং ৪০০০। পরে বহু সংস্করণ হইয়াছিল। ঐ বৎসরেই 'নীতিকথা'র দ্বিতীয় খণ্ডও বাহির হয় ; এই খণ্ড সংকলন করেন—মে, হার্লি ও পীয়ার্সন। তারিণীচরণ ইহার হিন্দী অনুবাদ করেন। 'নীতিকথা' ১ম ভাগ তৃতীয় সংস্করণে, পুস্তকে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন সম্বন্ধে একটি কৌতুককর মন্তব্য আছে। তাহা এই—" , এরূপ চিহ্ন দ্বারা যে বিচ্ছেদ দেওয়া যায় সে স্থানে এক এই উচ্চারণ করিতে যে সূক্ষ্ম কালবিলম্ব হয় তাহার জ্ঞাপন। ; দ্বিতীয় চিহ্ন পূর্ব্বচিহ্ন হইতে দ্বিগুণ বিলম্ববোধক।"

কেদারনাথ মজুমদার-প্রণীত 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের (১৯১৭) ৪৪ পৃষ্ঠায় 'নীতিকথা' সম্পর্কে এই মন্তব্য দেওয়া হইয়াছে—

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক বিদ্যালয়ের বালকদিগের জন্য ইংরেজী ও আরবী ভাষা হইতে সংগৃহীত। বর্দ্ধমান খৃষ্টীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ষ্টুয়ার্ট সাহেবের কেরাণী তারাচাঁদ মিত্র রাজাবাহাদুরকে ইহার অনুবাদ কার্য্যে সাহায্য করেন। ১৮১৮ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এই পুস্তক প্রকাশ করেন।

এই উক্তি সর্ব্বৈব ভুল।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' নামক মাত্র একখানি পুস্তকের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজীবলোচনের নাম। তাঁহার অন্য কোনও পুস্তক বা রচনার কথা জানা যায় নাই। রাজীবলোচনের জীবনকাহিনীও যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত; "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ২ সংখ্যক গ্রন্থ 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'এর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কলেজের কার্য্যবিবরণাদিতে এই পুস্তকের যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, তাহাতে লেখকের পরিচয় এইরূপ দেওয়া ছিল—"descended from the family of the Rajah" অর্থাৎ রাজীবলোচন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের (কৃষ্ণনগর) পরিবারসম্ভূত ছিলেন। এইটুকুই তাঁহার বংশ-পরিচয়। তাঁহার কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে আমরা এইটুকুমাত্র অবগত হইয়াছি যে, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগে উইলিয়ম কেরীর অধীনে রাজীবলোচন মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেরীর উৎসাহে তিনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া তাঁহারই হস্তে প্রদান করেন। কেরীর সুপারিশে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ রাজীবলোচনের ১০০৲ টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন এবং পুস্তক ছাপা হইলে ১০০ খণ্ড ক্রয় করিতে স্বীকৃত হন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ সনে প্রকাশিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের পণ্ডিতগণের তালিকায় রাজীবলোচনের নাম নাই। কেরীর জীবনীকার এস্. পীয়র্স সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে রাজীবলোচনের কেরীর সহিত দীর্ঘ উনত্রিশ বৎসরকাল যুক্ত থাকার কথা লিখিয়াছেন।

পরবর্ত্তী কালে 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' পুস্তকের অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ পুস্তকের আখ্যাপত্রের প্রতিকৃতি ১২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' পুস্তকের ভাষা সর্ব্বত্রই সংস্কৃতানুসারী, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র মত আর্বী ফার্সীর কোনও প্রভাব এই পুস্তকে পরিলক্ষিত হয় না। বাক্যরীতি সরল এবং ভাষা মোটের উপর প্রাঞ্জল। পরবর্ত্তী কালে এই পুস্তকের বহুল প্রচার দেখিয়া মনে হয়, এই ভাষা সেকালে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। কিছু নমুনা দিতেছি।

এক দিবস অন্তঃকরণে হইল শিকারে যাইব পরে ভৃত্যবর্গেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন আমি মৃগয়া করিতে যাইব তোমরা সকলে সসজ্জ হও আজ্ঞা প্রমাণে সকলে প্রস্তুত হইল। রাজা অশ্বারোহণে গমন করিয়া নিবিড় বনে মৃগয়া করেন ইতিমধ্যে এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন অতিরম্য স্থান চারিদিগে নদী মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং স্থানে২ অনেক পশু পক্ষী আছে নানা প্রকার শব্দ হইতেছে রাজা স্থান নিরীক্ষণ করিলেন এ অপূর্ব্ব স্থান আমি এইখানে কিছু দিন বিশ্রাম করিব রাজাজ্ঞাক্রমে ভৃত্যবর্গেরা

রাজার থাকিবার উপযুক্ত স্থান করিয়া দিয়া পশ্চাৎ আপনারদিগের স্থান করিয়া সকলেই সেই স্থানে বাস করেন। পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি এই স্থানে পুরী নির্ম্মাণ করিব পাত্রকে শীঘ্র আনয়ন কর রাজাজ্ঞানুসারে দূত গিয়া পাত্রকে আনিল পাত্রকে দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তুমি এই স্থানে অপূর্ব্বা এক পুরী প্রস্তুতা কর যেন কোনরূপে কেহ নিন্দা না করে। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি রাজধানীতে গমন করুন আমি পুরী নির্ম্মাণ করাই পশ্চাৎ প্রস্তুতা হইলেই মহারাজ আসিয়া দেখিবেন। পাত্রের বাক্যে রাজা রাজধানীতে আগমন করিলেন পাত্র সেই স্থানে থাকিয়া পুরী নির্ম্মাণ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন চারিদিগে যে নদী আছে সেই গড় হইল দক্ষিণ দিগের নদী বন্ধন করিয়া প্রধান পথ করিলেন এবং সৈন্যের থাকনের স্থান করিলেন বড়২ কামান দুই পার্শ্বে রাখিলেন হঠাৎ পুরমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে তৎপরে অপূর্ব্ব অট্টালিকা তৎপরে বাদ্যাগার তার পরে অতি উচ্চ অট্টালিকা তাতে ঘড়ি তদূর্দ্ধে ঘণ্টা তার পর চারি দরজা মধ্যে সদাগরেরদিগের থাকনের স্থান এবং হাট নানা জাতীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইবেক তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এক অট্টালিকা তাতে নানা জাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রীরা বাদ্যোদ্যম করিবেক পরে রাজবাটী প্রথম এক চতুঃসীমা দক্ষিণদ্বারী এক অট্টালিকা তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার হইবেক। পৃ. ৪৪-৪৬

প্রথম সংস্করণ পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১২০।

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' পুস্তকের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য

চরিত্রং।

শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়েন

রচিতং।

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ধরণীর মাঝ
যাহার অধিকারে নবদ্বীপ সমাজ।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত করিয়া প্রচার
কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে কহিব বিস্তার।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮০৫।

ভোট-বীর কেসর্-এর কথা

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১। ভোট বা তিব্বতী জাতি ও বোন্-ধর্ম

ভোট-দেশ বা তিব্বত এখন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ-সমূহের মধ্যে অন্যতম। তিব্বতের সংস্কৃতির মধ্যে শোভন ও সুন্দর এবং মার্জ্জিত যাহা কিছু, তাহার প্রায় সমস্তই ভারতবর্ষের দান। তিব্বতীরা ভাষায় এবং রক্তে চীনা, বর্মী ও থাই বা শ্যামীদের জ্ঞাতি। এই কয় জাতির পূর্ব-পুরুষ Tibeto-Chinese অর্থাৎ ভোট-চীন জাতি, খ্রীষ্ট-জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে Yang-tsze-Kiang য়াঙ্-ৎসে-কিয়াঙ্ নদীর উৎপত্তি-স্থলে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি-গত বিশিষ্টতা লাভ করে। পরে ইহাদের এক দল উত্তর-পূর্বে উত্তর-চীনদেশে গমন করিয়া সেখানে উপনিবিষ্ট হয়, এবং উত্তর কালে এই দল চীনা জাতিতে পরিণত হয়, চীনদেশে খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের পূর্বেই একটী বিরাট্ মৌলিক সভ্যতা গড়িয়া তুলে। 'থাই' নামে পরিচিত একটী, এবং 'ম্রন্-মা' নামে পরিচিত আর একটী—এই দুইটী দল, দক্ষিণ দিকে নামিয়া আসে, এবং যথাক্রমে উত্তর-শ্যামদেশে ও উত্তর-ব্রহ্মদেশে উহারা উপনিবিষ্ট হয়, ও পরে যথাক্রমে কম্বোজ ও দ্বারাবতী অর্থাৎ দক্ষিণ-শ্যামদেশের এবং 'রামঞ্ঞদেস' অর্থাৎ দক্ষিণ-বর্মার হিন্দু সভ্যতার দ্বারা অনুপ্রাণিত Khmer 'খ্মের্' এবং Rman 'র্‌মঞ্' বা Mon 'মোন্' জাতিদ্বয়ের সঙ্গে সংস্পর্শে আসিয়া, উহাদের নিকট ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া, আধুনিক শ্যামী ও বর্মী জাতিতে পরিণত হয়। আর একটী দল ভোট-দেশ বা তিব্বতে আসিয়া উপস্থিত হয়—আনুমানিক খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্য ভাগে কোনও সময়ে। এই দলের নিজস্ব নাম ছিল Bod 'বোদ্'—এখন এই শব্দ ইহাদের মুখে Pö 'প্যো' বা Phö 'ফ্যো' রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। ভারতীয় আর্য-ভাষী জাতি এই নামকে নিজেদের উচ্চারণ অনুযায়ী করিয়া, 'ভোট'-রূপে বদলাইয়া লইয়াছে। Bod 'বোদ্' = Bhot*a* 'ভোট' = Pö 'প্যো' বা Phö 'ফ্যো' জাতি, অর্থাৎ তিব্বতীয় জাতি, বহুদিন ধরিয়া বর্বর বা অর্ধ-সভ্য অবস্থায় ছিল। ইহাদের কতকগুলি শ্রেণী হিমালয় অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-হিমালয় ও ভারতের মধ্যেও আসিয়া উপনীত হয়। এই ভাবে, ভারতের সভ্য জগতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শ ঘটে; ফলে, ইহাদের মধ্যে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ইহাদের মধ্যে এক পরাক্রান্ত রাজা জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহার নাম ছিল Srong-btsan-sgam-po 'স্রোঙ্-ব্‌ৎসন্-স্‌গম্-পো'। ইনি বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন, ইঁহার চেষ্টায় ভোট-দেশের পণ্ডিত Thon-mi-sambhot*a* 'থোন্-মি-সম্‌ভোট' ভারতবর্ষে যান, ভারতীয় লিপি-বিদ্যার প্রচার স্বজাতির মধ্যে করেন, এবং তিব্বতী-লিপি গঠিত করেন। স্রোঙ-ব্‌ৎসন্-স্‌গম্-পো নেপালের হিন্দু রাজার কন্যা এবং চীন-দেশের সম্রাটের কন্যা এই দুই রাজকুমারীকে

বিবাহ করেন। তাঁহার আমলেই তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মাশ্রয়ী ভারতীয় সভ্যতার পত্তন হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে ভোট-জাতি যে ধর্ম পালন করিত, তাহার নাম Bon 'বোন্' ধর্ম। উত্তর-ইউরোপ এবং উত্তর- ও মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন আদিম মোঙ্গোল শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে ভূত-প্রেতে বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্মের প্রচার এখনও দেখা যায়, যাহার ইউরোপীয় নামকরণ হইয়াছে Shamanism (মধ্য-এশিয়ার বিকৃত বৌদ্ধ ধর্মের পুরোহিত Shaman বা 'শ্রমণ'-এর নাম হইতে এই নাম), এই বোন্-ধর্ম সেই Shamanism-এর পর্যায়ের ধর্ম ছিল। মন্ত্র-জপ ইত্যাদি দ্বারা অতি-প্রাকৃতিক দৈব বা ভৌতিক শক্তিকে মানুষের বশে আনা, এই ধর্মের অন্যতম মুখ্য আদর্শ। নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন, এবং বলি ও ভেট দ্বারা দৈব বা প্রেত শক্তির সন্তোষ সম্পাদনও এই ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, এবং জাদু ও ভোজবিদ্যায় আস্থা এই ধর্মে একটু বেশী করিয়াই লক্ষিত হয়। আমাদের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের সহিত বোন্-ধর্মচর্যার অনেক মিল আছে। আমাদের হিন্দুদের পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তির মত, চীনাদের অনুরূপ Yang-Yin 'য়াঙ্-য়িন্' বা পুরুষ-প্রকৃতির মত, তিব্বতীদের মধ্যেও Yab-Yum 'য়ব্-য়ুম্' অর্থাৎ 'পিতা-মাতা' বা পুরুষ-প্রকৃতির কল্পনা বিদ্যমান আছে। অনুমান করা যাইতে পারে যে চীনাদের Yang-Yin কল্পনার মত তিব্বতীদের Yab-Yum তাহাদের জাতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা-প্রণালী হইতেই রূপ গ্রহণ করিয়াছে। স্বর্গরাজ ও স্বর্গরাজ্ঞী এই দেবতাদ্বয়, আমাদের শিব-উমার মত, এই পুরুষ-প্রকৃতিময়ী কল্পনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষে অবশ্য পুরুষ-প্রকৃতি-বাদ, ব্রহ্ম-মায়া, সদসৎ, ব্যক্তাব্যক্ত প্রভৃতি যে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল, অনুরূপ গভীর দার্শনিক চিন্তা চীন-দেশের Yang-Yin বা তিব্বতীয় বোন্-ধর্মের Yab-Yum-এর মধ্যে পাওয়া যায় না। তবুও এশিয়া-খণ্ডের তিনটী বিশিষ্ট জাতির মধ্যে এই কল্পনার স্বাধীন অস্তিত্ব লক্ষনীয়। প্রাচীন চীনা জাতির য়াঙ্-য়িন্ ও তিব্বতী য়ব্-য়ুম্, মূল ভোট-চীন ভাব-ধারার মধ্যে বিদ্যমান ছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রাচীন চীনের Tao তাও-ধর্মের আনুষ্ঠানিক ও পৌরাণিক রূপ (ইহার দার্শনিক বিচার ততটা নহে) এই বোন্-ধর্মের সহিত মূলতঃ সম্পৃক্ত বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ভোট-জাতির মৌলিক প্রকৃতিতে, সুন্দর অপেক্ষা ভীষণের মধ্যেই অদ্ভুত ও আধ্যাত্মিক রস আস্বাদন বোধ হয় অনুকূল ছিল, এবং সেই জন্য বোন্-ধর্মে এবং ভোটদের গৃহীত বৌদ্ধ ধর্মে, ভীষণাকার দেবতাদের কল্পনা খুব বেশী করিয়া ঘটিয়াছিল। শ্যামল-শস্প-শ্রী-বিহীন, তুষারময় পর্বতে ও মরুময় প্রান্তরে পরিপূর্ণ তিব্বতের নৈসর্গিক পারিপার্শ্বিকের ভীষণতার প্রভাব, ভোট-জাতির মনে এই ভাবেই কার্য করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

তিব্বতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া এতাবৎ কাল পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মকে সুদৃঢ় করিবার বহু চেষ্টা হইয়াছে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে বোন্-ধর্মকেও বিদূরিত করিয়া দিবার প্রয়াসও হইয়াছে—কিন্তু বোন্-ধর্ম একেবারে মরে নাই। সব দেশেই যাহা দেখা যায়, তিব্বতেও তাহাই ঘটিয়াছে। ভারত হইতে আগত বৌদ্ধ ধর্ম, ও ভোটদের স্বকীয় বোন্-ধর্ম—এই দুইটী পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানে পূর্ণ—উহার অনেক ভাব-ধারা, অনেক ক্রিয়া-কলাপ প্রচ্ছন্ন-রূপে অবস্থিত বোন্ ভাব-ধারা ও বোন্ ক্রিয়া-কলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বোন-ধর্মের রঙ্গে রঙ্গানো হইয়াছে বলিয়া, তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম তাহার বিশিষ্ট রূপ পাইয়াছে। আবার বোন্-ধর্ম নিজেও আর অবিকৃত নাই, ইহার প্রায় সব দিকেই, ভারতের—পাল-যুগের বাঙ্গালা ও বিহারের, এবং নেপালের—

বৌদ্ধ ভাব-ধারা, দেব-বাদ ও আচার-অনুষ্ঠান ইহার সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বোন্-ধর্ম তিব্বতের বৌদ্ধ শাসক-বর্গ দ্বারা স্বীকৃত না হইলেও, ইহার অস্তিত্ব দেশের মধ্যে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। বোন্-ধর্মের পুরোহিত, এবং বোন্ ধর্মের মন্দির ও মঠ এখনও আছে। কিন্তু কোথাও শুদ্ধ বোন্ ধর্মের নিদর্শন এখন আর পাওয়া কঠিন।

এখন তিব্বতে যে মিশ্র বোন্-ধর্ম প্রচলিত আছে, তাহাকে Gyur-Bon 'গ্যুর্-বোন্' অর্থাৎ 'বিকৃত বোন্' বলে। ইহার মধ্যে বহু উচ্চ আদর্শ আছে। এই ধর্মের প্রধান কথা—*বিশ্ব-প্রপঞ্চের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্তার* (Gyung-drung 'গ্যুঙ্-দ্রুঙ্' অর্থাৎ 'সনাতন'-এর) সহিত লীন বা একাত্ম হইয়া যাওয়াই হইতেছে মানব-জীবনের কাম্য, এবং সমস্ত জীবের হিতসাধন করাই হইতেছে মানুষের কর্তব্য। এই সনাতনের সাধনায় ও বিশ্বমৈত্রীর পথে দুই প্রকারের বাধা দেখা যায়—এক, পাপময় অপদেবতাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বাধা, ও দুই, মানব-মনের নৈতিক 'বিষ' বা অবনতি-জনিত বাধা। মন্ত্র-জপ ও নানা প্রকার ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা অপদেবতার বিতাড়ন, এবং সচ্চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা মনে উন্নয়ন,—সাধন-পথে কৃতকারিতার উপায় এই দুইটী। প্রসন্ন ও ভীষণ দুই প্রকার দেবতার কল্পনা বোন্-ধর্মে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রসন্ন-প্রকৃতির দেবতারা মানুষের বন্ধু ও সহায়ক, এবং ভীষণ প্রকৃতির দেবতা বা অপদেবতারা সাধারণতঃ মানুষের শত্রু। প্রাচীন শুদ্ধ বোন্-ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ এখনও নির্ণীত হয় নাই—তবে বিকৃত বোন্-ধর্মে ইহার মূল কথা একেবারে চাপা পড়ে নাই, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অন্যথায় বৌদ্ধ ধর্ম ইহাকে দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইত।

২। গ্লিঙ্-রাজ কে-সর্ (বা গে-সর্)

আমাদের দেশের রামচন্দ্র বা অর্জুনাদি পাণ্ডবদের উপাখ্যানের মত সমগ্র তিব্বতে এক জনপ্রিয় উপাখ্যান বা কথা বিদ্যমান—সেটী হইতেছে রাজা কেসর্-এর কথা। রাজা কেসর্ তিব্বতের কোথায় এবং কোন্ সময়ে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কে-সর্-সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, আংশিক ভাবে ইনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, আংশিক ভাবে ইনি পৌরাণিক। প্রায় সকল দেশের প্রাচীন যুগের লোকোত্তর নায়ক-নায়িকা বা পাত্র-পাত্রীদের সম্বন্ধে একথা বলা যায়। রাজা কেসর্ সম্বন্ধে [১] গান, [২] গদ্য-পদ্য-মিশ্র ছোট গাথা, [৩] গদ্য-পদ্য মিশ্র বড় গাথা, ও [৪] গদ্য-পদ্য-মিশ্র বিশাল আকারের—প্রায় আমাদের মহাভারতের মত বড়—পুরাণ গ্রন্থ, তিব্বতে পাওয়া গিয়াছে। [১] গান এবং [২] ছোট গাথা—মুখ্যতঃ পশ্চিম-তিব্বতে, কাশ্মীরের অধীন Ladakh লদখ্ রাজ্যের তিব্বতীদের মধ্যে, পাওয়া গিয়াছে। অল্প-স্বল্প পৃথক্ দুইটী রূপে এগুলির সংগ্রহ করিয়াছেন পরলোকগত A. H. Francke ফ্রাঙ্কে নামে এক জরমান মিশনারি, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে। [৩] গদ্য-পদ্য-মিশ্র বড় গাথা বা পালা-গান, কয়েক-দিন ধরিয়া যেগুলি গাওয়া বা পাঠ-করা হয়, পূর্ব-তিব্বতে Khams বা Kham খম্-অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে; এবং [৪] 'কেসরায়ণ' আখ্যা যাহাকে দিতে পারা যায় এমন বৃহৎ গ্রন্থ মধ্য-তিব্বতে মিলিয়াছে। এই-সমস্তর ভাল করিয়া আলোচনা বা অনুবাদ কোনও ইউরোপীয় ভাষায় এখনও হয় নাই।

কেসর্-এর উপাখ্যান মধ্য-এশিয়ায় Mongol মোঙ্গোল্‌দের মধ্যেও মিলে। মোঙ্গোল-জাতি ধর্মে বৌদ্ধ, এবং তিব্বতী গুরুদের শিষ্য।—তিব্বত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম যখন তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হয়, খ্রীষ্টীয় বারর ও তেরর শতকে, তখন কেসর্-এর কাহিনীও তাহাদের দ্বারা গৃহীত হয়। তাহার পর, মোঙ্গোলদের জ্ঞাতি মাঞ্চুদের মধ্যে এই কাহিনী প্রসার লাভ করে।

এবং সপ্তদশ শতকের মধ্য ভাগে মাঞ্চুগণ কর্তৃক চীন-বিজয়ের পরে, মাঞ্চুদের নিকট হইতে তাহাদের প্রজা চীনা-জাতিও কেসর্-কাহিনীর সহিত আংশিক ভাবে পরিচিত হয়। অতএব বলা যায় যে, তিব্বতী কেসর্-কথা এখন সমগ্র মধ্য- ও পূর্ব- এশিয়ার মোঙ্গোল-শ্রেণীর জাতিগুলির সাধারণ সম্পত্তি।

মনোহারিত্বের জন্য ও নিজ বিশিষ্ট রসের জন্য কেসর্-কথা সমগ্র মানব-জাতির একটী আদরণীয় সাহিত্য-সম্পত্তি বা কথা-সম্পত্তি হইবার যোগ্য।

কেসর্-এর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কিছুই ঠিক জানা যায় নাই, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। কোনও মতে ইনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের লোক—রাজা স্রোঙ্-ব্ৎসন্-স্গম্-পো-র সময়ের; এবং সম্ভবতঃ এই ঐতিহাসিক রাজার অনেক কীর্তি ও গুণ ইহাঁতে আরোপিত হইয়াছে। অন্য মতে, এই সময়ের পরের লোক ইনি; আবার অন্য মতে, ইহার ঢের আগেকার, খ্রীষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের। সে যাহা হউক, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে ইনি ভোটদের National Hero অর্থাৎ "জাতীয় বীর";—আদর্শ মানব, আদর্শ যোদ্ধা ও আদর্শ রাজা সম্বন্ধে ভোটদের যে ধারণা, তাহা যেন ইহাঁতেই মূর্ত হইয়াছে। ভারতের যেমন রামচন্দ্র বা অর্জুন, পারস্যের যেমন Rustam রুস্তম, প্রাচীন গ্রীসের যেমন Herakles হেরাক্লেস্ ও Akhilleus আখিল্লেউস, জরমানিক জাতির যেমন * Sigiwarduz সিগিবর্দ্স্ (Sigurd সিগুর্ড্ বা Siegfried সীগ্‌ফ্রীদ্), প্রাচীন ব্রিটিশ জাতির যেমন রাজা Arthur আর্থর, প্রাচীন আইরীশ জাতির যেমন Cuchulainn কুখুলাইন্ ও Finn ফিন্, ইহুদীদের মধ্যে যেমন রাজা David দাবিদ,—ভোট-দেশের কে-সর্ বা গে-সর্ তেমনি একটী সমগ্র জাতির নরত্ব-বিষয়ে আদর্শের আশ্রয়-স্থল হইয়া, তিব্বতী মোঙ্গোল্ ও মাঞ্চুদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তিব্বতী ও মোঙ্গোলেরা বিশ্বাস করে যে রাজা কে-সর্ (গে-সর্) এখন স্বর্গবাস করিতেছেন, আবার তিনি মধ্য-এশিয়ার জাতিগণের উদ্ধার-কল্পে অদূর ভবিষ্যতে জগতে পুনরবতীর্ণ হইবেন বা পুনরাগমন করিবেন।

কেসর্-কথা এখন যে-সকল বিভিন্ন আকারে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পূর্বোক্ত ফ্রাঙ্কে সাহেবের সংগৃহীত গান ও ছোট গাথায় ইহার দুইটী সরল ও সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রূপ অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান। ইহার অতিরিক্ত বড় গাথা এবং বৃহৎ গ্রন্থগুলিতে মূল উপাখ্যানকে বিশেষভাবে পল্লবিত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, বড় গাথায় ও বৃহৎ গ্রন্থে কেসর্-এর উপাখ্যানকে তিব্বতী বৌদ্ধ মত-বাদ ও দেবতা-বাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাব বিজড়িত করিয়া দেওয়া হইয়াছে—এই আকারে যে কেসর্-কথা মিলে, সেগুলি দেখিয়া মনে হয়, কেসর্-কথা বুঝি তিব্বতের কোনও বৌদ্ধ-পুরাণই হইবে। কিন্তু গান ও ছোট গাথায় বৌদ্ধ প্রভাব একেবারে নাই বলিলেই হয়; কিছু অল্প পরিমাণে অবশ্য আছে—কিন্তু গান ও ছোট গাথায় যে ধর্মের, যে আধ্যাত্মিক জগতের পট-ভূমিকা মিলিতেছে, তাহা বৌদ্ধ-পূর্ব যুগের বোন্-ধর্মের ও বোন্ আধ্যাত্মিক জগতের বলিয়াই মনে হয়; এক কথায়, কেসর্-কথার যে সরলতম ও সুন্দরতম রূপ লদখ্-এ ফ্রাঙ্কে-সাহেব বাহির করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়—ধর্মান্তর গ্রহণ করিবার পূর্বে ভোট-জাতির মধ্যে প্রচলিত বোন্-ধর্মের আবেষ্টনীর মধ্যেই কেসর্-কথার উদ্ভব হইয়াছিল।

ফ্রাঙ্কে সাহেবের সংগৃহীত গানগুলি Indian Antiquary পত্রিকায় ১৯০১ ও ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়। ফিন্‌লাণ্ডের হেল্‌সিংফর্স্ নগরের সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকায় ইনি প্রথম পশ্চিম-ভোট প্রান্তে লদখ্-এর Sheh শেঃ-গ্রামে সংগৃহীত ছোট গাথাটী প্রকাশিত করেন, জরমান অনুবাদের সহিত; সেটী অংশতঃ ঐ দুই বৎসরের Indian Antiquary-তে ইংরেজী অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনী সমেত বাহির করেন। তৎপরে কলিকাতার এশিয়াটিক

সোসাইটী হইতে Bibliotheca Indica গ্রন্থমালায় তিনি লদখ্-এ Khalatse খলৎসে-গ্রামে প্রাপ্ত কেসর্-বিষয়ক আর একটী গদ্যপদ্যময় কাব্য-গাথা মূল তিব্বতী ও ইংরেজী সংক্ষিপ্ত সার এবং টিপ্পনী সমেত প্রকাশিত করেন। ১৮৩৬ সালে, শতবর্ষাধিক হইল, জরমান পণ্ডিত I. J. Schmidt শ্‌মিট্ কেসর্-কথার এক মোঙ্গোল-ভাষায় লিখিত কাব্য জরমানে অনুবাদ করিয়া রুষ-দেশের সেণ্ট্-পিটর্‌স্‌বর্গ নগরী হইতে প্রকাশিত করেন। সম্প্রতি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত-ভ্রমণকারিণী শ্রীযুক্তা Alexandra David Neel আলেক্সান্দ্রা দাভিদ্-নীল নামক জনৈক ফরাসী মহিলা, Khams খম্ বা পূর্ব-তিব্বতে কেসর্ বা গেসর্ সংক্রান্ত একটী বড় গাথা শুনিয়া তাহা লিখিয়া লন, এবং তাহার ফরাসী ও ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। এইগুলিই হইতেছে কেসর্-কথা অনুশীলন করিবার জন্য ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত মুখ্য সামগ্রী। তিব্বতী মূল বিরাট্-কাব্য গ্রন্থগুলি হস্ত-লিখিত অবস্থাতে নানা স্থানে আছে। সেগুলি প্রকাশিত, অনূদিত ও আলোচিত হইলে, এই কাহিনীর উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের উদ্ধার হইবে। ইতালীয় পণ্ডিত Giuseppe Tucci জুসেপ্পে তুচ্চি এইরূপ ছাপা কেসর্-কথা Spiti স্পিতি-তে একটী তিব্বতী মন্দিরে দেখিয়াছিলেন। কেসর্-কাব্যগুলি তিব্বতে বৌদ্ধ শাস্ত্রের মত কাঠের ফলায় খুদিয়া ছাপানো হইয়াছিল ; কিন্তু হস্তলিখিত পুথির মধ্যেই এই কথা বা কাব্য বেশীর ভাগ নিবদ্ধ আছে বলিয়া, সহজ-লভ্য নহে। কলিকাতার রয়াল-এশিয়াটিক-সোসাইটি-অভ্-বেঙ্গল-এর ভূত-পূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত Johan van Manen যোহান্ ফান্ মানেন্ এইরূপ বিরাট্ কাব্যের একটী হস্তলিপির আংশিক নকল করাইয়া লইয়াছেন।

এখন নীচে সংক্ষেপে ফ্রাঙ্কে-সাহেব কর্তৃক আহরিত ছোট গাথা অবলম্বনে কেসর্-এর গাথার মূল কথা-বস্তু প্রদত্ত হইতেছে।

এই পৃথিবীতে Gling গ্লিঙ্ বা Ling লিঙ্ রাজ্যে রাজত্ব করিবার জন্য, স্বর্গরাজ Dbang-po-rgya-bzhin দ্‌বঙ্-পো-র্গ্য-ব্‌ঝি.ন্ (অর্থাৎ 'সর্বঙ্কর-রূপ-বিশিষ্ট মহারাজ')-এর তৃতীয় পুত্র Don-grub দোন্-গ্রুব্ (অর্থাৎ 'অমোঘসিদ্ধি') অবতীর্ণ হইলেন। কি অবস্থার মধ্য দিয়া দোন্-গ্রুব্-এর অবতার-গ্রহণের আবশ্যকতা হইল, এবং কি উপায়ে তিনি অবতীর্ণ হইলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া অনেক কথা আছে। দোন্-গ্রুব্ পৃথিবীতে 'কে-সর্' এই নামে পরিচিত হইলেন। (Ke-sar কে-সর্ নামটী মধ্য-তিব্বতে Ge-sar 'গে-সর্' রূপে মিলে, এবং মোঙ্গোলদের মধ্যেও এই 'গে-সর্' বা Ge-ser 'গে-সের্' রূপ প্রচলিত ; লদখ্-এ Kye-sar 'ক্যে-সর্' রূপও পাওয়া যায়—'ক্যে-সর্' প্রাচীন তিব্বতী Skye-gsar 'স্ক্যে-গ্‌সর্' শব্দের আধুনিক রূপ ; 'স্ক্যে-গ্‌সর্' অর্থে 'নব-জাত' বা 'পুনর্জাত'। তিব্বতীতে 'কে-সর' বা 'গে-সর্' শব্দের অর্থ 'ফুলের কেসর' অথবা 'জাফরান' —শব্দটী সংস্কৃত হইতে তিব্বতীতে আসিয়াছে, অথবা সংস্কৃত 'কেসর' শব্দ মূলে তিব্বতীর 'গে-সর্' বা 'কে-সর্', তাহা বলা যায় না)। কেসর্ তরুণ বয়সেই সর্ব বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি নানা সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন।

সেই সময়ে ঐ দেশে একজন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির 'Bru-gu-ma "ব্রু-গু-ম' নামে সুন্দরী কন্যা ছিল (['ব্রু-গু-ম] অর্থে 'শস্য-কণা' ; নামটী মধ্য-তিব্বতে প্রচলিত কে-সর্ বা গে-সর্ কথায় 'Brug-mo "ব্রুগ্-মো'—উচ্চারণে ডুগ্‌মো—রূপে পাওয়া যায় ; লদখ্-এ প্রাপ্ত অন্য রূপ—'Bri-gu-ma "ব্রি-গু-ম'—ইহার অর্থ, 'তরুণী চমরী-গাবী'। মোঙ্গোল কাব্যে এই নাম Rogmo 'রোগ্‌মো' রূপ ধারণ করিয়াছে)। কে-সর্ ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহেন। তাঁহার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতায় ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীকে কে-সর্ পরাস্ত করেন। কন্যার নিকট ও

কন্যার আত্মীয়দের নিকট কে-সর্ নিজেকে প্রথম একজন পথচারী ভিক্ষুক বালকের আকারে দেখা দেন। আদিম অর্ধ-বর্বর সমাজের উপযোগী নানা প্রকারের রহস্যময় ও হাস্যকর ঘটনার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া ও 'ব্রু-গু-ম-কে অপ্রস্তুত করিয়া, পরে কে-সর্ আত্মপরিচয় দেন, ও শেষে 'ব্রু-গু-ম-কে বিবাহ করেন। বিবাহের পরে দুই জনে গ্লিঙ্ রাজ্যে সানন্দে বাস করিতে থাকেন। 'ব্রু-গু-ম-কে বিবাহ করিবার পরে গ্লিঙ্-রাজ্যের প্রধানেরা তাঁহার বীরত্ব ও অন্য গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেশের রাজা বলিয়া মানিয়া লয়।

ইহার পরে কেসর্-চীন-দেশে যান, এবং সেখানে নানা অদ্ভুত বীরত্বময় কার্য-কলাপ প্রদর্শন করেন। কে-সর্ চীন-দেশের রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরেন, ও দুই স্ত্রীর সহিত সুখে রাজ্য করিতে থাকেন। কেসর্-কাহিনীতে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী এই চীন-রাজকন্যার আর কোনও স্থান নাই।

দেবী Ane-bkur-dman-mo অনে-বকুর্-দ্‌মন্-মো-র (অর্থাৎ 'পূজনীয়া ঈশ-পত্নী'র) অনুরোধে কে-সর্ উত্তর দেশের এক অতিকায় অসুর বা রাক্ষসকে দমন করিতে যান। (এই দেবী আর কেহই নহেন, ইনি স্বর্গরাজ্ঞী, স্বর্গে যখন দোন্-গ্রুব্ রূপে কে-সর্ অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন কেসর্-এর মাতা। কেসর্-কথায় বহুস্থলে ইনি কেসর্-এর রক্ষয়িত্রী রূপে দেখা দেন)। পত্নী 'ব্রু-গু-ম-র নিকট হইতে কে-সর্ বিদায় লন; এই বিদায় অবলম্বন করিয়া বহু সুন্দর গান আছে। কে-সর্ অনেক কষ্টে উত্তর দেশে উপস্থিত হন। উত্তরের অসুরের স্ত্রী Dzemo-Bamza-bum-skyid দ্‌জে.মো-বম্-জ.-বুম্-স্কিদ্ (অর্থাৎ 'শতগুণ-আনন্দ') কেসর্-এর প্রেমে পড়ে, এবং তাহারই সাহায্যে কে-সর্ উক্ত অসুরকে বধ করিতে সমর্থ হন। দ্‌জে.মো-বম্-জ.-বুম্-স্কিদ্ কেসর্‌কে মন্ত্র-পড়া পানীয় ও খাদ্য আহার করাইয়া তাঁহার স্মরণ-শক্তি হরণ করিল। কে-সর্ নিজ রাজ্য গ্লিঙ্ ও প্রিয় পত্নী 'ব্রু-গু-ম-কে ভুলিয়া গিয়া মায়াবিনী দ্‌জে.মো-বম্-জ.-বুম্-স্কিদ্-এর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। উভয়ের একটী কন্যাও হইল।

ইতিমধ্যে কেসর্-এর অনুপস্থিতিতে 'ব্রু-গু-ম-র বিপদ্ ঘটিল। Hor হোর্ রাজ্যের রাজা Gur-dkar গুর্-দ্‌কর্ (বা গুর্-কর্, অর্থাৎ 'সাদা-তাঁবু') শুনিল যে, রাজা কে-সর্ বহুদিন ধরিয়া নিরুদ্দেশ। অবসর বুঝিয়া গুর্-দ্‌কর্ 'ব্রু-গু-ম-কে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে আসিল। 'ব্রু-গু-ম-র আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, হোর্-রাজ 'ব্রু-গু-ম-কে ধরিয়া লইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেল। কে-সর্ ও 'ব্রু-গু-ম-র একটী পুত্র হইয়াছিল, হোর্-রাজ তাহাকে বধ করিল। হোর্-রাজের নিকট কিছুকাল বন্দিনী থাকিবার পরে, কেসর্-পত্নী তৎপ্রতি ধীরে-ধীরে অনুরক্তা হইল, বহুদিন অনুপস্থিত কেসর্-এর কথা তাহার মন হইতে যেন মুছিয়া গেল। স্বেচ্ছায় সে হোর্-রাজের পত্নীত্ব স্বীকার করিল। তাহাদের দুইটী সন্তানও জন্মগ্রহণ করিল—একটী কন্যা ও একটী পুত্র।

এদিকে কে-সর্ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় মায়াবিনীর কবলে রহিয়াছেন। তাহার সঙ্গে একদিন পাশা খেলিতে খেলিতে কে-সর্ আকাশে উড্ডীয়মান বক-পংক্তিকে দেখিতে পাইলেন। তাহাদের ডাক শুনিয়া হঠাৎ তাঁহার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল—স্বদেশের এবং প্রাণপ্রিয়া পত্নীর কথা মনে পড়িল। তিনি বমন করিয়া মায়াবিনী প্রদত্ত খাদ্য ও পানীয় হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থ হইলেন। দ্‌জে.মো-কে এবং তাহার গর্ভজাত শিশুকন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া কে-সর্ বহির্গত হইলেন। দ্‌জে.মো ইহাতে নিজ সন্তানকে হত্যা করিল। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া কে-সর্ দেখিলেন, অন্য একজন যোদ্ধা তাঁহার রাজ্য দখল করিয়া বসিয়া আছে, এবং তাঁহার স্ত্রী হোর্-রাজ্যের অধীনে। তিনি লোক সংগ্রহ করিয়া রাজ্য উদ্ধার করিলেন, এবং তৎপরে স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে ও হোর্-রাজকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত হইলেন।

হোর্-রাজ্যে পঁহুছিয়া তিনি এক লৌহকারের আশ্রয় লইয়া শত্রুর ও শত্রুর অধীনস্থ স্বীয় পত্নীর কার্যাবলী অবলোকন করিতে লাগিলেন। এখানে কে-সর্ বহু অসম-সাহসের ও শক্তির কার্য করিলেন। এই অবস্থায় 'ব্রু-গু-ম কেসর্-এর সহায়তা না করিয়া, নানা বিষয়ে হোর্-রাজ গুর্-দ্কর্-এরই পোষকতাও সহায়তা করে। কে-সর্ শেষে হোর্-রাজকে পরাভূত করেন, এবং হোর্-রাজের কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও দেবী অনে-ব্কুর্-দ্মন্-মো-র নির্দেশে তাহাকে বধ করেন। এইরূপে 'ব্রু-গু-ম-কে উদ্ধার করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। গুর্-দ্কর ও 'ব্রু-গু-ম-র সন্তানদ্বয় কেসর্-এর অনুমতি অনুসারে (অথবা স্বয়ং কেসর্-এর দ্বারা) নিহত হয়।

'ব্রু-গু-ম-র অপরাধের জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার নানারূপ শাস্তি হয়। পরে এই শাস্তির দ্বারা তাহার পরিশুদ্ধি হইলে, কে-সর্ পুনরায় তাহাকে বিবাহ করেন, ও অবশিষ্ট জীবন উভয়ে সুখে যাপন করেন।

৪। বিশ্ব-সাহিত্যে কেসর্-কথার সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য

ইহাই হইল কেসর্-কথার সংক্ষিপ্ত-সার। লদখ্-এ প্রাপ্ত এই কথা-বস্তুর সঙ্গে তিব্বতের অন্যত্র এবং মোঙ্গোলদের মধ্যে প্রচলিত কেসর্-কাব্যের কথা-বস্তুর সঙ্গে ছোট-খাট নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও, মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। আদি যুগের বোন্-ধর্মাবলম্বী ভোটদের মধ্যে উদ্ভূত এই কাহিনীটীর মূল কথা—কেসর্-এর জন্মপর্ব, কেসর্-এর তরুণ-লীলা, কেসর্-'ব্রুগুম-বিবাহ, উত্তরের অসুর-বিজয়, কেসর্-এর আত্মবিস্মৃতি, হোর্-রাজ কর্তৃক 'ব্রুগুম-হরণ, কেসর্-কর্তৃক হোর্-রাজের বধ ও নিজ পত্নীর উদ্ধার—সর্বত্র এক।

গল্পটী যে মোটের উপর চিত্তাকর্ষক, সন্দেহ নাই। ইহাতে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা প্রচুর-পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও, ইহার মধ্যে মানব-জীবনের সুখ-দুঃখের কথাও যথেষ্ট আছে। কেসর্-পত্নীর চরিত্র, আদর্শ নারী-চরিত্র নহে—আমাদের সীতার অথবা প্রাচীন আয়র্লাণ্ডের বীরাঙ্গনা Noisi নোইশি-পত্নী Derdriu দের্দ্রিউ-র চরিত্রের কথা স্মরণ করিলে, 'ব্রুগুম-কে নিতান্ত রক্ত-মাংসের শরীরের প্রবৃত্তি-মুখিনী নারীই বলিতে হয়; 'ব্রুগুম-র উপাখ্যান পাঠ করিলে, প্রাচীন গ্রীক পুরাণের নায়িকা Helena হেলেন-কে, প্রাচীন ব্রিটিশ কাহিনীর রাজা Arthur আর্থর্-এর পত্নী Gwenhwyfar গ্বেন্হ্বিভার্-কে, আইরীশ বীরগাথার Graine গ্রাইনে এবং জরমানিক Sigurd সিগুর্ড-কে, কাহিনীর অন্যতর নায়িকা Gudrun গুড্রুন্-কেই মনে পড়ে; কিন্তু তথাপি, সমগ্র কাহিনীটীতে মানব-চরিত্র-চিত্রণ সুন্দর হইয়াছে। সব দিক্ বিচার করিয়া দেখিলে, এই কাহিনীটীকে রোমান্স-এর এক লক্ষণীয় আকর বলিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন, বিভিন্ন ভোট-চীন জাতিগণের মধ্যে এই এক-মাত্র epic বা মহাকাব্যোচিত উপাখ্যান উদ্ভূত হইয়াছে—চীনা, শ্যামী, বর্মী প্রভৃতি অন্য ভোট-চীন বর্গের জাতিগণের মধ্যে, একমাত্র তিব্বতী ছাড়া আর কোনও জাতি এইরূপ একটী গাথা-বস্তু রচনা করিতে পারে নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ epic tales বা মহা-অবদানগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া কেসর্-গাথাকে মানিয়া লইতে হয়। সেই হিসাবে, বিশ্বসাহিত্য-রসিকগণের নিকট ইহার আদর না হইয়া পারে না। অধিকন্তু, প্রাচীন কালের অবিমিশ্র ভোট-জাতির মানসিক ও অন্যবিধ সংস্কৃতির অতি সহজ ও সুন্দর পরিচয় ইহাতে আছে। এই কাহিনীর প্রাচীন ও অর্বাচীন ধারা হইতে প্রাচীন বোন্-ধর্মের অনেক তথ্য বাহির করিতে পারা যাইবে। কেসর্-কথার বিভিন্ন উপাখ্যানের ও চরিত্রের অভ্যন্তরে অধুনা-লুপ্ত বহু আদিম ধর্ম-বিশ্বাস ও দেবতা-বাদের সম্বন্ধে তথ্য লুকানো আছে—সেগুলির অন্তর্নিহিত ব্যাস-কূট ধীরে-ধীরে সমাধান করিবার বিষয়। সেগুলি হইতে আমরা ভোট-চীন-জাতীয় আদিম মানবের মনের—বিশ্ব-প্রপঞ্চ সম্বন্ধে তাহার চিন্তা-ধারার—অনেক পরিচয় পাইতে পারি। এই সব দিক্ দিয়া দেখিলেও এই কাহিনীটী নৃতত্ত্ববিদ্ ও ধর্মতত্ত্ববিদ্গণের নিকট যত্নের সহিত আলোচ্য॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
১৩৪১

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (১১)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

চণ্ডীচরণ মুন্‌শী

চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর জীবন-কাহিনী আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার মাত্র দুইটি কীর্ত্তির উল্লেখ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিবরণী-বহিগুলিতে (Buchanan, Roebuck) পাওয়া যায়—১। 'তোতা ইতিহাস', ২। ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ। প্রথম পুস্তকখানি বহু সংস্করণের মধ্য দিয়া আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয়খানির কোনও সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। উক্ত বিবরণী-বহিগুলি, *Primitiae Orientales* (তিন খণ্ড) পুস্তকে মুদ্রিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পুস্তকমালার বিজ্ঞাপন এবং ভারত-সরকারের দপ্তরে রক্ষিত *Home Miscellaneous* No. 559 প্রভৃতি হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, উক্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি কলেজ-কাউন্সিল কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিল এবং তাহা ছাপাখানার জন্য প্রস্তুত ছিল। পুস্তক ছাপা হইয়া বাহির হইয়াছিল কি না, জানা যায় না। সুতরাং কেবলমাত্র 'তোতা ইতিহাসে'র উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে চণ্ডীচরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে।

চণ্ডীচরণের বাড়ী কোথায় ছিল এবং কবে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যায় না। কলেজের বাংলা-বিভাগ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল পণ্ডিত ও মুন্‌শী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকায় চণ্ডীচরণের উল্লেখ নাই। তিনি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের পরে কোনও সময়ে উক্ত বিভাগে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত কলেজ-কাউন্সিলের সভায় উপস্থাপিত উইলিয়ম কেরীর পত্রে চণ্ডীচরণের উল্লেখ দেখা যায়। কেরী লিখিতেছেন—

Sir, ...

Accompanying this is a translation of the Toteenama from Persian into Bengalee by one of the Pundits of this Class, Chundeechurn. I will thank you to present it to the Council of the College. It is rendered into very plain and good Bengalee,—and very fit for a Class Book. Should the Council order him any reward for his labour, it will be gratefully received by him, and as he is a poor man will be a great help to him.

Sd. W. Carey. [Home Misce. Vol. No. 559, p. 304]

সভায় পণ্ডিত চণ্ডীচরণকে বাংলা ভাষায় তুতিনামা অনুবাদের জন্য এক শত টাকা পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসেই (৫ অক্টোবর, ১৮০৪) কাউন্সিলের নিকট লিখিত কেরীর অন্য একটি পত্র এই :

To the Council of the College of Fort William.

Gentlemen,

In consequence of the encouragement given to literary merit by the institution Rajeeb Lochun, a Pundit in the Bengalee Department has lately composed an history of Raja Krishnu Chunder Roy (late of Krishnunagar) in the Bengalee Language.

Chundee Churn, another Pundit in the same Department, has, with the help of some learned Brahmans, translated the Bhagvut Geeta into Bengalee.

I have examined these works and think them to be worthy of the patronage of the College, and recommend the writers as deserving some reward for their labours.

Accompanying this I send the manuscripts of these two works, which with the translation of the Tooteh nameh, by Chundee Churun I recommend to be printed for the use of the Bengalee Class.

I am,
Gentlemen,
Your most obedient humble servant,
Sd. W. Carey.
[Home Misce. Vol. No. 559, p. 384-5]

College,
5th October, 1804.

১২ নবেম্বর তারিখে কেরীর এই পত্র কাউন্সিলের অধিবেশনে উপস্থিত করা হয়। স্থির হয় যে, রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ইতিহাস ও চণ্ডীচরণের তুতিনামার অনুবাদ প্রত্যেকটি এক শত খণ্ড করিয়া কলেজের জন্য খরিদ করা হইবে। কলেজের পুস্তকাগারে রাখিবার জন্য প্রত্যেকটি বইয়ের একটি করিয়া সুলিখিত নকল করাইবার আদেশ দেওয়া হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ইতিহাসের জন্য রাজীবলোচনকে ১০০ সিক্কা টাকা ও ভগবদ্গীতার অনুবাদের জন্য চণ্ডীচরণকে ৮০ সিক্কা টাকা দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের অধিবেশনে বিভাগীয় কর্ত্তা কেরী কর্ত্তৃক প্রেরিত বাংলা সংস্কৃত ও মারাঠা ভাষার শিক্ষকদের যে তালিকা (প্রত্যেকের বেতন সহ) পঠিত হয়, তাহাতে দেখা যায় (নং ৫৫৯, পৃ. ৪৪৫), চণ্ডীচরণ সে সময়ে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে একজন সার্টিফিকেট পণ্ডিত ("Certified teacher") ছিলেন।

Home Miscellaneous vol. 559-এর ৩৫০-৫৫ পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য পুস্তকের যে তালিকা (১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে) আছে, তাহাতে "Ready for the Press" শিরোনামায় যথাক্রমে ২২ ও ২৩ সংখ্যক পুস্তক হইতেছে চণ্ডীচরণের ভগবদ্গীতা ও তোতা ইতিহাস।*

চণ্ডীচরণ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নবেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি দিবসে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল-অধিবেশনের বিবরণীতে (Home Misce. vol. 560, p. 554) নিম্নলিখিত সংবাদটি আছে :

Chundee Churn, a Pundit of the fixed Bengalee Establishment having died on the 26th November, 1808—Anund Chunder was appointed on the 2nd December, 1808 to succeed him.

চণ্ডীচরণ সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু জানা যায় না।

---

* এই তালিকা Primitiae Orientales, vol. III. (p. XXXIV) এবং বুকাননের *The College of Fort William in Bengal* (p. 219-35) পুস্তকেও মুদ্রিত হইয়াছে।

'তোতা ইতিহাস'—শুকপক্ষী বা তোতা পাখীর মুখনিঃসৃত বহু কাহিনী প্রাচ্য ভূখণ্ডে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় শুকসপ্ততি-জাতীয় গল্প-সংগ্রহ এই সকল কাহিনীর মূল হইতে পারে। চণ্ডীচরণ মুন্‌শী কিন্তু পুস্তক-রচনায় সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। মহম্মদ কাদিরি* প্রণীত ফার্সী তুতিনামার হিন্দুস্থানী অনুবাদ করেন হাইদর বক্স—এই 'তোতা-কাহানী'† সে যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চণ্ডীচরণ হাইদর বক্সের 'তোতা-কাহানী'টিই বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাতে মোট ৩৫টি কাহিনী আছে। চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাস' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা আখ্যাপত্র সহ ছিল ২২৪। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল :

তোতা ইতিহাস।— | বাঙ্গালা ভাষাতে | শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্‌শীতে রচিত।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০৫ ।— |

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগের কোনও কোনও ঐতিহাসিক এই মত পোষণ করিয়া থাকেন যে, সে যুগের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলির বিশেষ প্রচার ছিল না—সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গঠনে এগুলির প্রাধান্য তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। শুধু 'তোতা ইতিহাসে'র প্রচার দেখাইয়া প্রমাণ করা যায়, এই ধরণের উক্তি ভ্রান্ত। এই পুস্তকগুলি শুধু সে যুগে নয়, দীর্ঘ পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত বহুল প্রচারিত হইয়াছিল; শুধু সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে নয়, বহু সংগ্রহ-পুস্তকে স্থান পাইয়া এবং পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া ছাত্রছাত্রীগণের ভাষা-শিক্ষার সহায়ক হইয়াছিল। যে কয়টি 'তোতা ইতিহাসে'র সন্ধান আমরা পাইয়াছি, তাহার তালিকা দেখিলেই আমাদের উক্তির প্রমাণ মিলিবে।

'তোতা ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। ঠিক পর বৎসরেই (১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে) ইহার একটি সংস্করণ বাহির হয়। এই সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২১৪। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৩৮। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪০। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্রহীন একটি অতি পুরাতন বিচিত্র সংস্করণ আছে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪০; প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুই কলম; ডাহিনে বাংলা এবং বামে ইংরেজি। এতদ্ব্যতীত Sir G. C. Haughton ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত তাঁহার *Bengali Selections*··· পুস্তকের গোড়াতেই 'তোতা ইতিহাসে'র দশটি কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন। J. Wenger কর্ত্তৃক প্রকাশিত Rev. W. Yates-এর *Introduction to the Bengali Language* পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের

* Primitiæ Orientales, Vol. III (p. XXX)—"Tota Kuhanee; from the Persian of Qadir Bukhsh, by Moonshee Huedur Bukhsh, Nustaleek Character."

† *Tota kuhanee* a Translation into the Hindoostanee Tongue, of the popular Persian Tales, entitled Tootee Namu, by Sueyid Huedur Bukhsh Hueduree, under the superintendence of John Gilchrist . . . . . printed at the Hindoostanee Press in one Vol. 4to 1804. Roebuck, App. II, p. 24.

(কলিকাতা, ১৮৪৭) গোড়াতেই 'তোতা ইতিহাসে'র ১৮টি কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত Duncan Forbes-এর *The Bengali Reader* পুস্তকের প্রারম্ভে দশটি কাহিনী (হটনের নির্ব্বাচিত কাহিনীগুলিই) উদ্ধৃত হইয়াছে। হটন,* ইয়েটস্ ও ফরব্স প্রত্যেকেই নির্ব্বাচিত অংশের অনুবাদ, শব্দসূচী, ব্যাকরণ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া এগুলির বহুল প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। এগুলি ছাড়াও অন্যান্য অনেক সংগ্রহ-গ্রন্থের মারফতে 'তোতা ইতিহাস' এদেশে সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল।

বিষয়-বস্তুর দরুণ সামান্য ফার্সী-হিন্দুস্থানী মিশ্রিত হইলেও 'তোতা ইতিহাসে'র ভাষা সে যুগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। Yates-Wenger তাঁহাদের সংগ্রহের পাদটীকায় লিখিয়াছেন—

The style of these tales, which are translated from the Persian or the Urdu, is by no means pure, but deserving of attention as a very fair specimen of the colloquial language and its almost unbounded negligence.

ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার *History of Bengali Literature*...পুস্তকে (পৃ ১৮৮-৯০) চণ্ডীচরণের ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া 'তোতা ইতিহাসে'র ভাষার বিশেষত্ব দেখাইতেছি :—

এক শৃগাল রাজা হইয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা।—

সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেলে চন্দ্র পূর্ব্বদিগ হইতে বাহির হইলে খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গিয়া তোতাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ওহে তোতা বুদ্ধিবান কিমর্থে ভাবিত বসিয়া আছ ?। তোতা উত্তর করিলেক যে আপনি প্রধান লোকের পরিজন কিন্তু তোমার সখার গোষ্ঠি ও জাতি উত্তম কি নীচ তাহা না জানিয়া ভাবিত আছি যদি তিনি ভাল জাতি হন তবে তাঁহার সহিত তোমার প্রেম করাতে ক্ষেতি নাই এবং অপরামর্শও নয়। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা কহিলেন যে তোতা তুমি আমার মনোজ্ঞ যথার্থ বলিতেছ কিন্তু তাহা আমি কিরূপে জ্ঞাত হইব তোতা উত্তর করিলেক যে ভাল মন্দ মনুষ্যের কথোপকথনের দ্বারা জানা যায় তুমি এক শৃগালের কথা শুন নাই। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে সে কি প্রকার আমি জ্ঞাত নহি তাহা তুমি কহ। তোতা কহিতে লাগিল।—

এক শৃগাল সর্ব্বদা এক নগরে লোকেরদের বাটী যাইয়া সকল বস্তুতেই মুখ দিত। পরে এক রাত্রিতে আপন সময়ানুসারে এক নিলকারের বাটী গিয়া নিলের জালাইতে মস্তক প্রবেশ করাইতে সেই জালামধ্যে পড়িয়া শরীর নীলবর্ণ হইয়া বহুশ্রমে জালা হইতে বাহির হইয়া বনে গেল। আর২ জন্তুরা তাহার চমৎকার মূর্ত্তি দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে এ কোন বৃহৎ জন্তু হইবেক। পরে সকল পশুরা তাহাকে আপনারদের প্রধান করিয়া সেই শৃগালের আজ্ঞাকারী হইয়া রহিল কিন্তু তাহার শব্দেতেও কাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেক না। পরে সেই শৃগাল অল্প ক্ষুদ্র পশুরদিগকে আপন নিকটে দরবারের সময় দাঁড় করাইত শিবারা প্রথম সারিতে এবং খেঁকশিয়ালিরা দ্বিতীয় সারিতে

*'A Glossary, Bengali and English to explain the Tota-itihas' . . . . By Sir Graves Chamney Haughton, pp. 124. London. 1825.

হরিণেরা ও তৃতীয় সারিতে বানরেরা চতুর্থ সারিতে গোবাঘারা পঞ্চম সারিতে ব্যাঘ্রেরা ষষ্ঠ সারিতে হস্তীরা সপ্তম সারিতে সকলে এই প্রকার দাঁড়াইয়া থাকিত যখন শিবারা রব করিত তখন সেই সঙ্গে ঐ শৃগাল শব্দ করিত এ কারণ তাহার রব কেহ অনুমান করিতে পারিত না। কথক দিবস পরে সেই শৃগাল অন্য শিবারদের সহিত কলহ করিয়া তাহারদিগকে দূর করিয়া ব্যাঘ্র আর হস্তীকে আপন নিকটে স্থান দিল রাত্রি হইলে সেই শিবারা শব্দ করিত সেই শব্দ শুনিয়া সরদার শৃগাল তাহারদিগকে চুপ করাইতে না পারিয়া আপনিও রব করিতে লাগিল তখন নিকটস্থ জন্তুরা সেই রব শুনিয়া লজ্জিত হইয়া সেই শৃগালকে ধরিয়া বধ করিলেক।—

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলে যে ও কর্ত্রী ভালমন্দ সকলের কথার দ্বারা জানা যায় অতএব আপন বন্ধুর নিকট যাইয়া তাহার সহিত কথোপকথন কর পরে সকল ভালমন্দ জ্ঞাত হইবা। তাহার পর খোজেস্তা যাইতে ইচ্ছা করিলেই কুক্কুট শব্দ করিল প্রাতঃকাল হইল এজন্যে গমন হইল না।—

—প্রথম সংস্করণ, ১৮০৫, পৃ. ১১১—১৪

চণ্ডীচরণের ভাষা সর্ব্বত্র এইরূপ। দুই চারিটি ফার্সী শব্দ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিলেও এই বাংলা মূলতঃ সংস্কৃতানুসারিণী এবং কোথাও দুর্ব্বোধ্য নহে। চণ্ডীচরণ সংস্কৃত ব্যাকরণকে কদাচিৎ লঙ্ঘন করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত গল্পটি যেমন হিতোপদেশের নীলবর্ণ শৃগাল-কথাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তেমনই 'তোতা ইতিহাসে'র অন্যান্য দুই একটি গল্পের আদর্শও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ রায় 'শুকোপাখ্যান' নাম দিয়া চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাসে'র একটি সংশোধিত সংস্করণ (পৃ. ১২৪) প্রকাশ করেন।

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি

রোবাকের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাসে* রামকিশোর তর্কচূড়ামণি-রচিত ও ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্কৃত হিতোপদেশের বাংলা অনুবাদের উল্লেখ আছে। সেখানে ভ্রমক্রমে "রামকিশোর তর্কালঙ্কার" লেখা হইয়াছে। ঐ পুস্তকের পরিশিষ্টে কলেজের বাংলা-বিভাগের পণ্ডিতদের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি বাংলা-বিভাগের পণ্ডিতরূপে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নিযুক্ত হন। ১৮১৮ সনের ১লা জুন পর্য্যন্ত তিনি যে চাকুরিতে বাহাল ছিলেন, ঐ তালিকা হইতে তাহা বুঝা যায়।

রামকিশোরের হিতোপদেশের সন্ধান আমরা পাই নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে এবং অন্যত্র আখ্যাপত্রহীন বহু বাংলা হিতোপদেশ আমাদের নজরে পড়িয়াছে, এগুলির কোনওখানি রামকিশোরের হিতোপদেশ হইলেও হইতে পারে। অনুমানে কিছু স্থির করিবার উপায় নাই। ভবিষ্যতে কেহ এই লুপ্ত গ্রন্থের সন্ধান করিবেন, এই আশায়

* *The Annals of the College of Fort William* (1819)—Thomas Roebuck, p. 29 (Appendix No. II). "Fables— হিতোপদেশ by Ramkishoru Turkalunkaru, 8vo. 1808."

আমরা এখানে রামকিশোর সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। Home Miscellaneous No. 559, ৪৪৪ পৃষ্ঠায় ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখের কাউন্সিল-অধিবেশনের যে বিবরণী আছে, তাহাতে দেখা যায়, রামকিশোর তখনই সংস্কৃত ও বাংলা-বিভাগে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারি ক্যাপ্‌টেন লকেটের নিকট লিখিত উইলিয়ম কেরীর ১০ আগষ্ট, ১৮১৯ তারিখের পত্রে (Home Misce. No 565, pp. 492-93) জানা যায় যে, বাংলা-বিভাগের পণ্ডিত শিবচন্দ্র ৫৬ বৎসর বয়সে বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িলে তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হয় এবং তাঁহার স্থলে কেরী রামকিশোরকে নিযুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নবেম্বর তারিখে লিখিত কেরীর পত্রে (Home Misce. No. 565, p. 569) আমরা জানিতে পারি যে, রামকিশোরের মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার নাবালক পুত্র রামগতি শর্ম্মা পিতার মৃত্যুতে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া সাহায্যের জন্য কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিতেছেন।

ভগবদ্গীতার টীকা

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারি ক্যাপ্‌টেন এ. লকেটের নিকট লিখিত কেরীর পত্রে (Home. Misce. No 563, pp. 67-68) আমরা জানিতে পারি যে, কোনও পণ্ডিত বাংলা ভাষায় ভগবদ্গীতার একটি টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই পুস্তকেরও সন্ধান আমরা পাই নাই। কেরীর পত্রে এই টীকার যে সামান্য পরিচয় আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:

> A Pundit has written in the Bengalee language a commentary on the Bhagvut Geeta which is well executed and highly deserving of a reward, it being calculated to combine the study of the Bengalee language with a vaulable piece of assistance in the study of Sanskrit. I therefore request that a small reward, not less than Rs. 50, be given him for the work. At the same time I propose to print the Geeta in Sanskrit with this commentary in the Bengalee language at my own private expence, if the College Council have no objection to its being thus made public.

হরপ্রসাদ রায়

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-অধ্যায়ের শেষ লেখক হরপ্রসাদ রায় সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি কবি বিদ্যাপতি-প্রণীত 'পুরুষপরীক্ষা' নামক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত তাঁহার এইটুকুই সম্পর্ক। রেভারেণ্ড জে. লং তাঁহার *Returns relating to Native Printing Presses & Publications in Bengal*…(১৮৫৫) পুস্তকের ৪৭ পৃষ্ঠায় হরপ্রসাদকে কাঁচরাপাড়ার লোক বলিয়াছেন।* মুদ্রাকরপ্রমাদে হরপ্রসাদ "হরিপ্রসাদ" হইয়াছেন।

* "Hari Prasad Roy, of Kanchrapara, (1) Puresh Parikha, Moral Tales."

উইলিয়ম কেরী ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মার্চ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের সহকারী সেক্রেটারি ক্যাপ্‌টেন রোবাককে যে পত্র দিয়াছিলেন (Home Misce. No. 563. p. 343), তাহাতে আছে:

Hura Prusada, a Pundit on the Bengalee fluctuating Establishment of the College has translated a Sanskrit work called Pooroosha Pureeksha, into the Bengalee language which he intends to print, if he can obtain the usual encouragement of a subscription of 100 copies. . . . .

কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারি তাঁহার ৩০ মার্চ তারিখের পত্রে (ঐ, পৃ. ৩৪৪) বিজ্ঞাপিত করেন যে, প্রতি খণ্ড দশ টাকা হিসাবে এক শত খণ্ড 'পুরুষপরীক্ষা' গ্রহণ করিতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ স্বীকৃত হইয়াছেন। Home Misce. No 564, ১৯৬ পৃষ্ঠায় এই সংবাদটি আছে:

Huru Prusad's bill for 100 copies of Purush Pariksha (amounting to 890-8-0 Rs.) received into the Library, sanctioned for payment by Government on 3 August 1816.

কেরীর পত্র হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, হরপ্রসাদ কলেজের এক জন অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং রোবাকের পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রকাশিত পণ্ডিতগণের তালিকায় তাঁহার নাম নাই।

"পুরুষপরীক্ষা" অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গ্রন্থ, ইহাতে পুরুষের বিভিন্ন লক্ষণ-নির্দ্দেশক মোট ৪৪টি গল্প আছে। তা ছাড়া কয়েকটি অধ্যায়ে লক্ষণ-বিবরণও আছে। গ্রন্থের ভূমিকায় পুস্তকের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:

অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্তে এবং কামকলা কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন···। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরমা সেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।

···পৃথিবীতে পুরুষাকার মাত্র অনেক পুরুষ আছে সেই কেবল পুরুষাকার মনুষ্য সকলকে ত্যাগ করিয়া বাস্তব পুরুষকে বর করহ আমি ইহা কহিতেছি। সেই পুরুষ যে প্রকার হয় তাহা কহা যাইতেছে কেবল পুরুষাকার অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমাণ লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্ল্লভ তাহাও কহিতেছি বীর এবং সুধী ও বিদ্বান্ আর পুরুষার্থযুক্ত এই চারি প্রকার পুরুষ তদ্ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা পুরুষাকার পশু কেবল পুচ্ছরহিত।

'পুরুষপরীক্ষা'ও বহুল-প্রচারিত পুস্তক। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৭৩ (আখ্যাপত্র ও এক পৃষ্ঠা "অসঙ্গত সঙ্গত" সহ)। আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা | পুরুষপরীক্ষা।— | শ্রীহরপ্রসাদ-রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮১৫। |

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজ-লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় (১৮৪৩) ও লং-সংগৃহীত ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটির লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় কলিকাতা হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি সংস্করণের উল্লেখ আছে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে একটি সংস্করণ

(পৃ. ২৪২) প্রকাশিত হয়। ডক্টর সুশীলকুমার দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৮৩৪ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। পরিষৎ-গ্রন্থাগারে আমরা আখ্যাপত্রহীন দুইটি সংস্করণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু সেগুলি যে ১৮৩৪ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নয়, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। যে সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৬, তাহারই আর একটি সম্পূর্ণ খণ্ড আছে। সেটি কলিকাতা "জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত" ও ১২৫৮ সালে মুদ্রিত। অন্যটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৮৫। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ১৮৫০ ও ১৮৬৫ সনের সংস্করণ আছে। তালিকা-কর্ত্তা কিন্তু এই দুইটি সংস্করণের তারিখ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নহেন। এগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ১৮৬ ও ১৮৫। ১৮৫ পাতার একটি সংস্করণ ব্রিটিশ মিউজিয়মেও আছে। ১৩১১ বঙ্গাব্দে কলিকাতার বঙ্গবাসী অফিস 'পুরুষ-পরীক্ষা'র যে-সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহাতে ভ্রমক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে গ্রন্থকার বলা হইয়াছে। হটন, ইয়েটস-ওয়েঙ্গার ও ফর্ব্বস-এর সংগ্রহ-পুস্তকে 'পুরুষপরীক্ষা' হইতে কয়েকটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃতের অনুবাদ বলিয়া 'পুরুষপরীক্ষা'র ভাষা স্বভাবতঃই সংস্কৃতানুসারিণী। স্থানে স্থানে কঠিন শব্দপ্রয়োগে দুর্ব্বোধ্য হইলেও হরপ্রসাদ তাঁহার ভাষাকে বিশেষ ওজস্বিতাগুণসম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। 'পুরুষপরীক্ষা' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া হরপ্রসাদের ভাষার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিলাম।

জীবের আশাত্যাগ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয় অর্থাৎ মোক্ষসাধক জ্ঞান হয় কিন্তু কেবল উত্তম কর্ম্ম করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না যে পর্য্যন্ত মনেতে চাঞ্চল্য থাকে ও অর্থাভিলাষ থাকে এবং যাবৎ কন্দর্পের আবির্ভাব থাকে আর যাবৎ সকল জীবেতে সমজ্ঞান না হয় ও যে পর্য্যন্ত প্রয়োজনরহিত মিত্রতা না হয় তাবৎ পরমেশ্বর নিবিড় বনের ন্যায় থাকেন অর্থাৎ জীবের জ্ঞানের অগোচর থাকেন যখন বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হয় তখন তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানেতে ঈশ্বরদর্শন হইয়া জীবের মুক্তি হয়।

অথ লব্ধসিদ্ধি কথা।—

উজ্জয়িনী নগরীতে এক রাজার তিন পুত্র ছিল। প্রথম পুত্র ভর্ত্তৃহরি দ্বিতীয় শক তৃতীয় বিক্রমাদিত্য এই তিন সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভর্ত্তৃহরি তিনি পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য হেতুক দ্বেষাদি দোষেতে রহিত ও পবিত্র এবং শান্তান্তঃকরণ আর সকরুণ এবং সকল বিষয়েতে বিরক্ত ছিলেন। পরে রাজা পরলোকগত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভর্ত্তৃহরি রাজ্যবাসনা করিতেন না কিন্তু মন্ত্রিরদিগের অনুনয়েতে কহিলেন যে আমি রাজ্যাভিলাষ করি না কেবল তোমারদের অনুরোধে রাজত্ব স্বীকার করিলাম কিন্তু ধর্ম্মার্থেই কিঞ্চিৎ কাল রাজত্ব করিব কেবল সুখার্থে রাজ্য করিব না আর আমি একবার যে সুখভোগ করিব পুনশ্চ সেই সুখভোগ করিব না এবং তোমরাও আমাকে সেই ভুক্ত ভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না। এই পরামর্শ স্থির করিয়া ভর্ত্তৃহরি ঐ রাজ্যে রাজা হইয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে শত্রুগণকে জয় করিয়া ও শিষ্ট লোকের সম্বর্দ্ধনা এবং দুষ্ট লোকের দমন আর প্রজাবর্গের পালন করিয়া এক বৎসর রাজত্ব করিলেন। পরে মন্ত্রিগণ এই নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আপনি এক বৎসর রাজত্ব করিয়া সকল কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া

যে রূপ সুখভোগ করিয়াছেন ইহার পর আগামী বৎসরে সেই সকল সুখ পুনশ্চ আসিবে কিন্তু সেই অনুভূত সুখের পুনর্ব্বার অনুভব করিলেই ভুক্তভোজন হইবে কিন্তু আপনি পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমরা আমাকে ভুক্তভোজনে প্রবৃত্ত করিবা না এই নিমিত্তে নিবেদন করিলাম এখন মহারাজের যেমত স্বেচ্ছা হয় তাহাই করুন। রাজা ভর্তৃহরি মন্ত্রিরদিগের ঐ কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যদি একবার ভুক্ত বিষয়ের পুনর্ব্বার ভোগ কর্ত্তব্য হয় তবে মনুষ্য কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না এবং যে পুরুষ সম্বৎসর পর্য্যন্ত সময় বিশেষের সেং সুখ একবার অনুভব করিয়াছে সে প্রতিবর্ষে পুনশ্চ সেইং সুখের অনুভব করিতে পারে অধিক সুখভোগ করিতে পারে না অতএব একবার ভুক্ত সুখের পুনর্ব্বার ভোগ করা উত্তম পুরুষের কর্ত্তব্য নহে অপর ভোগ্য বস্তুর একবার ভোগ করিয়াও যে লোকের পিপাসা নিবৃত্তি না হয় তাহার সেই তৃষ্ণারূপ যে প্রাণান্তক রোগ সেই রোগের চিকিৎসাও হয় না অতএব আর সুখেচ্ছা কিম্বা রাজ্য বাসনা করিব না। রাজা ভর্তৃহরি মন্ত্রিরদিগকে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া এবং রাজ্য ও সমুদায় সুখভোগ ত্যাগ করিয়া শক নামে ভ্রাতাকে রাজ্য দিয়া আপনি তপোবনে প্রবেশ করিলেন। (পৃ. ২৬৮-৭১)

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের ইতিহাস এখানেই সমাপ্ত হইল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই বাংলা সাহিত্যের উপর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তথা শ্রীরামপুর মিশনরীদের প্রভাব স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে এবং রামমোহন রায়, রামকমল সেন ও রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে সে যুগের বাঙালী সমাজ সচেতন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইয়াছে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশ, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও হিন্দু কলেজের গোড়াপত্তন, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পত্তন ও বাংলা সাময়িক-পত্রের প্রচার—দ্বিতীয় যুগের এইগুলিই স্মরণীয় ঘটনা। অবশ্য এই যুগে পাদরি ও অন্যান্য সাহেবদেরও কীর্ত্তি নিতান্ত অল্প নহে। মালদহে এলার্টন, বর্দ্ধমানে স্টুয়ার্ট, চুঁচুড়ায় হার্লি, মে ও পীয়র্সন, শ্রীরামপুরে ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান এবং পীয়র্স, ম্যাক, ইয়েট্‌স প্রভৃতি সহৃদয় বৈদেশিকেরা এদেশের শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারে নানা ভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহাদের কীর্ত্তি দ্বিতীয় যুগের গোড়াতেই আমাদের স্মরণ করিতে হইবে।

'বাংলা সাময়িক-পত্র'

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে 'বাংলা সাময়িক-পত্র' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছিলাম—

> এই পুস্তকে আমি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা সাময়িক-পত্রের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি।...১৮৬৭ পর্য্যন্ত ইতিহাসই দুষ্প্রাপ্য; আমিও যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এমন মনে করিবার কারণ নাই।

এখনও পূর্ণ এক বৎসর অতীত হয় নাই; দেখিতে পাইতেছি, আমার আশঙ্কা অমূলক নহে। সম্প্রতি একটি সম্পূর্ণ নূতন মাসিক পত্রের সন্ধান পাইয়াছি; চোখে না দেখিয়া একটি সাময়িক-পত্রের অপরোক্ষ পরিচয় দিয়াছিলাম—সেটি দেখিতে পাইয়াছি; 'সাহিত্য সংক্রান্তি' নামীয় মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যাটি সংগ্রহ হইয়াছে; এবং 'সত্যার্ণব' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্র সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। আমি বর্ত্তমান নিবন্ধে এই সকল পত্র-পত্রিকারই সামান্য সামান্য পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শিল্প কল্প লতিকা

এই মাসিক পত্রিকাটি ইতিপূর্ব্বে চোখে ত দেখিই নাই, ইহার উল্লেখও সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী কোনও সাময়িক-পত্রে বা পুস্তক-তালিকায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অথচ দেখিতে পাইতেছি, এই পত্রিকাটি কি বিষয়-গৌরবে, কি রচনা-গৌরবে, বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। ঠিক এই ধরণের, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের এমন একটি পত্রিকাও আমাদের চোখে পড়ে নাই।

১২৬৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে এই "মাসিক পত্রিকা"র প্রথম সংখ্যা "কলিকাতা। শাঁখারিটোলা নং ১৯ ভবনে, নিউ বেঙ্গাল যন্ত্রে মুদ্রিত" হইয়া প্রকাশিত হয়। "শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দের সাহায্যে" অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। ইঁহাদের অন্য কোনও পরিচয় জানিবার উপায় নাই। ১২৬৮ সালে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রে এই পত্রিকার চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়; প্রতি মাসে পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪০। ১২৬৯ সনে এই পত্রিকার কোনও সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি নাই।

প্রথম সংখ্যার "বিজ্ঞাপন"টি অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতেই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও পরিচয়ের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

> শিল্প কল্প লতিকা।
>
> প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। ইহাতে আমাদিগের অশন, আচ্ছাদন, নিকেতন ও ভ্রমণানুকূল দ্রব্যের উৎপাদনে আবশ্যক যন্ত্র ও কৌশল; এবং সুখ ও চমৎকারিতা সাধন

বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করণের প্রথা, এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য প্রকরণ, ইংরাজি ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়া, এবং দেশীয় কারখানায় যে রূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহা সংগ্রহ করিয়া লেখা যাইবে। যেমন আমরা সাহস করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এক্ষণে দেশীয় আঢ্য, বিদ্যামোদী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়া উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে সংকল্পিত বিষয়টি অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইতে পারে।……

শ্রীঅভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

প্রথম সংখ্যায় এই কয়েকটি প্রস্তাব ছিল: ১। প্রেরিত পত্র (ক) যানাদির উৎপত্তির সম্ভবিত কারণ—শ্রীচণ্ডীচরণ ঘোষ প্রেরিত; (খ) সূচীকর্ম্মের যন্ত্র—শিল্প বিদ্যোৎসাহী; ২। শিল্প কল্প লতিকা—সম্পাদকীয়। ৩। শস্যাদির উৎপত্তি—সম্পাদকীয়। ৪। সংবাদ (ক) খসখসের টাটিতে জল দিবার কল; (খ) প্রস্তর কর্ত্তনের আশ্চর্য্য প্রকরণ; (গ) এতদ্দেশীয় সূত্রধরদিগের শিরীষ কাগজ; (ঘ) দেশীয় দিয়েশেলাই প্রস্তুতকরণ; (ঙ) সামান্য বর্ত্মে চালনোপযোগী বাষ্পীয় শকট; (চ) স্থায়ী কলপ। ৫। গতি—সম্পাদকীয়।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি:—

শিল্প কল্প লতিকা।…ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের দ্বারা শিল্প (Art) শব্দটির নানা প্রকার অর্থ করা হইয়াছে, এবং ইহার অগ্রে অনেক প্রকার বিশেষণের সংযোগ করিয়া অনেক প্রকার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যথা (Useful art) ব্যবহার্য্য শিল্প, (Entertaining art) চমৎকারিতা সাধন শিল্প, (Fine art) সুকুমার শিল্প, (Industrial art) শ্রমসাধ্য শিল্প ইত্যাদি, ফলতঃ প্রায় সকল শিল্পই ব্যবহার্য্য, চমৎকারিতাসাধন, সুকুমার ও শ্রমসাধ্য। তবে এইরূপ পৃথক্ করা এক একটি সংজ্ঞক শিল্পের দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদিত অথবা ব্যবহৃত, তাহাদিগেরই ব্যবহার্য্যতা, চমৎকারিতাসাধন, সুকুমারতা, ও শ্রমসাধ্যতা বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে। ফলতঃ শিল্প এই শব্দটির অর্থ "যত্ন, শ্রম ও কৌশল সহকারে দ্রব্যের উৎপাদন, অবস্থান্তর ও উপভোগ" এই রূপ স্বীকার করিলাম, এবং এই রূপ অর্থের যত দূর অধিকার তাহাই এই পুস্তকে পরিগৃহীত হইবে। শিল্প নৈসর্গিক নিয়মের উপর বিশেষ রূপে নির্ভর করে, প্রয়োজন (প্রাণী, উদ্ভিদ কিম্বা আকরীয়) পদার্থ সকলের শরীরগত গুণ, এবং তাহাদের সংযোগ বিয়োগ দ্বারা অবস্থান্তরে রূপান্তর ও গুণান্তর বিষয়ের সিদ্ধান্তও বিশেষ রূপে আবশ্যক হইবে, সুতরাং তাহাও এই পুস্তকের উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। শিল্প কার্য্যের ক্রমশঃ উন্নতির দ্বারাই পৃথিবীর আধুনিক অবস্থা সুখকর হইয়াছে, নতুবা ব্যবহার্য্য দ্রব্যের যথেষ্টতার অভাব বশতঃ দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অনিষ্টকর ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটিত, এবং লোক সংখ্যাও এক্ষণকার মত বৃদ্ধি পাইত না, আর পৃথিবীর সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইত না। শিল্প ও পদার্থ-বিজ্ঞান মানব জাতির প্রধান প্রয়োজন ও সুখ সাধন।

দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদিগের দেশে শিল্প কর্ম্মের উন্নতি অতি মন্দ। অতীব প্রাচীন কালে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী গুলির অদ্যাবধি অণুমাত্রও বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্ত হয় নাই। এখানে

দরিদ্র ও নীচ জাতিই শারীরিক শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত, তাহাদিগের প্রায় সকলেই মূর্খ, সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা কোন বিষয়ের সমুন্নতির প্রত্যাশা প্রায় অসম্ভব। যদিও তাহাদের কেহ কখন দৈবাৎ ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তনের মনস্থ করে, তথাপি পরীক্ষার উপযোগী অর্থের অভাবে কিছু করিতে পারে না। লাভের (সফলতার) প্রত্যাশায় সন্দেহ থাকিলে এতাদৃশ ব্যক্তি কখনই সাহস করিতে পারে না। যাঁহাদিগের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন আছে, তাঁহারাও এমন সকল বিষয়ে ক্ষতির ভয়ে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ। বাণিজ্যের বিস্তার ও শিল্পের সমুন্নতি যে উপার্জ্জন আধিক্যের একমাত্র সোপান, আমাদের দেশের সম্পন্ন মনুষ্যের মধ্যে অল্প লোকেই তাহার মর্ম্ম জানেন। কেবল কোম্পানির কাগজের সুদ আর দাসবৃত্তি এই দুইটি উত্তমরূপ বুঝিয়াছেন। আহা! অর্থ ও শ্রম যদি এক উৎস হইতে নির্গত হইত, তাহা হইলে লোকের আর ভাবনা কি ছিল?

আমাদিগের দেশে শস্য উৎপাদনের যন্ত্র প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন, (লাঙ্গল ও মই ইত্যাদি) ঐ সকল যন্ত্র দেখিয়া এমন বোধ হয় না যে যত দূর প্রত্যাশা করা যায় তাহাদের তত দূর ক্ষমতা আছে, কিন্তু উহাদেরই দ্বারা ভারতবর্ষের ৭৪২০০০ বর্গ ক্রোশ পরিমিত ভূমি (জলের অংশ ব্যতীত) চসা গিয়া থাকে, এবং সেই ভূমিতে উৎপন্ন শস্য দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যের অর্দ্ধেক অশনীয় প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি ভারতভূমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি এরূপ প্রবল না হইত তাহা হইলে এরূপ ফল কদাচ সম্ভবিত না। আর যদি ঐ সকল যন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহা হইলে এ দেশের যে কত দূর পর্য্যন্ত সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে তাহা বলা যায় না।

আমাদের ব্যবহারের অন্যান্য দ্রব্য সকল যাহা এই দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সে সকলের ও ভিন্ন দেশ হইতে আহৃত দ্রব্য সমূহে যে প্রভেদ তাহা দেখিলে অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইতে পারিবে, যে আমরা শিল্প বিদ্যায় অত্যন্ত অপারদর্শী এবং তাহার দ্বারা যে উপকার হইতে পারে তাহাও অনুভব করিতে নিতান্ত অসমর্থ অথবা অমনোযোগী।

ভারতবর্ষবাসি মনুষ্যের আহার ও ব্যবহারে আবশ্যক নানাবিধ দ্রব্য অতীব প্রাচীন কাল পর্য্যন্ত ভিন্ন দেশের অণুমাত্র সাহায্য ব্যতিরেকে উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে প্রত্যেক কার্য্যের প্রথম কর্ম্মকার যে কৌশল ও প্রকরণ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্র পরম্পরা কোন অংশে তাহার সমৃদ্ধিসাধন কিম্বা ব্যতিক্রম করেন নাই, বোধ হয় কেহ প্রয়াসও পান নাই। আমাদিগের দেশে ধারাবাহিক কোন কার্য্যেই ব্যতিক্রম হয় না, সেই জন্যে অনেক মহোপকারী কার্য্য করিতেও আমাদের দেশের লোক পরাঙ্মুখ থাকেন, সেই জন্যেই দেশাচারের এত দূর ক্ষমতা। কোন একটি দ্রব্য আবিষ্কৃত হইলে অন্যান্য দেশের লোকে প্রতিনিয়তই তাহার সুবিধার আধিক্য সাধন করিতে চেষ্টা করে, এবং (কোন বার সফল কোন বার বিফল) চেষ্টা করিতে করিতে তাহার আশ্চর্য্য রূপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই সমস্ত গুণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনি প্রভৃতি সভ্য দেশের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য এত বৃদ্ধি হইয়াছে। আর ইণ্ডিয়া পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল অদ্যাপি তাহার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, যদিও কিছু হইয়া থাকে তাহাও অতি অল্প ও অকিঞ্চিৎকর।

অধুনা সহরের ধনী লোক এবং যাঁহারা ইংরাজদিগের চাকরিতে নিযুক্ত ইঁহারা যেমন হউক

সভ্য দেশসুলভ দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন এতদ্ভিন্ন সামান্য বাঙ্গালিদের পরিচ্ছদ, পাদুকা, অশনীয়, যান ও সুখসেব্য দ্রব্য সকলই পূর্ব্বতন কাল প্রচলিত শিল্প কৌশলের অপ্রতিহত আদর্শ। সেই ধুতি দোবজা, সেই চটি, নাগোরা জুতা ও খড়ম, সেই সিদ্ধান্ন পক্কান্ন প্রভৃতি, এবং সেই ছোট ছোট আরসি কাষ্ঠের চিরনি আর মালা ঘুনসি অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। সেই সকল কাঁচা রঙ মাখান কাদার পুতুল। সেই ডুলি আর নৌকা। আর ইংরাজদিগের দ্বারা সেই সমস্ত উদ্দেশের দ্রব্য সকলের সঙ্গে এ সকলের কত তারতম্য। ইংরাজদের যে স্থানে যাইবে সেই স্থানেই মনোহর সামগ্রী সকল দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হইবে। উত্তম সামগ্রী আহার করিলে, উত্তম গৃহে থাকিলে এবং উত্তম দ্রব্য দর্শন ও ব্যবহার করিতে পাইলে মনুষ্যের মন পরিতৃপ্ত ও স্বাস্থ্যলাভ হয়, এবং তাহার দ্বারা সুখ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই রূপ উপভোগের সামগ্রী শিল্প বিদ্যার সমুন্নতি ব্যতিরেকে কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের উচিত হয় যে, যাহাতে শিল্প বিদ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হয়, এরূপ চেষ্টা করি। আমরা এ বিষয়ে অন্য সকল দেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট আছি। আর যাহাতে আমাদের দেশে বৃহৎ বৃহৎ শিল্পকর্ম্মালয় সংস্থাপিত হয়, সে বিষয়ে প্রয়াস পাওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

একটি সংবাদ উদ্ধৃত করিতেছি :—

স্থায়ী কলপ। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বাবু নামক একজন চিকিৎসক পক্ক কেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবার এক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত ঔষধ শুভ্র কেশে মাখাইলে কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া যাইবে, এবং সেই কৃষ্ণ বর্ণ চিরকাল রহিবে। ইহার পূর্ব্বে এক জন সাহেব এই রূপ একটি ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহার এই ঔষধ যদি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হয়, তবে বোধ করি ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলে উক্ত ঔষধের ব্যবসায় করিবার (Patent) একাধিকার পাইতে পারেন। তাহা হইলে ইহা সর্ব্বজন গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা।

অবকাশবন্ধু

'বাংলা সাময়িক-পত্রে'র ৩২৭-২৮ পৃষ্ঠায় এই মাসিক পত্রের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা 'নব-প্রবন্ধ' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত। এই পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যার পরিচয় দিতেছি। এই পত্রের ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যার প্রকাশ-কাল—আশ্বিন ১২৭৪ সাল। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২।

প্রথম সংখ্যার শেষে এই বিজ্ঞাপন ছিল :—

বিজ্ঞাপন। এই অবকাশবন্ধু পত্র সাহিত্য বিজ্ঞান ও বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধে প্রকটীত হইবে। ইহা দরমাহাটা ষ্ট্রীটে (খোড়ুয়া পোস্তা ১৭ নম্বর ভবনে শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে, বার্ষিক মূল্য ।৹ আনা ষাণ্মাসিক ।৹ আনা ত্রৈমাসিক দুই আনা প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন পয়সা।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক

প্রথম সংখ্যার সূচী এইরূপ :—

ভূমিকা — যৌবনের উন্নত আশা [কবিতা]
জন্মভূমি — অস্তিমচিন্তা [কবিতা]
কিং কাজো পশুর বিবরণ — পরদোষ কথন (গোলেস্তাঁ হইতে) [কবিতা]

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "ভূমিকা" এইরূপ :—

ভূমিকা। এক্ষণে অস্মদ্দেশে মাসিক, সাপ্তাহিক দৈনিক প্রভৃতি নানা প্রকার পত্রিকা দিন দিন বাহির হইয়া বঙ্গভাষার ভূয়সী উন্নতি সংসাধন করিতেছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে মুসলমানদিগের সময়ে আমাদিগের দেশে বঙ্গভাষার যে রূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, মহাত্মা ইংরাজদিগের প্রযত্নে ইহার সেইরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এবং বোধ হয় ইঁহাদিগের দ্বারাই আমাদিগের মাতৃ ভূমি সত্বরে তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমরা এই অবকাশবন্ধু নামক ক্ষুদ্র মাসিক পত্র খানি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম কিন্তু বঙ্গভাষার বর্ত্তমান অবস্থাতে অনেকানেক জ্ঞানগর্ভ ও নীতিপ্রদ প্রবন্ধ পূর্ণ পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত থাকাতে, আমাদিগের এই সামান্য ক্ষুদ্র পত্র জনসমাজে যে আদরণীয় হইবে এমত আশা কখনই হয় না। আমরা বামন হইয়া অত্যুচ্চ হিমগিরি উল্লঙ্ঘনের ন্যায় এবং ভেলক দ্বারা দুস্তর সাগর পার হইবার ন্যায় এই পত্র প্রকাশে ব্রতী হইলাম। বলিতে পারি না ইহাতে কি পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিব। যাহা হউক এক্ষণে সভ্য ভব্য জনগণের প্রতি নিবেদন, যেন তাঁহারা ইহার দোষ ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগকে উৎসাহ দান দ্বারা চিরবাধিত করেন।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ "জন্মভূমি" প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে জন্মভূমির প্রতি পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে স্বদেশ মনে করা ও সকল মনুষ্যই পরম পিতার সন্তান বলিয়া সকলেরই হিতসাধনে নিযুক্ত থাকাই উচিত। কিন্তু যদিও উদারচরিতেরা বসুধাশুদ্ধ লোককে কুটুম্ব মনে করেন তথাপি সচরাচর লোকে অভ্যাস, স্বভাব বা সংস্কার বশতঃ স্বদেশকেই প্রেম করেন। প্রত্যেকে যদি স্ব স্ব দেশের বিদ্যা সভ্যতার উন্নতি ও আচার ব্যবহারের সংশোধনে যত্ন করেন, তাহা হইলেই পৃথিবীর উন্নতি হয়। এক এক ব্যক্তি এক দেশে থাকিয়া তাহারই মঙ্গল সাধন করিবেন জগদীশ্বরেরও এই অভিপ্রায়।

দ্বিতীয় সংখ্যার (কার্ত্তিক ১২৭৪) প্রকাশকাল দেখিতেছি—৩০ কার্ত্তিক এবং পত্রিকা-শেষে মুদ্রাকর-নিশান এই ভাবে দেওয়া আছে :—

Printed by K. D. Chuckerbutty, at the Calcutta Brahmo Somaj Press for the proprietor. 15th Nov. 1867.

এই সংখ্যার সূচী :—

অবকাশ কাল — অভিজ্ঞতা
জীবনের শৃঙ্খলা — তাড়িত বার্ত্তাবহ [কবিতা]
চণ্ডকৌষিক। প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনামার পরেই এই শ্লোকটি উদ্ধৃত আছে :—

"কাব্য শাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং।
ব্যসনেন চ মূর্খানাং নিদ্রয়া কলহেন বা।"

সাহিত্য সংক্রান্তি

আমার পুস্তকের ২৯৫ পৃষ্ঠায় এই মাসিক পত্রটির পরিচয় আছে। সম্প্রতি প্রথম সংখ্যাটি দেখিয়াছি।

১২৭০ সালের ৩১ জ্যৈষ্ঠ ইহা "কলিকাতা। চোরবাগান ৪৫ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে শ্রীযোগেন্দ্র নাথ দাস ঘোষ দ্বারা প্রতি সংক্রান্তিতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। মূল্য ৵০ দুই আনা।" প্রতি মাসের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬।

প্রথম সংখ্যার সূচী :—

আরম্ভ [কবিতা]
নভোমণ্ডল [কবিতা]
পরাধীনা বঙ্গকন্যা
কুঁড়ের কাছে ফুলের বাগান [কবিতা]
বীর্য্যবতী হিন্দুনারী [কবিতা]

"আরম্ভ" এইরূপ :—

এলেম আমরা আজি লোকের গোচরে,
নির্ভয় হৃদয়ে, শুদ্ধ সরল অন্তরে।
নিলেম সে ভার, যাহে আজো কোন জন
হন নাই উৎসাহী করিতে হস্তার্পণ।
কি রূপ সে কার্য্যভার, কি তার আভাস,
ক্রমে তাহা এ সংক্রান্তি করিবে প্রকাশ।
প্রতিজ্ঞা রহিল এবে অন্তরে গোপন ;
কার্য্যেতে করিতে চাহি তাহার পালন।

সত্যার্ণব

আমার পুস্তকের ১৭৫-৭৭ পৃষ্ঠায় এই পত্রিকার একটি বিবরণ আছে। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের 'সত্যার্ণব' দেখিয়াছি।

প্রথম দুই বৎসর 'সত্যার্ণব' মাসিক পত্ররূপে চলিয়াছিল, এ কথার উল্লেখ আমার পুস্তকে আছে। তৃতীয় কাণ্ড হইতে উহা দ্বৈমাসিক (দুই মাস অন্তর) পত্রে পরিণত হয়। তৃতীয় কাণ্ড, ১ম সংখ্যার শেষে প্রকাশ :—

"বিজ্ঞাপন পত্রমেতৎ। সত্যার্ণব গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি সমাদর পুরঃসর বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে এই পত্র এতৎকালাবধি মাসি২ প্রচারিত না হইয়া মাসদ্বয়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।...

দ্বৈমাসিক পত্রে পরিণত হওয়ায় 'সত্যার্ণব' পত্রের তৃতীয় বর্ষে ছয় সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ১৮৫২—জুলাই ১৮৫৩) এবং চতুর্থ বর্ষে ছয় সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ১৮৫৩—জুলাই ১৮৫৪) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা আরও এক বৎসর (অর্থাৎ পাঁচ বৎসর) চলিয়াছিল বলিয়া মার্ডক উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পঞ্চম বৎসরের কোন সংখ্যা আমি এখনও দেখি নাই।

এখানে প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। 'বাংলা সাময়িক-পত্রে'র ১৯২ পৃষ্ঠায় 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছি :—"বাংলায় ইহাই প্রকৃতপক্ষে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র।" 'সত্যার্ণব' 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র অগ্রজ এবং ইহার প্রথম বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় একখানি ও দ্বিতীয়-চতুর্থ বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় দুইখানি করিয়া চিত্র থাকিত। কেহ কেহ এই কারণে আমার পূর্ব্বোক্ত উক্তিতে দোষ ধরিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই যে, 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় 'পশ্বাবলী'র বর্ণনায় প্রত্যেক

সংখ্যায় এক-একটি জন্তুর কাঠখোদাই চিত্রের উল্লেখ আমিই করিয়াছি। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'কেই "প্রকৃতপক্ষে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র" বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি। সচিত্র পত্রিকা বলিতে আমরা যাহা বুঝি 'পশ্বাবলী' বা 'সত্যার্ণব' সে-পর্য্যায়ে পড়ে না। তবু এগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র বর্ণনায় "প্রকৃতপক্ষে" বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাঙ্গাল গেজেটি

'বাঙ্গাল গেজেটি' ও 'সমাচার দর্পণ'—এই দুইখানির মধ্যে কোন্‌খানি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র, এই লইয়া অনেক দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি 'বাঙ্গাল গেজেটি' সম্বন্ধে একটু নূতন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখের 'ওরিয়েন্টাল স্টার' হইতে 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (জানুয়ারি ১৮১৯, পৃ. ৫৯) নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

Amongst the improvements which are taking place in Calcutta, we observe with satisfaction that the publication of a Bengalee newspaper has been commenced. The diffusion of general knowledge and information amongst the natives must lead to beneficial effects; and the publication we allude to, under proper regulations, may become of infinite use, by affording the more ready means of communication between the natives and European residents.

'ওরিয়েন্টাল স্টার' এখানে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গাল গেজেটি'র কথাই বলিতেছেন, কারণ শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়—২৩ মে ১৮১৮ তারিখে।

কিন্তু 'ওরিয়েন্টাল স্টারে'র উদ্ধৃতিটি হইতে 'বাঙ্গাল গেজেটি' যে 'সমাচার দর্পণে'র অগ্রজ সে-বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। আমার সংশয়ের কারণ বলিতেছি।

১৪ই মে ১৮১৮ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' প্রকাশিত, ১২ই মে তারিখযুক্ত একটি বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' "প্রকাশিত হইবে" ("intends to publish"), আবার 'ওরিয়েন্টাল স্টারে'র ১৬ই মে তারিখের সংবাদে দেখা যাইতেছে—"the publication of a Bengalee Newspaper has been commenced," অর্থাৎ ১২ই হইতে ১৬ই মে তারিখের মধ্যে উক্ত সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রতি শুক্রবার বাহির হইত, সুতরাং ১৫ই মে (শুক্রবার) উহা প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে। এখন বিবেচ্য, ১৪ই মে তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' "বাহির হইবে," এই বিজ্ঞাপন বাহির হইবার পরদিনই—১৫ই তারিখে কাগজ বাহির হওয়া সে-যুগের পক্ষে সম্ভব কি না। সে-যুগের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই বুঝিবেন ইহার মধ্যে কোন গল্‌তি থাকা সম্ভব। ১৪ই তারিখের কাগজে যাঁহারা "intends to publish" বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন তাঁহারা ১৫ই তারিখে কাগজ বাহির করিয়া বসিলেন, এবং ১৬ই তারিখে 'ওরিয়েন্টাল স্টারে'র সাহেব সম্পাদক সেই পত্রিকা দৃষ্টে সেই দিনই তাহার উপর মন্তব্য লিখিলেন ও তাহার পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই তারিখে সেই মন্তব্য প্রকাশিত হইল—সহজে ইহা মানিয়া লইতে বাধা আছে। আমার বিশ্বাস, এই সংবাদের মধ্যে 'ওরিয়েন্টাল স্টারে'র কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আছে; "আয়োজন"কে তাঁহারা "ঘটনা"র মর্য্যাদা দিয়াছেন; "publication...has been commenced" শব্দের দ্বারা সম্পাদক মহাশয় হয়ত ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

১৮১৮ সনে প্রকাশিত, সহমরণ-বিষয়ক রামমোহন রায়ের প্রথম পুস্তিকা—'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ'—ঐ বৎসর 'বাঙ্গাল গেজেটি'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। (*Asiatic Journal*, July 1819, p. 69.)

পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ

ঈশান নাগরের প্রসিদ্ধ "অদ্বৈত-প্রকাশ" গ্রন্থ ১৪৯০ শকাব্দে (১৫৬৮ খ্রীঃ) রচিত হয় বলিয়া গ্রন্থমধ্যে (তত্ত্বনিধির সং, ২৫৮ পৃঃ) নির্দ্দেশ আছে। এই সময়ে বাঙ্গালার সারস্বত কেন্দ্র নবদ্বীপ হইতে নব্য ন্যায় ও নব্য স্মৃতি চর্চ্চার প্রথম তাণ্ডবলীলা সমগ্র বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল এবং বিদ্বৎসমাজের প্রায় প্রত্যেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি অন্যতর বিষয়ে পরম পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া নানাবিধ বিচিত্র উপাধি ধারণপূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা প্রকটিত করিতেছিলেন। কোন প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে চৈতন্যদেবাদির পাণ্ডিত্যসূচক কোন উপাধির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তজ্জন্য অনেকের মনে খেদ হওয়ার সম্ভাবনা; ঈশান নাগর সে অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অদ্বৈতের ক্ষুদ্র "আচার্য্য" উপাধিই চিরপ্রচলিত। ঈশান নাগরের মতে তিনি ষড়্দর্শন সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করিয়া "শান্ত বেদান্তবাগীশ" নামক অধ্যাপকের নিকট দুই বৎসর বেদ পড়িয়া "বেদপঞ্চানন" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (পৃঃ ২০, ২২)। চৈতন্যদেবও সর্ব্বশেষে অদ্বৈতাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতেই "বেদ" অধ্যয়ন করিয়া "বিদ্যাসাগর" উপাধি পাইয়াছিলেন :—

এই নিমাঞি সর্ব্বশাস্ত্রে অতিবিচক্ষণে।
বিদ্যাসাগর উপাধি মুঞি করিলুঁ স্থাপনে ॥ (১২৬ পৃঃ)

চৈতন্যের আদিলীলার বর্ণনায় পুনঃ পুনঃ "নিমাই বিদ্যাসাগরে"র (পৃঃ ১২৮, ১৩৩, ১৪০) নাম উল্লেখ করিয়া ঈশান নাগর আমাদিগকে এই অভিনব উপাধির কথা বিস্মৃত হইতে দেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণকালে "নিমাই বিদ্যাসাগর" এক স্থানে জনৈক "তর্ক-চূড়ামণি"কে তর্কশাস্ত্রের বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন (পৃঃ ১৩৩) এবং অন্যত্র তদ্দেশীয় বিদ্বৎসমাজ তাঁহার পরিচয়প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন :—

বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাঞি পণ্ডিত।
বিদ্যাসাগর নামে টীকা যাঁহার রচিত ॥ (পৃঃ ১৩৪)

এই টীকা কোন্ শাস্ত্রের উপর রচিত হইয়াছিল, ঈশান নাগর তাহা পরিব্যক্ত করেন নাই। "সর্ব্বশাস্ত্রের" মধ্যে বেদান্তদর্শনে আনন্দপূর্ণ-রচিত কতিপয় টীকাগ্রন্থের নাম "বিদ্যাসাগরী"; কিন্তু আনন্দপূর্ণ চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ অবাঙ্গালী ছিলেন। মহাভারতের অন্যতম (বাঙ্গালী) টীকাকার বিদ্যাসাগর অনেক পরবর্ত্তী ছিলেন জানা যায়। স্মৃতি কিম্বা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর নামে কোন টীকাকারের উল্লেখ নাই। ঈশান নাগরের নিজ উক্তিমতে নিমাই-রচিত তর্কশাস্ত্রের অর্থাৎ নব্য ন্যায়ের টীকা (পৃঃ ২১২) এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিভাষ্য (পৃঃ ২১১) লোকলোচনের গোচর হওয়ার পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং "নিমাই বিদ্যাসাগর"-রচিত "বিদ্যাসাগরী টীকা"র কথা সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত

এবং আমাদের ধারণা, "অদ্বৈত-প্রকাশে" উল্লিখিত প্রায় সমস্ত কথাই এইরূপ কাল্পনিক, যাহা প্রামাণিক গ্রন্থদ্বারা সমর্থিত হয় না।

ঈশান নাগর অজ্ঞাতসারে যে বাঙ্গালী মহাপণ্ডিতের কীর্ত্তি বিলোপ করিয়া, তদ্দ্বারা চৈতন্যদেবের অজ্ঞাতপূর্ব্ব লীলা কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহার নাম **পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য** এবং নব্য ন্যায়াদি নানা শাস্ত্রে ইঁহার রচিত 'বিদ্যাসাগর নামে টীকা' বর্ত্তমানে বিলুপ্তপ্রায় হইলেও ঈশান নাগরের গ্রন্থ রচনাকালে প্রচারিত ছিল সন্দেহ নাই। দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণির পূর্ব্বগামী একজন নৈয়ায়িকরূপে তাঁহার প্রসঙ্গ আমরা অদ্য উত্থাপন করিলাম।

এ যাবৎ আমরা পুণ্ডরীকাক্ষ-রচিত ১০ খানা গ্রন্থের উল্লেখ পাইয়াছি। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। **চণ্ডীর টীকা**:—কলাপব্যাকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত নরসিংহ চক্রবর্ত্তি-রচিত চণ্ডীটীকা এক সময়ে বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল—ইহার প্রতিলিপি পূর্ব্ববঙ্গে এখনও সুপ্রাপ্য। নরসিংহ বহুতর প্রাচীন টীকাকার ও বৈয়াকরণের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মূল্যবান্ গ্রন্থখানিকে ভরিয়া রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে বহু স্থলে "বিদ্যাসাগর" কিম্বা "সাগরে"র মত উদ্ধৃত পাওয়া যায়[১] এবং তাহাদের কয়েকটা যে বিদ্যাসাগর-রচিত অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক চণ্ডীটীকা হইতে উদ্ধৃত, তাহা নিঃসন্দেহ। সম্প্রতি কুমিল্লার রামমালা পাঠাগারের পুথিশালায় বিদ্যাসাগর-রচিত চণ্ডীটীকার দুইটী প্রতিলিপি সংগৃহীত হইয়াছে।[২] একটি ১৭১৫ শকে লিখিত, তাহার পুষ্পিকা এই :—

> ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং
> চণ্ডীটীকায়াং মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যং সমাপ্তং।

এই গ্রন্থই সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনা; কারণ, ইহাতে গ্রন্থান্তরে বিজৃম্ভমান তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও প্রাচীন মতের বিস্তৃত খণ্ডনমণ্ডন একেবারেই বিদ্যমান নাই। মাত্র দুই স্থলে "চাতুর্ভুজী" টীকার এবং এক স্থলে কোষকার "গঙ্গাধরের" মত উদ্ধৃত পাওয়া যায়।

২। **কাতন্ত্রপ্রদীপ**:—ইহা দুর্গসিংহরচিত "কাতন্ত্রবৃত্তিটীকা"র উপর অতি বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কলাপব্যাকরণের দুইটি বিভিন্ন প্রস্থান বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল—পঞ্জীকার ত্রিলোচনদাসের ও "টীকা"কার দুর্গসিংহের। কালক্রমে "টীকা"র পঠনপাঠন শিথিল হইয়া গিয়া পঞ্জীগ্রন্থই বহুল প্রচার লাভ করে—বর্ত্তমানে প্রচলিত প্রায় সমস্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থই

১। অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির ২৬, ৫১, ৬২, ৭৪, ৭৮-৭৯, ৯৪ পত্র দ্রষ্টব্য। এই পুথির লিপি-কাল ১৭৩৬ শক, পত্রসংখ্যা ৯৬। নরসিংহ এক স্থলে পরিশিষ্টপ্রবোধকার গোপীনাথের মত উল্লেখ করিয়াছেন (৫১ পত্রে) এবং তাহার গ্রন্থের প্রাচীনতম প্রতিলিপির তারিখ ১৫৯৫ শক (H. P. Sastri, *Notices*. I. 186.)। অনুমান হয়, তাঁহার গ্রন্থরচনার তারিখ খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইবে।

২। পুরাণ, ২২ ও ২৩ সং পুথি।

বৃত্তি ও পঞ্জীর উপর রচিত ; যথা, সুষেণ কবিরাজ, হরিরাম, রামদাস, রামচন্দ্র প্রভৃতিরচিত গ্রন্থ। মূল "টীকা"গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য এবং তাহার ব্যাখ্যাকারগণের প্রায় সকলেরই গ্রন্থ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে: যথা, কুলচন্দ্র, হেমকর, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি। বিদ্যাসাগর-রচিত "কাতন্ত্রপ্রদীপে"র কতিপয় বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কতক অংশ মুদ্রিতও হইয়াছে। গুরুনাথ বিদ্যানিধির কলাপব্যাকরণের বিরাট্ সংস্করণে ১৩১২ সনে সর্ব্বপ্রথম কারকপ্রকরণের মাত্র ১২টি সূত্রের উপর বিদ্যাসাগরী টীকা মুদ্রিত হয়। পরে ধাতুসূত্রের উপর, "ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ" সূত্রের উপর এবং আখ্যাতের সপ্তমাধ্যায়ের কতিপয় (৩৬৭-৭৬ সংখ্যক) সূত্রের উপর বিদ্যাসাগরীও উক্ত সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। শেষোক্ত অংশ "সপ্তমমঙ্গলা" নামে মুদ্রিত হইলেও উহা যে বিদ্যাসাগর-রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারকপ্রকরণের ১২টি সূত্রের টীকা ক্ষুদ্র অক্ষরে ঘনভাবে বৃহদাকার পত্রে মুদ্রিত হইয়াও ৬৩ পৃষ্ঠাব্যাপী বটে ; ইহা হইতে এই গ্রন্থের আকার অনুমান করা যায়। যাঁহারা ধৈর্য্য-সহকারে এই অশুদ্ধিবহুল মুদ্রিত ব্যাখ্যা পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লইয়া বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে একজন শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ ছিলেন বলিলে একটুও অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয়, কলাপ-ব্যাকরণের এক দুরূহ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা বিলয়প্রাপ্ত হইল ; বাঙ্গালী তাহার সম্যক্ আস্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত। বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্য, তিনি অধিকাংশ স্থলে পূর্ব্বগামী বৈয়াকরণদের নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদের মতের খণ্ডনমণ্ডন করিয়াছেন। তিনি কাতন্ত্রের টীকাকার হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য পাণিনিতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন কাল হইতে পাণিনিতন্ত্রের যে এক বিশিষ্ট প্রস্থান গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার গ্রন্থসমূহ হইতে তিনি প্রচুর উপকরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—ন্যাসকার, ইন্দুমিত্র (অনুন্যাসকার), মৈত্রেয় রক্ষিত, পুরুষোত্তম, শরণদেব, সীরদেব প্রভৃতির সন্দর্ভ তিনি পদে পদে আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মৈত্রেয় রক্ষিতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৈত্রেয়-রচিত "ধাতুপ্রদীপ" গ্রন্থ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "তন্ত্র-প্রদীপ" বাঙ্গালার বাহিরে প্রচারিত হয় নাই। মুদ্রিত কারকপ্রকরণের ক্ষুদ্র অংশেই বিদ্যাসাগর কিঞ্চিন্ন্যূন একশত বার এই গ্রন্থের মত ও সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন—অধিকাংশ স্থলে "রক্ষিত" নামে, অনেক স্থলে "মৈত্রেয়" নামে এবং কতিপয় স্থলে "তন্ত্রপ্রদীপ" গ্রন্থ নামে। মৈত্রেয় রক্ষিতই বিদ্যাসাগরের পরমপ্রমাণস্বরূপ ছিলেন[৩] এবং অনুমান হয়, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি নিজ গ্রন্থের নাম "কাতন্ত্রপ্রদীপ" রাখিয়া-ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় কাতন্ত্রপ্রদীপের দুইটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে—একটি কারকপ্রকরণের (মুদ্রিত কারকাংশ তন্মধ্যে আছে) ও সমাসের কতিপয় সূত্রের উপর এবং অপরটি কৃৎপ্রকরণের বিচ্ছিন্ন অংশ। সৌভাগ্যক্রমে শেষোক্ত পুথিতে পুষ্পিকা আছে ;

৩। "বস্তুতস্তু কিমত্রাস্মদ্যুক্তেন মৈত্রেয়পাদা এব প্রমাণং" (কারকপ্রকরণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬৭৮ সংখ্যক পুথির ৭১ক পত্র)।

তাহা এই :—

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীমচ্ছ্রীকান্তপণ্ডিতাত্মজশ্রীপুণ্ডরীকাক্ষবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যবিরচিতে কাতন্ত্রপ্রদীপে কৃৎসু পঞ্চমঃ পাদঃ সমাপ্তঃ। (৪৩৪৮ সং পুথির ৫৮খ পত্র ; ১৭১৫ শকের পুথি)

এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর স্বরচিত অধুনালুপ্ত তিনখানি নিবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। **ন্যাসটীকা,** যথা,—

তচ্চিন্ত্যমি'ত ন্যাসঃ (?) টীকায়াং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ।৪

৪। **কারককৌমুদী,** যথা—

কারকমাত্রস্যৈব হি করণত্বং সম্ভবতি ইতি কারককৌমুদ্যাং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ।৫

৫। **তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ,** যথা—

অনয়োশ্চ মতয়োর্বলাবলম(স্ম)ৎ-কৃতে তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশেঽনুসন্ধেয়ং।৬

৬। **কলাপদীপিকা :**—ভট্টিকাব্যের বিখ্যাত টীকা। বহু বৎসর হইল, ইহার চারি সর্গ গুরুনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় "ভট্টিকাব্যস্য পরিশিষ্টং" নামে মল্লিনাথের টীকার সহিত মুদ্রিত করিয়াছিলেন।৭ এই টীকা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং ইহার প্রতিলিপি এখনও দুষ্প্রাপ্য নহে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে ইহার একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আছে—ঢাকা, কুমিল্লা ও নবদ্বীপের পুথিশালায়ও ইহার খণ্ডিত অংশ রক্ষিত আছে। পরবর্ত্তী কালের বিখ্যাত টীকাকার ভরত মল্লিক স্বরচিত টীকামধ্যে বিদ্যাসাগরের টীকারই প্রায় হুবহু অনুবাদ করিয়াছেন—বিদ্যাসাগর হইতে অনূদিত অংশ বাদ দিলে ভরত মল্লিকের টীকার বৈশিষ্ট্য প্রায় বিলুপ্ত হয়। বিদ্যাসাগরের এই টীকাও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ; আমরা একটিমাত্র সর্ব্বজনপরিচিত স্থলে তাঁহার টীকাংশ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম। ১ম সর্গের তৃতীয় শ্লোকের "বসূনি তোয়ং ঘনবদ্ব্যকারীৎ" বাক্যে ব্যাকরণানুসারে 'তোয়' পদের ক্রিয়ান্বয় ঘটে না—জয়মঙ্গলাকার, মল্লিনাথ প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণ ইহা ধরিতেই পারেন নাই। বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন :—

যদ্যপি যথা ঘনস্তোয়ং বিকিরতি তথা স বসূনি ব্যকারীদিতি নান্বয়ঃ সম্ভবতি ঘনশব্দস্য বৃত্ত্যুপ-

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬৭৮ সং পুথির ১২খ পত্র। এই পুথি ৯৭পত্রে সম্পূর্ণ—লিপিকার রামকান্ত শর্ম্মা "অন্যদাদর্শে নাস্তি" লিখিয়া শেষ করিয়াছেন।

৫। ঐ, ৩৬৭৮ সং পুথির ১৩ক পত্র দ্রষ্টব্য। মুদ্রিত কারকপ্রকরণেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়—৭, ১৩ ও ৪৬ পৃঃ। কারককৌমুদী নামক এক অজ্ঞাতকর্ত্তৃক ক্ষুদ্র নিবন্ধ পাওয়া যায় (L. 1161, অস্মন্নিকটেও আছে), তাহা বিদ্যাসাগর-রচিত নহে।

৬। মুদ্রিত কারকপ্রকরণ, ৫৬ পৃঃ। ৩৬৭৮ সং পুথির ৫৭খ পত্র। আমরা পূর্ব্ববৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষতঃ পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এর নিকট আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

৭। বিদ্যানিধি মহাশয় প্রারম্ভাংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবরণীতে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে—L. 2154. বিদ্যানিধির মুদ্রিতাংশ আদর্শদোষে অশুদ্ধিবহুল।

সর্জ্জনতয়া ক্রিয়াসম্বন্ধাভাবেন তোয়মিত্যস্যানন্বিতত্বাৎ, তথাপি তোয়শব্দোঽয়ং গৌণ্যা বৃত্ত্যা তৎসদৃশে বর্ত্ততে—তোয়তুল্যানি বসূনি ঘনতুল্যো ব্যকারীৎ দত্তবান্। যথা ঘনস্য দানে ফলানপেক্ষা তথা রাজ্ঞোঽপি দানকালে বসূনামনপেক্ষণীয়ত্বেন তোয়তুল্যতা। তোয়শব্দোঽয়মুপাত্তস্বসংখ্য এব বসুসমানাধিকরণ ইতি নোপচারে বচনপরিত্যাগঃ, অনেকেষামপি বসূনামেকতোয়তুল্যতেত্যাশয়াৎ। অতএব সাক্ষাশ্চং চত্বারি যোজনানীত্যাদৌ নোপচারে বচনপরিত্যাগ ইতি কাতন্ত্রপ্রদীপাদাবুক্তং।

ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, বাঙ্গালার বিদ্যালয়সমূহে ভট্টিকাব্য অধ্যয়নকালে এই শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী টীকাকারের গ্রন্থ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতেছে—গুরুনাথের অনতিপ্রচলিত সংস্করণ ব্যতীত কেহই এই সুপ্রাপ্য টীকার আলোচনা করেন নাই।

কাতন্ত্রপ্রদীপ ব্যতীত এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর স্বরচিত আরও তিনটি টীকাগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

৭। **বামনটীকা**

৮। **কাব্যপ্রকাশটীকা**, যথা—

অলঙ্কারলক্ষণং বামনটীকায়াং কাব্যপ্রকাশটীকায়াঞ্চ প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ।[৮]

৯। **কাব্যাদর্শদীপিকা**, যথা,—

অন্যে তু, ঔর্জ্জিত্যমথ সৌখ্যঞ্চ গাম্ভীর্য্যমথ বিস্তরঃ।
সংক্ষেপঃ সম্মিতত্বঞ্চ ভাবিকত্বং গতিস্তথা।
রতিশক্তিস্তথা প্রৌঢ়িঃ প্রেয়ানথ সুশব্দতা।

ইত্যেতানপ্যধিকান্ গুণানাহুঃ। এতেষাং লক্ষণং মৎকৃতকাব্যাদর্শদীপিকায়ামনুসন্ধেয়ম্।[৯]

বিদ্যানিধি মহাশয় আদর্শ-দোষে গ্রন্থকারের নাম "পুণ্ডরীক" বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন।[১০] তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, কলাপদীপিকার আরম্ভ-শ্লোকে স্পষ্ট 'পুণ্ডরীকাক্ষ' রহিয়াছে। ৫ম সর্গের শেষেও পাওয়া যায়,—

ইতি শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষো দক্ষঃ সংপক্ষরক্ষণে।
প্রকীর্ণকাণ্ডং ব্যাচষ্ট স্পষ্টং কাতন্ত্রবর্ত্মনা। (৬৩খ পত্র)

১০। **কাতন্ত্রপরিশিষ্টের টীকা**:—বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রশংসনীয় উদ্যমে ইহারও কতিপয় পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। লণ্ডনে এই গ্রন্থের এক সম্পূর্ণ প্রতিলিপি রক্ষিত আছে।[১১]

৮। দশম সর্গের ১ম শ্লোকের টীকায় অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির ১৫১খ পত্র। কাতন্ত্রপ্রদীপেও কাব্যপ্রকাশটীকার উল্লেখ আছে; যথা, "প্রয়োজনাধীনা লক্ষণা ইত্যপি কার্য্যমাত্রে পরিভাষা ন তু নিয়ম ইতি কাব্যপ্রকাশটীকায়াং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ" (ঢাকার ৩৬৭৮ সং পুথির ৯৫খ পত্র)।

৯। বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতির সম্পূর্ণ পুথির ১১০ক পত্র। আমাদের পুথিতে (১৬৫ক পত্র) "কাব্যাদর্শ টীকায়াং" পাঠ আছে (১১শ সর্গের ১ম শ্লোক)।

১০। কলাপব্যাকরণ (৩য় সংস্করণ, ১৩১২ সন), ভূমিকা, ।৴০ পৃষ্ঠা।
ভট্টিকাব্যের পরিশিষ্ট, ৭৯ পৃঃ (২য় সর্গের পুষ্পিকা)।

১১। কাতন্ত্রপরিশিষ্টম্ (১৩২১ বঙ্গাব্দ), ৫০৯-১৪ পৃঃ।
Eggeling: *Ind. Off. Cat*, p. 769.

পরিশিষ্টের টীকাকার হইলেও বিদ্যাসাগর কাতন্ত্রপ্রদীপে পুনঃ পুনঃ তীব্র ভাষায় শ্রীপতির মত খণ্ডন করিয়াছেন। পরমতখণ্ডনকালে বিদ্যাসাগরের দম্ভোক্তি অনেক সময় উপভোগ্য। কৃৎপ্রকরণে আছে,—

"তদসদুপাধ্যায়সেবাবিজৃম্ভিতদুর্বুদ্ধিবৈভবাদেব।" (৫৩খ পত্র)

"ইতি চক্ষুষী নিমীল্য পরিভাবয়ন্তু ভবন্তঃ।" (৫৪ক পত্র)

বঙ্গদেশে নব্য ন্যায়, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্র চর্চ্চার ইতিহাস বিষয়ে বিদ্যাসাগরের এ যাবৎ আবিষ্কৃত গ্রন্থাংশ হইতেই অনেক মূল্যবান্ উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে বাঙ্গালা দেশে কলাপব্যাকরণের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থকার বিদ্যাসাগরের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ধাতুবৃত্তিকার রমানাথ 'মনোরমা' গ্রন্থে এক স্থানে কাতন্ত্রপ্রদীপের উল্লেখ করিয়াছেন।[১২]

অন্যে তু স্বরব্যঞ্জনয়োরাদেশে স্থানিবদ্ভাবো নাস্তীতি হ্রস্বমাচষ্টে হ্রাসয়তি ইত্যত্র দীর্ঘমিচ্ছন্তীতি কাতন্ত্রপ্রদীপঃ।

'মনোরমা' ১৫৩৬ কিম্বা ১৫৪৬ খ্রীঃ রচিত হইয়াছিল। অধিকাংশ গ্রন্থকার বিদ্যাসাগরকে "মহান্তঃ" বলিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন। সুষেণ কবিরাজ ও নরহরি তর্কাচার্য্য বহু স্থলে উক্ত "মহান্তঃ" পদোল্লেখপূর্ব্বক বিদ্যাসাগরের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত "বিদ্যাসাগর" কিম্বা "সাগর" নামে রঘুনন্দন আচার্য্যশিরোমণি (কলাপতত্ত্বার্ণবে), হরিরাম চক্রবর্ত্তী, রামদাস চক্রবর্ত্তী, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতি ১৭শ শতাব্দীর বহু কাতন্ত্রমতের গ্রন্থকার তাঁহার সন্দর্ভ তুলিয়াছেন।[১৩]

ভরত মল্লিক ব্যতীত সুপদ্মমতের কন্দর্প চক্রবর্ত্তী বিদ্যাসাগরের ভট্টিটীকার প্রসিদ্ধি উল্লেখ করিয়াছেন :—

বিদ্যাসাগরটীকায়াং কাতন্ত্রপ্রক্রিয়া যতঃ।
সুপদ্মপ্রক্রিয়া তস্মাৎ তস্যামেব প্রণীয়তে॥

১২। মনোরমা বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে : শ্রীনাথ শিরোমণির "গণমালা" (১ম সং, ১২৯৭ সন) ৩১৯ পৃঃ ও (২য় সং, ১৩১১) ৩০৮ পৃঃ, "গণতত্ত্বদীপিকা" (১৩০৬, ঢাকা) ২৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। মনোরমা "বসু-বাণ-ভুবনগণিতে" (১৪৫৮) শকে রচিত (I. O. 775 : অস্মদীয় পুথিতেও এই শকাঙ্কই আছে), কিন্তু ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রাচীন পুথিতে "বসুরসভুবনগণিতে" (১৪৬৮) পাঠ আছে (H. P. Sastri : *Darbar Library Cat.*, II. 214.)

১৩। কবিরাজ, আচার্য্যশিরোমণি ও হরিরাম গুরুনাথের সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। নরহরি তর্কাচার্য্যের পঞ্জীব্যাখ্যা (আখ্যাতের) দুষ্প্রাপ্য নহে, অস্মদীয় খণ্ডিত পুথির ৪, ১৬, ১৮-১৯ প্রভৃতি পত্র দ্রষ্টব্য। রামদাসের 'কাতন্ত্রচন্দ্রিকা'ও দুষ্প্রাপ্য নহে—অস্মদীয় পুথির চতুষ্টয়ের ৬ পত্র দ্রষ্টব্য। রামনাথ অমরকোষের টীকায় "বিদ্যাসাগরে"র নাম করিয়াছেন—Z. D. M. G. XXVIII. p. 123। এই টীকা ১৫৫৫ শকে রচিত—A. Borooah's Ed. of Amarakosa (1887-88) p. 145.

সংক্ষিপ্তসারীয় নারায়ণ বিদ্যাবিনোদও বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ করিয়াছেন।[১৪] কাতন্ত্রমতের প্রাচীন দুইটী ভট্টিটীকায় তাঁহার বচন উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে—আমরা প্রসঙ্গক্রমে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপূর্ব্ব এই গ্রন্থকারদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। মহামহোপাধ্যায় **শ্রীমুকুন্দ শর্ম্মা** "কলাপচন্দ্রিকা" নামে ভট্টিটীকা রচনা করেন—ইহার একটী খণ্ডিত প্রতিলিপি (৬২ পত্র, কিঞ্চিদধিক ৪ সর্গ) আমাদের নিকট আছে। তাঁহার টীকা প্রায়শঃ বিদ্যাসাগরের টীকার প্রকারান্তরে অনুবাদ মাত্র, দুই স্থলে (২১ খ ও ২৯ ক পত্রে) "বিদ্যাসাগর" নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পাদটীকায় উদ্ধৃত তাঁহার একটী সন্দর্ভ হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রাচীনত্ব পরিস্ফুট হইবে। তিনি ১৬শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন অনুমান করা যায়।[১৫]

২। কায়স্থকুলতিলক **মহোপাধ্যায় কামদেব ঘোষ** নামে কাতন্ত্রমতে একজন প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন—তদ্রচিত ভট্টিকাব্যের "পদকৌমুদী" নামক টীকার একটি খণ্ডিত তাড়িপত্রে লিখিত সুপ্রাচীন প্রতিলিপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত আছে (৩৭৮ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি)। মঙ্গলাচরণ-শ্লোকদ্বয়ের ত্রুটিত পাঠ উদ্ধৃত হইল :—

* * * ববৈরি
ব্রাতশ্রীকন্দকীর্ত্তি প্রলয়কৃতিকৃতিপ্রৌঢ়কীর্ত্তিপ্রতানং।
রামং সত্যাভিরামং বিবুধগণসখং চারু নত্বাবিরামং
সশ্রীকঃ কামদে (বঃ কি)মপি বিতনুতে ভট্টিকাব্যস্য টীকাং।
যঃ কাশ্যা··· ··· ··· পত্নীসমেতঃ পরং
লোকং প্রাপ্য সমাগমৎ সমুচিতং শ্রীলার্দ্ধনারীশ্বরং।
তস্মৈ শ্রীলসুদর্শনায় গুরবে কৃত্বা নমো ভক্তিত-
ষ্টীকেয়ং পদকৌমুদী বিরচিতা কাতন্ত্রতন্ত্রা(ধ্বনা)।

১৪। কন্দর্পটীকা : *I. O.*, p. 262. বিদ্যাবিনোদের ভট্টিটীকা : *ibid.* p. 262. এই টীকায় বিদ্যাসাগরের নাম বস্তুতই আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

১৫। "**বস্তুত ক্রমঃ**,—ফলেগ্রহিশব্দস্য ত্রয়ী গতিঃ, রূঢ্যা বৃক্ষবিশেষোপস্থাপকত্বং যোগেন সামান্যোপস্থাপকত্বঞ্চ মণ্ডপশব্দবৎ। যত্র (রূঢ়িমাদায়ান্বয়ো) ন ঘটতে তত্র যোগমাদায়ৈবান্বয়ঃ মণ্ডপং ভোজয়েতিবৎ, প্রকৃতে চ মুনয় এব প্রকৃতাঃ। অতএব মণ্ডপং ভোজয়েত্যাদৌ লক্ষণয়া পুরুষোপস্থিতিরিতি চিন্তামণিকৃৎপক্ষো 'যোগেনৈবান্বয়বোধসম্ভবে কথং লক্ষণে'ত্যুক্ত্বা **যজ্ঞপতিনা** দূষিতোঽস্মাভিরন্যথা ব্যাখ্যায় স্থাপিতঃ। তথাহি, মণ্ডপশব্দস্য ত্রয়ী গতিঃ, রূঢ্যা গৃহবিশেষোপস্থাপকত্বং যোগেন মণ্ডপানকর্ত্তৃপুরুষবিশেষোপস্থাপকত্বং লক্ষণয়া পুরুষমাত্রোপস্থাপকত্বঞ্চ। তত্র তৃতীয়পক্ষমাদায় চিন্তামণিকৃদ্বচনং ন বুদ্ধা যজ্ঞপতিনা দূষিতমিতি।" (১৮ পত্র)। তত্ত্বচিন্তামণি, শব্দখণ্ড, শক্তিবাদ (সোসাইটি সং, ৬৯৯ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের নামোল্লেখ ও মতখণ্ডন প্রাচীনতার পরিচায়ক।

প্রথম সর্গের পুষ্পিকায় গ্রন্থকারের নাম ও উপাধি পাওয়া যায় :—

ইতি মহোপাধ্যায়শ্রীকামদেবঘোষকৃতায়াং ইত্যাদি (১৩খ পত্র)

গ্রন্থকার নামোল্লেখ না করিয়া বিদ্যাসাগরের মত তীব্র ভাষায় খণ্ডন করিয়াছেন। দুইটী স্থল প্রদর্শিত হইল। প্রথম শ্লোকে "গুণ" শব্দের ব্যুৎপত্তির বিষয়ে বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন,— "ঘঞিতি জয়মঙ্গলায়াংপ্রমাদঃ" (৫৫ পৃঃ)। কামদেব জয়মঙ্গলার সন্দর্ভ উদ্ধারপূর্ব্বক বিস্তৃতভাবে সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন,—"ইদন্তু ন বুদ্ধ্বা কেচিজ্জয়মঙ্গলায়াং প্রমাদকৃতপাঠ ইতি ব্যাচক্ষতে" (৪ক পত্র)।[১৬] দ্বিতীয় সর্গে "প্রণিহন্মি" (৩৫ শ্লোক) পদের ব্যাখ্যায় বিদ্যাসাগর ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন,—"নের্ণদগদেত্যাদিনা উপসর্গস্থ ণত্বং, ধাতোস্তু বমোর্ব্বেতি বিভাষয়া।" (৭৪ পৃঃ) কামদেব ইহা ঠিক ধরিয়া টিপ্পনী করিয়াছেন,—"ইতি কশ্চিৎ প্রলপতি, তদতীব বিরুদ্ধং যতো ণকারেণ ব্যবধানাৎ।" (২৪ খ পত্র)[১৭]। কামদেব এই গ্রন্থের বহু স্থলে (৬৯, ৮১, ৮৭, ৯৭, ১০৮ ও ১১৪ পত্র দ্রষ্টব্য) স্বরচিত "কাতন্ত্রদুর্ঘটপ্রবোধ" গ্রন্থের দোহাই দিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় তদ্রচিত শব্দরূপবিষয়ক "শব্দরত্নাকর" গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি (৭৫ পত্র, ১৬৫৭ শক লিপিকাল, পুথিসংখ্যা ৫১২ গ) আছে। সুষেণ কবিরাজ (সন্ধি, ৫ম পাদ, ১০ সূত্র) "**কামঘোষস্তু**" বলিয়া ইহারই অপর এক টীকাগ্রন্থের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং কামদেব খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন।

কাব্যপ্রকাশের "সারবোধিনী" টীকাকার শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভট্টাচার্য্য স্বগ্রন্থে বিদ্যাসাগরের মত খণ্ডন করিয়াছেন। যথা,—

"এবং চ "বৈয়াকরণে বক্তরি কষ্টত্বং গুণঃ" ইত্যস্য স্বয়ং গ্রন্থকৃতা বক্ষ্যমাণত্বেন ভট্টিকাব্যস্য ব্যাকরণার্থনিরূপণৈকতাৎপর্য্যস্য পদ্যমিদং শ্রুতিকটুত্বে কথমুদাহৃতমিতি ন জানীমঃ" ইতি বিদ্যাসাগরোক্তং দূষণং তেষামেব।"—(ঝলকীকরসম্পাদিত কাব্যপ্রকাশ, ২য় সং, ৩৬১ পৃঃ)

বলা বাহুল্য, উদ্ধৃত সন্দর্ভ বিদ্যাসাগর-রচিত কাব্যপ্রকাশের (সপ্তমোল্লাসের) টীকা হইতে গৃহীত। ভট্টিটীকার প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও অনুরূপ মত লিখিত হইয়াছে :—

"অতএব শ্রুতিকটুত্বাদিদোষো নাত্র শঙ্ক্যতে, প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ। অতএব বৈয়াকরণে

১৬। আমাদের নিকট বিদ্যাসাগরের ভট্টিটীকার যে পুথি আছে, তাহাতেও লিপিকার এক স্থলে বিদ্যাসাগরের 'গুণ' শব্দের ব্যাখ্যায় ত্রুটি দেখাইয়া একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

ঘঞি প্রমাদো জয়মঙ্গলায়াং বৈরুক্তমেবাঞ্চ মহান্ প্রমাদঃ।

অলোপি যো বাধক ইত্যগূঢ়ং বিচারমালোকয়তাত্র তত্ত্বাৎ॥ (১৩৩ খ পত্র)

১৭। অস্মদীয় বিদ্যাসাগরী টীকার পুথিতে লিপিকার যোজনা করিয়াছেন,— "ণত্বে সতি নিমিত্তস্বব্যবধানাৎ বিভাষয়া ণত্বমিতি প্রমাদলিখনমেব" (১৮খ পত্র)। পরেও লিখিত হইয়াছে— "ধাতোস্তু বমোর্ব্বেতি বিভাষয়েতি লিখনাদেব মহান্তো ন বিমর্ষণীয়া লেখকস্যৈব তদ্দোষাদিতি গুরুভিরনুগৃহীতং।" (১৩৩ খ পত্র) 'মহান্তঃ' পদে যে বিদ্যাসাগরকে বুঝাইত, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

বক্তরি তস্যাদোষত্বমিতি কাব্যপ্রকাশ ইত্যাহুঃ।" শ্রীবৎসলাঞ্ছন কমলাকর ভট্ট ও জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের পূর্ব্বতন এবং তাহার টীকার একটি প্রতিলিপির তারিখ "অনুমান ১৫৫০ খ্রীঃ।"[১৮] সুতরাং বিদ্যাসাগর ১৬শ শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন ধরা যায়।

কাতন্ত্রপ্রদীপের স্থানে স্থানে বিদ্যাসাগর নব্য ন্যায়ঘটিত বিচারের অবতারণা করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। কারকপ্রকরণে কর্ম্মলক্ষণ-সূত্রের ব্যাখ্যায়—"ন্যায়ভাস্করাদয়ঃ," ন্যায়নিবন্ধোদ্দ্যোত, "খণ্ডন-টীকায়াং দিবাকরাদিভিঃ," "রত্নকোষ"—এই গ্রন্থচতুষ্টয় উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যত্র গঙ্গেশের মতও বহু বার গৃহীত হইয়াছে। "ক্রিয়াভাবো ধাতুঃ" সূত্রের ব্যাখ্যায় রত্নকোষ, বর্দ্ধমান-রচিত (প্রমাণ)তত্ত্ববোধ, কন্দলীকার ও দিবাকরাদির মতের আলোচনা পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, তত্ত্বচিন্তামণির কোন টীকাকারের নাম পাওয়া যায় না—যজ্ঞপতি কিম্বা পক্ষধর মিশ্রেরও নহে। বাঙ্গালার নব্যন্যায়সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থে এযাবৎ দিবাকররচিত খণ্ডনটীকা কিম্বা ন্যায়নিবন্ধোদ্দ্যোতের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। শেষোক্ত গ্রন্থ শঙ্কর মিশ্রের অন্যতম প্রমাণস্বরূপ ছিল। প্রগল্‌ভাচার্য্য কিম্বা বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও তৎশিষ্য রঘুনাথ শিরোমণির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর তত্ত্বচিন্তামণি-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে প্রগল্‌ভ কিম্বা বাসুদেবের সমসময়ে তাঁহার অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা যায়।

কারকপ্রকরণে এক স্থলে (৩২ পৃঃ) গোয়ীচন্দ্রের সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে—তাঁহার প্রমাণাবলীর মধ্যে গোয়ীচন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন (অনুমান ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের লোক)। ভট্টিটীকার এক স্থলে ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গাদাসের নাম গৃহীত হইয়াছে (৮ম সর্গ, ১৩১ শ্লোক):—

"একমেবেদং পদ্যং গঙ্গাদাসাদিনোক্তম্" (১৩৪ ক পত্র)

গঙ্গাদাস খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন নিশ্চিত। বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক তাঁহার নামোল্লেখ, গঙ্গাদাসের কাল নির্ণয় বিষয়ে একটি মূল্যবান্ নির্দ্দেশ বটে।

বিদ্যাসাগরের পিতার নাম ছিল শ্রীকান্ত পণ্ডিত। ভট্টিটীকা ও কাতন্ত্রপ্রদীপের পুষ্পিকা হইতে বুঝা যায়, "পণ্ডিত" তাঁহার বিদ্যার উপাধি ছিল। তৎকালে এই উপাধি বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল এবং ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে 'পণ্ডিত' উপাধিধারী বহু ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ আছে। এক স্থলে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে (১৩০ পৃঃ),—

ত্রিবিক্রমেণৈব মুখেন সার্দ্ধং, রসচ্যুতিঃ পণ্ডিতকোপনাম্না।

বিদ্যাসাগর তাঁহার পিতার উপদেশ অনুসারেই গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতাও একজন পরমপণ্ডিত ছিলেন। কাতন্ত্রপ্রদীপে ধাতুসূত্রের ব্যাখ্যায় (১৩ পৃঃ),

---

১৮। ঝলকীকর-সম্পাদিত কাব্যপ্রকাশের প্রস্তাবনা, ৩৩-৩৪ ও ৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। Eggeling: *I. O. Cat.*, p. 325

কারকপ্রকরণে (৬০ পৃঃ) এবং ভট্টিটীকায় (৪র্থ সর্গ, ৯ শ্লোক) "অস্মৎপিতৃচরণাঃ" বলিয়া তাঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ভট্টিটীকার শেষে বিদ্যাসাগরের বিনয়োক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার পিতার ও পিতামহের নাম তন্মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—

ক বয়ং কূপমণ্ডূকাঃ ক চায়ং কাব্যসাগরঃ।
তাতোপদেশসেতোস্তু হেতোরেতং প্রতেরিম ।

অস্মিন্নতিপ্রথিতদুর্গমকাব্যসিন্ধা-
বন্ধীভবন্তি শতশোপি মহাকবীন্দ্রাঃ।
বালস্য মে চপলতাং তদহো ক্ষমধ্বং
যদ্ব্যাকৃতাবপি কৃতোস্য ময়া প্রযত্নঃ ।

রত্নাকরো জয়তি যদ্বচনামৃতানি
পীত্বা প্রযান্তি বিবুধাঃ পরিতঃ প্রমোদং।
শ্রীকান্তধীর ইতি তস্য সুতোভিজজ্ঞে
তস্যাত্মজেন রচিতা খলু টিপ্পনীয়ম্।

এই ক্ষুদ্র নির্দ্দেশ ব্যতীত বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান ও কুলপরিচয়াদি কথা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে। শ্রীহট্টে "বাণীনাথ বিদ্যাসাগর" নামে একজন পণ্ডিতের বংশ বিদ্যমান আছে এবং ইনিই কলাপের টীকাকার বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। বরিশালের নিকটবর্ত্তী কাশীপুর গ্রামে এক পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর ছিলেন, তাঁহাকেও কলাপের টীকাকার হইতে অভিন্ন ধরা হইয়াছে,[১৯] কিন্তু উভয় উক্তিই প্রমাণহীন বলিয়া ঈশান নাগরের উক্তির ন্যায় অগ্রাহ্য বটে। কাশীপুরের বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কিন্তু গবেষণা হওয়া আবশ্যক। আমরা অতি ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া বিদ্যাসাগরের কুলপরিচয়বিষয়ে একটা অনুমান বিদ্বৎসমাজের আলোচনার জন্য উপস্থিত করিতেছি। প্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম বন্দ্য আখণ্ডলবংশীয় ছিলেন। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আখণ্ডল বংশের যে নামমালা মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত ও অপ্রামাণিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় মহেশ-রচিত "নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা"র ৪ খণ্ড প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি। তাহাতে আখণ্ডলবংশে সার্ব্বভৌমের পিতামহের নাম পাওয়া যায় "রত্নাকর" এবং "তৎসুতাঃ—শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী বিশারদ ভট্টাচার্য্য **শ্রীকান্ত পণ্ডিতাঃ**।"[২০] শ্রীকান্তের অধস্তন পুরুষের নাম কোন পুথিতেই নাই। দুই পুরুষের নামের মিলে এবং অভ্যুদয়-কালের সামঞ্জস্যে ইঁহাকেই বিদ্যাসাগরের পিতা বলিয়া ধরিতে ইচ্ছা হয়; বিদ্যাসাগর তাহা হইলে সার্ব্বভৌমের খুল্লতাতভ্রাতা হন।

১৯। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত—২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪
চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস (শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ডরচিত) পৃ. ৬১-৬২।

২০। ৩২৩৩ সংখ্যক পুথি (৪৫ ক পত্র), ৪৪৪ ক সং পুথি (১১১ ক পত্র), ২৯১৫সং পুথি (৮৮ ক পত্র) এবং $\frac{\text{M 3/38}}{7\times8}$ পুথি (১৬৫ ক পত্র) দ্রষ্টব্য।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৪

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতি-শ্রেণী

রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে যিনি সর্ব্বপ্রথম স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন, তাঁহার নাম রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে তিনি এই পদে প্রায় দুই বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের বেতনের বিল-বইয়ে প্রকাশ, মাসিক ৮০৲ হারে ১৮২৫ সনের নবেম্বর মাসের প্রথম দুই দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন পাওনা হইয়াছিল, ইহার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়। বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত কোন সংবাদ সংস্কৃত কলেজের নথিপত্র হইতে আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির 'সন্দর্ভ-সংগ্রহ' পুস্তকে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের একটু পরিচয় আছে। তিনি দিগসুই-বাসী বলরাম ন্যায়ালঙ্কারের কনিষ্ঠ পুত্র; মধ্যম পুত্র রামজয় ছিলেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন:—

> রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, সংস্কৃত কালেজের প্রথম সময়ের এক বিখ্যাত অধ্যাপক। ইনি ১২২৩ সালে বিদ্যমান ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স বেশী হয় নাই। তিনি নিজ-নাম-প্রখ্যাত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের এক প্রধান ছাত্র ও রাজা রাধাকান্ত দেবের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। এরূপ শুনিতেছি, তখন রাজা বাহাদুরের বয়ঃক্রম কম ছিল। কলিকাতায় সংস্কৃত কালেজ স্থাপনের পর উইল্‌সন সাহেবের প্রযত্নে—রাজা বাহাদুরের আগ্রহে ও নির্ব্বন্ধে—কালেজের অধ্যাপকতা গ্রহণ করেন। কলিকাতায় গোহত্যা হইত, এজন্য বৈদ্যবাটীতে থাকিতেন।
>
> তৎ-সুত নবগোপালও নদীয়া জেলান্তর্গত কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক ছিলেন।—'সন্দর্ভ-সংগ্রহ': "ভরদ্বাজ গোত্র—৫ম প্রস্তাব," পৃ. ২১।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

১৮২৫ সনে নবেম্বর মাসের গোড়ায় রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থলে কলিকাতা সিমলা-নিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন মাসিক ৮০৲ বেতনে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কাশীনাথ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৫শ বর্ষ, ৪র্থ

সংখ্যা, পৃ. ২২২-৩১ ; ৪৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৮০) বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি ; এখানে কেবল তাঁহার কর্ম্মজীবন ও রচনাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

কর্ম্মজীবন

১৮১৩	...	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সহকারী পণ্ডিত।
১৮২৫, ১৯ নবেম্বর	...	মাসিক ৮০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। ১৮২৭ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।
১৮২৭, মে	...	চব্বিশ-পরগণা জেলার পণ্ডিত ও সদর আমীন। এই পদে তিনি ১৮৩১ সন পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।
১৮৪৭, ১২ মার্চ	...	মাসিক ৪০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর অধ্যাপক।
১৮৫১, জুন	...	সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ।

রচনাবলী

১। মহর্ষি গোতমকৃত **ন্যায়দর্শন**; মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারকৃত তদীয় ভাষাপরিচ্ছেদঃ। শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত তদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহঃ। গ্রন্থনাম **পদার্থকৌমুদী**। ১৮২১। পৃ. ১৪৫।

২। **আত্মতত্ত্ব কৌমুদী**। শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি কৃত, সাধুভাষা রচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ। সন ১২২৯ শাল [১৮২২ খ্রীঃ], পৃ. ১৮৯ + শব্দার্থে নির্ঘণ্ট পত্র ৫।

৩। **পাষণ্ডপীড়ন** নামক প্রত্যুত্তর। কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডিতের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল। ১৮২৩। পৃ. ২৮৫।

'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ৮ম সংখ্যক পুস্তক হিসাবে 'পাষণ্ডপীড়ন' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে 'পাষণ্ডপীড়ন' লিখিত হয়।

৪। **সাধু সন্তোষিণী**। ১৮২৬।

৫। **শ্যামাসন্তোষণ স্তোত্র**।

মৃত্যু

৮ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে, ৬৩ বৎসর বয়সে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয়।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

১৮২৭ সনের মে মাসে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার স্থলে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিদ্যাবাগীশ সম্বন্ধেও আমি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১০১-১৩) বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি; এখানে তাঁহার কর্ম্মজীবন ও রচনাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিতেছি।

কর্ম্মজীবন

১৮২৭, ১৪ মে	..	মাসিক ৮০৲ বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। ১৮৩৭ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।
১৮৪০, জানুয়ারি	..	হিন্দুকলেজ-সংলগ্ন বাংলা পাঠশালার সংস্কৃত এবং গৌড়ীয় ভাষাধ্যাপক।
১৮৪২, ১ জানুয়ারি	..	মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক।

রচিত ও সম্পাদিত রচনাবলী

১। **জ্যোতিষসংগ্রহসার**। ১৮১৭। পৃ. ১৫৫।

২। **অভিধান**। ১৮১৮ (?)

ইহাই বাঙালী-রচিত প্রথম বাংলা অভিধান।

৩। **পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে ব্যাখ্যান**। ১৭৫০ শক...

৪। **বিবাদচিন্তামণিঃ**। ১৮৩৭। পৃ. ১৭৩।

৫। **হিন্দুকালেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা**। ১৮৪০। পৃ. ১৬

৬। **নীতিদর্শন**। ১৮৪১।

মৃত্যু

২ মার্চ ১৮৪৫ তারিখে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পরলোকগমন করেন।

ভরতচন্দ্র শিরোমণি

১৮৩৭ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার স্থলে স্থায়িভাবে কাহাকেও নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ কিছু দিন স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৮৪০ সনের ১লা ডিসেম্বর হইতে বর্দ্ধমান জজ-কোর্টের পণ্ডিত ভরতচন্দ্র

শিরোমণি মাসিক ৮০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে কর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি যোগ্যতার সহিত এই সকল পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন :—

১৮৩০, জানুয়ারি…ল-পরীক্ষা কমীটির পণ্ডিত … ৭ বৎসর ৫ মাস
১৮৩৭, জুন … সারণ জেলার জজ-পণ্ডিত … ২ বৎসর ৫ মাস
১৮৩৯, নবেম্বর … বর্দ্ধমান জজ-কোর্টের পণ্ডিত … ১ বৎসর ১ মাস

ভরতচন্দ্র সে-যুগের একজন খ্যাতনামা স্মার্ত্ত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র—গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন তাঁহার একটি রচনায় শিরোমণি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

…অলঙ্কার শ্রেণীর পর আমরা স্মৃতির শ্রেণীতে উঠিতাম। তৎকালে ২৪ পরগণা জিলার অন্তঃপাতী লাঙ্গল-বেড়িয়া-নামক গ্রামের দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ পূজ্যপাদ ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি "দায়ভাগ"-নামক একখানি স্মৃতিসংগ্রহ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকখানি আমরা পাঠ করিতাম। তিনি অতিশয় রসিক লোক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন। সুতরাং আমরা তাঁহার নাতি-সম্পর্ক হইতাম। তিনি তদনুসারে আমাদের সহিত প্রায়ই তামাসা করিতেন। একদিন শীতকালে তিনি একখানি লালবর্ণ বনাত গায় দিয়া কলেজে আসিতেছিলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন ছাত্র বলিল—"ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনার লাল বনাতের উপর সূর্য্যকিরণ পড়াতে আপনার তেজ যেন সূর্য্যের মত দেখাইতেছে।" তিনি কোন উত্তর না করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা একটু দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ তদ্রূপ দ্রুতপদে আসিতে লাগিলাম। পরে তিনি কলেজে গিয়া তাঁহার চেয়ারে বসিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বাপ! ভাগ্যিস্! এখনি বগলে পুরিয়াছিল"। তখন আমরা সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলাম। যে-ছাত্র তাঁহাকে সূর্য্যের সহিত তুলনা করিয়াছিল, তাহাকে হনুমান্ বলিয়া তামাসা করিলেন। সেও অপ্রস্তুত হইল। এইরূপ তামাসা মধ্যে মধ্যে হইত।…তিনি তামাসা করিয়া সময় কাটাইতেন বটে, কিন্তু এক বৎসরে দায়ভাগ সমগ্র, দত্তক-মীমাংসা, দত্তক-চন্দ্রিকা এবং মিতাক্ষরা (ব্যবহারাধ্যায়) পড়াইয়া দিতেন। তিনি ব্যবস্থা-দর্পণ গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার সময় শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচারকগণ তাঁহার মত গ্রাহ্য করিতেন।—"সেকালের সংস্কৃত কলেজ": 'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৩২, পৃ. ৬৫০-৫১।

ভরতচন্দ্র শিরোমণি সংস্কৃত কলেজে ৩১ বৎসর ১ মাস অধ্যাপনা করিয়া, ১ জানুয়ারি ১৮৭২ হইতে মাসিক ৬৫৲ পেন্সনে অবসর লইয়াছিলেন। পেন্সন-গ্রহণকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৭ বৎসর ৮ মাস, এবং কলেজে তাঁহার বেতন ছিল ১৫০৲।

মৃত্যু

ভরতচন্দ্র খুব সম্ভব ১৮৭৭ সালে পরলোকগমন করেন। ১৮৭৭ সনে তিনি 'চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি'র ১ম খণ্ড সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পাদক-হিসাবে তাঁহার ও আরও দুই জন পণ্ডিতের নাম আছে।

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

১। জীমূতবাহন-কৃত **দায়ভাগ,** শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-বিরচিত টীকা-সহিত। ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক সংস্কৃত। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। সংবৎ ১৯০৭, পৃ. ২৫৯।

২। নন্দপণ্ডিত-বিরচিত **দত্তকমীমাংসা**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি-কৃত বালবিবোধনী-টীকা-সহিত। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। ইং ১৮৫৭।

৩। **বিষ্ণ্বাদিশতক**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি-বিরচিত। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। ১২৬৩ সাল, পৃ. ২০।

৪। কুবের বিরচিত **দত্তকচন্দ্রিকা**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি-কৃত বালসম্বোধনী-টীকা-সহিত। ইং ১৮৫৭, পৃ. ৩৮।

৫। জীমূতবাহন-কৃত **দায়ভাগ**। শ্রীশ্রীনাথাচার্য্য চূড়ামণি, শ্রীরামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, শ্রীমদচ্যুতানন্দচক্রবর্ত্তি, শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-কৃত ষড়্‌বিধ টীকাসহিত। ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক পরিশোধিত। ইং ১৮৬৩। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। পৃ. ৪৫৮।

৬। **মনুসংহিতা—কুল্লূকভট্ট-কৃত টীকা। যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন ও ভরতচন্দ্র শিরোমণি-কৃত বঙ্গানুবাদ সম্বলিত।** সংবৎ ১৯২৩। পৃ. ১৬৩।

৭। **দত্তক শিরোমণিঃ।** ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজ প্রচলিত দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা, দত্তকনির্ণয়, দত্তকতিলক, দত্তকদর্পণ, দত্তককৌমুদী, দত্তকদীধিতি, দত্তসিদ্ধান্ত-মঞ্জরী নামক সুপ্রসিদ্ধ দত্তকগ্রহণ-ব্যবস্থাপক গ্রন্থাষ্টক নিখিলসারসংগ্রহঃ। ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্যেণ সুপ্রণালী-পূর্ব্বকমেকবিংশত্যধ্যায়েন সংঘটিতঃ, প্রত্যধ্যায়াবসানে কৃতসঙ্ক্ষিপ্ত-সারসংগ্রহশ্চ।...ইং ১৮৬৭। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। পৃ. ৩৫৯।

৮। দ্রাবিড় দেশীয় শ্রীদেবানন্দ ভট্ট প্রণীত **স্মৃতিচন্দ্রিকা** দায়ভাগ প্রকরণ। শ্যামাচরণ সরকারের সাহায্যে ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক মুদ্রিত। জানুয়ারি ১৮৭০। পৃ. ১১৮।

৯। হেমাদ্রি-বিরচিত **চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি**। ভরতচন্দ্র শিরোমণি পরিশোধিত। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

১ম ভাগ— সংবৎ ১৯৩৪। পৃ° ১২২২

২য় ভাগ— ইং ১৮৭৮।

ন্যায়-শ্রেণী

নিমাইচন্দ্র শিরোমণি

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল হইতে নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক নিযুক্ত হন। সে সময়ে তাঁহার তুল্য নৈয়ায়িক বিরল ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলেজে তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৮০৲। শিরোমণি মহাশয়ের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মৃত্যু

১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে সে-যুগের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্র লিখিয়াছিলেন :—

মহাখেদার্ণবে নিমগ্নচিত্ত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রকাশ করিতেছি যে সংস্কৃত কালেজস্থ ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীলশ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি এতল্লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন উক্ত মহাশয়ের বিজ্ঞতার কথা কি কহিব যাহাকে ব্যাকরণ অলঙ্কার ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্রগণ বিলক্ষণ জানিতেন এবং এতদ্দেশের অদ্বিতীয় বিজ্ঞ...। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

সম্পাদিত গ্রন্থ

১। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য-কৃত **ন্যায়সূত্রবৃত্তি**। নিমাইচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক শোধিত। ১৮২৮। পৃ. ২৬৪।

২। **মহাভারত**—বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্কৃত মহাভারতের যে প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার অন্ততঃ তিনটি খণ্ডের (২য় খণ্ড, ১৮৩৬ খ্রীঃ ; ৩য় খণ্ড, ১৭৫৯ শক ; ৪র্থ খণ্ড ১৮৩৯ খ্রীঃ) এক জন সম্পাদক হিসাবে নিমাইচন্দ্র শিরোমণির নাম পাওয়া যায়।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যুর পর ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন—খ্যাতনামা নৈয়ায়িক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথাই আমি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৫-১৯) সবিস্তরে আলোচনা করিয়াছি ; এখানে সে-সকল কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সংযোজন

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শ্রেণীর বর্ণনাকালে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও তাঁহার রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। ঐ প্রবন্ধ রচনাকালে আমি তর্কবাগীশ-প্রকাশিত 'কুমারসম্ভব (অষ্টম সর্গ)' পুস্তকখানি কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে উহার এক খণ্ড দেখিয়াছি। উহা দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত ; আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

কুমারসম্ভবম্‌। | মহাকবি কালীদাস বিরচিত কুমারসম্ভব | নামক মহাকাব্যস্য | অষ্টমঃ সর্গঃ। | শ্রীপ্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যকৃত | টীকাসহিতঃ। | কলিকাতা। | বাঙ্গালাযন্ত্রে মুদ্রিতঃ। | শকাব্দাঃ ১৭৮৩। ইং ১৮৬২। | [পৃ. ৪৭]

পুস্তকের "বিজ্ঞাপন" বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। উহা উদ্ধৃত করা হইল :—

কুমারসম্ভব।

এতদ্দেশে উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ ছিল না, সপ্তমসর্গপর্য্যন্তই দেখা যাইত। ইহাতে নানাজনশ্রুতি, অর্থাৎ কেহ কেহ কহিতেন, গ্রন্থকর্ত্তা মহাকবি কালীদাস সপ্তমসর্গপর্য্যন্ত করিয়াই লোকান্তরিত হইয়াছেন। কেহ কেহ কহিতেন, সংপূর্ণই করিয়াছেন, কোন কারণবশতঃ অষ্টমাদি সর্গ বিনষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু কয়েক বৎসর হইল কাপ্তেন মার্শেল সাহেবের ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের যত্নে সংপূর্ণ গ্রন্থ পশ্চিমদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। ইহা দৃষ্টি করিয়া মহাকবিপ্রণীতত্বের সম্ভাবনা করা যায় ; ইহার কোন কোন শ্লোকাংশ প্রাচীন গ্রন্থে উদাহরণরূপে গৃহীতও দেখা যায়। অতএব ইহার বহুলীকরণ আবশ্যক বোধ করিয়া মৎকৃত টীকার সহিত মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করা গেল। কিন্তু একমাত্র আদর্শ, তাহাও পরিশুদ্ধ নহে, অনেক বিবেচনা দ্বারা পাঠের স্থিরতা করিতে হয়, তজ্জন্য কালবিলম্ব সম্ভাবনা করিয়া ক্রমশঃ অর্থাৎ এক এক সর্গ প্রকাশ করা ধার্য্য করিয়া সংপ্রতি অষ্টম সর্গ মুদ্রিত করা গেল। দেখা যাউক, যদি ইহাতে গ্রাহকদিগের আগ্রহ প্রকাশ পায়, তবে অপরাপর সর্গও ত্বরায় প্রকাশ করা যাইবে ইতি।

শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মা

শব্দ ও অর্থ

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্

"গো"-শব্দ শুনিলে আমরা "গরু" বুঝি; ("গো")-শব্দের সহিত ("গরু")-অর্থের কি সম্বন্ধ, অর্থাৎ কোনও একটী বিশিষ্ট শব্দ শুনিলে কেন আমরা একটী বিশিষ্ট অর্থ বুঝি,—এ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনসমূহে ভিন্ন ভিন্ন মতের অবতারণা দেখা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ সকল মতের মধ্যে কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইবে মাত্র, কোনও বিশিষ্ট মতের প্রতি আমাদের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন, ইহার উদ্দেশ্য নহে।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ বলেন, শব্দের সহিত অর্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; অর্থাৎ তাঁহাদের মতে, "গো" এই শব্দ শুনিয়া যে আমরা তৎক্ষণাৎ "গরু" এই অর্থ বুঝি, তাহা হইতে পারে না। কারণ দেখা যায়, অর্থ অর্থাৎ বস্তু থাকিলে যে সকল শব্দ দেখা যায়, বস্তু না থাকিলেও সে সকল শব্দ দেখা যায়। অতীত কালে কোনও বস্তু ছিল, এখন নাই; অথবা ভবিষ্যৎ কালে কোনও বস্তু হইবে, এখন নাই; কিন্তু বস্তু না থাকিলেও, তাহাদের বাচক শব্দ বর্ত্তমান কালে দেখা যায়। সুতরাং অর্থের সহিত শব্দের যে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ আছে, তাহা বলা যাইতে পারে না।

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য প্রভৃতি বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ এ বিষয়ে যে অতি সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্ক-জাল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম কতকটা এই প্রকার:—শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে বলিতেছ, সেইটী কি করিয়া সম্ভব হয়? যদি বল, শব্দ ও অর্থের "তাদাত্ম্য" আছে, তাহা হইলে হয় (১) শব্দও যাহা, অর্থও তাহা অথবা (২) অর্থও যাহা, শব্দও তাহা, এই দুই প্রকারের একটী স্বীকার করিতে হয়। প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে, বস্তুগুলা শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়, এই কথা বলিতে হয়; ফলে জগৎ বস্তুময় না হইয়া শুধু শব্দময় হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে, শব্দ বলিয়া আর কিছুই থাকে না, জগতে শুধু বস্তুই থাকে। শব্দ ও অর্থের "তাদাত্ম্য" প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধও বটে। "শব্দ" আমরা কর্ণের দ্বারা উপলব্ধি করি, পরন্তু "অর্থ" ভূতলাদিতে অবস্থিত বস্তু; সুতরাং শব্দ ও অর্থ এক ("তাদাত্ম্য") হইতে পারে না। যদি বল, শব্দ ও অর্থ, এই দুইটীর মধ্যে একটী অপরটী হইতে উৎপন্ন হয় ("তদুৎপত্তি") বলিয়া তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও দোষ হয়। শব্দ হইতে অর্থ উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না; কারণ, "কলস"-শব্দ হইতে যদি "কলস"-বস্তু উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে কলস নির্ম্মাণ করিবার জন্য

কুম্ভকারকে দণ্ড-চক্র-প্রভৃতির সাহায্য লইতে হইত না। আবার অর্থ হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহাও বলা যায় না; কারণ, ইহা তো সকলেরই প্রত্যক্ষ যে, কলস-বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও, আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে উচ্চারণ করি, ততক্ষণ কলস-শব্দের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং শব্দ ও অর্থের "তদুৎপত্তি"-সম্বন্ধও স্বীকার করা যায় না। "তাদাত্ম্য" ও "তদুৎপত্তি", এই দুই-এর অতিরিক্ত অপর কি সম্বন্ধই বা শব্দ ও অর্থের মধ্যে কল্পনা করা যাইতে পারে? যদি বল, আছে একটা সম্বন্ধ,—তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, সে সম্বন্ধের স্বরূপ কি? "সম্বন্ধ" বলিতে কি বুঝিব? যদি বল, শব্দ ও অর্থ যাহা, তাহাদের মধ্যে "সম্বন্ধ" তাহাই, তাহা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহা হইলে "সম্বন্ধ" স্বীকার করিবার যুক্তি থাকে না। কাজেই "সম্বন্ধ" শব্দ ও অর্থের অতিরিক্ত একটা কিছু, ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও অনেক আপত্তি হয়। এই যে "সম্বন্ধ", এটা কি নিত্য? নিত্য, বলা যায় না; কেন না, তাহা হইলে শব্দ ও অর্থকেও নিত্য বলিতে হয়। যদি বল, "সম্বন্ধ" অনিত্য, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই যে "সম্বন্ধ", এটা কি সকল শব্দ-অর্থে একই প্রকার হয়, না প্রতি শব্দ-অর্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়? যদি বল, বিশ্বের সমস্ত শব্দ ও অর্থের মধ্যে একই সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা হইলে তো একটী শব্দ হইতেই বিশ্বের সমস্ত অর্থ জানা যাইতে পারে। আর যদি বল, সম্বন্ধি-ভেদে সম্বন্ধ পৃথক্ প্রকার হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হয়,—"সম্বন্ধি"-র সহিত "সম্বন্ধে"-র কোনও সম্বন্ধ আছে কি না? যদি বল, "সম্বন্ধি"(শব্দ-অর্থ)-র সহিত "সম্বন্ধে"-র কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহা হইলে ঘট-শব্দ হইতে পটও বুঝা যাইতে পারিত, পট-শব্দ হইতে ঘটও বুঝা যাইতে পারিত। আর যদি বল, "সম্বন্ধি"-র সহিত "সম্বন্ধে"-র "সম্বন্ধ" আছে, তাহা হইলে এই যে শেষোক্ত "সম্বন্ধ", এটা কি? "তাদাত্ম্য"—না "তদুৎপত্তি?" "তাদাত্ম্য"-সম্বন্ধ বলা যাইবে না; কারণ, ইতিপূর্ব্বেই স্বীকার করা হইয়াছে যে, "সম্বন্ধ" "সম্বন্ধি" হইতে পৃথক্ অর্থাৎ অতিরিক্ত কিছু। আর যদি বলা হয়, "সম্বন্ধ" "সম্বন্ধি" হইতেই উৎপন্ন হয় ("তদুৎপত্তি"), তাহা হইলেও দোষ হয়। কখন্ এই "সম্বন্ধ" উৎপন্ন হয়? শব্দোৎপত্তিকালে অথবা অর্থোৎপত্তিকালে এই "সম্বন্ধে"-র উৎপত্তি হয়, বলা যাইতে পারে না,—কারণ, শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ তো শব্দ ও অর্থ দুটীকেই আশ্রয় করিয়া থাকে,—শব্দ বা অর্থের একটী না থাকিলে শব্দার্থ-সম্বন্ধ কি করিয়া উৎপন্ন হইতে পারে? যদি বল, যখন শব্দ ও অর্থ এক সঙ্গে উৎপন্ন হয়, তখন শব্দার্থ-সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যে স্থলে শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটী আগে হয়, সে স্থলে শব্দের দ্বারা অর্থপ্রকাশ অসম্ভব হয়। যদি বল,—শব্দ ও অর্থের মধ্যে আগে একটী হইল, তার পর যখন অপরটী উৎপন্ন হইল, তখনই শব্দ-অর্থ-সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়; তাহাতেও দোষ হয়। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য হয়—(১) শব্দ-অর্থ হইতেই শব্দার্থ-সম্বন্ধ হয়, (২) না শব্দ-অর্থের অতিরিক্ত কিছু হইতে ঐ সম্বন্ধ হয়, (৩) অথবা

শব্দ-অর্থ এবং তাহার উপর অতিরিক্ত আর কিছু, এই সব হইতে শব্দার্থ-সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়? প্রথম পক্ষ স্বীকারে আপত্তি এই যে, তাহা হইলে তো শব্দের অর্থ শিখিবার বা জানিবার প্রয়োজন থাকে না,—শব্দ শুনিলেই, ঐ শব্দের অর্থ যে জানে না, সেও তৎক্ষণাৎ সেই শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ স্বীকারে এই আপত্তি যে, যদি শব্দার্থ-সম্বন্ধ শব্দ ও অর্থের অতিরিক্ত আর কিছুর অপেক্ষা করে, তাহা হইলে "তদুৎপত্তি"-সম্বন্ধ বলা যায় না, অর্থাৎ শব্দার্থ-সম্বন্ধ শব্দ-অর্থ হইতে উৎপন্ন, এ কথা বলা যায় না।

এইরূপে বৌদ্ধদার্শনিকগণ বহুবিধ যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, শব্দের সহিত অর্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই,—থাকিতে পারে না।

বৌদ্ধগণ এই প্রসঙ্গে আর একটী তর্ক উত্থাপন করিয়া বলেন, শব্দের পক্ষে অর্থ (বিষয়) প্রকাশ করা অসম্ভব। বিষয় তাঁহাদের মতে "স্বলক্ষণ"। প্রত্যেক বস্তুতে আমরা সামান্য ধর্ম্ম ও অসাধারণ ধর্ম্মের বিচার করি। কোনও একটী বস্তু সেই জাতীয় অপর বস্তুগুলির সহিত যে যে ধর্ম্মে সমান, সেই সেই ধর্ম্ম ঐ বস্তুর সামান্য ধর্ম্ম। বৌদ্ধগণ বলেন, সামান্য-ধর্ম্মের "অর্থক্রিয়াকারিত্ব" নাই অর্থাৎ বস্তুর সামান্য গুণের দ্বারা কোনও পুরুষের প্রয়োজন-সিদ্ধি হয় না। বিষয় বা অর্থ বলিতে আমরা বুঝি, যাহা দ্বারা পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কোনও বস্তুর যাহা অসাধারণ অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্ম, তাহা দ্বারাই পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়; সুতরাং অসাধারণ ধর্ম্মেরই "অর্থক্রিয়াকারিত্ব" আছে, এবং এই অসাধারণ ধর্ম্মই "স্বলক্ষণ"। অর্থ বা বিষয় বলিতে এই "স্বলক্ষণ" বুঝায়। এই "স্বলক্ষণ" শুধু নিছক অসাধারণ ধর্ম্ম, যাহা বর্ত্তমান ক্ষণে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয়। ইহাতে অতীতের বা অনাগতের কোনও ধর্ম্মের "কল্পনা" বা "ভ্রান্তি"র সম্পর্ক নাই। এই "স্বলক্ষণ" কাজে কাজেই পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে সমর্থ। বৌদ্ধগণ এই "অর্থক্রিয়াকারি" "স্বলক্ষণ"কে বিষয় বা অর্থ বলেন। এই স্বলক্ষণের সহিত অন্যান্য নাম-জাতি-আদি বিবিধ ধর্ম্মের যোজনা করিলে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই জ্ঞানের নাম "বিকল্প"; তাহা বিশুদ্ধ "প্রত্যক্ষ" নহে এবং এই বিকল্পের বিষয় প্রকৃত অর্থ বা স্বলক্ষণ নহে। এই কথাই অন্য ভাবে প্রকাশ করিয়া বলা হয়, অর্থ বিকল্পের বিষয় হইতে পারে না। অপর পক্ষে শব্দ এক দিকে বিকল্পের কারণ, অপর দিকে বিকল্পের পরিণাম। আমরা বস্তু বুঝাইবার জন্য যে সকল শব্দ প্রয়োগ করি, সে সকল শব্দ-প্রয়োগের মূলে পূর্ব্বকথিত সামান্যের জ্ঞান প্রভৃতি থাকে; সুতরাং শব্দ বিকল্প হইতে উৎপন্ন, ইহা বলা যায়। আবার কোনও বস্তু সম্বন্ধে শব্দ প্রয়োগ করিলে সে বস্তুর আর স্বলক্ষণত্ব থাকে না, তাহাতে নাম-জাতি-আদি যোজিত হওয়ায় সেই শব্দ-জনিত জ্ঞান বিকল্প হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং শব্দের কারণও বিকল্প, পরিণামও বিকল্প। বৌদ্ধগণ বলেন, এই বিকল্পাত্মক শব্দ কিরূপে স্বলক্ষণ-স্বরূপ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে?

বিকল্পযোনয়ঃ শব্দা বিকল্পাঃ শব্দযোনয়ঃ।
কার্য্যকারণতা তেষাং, নার্থং শব্দাঃ স্পৃশন্ত্যপি।

অতএব শব্দের পক্ষে অর্থ প্রকাশ করা অসম্ভব।

তাহা হইলে, "গো"-শব্দ শুনিলে আমাদের কি জ্ঞান হয় ? বৌদ্ধগণ বলেন,— "গো"-শব্দ শুনিলে যে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে "গরু"-অর্থ বুঝি, তাহা নহে। গো-শব্দ সাক্ষাৎসম্বন্ধে গো-অর্থ-জ্ঞাপক নহে। "গো"-শব্দ শুনিলে, "অ-গো-নিবৃত্তি", মাত্র এই নিষেধাত্মক জ্ঞানই সাক্ষাৎসম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যখন আমরা "গো" এই শব্দ শুনি, তখন যে আমরা কোনও যথার্থ অর্থ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করি, তাহা নহে; তখন আমাদের কেবল গো-বিরুদ্ধ জ্ঞানের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিরাস হয়। এই জন্য বৌদ্ধাচার্য্যগণ শব্দকে "অপোহ" বা "অন্যাপোহ"-কারি মাত্র বলেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে শব্দ হইতে অর্থ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় না; "গো"-শব্দ শুনিলে আমাদের এই জ্ঞান হয় যে, "গো-বিরুদ্ধ" বস্তুর জ্ঞান তিরোহিত হইল। এই অপোহ বা অন্যাপোহ জ্ঞানের সহিত পরক্ষণে বিবিধ বিকল্প জ্ঞানের সংমিশ্রণ হয় এবং যখন আমরা এই বিকল্প-জ্ঞান-সমষ্টির বিষয়ীভূত একটী অর্থ আমাদের বাহিরে অবস্থিত রহিয়াছে, এইরূপ মনে করি, তখনই আমাদের "গো"-শব্দের দ্বারা "গরু"-পদার্থের উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ আমরা "গো"-শব্দের সহিত "গো"-পদার্থের একটা সম্বন্ধ কল্পনা করি। ফলতঃ শব্দ অর্থের সহিত প্রকৃত পক্ষে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট নহে; শব্দ অর্থের অভাবের ব্যাবর্ত্তক মাত্র এবং শব্দের সহিত অর্থের তথাকথিত সম্বন্ধ কল্পনা-প্রসূত, ইহাই বৌদ্ধ মত।

সুপ্রসিদ্ধ অপোহ-বাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকাদি আচার্য্যগণ বলেন,—কোনও শব্দ ("গো") শুনিলে তো আমাদের প্রথমে কোনও অভাবের ("অ-গো") জ্ঞান হয় না। শব্দ শুনিলে একটা (বিধ্যাত্মক বা positive) অর্থেরই তো প্রতীতি হয়; কোনও নিষেধাত্মক বা negative জ্ঞান তো হয় না। আর যদি বল, "গো"-শব্দের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে "অ-গো"-ব্যাবর্ত্তক একটা নিষেধাত্মক জ্ঞানেরই উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে "গরু"-অর্থের প্রকাশ "গো"-শব্দের দ্বারা অসম্ভব হইয়া পড়ে; উহার জন্য অন্য শব্দের প্রয়োজন হয়। যদি বল, অপোহ নিষেধাত্মক জ্ঞানের উৎপাদক হইয়া আবার বিধ্যাত্মক জ্ঞানও উৎপাদন করে;—কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কেন না, যাহা অভাব বা নিষেধ জ্ঞাপন করে, তাহা কিরূপে ভাব-পদার্থ বা বিধির জ্ঞাপক হইতে পারে ?

নন্বন্যাপোহকৃচ্ছব্দো যুষ্মৎপক্ষেঽনুবর্ণিতঃ।
নিষেধমাত্রং নৈবেহ প্রতিভাসেঽবগম্যতে ॥
কিন্তু গৌর্গবয়ো হস্তী বৃক্ষ ইত্যাদিশব্দতঃ।
বিধিরূপাবসায়েন মতিঃ শাব্দী প্রবর্ত্ততে ॥
যদি গৌরিত্যয়ং শব্দঃ সমর্থোঽন্যনিবর্ত্তনে।
জনকো গবি গোবুদ্ধির্মৃগ্যতামপরো ধ্বনিঃ ॥
ননু জ্ঞানফলাঃ শব্দা ন চৈকস্য ফলদ্বয়ম্।
অপবাদবিধিজ্ঞানং ফলমেকস্য বঃ কথম্ ॥

বৌদ্ধাচার্য্য সুবিখ্যাত দিঙ্‌নাগ এই স্থলে বলেন,—নিষেধাত্মক জ্ঞান বিধ্যাত্মক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। তিনি এই সম্বন্ধকে কতকটা "বিশেষণ-বিশেষ্য"-সম্বন্ধের মত বলেন। যেমন "নীল-উৎপল" বলিলে "নীল" এই বিশেষণটী "উৎপল"-টী কেমন, তাহা প্রকাশ করিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে, সেইরূপ "অ-গো-নিবৃত্তি" এই negative বা নিষেধাত্মক জ্ঞানটী "গো"-বস্তুর positive বা বিধ্যাত্মক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। অর্থাৎ "গো"-জ্ঞান কেমন? না, "অ-গো-জ্ঞান"-ব্যাবর্ত্তক। আচার্য্য দিঙ্‌নাগ বলেন,—নিষেধাত্মক জ্ঞানের সহিত বিধ্যাত্মক জ্ঞানের এইরূপ "বিশেষণ-বিশেষ্য"-সম্বন্ধ থাকার জন্য অপোহ হইতে বিধ্যাত্মক বস্তুজ্ঞান সম্ভবপর হয়। কিন্তু ন্যায়াচার্য্যগণ আপত্তি করেন যে, "নীল" ও "উৎপলে"র মধ্যে যে সম্বন্ধ, "অ-গো" ও "গো"-র মধ্যে সে সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। "নীল" ও "উৎপল" দুইটীই ভাব-পদার্থ; সুতরাং তাহাদের মধ্যে "বিশেষণ-বিশেষ্য"-সম্বন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু "অ-গো" ভাবপদার্থ না হওয়ায় তাহার সহিত "গো"-পদার্থের বিশেষণ-বিশেষ্য-সম্বন্ধ হইতে পারে না। আবার "বিশেষণ" হইতে যে "বিশেষ্যে"র উৎপত্তি হইতে পারে, তাহাও বলা যায় না। "নীল" হইতে "উৎপল" উৎপন্ন হয় না। বিশেষণের দ্বারা বিশেষ্য অনুরঞ্জিত হয় মাত্র। সুতরাং নিষেধাত্মক অপোহ বিধ্যাত্মক বস্তুজ্ঞানের সহিত কোনও প্রকারে সম্বন্ধযুক্ত হয় না,—হইলেও, তাহার উৎপাদক হইতে পারে না।

"গো"-শব্দের দ্বারা বৌদ্ধ-সম্মত উপরোক্ত "স্বলক্ষণ" অসাধারণ ধর্ম্ম না বুঝাইতে পারে এবং শাবলেয়াদি গো-ব্যক্তি-বিশেষও না বুঝাইতে পারে। কিন্তু "গো"-শব্দের দ্বারা "গরু"-পদার্থ-সমূহের সামান্য-ধর্ম্ম কেন না বুঝাইবে? বৌদ্ধগণ বলেন, শব্দের দ্বারা "অভাব" বুঝায়; কিন্তু "অভাব" কি? শব্দের দ্বারা যে অভাব বুঝায়, তাহা শূন্য হইতে পারে না; এখানে "অভাবে"-র দ্বারা ভাবান্তর অর্থাৎ অন্য বস্তু বুঝায়। বিশ্লেষণ করিলে বৌদ্ধ মত হইতেই ইহা বুঝা যায় যে, "গো"-শব্দের দ্বারা যে তথাকথিত অপোহ বা "অ-গো"-র অভাব বুঝায়, তাহার অর্থ শূন্য-জ্ঞান নয়। তাহার অর্থ হইতেছে যে, "গো"-শব্দের দ্বারা কোনও একটী "গরু"-পদার্থের অসাধারণ-ধর্ম্ম বা কোনও একটী বিশেষ "গরু" না বুঝিয়া, "গরু"-জাতীয় পদার্থের সামান্য ধর্ম্ম বুঝা যায়। সুতরাং যদি শব্দের দ্বারা বিধ্যাত্মক অর্থই বুঝাইল, তাহা হইলে বৌদ্ধগণের অপোহ-বাদের সার্থকতা থাকে কৈ?

সিদ্ধশ্চেদ্গৌরপোহার্থঃ বৃথাপোহপ্রকল্পনম্।

বৈশেষিকাচার্য্যগণের মতে শব্দের দ্বারা অর্থের যে বোধ হয়, তাহা "আনুমানিক"। তাঁহারা বলেন, যে কোনও শব্দ হইতে যে কোনও অর্থের বোধ হয় না। "গো"-শব্দ হইতে "অশ্ব"-অর্থের জ্ঞান হয় না; "গো"-শব্দ হইতে "গরু"-অর্থের বোধ হয়। কিন্তু এ-অর্থ-বোধ হয় কাহার? যে ব্যক্তি "গো"-শব্দের অর্থ জানে না, "গো"-শব্দ শুনিলে, তাহার "গরু"-অর্থের বোধ হয় না; যে "গো"-শব্দের অর্থ জানে, "গো"-শব্দ শুনিলে তাহারই "গরু"-অর্থের বোধ হয়। সুতরাং শব্দ হইতে অর্থের

যে জ্ঞান হয়, তাহা শব্দের সঙ্কেতের জ্ঞানসাপেক্ষ। যেমন কোনও পর্ব্বতে ধূম দেখিলে, সেই ব্যক্তিই ঐ ধূম হইতে পর্ব্বতে বহ্নি আছে, এই অনুমান করিতে পারে, যে ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব সম্বন্ধ অবগত আছে। সেইরূপ শব্দ হইতে অর্থের বোধ হয় তাহার, যে ঐ শব্দের কি অর্থ, তাহা পূর্ব্ব হইতে জানে। এই জন্য বৈশেষিকাচার্য্যগণ শাব্দজ্ঞানকে "অনুমানে"-র অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহাদের মতে "গো"-শব্দের অর্থ "গরু", ইহা যে ব্যক্তি জানে, সেই ব্যক্তিরই "গো"-শব্দ শুনিলে "গরু"-অর্থ-সম্বন্ধে প্রতীতি উৎপন্ন হয় এবং এই প্রতীতি "আনুমানিক" জ্ঞান,—inferential knowledge.

নৈয়ায়িকগণ বৌদ্ধ-মত খণ্ডন বিষয়ে বৈশেষিকগণের সহিত বলেন যে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তাঁহারা শাব্দ জ্ঞানকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া, ইহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অন্যতম যুক্তি এই যে, পরীক্ষকমাত্রেই জানেন যে, ধূম হইতে বহ্নি সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান এবং শব্দ হইতে অর্থবিষয়ে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান, একই প্রকার জ্ঞান নহে। অনুমান ও শব্দজনিত জ্ঞান পৃথগ্বিধ; সুতরাং নৈয়ায়িকগণের মতে শাব্দ জ্ঞান অনুমান নহে।

শব্দ ও অর্থের মধ্যে "তাদাত্ম্য", "তদুৎপত্তি" প্রভৃতি সম্বন্ধ স্বীকার করিলে বৌদ্ধাচার্য্যগণের উত্থাপিত যে সমস্ত পূর্ব্বকথিত আপত্তির সম্ভাবনা হয়, তাহা ন্যায়াচার্য্যগণ স্বীকার করেন। এই জন্য তাঁহারা শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে "বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ" বলিয়া অভিহিত করেন। "গো"-শব্দের অর্থ "গরু"; "গো"-শব্দ বাচক এবং "গরু"-অর্থ বাচ্য; "গো" এবং "গরু", এই দুইএর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ। ইহার অপর নাম "সময়" বা "সঙ্কেত"। "গো" এবং "গরু"-র মধ্যে এই সাঙ্কেতিক সম্বন্ধ যে অবগত আছে, তাহারই "গো"-শব্দ শুনিলে "গরু"-সম্বন্ধে শাব্দ জ্ঞান হয়। নৈয়ায়িকগণ বলেন, কোন্ শব্দের কি অর্থ, তাহা (বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ) সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে স্থির করিয়া, তদ্বিষয়ে ঋষি-মহর্ষিগণকে জ্ঞান প্রদান করেন; এবং ঐ সাময়িক বা সাঙ্কেতিক জ্ঞান, ঋষি-মহর্ষি প্রভৃতি বৃদ্ধপরম্পরাক্রমে অদ্যাপি সংসারে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে অর্থাৎ কোন্ শব্দের কি অর্থ, তাহা আধুনিক কালে লোকে গুরু প্রভৃতির নিকট হইতে শুনিয়া শিখিয়া লয়।

জগৎ সম্বন্ধে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা যে ঈশ্বর আদিতে শব্দ ও অর্থের সাঙ্কেতিক সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেন, ইহা মানিতে প্রস্তুত হইবেন না, ইহা সহজেই অনুমেয়। জৈন দার্শনিকগণের মতে সৃষ্টিকর্ত্তা কোনও ঈশ্বর নাই। সুতরাং বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ ঈশ্বর নির্দ্দেশ করিয়া দেন, ইহা তাঁহারা কোনও মতেই স্বীকার করেন না তাঁহারা আরও বলেন, একই শব্দকে

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। যদি সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্ব্বশক্তিমান নিয়ন্তা প্রত্যেক শব্দের সঙ্কেত নিরূপিত করিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে একই শব্দের দ্বারা দেশভেদে বা কালাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রকাশ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এই জন্য জৈনাচার্য্যগণ বলেন,—

স্বাভাবিকসামর্থ্যসময়াভ্যামর্থবোধনিবন্ধনং শব্দঃ।

অর্থ-প্রকাশ বিষয়ে শব্দের একটী সামর্থ্য আছে। এ সামর্থ্য পরমেশ্বরপ্রদত্ত নহে; ইহা "স্বাভাবিক"। শব্দের এই "স্বাভাবিক সামর্থ্য" একটী অতীন্দ্রিয় শক্তি; ইহার অপর নাম "যোগ্যতা"। এই স্বাভাবিক সামর্থ্য বা যোগ্যতাবশতঃ শব্দ অর্থ-প্রতিপাদনে সমর্থ হয়। কিন্তু শুধু সামর্থ্য বা যোগ্যতা থাকিলেই অর্থ প্রকাশ হয় না। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে; কিন্তু তাহা কখন্, কোন্‌খানে, কোন্ পদার্থকে দগ্ধ করিবে, তাহা শুধু দাহিকা শক্তির উপর নির্ভর করে না; দাহিকা শক্তি ব্যতীত তাহা আরও অন্যান্য কারণ-সমষ্টির অপেক্ষা করে। সেইরূপ শব্দ-মাত্রেই অর্থ-প্রকাশে সমর্থ; কিন্তু কোন্ শব্দের দ্বারা কখন্, কোন্ দেশে, কোন্ পদার্থ প্রকাশিত হইবে, তাহা লোক-ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। কোন্ শব্দের কোন্ অর্থ, তাহা লোকেই নিরূপণ করে। এই লোকব্যবহারের ফলে পূর্ব্বকথিত "সময়" বা "সঙ্কেত" নির্দ্ধারিত হয়। তাহা হইলে শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশের মূলে শব্দের প্রথমতঃ "যোগ্যতা" নামে অতীন্দ্রিয় শক্তি বা স্বাভাবিক সামর্থ্য স্বীকার করিতে হয়; ইহা না হইলে শব্দের দ্বারা অর্থপ্রকাশ একেবারেই অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ— কোন্ শব্দের কোন্ অর্থ হইবে, ইহা লোক-ব্যবহার-জনিত "সময়" বা "সঙ্কেতে"র দ্বারা নিরূপিত হয়। যিনি এই সঙ্কেত জানেন, তিনিই শব্দ শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারেন। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ-সম্বন্ধে জৈনাচার্য্যগণ বলেন, সকল শব্দেরই সকল অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তি আছে; অর্থাৎ একই শব্দ জগতের সকল পদার্থই প্রকাশ করিতে সমর্থ। কিন্তু কোনও শব্দ কি অর্থ প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ করিবে, তাহা লোকব্যবহার-জনিত সঙ্কেতের উপর নির্ভর করে। দেশ-ভেদে, কাল-ভেদে, প্রয়োজন-ভেদে লোকে একই শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে; এই সাময়িক বা সাঙ্কেতিক প্রয়োগে অসামঞ্জস্য কিছুই নাই। কারণ, সকল শব্দেরই সকল অর্থ প্রকাশ করিবার "যোগতা" আছে।

অর্থ-প্রকাশ বিষয়ে শব্দের এই স্বাভাবিক সামর্থ্য স্বীকার করিলে শব্দ সম্বন্ধে আরও প্রশ্ন ওঠে। অর্থের সহিত যাহার এতটা সম্বন্ধ, তাহা কি একেবারে অনিত্য? নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ, সংযোগ ও বিভাগ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং পরে শব্দ বিনষ্টও হয়, এ জন্য শব্দ অনিত্য, এইরূপ বলিয়াছেন। জৈন দার্শনিকগণ শব্দকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, ইহাকে "পৌদ্গলিক" অর্থাৎ নিত্য পদার্থ যে পুদ্গল (matter), তাহারই সমাশ্রিত বলিয়াছেন। শব্দের অনিত্যত্ববাদী ন্যায়াচার্য্যগণও ইহাকে নিত্য-পদার্থ আকাশের গুণ বলেন। সাংখ্য-পণ্ডিগণ শব্দকে একেবারে অনিত্য না বলিয়া ইহার একটা "তন্মাত্র" অবস্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শব্দ সূক্ষ্মরূপে দ্রব্যকে সর্ব্বদাই আশ্রয়

করিয়া আছে। যখন আমরা কোনও শব্দ শুনি, তখন যে প্রকৃতপক্ষে শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহা নহে; ঐ পূর্ব্ববর্ণিত সূক্ষ্ম শব্দ অভিব্যক্ত হয় মাত্র; এবং যখন আমরা শব্দ শুনিতে না পাই, তখন যে শব্দ একেবারে চির-বিনষ্ট হইল, তাহা নহে; ইহা তখন অনভিব্যক্ত সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত হয়।

শব্দ নিত্য, কি অনিত্য—তাহা এ স্থলে বিচার্য্য নহে। শব্দ একেবারে অবস্তু নহে, কতকটা যেন substance বা বস্তুভাবাপন্ন, উপরোক্ত সাংখ্যমতে ইহারই যেন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শব্দের বস্তুত্ব সম্বন্ধে মীমাংসক ও বৈয়াকরণ দার্শনিকগণ নৈয়ায়িকগণের বিরোধী মত পোষণ করিয়া থাকেন। সুবিখ্যাত ভর্ত্তৃহরি লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—

ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্ব্বং শব্দেন গৃহ্যতে॥

কোনও জ্ঞানই শব্দপ্রয়োগ ব্যতিরেকে দেখা যায় না। সকল জ্ঞানের মূলে শব্দ।

যাবদর্থং বৈ নামধেয়শব্দাঃ তৈরর্থসম্প্রত্যয়ঃ

যা' কিছু পদার্থ, সকলেরই সংজ্ঞাশব্দ আছে; এই শব্দের সাহায্যেই অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়।

শুধু তাই নয়। সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক জ্ঞানই শব্দময়। কোনও জ্ঞান হইতে যদি তাহার উপাদানভূত শব্দ বিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে জ্ঞানের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; শব্দ-ব্যতিরেকে বস্তুসম্বন্ধে কোনও বোধ থাকে না।

বাগ্‌রূপতা চেদুৎক্রামেদববোধস্য শাশ্বতী।
ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সাহি প্রত্যবমর্শিণী॥

যদি শব্দ-ব্যতিরেকে অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে,—মীমাংসামত এই যে—শব্দ ন্যায়াচার্য্যগণের উক্তিমত অ-বস্তু নহে; এমন কি, ইহা সাংখ্যাচার্য্যগণের বিবরণমত যে বস্তু-আশ্রিত, তাহাও নহে,—শব্দ ও অর্থ অভিন্ন অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের মধ্যে "তাদাত্ম্য" সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

মীমাংসামতে শব্দ নিত্য-সত্ত্ব-রূপে চির-বর্ত্তমান। ইহার উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই। আমরা যখন কোনও শব্দ শুনি, তখন কারণ-সাহচর্য্যে ঐ নিত্য-শব্দের অভিব্যক্তি হয় এবং যখন আমরা ঐ শব্দ শুনিতে না পাই, তখন ইহার সত্তা নষ্ট হয় না, উহা অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে মাত্র। যেমন বস্তুমাত্রের রূপ আছে। এই রূপ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকিলেও যখন আলোক-সম্পাত হয়, তখনই ঐ রূপ দর্শকের নিকট প্রকাশিত হয়। অন্ধকারাবৃত হইলে ঐ রূপ যে বিনষ্ট হয়, ইহা কেহই বলেন না; তখন ঐ রূপ বর্ত্তমান থাকিয়াও অপ্রকাশিত হয় মাত্র। নিত্য শব্দের যে অনিত্য অভিব্যক্তি, তাহার নাম "ধ্বনি"; এই ধ্বনি নিত্যশব্দকে অভিব্যক্ত করে বলিয়া ইহার অপর নাম "ব্যঞ্জক"। ধ্বনির উৎপত্তি হয়, বিলয় হয়; ধ্বনি কখনও তীব্র, কখনও মন্দ, কখনও মধুর, কখনও কর্কশ হয়,—একটি ধ্বনির দ্বারা অপর একটী ধ্বনি "অভিভূত" হইতে পারে; কিন্তু শব্দ

নিত্য ও অবিকারী। নিত্য ও অবিকারী শব্দ কোনও কারণের অপেক্ষা করে না; কিন্তু ধ্বনি বা ব্যঞ্জক কারণ হইতে সঞ্জাত, কারণের বিনাশে ইহারও বিনাশ হয়, কারণের সত্তাতে ইহারও স্থিতি এবং কারণের তারতম্যানুসারে ইহারও তারতম্য হইয়া থাকে।

শব্দ যে ধ্বনি-ব্যতিরিক্ত একটী নিত্য পদার্থ, তৎসম্বন্ধে মীমাংসকগণ বলেন,—এই ক্ষণে একটী "গ"-কার শুনিলাম; পরক্ষণে আবার "গ"-কার শুনিলাম; আমরা বলি—সেই "গ"-কার আবার শুনিলাম। যদি পূর্ব্বক্ষণ-শ্রুত "গ"-কার একটী অনিত্য অ-বস্তু হইত, তাহা হইলে পরক্ষণে তাহার বিদ্যমানতা সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্তু পরক্ষণের "গ-"কার পূর্ব্বক্ষণের "গ"-কারের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, পূর্ব্ব-শ্রুত "গ"-কার ও পরক্ষণ-শ্রুত "গ"-কার উভয়েরই মূলে একটী নিত্য, অবিকৃত শব্দ বিদ্যমান। মীমাংসকগণ আরও বলেন যে, শব্দ নিত্য না হইলে শিক্ষাদানাদি কার্য্য অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, গুরু যে সমস্ত শব্দরাশি তাঁহার উপদেশকের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত শব্দরাশি শিষ্যকে যথাযথভাবে সম্প্রদান করার নামই অধ্যাপনা। যদি শব্দ অনিত্য ও অবস্তু হইত, তাহা হইলে কিরূপে গুরু, শিষ্যকে তাঁহার অধিগত বিদ্যা দান করিবেন? তাঁহার অধিগত শব্দরাশি অনিত্য হইলে সে সমস্ত আর শিষ্যকে প্রদান করিবার সম্ভাবনা থাকে না। শব্দ অনিত্য হইলে, কোনও গ্রন্থ তিনবার পাঠ করিয়াছি, ইহাও বলা সম্ভবপর হয় না।

মীমাংসকগণের মতে শব্দ নিত্য এবং অর্থের সহিত ইহার তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ। শব্দ ব্যতীত অর্থের পৃথক্ সত্তা নাই। শব্দ ও অর্থ একই পদার্থ বলিয়া শব্দ হইতে অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে।

উৎপত্তি-বিনাশ-তারতম্য-বিশিষ্ট ধ্বনিসমূহের অতীত যে নিত্য শব্দ, তাহাকে মীমাংসকগণ "শব্দ-ব্রহ্ম" বলেন। তাঁহাদের মতে শব্দ-ব্রহ্মই উপনিষদুক্ত "বাক্"। ব্রহ্মাদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণের "ব্রহ্মে"র ন্যায় এই "শব্দব্রহ্ম" "অক্ষর" ও "অনাদি-নিধন", এই "বাক্" "শাশ্বতী"। ব্রহ্মাদ্বৈতবাদিগণ যেমন জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলেন, সেইরূপ শব্দাদ্বৈতবাদিগণও বিভিন্ন বস্তুময় বিশ্ব-প্রপঞ্চকে শব্দের বিবর্ত্তমাত্র বলিয়া থাকেন।

> অনাদিনিধনং শব্দব্রহ্মতত্ত্বং যদক্ষরম্।
> বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।

খ্রীষ্ট-ঋষি সেণ্ট জন্‌এর প্রহেলিকাময় উক্তির মধ্যে আমরা যেন এই সুপ্রাচীন ভারতীয় শব্দব্রহ্ম-বাদের একটা সুদূরাগত প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।—

In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him and without Him was not anything made that hath been made.

তাঁহার মতে এই মূলতত্ত্বস্বরূপ Word হইতেই স্থূল জগতের উৎপত্তি।

শব্দাদ্বৈতবাদিগণের মতে শব্দ-ব্রহ্ম একদিকে জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু (—"বাচ্য"—)-রূপে, অপর দিকে ঐ সমস্ত বস্তুর নাম (—"বাচক"—)-রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। অর্থ ও শব্দ, বস্তু ও ধ্বনি, ব্যঞ্জ্য ও ব্যঞ্জক, বাচ্য ও বাচক,—বিশ্ব জগতের সকলেরই মূলে সেই অনাদিনিধন, নিত্য, অবিকৃত শব্দ-ব্রহ্ম।

ব্রহ্মকে "জগৎ-যোনি" বলিয়াও ব্রহ্মাদ্বৈতবাদিগণ জগতের বস্তুমাত্রকে ব্রহ্ম বলেন নাই। আমাদের "জাগ্রৎ" অবস্থায় উপলব্ধ বস্তুসমূহ ব্রহ্ম নহে। 'স্বপ্ন' ও 'সুষুপ্তি'র অধিগম্য বিষয়ও ব্রহ্ম নহে। বেদান্তিগণ ব্রহ্মকে এ সকলের অতীত স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতিঃ-স্বরূপ বলিয়াছেন। শব্দাদ্বৈতবাদিগণও শব্দমাত্রকেই শব্দ-ব্রহ্ম বলেন না। তাঁহারা শব্দকেও ত্রিধা বিভক্ত করিয়া ব্রহ্মাদ্বৈতবাদেরই কতকটা অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের মতে শব্দ বা বাক্ "বৈখরী", "মধ্যমা" ও "সূক্ষ্মা" ভেদে তিন প্রকার। কণ্ঠাদিস্থানে প্রাণবায়ু যথাপ্রকারে প্রযুক্ত হইলে যে শব্দ হয়, তাহার নাম "বৈখরী"; ইহাতে স্বরব্যঞ্জনাদি বর্ণ থাকে এবং ইহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রুত হয়। 'মধ্যমা' বাকে প্রাণবায়ুর কোনও ক্রিয়া থাকে না এবং ইহাতে স্বর-ব্যঞ্জনাদি বিভিন্ন বর্ণের বা বাক্যের প্রয়োগ নাই; ইহা বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; ইহাকে "অন্তর্জল্পরূপা" বলিয়া বর্ণনা করা হয়। "সূক্ষ্মা বাক্" বৈখরী ও মধ্যমার অতীত; ইহা জ্যোতিঃস্বরূপ, সূক্ষ্ম, নিত্য অর্থাৎ অনাদিনিধন। জগতের মূলে এই সনাতন, শাশ্বত, সত্যস্বরূপ সূক্ষ্ম বাক্ বা শব্দ-ব্রহ্ম; ইহা সমস্ত জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে এবং এই জন্যই জগৎকে শব্দাত্মক বলা হয়।

স্থানেষু বিবৃতে বায়ৌ কৃতবর্ণপরিগ্রহা।
বৈখরী-বাক্ প্রযোক্তৄণাং প্রাণবৃত্তিনিবন্ধনা।
প্রাণবৃত্তিমতিক্রম্য মধ্যমা বাক্ প্রবর্ত্ততে।
অবিভাগাহনুপশ্যন্তী সর্ব্বতঃ সংহৃতক্রমা।
স্বরূপজ্যোতিরেবান্তঃসূক্ষ্মা বাগনপায়িনী।
তয়া ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বং ততঃ শব্দাত্মকং জগৎ।

প্রাচীন বাঙ্‌লার ধন-সম্বল

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

সমাজ-সংস্থানের বস্তু-ভিত্তি হইতেছে ধন। এই ধন যে শুধু ব্যক্তির পক্ষে, তাহার জীবনধারণ, অশন বসন, শিক্ষা দীক্ষা, ধর্মকর্মের জন্য অপরিহার্য তাহা নয়, গোষ্ঠী ও সমাজের পক্ষেও তাহাই। সমাজ-নিরপেক্ষ পারত্রিক মঙ্গলের জন্য, অথবা তপশ্চর্যায় বিশুদ্ধ ধর্মজীবন যাপনের জন্য, অথবা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে সমাজের বাহিরে একান্ত ভাবে একক জীবন যাহারা যাপন করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন মুক্ত পুরুষ হয়ত আছেন যাহারা কোন ভাবেই কোনও ধন কামনা করেন না, অশন বসনের ও কামনার উর্দ্ধে যাঁহাদের স্থান। তাঁহারা সমাজ-ইতিহাসের আলোচনার বিষয় নহেন। আমরা তাহাদের কথাই বলিতেছি যাহারা জীবনের দৈনন্দিন সুখ দুঃখে, জীবনের বিচিত্র টানা পোড়েনে নিত্য আন্দোলিত, ঐহিক জীবনের ক্ষুৎপিপাসায়, শীতাতপে পীড়িত এবং সামাজিক নানা বিধি বিধান প্রয়োজন আয়োজন দ্বারা শাসিত। সমাজ-ধর্মী এই যে ব্যক্তি তাহার দৈনন্দিন জীবনে ধন অপরিহার্য বস্তু; এই ধন বলিতে শুধু মুদ্রাকে বুঝায় না, টাকা আনা পয়সা বুঝায় না, একথা আজকাল আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ব্যক্তির যেমন, সমাজেরও তেমনই; ধন ছাড়া কোনও দেশের কোনও বিশেষ কালের সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্য কল্পনাই করিতে পারা যায় না; ধন ছাড়া সমাজের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হইতে পারে না; কারণ যাহারা এই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করিবেন তাহাদিগকে তাহাদের কায়িক অথবা মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নিজেদের ভরণপোষণের, শিক্ষাদীক্ষার ধর্মকর্মের, বিলাস আরামের জন্য বেতন দিতে হইবে, তাহা শস্য দিয়া হউক, মুদ্রা দিয়া হউক, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া হউক, ভূমি দিয়া হউক, অথবা অন্য যে কোনও উপায়েই হোক্। শুধু রাষ্ট্রের কথাই বা বলি কেন, ধর্ম, শিল্প, শিক্ষা সংস্কৃতি, কিছুই এই ধন ছাড়া চলিতে পারে না, এবং সমাজ-সংস্থানের যে-কোনও ব্যাপারেই এ কথা সত্য।

নানা বর্ণ, নানা জাতি এবং নানা শ্রেণীর অগণিত ও অলিখিত জনসমষ্টি লইয়া প্রাচীন বাঙ্‌লার যে-সমাজ, তাহার সংস্থানে এবং পরিকল্পনায় যে ধন প্রয়োজন হইত, তাহা আসিত কোথা হইতে? একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, যাহারা রাজসরকারে চাকরী করিতেন, লেখমালায় যাহাদের বলা হইয়াছে রাজপাদপোজীবী, তাহারা ধন উৎপাদন করিতেন না, উৎপাদিত ধনের অংশ মাত্র ভোগ করিতেন শ্রম ও বুদ্ধির বিনিময়ে। শিক্ষা-বৃত্তি ছিল যাহাদের, ধর্মানুষ্ঠানের পুরোহিত ছিলেন যাহারা, সমাজের তথাকথিত হেয় কর্ম ইত্যাদি যাহারা করিতেন, তাহারাও যতটুকু পরিমাণে নিজ নিজ বিশেষ বৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন ততটুকু পরিমাণে ধনোৎপাদনের দায় ও কর্তব্য হইতে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু

উৎপাদিত ধনের অংশ তাহারা ভোগ করিতেন শ্রম ও বুদ্ধির বিনিময়ে নিজ নিজ সুযোগ ও অধিকার অনুযায়ী। সোজাসুজি প্রত্যক্ষ ভাবে ধনোৎপাদন ইহারা কেহই করেন না বটে, তবে পরোক্ষ ভাবে ধনোৎপাদনে সাহায্য সকলকেই কিছু না কিছু করিতে হয়, কোনও না কোনও উপায়ে। সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে যাহাদের পরিচয় আছে তাহারাই একথা জানেন।

তাহা হইলেই প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, ধনোৎপাদনের উপায় কি কি? প্রাচীন বাঙ্‌লায় দেখিতেছি, ধনোৎপাদনের তিন উপায়: কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য। ইহাদের মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যই প্রধান; আজ পর্যন্তও বাঙ্‌লা দেশে কৃষিই প্রধান ধন-সম্বল; তারপরেই শিল্প। এই কৃষি ও শিল্পজাত জিনিসপত্র লইয়া দেশে বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে উৎপাদিত ধনের বৃদ্ধি এবং দেশের বাহির হইতে নূতন ধনের আগমন হইত। এই তিন উপায়ে আহরিত যে ধন তাহাই প্রাচীন বাঙ্‌লার ধন-সম্বল। এবং এই ধন-সম্বলের উপরই সমাজ, রাজা, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি সবকিছুর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ।

কিন্তু এই ধন-সম্বলের কথা বলিবার আগে আমাদের ঐতিহাসিক উপাদান সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়া লওয়া দরকার। আমাদের প্রধান উপাদান লেখমালা, এবং প্রাচীন বাঙ্‌লার সর্বপ্রাচীন লেখমালার তারিখ আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাপ্ত এই সুপ্রাচীন প্রস্তর-লেখখণ্ডটিতে প্রাচীন বাঙ্‌লার ধন-সম্বলের একটি প্রধান উপকরণের সংবাদ পাওয়া যায়[১]। এই উপকরণটি ধান, কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান। এই লেখখণ্ডটি ছাড়া, পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাঙ্‌লাদেশ-সম্পর্কিত প্রচুর লিপির সংবাদ আমরা জানি, কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থের উপাদানও আমাদের অজ্ঞাত নয়, অথচ এই সর্বপ্রাচীন মহাস্থান-লেখ খণ্ডটি ছাড়া বাঙ্‌লা দেশের প্রধান উৎপন্ন ধন যে ধান সে-উল্লেখ কোথাও নাই বলিলেই চলে। অথচ ইহা ত সহজেই অনুমেয় যে আজও যেমন অতীতেও তেমনি, ধান্যই ছিল বাঙ্‌লা দেশের প্রধান ধন-সম্বল[২]। শুধু ধান সম্বন্ধেই নয়, অন্যান্য অনেক কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উল্লেখই আমাদের ঐতিহাসিক উপাদানে পাওয়া যায় না। কাজেই আমাদের এই বিবরণীতে যে-সব উপকরণের উল্লেখ নাই, অথচ যাহা উৎপাদিত ধন হিসাবে বর্তমান ছিল বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায়, তাহা প্রাচীন বাঙ্‌লায় ছিল না, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কার্পাস বস্ত্র ও রেশম বস্ত্র যে বাঙ্‌লার প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য ছিল, এবং সুদূর ইজিপ্ট ও রোমদেশ পর্যন্ত তাহা রপ্তানী হইত, সর্বত্র তাহার আদরও ছিল, একথা আমরা খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার বর্ণিত "Periplus of the Erythrean Sea"[৩] অথবা কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"[৪] কিংবা "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়"[৫] গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু জানিতে পারি; অথচ এযাবৎ বাঙলাদেশ-সম্পর্কিত যত লেখাবলীর খবর আমরা জানি কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। উদাহরণ দিবার জন্য ধান ও বস্ত্রশিল্পের

উল্লেখ করিলাম মাত্র, তবে অনেক কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের সম্বন্ধেই একথা বলা যাইতে পারে। কাজেই অনুল্লেখের যুক্তি অন্ততঃ এক্ষেত্রে অনস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে না। কৃষি ও শিল্পের তদানীন্তন অবস্থায়, প্রাচীন বাঙ্‌লার তদানীন্তন ভূমি-ব্যবস্থায়, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু এবং নদনদীর সংস্থানে যে-সব দ্রব্য উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক তাহা সমস্তই উৎপাদিত হইত, এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গত, তবু ঐতিহাসিক বিবরণ যখন লিখিতে বসিয়াছি তখন আমি কেবলমাত্র সেই সব উপকরণই বিবৃত করিব যাহার উল্লেখ অবিসংবাদিত উপাদানের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং যাহার উল্লেখ না থাকিলেও অস্তিত্বের অনুমান প্রমাণের অনুরূপ মূল্য বহন করে। একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। তক্ষণ অথবা স্থাপত্য শিল্পের কোন উল্লেখ আমরা আমাদের জ্ঞাত উপাদানের মধ্যে পাই না, যদিও তিব্বতী লামা তারানাথ তাঁহার "ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে" ধীমান্ ও বীটপাল নামে বরেন্দ্রভূমির দুই খ্যাতনামা শিল্পীর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বিজয়সেনের দেওপাড়া তাম্রশাসনে "বারেন্দ্রক শিল্পিগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপাণি"র উল্লেখ আছে। ঠিক তেমনি স্বর্ণকার অথবা রৌপ্যকারের উল্লেখও নাই। অথচ বাঙ্‌লাদেশে প্রাপ্ত অগণিত দেবদেবীর পোড়ামাটি ও পাথরের মূর্তিগুলি দেখিলে; পাহাড়পুর ও অন্যান্য স্থানের প্রাচীন মন্দির, স্তূপ এবং বিহারের ধ্বংসাবশেষ অথবা সমসাময়িক চিত্রে ও ভাস্কর্যে সেই যুগের ঘর বাড়ী মন্দিরাদির পরিকল্পনা দেখিলে, দেবদেবীর মূর্তিগুলির চিরযৌবনসুলভ শ্রীঅঙ্গে বিচিত্র গহনার সূক্ষ্ম ও বিচিত্রতর কারুকার্যগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে একথা অনুমান করিতে কোনও আপত্তি করিবার কারণ নাই যে তদানীন্তন কালে তক্ষণ ও স্থাপত্য শিল্প অথবা স্বর্ণ ও রৌপ্যশিল্পজাত দ্রব্যাদির কোনও প্রকার অপ্রতুলতা ছিল। অন্যান্য অনেক কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধেই একথা বলা যাইতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধেও একই কথা। তাম্রলিপ্তি যে মস্ত বড় একটি বন্দর ছিল, এ খবর বিশেষভাবে জাতকগ্রন্থে ও ফাহিয়ান-য়ুয়ান্‌চোয়াঙের বিবরণীর ভিতর পাওয়া যায়, কিন্তু তা'ছাড়া অন্য কোথাও ইহার বিশদ উল্লেখ কিছু নাই বলিলেই চলে। এই বন্দর হইতে, এবং কিছু পরবর্তীকালে অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রারম্ভ হইতেই সপ্তগ্রাম হইতে যে পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপগুলিতে, দক্ষিণ-ভারতের উপকূল বাহিয়া সিংহলে, এবং পশ্চিম উপকূল বাহিয়া সুরাষ্ট্র ভৃগুকচ্ছ পর্যন্ত বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিত তাহার কিছু কিছু আভাস হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু সমসাময়িক বিশদ প্রমাণ কিছু নাই বলিলেই চলে। অন্তর্বাণিজ্যও নিশ্চয়ই ছিল, বাঙলাদেশের বিভিন্ন জনপদগুলির ভিতর এবং দেশের বাহিরে অন্যান্য রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডগুলির সঙ্গে। এই অন্তর্বাণিজ্য চলিত হয়ত অধিকাংশই নদীপথে, কিন্তু স্থলপথেও কিছু কিছু না চলিত এমন নয়, অথচ এই সব বাণিজ্য-সম্ভার, বাণিজ্যপথ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য খবরের আভাসও উপাদানগুলির মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। হাট বাজার, আপণি, বিপণি, ব্যাপারী ইত্যাদির নির্বিশেষ

উল্লেখ লেখমালাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায়, কিন্তু তাহা উল্লেখ মাত্রই, বিশেষ আর কিছু খবর পাওয়া যায় না।

পাওয়া যে যায় না, উল্লেখ যে নাই তাহার কারণ ত খুবই পরিষ্কার। লেখমালাই হউক্, অথবা অন্য যে কোনও প্রকার লিখিত বিবরণই হউক্ ইহাদের কোনটিই দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের, কিংবা দেশের সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দিবার জন্য রচিত হয় নাই। দু'একটি ছাড়া সব লেখমালাই প্রায় ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলি, আধুনিক ভাষায় পাট্টা বা দলিল। প্রস্তাবিত দান-বিক্রয়ের ভূমির পরিচয় দিতে গিয়া, কিংবা দান-বিক্রয়ের সর্ত ও স্বত্ব উল্লেখ করিতে গিয়া পরোক্ষভাবে কোনও কোনও উৎপন্ন দ্রব্যাদির নাম বাধ্য হইয়াই করিতে হইয়াছে, কারণ সেই সব উৎপন্ন দ্রব্যাদি সেই ভূমিখণ্ডের ধন-সম্পদ, এবং তাহার অবলম্বনেই ক্রেতা অথবা দানগ্রহীতার ক্রয় অথবা দানগ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সব লেখমালায় আবার সে উল্লেখও নাই। পূর্বোক্ত মহাস্থান শিলালিপিখণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিলে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম শতক পর্যন্ত বহু তাম্রপট্টোলির খবর আমরা জানি, কিন্তু উহাদের মধ্যে কোথাও দত্ত বা ক্রীত ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যাদির বা কোনও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে; একমাত্র সপ্তম শতকে রচিত কর্ণসুবর্ণ (কর্ণস্বর্ণ—কানসোনা, মুর্শিদাবাদ জেলা) রাষ্ট্রের ঔদুম্বরিক বিষয়ের বপ্যঘোষবাট গ্রামের তাম্রপট্টোলিতে[৬] "সর্ষপ-যাণক" বলিয়া সর্ষপক্ষেত্র-পার্শ্ববিলম্বিত যে-পথের (?) উল্লেখ আছে তাহা হইতে হয়ত অনুমান করা যায় উক্ত গ্রামের অন্যতম উৎপন্ন দ্রব্য ছিল সর্ষপ বা সরিষা। অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পাল, সেন ও অন্যান্য রাজবংশের যে-সমস্ত পট্টোলির খবর আমরা জানি তাহার প্রায় সব ক'টিতেই দত্ত অথবা ক্রীত ভূমির প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ আছে, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ ভাবে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের পট্টোলিগুলিতে ভূমিজাত দ্রব্যাদির আয়ের পরিমাণও উল্লেখ করা আছে। ভূমি সম্পর্কিত দলিল বলিয়াই ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। প্রশ্ন দাঁড়ায়, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের লেখমালায় ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই কেন, এবং অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের লেখমালায় আছে কেন? সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন, কিন্তু একটা অনুমান করা চলে। বৈন্য গুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলিতে (১৮৮ গুপ্ত সং=৫০৭-৮ খৃ) দেখিতেছি মহাযানিক বৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘকে যে গ্রাম বা অগ্রহার দান করা হইতেছে তাহার সর্ত হইতেছে "সর্বতোভোগেন", অর্থাৎ দানগ্রহয়িতা সকল প্রকারে এই ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য ও তাহার আয় ভোগ করিতে পারিবেন, এই অধিকার তাহাকে দেওয়া হইতেছে। এই যুগের অন্যান্য লেখমালায় এই ধরণের "সর্বতোভোগেন" অধিকারের উল্লেখ বিশেষ ভাবে নাই, কিন্তু অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী যে দান তাহা যে "সর্বতোভোগেন"ই দেওয়া হইত, এবং ক্রেতা ও দানগ্রহয়িতারা যে

সেই ভাবেই গ্রহণ করিতেন, এ অনুমান হয়ত করা যায়। পরবর্তী কালে এই "সর্বতোভোগে"র স্বরূপ নির্দেশ করা প্রয়োজন হয়ত হইয়াছিল নানা বিশেষ ও অবিশেষ কারণে; ভোক্তার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন হয়ত উঠিয়াছিল, এবং হয়ত এই কারণেই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরবর্তী কালে কতকটা বিশদভাবে এই অধিকারের স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছিল, এবং তাহার ফলেই ভূমিজাত দ্রব্যাদির খবর আমরা কিছু কিছু পাই।

এ ত গেল লেখমালাগুলির কথা। অন্যান্য উপাদানগুলি সম্বন্ধেও দু'এক কথা বলা দরকার। পূর্বে বলিয়াছি, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রচিত "Periplus of the Erythrean Sea" নামক গ্রন্থে ও কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" প্রাচীন বাঙলার প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের খবর পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বিদেশীয় বণিক যাহারা সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেন, তাহাদের সুবিধার জন্য, কতকটা 'গাইড্ বই'র মতন। বাঙলা দেশ হইতে যে-সব জিনিষ বিদেশে পশ্চিম এসিয়ায়, ইজিপ্টে, রোমে, গ্রীসে যাইত তাহার মধ্যে অজ্ঞাত-নামা লেখক রেশম বস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সব দেশে এই জিনিসের চাহিদা ছিল, তাই ইহার উল্লেখ হইয়াছে; অন্য শিল্পজাত দ্রব্যও নিশ্চয়ই ছিল, সেগুলির চাহিদা হয়ত তেমন ছিল না, রপ্তানীও হইত না, সেই জন্য তাহাদের উল্লেখ নাই। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" এই বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ অপরোক্ষভাবে। কারণ এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থোক্ত বিশেষ অধ্যায়টি ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের সংবাদ দিবার জন্য বিশেষ ভাবে রচিত নয়। রাজশেখরের "কাব্য-মীমাংসায়" পূর্বদেশগুলির উৎপন্ন দ্রব্যাদির একটা ক্ষুদ্র তালিকা আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, এই তালিকা কিছুতেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; মনে হয় কোনও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে যে সব গন্ধ ও আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইত, এ তালিকায় শুধু সেই সব কয়েকটি দ্রব্যেরই নাম আছে। সেই জন্য আমাদের নানা উপাদানের মধ্যে প্রাচীন বাঙলার ধন-সম্বলের যে-সংবাদ তাহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পরোক্ষ ও অসম্পূর্ণ। এই সব বিচ্ছিন্ন, টুক্‌রা টুক্‌রা তথ্য আহরণ করিয়া এই ধনসম্বলের একটি সম্পূর্ণ স্বরূপ গড়িয়া তোলা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু মোটামুটি একটা কাঠামো গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

প্রথম কৃষি ও ভূমিজাত দ্রব্যাদির কথাই বলি। প্রাচীন বাঙলায় কৃষি যে ধনোৎপাদনের এক প্রধান ও প্রথম উপায় ছিল তাহার প্রমাণ লেখমালায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত লেখমালাগুলিতে 'ক্ষেত্রকরান্', 'কর্ষকান্' 'কৃষকান' ইত্যাদি কথার ত উল্লেখ আছেই। জনসাধারণ যে-কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে ক্ষেত্রকর বা কৃষকেরাও ছিল বিশেষ একটি শ্রেণী, এবং কোনও স্থানে ভূমি দান-বিক্রয় করিতে হইলে রাজপাদপোজীবিদের, ব্রাহ্মণদের, এবং গ্রামের ও গোষ্ঠীর অন্যান্য মহত্তর ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদেরও দান-বিক্রয়ের ব্যাপার বিজ্ঞাপিত

করিতে হইত। উদাহরণ স্বরূপ খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের লিপি[৭] (অষ্টম শতকের চতুর্থ পাদ, আনুমানিক) হইতে এই বিজ্ঞাপন-সূত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"এষু চতুর্ষু গ্রামেষু সমুপগতান্ সর্বানেব রাজ-রাজনক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-সেনাপতি-বিষয়পতি-ভোগপতি-ষষ্ঠাধিকৃত-দণ্ডশক্তি-দণ্ডপাশিক—চৌরোদ্ধরণিক-দৌসৃসাধসাধনিক-দূত-খোল সমাগমিকা-ভিত্বরমাণ-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষাজাবিকাধ্যক্ষ-নাকাধ্যক্ষ-বলাধ্যক্ষ-তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক-তদায়ুক্তক-বিনিযুক্তকাদি-রাজপাদপোজীবিনোঽন্যাংশ্চাকীর্তিতান্ চাটভট জাতীয়ান্ যথাকালাধ্যাসিনো জ্যেষ্ঠকায়স্থ-মহামহত্তর-মহত্তর-দাশগ্রামিকাদি-বিষয়ব্যবহারিণঃ সকরণান্ প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণ-মাননাপূর্বকং যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ।"

এই ধরণের উল্লেখ প্রায় প্রত্যেক তাম্র-পট্টোলিতেই আছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভাল প্রমাণ লোকের ভূমির চাহিদা। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত যত ভূমি দান-বিক্রয়ের তাম্রপট্টোলি দেখিতেছি, সর্বত্রই দেখি ভূমি-যাচক বাস্তুক্ষেত্রাপেক্ষা খিলক্ষেত্রই চাহিতেছেন বেশী পরিমাণে; তাহার উদ্দেশ্য যে কৃষিকর্ম তাহা সহজেই অনুমেয়। যে-জমি কর্ষিত হয় নাই, সেই জমির চাহিদাই বেশী, উদ্দেশ্য কর্ষণ তাহাতে আর সন্দেহ কি? ধনাইদহ পট্টোলি (১১৩ গুপ্ত সং=৪৩২-৩৩ খৃ)[৮], দামোদরপুরে প্রাপ্ত প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পট্টোলি[৯] (৪৪৩-৪৪ খৃ; ৪৮২-৮৩খৃ; ৫৪৩-৪৪ খৃ), ধর্মাদিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় পট্টোলি[১০] (সপ্তম শতক), গোপচন্দ্রের পট্টোলি[১১] (সপ্তম শতক), সমাচার দেবের ঘুগ্রাহাটি পট্টোলি[১২] (সপ্তম শতক) প্রভৃতিতে শুধু খিলক্ষেত্র প্রার্থনারই উল্লেখ আছে। অন্যত্র, যেখানে খিল ও বাস্তুক্ষেত্র উভয়ই প্রার্থনা করা হইতেছে, যেমন বৈগ্রাম পট্টোলিতে[১৩] (১২৮ গুপ্ত সং=৪৪৭-৪৮ খৃ), সেখানেও খিলক্ষেত্রের পরিমাণ বাস্তুক্ষেত্রের প্রায় বারগুণ। পরবর্তী কালের পট্টোলিগুলিতে ভূমির পরিমাণ সমগ্রভাবে পাওয়া যাইতেছে কিন্তু সে-ভূমির কতটুকু খিল কতটুকু বাস্তু তাহা পরিষ্কার করিয়া কিছু বলা নাই। তবু দত্ত ও ক্রীত ভূমির যে-বিবরণ আমরা এই লিপিগুলিতে দেখি, তাহাতে মনে হয় খিলভূমির কথাই বলা হইতেছে অধিকাংশক্ষেত্রে। তাহা ছাড়া কৃষির প্রাধান্য সম্বন্ধে অন্য একটি অনুমান ও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূমির পরিমাণ সর্বত্রই ইঙ্গিত করা হইতেছে এমন মানদণ্ডে যাহা কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ, বা আঢকবাপ, উন্মান (উয়ান) এই সমস্ত মানই শস্য-সম্পর্কিত। এক কুল্য বীজ বপনের জন্য, এক দ্রোণ বা এক আঢক (বাঙলা, আঢ়া; পূর্বাঙলার অনেক স্থানে এখনও প্রচলিত) বীজ বপনের জন্য যতটুকু জমির প্রয়োজন তাহার পরিমাণই এক কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ অথবা আঢ়বাপ ভূমি এবং এই মানানুযায়ীই পঞ্চম হইতে মোটামুটি অষ্টম শতক পর্যন্ত সমস্ত ভূমির পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের তাম্রপট্টোলি[১৪] (একাদশ শতক) কিংবা শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা তাম্র পট্টোলিতে[১৫] ভূমির পরিমাণের মান হইতেছে হল, এবং হলই হইতেছে প্রধান কৃষিযন্ত্র। অবশ্য একথা সত্য যে আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভূমি ঠিক এই কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, উন্মান, হল ইত্যাদি মানদণ্ডে মাপা হইত

না ; তাহার জন্য অন্য মানদণ্ডের নির্দেশ, অর্থাৎ নল মানদণ্ডের নির্দেশ (অষ্টক নবকনলাভ্যাম্, ৮×৯ নল) দামোদরপুরের তৃতীয় পট্টোলিতে (৪৮২-৮৩ খৃ) দেখিতেছি ; তথাপি এই যে শস্যমান অথবা কৃষিযন্ত্র মানের সাহায্যে ভূমির পরিমাণের উল্লেখ ইহার মধ্যে কৃষিপ্রধান সমাজের স্মৃতি যে আছে তাহা অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত নয়।

ডাক ও খনার বচনগুলিও প্রাচীন বাঙ্‌লার কৃষি-প্রধান সমাজের অন্যতম প্রমাণ। যে-ভাষায় এখন আমরা এই বচনগুলি পাই, তাহা অর্বাচীন, সন্দেহ নাই। এগুলি প্রচলিত ছিল জনসাধারণের মুখে মুখে বংশপরম্পরায়। ভাষার অদল বদল হইয়া বর্ত্তমানে তাহা যে রূপ লইয়াছে, তাহা মধ্যযুগীয়। তবু এই বচনগুলি যে খুব প্রাচীন স্মৃতি বহন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন্ কোন্ ঋতুতে কি শস্য বুনিতে হইবে, কোন্ শস্যের জন্য কি প্রকার ভূমি, কি পরিমাণের বারিপাত প্রয়োজন ; বারিপাত ও খরাতপ নির্দেশ, বিভিন্ন শস্যের নাম ও রূপ, আবহাওয়া-তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, কৃষি-প্রধান সমাজের বিচিত্র ছবি, ইত্যাদি নানা খবর এই বচনগুলিতে পাওয়া যায়।

বাঙলাদেশ নদীমাতৃক, ইহার ভূমি নিম্ন এবং বারিপাত কৃষির পক্ষে অনুকূল ; এ-দেশের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে ; ইহার ভূমির উর্বরতা সম্বন্ধে চীন-পরিব্রাজক য়ুয়ান্ চোয়াঙের সাক্ষ্যও সেই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ ভাবে এ দেশের শস্যসম্ভার সম্বন্ধেও এই চীন পরিব্রাজকের দু'চার কথা বলিবার আছে। পূর্বভারতের যে কয়টি দেশে তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অন্ততঃ চারিটি বর্তমান বাঙ্‌লা ভাষাভাষী জনপদের সীমার ভিতর অবস্থিত—পুন্-ন-ফ-টন্-ন (পুণ্ড্রবর্দ্ধন), সন্-মো-ত-ট' (সমতট), তন্-মো-লিহ্-তি (তাম্রলিপ্তি) এবং ক-লো-ন-সু-ফ-ল-ন (কর্ণ সুবর্ণ)। তাহা ছাড়া আর একটি দেশেও তিনি গিয়াছিলেন, তাহার নাম ক-চু-ওয়েন্-কি'-লো (Watters) অথবা ক-ষেঙ্-কিয়ে-লো (Julien) ; ইহার ভারতীয় রূপ হইতেছে কজঙ্গল অথবা কজাঙ্গল। কানিংহাম সাহেব এই কজঙ্গলকে কাঁকজোল বা রাজমহলের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতে" এক কযঙ্গল রাজার উল্লেখ আছে ; কোন কোন বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থেও কজঙ্গলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড পুঁথিতে রাঢ়ীখণ্ডজাঙ্গল নামে এক দেশের উল্লেখ আছে। এই দেশ ভাগীরথীর পশ্চিমে, কীকট অর্থাৎ মগধ দেশের নিকটে ; এই দেশের ভিতরেই বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর ও বীরভূমি (বীরভূম), অজয় ও অন্যান্য নদী এবং ইহার তিন ভাগ জঙ্গল, এক ভাগ গ্রাম ও জনপদ, ইহার অধিকাংশ ভূমি উষর, স্বল্পভূমি উর্বর[১৬]। এই যে জঙ্গল প্রদেশ ইহাই ত য়ুয়ান্ চোয়াঙের কজঙ্গল বা কজাঙ্গল বলিয়া মনে হয়, রাঢ় দেশের উত্তর খণ্ডের জঙ্গলময় উষর ভূভাগ যাহা হয়ত রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং এই হিসাবে এই কযঙ্গল—কজঙ্গল—জাঙ্গল বর্তমান বাঙ্‌লা দেশেরই অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমার এই মন্তব্যের সমর্থন পাইতেছি ভট্টভবদেবের (ভুবনেশ্বর) লিপিতে[১৭] (একাদশ শতক)। ভবদেব উষর (অজল) ও জঙ্গলময় রাঢ় দেশের

কোনও গ্রামোপকণ্ঠে একটি জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছিলেন (রাঢ়ায়ামজলাসুজাঙ্গল পথগ্রামোপকণ্ঠস্থলীসীমাসু…)। এখানেও রাঢ় দেশের যে অংশের বিবরণ পাইতেছি তাহা অজল, অমুর্বর এবং জঙ্গলময়। এখন দেখা যাক্ য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ এই পাঁচটি দেশের শস্যসম্ভার সম্বন্ধে সাধারণভাবে কি বলিতেছেন[১৮]।

কজঙ্গল সম্বন্ধে তিনি বলেন, এদেশের শস্যসম্ভার ভাল। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের বর্দ্ধিষ্ণু জনসমষ্টি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং এ দেশের শস্যসম্ভার ফুল ফল যে সুপ্রচুর তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সমতট ছিল সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ; এ দেশের উৎপাদিত শস্য সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। তাম্রলিপ্ত ছিল সমুদ্রের এক খাড়ির উপরেই; এখানকার কৃষিকর্ম ভাল ছিল, ফলফুল ছিল প্রচুর। স্থলপথ ও জলপথ এখানে কেন্দ্রীকৃত হইয়াছিল বলিয়া নানা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি এখানে মজুত্ হইত এবং এখানকার অধিবাসীরা সেই হেতু প্রায় সকলেই বেশ সম্পন্ন ও বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। কর্ণসুবর্ণের লোকেরাও ছিল খুবই ধনী, এবং জনসংখ্যাও ছিল প্রচুর; কৃষিকর্ম ছিল নিয়মিত ঋতু অনুযায়ী, ফলফুল-সম্ভার ছিল সুপ্রচুর। দেখা যাইতেছে, য়ুয়ান্ চোয়াঙের দৃষ্টিও দেশের কৃষিপ্রাধান্যের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং সর্বত্রই তিনি উৎপন্ন শস্য-সম্ভারের উল্লেখই করিয়াছেন, এক সমতট ছাড়া। সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই দেশে স্বভাবতঃই কৃষিকর্মের অবস্থা হয়ত ভাল ছিল না। তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধির হেতু যে শুধু কৃষিকর্মই নয়, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই এই দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রতিও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

এইবার কৃষিজাত কি কি শস্য ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদির খবর আমরা জানি একে একে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথমেই প্রধান শস্য ধান্যের সহিত আমাদের পরিচয়। এই পরিচয়, আগেই বলিয়াছি, আমরা পাই খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে রচিত প্রাচীন করতোয়া-তীরবর্ত্তী মহাস্থানের শিলালিপিখণ্ডটি হইতে। ইহা একটি রাজকীয় আদেশ; রাজা অজ্ঞাত, এবং যে-স্থান হইতে এই আদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহার নামও অজ্ঞাত। তবে অক্ষর দেখিয়া শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় অনুমান করেন, এবং তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয় যে, আদেশটি দিয়াছিলেন কোনও মৌর্য সম্রাট্। আদেশটি দেওয়া হইতেছে পুন্দনগলের (পুণ্ড্রনগরের) মহামাত্রকে, এবং তাহাকে শাসনোল্লিখিত আদেশটি পালন করিতে বলা হইয়াছে। পুণ্ড্রনগরে ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে সংবঙ্গীয়দের (বাঙ্‌লার বিভিন্ন জনপদমণ্ডলের) মধ্যে কোনও দৈবদুর্বিপাকবশতঃ নিদারুণ দুর্গতি দেখা দিয়াছিল। এই দৈবদুর্বিপাক যে কি তাহা উল্লেখ করা নাই। এই দুর্গতি হইতে ত্রাণের উদ্দেশ্যে দুইটি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। প্রথমটি কি, তাহা হয়ত শিলাখণ্ডটির প্রথম লাইনে লেখা ছিল, কিন্তু ভাঙিয়া যাওয়াতে তাহা আর জানিবার উপায় নাই। তবে অনুমান করা হইয়াছে যে গণ্ডক মুদ্রায় কিছু অর্থ সংবঙ্গীয়দের নেতা (?) গলদনের হাতে দেওয়া হইয়াছিল

ঋণ হিসাবে। দ্বিতীয় উপায়ে রাজকীয় শস্যভাণ্ডার হইতে দুঃস্থ জনসাধারণকে ধান্য দেওয়া হইয়াছিল—খাইয়া বাঁচিবার জন্য, না বীজ হিসাবে, তাহা উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু এই ধান্য বিতরণও ঋণ হিসাবে। কারণ, এই আশার উল্লেখ লিপিখণ্ডটিতে আছে যে, রাজকীয় এই আদেশের ফলে সংবঙ্গীয়েরা বিপদ কাটাইয়া উঠিতে পারিবে, এবং জনসাধারণের মধ্যে আবার শস্য-সমৃদ্ধির প্রাচুর্য ফিরিয়া আসিলে (সু-অতিয়ায়িক [সি]) তখন গণ্ডক মুদ্রদ্বারা রাজকোষ (গণ্ড [কেহি] [ধানি] [য়ি] কেহি এস কোথা গালে কোসম [ভর]-[নীয়ে]) এবং ধান্যদ্বারা রাজকোঠাগার ভরিয়া দিতে হইবে। এই শিলাখণ্ড হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জনসাধারণের প্রধান উপজীব্যই ছিল ধান্য, দুর্গতি দুর্ভিক্ষের সময়ও এই ধান্য ঋণ গ্রহণই ছিল জীবনধারণের উপায়, এবং রাজাও সেই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং রাজ-কোঠাগারে দৈবদুর্বিপাক কাটাইবার জন্য ধান্যই সংগৃহীত হইত। এই বিপদে রাজা যে ধান বিনামূল্যে বিতরণ করেন নাই, ঋণ স্বরূপই দিয়াছিলেন, অর্থও যে ঋণ স্বরূপই দিয়াছিলেন, ইহা লক্ষ্যণীয়।

সর্ষপ যে অন্যতম উৎপন্ন শস্য ছিল তাহার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি; বপ্য-ঘোষবাট গ্রামের তাম্রপট্টোলিতে উল্লিখিত 'সর্ষপ-যানক' কথাটিতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ যে বাঙ্লার সর্বত্রই প্রচুর ফল-সম্ভারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উক্তি মাত্রই নয়; ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত রচিত তাম্র-পট্টোলিগুলিতে। আমি আগেই বলিয়াছি, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত রচিত লিপিগুলিতে ভূমিজাত দ্রব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু অষ্টম শতকে পাল-রাজত্বের আরম্ভের সূত্রপাত হইতেই এই উল্লেখ পাওয়া যায়। কি ভাবে তাহা পাওয়া যায় তাহা দেখা যাইতে পারে।

খালিমপুর তাম্রশাসনে দেখিতেছি, ধর্মপাল চারিটি গ্রাম দান করিতেছেন হট্টিকা তলপাটক (বাটক ?) সমেত, উৎপাদিত শস্যাদির কোন উল্লেখ নাই। দেবপালের মুঙ্গের শাসনে[১৯] দেখিতেছি, মোষিকা নামক একটি গ্রাম দান করা হইতেছে "স্বসীমা-তৃণযুতি-গোচর পর্যন্তঃ সতলঃ সোদ্দেশঃ সাম্র মধুকরঃ সজলস্থলঃ সমৎস্যঃ সতৃণঃ..."। যে-জমি দান করা হইতেছে তাহার উপর রাজা কোনও অধিকারই রাখিতেছেন না, শুধু ভূমির উপরকার স্বত্ব নয়, ভূমির নিম্নের স্বত্ব (সতলঃ), জলস্থলের স্বত্ব (সজলস্থলঃ সমৎস্যঃ), গাছগাছড়ার স্বত্ব সবই দান করিয়া দিতেছেন। তিনটি উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ এখানে আছে, আম্র, মহুয়া (মধুকঃ) ও মৎস্য। নারায়ণ পালের ভাগলপুর লিপিতেও[২০] অনুরূপ সংবাদই পাওয়া যায়, শুধু মৎস্যের উল্লেখ নাই। যাহাই হউক, মুঙ্গের ও ভাগলপুর লিপির দু'টি গ্রামই হয়ত বর্তমান বিহার প্রদেশে, কাজেই এই সাক্ষ্য হয়ত বাঙ্লা দেশের প্রতি প্রযোজ্য অনেকে নাও মনে করিতে পারেন। কিন্তু, দেখিতেছি, দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে প্রাপ্ত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসনে[২১] যে কুরটপল্লিকা গ্রাম দান করা হইতেছে,

তাহার উৎপন্ন দ্রব্যাদির উল্লেখ ঠিক পূর্বোক্ত ভাগলপুর লিপিরই অনুরূপ, এখানেও মৎস্যের উল্লেখ নাই, কিন্তু আম ও মহুয়ার উল্লেখ আছে। প্রথম মহীপাল দেবের রাজত্বকাল মোটামুটি একাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অথচ ইহার কিছু পূর্ববর্তী, অর্থাৎ দশম শতকের একটি শাসনে উৎপন্ন দ্রব্যাদির তালিকা অনুরূপ। কম্বোজরাজ নরপালদেবের ইর্দা তাম্রপট্টে[২২] বৃহৎ ছত্তিবন্না (যে গ্রামে খুব বড় একটি ছাতিম গাছ ছিল?) নামে একটি গ্রাম দানের উল্লেখ আছে। এই গ্রামটি বর্দ্ধমানভুক্তির দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের অন্তর্গত। দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর জেলার দাঁতন অথবা দান্তন। এই গ্রামটি দান করা হইতেছে সমস্ত অধিকার সমেত, যাহাকে দান করা হইতেছে তিনিই ইহার সবকিছু ভোগ করিবেন; বাস্তক্ষেত্র, জলাধার, গর্ত্ত, মার্গ (পথ), পতিত বা অনুর্বর জমি, জঞ্জাল ফেলিবার জায়গা বা আস্তাকুঁড় (আবষ্কর স্থান), লবণাকর, সহকার (আম) মধুক বৃক্ষের ফল ফুল, অন্যান্য গাছ গাছড়া, (বাস্তক্ষেত্র-জলাধার-গর্ত্ত-মার্গ-সমন্বিতঃ-সোষরাবষ্কর-স্থান-নিবীত-লবণাকরঃ-সহকার-মধুকাদি-তরুষণ্ডাদি-মণ্ডিতঃ), হাট, ঘাট, পার বা খেয়া ঘাট, (সহট্ট-ঘট্ট-সতর) ইত্যাদি সমস্তই তাহার ভোগ্য। ধান্য, ও অন্যান্য শস্য ছাড়া, আম্র-মধুক ছাড়া, এখানে আর একটি উৎপন্ন দ্রব্যের খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহা লবণ। মেদিনীপুর জেলার দান্তন সমুদ্রতীরবর্তী। জোয়ার যখন আসে, তখন সমুদ্র-তীরবর্তী অনেকস্থানেই নোনাজলে ভাসিয়া ডুবিয়া যায়; বড় বড় গর্ত করিয়া লোকে এখনও সেই জল ধরিয়া রাখে, পরে রৌদ্রে অথবা জ্বাল দিয়া শুকাইয়া লবণ তৈরী করে। এই প্রথা প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ প্রথম পাওয়া যায় ইর্দা লিপিটিতে। এই বড় বড় গর্তগুলিই শাসনোল্লিখিত লবণাকর। জল কিংবা তলের কিংবা পারঘাটের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া রাজা যে ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুযায়ী বা অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী ভূমি দান করিতেছেন বলিয়া দেখিতেছি তাহার অর্থ পরিষ্কার। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" দেখি, জল, স্থল, পারঘাট ইত্যাদির অধিকার রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত; পারঘাটের আয় রাজার, ভূমির উপরকার অধিকার প্রজার হইলেও নীচেকার অধিকার রাষ্ট্র কখনও ছাড়িয়া দেয় না। সেইজন্যই যেখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, সেখানে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই "অর্থশাস্ত্রে"ই দেখি লবণে রাষ্ট্রের অথবা রাজার একচেটিয়া অধিকার)। সেই একচেটিয়া অধিকারও ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, যেখানে রাজা ভূমিদান করিতেছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে[২৩] প্রাগ্-জ্যোতিষভুক্তির কামরূপ মণ্ডলের বাড়া বিষয়ে একটি গ্রামদানের উল্লেখ আছে; এই গ্রামটি দানের সর্ত্ত 'জল-স্থল-খিলারণ্য-বাট-গোবাট-সংযুক্তং'। পথ-গোপথের অধিকারও ছাড়া হইতেছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হইতেছে অরণ্যের উপর অধিকার ত্যাগ। অথচ কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" অরণ্য রাষ্ট্র-সম্পদ ও সম্পত্তি। এই অরণ্য-দানের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। কাঠ অর্থোৎপাদনের একটি প্রধান উপায়। মদন পাল দেবের মনহলি তাম্র-

পট্টে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির কোটিবর্ষবিষয়ের হলাবর্তমণ্ডলে যে গ্রাম দানের উল্লেখ আছে তাহাও দেখিতেছি সতলঃ ...সাম্রমধুকঃ সজলস্থলঃ-সগর্তোষর সঝাট-বিটপঃ...। পুণ্ড্র-বর্দ্ধনেও তাহা হইলে বিস্তৃত মহুয়ার চাষ ছিল! এই মহুয়া গাছের আয় দুই প্রকার —খাদ্য হিসাবে এবং মহুয়া-জাত আসব হইতে। মহুয়া-আসবের উল্লেখ কৌটিল্য ত বিশদভাবেই করিয়াছেন। স-ঝাট-বিটপও উল্লেখযোগ্য; বাঁশ অথবা অন্য গাছের ঝাড় ও অন্যান্য বড় গাছও একরকমের অর্থাগমের উপায়। সাধারণ-লোকে যে বাঁশের চাঁচের বেড়া দিয়াই ঘর-বাড়ী বাঁধিত, (খুঁটিও ব্যবহার করিত নিশ্চয়ই), তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ে", শবরীপাদের একটি চর্যাপদে—"চারিপাসেঁ ছাইলারে দিয়া চঞ্চালী।" সংস্কৃত অনুবাদ, চতুর্দিক্ষু বংশ চঞ্চারিকয়া প্রকৃষ্টরূপেন বেষ্টিতম্। চঞ্চালী=চঞ্চারিকা যে আমাদের বাঁশের চাঁচারি এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি? আর বাঁশের ব্যবসায় ত এখনও বাংলা দেশে সর্বত্র সুপরিচিত।

উৎপন্ন দ্রব্যাদির, অবশ্যই ধান্য ও অন্য শস্য ছাড়া,[২৪] বিস্তৃততর উল্লেখ আমরা পাই পরবর্তী লিপিগুলিতে। একাদশ শতকের শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসনে[২৫] পাই "সতলা।...সাম্রপনসা। সগুবাক নালিকেরা সলবণা সজলস্থলা...। দ্বাদশ শতকের ভোজ-বর্মণের বেলব লিপিতে[২৬] পাই "সাম্রপনসা সগুবাকনারিকেরা সলবণা সজলস্থলা সগর্ত্তোষরা।" বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে[২৭] উৎপন্ন দ্রব্যাদির খবর পাওয়া যায় না; এই রাজারই বারাকপুর শাসনেও[২৮] তাহাই, কিন্তু শেষোক্তটিতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির খাড়িমণ্ডলের (সমুদ্র নিকটবর্তী ২৪ পরগণায়) যে গ্রামে চারপাটক ভূমিদানের উল্লেখ আছে তাহার বার্ষিক আয় ছিল দুই শত কপর্দক পুরাণ। চার কড়িতে এক গণ্ডা, ষোল গণ্ডায় এক কপর্দক পুরাণ। বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রপট্টে[২৯] বর্দ্ধমানভুক্তির উত্তর-রাঢ়মণ্ডলের স্বল্পদক্ষিণবীথির অন্তর্গত বাল্লহিঠ্ঠা গ্রামে কিছু ভূমিদানের উল্লেখ আছে, এই ভূমির পরিমাণ বৃষভশঙ্কর অর্থাৎ বিজয়সেনীয় নলের মাপে ৪০ উন্মান ৩ কাক। ইহার বার্ষিক আয় ৫০০ কপর্দকপুরাণ এবং এই আয়ের অন্ততঃ কিয়দংশ পাওয়া যাইতেছে ভূমি-সম্বদ্ধ 'ঝাটবিটপ গর্তোষর জলস্থল গুবাক নারিকেল' হইতে। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি শাসনেও[৩০] অন্যতম আয়ের পথ ঝাটবিটপ ও গুবাক নারিকেল। দত্ত ভূমি পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বেলাহিষ্ঠী গ্রামে; ভূমির পরিমাণ ১২০ আঢাবাপ, ৫ উন্মান; বার্ষিক আয় ১৫০ কপর্দকপুরাণ। এই নৃপতিরই মাধাইনগর লিপিতে[৩১] দত্ত ভূমি বরেন্দ্রীর অন্তর্গত কান্তাপুরের নিকট দাপনিয়াপাটক গ্রাম, গ্রামটির পরিমাণ ১০০ ভূখাড়ি, ৯১ খাড়িকা, বার্ষিক আয় ১৬৮ (?) কপর্দকপুরাণ (কপর্দ্দকাষ্টষষ্টিপুরাণাধিকশত=কপর্দ্দকাষ্টষষ্ঠ্যাধিক-পুরাণশত)। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর শাসনেও[৩২] অন্যতম আয়ের পথ ঝাটবিটপ এবং গুবাক নারিকেল। দত্ত ভূমি বর্দ্ধমানভুক্তির পশ্চিম খাটিকার বেত্তড্ডচতুরক (বেতড়) অন্তর্গত বিড্ডারশাসন গ্রাম; পূর্বে গঙ্গা। ভূমির পরিমাণ ৬০ দ্রোণ, ১৭ উন্মান; বার্ষিক আয় ৯০০ পুরাণ, দ্রোণ প্রতি ১৫ পুরাণ। আনুলিয়া শাসনে[৩৩] দত্ত

ভূমি পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির ব্যাঘ্রতটীর মাথরণ্ডিয়া-খণ্ডক্ষেত্র ; ভূমির পরিমাণ ১ পাটক, ৯ দ্রোণ, এক আঢ়াবাপ, ৩৭ উন্মান, এবং ১ কাকিনিকা ; বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ১০০ কপর্দক পুরাণ, এবং আয়ের অন্যতম উপকরণ ঝাটবিটপ ও গুবাক নারিকেল। সুন্দরবন শাসনে[৩৪] দত্ত ভূমির পরিমাণ ৩ ভূদ্রোণ, ১ খাড়িকা (?), ২৩ উন্মান, এবং ২॥০ কাকিনি ; বার্ষিক আয় ৫০ পুরাণ ; ভূমি পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির খাড়িমণ্ডলের কান্তল্লপুরচতুরকের মণ্ডল গ্রামে। আয়ের অন্যতম উপকরণ এ ক্ষেত্রেও ঝাটবিটপ ও গুবাক নারিকেল। ত্রয়োদশ শতকে বিশ্বরূপ সেন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ শাসনদ্বারা[৩৫] নানা তিথিপর্ব উপলক্ষে পুণ্ডবর্দ্ধনভুক্তির সমুদ্রতীরশায়ী নিম্ন প্রদেশে বিভিন্ন গ্রামে ১১টি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন। দুইটি ভূখণ্ড দিয়াছিলেন বঙ্গের নাব্য (নৌকা চলাচল যোগ্য) খণ্ডে রামসিদ্ধি পাটকে ; ভূমির পরিমাণ ৬৭¾ উন্মান, আয় ১০০ পুরাণ, এই আয়ের প্রায় এক পঞ্চমাংশ (১৯‌৳) পানের বরজ হইতে। এই নাব্যখণ্ডেই বিনয়তিলক গ্রামে দত্ত ২৫ উদান (উন্মান) ভূমির আয় ছিল ৬০ পুরাণ ; মধুক্ষীরকা আবৃত্তির নবসংগ্রহচতুরকে আজিকুল পাটকে দত্ত ভূমির পরিমাণ ১৬৫ উন্মান, আয় ১৪০ পুরাণ ; বিক্রমপুরের লাউহণ্ডাচতুরকের দেউলহস্তী গ্রামে দত্ত পাঁচটি ভূখণ্ডের পরিমাণ ৪২ উন্মান, আয় ১০০ পুরাণ ; ?ন্দ্রদ্বীপের ঘাঘরকাট্টি পাটক ও পাতিলাদিবীক গ্রামে দত্ত ভূমির পরিমাণ ৩৬¾ উন্মান, আয় ১০০ পুরাণ। মোট দত্ত ভূমির পরিমাণ ছিল ৩৩৬½ উন্মান, আয় ছিল ৫০০ পুরাণ। এই ভূমি নালভূমি অর্থাৎ কৃষিভূমি ও বাস্তুভূমি দুইই ছিল। এবং আয়ের প্রধান উল্লিখিত উপকরণ ছিল পানের বরজ ও গুবাক নারিকেল। রামসিদ্ধি পাটকে যে ৬৭¾ উন্মান ভূমি দেওয়া হইয়াছিল তাহার বার্ষিক আয় ছিল ১০০ পুরাণ, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; তাহার প্রায় এক পঞ্চমাংশ (১৯‌৳=১৯ পুরাণ ১১ গণ্ডা) আয় হইত শুধু পানের বরজ হইতে। বাকী চারি অংশ পরিমাণ আয় যে অন্যান্য উৎপন্ন শস্যাদি হইতে এবং অন্যান্য উপায়ে হইত তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু সে সবের উল্লেখ নাই। অন্যান্য লিপিতেও এইরূপই ; ধান্য ও অন্যান্য শস্য, মৎস্য ইত্যাদি উপকরণ অনুল্লিখিতই থাকিত। বিশ্বরূপ তাঁহার মদনপাড়া তাম্রপট্টোলিদ্বারা[৩৬] পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির 'বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে' পিঞ্জোকাষ্ঠি গ্রামের আরও দুইটি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন ; এই দুই খণ্ড ভূমির আয় ছিল ৬২৭ পুরাণ, এবং প্রধান উল্লিখিত উপকরণ এক্ষেত্রেও গুবাক নারিকেল। বিশ্বরূপের ভ্রাতা কেশব সেন এই 'বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে'ই তলপাড়াপাটক নামে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন ; এই গ্রামটির মূল্য রাজসরকারে নির্দ্ধারিত ছিল ২০০ শত দ্রম্ম (?)। এখানেও গুবাক নারিকেল হইতেছে অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ; এই গুবাক নারিকেল গাছ ইত্যাদি সহই যে গ্রামটিকে দান করা হইতেছে তাহাই নয়, দান-গ্রহয়িতা নীতিপাঠক ঈশ্বর-দেবশর্ম্মণকে বলা হইতেছে তিনি যেন মন্দির ও পুষ্করিণী ইত্যাদি করাইয়া (দেবকুল পুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা) এবং গুবাক নারিকেল গাছ ইত্যাদি লাগাইয়া (গুবাক-নারিকেলাদিকং লগ গাবয়িত্বা) এই গ্রাম যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ভোগ করিতে থাকেন। গুবাক

ও নারিকেলই যে ধান্য ইত্যাদি শস্যের পরেই এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল, এই নির্দেশই তাহার প্রমাণ। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে জনৈক রাজা দামোদর পৃথ্বীধর নামক এক ব্রাহ্মণকে ৫ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তিন দ্রোণ ডাম্বরডাম গ্রামে, ২ দ্রোণ কেটঙ্গপাল গ্রামে। ভূমির আয় বা উৎপন্ন দ্রব্যাদির কোনও খবরই চট্টগ্রামে প্রাপ্ত এই শাসনে উল্লেখ নাই, তবে ডাম্বরডাম গ্রামের দক্ষিণ সীমায় লবণোৎসবাশ্রমসম্বাধা বাটীর উল্লেখ হইতে মনে হয় এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল লবণ, এবং লবণ উত্তোলন, অথবা এই ধরণের লবণ-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে উৎসবও হইত, যেমন নবান্ন উপলক্ষে হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী দেশে ইহা কিছু অসম্ভবও নহে। দনুজ মাধব দশরথদেব সেনরাজবংশ অবসানের পর ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে পূর্ব-বাঙ্‌লার রাজা হইয়াছিলেন। তিনি একবার অনেক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে পৃথক পৃথক ভাবে অনেকগুলি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন। এই ভূখণ্ডগুলির সমগ্র আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০০ পুরাণ। বিক্রমপুর পরগণায় আদাবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত এক তাম্রপট্টে[৩৭] ইহার বিস্তৃত খবর পাওয়া যায়; দত্ত ভূখণ্ডগুলি আদাবাড়ীতে এবং আদাবাড়ীরই নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামে, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিশেষ উল্লেখ তাহাতে নাই।

অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সমস্ত লেখমালাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল, ধান্য এবং অন্যান্য শস্য ছাড়া প্রাচীন বাঙ্‌লার প্রধান ভূমি ও কৃষিজাত দ্রব্য হইতেছে, আম্র অথবা সহকার, মধুক অর্থাৎ মহুয়া, পনস অর্থাৎ কাঁঠাল, গুবাক অর্থাৎ সুপারি, নারিকেল, পান, মৎস্য ও লবণ। আম ত বাঙ্‌লা দেশের সর্বত্রই জন্মায়, কমবেশী এই মাত্র; এই জন্যই প্রায় সব ক'টি লিপিতেই আমের উল্লেখ আছেই। মহুয়ার উল্লেখ যে ক'টি লিপিতে আছে প্রত্যেকটিরই স্থানের ইঙ্গিত উত্তর বঙ্গে, শুধু ইর্‌দা তাম্রপট্টের ইঙ্গিত মেদিনীপুর জেলার দাঁতনের দিকে। মহুয়ার চাষ এই সব অঞ্চলে বোধ হয় তখন ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। পনস অর্থাৎ কাঁটালের উল্লেখের ইঙ্গিত পাইতেছি বিশেষ-ভাবে পূর্ববাঙ্‌লায় ঢাকা অঞ্চলে। য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ কিন্তু বলিতেছেন (৭ম শতক), কাঁটাল খুব প্রচুর জন্মাইত পুণ্ড্রবর্দ্ধনে, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে, এবং সেখানে এই ফলের আদরও ছিল খুব। গুবাক ও নারিকেল ত এখনও প্রচুরতর পরিমাণে জন্মায় বাঙ্‌লার গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথী-করতোয়া ও বিশেষভাবে সমুদ্রতীর-নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে; এবং আশ্চর্যের বিষয় এই, লেখমালার ইঙ্গিতও তাই। উত্তর রাঢ়ে, বরেন্দ্রীতে গুবাক নারিকেলের উল্লেখ পাইতেছি, সন্দেহ নাই; বাঙ্‌লাদেশের সর্বত্রই ত সুপারি নারিকেল জন্মায়, তবু অধিক উল্লেখ পাই বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে, সুন্দরবনের খাড়িমণ্ডলে, বঙ্গের নাব্য অর্থাৎ নিম্ন জলাভূমি অঞ্চলে, ঢাকা জেলার পদ্মাতীরবর্তী ভূমি অঞ্চলে। খড়্গাবংশীয় রাজা দেবখড়্গের (অষ্টম শতক) আশ্রফপুর তাম্র-পট্টোলি (২নং)[৩৮] দ্বারা তলপাটক গ্রামে ½ পাটক ভূমি দান করা হইতেছে, এবং এই ভূমিখণ্ডে যে দুইটি সুপারি বাগান (গুবাক বাস্তুদ্বয়েন সহ) আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে সুপারির আদর কতটুকু ছিল

ধনসম্বল হিসাবে। পানের বরজের উল্লেখ যে পাই, সেও বঙ্গের নাব্য প্রদেশে; অন্যান্য স্থানেও হইত সন্দেহ নাই। মৎস্যের সবিশেষ উল্লেখ বাঙ্‌লার কোনও লিপি অথবা শাসনে নাই, কিন্তু যখনই ভূমি দান করা হইয়াছে, সজল অর্থাৎ জলাধার, খাল, বিল, প্রণুল্লী, নালা পুষ্করিণী ইত্যাদির অধিকার সমেতই দান করা হইয়াছে; অষ্টম শতক-পরবর্তী শাসনগুলিতে সর্বত্রই তাহার উল্লেখও আছে। এই যে 'সজল' ভূমি দান, ইহা 'সমৎস্য' দান, এই অনুমান কিন্তু অসঙ্গত নয়। তাহা ছাড়া এই নদনদীবহুল খালবিলাকীর্ণ বাঙ্‌লাদেশে মৎস্য যে একটি প্রধান সামাজিক ধনসম্পদ্ প্রাচীন কালেও ছিল, তাহাও সহজেই অনুমেয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অরণ্য এবং বহু ক্ষেত্রেই ঝাটবিটপ, তৃণযূত্যাদি সহ ভূমি দান করা হইয়াছে; ইহার আয়ও কম ছিল না। ঝাট অথবা ঝাড় আমার ত বাঁশের ঝাঁড় বলিয়াই সন্দেহ হয়, এবং অরণ্য ও বিটপ যে কাঠের কাঁচা মাল বা raw material, তাহাও সুস্পষ্ট। বাঁশ ও কাঠ এখনও পর্যন্ত বাঙ্‌লাদেশের অন্যতম ধনসম্বল। লবণ ঠিক কৃষিজাত অথবা ভূমিজাত দ্রব্য না হইলেও এই সঙ্গেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ কথা অনেকেই জানেন, বাঙ্‌লার সমুদ্রতীরের নিম্নভূমিগুলিতে কিংবা পদ্মার উজান বাহিয়া জোয়ারের জল সামুদ্রিক লবণ বহন করিয়া আনে। এই অঞ্চলের লোকেরা কি করিয়া লবণ প্রস্তুত করে, তাহা আগেই বলিয়াছি। সেই জন্যই দেখা যাইবে, উল্লিখিত শাসনগুলিতে যেখানে 'সলবণ' ভূমি দান করা হইতেছে, সেই ভূমি সর্বদাই সমুদ্রতীরবর্তী নিম্নভূমিতে অথবা পদ্মার তীরে তীরে—ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জের পদ্মাতীরে, মেদিনীপুর জেলার দাঁতনে, চট্টগ্রামে। বিক্রমপুরে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা শাসনে[৩৯] যে লোনিয়াজোড়া-প্রস্তরের উল্লেখ আছে, তাহা যে লবণের গর্তের মাঠ, তাহা ত বোধ হয় সহজেই অনুমান করা চলে। ইহাও বিক্রমপুর অঞ্চলে।

এই সব ছাড়া আরও কিছু কিছু ভূমিজাত অথবা বৃহত্তর অর্থে কৃষি-সম্পর্কিত দ্রব্যাদির খবর ইতস্ততঃ অনুসন্ধানে জানা যায়। যেমন বিদ্যাপতি তাঁহার "কীর্তিকৌমুদী" গ্রন্থে গৌড় দেশকে "আজ্যসার গৌড়" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। আজ্য অর্থে ঘৃত, আজ্য বা ঘৃত যে গৌড় দেশের শ্রেষ্ঠ বস্তু, সেই গৌড় হইল আজ্যসার গৌড়। তাহাকে রাজা মোদকের মতন করতলগত করিলেন[৪০]। চতুর্দশ শতকের অপভ্রংশ ভাষায় রচিত "প্রাকৃত পৈঙ্গল" গ্রন্থের একটি পদে প্রাকৃত বাঙালীসুলভ যে আহার্য-বর্ণনা আছে, তাহাতে কলাপাতায় ওগরা ভাত ও নালিতা শাক এবং মৌরলা মাছের সঙ্গে সঙ্গে গরম ঘৃত ও দুগ্ধের উল্লেখ আছে[৪১]। রাজশেখর তাঁহার "কাব্য-মীমাংসা" গ্রন্থে পূর্বদেশে ১৬টি জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—অঙ্গ, কলিঙ্গ, কোসল, তোসল, উৎকল, মগধ, মুদ্গর (মুদ্গগিরি — মুঙ্গের), বিদেহ, নেপাল, পুণ্ড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, তাম্রলিপ্তক, মলদ, মল্লবর্তক, সুহ্ম ও ব্রহ্মোত্তর। এই ষোলটি জনপদের উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষুদ্র একটি তালিকাও তিনি দিয়াছেন; যথা,—লবলী, গ্রন্থিপর্ণক, অগুরু, দ্রাক্ষা, কস্তুরিকা[৪২]। এই তালিকা রাজশেখর কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, বলা শক্ত; কিন্তু এ কথা বুঝা শক্ত নয় যে, তিনি গন্ধদ্রব্য এবং আয়ুর্বেদীয় উপকরণের একটি ক্ষুদ্র তালিকা মাত্র দিয়াছেন।

এই তালিকায় দ্রাক্ষা দ্রব্যটি সন্দেহজনক। যে কয়টি দেশের নাম তিনি করিয়াছেন কোথাও দ্রাক্ষা জন্মান প্রায় সম্ভব নয় বলিলেই চলে। আমার মনে হয়, দ্রব্যটি হইবে লাক্ষা; এটি লিপিকর-প্রমাদ, অশুদ্ধ পাঠ। দ্রাক্ষা হয় না বটে, কিন্তু পূর্ব্বভারতের অনেক স্থানে লাক্ষা জন্মায়। এই ষোলটি জনপদের চারিটি বর্ত্তমান বাঙ্‌লা দেশে; যথা,—পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক, সুহ্ম ও ব্রহ্মোত্তর। লাক্ষা রাঢ়দেশে ও উত্তরবঙ্গে বা বরেন্দ্রভূমিতে এখনও জন্মায়। অগুরু বাংলা দেশে কোথাও জন্মায় কি না, জানি না; তবে কামরূপের নানা জায়গায় জন্মায়, তাহার প্রমাণ পাইতেছি কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" ও তাহার টীকায়। তবে ইব্‌ন্ খুর্দ্দদ্‌বা নামে একজন আরব ভৌগোলিক (দশম শতক) রহ্‌মি দেশে (রহন্=আরাকান্) অগুরু কাষ্ঠ জন্মায়, এ কথা বলিতেছেন। কস্তুরী বা কস্তুরিকা নেপালে হিমালয়ের পাদদেশে হয় ত পাওয়া যাইত, পূর্বদেশের অন্য কোনও জনপদে কস্তুরীমৃগের বিচরণস্থান ছিল বলিয়া জানি না, তবে কস্তুরিকা নামে একপ্রকার ভৈষজ্য আছে; রাজশেখর তাহারও ইঙ্গিত করিয়া থাকিতে পারেন।

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে"র টীকাকার বাঙ্‌লা দেশের একটি আকরজ দ্রব্যের খবর দিতেছেন। কৌটিল্য যে অধ্যায়ে মণিরত্নের খবর বলিতেছেন, সেই অধ্যায়ে হীরামণির উল্লেখ আছে। টীকাকার এই হীরামণির খনি কোথায় কোথায় ছিল, তাহার একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন; এই তালিকার দুইটি জনপদ নিঃসন্দেহে বাঙ্‌লা দেশে, তাহাদের নাম, টীকাকারের ভাষায়—পৌণ্ড্রক এবং ত্রিপুর (=ত্রিপুরা)[৪৩]। আর একটি আকরজ দ্রব্যের উল্লেখও "অর্থশাস্ত্রে" দেখা যায়, গৌড়িক নামক একপ্রকার খনিজ রৌপ্যের নাম তিনি করিয়াছেন, এবং তাহা যে গৌড়দেশোৎপন্ন, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। টীকাকার বলিতেছেন, এই রৌপ্যের রঙ্‌ অগুরুফুলের মতন[৪৪]।

আর একটি খনিজ দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় কতকটা অর্বাচীন একটি গ্রন্থে—"ভবিষ্য পুরাণে"। এই গ্রন্থ কতটা প্রাচীন এবং ইহার ব্রহ্মখণ্ড প্রক্ষিপ্ত, না মূল গ্রন্থের সমসাময়িক, বলা কঠিন। এ কথা সত্য যে, ইহা খুব প্রাচীন নয়, এবং আমাদের বিষয়ের সমসাময়িক প্রমাণও হয় ত নয়; তবে মধ্যযুগের আদিপর্বের রচনা বলিয়া অনুমান হয়। ইহার ব্রহ্মখণ্ডে রাঢ়দেশের জঙ্গল-বিভাগের বিবরণে আছে :—

ত্রিভাগজাঙ্গলং তত্র গ্রামশ্চৈবৈকভাগকঃ।
স্বল্পা ভূমিরুর্বরা চ বহুলা চোষরা মতাঃ॥
রারীখণ্ডজাঙ্গলে চ লৌহধাতোঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
আকরো ভবিতা তত্র কলিকালে বিশেষতঃ॥[৪৫]

এখানে রাঢ়দেশের জঙ্গলপ্রদেশে লৌহখনির উল্লেখ আমরা পাইতেছি।

বাঙলা দেশের রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ও সংস্থাপনার মধ্যে হস্তীর একটি প্রধান স্থান ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে পাই, Prasioi=প্রাচ্য ও Gangeridae=গঙ্গারাষ্ট্রের সম্রাট্ Agrammes বা উগ্রসৈন্যের সামরিক শক্তি অনেকটা হস্তীর উপর নির্ভর করিত।

পাল ও সেন-রাজাদের হস্তী, অশ্ব ও নৌবল লইয়াই ছিল সামরিক শক্তি। এই হস্তী আসিত কোথা হইতে? কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" আছে, কলিঙ্গ, অঙ্গ, করূষ এবং পূর্বদেশীয় হস্তীই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ[৪৬]। এই পূর্বদেশ বলিতে কৌটিল্য বাঙলাদেশ, বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের পার্বত্য অঞ্চলের কথা বলিতেছেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এখনও তো গারো পাহাড় অঞ্চল হাতীর জায়গা। আর এই বাঙলাদেশেই ত পরবর্তী কালে হাতী ধরার এবং হস্তী-আয়ুর্বেদ নামে এক বিশেষ বিদ্যা ও শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, সে কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বহু দিন আগেই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্র দেশ যে হাতীর জন্য বিখ্যাত ছিল, তাহা মেগাস্থিনিসের বিবরণ পড়িলেও বুঝা যায়।

শিল্পজাত দ্রব্যাদির কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই বলিতে হয় বস্ত্রশিল্পের কথা। বাঙলা দেশের বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্বেই দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং ইহাই যে এদেশের প্রধান শিল্প ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে", Periplus of the Erythrean Sea নামক গ্রন্থে, আরব, চীন ও ইতালীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের বৃত্তান্তের মধ্যে। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে"র সাক্ষ্যই প্রথম উদ্ধৃত করা যাক। কৌটিল্য বলিতেছেন, বঙ্গদেশের (বাঙ্গক) দুকূল (পশম বস্ত্র ?) খুব নরম ও সাদা, এবং পুণ্ড্রদেশের (পৌণ্ড্রক) দুকূল শ্যামবর্ণ এবং মণি যেমন দেখিতে পেলব, ঠিক তেমন পেলব। টীকাকার যোজনা করিতেছেন, দুকূল বস্ত্র হইতেছে খুব সূক্ষ্ম, এবং ক্ষৌম বস্ত্র হইতেছে একটু মোটা। পত্রোর্ণ (জাত) বস্ত্র মগধ (মাগধিকা), সুবর্ণকুড্যক (সৌবর্ণ্য কুড্যকা) অর্থাৎ কামরূপ এবং পুণ্ড্রদেশে (পৌণ্ড্রিকা) উৎপন্ন হইত। পত্রোর্ণজাত বস্ত্র বোধ হয় এণ্ডি ও মুগাজাতীয় বস্ত্র (পত্র হইতে যাহার উর্ণ=পত্রোর্ণ ?)। পুণ্ড্র দেশে যে শুধু দুকূল ও পত্রোর্ণ বস্ত্র উৎপন্ন হইত, তাহাই নয়, মোটা ক্ষৌম বস্ত্রও উৎপন্ন হইত এই দেশে, কৌটিল্য সে কথাও বলিতেছেন। শ্রেষ্ঠ কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হইত মধুরা (Madura), অপরান্ত, কলিঙ্গ, কাশি, বঙ্গ, বৎস এবং মহিষ জনপদে। বঙ্গে শ্বেতস্নিগ্ধ দুকূল যেমন উৎপন্ন হইত, তেমনই শ্রেষ্ঠ কার্পাসবস্ত্রেরও অন্যতম উৎপত্তিস্থল ছিল এই দেশ[৪৭]। বঙ্গে ও পুণ্ড্রে প্রাচীন কালে তাহা হইলে চারিপ্রকার বস্ত্রশিল্প ছিল,—দুকূল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাস। প্রাচীন বাঙলার এই সম্পদের কথা গ্রীক ঐতিহাসিকেরা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার রপ্তানীর উল্লেখ পাওয়া যায় Periplus of the Erythrean Sea নামক গ্রন্থে। Schoff'র ইংরেজী অনুবাদটুকু সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি এই জন্য যে, এই উপলক্ষ্যে আমাদের দেশের অন্যান্য রপ্তানী দ্রব্যেরও কিছু কিছু খবর পাওয়া যাইবে। হিমালয়ের সানুদেশে পার্বত্য অসভ্য কিরাত জাতিদের উল্লেখের পরেই বলা হইতেছে :

"After these, the course turns towards the east again, and sailing with the ocean to the right and the shore remaining beyond to the left, Ganges comes into view, and

near it the very last land towards the east, Chryse. There is a river near it called the Ganges. . . On its bank is a market town which has the same name as the river Ganges. Through this place are brought *malabathrum* and Gangetic *spikenard* and *pearls* and *muslins of the finest sorts,* which are called Gangetic. It is said that there are gold-mines near these places, and there is a gold coin which is called *caltis*. . ." ৪৮

এই সমুদ্রতীরবর্তী গঙ্গাবিধৌত দেশ যে বাঙলা দেশ, তাহাও সুস্পষ্ট। এই দেশকেই গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলিয়াছেন গঙ্গারাষ্ট্র বা Gangaridae. এই গঙ্গা-বন্দরের (বোধ হয় তাম্রলিপ্তি) রপ্তানী দ্রব্যগুলির প্রথমই পাইতেছি malabathrum বা তেজপাতা। Ptolemy বলেন, kirrhadae বা কিরাত দেশেই সব চেয়ে ভাল তেজপাতা উৎপন্ন হইত। উত্তর-বঙ্গের কোনও স্থানে, শ্রীহট্টে এবং আসামের কোন কোনও জায়গায়, সাধারণভাবে পূর্ব-হিমালয়ের পার্বত্য জনপদগুলিতে এখনও প্রচুর তেজপাতা উৎপন্ন হয়, এবং তাহার ব্যবসাও খুব বিস্তৃত। ইহার পরেই দেখিতেছি, গাঙ্গেয় পিপ্পলির উল্লেখ; ইহারও উৎপত্তিস্থল বোধ হয় ছিল—বাঙলার উত্তরের পার্বত্য সানুদেশ। রোমদেশীয় বণিকেরা Nelcynda হইতে যে প্রচুর পিপ্পলি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে লইয়া যাইতেন, তাহার অধিকাংশই যে এই গঙ্গা-বন্দর হইতেই যাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু কিছু মালবার অঞ্চল হইতেও যাইত, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের পিপ্পলি (গ্রীক, পেপেরি >অধুনা pepper) গঙ্গা-বন্দরের পিপ্পলির মতন এত বড় বা ভাল হইত না। এই পিপ্পলির ব্যবসায়ে দেশের প্রচুর অর্থাগম হইত, সে কথা ব্যবসা-বাণিজ্য আলোচনার সময় আমরা দেখিব। পিপ্পলির পরেই পাইতেছি, মুক্তার উল্লেখ। এই মুক্তা যে গাঙ্গেয় মুক্তা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, এবং খুব ভাল মুক্তা না হইলেও ইহারও কিছু কিছু পশ্চিম এসিয়ায়, ইজিপ্টে, গ্রীসে, রোমে রপ্তানী হইত। কিন্তু সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ রপ্তানী দ্রব্য হইতেছে Gangetic muslin অর্থাৎ গাঙ্গিতিকী সূক্ষ্মতম বস্ত্র-সম্ভার। সর্বশেষ উল্লেখ হইতেছে স্বর্ণখনির। Schoff সাহেব অনুমান করেন, এই স্বর্ণ আসিত গ্রীক Erannaboas, সং হিরণ্যবাহ, বর্তমান শোণ নদ বাহিয়া। কিন্তু Herodotus হইতে আরম্ভ করিয়া প্লিনি পর্যন্ত তিব্বতের যে, "Ant gold"র কথা বলিয়াছেন, Periplusএ যে তাহার উল্লেখ নাই, সে-কথাই বা কে বলিবে? কিন্তু এ দুয়ের কোনওটিই বাঙলা দেশে নয়। বহু দিন পরে টেভারনিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে কিন্তু পাইতেছি, আসাম ও উত্তর-ব্রহ্মের নদী বাহিয়া কিছু কিছু সোনা ত্রিপুরাদেশের ভিতর দিয়া বাঙলায় আসিত। এই সোনার পরিমাণ ছিল যথেষ্ট, যদিও এই সোনার স্বরূপ খুব উৎকৃষ্ট ছিল না। ত্রিপুরার যে-সব বণিক্ ঢাকায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তাঁহারা টুক্‌রা টুক্‌রা সোনার পরিবর্তে লইয়া যাইতেন প্রবাল, অয়স্কান্ত মণি (yellow amber), কূর্মাবরণের এবং সামুদ্রিক শঙ্খের বালা।

যাহা হউক, কার্পাস বস্ত্র ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ "অর্থশাস্ত্র" বা Periplus ছাড়াও অন্যত্র অনেক জায়গায় আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইব্‌ন্ খুর্দদ্‌বা নামক আরব ভৌগোলিকের (দশম শতক) নাম করা যাইতে পারে। ইনি রহমি বা রহ্‌ম

নামে একটি দেশের নাম করিতেছেন: এই রহমি বা রহ্ম দেশকে Elliot সাহেব মোটামুটি বঙ্গ দেশের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন (Elliot and Dawson, Hist. of India as told by its own historians, Vol. 1. p. 361)। আমার মনে হয়, Elliot সাহেবের এই অনুমান যথার্থ নয়; রহ্মি বা রহম্ প্রাচীন আরাকান (রহ্ম্=রহন্=রখ্ন্=আরাকান)। যাহা হউক, ইব্ন খুর্দদবা বলিতেছেন, "জলপথে জাহাজের সাহায্যে রহ্মি দেশের রাজা অন্যান্য দেশের রাজাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করেন। তাঁহার পাঁচ হাজার হাতী আছে। এবং তাঁহার দেশে কার্পাস বস্ত্র এবং অগুরু কাঠ উৎপন্ন হয়।" ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে চীন-পরিব্রাজক চাও-জু-কুয়া পিং-কলো বা বাঙলা দেশ সম্বন্ধে বলিতেছেন, এদেশে খুব ভাল দুমুখো তলোয়ার তৈরী হয়, এবং কার্পাস এবং অন্যান্য বস্ত্র উৎপন্ন হয়[৪৯]। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে (১২৯০) মার্কো পোলো গুজরাট, কাম্বে, তেলিঙ্গানা, মালাবার ও বঙ্গদেশে কার্পাস উৎপাদন ও কার্পাস বস্ত্রশিল্পের কথা বলিয়াছেন। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, বাঙলা দেশের লোকেরা প্রচুর কার্পাস উৎপাদন করে, এবং তাহাদের কার্পাসের ব্যবসা ছিল খুবই সমৃদ্ধ[৫০]।

কার্পাস সম্বন্ধে একটু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়"-গ্রন্থ হইতেও। এই গ্রন্থ সহজিয়া গুহ্যসাধনার আনন্দ-সঙ্গীত; ইহার অনেক পদের অর্থ সুস্পষ্ট নয়। তথাপি নানা রাগরাগিণীর এই গানগুলি যে সাধনার আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, এ কথা সহজেই বুঝা যায়। এই গ্রন্থের শবরপাদের একটি পদে আছে:—"হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা। সুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা॥ তইলা বাড়ীর পাসেঁর জোহ্না বাড়ী উএলা। ফিটেলি অন্ধ্যারি রে আকাশ ফুলিআ॥" ইহার প্রথম দুই লাইনের তিব্বতী অনুবাদ হইতে প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয় সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন এইরূপ:—"মম উদ্যানবাটিকাং দৃষ্ট্বা খসম-সমতুল্যাম্। কার্পাস-পুষ্পম্ প্রস্ফুটিতম্ অত্যর্থং আনন্দিতঃ ভবতি।" বাড়ীর বাগানে কার্পাসফুল ফুটিয়াছে, দেখিয়াই আনন্দ; ইহা হইতেই বুঝা যায়, কার্পাসকে কতখানি মূল্য দেওয়া হইত তদানীন্তন বাঙলা দেশে। শান্তিপাদের একটি পদে আছে:—"তুলা ধুঁনি ধুঁনি আঁসুরে আঁসু। আঁসু ধুনি ধুনি নিরবর সেসু॥...তুলা ধুঁনি ধুঁনি সুনে অহারিউ। পুন লইয়া অপনা চটারিউ॥" অর্থ এই,—তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ তৈরী করা হইয়াছে, আঁশ ধুনিয়া ধুনিয়া আর কিছু বাকী নাই। তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া শূন্যে উড়াইতেছি; আবার তাহাই লইয়া ছড়াইয়া দিতেছি। হয় ত ইহার গুহ্য অর্থ আছে; কিন্তু তুলা ধুনিবার যে ইহা একটি বাস্তব চিত্র, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কাহ্নপাদের একটি পদে তাঁত বিক্রীর কথাও আছে, এবং সাধারণতঃ ডোমনীরাই বোধ হয় তাঁত (বাঁশের) তৈরী করিত [তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চাংগেড়া (বাঁশের চাঙাড়ি)]। আর একটি পদের রচয়িতার নাম পাইতেছি তন্ত্রীপাদ। তন্ত্রীপাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে তাঁত-শিক্ষক অথবা তাঁত-গুরু। ইহাই বোধ হয়, এই পদ-রচয়িতার পূর্বতন বৃত্তি ছিল; পরে তিনি 'সিদ্ধ' হইয়া-

ছিলেন। এই অনুমানের কারণ পদটির ভিতরই আছে। ইহার মূল বাঙ্‌লা পাওয়া যায় নাই ; তবে তিব্বতী অনুবাদ হইতে প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয় যে সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ হইতে বুঝা যাইবে, গীত ও সাধন-সংবদ্ধ সমস্ত রূপকটি গড়িয়া উঠিয়াছে বস্ত্র বয়নকে অবলম্বন করিয়া।

কালপঞ্চকতন্তুং নির্মলং বস্ত্রং বয়নং করোতি।
অহং তন্ত্রী আত্মনঃ সূত্রম্।
আত্মনঃ সূত্রস্য লক্ষণং ন জ্ঞাতম্।
সার্দ্ধত্রিহস্তং বয়নগতিঃ প্রসরতি ত্রিধা।
গগনং পূরণং ভবতি অনেন বস্ত্রবয়নেন।[৫১]

উপরের এই আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে, কার্পাসের চাষ, গুটিপোকার চাষ, কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রাচীন বাঙ্‌লার সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত শিল্প এবং ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপায়।

কারুশিল্পও কম ছিল না ; তাহার লিপি-প্রমাণ বিশেষ নাই, কিন্তু অনুমান সহজেই করা চলে। তক্ষণ ও স্থপতিশিল্প, স্বর্ণ ও রৌপ্যশিল্পের কথা আগেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি। লৌহশিল্পও ছিল ; দুই একটি শাসনে কর্মকার ত রাজপাদোপজীবী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। চাও-জু-কুয়া যে বলিয়াছেন, বাঙ্‌লা দেশে দুমুখো খুব ধারালো তলোয়ার তৈরী হয়, তাহার মধ্যে এই লৌহ ইত্যাদি ধাতুশিল্পে এদেশের শিল্প-কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দ কেশবের শাসনে[৫২] আমরা রাজবিগ নামে জনৈক দন্তকারের উল্লেখ পাইতেছি ; মনে হইতেছে, হস্তিদন্ত-শিল্পের প্রচলনও ছিল। সূত্রধরের উল্লেখও কয়েকটি লিপিতেই পাইতেছি ; আশ্চর্যের বিষয় এই, ইহাঁদের উল্লেখ তাম্রপট্টগুলির খোদাইকররূপে, লিখিত শাসন ইহাঁরাই তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ করিতেন। এই অর্থে আমরা এখন আর এই শব্দটি ব্যবহার করি না, কিন্তু যে-যুগের কথা আমরা বলিতেছি, সে-যুগে যে ব্যবহৃত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। না হইবার কারণও নাই ; সূত্রধর যে শুধু কাঠ-মিস্ত্রী, তাহাই নয় ; আমাদের প্রাচীন বাস্তু-শাস্ত্রে (যেমন "মানসারে") সূত্রধর বলিতে স্থপতি, তক্ষণকার, খোদাইকর, কাঠ-মিস্ত্রী সকলকেই বুঝাইত। সাধারণ ভাবে শিল্পী ও শিল্পিগোষ্ঠীর কথার আভাস ত বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপির খোদাইকর রাণক শূলপাণির "বারেন্দ্রক শিল্পিগোষ্ঠীচূড়ামণি" এই বিশেষণটির মধ্যেও আছে। তাহা ছাড়া, পঞ্চম হইতে অষ্টম শতকের তাম্রপট্টোলিগুলিতে জমি দান-বিক্রয় ব্যাপারে বিষয়পতি বা অন্য রাজপ্রতিনিধি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যে কয়জন প্রধানের মতামত গ্রহণ করিতেন, অর্থাৎ যে কয়জনে মিলিয়া অধিকরণ গঠিত হইত, তাহাদের মধ্যে প্রথম-কুলিক সর্বদাই অন্যতম। কুলিক অর্থ শিল্পী, artisan। নগরের অথবা বিষয়ের শ্রেষ্ঠ গণ্য মান্য শিল্পী যিনি ছিলেন, তিনিই এই জাতীয় অধিকরণে আসন লইবার জন্য আহূত হইতেন। রাজপাদোপজীবীদের

মধ্যেও কোথাও কোথাও কুলিক বা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নাম পাওয়া যাইতেছে। পূর্বোল্লিখিত ভাটেরা গ্রামের গোবিন্দকেশব দেবের লিপিতে গোবিন্দ নামে এক কাস্থ অর্থাৎ কাংস্থকার বা কাঁসারীর উল্লেখ পাইতেছি। কাঁসা বা bell-metal-র শিল্পের আভাসও তাহা হইলে কিছু পাওয়া গেল।

সকল শিল্পের মধ্যে নৌ-শিল্প বা নদীগামী নৌকা ও সমুদ্রগামী পোত নির্মাণের শিল্পের একটা বিশেষ স্থান নিশ্চয়ই ছিল; তাহার প্রমাণ শুধু বর্তমান চট্টগ্রামে, কিংবা মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে নয়, প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলিতে এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। মৌখরী-রাজ ঈশানবর্মের হড়াহা লিপিতে (ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ) গৌড়দেশবাসীদের (গৌড়ান্) "সমুদ্রাশ্রয়ান্" বলা হইয়াছে; ইহার অর্থ সমুদ্রতীরবর্তী গৌড়দেশ হইতে পারে, অথবা সামুদ্রিক বাণিজ্যই যাহার আশ্রয়, সেই গৌড়দেশও বুঝাইতে পারে। কালিদাস "রঘুবংশে" রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বাঙালীকে "নৌসাধনোদ্যতান্" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পাল ও সেন-বংশের লিপিমালায় নৌবাট, নৌবিতান (fleet of boats) প্রভৃতি শব্দ ত প্রায়শঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এই উভয় রাজবংশের এবং সমসাময়িক বাঙলা দেশের অন্যান্য রাজবংশেরও সামরিক শক্তি নৌবলের উপর অনেকটা নির্ভর করিত; ইহার উল্লেখ ত অনেক শিলা-লিপিতেই আছে। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে[৫৩] নৌযুদ্ধের বর্ণনাভাসও আছে। সাধারণ লোকদেরও যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নৌ-যানের প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট; এই নদীমাতৃক, খাড়ি-প্রধান, বারিবহুল, এবং বহুলাংশে নিম্নভূমির দেশে ইহা ত স্বাভাবিক এবং সহজেই অনুমেয়। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর লিপিতে[৫৪] (৫০৭-৮ খৃ) নৌযোগ অর্থাৎ নৌকাঘাট বা বন্দর বা পোতাশ্রয়ের উল্লেখ আছে; এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যে ভূমি-সীমানা সম্পর্কে এই নৌযোগের উল্লেখ, সেই ভূমি ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর গ্রামের নিকটবর্তী নিম্ন জলপ্লাবিত দেশে। ফরিদপুর জেলায় প্রাপ্ত মহারাজ ধর্মাদিত্যের ১নং তাম্রপট্টলিতে[৫৫] ভূমির সীমা সম্পর্কে "নবাত-ক্ষেণী" কথার উল্লেখ আছে। 'নাবাত' পাঠ খুব শুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না; প্রকাশিত প্রতিলিপিতে 'ভাবতা' পাঠই সমীচীন মনে হয়; কিন্তু 'ভাবতা-ক্ষেণী' কথার কোনও সঙ্গত অর্থ এস্থলে করা যায় না। সেই জন্য পার্জিটার সাহেবের আনুমানিক পাঠ 'নাবাত-ক্ষেণী' আপাততঃ স্বীকার করা যাইতে পারে। তিনি ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, ship-building harbour। যদি এই অনুবাদ ঠিক হয়, তাহা হইলে নৌশিল্পের ইহাও অন্যতম প্রমাণ। এই ধর্মাদিত্যের ২নং শাসনে অন্য একটি ভূমির সীমা সম্পর্কে "নৌদণ্ডক" কথার উল্লেখ আছে; বোধ হয় "নৌদণ্ডক" কথার অর্থও নৌকার আশ্রয়, নৌকা যেখানে বাঁধা হইত, সেই স্থান, বন্দর, ঘাট। এই সব উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, নদনদীগামী ছোট বড় নৌকা, সমুদ্রগামী পোত ইত্যাদি নির্মাণ-সংক্রান্ত একটা সমৃদ্ধ শিল্প ও ব্যবসায় প্রাচীন বাঙলায় নিশ্চয়ই ছিল।

এই নৌ-শিল্পের কথা হইতেই ধনোৎপাদনের তৃতীয় উপায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কথার মধ্যে আসিয়া পড়া যাইতে পারে। এপর্যন্ত ভূমিজাত ও শিল্পজাত যে সব দ্রব্যাদি ও অন্যান্য বস্তুর কথা বলিয়াছি, তাহাই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের উপকরণ। ফলফুল, অর্থাৎ আম, কাঁটাল, মহুয়া ইত্যাদি লইয়া কোনও বিস্তৃত ব্যবসা হয় ত সম্ভব ছিল না, মৎস্য সম্বন্ধেও তাহাই, তবু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের হাটে হাটে এই সব জিনিস লইয়া ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত বই কি? হট্ট, হট্টিকা, হট্টিয়গৃহ, আপণ, মানপ (তৌলদার—দোকানদার—ছোট ব্যবসায়ী) ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ প্রায়শঃ লেখমালাগুলিতে দেখা যায়; অষ্টমশতক-পরবর্তী লিপিগুলিতে ত অনেক স্থলেই হাটবাজার ঘাটসমেত (সহট্ট সঘট্ট) জমি দান করা হইয়াছে। এই সব গ্রাম ও গ্রামান্তরের হাটে স্থানীয় উৎপন্ন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়াই ক্রয়-বিক্রয় চলিত। ভূমিজাত অন্যান্য কিছু কিছু দ্রব্য, যেমন পান, সুপারি, নারিকেল ইত্যাদির ব্যবসা নিশ্চয়ই বিস্তৃততর ছিল সন্দেহ নাই, এবং শুধু বাঙ্‌লা দেশের ভিতরেই নয়, সম্ভবতঃ দেশের বাহিরেও প্রতিবেশী দেশগুলিতে এই দুই দ্রব্যই কিছু কিছু রপ্তানী হইত, এরূপ অনুমান করা যায় পরবর্তী মধ্যযুগীয় বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া। বংশীদাসের "মনসামঙ্গলে" ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের "চণ্ডীকাব্যে" পাই, দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রোপকূল বাহিয়া বাঙালী বণিকেরা গুজরাট পর্যন্ত যে সামুদ্রিক বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া যাইতেন, তাহার মধ্যে গুয়া বা গুবাক, পান ও নারিকেলের উল্লেখ। গুয়ার বদলে লইয়া আসিতেন মাণিক্য, পানের বদলে মরকত এবং নারিকেলের বদলে শঙ্খ[৫৬]। গুয়া বা গুবাক যে সুপারী নাম লইল, তাহার ইতিহাসের মধ্যে বাঙ্‌লা দেশের এই দ্রব্যটির বাণিজ্য-ইতিহাসও লুকাইয়া আছে। বর্তমান গৌহাটি সহরের নামটি আসিয়াছে গুয়া হইতে; গুবাক ক্রয়-বিক্রয়ের হাট বা হাটি অর্থে গুবাহাটি=গুয়াহাটি=গৌহাটি। যাহা হউক, এই গুবাক প্রাচীন কালেই আরব-পারস্য প্রভৃতি দেশগুলিতে রপ্তানী হইত; ঐ দেশীয় বণিকেরা এই দ্রব্য জাহাজ বোঝাই করিতেন বাঙ্‌লা দেশের বন্দর হইতে নয়, পশ্চিম-ভারতের বন্দর শূর্পারক =সুপ্পারক=সোপারা হইতে, এবং তাঁহারা এই দ্রব্যকে সোপারার ফল বলিয়াই জানিতেন, এই অর্থে পরবর্তী কালে গুবাক হইল সুপারী এবং সেই নামেই ভারতের সর্বত্র ইহার পরিচয়, কিন্তু বাঙ্‌লা দেশের, বিশেষতঃ পূর্ববাংলার গ্রামে গ্রামে এখনও ইহার নাম গুবা বা গুয়া। গুবাকের ব্যবসা যে খুবই প্রশস্ত ছিল, এবং তাহা হইতে এই দেশের প্রচুর অর্থাগমও হইত, তাহার প্রমাণ ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্তও পাওয়া যায়। কোম্পানীর আমলে সুপারী বাঙ্‌লা দেশের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। এই সুপারী নারিকেলের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ইতিহাস যদি পরবর্তী মধ্যযুগ বাহিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত অনুসরণ করা যায়, তবেই বুঝা যাইবে, প্রাচীন বাঙ্‌লার ভূমিদান সম্পর্কিত লিপিগুলিতে বিশেষ করিয়া গুবাক নারিকেল এবং পানের বরজের উল্লেখ কেন করা হইয়াছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহা হইতে আয়ের পরিমাণও কেন

উল্লেখ করা হইয়াছে। লবণ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে। বাঙলা দেশের লবণ সামুদ্রিক লবণ। মধ্যযুগের যে দুইটি কাব্যের নাম কিছু আগে করিয়াছি, তাহাতেই প্রমাণ আছে, লবণও অন্যতম বাণিজ্যসম্ভার ছিল। বাঙালী বণিকেরা সামুদ্রিক লবণের বিনিময়ে সৈন্ধব লবণ লইয়া আসিতেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও দেখি, লবণের ব্যবসা লইয়া কাড়াকাড়ি; কোম্পানীর সওদাগরেরা অনবরত চেষ্টা করিতেছেন লবণের ব্যবসা একচেটিয়া করিতে। এই প্রয়াসের ইতিহাস পড়িলে স্বতই মনে হয়, ব্যবসাটা খুবই লাভবান্ ছিল। সে কথাটি না বুঝিলে প্রাচীন লিপিগুলিতে কেন যে ভূমি দানের সময় বার বারই 'সলবণ' কথাটি উল্লেখ করা হইতেছে, সে রহস্যটি ধরা পড়ে না।

'Periplus Erythri Mari' গ্রন্থে তেজপত্র ও পিপ্পলের ব্যবসার উল্লেখ আমরা দেখিয়াছি। এই দুটি দ্রব্যের ব্যবসাও খুব লাভজনক ব্যবসা ছিল, সন্দেহ নাই। সব দ্রব্যের বাণিজ্যমূল্য উপাদানের অভাবে জানিবার উপায় নাই; কিন্তু পিপ্পলির বাণিজ্য-মূল্যের খানিকটা আভাস পাইতেছি প্লিনির "ইণ্ডিকা" নামক গ্রন্থ হইতে (খৃঃ প্রথম শতক)। তিনি বলিতেছেন, রোম সাম্রাজ্যে এক পাউণ্ড বা আধ সের পিপ্পলির দাম ছিল তখনকার দিনে ১৫ দিনার, অর্থাৎ পনরটি স্বর্ণমুদ্রা। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, এই সব বাণিজ্যসম্ভার হইতে, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ফলে দেশের কম অর্থাগম হইত না। কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। এই শিল্প সম্বন্ধে আগে যে-সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, নানা প্রকার বস্ত্রের ব্যবসা বাঙলা দেশে খুব সুপ্রাচীন এবং শুধু প্রাচীন বাঙলায়ই নয়, একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত সর্ব্বদাই এই বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা দেশের অর্থাগমের একটা মস্ত বড় উপায় ছিল। প্লিনি সেই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেই বলিতেছেন, ভারতবর্ষ হইতে যত রেশম ও কার্পাস ইত্যাদি বস্ত্র পশ্চিমের বণিকেরা বহন করিয়া লইয়া যাইত, তাহার বার্ষিক মূল্য ছিল (আনুমানিক) এক লক্ষ মুদ্রা[৫৭]। এই অর্থের একটা বৃহৎ অংশ যে বাঙলা দেশে আসিত, তাহাতে সন্দেহ কি? বংশীদাসের "মনসামঙ্গল" অথবা মুকুন্দরামের "চণ্ডীকাব্যে" বাঙালীর অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের যে ছবি পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত সন্দেহ নাই, গ্রন্থ দুইটি আমাদের যুগের পক্ষে অর্বাচীনও; কিন্তু তাহা যে বাঙালীর প্রাচীন বাণিজ্য-স্মৃতি বহন করে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার সাক্ষ্য আমাদের বক্ষ্যমাণ বিষয়ে প্রামাণ্য কিছুতেই নয়, তবু এই দেশজাত পান, গুবাক, নারিকেল ইত্যাদির পরিবর্তে বণিকেরা যে-সব মূল্যবান্ দ্রব্য লইয়া আসিতেন, তাহার অংশ মাত্রও যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও এ কথা অনুমান করা চলে যে, প্রাচীন বাঙলায় অর্থাগমের অন্যতম নয়, প্রথম ও প্রধান উপায়ই ছিল বাণিজ্য। এ কথা যে একেবারে শূন্য কথা নয়, তাহা বস্ত্রশিল্প ও পিপ্পল সম্বন্ধে প্লিনির উক্তি হইতেও কতকটা বুঝা যায়। হাজারিবাগ জেলায় দুধপানি পাহাড়ে একটি লিপি উৎকীর্ণ আছে; অক্ষরের রূপ দেখিয়া মনে হয়, লিপিটি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের। এই লিপিতে আছে:—

অথ কস্মিংশ্চি[ৎ স]ময়ে বণিজো ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ।
তামলিপ্তি [ম] যোধ্যায়া যযুঃ পূর্ব্ববণিজয়া।
ভূয়ঃ প্রতিনিবৃত্তাস্তে সমাবাসং যিয়াসবঃ।
প্রয়োজনেন কেনাপি চিরঞ্চক্রুরিহ স্থিতিং।
সুবর্ণ মণি মাণিক্য মুক্তা প্রভৃতি বৈর্দ্ধনং।
বিত্তপস্পর্দ্ধয়েবা সোদপর্যন্তমুপার্জ্জিতং।

অষ্টম শতকে বলা হইতেছে, 'কোনো এক সময়ে' অর্থাৎ এখানে যে উল্লেখটি আছে, তাহা একটি প্রাচীন দিনের ঘটনার স্মৃতি। কিন্তু বাণিজ্য উপলক্ষে তিন ভাই অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তিতে আসিয়া কিছুকালের মধ্যে প্রচুর ধনরত্ন উপার্জ্জন করিয়া নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, এ কথাটির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বৌদ্ধ জাতকের অনেক গল্পে বাণিজ্য উপলক্ষে তাম্রলিপির উল্লেখও সুপরিচিত; পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সোমদেবের "কথাসরিৎসাগরে" একাধিক জায়গায় উল্লেখ আছে, বারাণসী হইতে বণিক্‌দের বাণিজ্য উপলক্ষে পুণ্ড্রে অথবা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিবার কথা। তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যের উল্লেখও একাধিক বার আছে। বিদ্যাপতির "পুরুষ পরীক্ষা"য় গুজরাটের সঙ্গে গৌড়ের বাণিজ্য-সম্বন্ধের আভাস পাইতেছি। গঙ্গার মুখে গঙ্গাবন্দরের কথা, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির উল্লেখ ত য়ুয়ান্ চোয়াঙ্‌ও করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত সাক্ষ্যই সুপরিচিত। এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখিলে সহজেই মনে হয়, প্রাচীন বাঙ্‌লার সমৃদ্ধি যাহা ছিল, তাহা বহুলাংশে নির্ভর করিত ব্যবসা-বাণিজ্যেরই উপর। তাহা ছাড়া পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত দেখিতেছি, ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিলগুলিতে স্থানীয় অধিকরণে যাহাদের আহ্বান করা হইতেছে, সেই পাঁচ জনের মধ্যে দুই জন ত রাজকর্মচারীই—বিচারপতি স্বয়ং এবং প্রথম-কায়স্থ বা জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ, বাকী তিন জনের মধ্যে দুই জন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধি, নগরশ্রেষ্ঠী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠিগোষ্ঠীর যিনি প্রধান, তিনি এবং প্রথম-সার্থবাহ, বণিক্‌দের মধ্যে যিনি প্রধান—তিনি, অবশিষ্ট যিনি রহিলেন, তিনি প্রথম-কুলিক, শিল্পিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তাহা হইলে দেখিতেছি, রাষ্ট্রেও কতকটা আধিপত্য এই বণিক্ ও ব্যবসায়ীরাই করিতেছেন। রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যাপারেও প্রধানব্যাপারিণঃ, প্রধানব্যবহারিণঃ যাঁহারা, তাঁহাদের সাহায্য লওয়া হইতেছে, মহত্তর অর্থাৎ সমাজের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকেদের সঙ্গে সঙ্গে। এই সম্বন্ধে পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে আরও বলিবার সুযোগ আসিবে; এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ব্যবসাবাণিজ্যের ফলে এই সব শ্রেষ্ঠী ও বণিক্‌দের হাতে যে অর্থাগম হইত, তাহার ফলেই ইঁহারা রাষ্ট্রে আধিপত্য লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রে যে আছে, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি', এ কথা প্রাচীন বাঙ্‌লায়ও সত্য হইয়াছিল বলিলে ইতিহাসের অমর্য্যাদা হয় না। প্রাচীন বাঙ্‌লার লক্ষ্মী ব্যবসাবাণিজ্য-নির্ভরই ছিলেন বেশী, এবং সেই লক্ষ্মী বাস করিতেন বণিক্, ব্যাপারী, শ্রেষ্ঠী ইত্যাদির ঘরে, ধর্ম্মাদিত্যের ২নং এবং গোপচন্দ্রের তাম্রপট্টে

যাহাদের যথাক্রমে বলা হইয়াছে ব্যাপার-কারণ্ডয়ঃ, ব্যাপারিণঃ, তাহাদের ঘরে। মধ্যযুগীয় বাঙলা-সাহিত্যে নানা সওদাগরের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাহিনীগুলিতেও সে কথার প্রমাণ আছে; ধনপতি, হীরামাণিক, দুলালধন, ইত্যাদি নাম যে বণিক্‌দের মধ্যেই পাই, তাহা একেবারে নিরর্থক নয়।

এই সমৃদ্ধ বাণিজ্য স্থলপথ ও জলপথ উভয় পথেই চলিত। তবে এই নদীমাতৃক দেশে নৌশিল্পের প্রচলন যেমন দেখিতে পাই, যত 'নাবাত-ক্ষেণী', 'নৌবাট', 'নৌদণ্ডক', 'নৌবিতান', ইত্যাদির উল্লেখ পাইতেছি, এবং লিপিগুলিতে যত খাল-বিলাল-নালা-প্রণুল্লী-খাটাখাড়িকা-গঙ্গিনিকা-নদনদীর উল্লেখ পাইতেছি, তাহাতে অনুমান হয়, নৌ-বাণিজ্যই প্রবলতর ও প্রশস্ততর ছিল। গুজরাট হইতে গৌড়ে, কিংবা বারাণসী হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনে যে-বাণিজ্যের আভাস বিদ্যাপতির "পুরুষপরীক্ষা"য় কিংবা সোমদেবের "কথাসরিৎসাগরে" পাওয়া যায়, জাতকের বহু গল্পে তাম্রলিপ্তিতে বণিক্‌দের যে আনাগোনার খবর পাওয়া যায়, তাহা হয় ত স্থলপথেই বেশী হইত, বৌদ্ধযুগের সুপরিচিত বাণিজ্যপথ ধরিয়া। বারাণসী হইতে মগধের ভিতর দিয়া অঙ্গের রাজধানী চম্পা হইয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধন পর্যন্ত সার্থবাহের গরুর গাড়ীর শ্রেণী চলাচলের পথ যে ছিল, একথা মনে করিতে সুদূরবিসর্পী কল্পনার আশ্রয় লইবার কোনও প্রয়োজন নাই। চম্পা হইতে গঙ্গা ও ভাগীরথী বাহিয়া তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত নৌকাপথও প্রশস্ত ছিল। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এই নদীপথের বন্দর ও দেশগুলির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বংশীদাসের "মনসামঙ্গলে," এবং বিস্তৃত ভাবে মুকুন্দরামের "চণ্ডীকাব্যে" এই পথের কিয়দংশের বন্দরগুলির উল্লেখ আছে। এই বিবরণের মধ্যে প্রাচীন স্মৃতি কিছু লুকাইয়া নাই, এ কথা কে বলিবে? স্থলপথের আর একটি আভাস য়ুয়ান্ চোয়াঙের বিবরণীতে পাওয়া যায়। কজঙ্গল বা উত্তররাঢ় হইতে তিনি গিয়াছিলেন পুণ্ড্রবর্দ্ধনে এবং সেখান হইতে একটি বৃহৎ নদী পার হইয়া কামরূপে। এই পরিব্রাজক নিজে নূতন করিয়া পথ কাটিয়া অগ্রসর হন নাই; যে-পথ বহু দিন আগে হইতেই বহুলোক-যাতায়াতে প্রশস্ত হইয়াছে, সেই পথেই তিনি গিয়াছিলেন, এ অনুমানই সঙ্গত। এই পথেই কামরূপের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য-সম্বন্ধ চলিত। পূর্ব ও নিম্নবঙ্গের সঙ্গে কামরূপের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল সেই পথ ধরিয়া, যে-পথে এই চীন পরিব্রাজক কামরূপ হইতে সমতট ও তাম্রলিপ্তিতে আসিয়াছিলেন। আর উড়িষ্যার সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধের স্থলপথ ধরিয়াই যে পরবর্তী কালে চৈতন্যদেব নীলাচল গিয়াছিলেন, তাহা ত সহজেই অনুমেয়। এই সব পথ বহুপ্রাচীন এবং বহুজনের চরণচিহ্নে অঙ্কিত।

সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান বন্দর যে ছিল তাম্রলিপ্তি, তাহা ত সুস্পষ্ট, জাতকে যাহাকে বলা হইয়াছে দামলিপ্তি, Periplus গ্রন্থের Gange বন্দর এবং Ptolemyর Tamalites, য়ুয়ান্ চোয়াঙের তন্-মো-লিহ্-তি। সিংহলের সঙ্গে তাম্রলিপ্তির বাণিজ্যপথের আভাস ফাহিয়ান্ রাখিয়া গিয়াছেন (চতুর্থ শতক)। তাহারও তিন শত বৎসর আগে ভারতের দক্ষিণ-সমুদ্রতীর বাহিয়া তাম্রলিপ্তির সঙ্গে সুদূর রোম-সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-

সম্বন্ধের আভাস ত Periplus ও Ptolemyর গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এ সমস্ত সাক্ষ্যই অত্যন্ত সুপরিচিত। বহু পরবর্তী কালেও অন্ততঃ ভৃগুকচ্ছ-সুরাষ্ট্র-পাটন পর্যন্ত এই বাণিজ্য-সম্বন্ধের বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যাইবে বংশীদাসের ও মুকুন্দরামের "মনসামঙ্গল" ও "চণ্ডীকাব্যে"। ব্রহ্মদেশ ও যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ ও পূর্বদক্ষিণ বৃহত্তর ভারতের দ্বীপগুলির সঙ্গে বাঙলাদেশের বাণিজ্যসম্বন্ধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নাই, তবে অনুমান খুব সহজেই করা যাইতে পারে। উত্তর-ব্রহ্মের সঙ্গে আসাম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া স্থলপথে একটা নিকট সম্বন্ধ ত ছিলই, একথা আমি অন্যত্র প্রমাণ করিয়াছি; এবং বর্তমান ত্রিপুরা জেলার পট্টিকেরার রাজবংশের সঙ্গে যে পাগানের আনাউরহথাও চান্‌জিথ্‌থার রাজবংশের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, তাহা আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি।[৫৮] মধ্যযুগে এই পথ দিয়াই একাধিক বার মণিপুরে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধাভিযান আসিয়াছে। নিম্নব্রহ্মের সঙ্গে সমুদ্রোপকূল বাহিয়া জলপথও ছিল, তাহার প্রমাণ ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন রাজবংশাবলীগুলির ইতিহাসের মধ্যে আছে, এবং "ব্রহ্মদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস" ও আমার অন্য দুটি গ্রন্থে সে কথা প্রমাণ করিয়াছি[৫৯]। এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যবদ্বীপ-সুবর্ণদ্বীপের সঙ্গে পূর্বদক্ষিণ-সমুদ্রের দেশ ও দ্বীপগুলির সম্বন্ধের প্রমাণ আছে দেবপালদেবের রাজত্বকালে রাজা বালপুত্রদেবের নালন্দা লিপিতে[৬০], ইৎসিঙ্‌ নামক চীন পরিব্রাজকের (৭ম শতাব্দী) ভ্রমণ-বৃত্তান্তে[৬১], বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত ধর্মকীর্তির জীবন ইতিহাসের মধ্যে। এই সমস্ত সাক্ষ্যই এত সুপরিচিত যে, ইহাদের উল্লেখ পুনরুক্তি-দোষে দুষ্ট হইবে। তাহা ছাড়া সাধারণ ভাবে এই সব পূর্বদক্ষিণসমুদ্রের দ্বীপ ও দেশগুলিতে বাঙলাদেশের ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতির প্রভাব এত সুস্পষ্ট এবং পণ্ডিত মহলে এত বেশী আলোচিত হইয়াছে যে, প্রাচীন বাঙলা দেশের সঙ্গে ইহাদের নিকট সম্বন্ধের কথা এখন আর কল্পনার বিষয় নয়। কিন্তু এই সব সাক্ষ্য প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত একটিও প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্যসংক্রান্ত নয়, যদিও একথা অনুমান করিতে বাধা নাই যে, বাণিজ্য-সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই ক্রমে ক্রমে বাঙলা দেশের ও ভারতের অন্যান্য দেশের ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতি ক্রমশঃ এই সব অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অন্য দেশে রাজ্যবিস্তার, সংস্কৃতিবিস্তার এই ভাবেই হইয়া থাকে, প্রাচীন কালেও হইয়াছিল, বর্তমান কালেও হইয়াছে ও হইতেছে। সর্বাগ্রে বণিক্, বণিকের সঙ্গে বণিকের প্রয়োজনেই ধর্ম ও পুরোহিত, তার পরেই ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আসিয়া পড়ে সামরিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব। যাহাই হউক, প্রত্যক্ষ বাণিজ্য-সম্বন্ধের প্রমাণ প্রাচীন বাঙলায় পাইতেছি না, কিন্তু বিজয় গুপ্তের "মনসামঙ্গলে" সে-প্রমাণ আছে; আরাকান ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধের আভাস এই গ্রন্থে পাওয়া যায় বলিয়া আমি মনে করি[৬২]। অনুল্লিখিত-নাম যে দেশের বিবরণ সওদাগরদের শুনান হইতেছে, সেই দেশ যে ব্রহ্মদেশ, তাহা বিবরণটি একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলে আর সন্দেহ থাকে না। (**N. N. Sen Gupta's edn. pp. 194-95**)। কিন্তু প্রাচীন কালে এই পূর্বদক্ষিণ-সমুদ্রের দ্বীপ ও দেশগুলির সঙ্গে বাঙলা দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধের একটি প্রমাণও কি নাই? আমার

মনে হয়, আছে। সেই প্রমাণটি উল্লেখ করিয়াই এই ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গ শেষ করিব। মালয় উপদ্বীপের ওয়েলেস্‌লি জেলার একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে একটি শ্লেট্ পাথরে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পাথরটির মাঝখানে উৎকীর্ণ একটি বৌদ্ধস্তূপের প্রতিকৃতি; স্তূপটির দুই পাশে লিপি উৎকীর্ণ। লিপিটির পাঠ এইরূপ:—

অজ্ঞানাচ্চীয়তে কর্ম্ম জন্মনঃ কর্ম্ম কারণ [ম]
জ্ঞানান্ন চীয়তে [কর্ম কর্ম্মাভাবান্ন জায়তে]

ইহা একটি বৌদ্ধ সূত্র। এর পরেই দক্ষিণতম প্রান্তে লেখা আছে:—

মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তস্য রক্তমৃত্তিকা বাস্ [ত ব্যস্য]

এবং তার পরেই বাম প্রান্তে ও পার্শ্বে আছে:—

সর্ব্বেণ প্রকারেণ সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বথা স (র) ব্ব…সিদ্ধ যাত্ [র] া [ঃ] সন্তু

এই মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত পণ্ডিতমহলে সুপরিচিত; লিপিটি বহু আলোচিত। বুদ্ধগুপ্তের বাড়ী ছিল রক্তমৃত্তিকায়। সিদ্ধযাত্র ও সিদ্ধযাত্রা কথাটি লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়াছে। বেশীর ভাগ তর্ক নিরর্থক। কথাটি এ পর্যন্ত এই দেশ ও দ্বীপগুলির অন্ততঃ সাতটি প্রাচীন লিপিতে পাওয়া গিয়াছে। সিদ্ধযাত্রিক, সিদ্ধযাত্রত্ব, যাত্রাসিদ্ধিকাম ইত্যাদি কথা "পঞ্চতন্ত্রে" ও "জাতকমালা"য় বার বার পাওয়া যায়। "জাতকমালা"র সুপারগ-জাতকে পূর্ব ভারতের বণিক্‌দের সুবর্ণভূমি বা নিম্নব্রহ্মদেশে যাত্রার কথা আছে (সুবর্ণভূমিবণিজো যাত্রাসিদ্ধিকামাঃ)—তাহাদের যাত্রা সিদ্ধিলাভ করুক, এই কামনা তাহাদের মনে ছিল, সেই জন্য তাহাদের বলা হইয়াছে যাত্রাসিদ্ধিকামাঃ। বুদ্ধগুপ্তের এই লিপিটির শেষ ছত্রটির অর্থেরও অস্পষ্টতা কিছু নাই; সর্বপ্রকারে, সকল বিষয়ে সর্বথা বা সর্ব উপায়ে সকলে সিদ্ধযাত্র হউক, এই প্রকার একটা কামনা বা আশীর্বাদ করা হইতেছে। এই কামনা বা আশীর্বাদ করা হইয়াছিল যাত্রার পূর্বে, ইহাই ত 'সন্তু' এই ক্রিয়াপদটির এবং সমস্ত আশীর্বাদটীর ইঙ্গিত। কামনা বা আশীর্বাদ করা হইয়াছিল খুব সম্ভব কোন বৌদ্ধ পুরোহিত বা ধর্মগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে; স্তূপের প্রতিকৃতিটি তাহার প্রমাণ, এবং এই আশীর্বাদের একটি লিপি বৌদ্ধসূত্র সহ ধর্মনিদর্শন সহ খোদাই করিয়া, রক্ষাকবচের মত বুদ্ধগুপ্তের সঙ্গে দিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রথা ত এখনও বাঙলার বহু পরিবারে প্রচলিত। এই মহানাবিকের বাস্তব্য অর্থাৎ বাড়ী ছিল রক্তমৃত্তিকায়। এই রক্তমৃত্তিকা কোথায়, ইহাই হইতেছে প্রশ্ন। অধ্যাপক কার্ণ বলিয়াছিলেন, এই রক্তমৃত্তিকা চৈনিক উপাদানের Ch'ih-t'u, সিয়াম দেশের সমুদ্রোপকূলের একটি স্থানের সঙ্গে অভিন্ন। অক্ষর দেখিয়া লিপিটির তারিখ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক। লিপিটির ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত; ধর্মপ্রেরণা একান্তভাবেই ভারতীয়; মহানাবিকটির নাম ও ধাম একান্ত ভাবেই ভারতীয়, বুদ্ধগুপ্ত নামটি যেন বিশেষ করিয়াই ভারতীয়। এই অবস্থায় নাবিকটিকে সিয়ামদেশবাসী বলিয়া মনে করিতে একটু ঐতিহাসিক

দ্বিধা বোধ হয় বই কি? বিশেষতঃ রক্তমৃত্তিকার সন্ধান যদি ভারতবর্ষে কোথাও পাওয়া যায়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ (সপ্তম শতক) কিন্তু কর্ণসুবর্ণের বিবরণ দিতে বসিয়া এক রক্তমৃত্তিকার সন্ধান দিতেছেন। বলিতেছেন, কর্ণসুবর্ণের রাজধানীর একেবারে পাশেই ছিল লো-টো-মো-চিহ্ (Lo-to-mo-chih) নামে বৃহৎ বৌদ্ধ-বিহার। চীন লো-টো-মো-চিহ্ পালি অথবা প্রাকৃত লত্তমচি=রক্তমত্তি=রক্তমৃত্তি বা রক্তমৃত্তিকা, বাঙ্লা, রাঙামাটি। আমার ত মনে হয়, বুদ্ধগুপ্তের বাড়ী কর্ণসুবর্ণের এই রক্তমৃত্তিকা বা রাঙামাটি। তাহা ছাড়া আর একটি রাঙামাটির খবর আমরা জানি চট্টগ্রামে। প্রাচীন ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক আবেষ্টনের কথা মনে রাখিলে মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত যে বাঙ্লা দেশের তাম্রলিপ্তি বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, পূর্বদক্ষিণ-সমুদ্রতীরের দেশে, এই অনুমানই ত বিজ্ঞানসম্মত সত্য বলিয়া মনে হয়। এবং যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এইখানে আমরা প্রাচীন বাঙলার সামুদ্রিক বাণিজ্য-বিস্তারের একটা পাথুরে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম।

এই যে আমরা একটা প্রশস্ত, সমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের পরিচয় পাইলাম, এই বাণিজ্যে বাঙ্লা দেশে প্রচুর অর্থাগম হইত এবং সে অর্থের অধিকাংশ বণিক্‌দের হাতেই কেন্দ্রীকৃত হইত, এই ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি। কিন্তু এই অর্থ কি? ইহা কি মুদ্রায় বা বিনিময়-দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত? প্লিনি যে বলিয়াছেন, আধ সের পিপ্পলির দাম হইত ১৫ স্বর্ণ দিনার, এবং ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বার্ষিক রপ্তানীর মূল্য ছিল প্রায় এক লক্ষ মুদ্রা, তাহা হইতে অনুমান হয়, বণিকেরা বাণিজ্য পসরার বদলে মুদ্রাই লইয়া আসিতেন, এবং এই মুদ্রা সুবর্ণমুদ্রা dinarius বা দিনার ও রৌপ্যমুদ্রা drachm বা দ্রম্ম। পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রায় সমস্ত পট্টোলিগুলিতে ভূমির মূল্যের উল্লেখ (স্বর্ণ) দিনার অনুযায়ী, কিংবা পরবর্তী পাল ও সেনবংশের লিপিগুলিতে মূল্যের উল্লেখ পাই রৌপ্য দ্রম্মে (ধর্মপালের মহাবোধি লিপির "ত্রিতয়েন সহস্রেণ দ্রম্মানাং খানিতা"; বিশ্বরূপ ও কেশব সেনের দুইটি লিপিতেও ভূমির মূল্য দেওয়া হইয়াছে দ্রম্মে)। এই দুইটি মুদ্রার নাম হইতে মনে হয়, এক সময়ে এই দুই বিদেশী মুদ্রাই প্রচুর পরিমাণে বাঙ্লা দেশে আসিত, এবং বিনিময়-মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত এবং গৃহীতও হইত, পরে ইহাদের নাম হইতেই স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা বাঙ্লা দেশে দিনার ও দ্রম্ম নামে পরিচিত হইয়াছিল। 'দাম' এবং দর্মা (বেতন) এই কথা দুইটি ত 'দ্রম্ম' হইতেই আমরা পাইয়াছি। এই দুই মুদ্রা প্রচলনের মধ্যেও প্রশস্ত বৈদেশিক বাণিজ্য-সম্বন্ধের স্মৃতি লুক্কায়িত আছে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু বিনিময়-বাণিজ্য (trade by barter)ও সঙ্গে সঙ্গে ছিল না, এ কথাও বলা চলে না। Periplus গ্রন্থে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ত মনে হয়, এই বাণিজ্য পণ্য-বিনিময়েই চলিত বেশী। বংশীদাস ও মুকুন্দরামের যে সাক্ষ্য আগে একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেও প্রমাণ হয় যে, মধ্যযুগেও এই বিনিময়-বাণিজ্যই বহির্বাণিজ্যের সাধারণ নিয়ম ছিল। টেভারনিয়ারের যে-সাক্ষ্য ত্রিপুরাদেশাগত সোনা সম্বন্ধে আগে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে ত দেখা যায়, অন্তর্বাণিজ্যেও এই ব্যবস্থা কতকটা

প্রচলিত ছিল। এই দুটি সাক্ষ্যই মধ্যযুগীয়, তবু মনে হয়, প্রাচীন ধারাই মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল।

কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলা হইল; এই তিন উপায়েই দেশের অর্থোৎপাদন হইত। মুদ্রায় এই অর্থের রূপান্তর কিরূপ ছিল, দেখা যাক্।

মহাস্থানের শিলাখণ্ডের লিপিটিতে গণ্ডক নামে এক মুদ্রার নাম পাইতেছি; এই মুদ্রা সোনার, কি রূপার, বলার কোনও উপায় নাই। পঞ্চম হইতে অষ্টক শতক পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলিগুলিতেই ভূমির মূল্য দেওয়া হইয়াছে (স্বর্ণ) দিনারে। প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রাই যে ছিল দিনার, তাহা ইহাতেই সপ্রমাণ; রৌপ্য মুদ্রার প্রচলনও ছিল, তাহার নাম ছিল রূপক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈগ্রাম পট্টোলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই লিপি হইতেই প্রমাণিত হয় যে, আটটি রূপক মুদ্রা অর্দ্ধ দিনারের সমান, অর্থাৎ ষোলটিতে এক স্বর্ণদিনার। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে এক স্বর্ণদিনারের (ধনাইদহ ও দামোদর পট্টোলির কালে) ওজন ছিল ১২৪·৭ হইতে ১২৭·৩ মাষ পরিমাণ, এ কথা এই আমলের প্রাপ্ত সুবর্ণমুদ্রা হইতে জানা যায়। স্কন্দগুপ্তের সময়ে সুবর্ণমুদ্রা দিনারের ওজন ছিল ১৪২ মাষ। রূপক মুদ্রার সাধারণ ওজন ছিল একটি রৌপ্য কার্ষাপণের সমান অর্থাৎ ৫৬ মাষ। "অমরকোষে"র মতে এক (স্বর্ণ) দিনার এক (স্বর্ণ) নিষ্কের সমান। আশ্চর্যের বিষয় এই, সপ্তম শতকের পর আর আমরা (স্বর্ণ) দিনারের উল্লেখই পাই না, এবং শিলালিপিতে উল্লেখ যেমন নাই, তেমনি সেই যুগের পর কোনও স্বর্ণমুদ্রা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃতও হয় নাই। আমি আগেই উল্লেখ করিয়াছি, ধর্মপালের মহাবোধি লিপিতে, বিশ্বরূপ সেনের একটী অপ্রকাশিত লিপিতে ও কেশব সেনের একটি লিপিতে বোধ হয় দ্রন্ম (?) নামক (রৌপ্য) মুদ্রার উল্লেখ আছে। ভাস্করাচার্যের (১০৩৬ শক=১১১৪খ্রীঃ) "লীলাবতী" গ্রন্থে একটি আর্য্যা আছে: কুড়ি কড়ায় এক কাকিনী, চার কাকিনীতে এক পণ, ষোল পণে এক দ্রন্ম, ষোল দ্রন্মে এক নিষ্ক। "অমরকোষে" দেখিয়াছি, এক নিষ্ক এক দিনারের সমান; তাহা যদি হয়, তাহা হইলে এক দ্রন্ম এক দিনারের ষোল ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ বৈগ্রাম লিপির উল্লিখিত এক রূপকের সমান। দ্রন্ম যে রৌপ্যমুদ্রা, এ সম্বন্ধে তাহা হইলে আর কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এ পর্যন্ত একটি দ্রন্ম রৌপ্যমুদ্রাও বাঙলাদেশে কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। সেন-রাজত্বের অবসান পর্যন্ত দ্রন্মের প্রচলনের উল্লেখ লিপিতে থাকিলেও সাধারণ প্রচলিত উর্দ্ধতম মুদ্রামান ছিল কপর্দক পুরাণ বা পুরাণ। সেন-বংশের এবং সমসাময়িক সকল রাজবংশের শিলালিপিতেই ভূমির আয়ের পরিমাণ দেওয়া হইতেছে এই পুরাণ মুদ্রায়, তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। এই পুরাণ মুদ্রার সঙ্গে তদানীন্তন দ্রন্মের কি যোগ ছিল, দুইই এক কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। নিম্নতম মান কি ছিল, তাহাও বলা যায় না, তবে মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতে অনুমান করা যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়,

এই নিম্নতম মান ছিল কড়ি। ফাহিয়ান্‌ও (চতুর্থ শতক) বলেন, লোকে ক্রয়বিক্রয়ে কড়িই ব্যবহার করিত।

গুপ্তযুগের পর অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক হইতেই মুদ্রার, বিশেষভাবে স্বর্ণ-মুদ্রার অবনতি ঘটিল কেন, এই প্রশ্ন অর্থনীতিবিদের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতে পারে। এই অবনতি কি দেশের সাধারণ আর্থিক দুর্গতির দিকে ইঙ্গিত করে? না, রাষ্ট্রের স্বর্ণের অথবা রৌপ্যের গচ্ছিত মূলধনের (reserve) স্বল্পতার দিকে ইঙ্গিত করে? ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কপর্দকপুরাণ বোধ হয়, রৌপ্যমুদ্রাই ছিল, অন্ততঃ ভূমির আয়ের পরিমাণ দেখিয়া ত তাহাই মনে হয়। যদি তাহা হয়ও, যদি কপর্দকপুরাণ ও দ্রম্ম একই জিনিসও হয়, তাহা হইলেও এটা আশ্চর্য যে, একটি কপর্দ্দকপুরাণও আজ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কৃত হইল না! মুদ্রার প্রচলন কি কমিয়া গিয়াছিল? ব্যবসা বাণিজ্য, কাজকর্ম, চাকুরী, ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদি সবই বিনিময়ে হইত, ইহাও ত সম্ভব নয় এই যুগে! তবে কি হইয়াছিল? রৌপ্যই কি অর্থমান নির্ণয় করিত? হয় ত তাহাই। সামাজিক ধন-সম্বলের গতি কোন্ দিকে, এই তথ্যের মধ্যে হয় ত তাহার ইঙ্গিত আছে। দ্রম্ম ও কপর্দ্দকপুরাণ, দুইই যদি রৌপ্যমুদ্রাই হয়, এবং আগেই বলিয়াছি, ইহা হওয়াই সম্ভব, তাহা হইলেও মনে হয়, কপর্দকপুরাণের intrinsic value বা মুদ্রার দিক্ হইতে যথার্থ মূল্য দ্রম্মাপেক্ষা কম ছিল বলিয়াই ত মনে হয়। রৌপ্যমুদ্রার এই অবনতিই বা কিসের জন্য হইল? Gresham's Law দ্বারা ইহা ব্যাখ্যা করা যায় কি? যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর, বিশেষ করিয়া বহির্বাণিজ্যের উপর প্রাচীন বাঙলার সমৃদ্ধি নির্ভর করিত, তাহার অবনতি ঘটিয়াছিল কি?

'প্রাচীন বাঙলার ধন-সম্বল' প্রবন্ধের পাদটীকা

১ Mauryan Brahmi inscription of Mahasthan, Ep. Ind. xxi, p. 83 ff.

২ প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলিতে ভূমিজাত এই দ্রব্যটির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে; এই শস্যসম্পদটি এতই আদৃত ও পরিচিত ছিল যে, ইহাকে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই লিপি-লেখকেরা ধরিয়া লইয়াছেন, উল্লেখের কোনও প্রয়োজন মনে করেন নাই। প্রতিবাসী কামরূপ-রাজ্যের লিপিগুলিতে কিন্তু শুধু ভূমির পরিমাণই যে দেওয়া হইতেছে, তাহা নয়, সেই ভূমিতে কি পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়, তাহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে; অনেক স্থলে উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ দ্বারাই ভূমির পরিমাণ নির্দেশ করা হইতেছে। বলবর্মার তাম্রশাসনে বলা হইতেছে, "দক্ষিণকুলে দিজ্জিন্নাবিষয়ান্তঃপাতিনো ধান্যচতুস্সহস্রোৎপত্তিমতো হেঙসিবাভিধানা ভূমিঃ"; রত্নপালের প্রথম শাসনে বলা হইতেছে, "উত্তরকুলে ত্রয়োদশগ্রামবিষয়ান্তঃপাতি বামদেবপাটকাপকৃষ্টভূমিসমেতলাবুকুটি ক্ষেত্রে ধান্যদ্বিসহস্রোৎপত্তিকভূমৌ"; ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় তাম্রশাসনে বলা হইতেছে, "উত্তরকুলে মন্দিবিষয়ান্তঃপাতি-পণ্ডরীভূমিতোঽপকৃষ্টধান্যদ্বিসহস্রোৎপত্তিকভূমৌ", ইত্যাদি। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, "কামরূপশাসনাবলী", ৭৮ পৃ, ৯৯ পৃ. ১৩৬-৩৭ পৃ.।

৩ "Periplus of the Erythrean Sea", ed. by Schoff.

৪ "Kautilya's Arthasastra," ed. by R. Shamasastry. 2nd. edn. 1923.

৫ "Materials for a critical edition of the old Bengali Caryapadas," by Dr. Prabodh-chandra Bagchi. J. D. Letters. C. U. Vol. xxx. pp. 1-156. "বৌদ্ধগান ও দোঁহা", হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২৩, ১-৩৬।

৬ Vappaghosavata grant of Jayanaga, Ep, Ind. xviii, p. 60 ff.

৭ "গৌড়লেখমালা", অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ১৩১৯, ৯-২৮ পৃ.

৮ Dhanaidaha Copper-plate insc, of the time of Kumaragupta I, Ep. Ind. xvii, p, 345 ff.

৯ Damodarpur Copper-plate inscriptions, Ep. Ind., xv, pp.

১০ Three Copper-plate grants from East Bengal (Faridpur). Ind. Ant. 1910. p. 193 ff. ১১ Ibid.

১২ Ghugrahati Copper-plate insc. of Samacaradeva, Ep. Ind. xviii, p. 74 ff.

১৩ Baigram Copper-plate insc. of the Gupta year 128, Ep. Ind. xxi, p. 78 ff.

১৪ Bhatera Copper-plate inscription of Govinda-Kesava, Ep. Ind.

১৫ Dhulla Copper-plate of Sricandra, Inscriptions of Bengal. iii, 1929, p. 165 ff.

১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪১ ভাগ, ১৩৪১, ৭৮-৭৯ পৃ।

১৭ Bhuvanesvar Inscription of Bhatta-Bhavadeva, Insc. of Bengal, iii, 1929, p. 25 ff.

১৮ "Yuan Chwang", by Watters, Vol. ii.

১৯ "গৌড়লেখমালা", ৩৭-৪৪ পৃ। ২০ ঐ, ৫৫-৬৯ পৃ। ২১ ঐ, ৯১-১০০ পৃ।

২২ Irda Copper-plate of the Kamboja King of Nayapaladeva, Ep. Ind. xxii, p. 150 ff.

২৩ "গৌড়লেখমালা", ১২৭-১৪৬ পৃ।

২৪ ২নং পাদটীকা দেখুন।

২৫ "Inscriptions of Bengal", III. p. 1-9.

২৬ Ibid, p. 14 ff.

২৭ Ibid, p. 42 ff.

২৮ Ibid, p. 57 ff.

২৯ Ibid, p. 68 ff.

৩০ Ibid. p. 99 ff.

৩১ Ibid, p. 106 ff.

৩২ Ibid, p. 92 ff.

৩৩ Ibid, p. 81 ff.

৩৪ Ibid, p. 169 ff.

৩৫ Ibid, p. 177 ff.

৩৬ Ibid, p. 132 ff.

৩৭ Ibid, p. 181 ff.

৩৮ Asrafpur Copper-plates of Devakhadga, Mem. A. S. B. I, p. 85 ff.

৩৯ "Inscriptions of Bengal", III, p. 165 ff.

৪০ "কীর্তি-কৌমুদী" গ্রন্থ লবণপাল ও বীরধবল বাঘেলাদের মন্ত্রী বস্তুপালের জীবনী। সোমেশ্বর ইহার রচয়িতা। Ed. by A. V. Kathavate. Bombay 1883. প্রথম সর্গ, ১২ পৃ, ৩৭ শ্লোক। "আজ্ঞাসারঃ করস্তো-ভূলোগৌড়ো মোদকবন্নৃপঃ।" এই নৃপ হইতেছেন অনহিলপুরের রাজা জয়সিংহ (আনুমানিক ১০৯৩ খৃঃ)। ভ্রমক্রমে এই গ্রন্থ বিদ্যাপতির বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, বস্তুতঃ সোমেশ্বর ইহার রচয়িতা।

৪১ "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", সুকুমার সেন।

৪২ "কাব্যমীমাংসা"।

লবলী কি বস্তু, আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই। গ্রন্থিপর্ণকের উল্লেখ একাধিক "নিঘণ্ট" গ্রন্থে আছে; ইহা এক প্রকার ভেষজ দ্রব্য বলিয়াই মনে হয়। কস্তুরী তিন প্রকার; নেপালের কস্তুরী ধূসর, কাশ্মীরের হরিদ্রাবর্ণ, এবং

কামরূপের কৃষ্ণবর্ণ। ভাবপ্রকাশের মতে নেপালের কস্তুরী নীলবর্ণ, এবং কাশ্মীরের ধূসর। এই মতে কামরূপের কস্তুরী সর্বশ্রেষ্ঠ, তার পর নেপাল এবং কাশ্মীরের স্থান।

৪৩ "Kautilya's Arthasastra," Shamasastry's edn. p. 86 and f. n. 7.

৪৪ Ibid, p. 99 and f. n. 2. মহাভারতে উল্লেখ আছে, বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরবর্তী ম্লেচ্ছরা যুধিষ্ঠিরকে সোনা ও মুক্তা উপঢৌকন দান করিয়াছিল (II, 30, 27)।

৪৫ ১৬ নং পাদটীকা দেখুন।

৪৬ "Kautilya's Arthasastra" op. cit. p. 54. মহাভারতের যুদ্ধ দৃশ্যগুলিতে বঙ্গদেশীয় হস্তীর উল্লেখ আছে।

৪৭ "Kautilya's Arthasastra" op. cit. p. 90-91 with f. ns.

৪৮ "Periplus of the Erythrean sea", ed. by Schoff. op. cit.

৪৯ J. R. A. S., 1806, p. 495.

৫০ Yule's "Marcopolo", II, p. 115. পঞ্চদশ শতকের আর একজন চীন পর্যটক বাঙ্‌লাদেশের বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে বলিতেছেন, "Five or six kinds of cotton fabrics were manufactured, one of which called Pi-chih was of very soft texture, 3 feet wide and 56 ft. long. Another ginger-yellow fabric called Man-cheti was also produced, which was 4 ft. wide and 50 ft. long, etc." J. R. A.S, 1895., pp. 529-33, "Mahuan's Account of the Kingdom of Bengal", by G. Phillip.

৫১ "Materials for a critical edition of the old Bengali Caryapadas" by P. C. Bagchi op. cit, এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, প্রাচীন বাঙ্‌লা মূল পদ নং i, xxvi, x, ও ইহাদের তিব্বতী ও সংস্কৃত অনুবাদ; শেষোক্ত পদটির জন্য দ্রষ্টব্য নং xxv তিব্বতী ও সংস্কৃত অনুবাদ। সঙ্গে সঙ্গে বাগচী মহাশয়ের টীকাও দ্রষ্টব্য।

৫২ ১৪নং পাদটীকা দেখুন।

৫৩ ২৩ নং " "।

৫৪ Indian Hist. Quarterly, vol, vi, 1930, p. 45 ff.

৫৫ Ind. Ant. 1910, p. 193 ff.

৫৬ "আগে আনি গুয়াপান থুইলেক বিদ্যমান
মূল্য বঙ্গে কাঁড়ারী দুলাই।
একটি একটি পানে মরকত দশগুণে
গুয়াতে মাণিক্য যেন পাই।" ইত্যাদি
বংশীদাসের "মনসামঙ্গল", ৩৮০-৩৯০ পৃ।

"কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব
শুঠের বদলে টঙ্ক।"
কবিকঙ্কণের "চণ্ডীকাব্য", ১৯১ পৃ।

৫৭ Pliny, "Natural History" xii, 18. প্লিনির বক্তব্য হইতেছে, There was "no year in which India did not drain the Roman Empire of a hundred million Sesterces." এই মুদ্রা-পরিমাণ এখনকার ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার সমান।

৫৮ "Sanskrit Buddhism in Burma", Cal. Univ. 1936. pp. 93-94.

৫৯ "Brahmanical Gods in Burma," Cal. Univ. 1932; "Sanskrit Buddhism in Burma", Cal. Univ. 1936; "History of Theravada Buddhism in Burma" (in the press.)

৬০ N. G. Majumder, V. R. S. Monograph, No. 1.

৬১ "A Record of the Buddhist Religion...", by J-tsing. Ed. by J. Takakusu. Oxford. 1896.

৬২ N. N. Sen Gupta's edn. pp. 194-95। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে প্রাচীন বাঙ্‌লার স্থান কি ছিল, তাহার পরিচয় "মিলিন্দ-পঞ্‌হ" ও অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কিন্তু এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণ এত সুপরিচিত যে, তাহার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

হীরেন্দ্র-সংবর্দ্ধনা

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, ২৩এ নবেম্বর ১৯৪০, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷৽টা

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইলে পরিষদ্-তোরণে শানাই বাজিতে আরম্ভ হয় এবং দুইটি বালিকা শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করে। পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মাধ্যক্ষগণ এবং অন্যান্য সাহিত্যসেবিগণ অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে প্রথমে হলঘরে লইয়া যান। মন্দিরের প্রবেশ-পথ ও হলঘরটি শিল্পী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্ত্তৃক বিচিত্র আলিপনায় সজ্জিত হইয়াছিল। হলঘরের মাঝখানে সকলে দণ্ডায়মান হইলে আলোকচিত্র গৃহীত হয়। পরে হীরেন্দ্রবাবুকে মঞ্চোপরি লইয়া যাওয়া হয়। মঞ্চটিও মনোরম আলিপনায় চিত্রিত হইয়াছিল। সভাস্থ সকলে আসন গ্রহণ করিলে পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য আশীর্ব্বচন পাঠ করেন এবং হীরেন্দ্রবাবুর কপালে চন্দন-লেপন করেন। পরে নিম্নোক্তরূপ কার্য্যসূচী অনুসৃত হয়।

শ্রীযুক্ত কালীপদ পাঠক উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুকে মাল্যদান করেন।

পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নোক্ত মানপত্র পাঠ করেন,—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন

মহাশয়ের করকমলে—

হে মহাভাগ,

আপনার সুদীর্ঘ সাহিত্য ও কর্ম্ম-জীবনের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া বঙ্গদেশের সাহিত্য-সমাজের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে সাদর সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছে।

আপনি এই প্রতিষ্ঠানের পরম আত্মীয় ও সর্ব্বোত্তম সুহৃৎ; যে কয়জন অনন্যকর্ম্মা সুধী সাহিত্যিকের যত্ন ও চেষ্টায় দীর্ঘ সাতচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার জন্ম হইয়াছিল, আজ তাঁহাদের সকলেই সংসার হইতে বিদায় লইয়াছেন, একমাত্র আপনিই আপনার জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা ইহাকে যশোমণ্ডিত করিয়া চলিয়াছেন—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হে অদ্বিতীয় আজন্মবান্ধব, এই প্রতিষ্ঠানে আপনার পদাঙ্কানুসারী সেবক আমরা আপনাকে সশ্রদ্ধচিত্তে সগৌরবে বরণ করিতেছি।

কৈশোরে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি বঙ্গভারতীর সেবায় ঐকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া অর্দ্ধ শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল নিষ্ঠার সহিত বাণীসাধনায় রত আছেন; গীতা, ভাগবত, বেদান্ত ও উপনিষদের হিমালয়-চূড়া হইতে দুরূহ তপস্যার দ্বারা ভগীরথের ন্যায় রস-গঙ্গাকে আমাদের সাহিত্য-সংসারে বহন করিয়া আনিয়াছেন; সুদুর্লভ বৈষ্ণব-প্রেমের অধিকারী আপনি, সর্ব্ববিধ কঠিন দার্শনিক চিন্তা ও ভগবৎতত্ত্বকথাকে সরস সাহিত্য-রূপ দান করিয়া সাধারণের আস্বাদনীয় করিয়া তুলিয়াছেন, হে রসিক, হে প্রেমিক সাহিত্যস্রষ্টা, আমরা আজ আপনাকে সংবর্দ্ধিত করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইতেছি।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালীর যখন জাতীয় নবজাগরণ ঘটিল, বাঙালীর নবোদ্বুদ্ধ ভাবচেতনা বিবিধ মঙ্গলকর্ম্মে বিকাশলাভে উন্মুখ হইল, তখন আপনি স্বীয় জ্ঞান ও তপস্যা-মহিমায় শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্যের বিবিধ কল্যাণকর কাজে দেশবাসীকে প্রেরণা যোগাইয়াছেন এবং বহু দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী ও কর্ণধাররূপে বাঙালীকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছেন; অসংখ্য কর্ম্মবন্ধনের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও আপনার কল্যাণহস্ত শিথিল হয় নাই—হে অনন্যব্রতী দেশসেবক, আমরা আপনাকে নমস্কার নিবেদন করিতেছি।

হে দার্শনিক, আপনার কাব্যরসধারায় স্নান করিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি; আপনার সুললিত ছন্দানুবাদে ভারতের কালিদাস ও বাংলার জয়দেবকে আমরা একান্ত নিজস্ব করিয়া পাইয়াছি; ভাগবতের রসসমুদ্রে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। কাব্য, বিজ্ঞান ও দর্শন আপনাতে একত্র মিলিত হইয়াছে; আপনার লেখনীনিঃসৃত অমৃতধারায় আমরা নিরন্তর অভিষিক্ত হইতেছি; হে কবি, আমাদের সপ্রেম অভিবাদন গ্রহণ করুন।

হে তপস্বী, যৌবনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট আপনি দীক্ষালাভ করিয়াছেন, কবি নবীনচন্দ্রের নিকট কাব্য-প্রেরণা পাইয়াছেন এবং প্রসিদ্ধ ঈশ্বরতত্ত্ববাদীদের সান্নিধ্যে আপনার ভাগবতী চেতনা জাগ্রত হইয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য, নবীনচন্দ্রের প্রিয় বান্ধব এবং বঙ্গদেশে ঈশ্বরতত্ত্ববাদীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, হে হীরেন্দ্রনাথ, আমাদের সম্মিলিত শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করুন।

আপনার ঐকান্তিক সাধনায় ও অকুণ্ঠ সেবায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তথা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নব নব সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, আপনি শতায়ুঃ হইয়া ইহার অধিকতর কল্যাণ সাধন করুন—শ্রীভগবানের কাছে আজ আমাদের ইহাই একান্ত প্রার্থনা। আপনার আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করিয়া আমরাও যেন এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিতে পারি—অদ্যকার শুভদিনে আমরাও আপনার নিকট সেই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

আপনি প্রসন্নচিত্তে আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

॥ বন্দে মাতরম্ ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা, ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭

মান-পত্র পাঠের পর সম্পাদক মহাশয় পরিষদের অন্যতম বান্ধব মহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের পক্ষ হইতে মুর্শিদাবাদের একটি গরদের জোড় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে অর্পণ করেন।

অতঃপর হীরেন্দ্রবাবুর শিষ্যস্থানীয় কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম. এ. মহাশয় কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া গুরুবন্দনা করেন, এবং রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর ভারতীয় প্রাচীন প্রথানুবর্ত্তী হইয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুকে যে একটি শমীবৃক্ষ উপহার পাঠাইয়া দেন, তাহা প্রদান করা হয়। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় স্বরচিত নিম্নোক্ত "কবি-প্রশস্তি" পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

কবি-প্রশস্তি

জ্ঞানের সাধনা লভে পরিণতি কঠিন ব্রহ্মবাদে,
পিছে প'ড়ে থাকে কুরুক্ষেত্র প্রভাস রৈবতক ;
সংসার-ত্যাগী যাজ্ঞবল্ক্যে মৈত্রেয়ী শুধু সাধে—
ঈশ্বরবাদ খুঁজিতে ব্যাকুল গীতার অধ্যাপক।
উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব বেদান্ত-পরিচয়,
কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর, বৌদ্ধ-নাস্তিকতা—
অবতাররূপী ঈশ্বর যাঁর ধরায় অভ্যুদয়,
তত্ত্বে তাঁহার ছিল একদিন জ্ঞানের সার্থকতা।
অদ্বৈতের বাদ-প্রতিবাদ যাজ্ঞবল্ক্য জানে,
নীরস সাংখ্য করিল প্রচার জীবন্মুক্তি-বাণী ;
কৃষ্ণতত্ত্বে বঙ্কিম, কথা কহে পণ্ডিত-কানে,
দার্শনিকের ঘটে বিভ্রম চঞ্চল হয় প্রাণী।
পাণ্ডিত্যের কূট-আবর্ত্তে ভরা তরীখানি ডোবে,
অতল সলিলে শুষ্কজ্ঞানের দুঃসহ নির্ব্বাণ!
হে তাপস, তব ভারতী সেদিন কাঁদিল মনঃক্ষোভে,
তখনো বীণার বাকি ছিল তার, থামে নি ললিত তান।

সযতনে তুমি কম্পিত হাতে আবার বাঁধিলে বীণা,
ঊষর মরুতে শ্যাম তৃণরাজি সহসা শিহরি উঠে,
প্রসন্ন হাসি হাসিলেন মাতা শুষ্ক-সাধন-ক্ষীণা—
শতদলদল করে টলমল রাঙা ও চরণপুটে।
সেদিনের সেই গতি বিপরীত তারই আনন্দে কবি,
এ যুগের কবি করিল রচনা তব বন্দনা-গান,

রাসলীলা আর মেঘদূত আঁকে মানব-মনের ছবি—
প্রেমের বাতাসে জ্ঞানের তটিনী হরষে বহে উজান।
কে ছিল প্রবীণ—জ্ঞানেতে বৃদ্ধ, কে ছিল তত্ত্ববাদী,
হিসাব তাহার পারে নি রাখিতে আকাশে জ্যোৎস্নাধারা,
কাননে কুসুম মেঘে মেঘে রঙ ছিল মায়াজাল ফাঁদি,
কৃষ্ণরাধার প্রেমে শুকসারী খাঁচায় আত্মহারা।
হে কবি, তোমায় বন্দি রূপকে, বুঝিবে তুমি তা জানি,
প্রেমিক, তোমার চরণে জানাই শতেক নমস্কার।
আধেক চিনেছি, চিনি না আধেক, তাতে বল কিবা হানি—
কৃষ্ণজন্মে হাসে একদিন কংসের কারাগার।

প্রেমের ধর্ম্মে বুঝে নিও কবি, কি আমি বলিতে চাহি,
শেষ কথা তুমি জীবনের শেষে বুঝিয়াছ জানিয়াছি,
ব্রজগোপীদলে নিজে ভগবান্ পারে নেন তরী বাহি,
গোপালের রূপে শ্রীহরি স্বয়ং ফিরিছেন ননী যাচি।
এই শেষ কথা, হে কবি প্রেমিক, তোমার লেখনীমুখে,
শুষ্ক জ্ঞানের মরুভূমি মাঝে টলমল সরোবর,
তোমারে খুঁজেছি, তোমারে পেয়েছি, তোমারে ধরেছি বুকে,
কবির চরণে কবির অর্ঘ্য কাব্যেই মনোহর।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরিত নিম্নোদ্ধৃত বাণী পঠিত হয়—

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্বর্দ্ধনা করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, এ সংবাদে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। সাহিত্য-সমাজে হীরেন্দ্রবাবু যে সমুচ্চ সম্মানের যোগ্য, তাহারই ঘোষণার সংকল্পে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।"

এই সংবর্দ্ধনা-সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া (ক) বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহ্‌তাপ বাহাদুর, (খ) শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, (গ) কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, (ঘ) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং (ঙ) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলি পঠিত হয়।

অতঃপর সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেন, স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু দেশের স্থায়ী উপকারের দিকে মনোযোগ দিয়াছিলেন। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের কর্ণধাররূপে তিনি নীরবে নিভৃতে বহু বৎসর উহার সেবা

করিয়াছেন। দার্শনিক ও সাহিত্যিক হিসাবে তিনি দেশের প্রকৃত সেবা করিতেছেন এবং তাঁহার অন্তরের সমস্ত প্রেরণা বঙ্গভাষার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মাবধি ইহার বর্ত্তমান উন্নত ও সমৃদ্ধ ইতিহাসের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, তিনি পরিষদের সহিত কিরূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে এই পরিষদের জীর্ণ মন্দির সংস্কার, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থাবলীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশ, কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিম-ভবন সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার জীবন অতি বিচিত্র এবং দেশের পক্ষে হিতকারী। আজ দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন—নেতা কই!—কাজ কই! শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, ফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে কাজ করিতে হইবে। বিবেকানুমোদিত পথে চলিলে ফল হইবেই হইবে—এই শিক্ষা তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন।

উত্তরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু বলেন, দীর্ঘ ৫০ বৎসরকাল আমি বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছি। ৪৭ বৎসর পূর্ব্বেকার ক্ষুদ্র বীজ আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্রূপ প্রকাণ্ড মহীরুহরূপে দেখা দিয়াছে এবং বহু ঝঞ্ঝা ও বিপদের ভিতর দিয়া উহা অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত ও এক্ষণে ফলভরে অবনত হইয়াছে। এই সাহিত্য-পরিষদ্‌কে আশ্রয় করিয়া শত প্লাবনের ভিতরেও জাতীয় জীবনতরী সাফল্যের মন্দিরে নিশ্চিতরূপে পৌঁছিতে সক্ষম হইবে। যে দিন আমি শেষ শয্যা গ্রহণ করিব, সে দিন এ কথা ভাবিয়া গৌরব বোধ করিব যে, পরিষদের সেবকরূপে দীর্ঘকাল বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া আমি পরমধামে যাত্রা করিতেছি। আজ এই বৃদ্ধ বয়সে যদি স্তুতিরস অঞ্জলি ভরিয়া পান করি, তবে আপনারা বিস্মিত হইবেন না।

সভার শেষে সঙ্গীতাদির জলসা বসে, শ্রীযুক্ত কালীপদ পাঠকের টপ্পা গান, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবৃত্তি ও শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ দাসের ম্যাজিক সভাস্থ সকলকে বিশেষভাবে আনন্দ দান করে। সর্ব্বশেষে জলযোগে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।

নিম্নোক্ত হিতৈষিগণ অর্থ সাহায্য করিয়া এই অনুষ্ঠানের সাফল্য সম্পাদন করেন।

শ্রীযুক্ত	অনঙ্গমোহন সাহা	১৲		জের	১৫৲
”	অনাথগোপাল সেন	১৲	শ্রীযুক্ত	গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
”	অনাথনাথ ঘোষ	১৲	”	গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
”	অনাথবন্ধু দত্ত	১৲	”	চন্দ্রকুমার সরকার	১৫৲
”	অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৫৲	”	চারুচন্দ্র বিশ্বাস সি. আই.ই.	২৲
”	ঈশানচন্দ্র রায়	২৲	”	কুমার জগদীশচন্দ্র সিংহ	১০৲
”	রেভাঃ এ. দৌতেন	২৲	”	জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
”	খগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর	২৲	”	জনৈক অনুরাগী	৫৲
		১৫৲			৫০৲

জের	৫০৲
শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়	১৲
" দেবপ্রসাদ ঘোষ	১৲
" দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
" ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়	১৲
" ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী	২৲
" পুলিনবিহারী সেন	১৲
" প্রফুল্লকুমার সরকার	১৲
" স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১৫৲
" মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহ্‌তাপ বাহাদুর	১৫৲
" বিভাস রায় চৌধুরী	১৲
" কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ	৩০৲
" ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া	১৲
	১২১৲

জের	১২১৲
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" মন্মথমোহন বসু	১৲
" মৃণালকান্তি ঘোষ	২০৲
" যতীন্দ্রনাথ বসু	৩০৲
" স্যর যদুনাথ সরকার	১৫৲
" কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়	৫৲
" শান্তি পাল	১
" শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	১৲
" সজনীকান্ত দাস	২৲
" সতীশচন্দ্র বসু	১৲
" সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
" সুরেশচন্দ্র মজুমদার	১৲
	২০১৲

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
১৩৪৭

মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্-এ, ডি লিট

মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাস ভাল করিয়া চর্চ্চা করিতে গিয়া মহাবিপদে পড়িতে হয়। কি হিন্দুসমাজ, কি মুসলমান শাসকগণ, কাহারও সম্বন্ধেই বিস্তৃত সমসাময়িক লিখিত উপকরণ পাওয়া যায় না। মুসলমান-শাসিত ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশের পৃথক্ ইতিহাস পারসিক ভাষায় লেখা দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক পত্রাবলীও রক্ষা পাইয়াছে। বাঙ্গলার পক্ষে সেরূপ ইতিহাস একখানি মাত্র, রিয়াজ-উস-সলাতীন, তাহাও আবার পলাশীর যুদ্ধের ত্রিশ বৎসর পরে ইংরাজ আমলে ইংরাজের আজ্ঞায় লেখা। এই বইখানি যদি সমস্ত পূর্ব্ব-লিখিত সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইত, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না; কারণ, সংকলন যখন বিশুদ্ধ হয়, তখন তাহা অনেকটা আসলের অভাব পূরণ করিতে পারে। আজ দেখাইব যে, মুসলমান-বাঙ্গলার এই সবে-ধন নীলমণি রিয়াজ কত দূর বিশ্বাসের অযোগ্য এবং তথ্যবিহীন।

বাঙ্গলার জন্য একখানিও স্বতন্ত্র প্রাদেশিক ইতিহাস মুসলমান-শাসনকালে (অর্থাৎ ৫৫৭ বৎসরের মধ্যে) লিখিত না হইলেও, বাঙ্গলার ঘটনা অনেক স্থলে সমসাময়িক দিল্লীর ফার্সী ইতিহাসের মধ্যে অংশরূপে স্থান পাইয়াছে; সুতরাং তখনকার দিনের বাঙ্গলার আমরা "মাঝে মাঝে দেখা পাই, ক্রমাগত পাই না"। এবং এই দেখাও রাজারাজড়া এবং যুদ্ধ ও খুনের সহিত, দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে নহে। তথাপি ইহাই আকবরের পূর্ব্ববর্ত্তী (অর্থাৎ তথাকথিত "পাঠান" যুগের) বাঙ্গলা সম্বন্ধে খাঁটি ও তারিখযুক্ত সংবাদ পাইবার একমাত্র আধার। এই শ্রেণীর দিল্লীর ইতিহাস তিন খানি—তব্‌কাৎ-ই-নাসিরী, জিয়াবর্ণী-কৃত তারিখ-ই-ফিরোজশাহী এবং আফিফ-কৃত পরিশিষ্ট (যাহাতে ফিরোজ তুঘলকের ৬ষ্ঠ রাজ্যসন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আছে) এবং নিজামুদ্দীন আহমদের তবকাৎ-ই-আকবরীর বাঙ্গলা সম্বন্ধে অধ্যায়টি। এগুলি সব ইংরাজীতে অনুবাদ হইয়াছে।

মুদ্রা এবং শিলালিপি হইতে আমরা যে নাম ও তারিখ পাই, তাহার সাহায্যে "পাঠান" যুগের সুলতানদের নাম ও রাজ্যকাল আমরা এখন সঠিক জানিতে পারি এবং এইরূপে রিয়াজ এবং অন্য গ্রন্থের ভুল সংশোধন করি; কিন্তু ইহা ইতিহাসের কঙ্কাল মাত্র দেয়। শের শাহ কর্ত্তৃক বাঙ্গলার স্বাধীন মুসলমানরাজ ধ্বংস (১৫৩৯) হইতে আকবরের দ্বারা বঙ্গ-

বিজয় (নামতঃ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, কার্য্যতঃ ১৬০২ সালে) পর্য্যন্ত যে প্রকৃত পাঠান-যুগ ছিল, তাহার প্রামাণিক ইতিহাস নিয়ামৎ-উল্লা কৃত মখ্‌জন্-ই-আফাঘানা ; ইহা ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হইলেও খুব মূল্যবান্ ; কারণ, পাঠান-বাঙ্গলা সম্বন্ধে ইহাতে অনেক খবর আছে, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। যে আধার হইতে এই গ্রন্থকার তাঁহার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলির প্রায় সবই এখন লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তিনি হয় পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ হইতে অথবা বৃদ্ধের মুখ হইতে অনেক সত্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানির ইংরাজী অনুবাদ *History of the Afghans*, by Bernard Dorn, in two parts (London 1829) বড়ই অশুদ্ধ ও অসুবিধাজনক অনুবাদ। তাহার কারণ, ঐ জর্ম্মান সাহেব ভারতীয় স্থান ও লোকের নাম ঠিক পড়িতে পারেন নাই ; দ্বিতীয়তঃ, ঐ গ্রন্থের দুই ধরণের পাঠযুক্ত হস্তলিপি পাওয়া যায়, একখানি গ্রন্থকারের আসল বিস্তৃত রচনা, অপরখানি উহার এক ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্তসার (অনেক অংশ বাদ দিয়া, কোন নকলনবিসের দ্বারা প্রস্তুত)। ডর্ণ সাহেব প্রথমে ঐ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থখানি অনুবাদ করিয়া তাহা প্রথম খণ্ড নামে ছাপাখানায় দিয়া, বিলাত হইতে চলিয়া যাইবার দু-এক দিন আগে আসল ও বিস্তৃত গ্রন্থের এক হস্তলিপি সংগ্রহ করেন এবং পরে তাহা হইতে প্রথম ভাগের পদে পদে সংশোধন ও আবশ্যক বেশী কথাগুলি সংযোগ করিয়া দিয়া তাহাই দ্বিতীয় খণ্ড নামে ছাপেন। সুতরাং এই বই এক সময়ে দুই স্থানে না খুলিলে ইহা পড়া যায় না।

নিজামুদ্দীন্ আহমদ্ কোন্ কোন্ গ্রন্থ হইতে তাঁহার বঙ্গ-ইতিহাসের অধ্যায়টি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু তিনি মুঘল-পূর্ব্ব যুগের ইতিহাসের কঙ্কাল মাত্র দিয়াছেন, এবং তাহা প্রায়শই বিশ্বাসযোগ্য। এখানে সাবধান করিয়া দিই যে, তারিখ-ই-দাউদীর কোন স্বাধীন মূল্য নাই, ওটা সংকলন মাত্র। মুঘল-সাম্রাজ্য স্থাপনের ঠিক প্রথম কালে শের শাহের সহিত বাঙ্গলার সুলতানের ও বঙ্গদেশে হুমায়ূন বাদশার যে সংঘর্ষ হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আব্বাস-কৃত শের শাহের ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গলার লোক ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ইহাতেও খবর নাই বলিলেই হয়।

তাহার পর মুঘল যুগ আরম্ভ ; এখন হইতে আমরা সঠিক ও ধারাবাহিক সংবাদ পাই, এবং আমার দ্বারা প্যারিস রাষ্ট্রীয় পুস্তকাগারে আবিষ্কৃত পারসিক হস্তলিপি "বহারিস্তান" শুধু বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসামের ১৮ বৎসর (১৬০৮-১৬২৫) ব্যাপী অতি বিস্তৃত স্বতন্ত্র ইতিহাস। তাহার পর মীরজুমলার আসাম-অভিযান এবং শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক চাটগাঁ অধিকারের তালিশ-রচিত দীর্ঘ বিবরণ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন আর সব সংবাদ দিল্লীর সরকারী ইতিহাসের অংশরূপে পাওয়া যায়। এই শেষ শ্রেণীর ইতিহাসের প্রথম এবং সর্বাধিক মূল্যবান্ দৃষ্টান্ত আবুলফজলের আকবরনামা। এই গ্রন্থ লিখিতে সাহায্য করিবার জন্য আকবর বাদশাহ হুকুম দিলেন যে, সব প্রদেশ হইতে সেখানকার পূর্ব্ব ইতিহাস, স্থানবর্ণনা, আয়ব্যয়, বাণিজ্য শিল্পের বৃত্তান্ত ইত্যাদি সংকলন করিয়া আবুলফজলের নিকট পাঠাইতে হইবে। যে-সব তথ্য আমরা আজকালকার ইংরাজী গেজেটিয়ার এবং ষ্টটিষ্টিকাল রিপোর্টে পাই, ভারতে সেগুলি এই প্রথম সংগৃহীত হয়, এবং

এগুলি প্রায়শঃ আইন্-ই-আকবরীতে, এবং অংশতঃ আকবরনামাতে স্থান পাইয়াছে। তাহার উপর বাদশাহের দপ্তরখানাতে যে-সব সরকারী চিঠি ও রিপোর্ট এবং সেনানীদের ডেস্প্যাচ্ রক্ষিত ছিল, তাহা সমস্ত আবুলফজ্লকে দেখিতে ও নকল করিতে দেওয়া হইল। ইহার ফলে আকবরনামা এক অতুলনীয় প্রামাণিক গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজামুদ্দীন আহমদ ও বদায়ূনী যদিও আকবরের রাজ্যকালের ইতিহাস তাঁহাদের বৃহৎ ইতিহাসের অংশরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা কেহই আবুলফজলের মত রেকর্ড দেখিয়া লেখেন নাই, শুধু বাজার-গুজবের উপর অথবা দু-এক জন নিম্নপদস্থ প্রত্যক্ষদ্রষ্টার কথার উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন। নিজামুদ্দীন আহমদ স্পষ্টই লিখিয়াছেন (লক্ষ্ণৌ লিথো, ২৪২ পৃষ্ঠায়)—"যদিও আল্লামী শেখ আবুলফজল বাদশাহ আকবরের জন্ম হইতে আজ তাঁহার রাজ্যকালের ৩৮ ইলাহী বৎসর=১০০২ হিজরী (১৫৯৩ খৃঃ) পর্য্যন্ত ছোট বড় সমস্ত ঘটনা তাঁহার আকবরনামা-নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি যখন আমি ভারতের সমস্ত সুলতানদের ইতিহাস লিখিতে লাগিয়াছি, তখন আকবর বাদশাহের রাজ্যকালের ঘটনাগুলির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। অতএব সেই অসীম সমুদ্র হইতে কয়েকটি ফোঁটা তুলিয়া লইয়াছি…।" ইহাতেই বুঝা যায় যে, তিনি আকবরনামা পড়িবার পর তাহা হইতে নিজ ইতিহাসের ঐ অংশ সংগ্রহ করেন।

বদায়ূনী ইহার কয়েক বৎসর পরে নিজ গ্রন্থ লেখেন, এবং তাহাতে অনেক স্থলে লিখিয়াছেন,—"পাঠক এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আকবরনামায় পাইবেন।" সুতরাং এই দুইখানি গ্রন্থই আকবরের রাজ্যকাল সম্বন্ধে মৌলিক প্রামাণিক গ্রন্থ নহে, ইহাদের আকবর-নামার সঙ্গে এক শ্রেণীতে বসান যায় না। হয়ত দুই-একটি ঘটনা, যেখানে এই দুজন লেখকের মধ্যে কেহ সশরীরে উপস্থিত ছিলেন—যেমন হলদিঘাট-যুদ্ধে বদায়ূনী—সেখানে তাঁহার উক্তি অত্যন্ত মৌলিক বলিয়া মানিয়া লইব, কিন্তু বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের কাহারই চাক্ষুষ জ্ঞান ছিল না। সুতরাং আমাদের প্রায় সকল লেখকই যে লেখেন—"আকবরনামাতে অমুকের নাম (বা রাজ্যকাল) এইরূপ, বদাউনী অন্যরূপ, ফিরিষ্‌তা এইরূপ, তবকাৎ ঐরূপ লিখিয়াছে—(এমন কি) রিয়াজ অন্যরূপ বলেন"—তাহা ইতিহাসের দৃষ্টিতে অসার উক্তি মাত্র। মখ্‌জন্ ও আকবরনামার বিরুদ্ধে যে-যে স্থানে রিয়াজ কোন উক্তি করিয়াছে, তাহা একেবারে বিবেচনার অযোগ্য। এবং তাহা লইয়া আলোচনা করাও সময়ের অপব্যয় মাত্র; কারণ, ১৭৮৭ সালে লিখিত এই পুস্তকে গ্রন্থকর্ত্তা কোনই প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধৃত, এমন কি, নাম উল্লেখ করিতে পারেন নাই। সূক্ষ্মভাবে রিয়াজ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে গ্রন্থকার মালদহে বসিয়া আকবরনামা, মখ্‌জন্ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ একেবারেই পান নাই, তৃতীয় শ্রেণীর কোন আধুনিক সংকলন মাত্র পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ভুলের দৃষ্টান্ত এত বেশী যে অতি সাংঘাতিক দু-একটি মাত্র এখানে উল্লেখ করিব :—(১) নসীরউদ্দীন মহমুদ এবং তাঁহার পৌত্র নসীরউদ্দীন ইব্রাহীমকে, এক ব্যক্তি

ভাবিয়া তাঁহার রাজ্যকাল ২৬ বৎসর লেখা হইয়াছে (শুদ্ধ কাল ৬ বৎসর)। "সুলেমান কর্‌রাণী ২৫ বৎসর বিহার বঙ্গে শাসন করেন," এই অসম্ভব কথা ফিরিষ্‌তা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে ; তাজ খাঁকে ধরিলেও অনেক কম বৎসর হয়। মুদ্রিত পারসী গ্রন্থে ১৫৪ পৃষ্ঠায় সুলেমান কর্‌রাণীকে যে কুচরিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে তৎপুত্র বায়াজিদের সম্বন্ধে সত্য (মখ্‌জন্ দ্রষ্টব্য) ; এটি রিয়াজের একটি মারাত্মক ভুল।

আরও একটি হাস্যাস্পদ ঐতিহাসিক ভুল ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে (১৮১৩ খ্রীঃ প্রকাশিত) ডাউ নামক কাল্পনিক লেখককে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিবার ফলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং তাহাই পাঠ করিয়া বঙ্কিম তাঁহার "দুর্গেশনন্দিনী"র কাঠামো কল্পনা করেন। ডাউ-এর পারসিক জ্ঞানের অভাব এবং অতিরঞ্জিত কাহিনী সৃষ্টি করিবার অসাধু আগ্রহ ও মজ্জাগত অভ্যাসকে স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্ এবং গীবন নিন্দা করিয়াছেন। মানসিংহের পুত্র কুমার জগৎসিংহ মদিরামত্ত অবস্থায় কৎলু খাঁর সেনাপতি বাহাদুর করুঃ কর্তৃক পরাজিত ও আহত হইয়া বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের যত্নে সেই রাজধানীতে পলাইয়া গিয়া বাঁচেন, ইহাই সত্য ঘটনা—এবং ইহা আবুলফজল বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ ডাউ লেখেন যে, কুমার জগৎসিংহ কৎলুর দুর্গে বন্দিভাবে নীত হন, এবং কৎলুর মৃত্যুর পর পাঠানেরা তাঁহাকে মুক্তি দিয়া তাঁহার মধ্যস্থতায় মানসিংহের সহিত সন্ধি করে,—অর্থাৎ যেমন আমরা 'দুর্গেশনন্দিনী'র শেষে পড়ি।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৫

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক

মধুসূদন তর্কালঙ্কার

সংস্কৃত কলেজের গোড়া হইতে সেক্রেটরীরূপে প্রধানতঃ এক জন সাহেব কলেজের কার্য্যপরিদর্শনাদি করিতেন ; ১৮৫১ সনের পূর্ব্বে প্রিন্সিপ্যাল বলিয়া কোন পদ ছিল না।

ক্যাপ্টেন জি. টি. মার্শেল যখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী, সেই সময় কার্য্য-পরিচালনের সুবিধার জন্য মধুসূদন তর্কালঙ্কারকে অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী বা সহকারী সম্পাদক রূপে নিযুক্ত করিবার সুপারিশ করিয়া তিনি ১৮৩৯ সনের মে মাসে শিক্ষা-বিভাগকে পত্র লেখেন। তিনি তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী এবং মধুসূদন তর্কালঙ্কার ঐ কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার।

শিক্ষা-বিভাগ সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ মঞ্জুর করিয়া পরবর্ত্তী ২৬শে জুলাই তারিখে জানাইলেন :—

> I am directed by the General Committee of Public Instruction to acknowledge the receipt of your letter of the 18th ultimo and in reply to state that it sanctions the nomination of Madhusudan Tarkalankar, as Assistant Secretary to the Sub-Committee of the Sanscrit College on a monthly salary of fifty Rupees (50) on condition that his duties at the College of Fort William as Sheristadar will enable him to perform the duties of this appointment efficiently.
>
> The salary will commence from the 1st proximo.*

এখানে বলা প্রয়োজন, সহকারী সম্পাদকের কার্য্যতালিকা প্রধানতঃ এইরূপ ছিল :—প্রতি মাসে কলেজের বিভিন্ন শ্রেণী পরীক্ষা করিয়া ফলাফল সম্পাদককে জানান, অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলেজে হাজির হইতেছে কি না সেদিকে নজর রাখা, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা, প্রভৃতি।

মধুসূদন তর্কালঙ্কারই সংস্কৃত কলেজের প্রথম সহকারী সম্পাদক। তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। কলেজ হইতে প্রাপ্ত তাঁহার প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :—

No. 42.
Government Sanscrit College of Calcutta.

We hereby certify that Madhusudana Tarkalankara has attended at the Government Sanscrit College for ten years six months and studied the following branches of Hindoo Literature Poetry, Rhetoric, Arithmetic, Law, Bhagabat and English, that he

* Letter dated 26 July, 1839 from the Secy. General Committee of Public Instruction, to Capt. G. T. Marshall, Secy. to the Sub-Committee, Sanscrit College.

has attained considerable proficiency on the subject of these studies, and that he conducted himself well.

Fort William
the 15th Jany. 1835

Sd. A. Troyer,
Secy. Govt. Sans. Coll.

T. B. Macaulay
H. Shakespear
A. Smith
W. H. Macnaghten
G. A. Bushby
J. Prinsep
R. J. H. Brich
J. R. Colvin
J. Grant
J. C. C. Sutherland

Members, Genl. Commee. of P. Inst.

তর্কালঙ্কার প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া তিনি ১ আগষ্ট ১৮৩৯ হইতে মাসিক ৫০৲ বেতনে অতিরিক্ত কার্য্য হিসাবে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪১ সনের ৯ই নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগের তারিখ—১ জানুয়ারি ১৮৪২। এই পদে কিছু দিন কাজ করিবার পর ২ মার্চ ১৮৪৫ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিদ্যাবাগীশ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ ১০১-১৩) আমি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি—এখানে সে-সকল কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

গোবিন্দ শিরোমণি

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ অসুস্থতার জন্য সংস্কৃত কলেজের কার্য্য হইতে অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে গোবিন্দ শিরোমণি ঐ পদের অর্দ্ধ বেতনে, অর্থাৎ মাসিক ২৫৲ হারে, সহকারী সম্পাদকের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে শিরোমণি ১ জুন ১৮৩৯ হইতে ৩০ এপ্রিল ১৮৪৪ পর্য্যন্ত হিন্দু-ল পরীক্ষা কমীটির পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি এক বৎসর কাল—১১ জুন ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৫ সনের জুন মাসের প্রায় শেষাশেষি পর্য্যন্ত—সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম—৪০ বৎসর।

এই গোবিন্দ শিরোমণিকে আমি পূর্ব্বে ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৪৫শ বর্ষ, পৃ. ১০৯) কুমারহট্ট-নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পুত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা অভিন্ন নহেন বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ তর্কবাগীশের পুত্র এই সময় হুগলী কলেজের পণ্ডিতের পদে কার্য্য করিতেছিলেন।

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের শূন্য পদে ২৬শে জুন ১৮৪৫ হইতে রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।*

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মাতামহ। শাস্ত্রী-মহাশয় রামমাণিক্য সম্বন্ধে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৩৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২১৫-১৮) একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

বরিশাল জেলায় কলশকাঠী নামে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে। তথাকার রায় মহাশয়েরা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ভঙ্গ। তাঁহারা অনেক পুরুষ ধরিয়া কলশকাঠীতে কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করাইতেছেন। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে মুকুন্দরাম নামে এক ব্রাহ্মণ রায় মহাশয়দিগের আশ্রয়ে তথায় বাস করেন। তাঁহার বংশ বিস্তৃত না হইলেও অনেক পণ্ডিত এ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের পৌত্র রামমাণিক্য ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মান।...তিনি বাড়ীতেই ব্যাকরণাদি বালশাস্ত্র পড়েন এবং ন্যায়শাস্ত্রের কিছুদূর পড়িয়া, নৈহাটীতে মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিয়া ব্যাপ্তিখণ্ড ও শব্দখণ্ড অধ্যয়ন করেন।...রামমাণিক্য কলশকাঠীতে টোল করিলেন।...কিন্তু বেশীদিন তিনি কলশকাঠীতে থাকিতে পারিলেন না।...রামমাণিক্য আসিলেন বরাহনগরে।

কাশীপুরে তখন রামরত্ন রায় মহাশয় একজন বড় জমীদার।...রামরত্ন রায় মহাশয় রামমাণিক্যের পরিচয় পাইয়া ও তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও আভিজাত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন এবং প্রথম সুযোগেই বরাহনগর হইতে উঠাইয়া আনিয়া কাশীপুর ঘাট রোডের উপর অনেক জমিজায়গা দিয়া টোল ও বাড়ী করিয়া দিলেন। রামমাণিক্যের অনেক ছাত্র জুটিল।...

বহু বৎসর এইরূপে দক্ষতা ও সম্মানের সহিত অধ্যাপনার পর রামরত্ন রায়ের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটিল।...

১৮২৪ সাল হইতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন হইয়া অবধি রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারকে ন্যায়ের পণ্ডিত করিয়া লইয়া যাইবার অনেকবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু বেতন লইয়া পড়ান—বিশেষ ম্লেচ্ছ গবর্ণমেণ্টের বেতন লওয়া তাঁহার অকার্য্য বলিয়া মনে হইত। এখন তিনি বলিলেন যে, খোষামোদ অপেক্ষা পাপ ভাল, খোষামোদ করিতে গিয়া ব্রহ্মহত্যাও দেখিতে হয়, পাপে আর সেটা হয় না। এইরূপ মনের ভাব লইয়া এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে এই সব কথা বলিয়া তিনি কলেজে আসিয়া নিজে কর্ম্মপ্রার্থী হইলেন, তখন অন্য কাজ খালি ছিল না, এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ খালি ছিল।...

রামমাণিক্য সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াই কর্তৃপক্ষের নিকট একটি প্রস্তাব করেন; প্রস্তাবটি এইরূপ :—

2. The Assistant Secretary proposes to devote an hour of his time daily in giving lectures on the higher branches of the Nyaya Philosophy to which he wishes the students of high attainments of his own private seminary as well as other seminaries in Calcutta should be at liberty to attend.†

* . . . . I have the honor to report that Rammanikya Vidyalankar assumed charge of the office of the Assistant Secretary to this Institution this day.—Russomoy Dutt, Secretary, Sanskrit College, dated 26 June 1845, to the Secy. to the Council of Education.

† Letter dated 26 June, 1845 from the Secretary, Sanskrit College to the Secretary, Council of Education.

কলেজে একটি স্বতন্ত্র ন্যায়-শ্রেণী থাকায় সহকারী সম্পাদক বিদ্যালঙ্কারের প্রস্তাবে শিক্ষা-সংসদ সম্মত হন নাই।

রামমাণিক্যের খ্যাতি বহু বিস্তৃত ছিল। তিনি ধর্ম্মসভার এক জন অধ্যক্ষ ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে প্রায় এক বৎসর কার্য্য করিবার পর রামমাণিক্য ২৬ মার্চ ১৮৪৬ তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত পরবর্ত্তী ২৮ মার্চ তারিখে শিক্ষা-সংসদকে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> With regret I beg to report the death of Rammanikya Vidyalankar, Assistant Secretary to this Institution on Thursday, the 26th instant.
>
> 2. The deceased was a Pundit of very great eminence in Bengal and a worthy successor to Ramchunder Vidyabageesha. . . .

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। ৯ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সেরেস্তাদার মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হইলে, তিনি কলেজের সেক্রেটরী ক্যাপ্টেন মার্শেলের চেষ্টায় সেরেস্তাদারের পদ লাভ করেন (২৯ ডিসেম্বর ১৮৪১)। এই পদে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল কার্য্য করিবার পর বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার সুবিধা মিলিল। যে-প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের ইচ্ছা তিনি মনে মনে পোষণ করিতেন।

১৮৪৬ সনের ২৬এ মার্চ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের পরলোকগমনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। বিদ্যাসাগর এই পদের জন্য আবেদন করিলেন (২৮ মার্চ)। তাঁহার আবেদনপত্রখানি ইংরেজীতে লিখিত; পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

To

Baboo Russomoy Dutt,

Secretary to the Govt. Sanscrit College, Calcutta.

Sir,

Understanding that the situation of Assistant Secretary to the Government Sanscrit College has been left vacant by the death of the late incumbent Rammanikya Bidyalankar I beg to present myself as a candidate for the same.

As regards my qualifications, I beg to observe that I had the honor to be educated in the above Institution where I was fortunate enough to obtain many honors and distinctions. Besides I have the honor to hold the office of Sheristadar of the Bangallee Department of the College of Fort William, to which I was appointed in 1841 since which time from the nature of my duties and the Institution being a seat of learning I have improved my knowledge to a considerable degree and in addition I have given much attention to acquire proficiency in the system of Sankhyh Philosophy and the Puranahs, branches which do not fall within the regular course of Education afforded by your College.

In the examinations for scholarships which Capt. Marshall the Secretary to the College of Fort William undertook for the Sanscrit College for the last four years I was kindly allowed the honor of taking an active part in preparing questions and examining the answers thereunto. And I believe I have discharged my share of this duty in

a manner which afforded perfect satisfaction to the parties concerned, *viz.* the worthy examiner and the Professors and students of the Institution. This, together with my long connection with the college as a student has given me an intimate knowledge of the system of education pursued there, and inspires me with confidence that in case my services are accepted I shall prove useful to the Institution. But I confess that in offering my services it is in the hope that the emoluments attached to the situation may be increased to a higher degree, for it would not be prudent that I should quit my present office for one so troublesome without an adequate remuneration, and I respectfully submit that the present salary is very small for a duly qualified person who is expected to give his whole time to the duties.

The copies of testimonials are herewith annexed for your inspection.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient Servant,
Ishwar Chunder Shurma.

Calcutta,
28th March, /46

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী হিসাবে মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগরকে একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :—

Certified that Ishwar Chunder Vidyasagar has been Serishtadar of the Bengallee Department of the College of Fort William for nearly five years. He was educated in the Government Sanscrit College and studied all the Branches of Literature and Science taught there with the greatest success, and he has since, by private study, acquired a very considerable degree of knowledge of the English Language. I have derived most satisfactory aid from his learning and intelligence in matters connected with his office—and I have also received much willing assistance in others of an extra nature, especially in the annual examination of candidates for scholarships in the Sanscrit College for the last four years, in which I have been strongly impressed with his tact and intelligence and freedom from all bias or unworthy motives. On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition, and high respectability of character.

College of
Fort William
28th March 1846.

Sd. G. T. Marshall,
Secretary College.

৬ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরীর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর।

বিদ্যাসাগর উৎসাহের সহিত সংস্কৃত কলেজে কাজ করিতে লাগিলেন। সম্পাদকের সাহায্যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ তারিখে এক উন্নত প্রণালীর পঠন-ব্যবস্থার রিপোর্ট সম্পাদকের হস্তে দিলেন। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের যে বৃত্তি পরীক্ষা হয়, মেজর মার্শেল তাহার পরীক্ষক ছিলেন; তিনি পরীক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যের এক স্থলে বিদ্যাসাগরের রিপোর্টের উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি লেখেন :—

The Assistant Secretary consulted me some time ago on a plan of study which he had prepared at a great sacrifice of time and labour. The suggestions therein contained appeared to me well adapted to produce order, to save time, and to secure to each subject of study the degree of attention which it deserves : as such I would beg strongly to recommend the Council to give it a trial. If I am not much mistaken, the result would prove highly satisfactory.*

* General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1846-47 (May 1846—April 1847), pp. 39, 41.

বিদ্যাসাগর মেজর মার্শেলের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন—এ কথা সম্পাদক রসময় দত্ত জানিতেন। বিদ্যাসাগর তদীয় রিপোর্টটি মার্শেলের গোচর না করিলে, মার্শেলের পক্ষে এই প্রস্তাবিত পঠন-ব্যবস্থার কথা জানা বা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করা কখনই সম্ভবপর হইত না। এই কারণে সম্পাদক রসময় দত্ত তাঁহার সহকারী বিদ্যাসাগরের প্রতি মনে মনে রুষ্ট হইয়াছিলেন। হইবারই কথা। তিনি ছিলেন ঠিকা কর্ম্মচারী, অন্য সরকারী কর্ম্ম বজায় করিয়া কয়েক ঘণ্টা মাত্র সংস্কৃত কলেজের কাজ দেখিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার সহকারী স্বীয় কৃতিত্ববলে কোনরূপে কর্ত্তৃপক্ষের সুনজরে পড়িলে তাঁহার স্বার্থে ঘা পড়িতে পারে। বোধ হয় এই সকল কারণেই তিনি বিদ্যাসাগর-প্রস্তাবিত পঠন-ব্যবস্থা শিক্ষা-পরিষদের গোচর করেন নাই। দু-একটি ছোটখাট প্রস্তাব, যথা,—সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের অধ্যয়নকাল ১২ হইতে ১৫ বৎসরে পরিণত করা ছাড়া বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবিত কোন সংস্কারই তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

যাহা হউক, কলেজের উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর যখনই যাহা প্রস্তাব করিতে লাগিলেন, সম্পাদক রসময় দত্ত তাহাতে কর্ণপাত করা সঙ্গত মনে করিলেন না। এই বাধায় বিদ্যাসাগরের জ্বলন্ত উৎসাহ নিমেষে শীতল হইয়া গেল। স্বাধীনচেতা পণ্ডিত চটিয়া পদত্যাগ করিলেন। ১৬ জুলাই ১৮৪৭ তারিখ পর্য্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

মহাদেব আচার্য্যসিংহ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকালে "ভারতীর রাজধানী" নবদ্বীপের অতি উজ্জ্বল বর্ণনা চৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায় (আদিখণ্ড, ২য় অধ্যায়) :—

নবদ্বীপসম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতীপ্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥

এ যাবৎ এই মহাপীঠের গৌরব বর্ণনায় যাঁহারাই লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নব্য ন্যায়, নব্য স্মৃতি, বৈষ্ণব ও তন্ত্রশাস্ত্রে নবদ্বীপের কীর্ত্তিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এবং জনসাধারণের একটা সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বাঙ্গালাদেশে, বিশেষতঃ নবদ্বীপে এই ত্রিবিধ শাস্ত্র ও ব্যুৎপত্তিশাস্ত্র ব্যাকরণ ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইত না। নুলো পঞ্চাননের রহস্যপূর্ণ কারিকায় এই ধারণাই বদ্ধমূল :—

বাসুদেবের তিন শিষ্য, চেয়ে রঘোত্তম।
নদের লোকে এদের নামে জীয়ে রয়॥

* * *

তিন জনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥

(বিদ্যানিধির সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সং, পৃঃ ৫১৯)

পরবর্ত্তী কুলকারিকাকার পূতি কুলচন্দ্রও এই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন :—

বিদ্যাহেতু যাতায়াত বিদ্যার নগর।
পারাপারে ধরে গঙ্গা, হৃদি ইন্দীবর॥

* * *

ন্যায় স্মৃতি তন্ত্রে বেদে তার জ্যোতি।
তদবধি গৌড়ে দ্বিজে বিদ্যার উন্নতি॥
পূতি কুলচন্দ্র ভণে, আবার কি দেখবে।
নিমু, রঘু, রঘু, কৃষ্ণ হৃদি রাখবে॥—(ঐ, পৃঃ ৬৯৪)

সংস্কৃত সাহিত্যের বিবিধ বিভাগে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব চৈতন্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ত্রিধারায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, ইহা অংশতঃ সত্য হইলেও প্রাক্‌চৈতন্য যুগে বাঙ্গালীর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রমাণ ক্রমশঃ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। চৈতন্যদেবের জন্মের আট বৎসর পরে নবদ্বীপে বসিয়া একজন বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত ভবভূতি-রচিত মালতী-মাধবনাটকের অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করিয়াছিলেন, যাঁহার নাম এ যাবৎ আমরা ঘুণাক্ষরেও অবগত নহি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই চিরবিলুপ্ত গ্রন্থকারের বিবরণ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় বিদ্যাসাগর-সংগ্রহে **মহাদেব আচার্য্যসিংহ**-রচিত মালতীমাধবটীকার একটী সম্পূর্ণ প্রতিলিপি রক্ষিত আছে; দুঃখের বিষয়, ইহা অশুদ্ধি-বহুল। পত্রসংখ্যা ১০৫ (বস্তুতঃ ১১৪ হইবে; ১১০ পত্রের পরে ভ্রমক্রমে ১০২ সংখ্যা লিখিত হইয়াছে), প্রতি পৃষ্ঠে পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা ৬। প্রারম্ভাংশ উদ্ধৃত হইল (৩১০ সংখ্যক পুথি),—

জৃম্ভারম্ভবিদীর্ণবক্ত্রকুহরং নিশ্বাসধারা(কুলং)
নিদ্রাচ্ছেদবিবর্ত্তনৈঃ ফণিপতিং ভস্ত্রাশ্রিয়ং লম্ভয়ন্।
পাদাঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতাগ্রকুচয়া লগ্না সরোমোদ্গমং
সস্মেরং সকটাক্ষমীক্ষিতবপুর্দেবঃ শিবায়াস্তু নঃ ॥১
পত্নী যস্য সমস্তরত্নখনিভৃচ্ছৈলাধিরাজাত্মজা
মিত্রঞ্চাপি সমীপব * * নিধীনাং পতিঃ।
পুত্রো বিঘ্ননিবারণো গণপতিঃ সোপি স্বয়ং যাচতে
শ্রুত্বৈবং গণমুখ্যভৃঙ্গিবচনং স্মেরো হরঃ পাতু বঃ ॥২
সাহিত্যজলধিবন্ধং পান্থং সৎকর্ম্মাপন্থ(তাত্মানং)।
রিপুকুলহৃদয়াঘাতং তাতং **শ্রীবিষ্ণুপণ্ডিতং** বন্দে ॥৩
নির্ম্মৎসরাঃ সুমনসঃ পরিভাবয়ধ্বং কিং পৌরুষে * * হতে * * বিচারঃ।
তদ্দোষরোপণমপাস্য গুণান্ ভজধ্বং গন্ধো হি নূনমশুভস্য * * বিধত্তে ॥৪
সন্ত্যেব যদ্যপি পুরাতনপণ্ডিতানাং টীকাস্তথাপি ভবভূতিকবেঃ প্রবন্ধে।
তৎসারভাগমবিমুচ্য ময়া কৃতেয়ং টীকা স্বনাটকরহস্যবিরোচনায় ॥৫
একত্র যে সকলনাটক * * লব্ধ মনসঃ কৃতিনো ভবন্তি।
আচার্য্যসিংহভণিতাবিহ তে প্রযত্নং কুর্ব্বন্তু নো যদি ভবেদলসোঽন্তরায়ঃ ॥৬

পঞ্চম শ্লোকে গ্রন্থকারের স্বরচিত "নাটকরহস্য" নামক কোন গ্রন্থের নির্দ্দেশ আছে কি না, নিঃসন্দেহরূপে বলা যায় না। সৌভাগ্যক্রমে গ্রন্থশেষে গ্রন্থরচনার সময় ও গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষকের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতীয় গ্রন্থে রচনাকালের নির্দ্দেশ এতই দুর্ল্লভ বস্তু যে, সর্ব্বত্র উহা গ্রন্থকারের একটা বৈশিষ্ট্য সূচনা করে। তদুপরি সঙ্গে অতি মূল্যবান্ একটি ঐতিহাসিক তথ্য অন্তর্নিবিষ্ট থাকিয়া এই অপূর্ব্ব কালনির্দ্দেশটীকে অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছে। পুষ্পিকা সহ শেষাংশ উদ্ধৃত হইল :—

অস্তি **শ্রীমজিলীশবার্ব্বক** ইতি খ্যাতো গুণানাং নিধি-
র্জাতো রাম ইব ক্ষিতৌ কলিযুগে সত্যাবতারেচ্ছয়া।
তস্মিন্ গৌড়মহীমহেন্দ্রসচিবশ্রেণীশিরোভূষণে
যোগক্ষেম(ম)মুক্ষণং কৃতধিয়াং নির্ব্যাজমাতন্বতি ॥
শাকে ষোড়শসাগরেন্দুগণিতে গীর্ব্বাণকল্লোলিনী-
তীরে ধীরগণাস্পদে পুরি নবদ্বীপাভিধায়াং ব্যধাৎ।
বৈশাখে ভবভূতিধীরভণিতৌ গুঙ্কার্থসন্দীপনীম্
আচার্য্যো মতিমানিমামিহ **মহাদেবঃ** কৃতী টিপ্পনীম্ ॥
প্রতিহতবিঘ্নং কৃতিনাং বিমলমনীষং গণেশমিব।
যং প্রাসূত ভবানী কুমারমিব শক্তিসম্পদম্ ॥

ইতি শাব্দিকার্থিকচক্রচূড়ামণি-পাণ্ডিত্যমণ্ডিতগীর্ব্বাণার্থশ্রীবিষ্ণুপণ্ডিত-তনুজন্ম-সকলকলাকুশলশ্রীমহাদেবাচার্য্যসিংহকৃতায়াং মালতীটীকায়াং রহস্যদীপিকায়াং দশমাঙ্কবিবরণং সমাপ্তং ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তি দোষকঃ। শ্রীরাজমোহনশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরমেতৎ ॥

১৪১৬ শকাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল, ১৪৯৪ খ্রীঃ) "ধীরগণাস্পদ" নবদ্বীপনগরীতে এই গ্রন্থ রচিত হয়—তখন গৌড়াধিপতির সচিবশ্রেষ্ঠ "মজিলীশবার্ব্বক" নামক শাসন-কর্ত্তা জীবিত থাকিয়া নবদ্বীপ অঞ্চলে অকপটে কৃতধী ব্যক্তিগণের যোগক্ষেম বহন করিতেছিলেন। তৎকালীন গৌড়মহীমহেন্দ্র হুসেন সাহা ছিলেন সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার শাসনকর্ত্তাকে "কলিযুগাবতার" ও "রাম"সদৃশ বলিয়া যেরূপে উচ্চতম প্রশংসার ভাজন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ থাকে না যে, চৈতন্যদেবের জন্মকালীন রাজশক্তির অত্যাচার-লীলার অবসান হইয়া তখন হুসেন সাহের সুনীতিবলে দেশময় শান্তি বিরাজ করিতেছিল। এই সময়ে চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা নবদ্বীপকে গৌরবান্বিত করিতেছিল এবং অনুমান হয়, ইহার কিছু পূর্ব্বেই বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া উৎকলরাজের আশ্রয় নিয়াছিলেন। তৎকালীন নবদ্বীপের মুসলমান শাসনকর্ত্তার নাম "মজলিশ বারবক" এত দিনে আবিষ্কৃত হওয়ায় এ বিষয়ে সকল জল্পনাকল্পনার অবসান হইল।

আচার্য্যসিংহ পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারগণের সারভাগ গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে রক্ষিত, গঙ্গাধরোপাধ্যায় ও রেখাকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাঁদের বহুতর সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়া টীকাখানির সর্ব্বাংশ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে একখানি মাত্র নাটকের উপর এই সকল "পুরাতন পণ্ডিতে"র টীকা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল—আচার্য্যসিংহের এই প্রমাণবচন হইতে তৎকালে বঙ্গদেশে সাহিত্যালোচনার পূর্ণ সমৃদ্ধি সূচিত হয়। বর্ত্তমানে ইহাঁদের কাহারও টীকাগ্রন্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহাঁদের সম্বন্ধে যৎসামান্য বিবরণ সঙ্কলিত হইল। ইহাঁদের মধ্যে **রক্ষিত** সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়। কাতন্ত্রটীকাকারগণ আখ্যাতের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় রক্ষিতের একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা :—

"তথা চ ভদ্রং ভদ্রং বিতর ভগবন্ ভূয়সে মঙ্গলায় ইতি মালতী। অত্র ভদ্রং প্রশস্তং ভদ্রং মঙ্গলং ভূয়সে মঙ্গলায় বিঘ্নধ্বংসায় বিতরেত্যর্থো মালতীশ্লোকে রক্ষিতেন ব্যাখ্যাতঃ ন হ্যন্যথা শ্লোকার্থঃ উপপদ্যতে।"

—(কবিরাজ ও নরহরি তর্কাচার্য্য)

রক্ষিত নামে মালতীমাধবের টীকাকার কেহ ছিলেন, ইহা এত কাল অজ্ঞাত ছিল বলিয়া উদ্ধৃত সন্দর্ভটী প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ মৈত্রেয় রক্ষিতের প্রসঙ্গোক্তি বলিয়া ধরা হইত। বস্তুত মালতীমাধবের টীকাকার রক্ষিত ও তন্ত্রপ্রদীপাদি পাণিনীয় টীকাকার মৈত্রেয় রক্ষিত অভিন্ন কি না, তাহার সাক্ষাৎ কোন প্রমাণ আচার্য্যসিংহের বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিতে পাওয়া না গেলেও বিরুদ্ধ প্রমাণও কিছু পাওয়া যায় নাই। বরং একটী সন্দর্ভ ইঁহাদের অভেদকল্পনার পরিপোষক বলিয়া মনে হয়। প্রস্তাবনার 'নিসর্গসৌহৃদেন' শব্দে 'সৌহৃদ' পদের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে আচার্য্যসিংহ লিখিয়াছেন—

"যদ্যপ্যুভয়পদবৃদ্ধ্যা সৌহার্দ্দমিতি স্যাত্তথাপি 'সুহৃদ্দুর্হৃদৌ মিত্রামিত্রয়ো'রিতি তস্য সুহৃচ্ছব্দস্যাবয়বীভূতহৃচ্ছব্দস্য উত্তরপদবৃদ্ধির্ন ভবতি, সমুদায়স্য মিত্রবচনত্বাদবয়বস্য নিরর্থকত্বাদিতি **রক্ষিতঃ**। হৃদিত্যাদৌ প্রতিপদোক্তস্য গ্রহণাৎ হৃদাদেশস্য নাদিপদবৃদ্ধিরিত্যন্যে। 'সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্য' ইত্যুভয়পদবৃদ্ধ্যভাব ইত্যপরে।" (৭ক পত্র)

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পুথিশালায় "মহোপাধ্যায় **মৈত্রেয় শ্রীরক্ষিত**কৃত" তন্ত্রপ্রদীপ গ্রন্থের 'দেবিকাপাদে'র অর্থাৎ পাণিনির সপ্তমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদের একটি প্রতিলিপি (২৮ পত্রে সম্পূর্ণ) আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। ১৯ সূত্রের ব্যাখ্যায় আছে (৮খ পত্র):—

"সৌহার্দ্দমিতি যদা সুহৃদয়শব্দাদণ্ ভবতি তদাপি উত্তরপদাধিকারে তদন্তবিধেরভ্যুপগমাৎ হৃদয়শব্দান্তাদপ্যণি কৃতে হৃদাদেশঃ তদন্তবিধিশ্চ, যেন বিধিরিত্যত্র ভাষ্যে পদাঙ্গাধিকারে তদন্তবিধেরভ্যুপগমাৎ। কেচিদর্থবদ্গ্রহণপরিভাষয়া নিপাতিতসুহৃচ্ছব্দস্য যোঽবয়বো হৃচ্ছব্দস্তদন্তস্য উত্তরপদবৃদ্ধির্ন ভবতীতি ব্যাচক্ষতে। সমুদায়োহি তত্র মিত্রবচনঃ অবয়বস্তু নিরর্থক এব।"১

উভয় মতের ভাব ও ভাষাগত আশ্চর্য্য মিল উপেক্ষণীয় নহে। মৈত্রেয় রক্ষিত বাঙালী ছিলেন অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা বহু পূর্ব্বেই খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ তাঁহার অভ্যুদয়কাল অনুমান করিয়াছিলাম।২ আচার্য্য-

---

১। ভাষাবৃত্তির (৪৯২ পৃঃ) পাদটীকায় স্বর্গত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সন্দর্ভের শেষাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শরণদেবের 'দুর্ঘট বৃত্তিতে'ও ইহা পাওয়া যায়। মৈত্রেয় রক্ষিত 'কেচিৎ' বলায় বুঝা যায়, ইহা তাঁহার স্বোপজ্ঞ মত নহে—তদপেক্ষা প্রাচীন কোন বৈয়াকরণের সিদ্ধান্ত এবং বর্দ্ধমান-রচিত "গণরত্নমহোদধি"র উক্তি হইতে অনুমান হয়, উক্ত প্রাচীন বৈয়াকরণ ভোজদেব। আচার্য্যসিংহোক্ত দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তি অবিকল পুরুষোত্তমের ভাষাবৃত্তিতে (৪৯২ পৃঃ) পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, জগদ্ধরের মুদ্রিত টীকায়ও ত্রিবিধ ব্যুৎপত্তিই সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু রক্ষিতের নাম নাই।

২। Sir Asutos Silver Jubilee : Vol. III (Orientalia), pt. I, p. 203. উজ্জ্বল দত্ত (উণাদিবৃত্তি ১।৩৮) মৈত্রেয় শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিয়া উদাহরণ দিয়াছেন—"মৈত্রেয়ো রক্ষিতঃ।" তন্ত্রপ্রদীপের বহু প্রতিলিপির পুষ্পিকায় "মৈত্রেয়শ্রীরক্ষিত" এইরূপ পদবিন্যাস রহিয়াছে। উভয় স্থলে মৈত্রেয় ও রক্ষিত পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য ব্যতীত অন্বয়ান্তর ঘটে না। আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতবিশ্রুত অধ্যাপক ডক্টর সুশীল-কুমার দে মহাশয় ইহা জানিয়াও (তৃতীয়া বা চতুর্থীতৎপুরুষ দ্বারা নিষ্পন্ন) সমগ্র সমাস পদটিই বৌদ্ধ গ্রন্থকারের

সিংহের রচনাকালে মৈত্রেয় রক্ষিত পরমপ্রমাণরূপে বাঙ্গালার সমস্ত বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ "তন্ত্রপ্রদীপ" পূর্ব্বাপর বাঙ্গালা দেশেই প্রচারিত ছিল এবং বাহিরে ঐ গ্রন্থের একখানি পুথিও আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ। পুরুষোত্তম দেব হইতে আরম্ভ করিয়া অসংখ্য বৈয়াকরণ মৈত্রেয় রক্ষিতের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং অধিকাংশ স্থলেই "রক্ষিত" নামে। মালতীটীকাকার পৃথক্ ব্যক্তি হইয়া থাকিলে আচার্য্যসিংহ কোন না কোন স্থলে তাহা সূচিত করিয়া যাইতেন।

অপর টীকাকার **গঙ্গাধরোপাধ্যায়** রক্ষিত অপেক্ষাও অধিকতর স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ রক্ষিতের পরবর্ত্তী ছিলেন। তিনি যে ভোজদেব ও কাব্যপ্রকাশ-কারের পরবর্ত্তী ছিলেন, তাহা আচার্য্যসিংহের উদ্ধৃতি হইতেই প্রমাণ হয়। যথা :—

'উৎপৎস্যতে তু' ইতি ভোজরাজধৃতঃ, স চাপ্রীত্যনুক্তে
সাম্প্রতিকোপযোগাভাব ইতি গঙ্গাধরোপাধ্যায়ৈর্দূষিতঃ। (৭খ পত্র)

প্রথমাঙ্কে 'জগতি জয়িনস্তে তে ভাবাঃ' ইত্যাদি শ্লোকের "বিলোচনচন্দ্রিকা" পদে কাব্যপ্রকাশ-কার অলঙ্কারশাস্ত্র-ঘটিত দোষ ধরিয়াছেন ; তদুত্তরে—

"গঙ্গাধরোপাধ্যায়াস্তু অন্যে সন্তু ইয়ন্তু তদ্বিলক্ষণা চন্দ্রিকা বিবক্ষিতা...তদত্র দূষণং নাস্ত্যেবেত্যাহুঃ" (২৭ ক পত্র)।

অজ্ঞাতনামা **রেখাকারের** ব্যাখ্যাও বহু স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন "**শ্রীরত্নাকরাস্তু**" বলিয়া এক জন অভিনব টীকাকারের ব্যাখ্যা এক স্থলে উদ্ধৃত পাওয়া যায় :—

"শ্রীরত্নাকরাস্তু আত্মনি সঙ্কটপতিতে জায়মানো ভাববিশেষ এবাতঙ্ক...ইত্যাহুঃ।" (৬৯ খ পত্র)

এই চারিখানা টীকাই নামোল্লেখপূর্ব্বক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং নামহীন বহুসংখ্যক টীকান্তর হইতে উদ্ধৃত ব্যাখ্যার সংখ্যাও কম নহে। আমরা এ স্থলে আচার্য্যসিংহের প্রমাণপঞ্জী হইতে কতিপয় বিশিষ্ট নাম উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কুন্দমালা (১০ খ)

গুণপতাকা : "তথা চ গুণপতাকায়াং সংসারে কিং সারমিতি গুণপতাকাপ্রশ্নে সারং মহিলাবঞ্চনমিতি মূলদেবোত্তরং।" (৭১ ক)

দেশীসারঃ (৯১ খ)

নাগরসর্ব্বস্ব "তদুক্তং নাগরসর্ব্বস্বে পদ্মপণ্ডিতৈঃ।" (৩৫ খ)

নাট্যলোচন (২ খ, ৯৭ খ)

সহজবোধ্য নামরূপে ধরিতে চান। (New Ind. Ant., Aug. 1939, Ross Number, p. 272 f. n. 1) **সমানাধিকরণ স্থলে একটি পদ নামধেয় এবং অপরটি (কুলগত কিম্বা অন্যবিধ) উপাধি হইবে, ইহাই স্বাভাবিক—উদ্ধৃত পুষ্পিকার প্রমাণবলে এবং উজ্জ্বল দত্তের ব্যুৎপত্তি দ্বারা "মৈত্রেয়" পদটিই উপাধি প্রতিপন্ন হয়—'রক্ষিত' পদটি নহে, ইহা নিশ্চিত। মৈত্রেয় নামক বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উপাধিকে ডক্টর দে মহাশয় "আধুনিক" ধরিয়াছেন—ইহা যুক্তিহীন এবং বিরাট্ কুলশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ে নব্য শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অজ্ঞতা ও বিজ্ঞানবিরোধী অবজ্ঞা মাত্র সূচিত করে।**

বাৎস্যায়ন (১০ ক, ৪৪ ক)
বাদরায়ণ (১ খ)
মহিমাচার্য্য (৭১ খ)
রত্নমালা (৬ খ)
রামচরিত (১০ খ)

আচার্য্যসিংহ নান্দীশ্লোকের ব্যাখ্যা অতি বিস্তৃতভাবে করিয়াছেন এবং এক স্থলে পাঠান্তর সূচনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

"পাশ্চাত্যাস্তু তাণ্ডবে চন্দ্রমৌলেরিতি পঠন্তি, **গৌড়াস্তু** শূলপাণেরিতি…শ্লোকদ্বয়েপি ব্যাখ্যানকোলাহলো নীরসত্বেনানতিপ্রয়োজনকত্বেনাপরিষ্কৃত ইতি সংক্ষেপঃ। যত্র পূর্ব্বপদ্যং নাস্তি" ইত্যাদি (৪ পত্র)

এখানে অভিজ্ঞানশকুন্তলাদির ন্যায় মালতীগ্রন্থেও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পাঠবৈশিষ্ট্য ও কোলাহলজনক সাহিত্যানুরাগের স্পষ্ট সূচনা রহিয়াছে। আচার্য্যসিংহ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত কতিপয় অজ্ঞাতকর্ত্তৃ টীকান্তরের বচন অবিকল জগদ্ধরের টীকায় পাওয়া যাইতেছে। যথা :—

"কামন্দকী নীতিগ্রন্থঃ তং বেত্তীত্যণ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অনয়া নামব্যুৎপত্ত্যা নীতিবোধনেন প্রকৃতসিদ্ধ-হেতুতোক্তেতি কশ্চিৎ ॥" (১১ ক পত্র, জগদ্ধরের টীকা, M. R. Kale's Ed. পৃঃ ১২ দ্রষ্টব্য)

"চীরেণ বস্ত্রখণ্ডেন, চীবরং সৌগতপরিব্রাজকবাস ইতি কেচিৎ।" (১২ ক পত্র, জগদ্ধর, পৃঃ ১৩)

"দক্ষিণদেশস্য শৃঙ্গারবীররসপ্রধানতয়া তদ্দে(শ)জত্বেনাস্য তদুভয়রসবর্ণনাশক্তিরুক্তেতি কশ্চিৎ"

—(৬ পত্র, জগদ্ধর, পৃঃ ৭)

"কেচিত্তু কল্যাণানামিত্যাদি শ্লোক এব সর্ব্বাঙ্কসূচনং ব্যাখ্যায় শ্লোকং কদর্থয়ন্তি"

(১৫ ক, জগদ্ধর, পৃঃ ৫)

পঞ্চমাঙ্কের প্রসিদ্ধ "লীনেব প্রতিবিম্বিতেব" ইত্যাদি শ্লোকের পৃথক্ উপমানপদ দ্বারা আচার্য্যসিংহোদ্ধৃত "টীকান্তরা"নুসারে ক্রমান্বয়ে যোগাচার, সাংখ্য, সৌত্রান্তিক, ত্রিদণ্ডি, পাতঞ্জল, ভট্ট ও বিজ্ঞানবাদীর মত গৃহীত হইয়াছে (৬৩ ক পত্র)। জগদ্ধরের টীকায়ও (পৃ ৯৯) অনুরূপ ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে জগদ্ধরই আচার্য্যসিংহের অন্যতম উপজীব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু জগদ্ধর মৈথিল মহাপণ্ডিত চণ্ডেশ্বরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বিধায় খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর পূর্ব্বে যান না। কষ্টকল্পনা করিয়া তাঁহাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে স্থাপন করিলেও আচার্য্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী করা দুষ্কর। কারণ, চণ্ডেশ্বর প্রায় ১৩৭০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া "রাজনীতিরত্নাকর" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জগদ্ধরের টীকারচনার শৈলী আচার্য্যসিংহ হইতে পৃথক্। গ্রন্থারম্ভে যদিও তিনি "অবলোক্য টীকাং" লিখিয়াছেন, গ্রন্থমধ্যে কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার উপজীব্য প্রাচীন টীকার নামোল্লেখ করেন নাই এবং ভরত প্রভৃতি কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ নাম ব্যতীত তাঁহার প্রমাণপঞ্জী শূন্যপ্রায়। সুতরাং তাঁহার টীকায় প্রাচীন টীকাকারদের গ্রন্থের নামোল্লেখবর্জ্জিত অনুবাদ রহিয়াছে, ইহা নিশ্চিত। পঞ্চমাঙ্কের এক স্থলে (১৭ শ্লোক) পাঠান্তর আলোচনা-কালে জগদ্ধর লিখিয়াছেন, "অস্ব ইতি পাঠো ন যুক্তঃ" (১০৬ পৃঃ)। আচার্য্যসিংহ

লিখিয়াছেন, "স্বিত্যদস্তু ইত্যপপাঠ ইতি রক্ষিতঃ" (৬৫ খ)। দ্বিতীয়াঙ্কের এক স্থলেও প্রমাণনির্দ্দেশ না করিয়া জগদ্ধর একটী শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—"যদাহ—পরোক্ষেপি চ বক্তব্যো নার্য্যা প্রত্যক্ষবৎ প্রিয়ঃ।" (৪৯ পৃঃ)। আচার্য্যসিংহও "ইতি রক্ষিতঃ" বলিয়া এই শ্লোকার্দ্ধই দিয়াছেন (৩২ ক পত্র)। সুতরাং যে সকল স্থলে আচার্য্যসিংহের উদ্ধৃতি জগদ্ধরের গ্রন্থের সহিত মিলিয়া যাইতেছে, সর্ব্বত্র জগদ্ধর সেখানে পূর্ব্বটীকার অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া ধরিতে হইবে।

আচার্য্যসিংহ গ্রন্থারম্ভে, গ্রন্থশেষে এবং প্রতি অঙ্কের পুষ্পিকায় পিতৃনামোল্লেখ করিয়াছেন, এতদতিরিক্ত তাঁহার কোন কুলপরিচয়াদি গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁহার পিতা **বিষ্ণু পণ্ডিত** "শাব্দিকার্থিকচক্রচূড়ামণি" একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার অপর বিশেষণপদ "পাণ্ডিত্যমণ্ডিতগীর্ব্বাণার্থ" হইতে অনুমান হয়, তিনিও গ্রন্থকার ছিলেন। আচার্য্যসিংহ সর্ব্বত্র তাঁহার পিতার নামের পূর্ব্বে "শ্রী" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা বুঝা যায়, গ্রন্থরচনাকালে (১৪৯৪ খ্রীঃ) বিষ্ণু পণ্ডিত জীবিত ছিলেন। আমরা ঠিক এই সময়েই প্রাদুর্ভূত "পূতিতুণ্ড"বংশীয় রাঢ়ীয় কুলীন এক বিষ্ণু পণ্ডিতের উল্লেখ পাইয়াছি, তাঁহার সহিত আচার্য্যসিংহপিতার অভেদানুমান অসঙ্গত হইবে না। আমরা প্রামাণিক কুলশাস্ত্র হইতে বিষ্ণুপণ্ডিতের পরিচয় সঙ্কলন করিয়া দিলাম। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশ" নামক সমীকরণকারিকাগ্রন্থে পাওয়া যায়, "পূতিতুণ্ড"বংশীয় উৎসাহপুত্র গোবর্দ্ধন (বল্লালসেনের শাসনকালীন) প্রথম সমীকরণে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন (মহাবংশ, পৃঃ ১)।[৩] তৎপুত্র "শিকো" ষষ্ঠ সমীকরণে (ঐ, পৃঃ ৬), শিকো পুত্র পীতাম্বর নবম সমীকরণে (১০ পৃঃ) এবং পীতাম্বর পুত্র রাম ১৬শ সমীকরণে (১৬ পৃঃ) অন্তর্ভূত ছিলেন। রামের পুত্র অর্থাৎ বল্লালসদস্য গোবর্দ্ধনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র চক্রপাণি অতি প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন এবং পঞ্চবিংশ সমীকরণ কারিকায় অতি উজ্জ্বল ভাষায় তাঁহার কুলক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে।[৪] তাঁহার নামেই পূতিতুণ্ডবংশ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তাঁহার আট পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ "পুণ্ড্র" অর্থাৎ পুণ্ডরীকাক্ষ এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ ভূধর (মহাবংশ, পৃঃ ২৬)। ভূধরের তৃতীয় পুত্র শোভাকর ১৩৭৭ শকাব্দে স্বর্গী হন (ঐ, পৃঃ ৪৯ ও ৭৭)। ধ্রুবানন্দের মহাবংশের কালপর্য্যায় এই অতি মূল্যবান্ শকাঙ্কের উপর প্রতিষ্ঠিত বটে। "পুণ্ড্রে"র ধারা ধ্রুবানন্দের গ্রন্থে পুণ্ড্রপুত্র

৩। সপ্তশতীকার গোবর্দ্ধনের সহিত ইঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই এবং কোনও মূল কুলগ্রন্থে ঐরূপ সম্বন্ধের ইঙ্গিত নাই। সপ্তশতীকারের পিতার নাম নীলাম্বর (৩৮ শ্লোক)। গোবর্দ্ধন নাম অতিসুলভ এবং নানা বংশে একই সময়ে এই নামের লোক থাকা বিচিত্র নহে।

৪। চক্রপাণির প্রথম কারিকায় তাঁহাকে "রাজা" অর্থাৎ কুলকর্ম্মদ্বারা নৃপতুল্য বলা হইয়াছে—"রাজা জয়ী কর্ম্মচতুষ্টয়েন"। বসু মহাশয়ের মুদ্রিত গ্রন্থে ছন্দোদুষ্ট "রাজজয়ী" পাঠ অমূলক কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছে। একখানি পুথির (বরেন্দ্র অনুসন্ধানের ১৮৮৩ সংখ্যক) পার্শ্বে টিপ্পনী আছে, "পুতি চক্রপাণিকস্য চংধং সপনে পূর্ণার্তিরতঃ স রাজা…কর্ম্মচতুষ্টয়েন জয়ীতি" (৩১ খ পত্র)

গোপালের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াই শেষ হইয়াছে (৪৯ পৃঃ), কিন্তু মহেশরচিত নির্দ্দোষকুল-পঞ্জিকাদি গ্রন্থে গোপালের অধস্তন ধারা কতক দূর পাওয়া যায়। গোপালপুত্র "শ্রীরঙ্গভট্ট" তন্নামীয় মেলের মূলপ্রকৃতি ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রই বিষ্ণুপণ্ডিত।[৫] গোপাল উল্লিখিত শোভাকরের (মৃত্যু ১৪৫৫ খ্রীঃ) সর্ব্বজ্যেষ্ঠতাতপুত্র বটেন, সুতরাং গোপালের পৌত্র বিষ্ণু পণ্ডিত ও প্রপৌত্র মহাদেব আচার্য্য ১৪৯৪ খ্রীঃ জীবিত ছিলেন সন্দেহ নাই। পূতিতুণ্ডবংশে কৌলীন্যধ্বংস হওয়ায় কুলগ্রন্থে এই বংশের বিবরণ প্রায়শঃ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং শ্রীরঙ্গভট্টের ধারা আরও দুষ্প্রাপ্য। বিষ্ণুপণ্ডিতের পুত্রমধ্যে মহাদেবের নাম এ যাবৎ আমরা কোন কুলগ্রন্থে প্রাপ্ত হই নাই। অকুলীন ধারার নামপর্য্যায়ে ত্রুটিবিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তদুপরি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যায় না। আলোচ্য স্থলেই ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলানাটকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী টীকাকার—**চন্দ্রশেখর পণ্ডিত,** যাঁহাকে Pischel সাহেব সমগ্র ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ টীকাকাররূপে খ্যাপন করিয়াছেন।[৬] শকুন্তলা-বিবৃতির পুষ্পিকায় তিনি "মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিষ্ণুপণ্ডিততনূজ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার অপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শিশুপালবধের উপর "সন্দর্ভচিন্তামণি" নামক টীকা। এই গ্রন্থের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপির পুষ্পিকায় তাঁহাকে "পুততুণ্ডীয়"[৭] বলা হইয়াছে এবং রাজা রাজেন্দ্রলালের পরীক্ষিত এক প্রতিলিপিতে প্রারম্ভে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের কৃতিত্বসূচক কতিপয় অতিরিক্ত শ্লোক পাওয়া যায়—দুঃখের বিষয়, বহু স্থানে পাঠ ত্রুটিত হইয়াছে। এই মূল্যবান্ শ্লোকগুলি যথাযথ উদ্ধৃত হইল :—

যদনুধ্যানমাত্রেণ তমোঽপসরতি ক্ষণাৎ।
তদেব পরমাশ্চর্য্যং পরং জ্যোতিরুপাস্মহে ॥

৫। সম্বন্ধনির্ণয়—বংশাবলী, ২৭০ পৃঃ এবং 'মেলপ্রকরণ' ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকার বহু প্রতিলিপি রক্ষিত আছে—২৯১৫ সংখ্যক পুথিতে আছে (২৯৯ খ পত্র) :—

"গোপাল অস্য আর্ত্তি মুং শঙ্কর…তৎসুতাঃ শ্রীরঙ্গভট্ট মুরারি পদ্মনাভ শ্রীনাথাঃ। শ্রীরঙ্গভট্টস্যার্ত্তি মুং রাম…অত্র মেল শ্রীরঙ্গভট্টী তৎসুতাঃ বিষ্ণু—নৃসিংহ-কেশবাচার্য্যরামকাঃ। বিষ্ণুকস্য…তৎসুত মাধব অস্যার্ত্তি চং মঙ্গলানন্দ ॥"

অপর একটি প্রতিলিপিতেও (৪৪৪ ক সংখ্যক গ্রন্থ) বিষ্ণুর এক পুত্র মাধবের নামই লিখিত হইয়াছে।

৬। "Eggeling" *Ind. Off. Cat.* p. 1576-77 তাঁহার মাঘটীকার বিবরণ (*ibid* p. 1433-34) হইতেও চন্দ্রশেখরের সমৃদ্ধ পুস্তকালয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বহুসংখ্যক প্রাচীন টীকাকারের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং এক স্থলে (মল্লিনাথ-রচিত) 'সর্ব্বঙ্কষা' টীকার সন্দর্ভও উদ্ধৃত হইয়াছে। চন্দ্রশেখরের পূর্ব্বে এবং পরে বোধ হয় কোন বাঙ্গালী টীকাকার মল্লিনাথের নাম করেন নাই।

৭। রাজসাহি, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ৮৪ সং পুথির ১৪২ খ পত্রে পুষ্পিকা আছে—"ইতি পুততুণ্ডীয় শ্রীচন্দ্রশেখরকৃতৌ সন্দর্ভচিন্তামণৌ মাঘটীকায়ামষ্টাদশঃ সর্গবিবরণম্।" এই চন্দ্রশেখরের উপাধি "চক্রবর্ত্তী" (*I. O.* p. 1577) কিম্বা "পণ্ডিত" (*De cr. Cat., A. S. B.,* vi. p. 74) এবং একটী কুলগ্রন্থে আছে "আচার্য্য"। সুতরাং মহানাটকের টীকাকার "চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার" পৃথক্ ব্যক্তি এবং সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী।

কর্ম্মার্ণবনিবিষ্টার্থশেষসংসক্তবর্ম্মণে।
সদো…সুকায়াস্মৈ বিষ্ণবে গুরবে নমঃ॥

রুদ্রাণামিব ধূর্জ্জটিঃ সমজনি শ্রেষ্ঠঃ পুরা যজ্বনাং
শ্রীগোপাল ইতি শ্রুতোঽতিবিষদং স্বাধ্যায়মধ্যাশ্বিতঃ।
আস্তামন্যগুণাতিরেকভণিতির্লোকঃ স্বকান্তাধরং
যং কৌলিক্যকথামধুদ্রবভরক্ষীরোঽপি নাপেক্ষতে॥

ভাস্বানি(বোদয়ধরা) ধরতঃ সুধাংশুঃ
ক্ষীরাম্বুধেরিব বিধোরিব রৌহিণেয়ঃ।
শ্রীরঙ্গভট্ট ইতি সূনুরভূচ্চ তুল্যঃ
(ধীরাগ্র)গণ্যগণকল্পতরুস্ততোপি॥

জাতঃ সম্মদকারণং…যথাভূৎ শিবাৎ
স্কন্দঃ শ্রীযুত**চন্দ্রশেখর** ইতি খ্যাতঃ ক্ষমামণ্ডলে।
কণ্ঠে যং…তস্য নির্ভরমিয়ং সাহিত্যবিদ্যা সতী
তৃপ্তা ভূরিরসস্য ভিন্নপুরুষান্ ভ্রান্ত্যাপি ন প্রেক্ষতে॥৮

মধ্যে যে একটি শ্লোক সম্পূর্ণ ত্রুটিত হইয়াছে, তাহাতে চন্দ্রশেখরের পিতা বিষ্ণু পণ্ডিতের গুণকীর্ত্তন ছিল সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় শ্লোকে তাঁহার গুরুর নামও "বিষ্ণু" লিখিত হইয়াছে এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁহার পিতাই গুরু ছিলেন। ধ্রুবানন্দের সমীকরণকারিকা গ্রন্থে গোপালের সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"গোপালাখ্যঃ সুতস্তস্য পূতিবংশবিবর্দ্ধনঃ।" (পৃঃ ৪৯)

তিনিই চন্দ্রশেখরের প্রপিতামহ এবং গোপাল "যজ্বশ্রেষ্ঠ" হইলেও চন্দ্রশেখর স্বয়ং তাঁহার "কৌলিক্য" কথার অর্থাৎ কুলক্রিয়ার মাধুর্য্য অপূর্ব্ব ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের বিবরণদ্বারা মূল কুলগ্রন্থের প্রামাণ্য অব্যাহত রহিয়াছে এবং কৌলীন্য প্রথার মধুরোজ্জ্বল চিত্রের আভাস প্রকারান্তরে প্রদত্ত হইয়াছে। পূতিবংশীয় বিষ্ণু পণ্ডিতের অন্যতম পুত্র এই চন্দ্রশেখরের নামও কিন্তু কুলগ্রন্থে যথাযথ পাওয়া যায় না।[৯] আচার্য্যসিংহ পূতিতুণ্ডবংশীয় হইয়া থাকিলে তাঁহার পাণ্ডিত্য কুলক্রমাগত। কারণ, ভ্রাতা

৮। Notices of Sans. Mss. ix. pp. 137-38, No. 3040. পিতৃপরিচয়ের শ্লোকগুলি অন্য কোন প্রতিলিপিতে নাই।

৯। বিষ্ণুপুত্র মাধব ছাড়া চন্দ্রশেখর কিম্বা মহাদেব আচার্য্যসিংহ কাহারও নাম কুলগ্রন্থে নাই। নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকার একটি মাত্র পুথিতে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের $\frac{M.\ 3/38}{7+8}$ সং) চন্দ্রশেখরের নাম শ্রীরঙ্গভট্টের পুত্ররূপে এবং বিষ্ণু পণ্ডিতের ভ্রাতৃরূপে প্রদত্ত হইয়াছে :—"শ্রীরঙ্গভট্টস্য তৎসুতাঃ চন্দ্রসেখর-কেসব-নরসিংহ-বিষ্ণু-বাণী-হরিহর-গদাই-লক্ষ্মীধর-মহেশ্বরাঃ। কেসবসুতা রামাচার্য্য-মাধবাচার্য্য-রত্নেশ্বরাঃ।" (৫২৯ ক পত্র) পাদটীকা ৫ দ্রষ্টব্য। এইরূপ বিপর্য্যয়স্থলে গ্রন্থকারের উক্তিই সত্যনির্দ্দেশ করিবে।

চন্দ্রশেখর ব্যতীত তাঁহার পিতা বিষ্ণু পণ্ডিতও একজন টীকাকার ছিলেন। মুরারির অনর্ঘ্য রাঘবের উপর "তাৎপর্য্যদীপিকা" নামে এই বিষ্ণুপণ্ডিত-রচিত টীকা পাওয়া যায়।[১০] গ্রন্থ শেষের পরিচয়-শ্লোকে আছে :—

যস্য শ্রীরঙ্গভট্টোঽভূজ্জনকো ভূবৃহস্পতিঃ।
সবিত্রী যস্য সাবিত্রী সাবিত্রীব পতিব্রতা ॥
তেনেয়ং নির্ম্মিতা বিষ্ণুপণ্ডিতেনাতিসুন্দরী ॥
টীকা মুরারেধ্রি য়তাং বিবুধা (?) হৃদি যত্নতঃ ॥

তাঁহার পিতা "ভূবৃহস্পতি" শ্রীরঙ্গ ভট্টও পণ্ডিত ছিলেন, যদিও তাঁহার কোন গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আচার্য্যসিংহ স্বটীকায় 'ভট্ট'পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ভট্টশ্চতুর্দ্দশ-শাস্ত্রাভিজ্ঞঃ" (৭ক পত্র)। শ্রীরঙ্গভট্টের পাণ্ডিত্য তাঁহার উপাধি হইতেই প্রতিপন্ন হয়।

মুরারিটীকায় বিষ্ণুপণ্ডিত পুরাতন টীকাকারদের উল্লেখ করিয়াছেন। শেষের একটি শ্লোকে আছে :—

টীকা পুরাণকৃতিনাং যদপীহ সন্তি
ধীরাস্তথাপি মম বাচি রসোঽস্তি কোঽপি।
বাসন্তিকা ন লতিকা… …পরিমলঃ পুনরস্য এব ॥

আমরা এই টীকার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়াছি।[১১] প্রাচীন টীকাকার "শিবচন্দ্রে"র সন্দর্ভ বহু স্থলে উদ্ধৃত পাওয়া যায়।[১২] তদ্ভিন্ন শেষাংশে "নরসিংহ" নামক টীকাকারের বচনও কতিপয় স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। এক স্থলে আছে :—

"পদ্যমিদং প্রাচীনৈর্ধৃতমিদানীন্তনৈঃ কৈশ্চিন্ন ব্যাখ্যাতমনতিপ্রয়োজনকেত্যলং বহুনা।" (১২খ পত্র)

বিষ্ণু পণ্ডিতের টীকা রচনার শৈলী চন্দ্রশেখর ও আচার্য্যসিংহের অনুরূপ। বহু প্রাচীন ও বিলুপ্ত গ্রন্থের বচনপরম্পরা নামোল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডনমণ্ডনের জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে। এক নান্দীপদের ব্যাখ্যাতেই অন্যূন ৬।৭টি পূর্ব্বতন নাট্যশাস্ত্রকারের নাম পাওয়া যায়। আমরা এখানে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম :—

তত্র চ চন্দ্রকীর্ত্তনমাবশ্যকং ন বেতি সন্দেহে কল্পতরুকারঃ—"আশীর্নমঃ প্রধানাত্বা…।" তথা চ "নরসিংহ-বিজয়" প্রয়োগে চন্দ্রকীর্ত্তনং বামদেবেন ন কৃতমেব, ভটব্রহ্মযশঃস্বামিনা "পুষ্পভূতি"প্রকরণে চ একীভূতাঃ… ইত্যত্র চন্দ্রকীর্ত্তনং নাস্তীতি আহ। বিমলনাট্যমনোহরে—'পঞ্চত্রিংশৎপদা নান্দী মহাভূতান্বিতা শুভা। স্যান্নায়কস্য চ কবের্যদি শম্ভুবিভূষিতা।' যথাভিজ্ঞানে… অন্যা চ সঙ্গীতমুক্তাবল্যাং 'গঙ্গা নাগপতিঃ…' ইত্যাহুঃ। (৩ক পত্র)

১০। Notices of Sans. Mss. Vol. IX, p. 136. No. 3038.
Descr. Cat. of Sans. Mss. A. S. B., Vol. VI, pp. 246-47.

শেষোক্ত প্রতিলিপিতে গ্রন্থশেষে কতিপয় অতিরিক্ত ত্রুটিত শ্লোক আছে। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ এই :—

অননীয়াংসমীশানং নত্বোপাস্যং পুরাবিদঃ।
অনর্ঘরাঘবগ্রন্থীমুদ্গ্রথ্নামি যথামতি ॥

১১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩৩৩ সং পুথি, পত্রসংখ্যা ২৫+৯।

১২। শিবচন্দ্র ২, ৭, ৯, ১৩, ১৪, ২০, ২১ পত্রে। নরসিংহ ক গ জ পত্রে।

আক্ষেপের বিষয়, নান্দীশব্দের আলোচনাকালে অধুনা বাঙ্গালী টীকাকারদের এই সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবৃতি বিদ্বৎসমাজে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে এবং সাহিত্যবিদ্যার পরম উপাসক এই পূতিতুণ্ড-গোষ্ঠীর কৃতী পুরুষগণের নামও বিলুপ্ত হইয়াছে—বংশধর কেহ বিদ্যমান আছে কি না, জানিবার কোনই উপায় নাই।

চৈতন্যদেবের প্রামাণিক চরিতগ্রন্থানুসারে তাঁহার অন্যতম বিদ্যাগুরুর নাম "বিষ্ণু পণ্ডিত"। মুরারি গুপ্তের করচায় পাওয়া যায় :—

ততঃ পপাঠ স পুনঃ শ্রীমান্ শ্রীবিষ্ণুপণ্ডিতাৎ।
সুদর্শনাৎ পণ্ডিতাচ্চ শ্রীগঙ্গাদাসপণ্ডিতাৎ॥ (১।৯।১)

লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে'ও বিষ্ণু পণ্ডিতের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে (বঙ্গবাসী ২য় সং, পৃঃ ৫৮-৯)। চৈতন্যদেবের বিদ্যাভ্যাস লৌকিকতঃ ব্যাকরণশাস্ত্র অতিক্রম করিয়া যায় নাই, ইহাই প্রামাণিক কথা। আনুষঙ্গিক কিছু সাহিত্যালোচনাও ঘটিয়াছিল অসম্ভব নহে। উক্ত বিষ্ণু পণ্ডিত আমাদের প্রবন্ধোক্ত পূতিবংশীয় বিষ্ণু পণ্ডিত হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়; কারণ, ১৪৯৪ খ্রীঃ কিম্বা কিছু পরে একই সময়ে ব্যাকরণ ও সাহিত্যবিদ্যার মহারথী একনাম ও এক উপাধিধারী দুই জন বিষ্ণু পণ্ডিত এক নবদ্বীপেই বিদ্যমান ছিলেন, এরূপ প্রমাণ নাই। ঈশান নাগর তাঁহার প্রকৃতিসুলভ কল্পনার আশ্রয়ে লিখিয়াছেন :—

দুই বর্ষে পড়িলা সাহিত্য অলঙ্কার।
তবে গেলা শ্রীমান্ বিষ্ণুমিশ্রের গোচর॥
তাঁহা দুই বর্ষে স্মৃতি জ্যোতিষ পড়িলা।

(অদ্বৈতপ্রকাশ, তত্ত্বনিধির সং, ১১৮ পৃঃ)

'পণ্ডিত' ও 'মিশ্র' উপাধিদ্বয়ের তারতম্য এখানে উপেক্ষিত হইয়াছে এবং চৈতন্যদেবকে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ প্রতিপন্ন করিতে গিয়া 'স্মৃতি' ও 'জ্যোতিষ' শাস্ত্রের অধ্যাপনা-ভার বিষ্ণু মিশ্রের উপর অর্পিত হইয়াছে—উভয়ই নিষ্প্রমাণ উক্তি সন্দেহ নাই।

———

কদলীরাজ্য

শ্রীরাজমোহন নাথ, বি. ই.

খৃষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে প্রচলিত গীতিকাব্য গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, মীনচেতন, গোরক্ষবিজয়, ময়নামতীর গান প্রভৃতিতে কদলীরাজ্য একটি বিখ্যাত স্থান। পরমসিদ্ধা মীননাথ কদলীরাজ্যে ভ্রমণ করিতে আসিয়া সেই দেশের অধীশ্বরী কমলা ও তাঁহার ভগ্নী মঙ্গলার প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া যোগধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সাংসারিক দৈহিক সুখে মত্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য গোরক্ষনাথ নর্ত্তকীর বেশে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নটীর "ভাও"[১] দেখাইবার সময় বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে "কায়া সাধনে"র তত্ত্বগুলি গুরুর স্মৃতিপথে জাগরূক করিয়া দিয়া, তাঁহাকে কদলীরাজ্যের নারীদের মায়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া আনেন।

গীতিকাব্যগুলিতে কদলীরাজ্যের যে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে—

" * * এহি রাজ্য বড় হএ ভালা।
চারি কড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলা॥
লোকের পিধন পাটের পাছড়া।[২]
প্রতি ঘর চালে দেখে সোণার কোমড়া॥
কার পথরির পানি কেহ নাহি খাএ।
মণিমাণিক্য তারা রৌদ্রেতে সুখাএ॥
*　　　*　　　*
স্থানে স্থানে দেখে সব অমরানগর।
সকল নগরে দেখে উচ্চ উচ্চ ঘর॥
সুবর্ণের ঘর সব পতাকা রচিত।
সকল দেশের লোক রত্তনে ভুসিত॥
রাজ্যের সকল দেখে তার ভাল রঙ্গ।
প্রতি ঘর দ্বারে দেখে হিরণ্যের টঙ্গ॥
ধন্য ধন্য রাজনগর করিয়া বাখানি।
সুবর্ণের কলসে সর্ব্বলোকে খাএ পানি॥"—গোরক্ষবিজয়, ৫৫-৫৬ পৃঃ।

এহেন সুজলা সুফলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডাররূপ দেশে কমলা ও মঙ্গলা নামে দুই ভগ্নী সিংহাসনাধিকারিণী; তাঁহাদের মন্ত্রী ও পারিষদ ষোল শত নারী—

১। অসমীয়া ভাষায় ভাও—যাত্রাগানের পাঠ। ভাওরীয়া—যাত্রাগানের পালাকারী। ভাওনা—যাত্রাগান।
২। পাছড়া—এখনও অসমীয়া ভাষায় ধুতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"কদলিত দেখে জুবতি সব প্রজা।
স্ত্রীরাজ্য হএ সে জে স্ত্রী হএ রাজা॥"—গোরক্ষবিজয়, ২৪ পৃঃ।
"স্ত্রী রাজা স্ত্রী প্রজা স্ত্রী রাজ্যের দেওান।
নারি বিনে নাহি রাজ্যে পুরুষের ত্রাণ॥"—গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ১৫ পৃঃ।

দেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যধিক, পুরুষের সংখ্যা নগণ্য—প্রতি পুরুষের ঘরে "দুই চারি মাই"—এমন কি, প্রথম যৌবনোদ্গমে পুরুষের অভাবে—

"রিতুস্তান করে নারী জায়া কামরূপ।"—গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ১৫ পৃঃ।

রাজ্যের নাম কদলী দেশ; রাজধানী কদলী নগর, অধিবাসিবৃন্দও কদলী নামে পরিচিত।

"ধরিয়া ব্রাহ্মণরূপ কদলীতে জাএ।
একদিষ্টে কদলীর সভা সবে চাএ॥"—গোরক্ষবিজয়, ৫১ পৃঃ।
*　　*　　*
সোল স কদলী আইল করি নানা সাজ।
বসিলেক চারি পাশে মীনে করি মাঝ॥—গোরক্ষবিজয়, ১৫৬ পৃঃ।

রাজ্যে সাধারণতঃ নাথ-সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা বেশী ছিল। পুরুষদিগকে "রাউল" বলিয়া সম্বোধন করা হইত; মেয়েরা "চিকণ সুতি" কাটিয়া "পাটের পাছড়া" এবং "ধুতি বুনিত" এবং তাহা হাটে নিয়া বিক্রয় করিয়া "কৌড়ি" পাইত। তাহারা সুবর্ণের "বাটা ভরিয়া তাম্বূল" খাইত, এবং পুরুষেরা "সমাজে মদের ঘটি আগে" পাওয়াকে সামাজিক গৌরব মনে করিত।

এহেন স্ত্রীরাজ্যের স্থান নির্ণয় সম্পর্কে বঙ্গের মনীষীদিগের মধ্যে একটা আলোচনা চলিতেছে। গীতিকাব্যে যদিও ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধান করা সমীচীন নহে, তথাপি আলোচ্য গীতিকাব্যগুলিতে উল্লিখিত স্থানগুলি নিছক কাল্পনিক নহে বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন, এবং সেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা কাব্যোক্ত স্থানগুলির আধুনিক নাম নির্দেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন।

ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কদলীরাজ্যকে "স্ত্রীস্বাধীনতার দেশ কামরূপ-মণিপুর-ব্রহ্মদেশ"[৩] বলিয়া অনুমান করেন। ডক্টর শহীদুল্লা কদলী অর্থে কাছার জেলা অনুমান করিয়াছেন।[৪] জৈমিনী মহাভারতে এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও স্ত্রীরাজ্যের উল্লেখ আছে এবং অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় বাহ্লীক দেশকে ব্যাকট্রিয়া (Bactria) ধরিয়া স্ত্রীরাজ্যের স্থান তাহারই সন্নিকটে নেহাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোথাও স্থির করিয়াছেন।[৫]

৩। ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশিত "ময়নামতীর গান" ২২ পৃঃ, পাদটীকা (৩)।
৪। Les Chantes Mystiques—page 27.
৫। Social life in Ancient India—Studies in Vatsyana's Kamasutra—pages 59-60.

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত লামা তারানাথের পাগ্সাম্ জোন্জ্যান্ (Pagsamjonzan) নামক গ্রন্থেও কদলী-ক্ষেত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬] তাহাতে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশীয় রাজা গোপীচন্দ্র—সিদ্ধা বালপাদকে (অপর নাম হাড়িপা বা জালন্ধর সিদ্ধা) জীবন্ত অবস্থায় মাটির নীচে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। বার বৎসর পরে হাড়িফার শিষ্য কাণফা সিদ্ধা বা কৃষ্ণাচার্য্য কদলীক্ষেত্রে যাওয়ার পথে গুরুদেবকে মুক্ত করেন এবং তখনই গোপীচন্দ্র হাড়িপার অনুগ্রহ লাভ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গোরক্ষনাথের শিষ্যা ময়নামতী এই গোপীচন্দ্রের মাতা; এবং এই মাতা ও পুত্রের কাহিনীই বঙ্গীয় গীতিকাব্যগুলির উপজীব্য।

গোরক্ষবিজয় ও গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে আরও কয়েকটী স্থানের উল্লেখ আছে। হাড়িপাসিদ্ধা ময়নামতীর ঘরে মেহারকুল দেশে অবস্থান করিতেছিলেন, কাণফা কামরূপ ভ্রমণ করিয়া পাটন গিয়াছিলেন, সেখান হইতে লঙ্কাপুরী হইয়া ডাহুকা এবং ডাহুকা হইতে কদলীদেশ ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পথে বকুলতলাতে বা ঝুলতলিতে গোরক্ষনাথের সহিত তাঁহার দেখা হয় (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, ১৪ পৃঃ)। অন্য দিকে আবার গুরু মীননাথকে অনুসন্ধান করিতে করিতে গোরক্ষনাথ "বিজয়নগর ছাড়ি বকুলেত যাইলা" (গোরক্ষবিজয়, ৩৯পৃঃ)। বকুলেতেই ডাহুকা-প্রত্যাগত কাণফার নিকট মীননাথের কদলীদেশে "নটিনির বাশোরে" বিভোর হইয়া থাকার সংবাদ পাইলেন।

বকুল হইতে সোজাসুজি কদলীদেশে গিয়া গোরক্ষনাথ অনেক চেষ্টার পর গুরু মীননাথকে কদলীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া বিজয়নগর চলিয়া গেলেন এবং যাইবার পূর্ব্বে কদলীগণকে শাপ দিলেন,—

> "মুখে যাও মুখে বছ মুখে জাও সঙ্গ।
> গোর্খের শাপেতে উঠ হইয়া পতঙ্গ ॥
> বিক্ষের ফল মূল বসি কর পান।
> এহি শাপ দিলো তোরে করি সমাধান ॥
> এ বলিয়া জতিনাথ হাতে মারে তুড়ি।
> বাদুর হইয়া সব কদলী গেল উড়ি ॥"—গোরক্ষবিজয়, ১৯৭ পৃঃ।

খৃষ্টীয় ৯৮৫ হইতে ১১২৫ অব্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন কামরূপরাজ্য নরকাসুরবংশীয় পাল-নৃপতিগণের অধীন ছিল। এই বংশের প্রথম রাজা ব্রহ্মপাল (৯৮৫-১০০০), দ্বিতীয় রত্নপাল (১০০০-১০৩০), তৃতীয় ইন্দ্রপাল (১০৩০-১০৫৫), ষষ্ঠ ধর্ম্মপাল (১০৯০-১১১৫) এবং সপ্তম বা শেষ রাজা জয়পাল (১১১৫-১১২৫)[৭]। Pagsamjonzan মতে শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়ের পর শ্রীহর্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন মগধদেশ শাসন করিতেছিলেন, তখন বঙ্গদেশে

৬। J. A. S. B. 1898, part I, page 20, Rai-Bahadur S. C. Das's Notes on Antiquities of Chittagong.

৭। Early History of Kamrup by Rai-Bahadur K. L. Barua, page 149.

সিংহচন্দ্রের পুত্র বালচন্দ্র রাজত্ব করিতেন। বালচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্দ্র (অপর নাম মাণিকচন্দ্র ?) মালবদেশের রাজা ভর্ত্তৃহরির ভগিনী ময়নামতীকে বিবাহ করেন। বিমলচন্দ্র তীরভুক্তি, সমগ্র বঙ্গদেশ ও কামরূপে বেশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি মাধ্যমিক-দর্শনোৎসাহী ছিলেন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে মুসলমানের অত্যাচারে মগধদেশ হইতে পলায়ন করিয়া অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পূর্ব্বাঞ্চলে কুকীদের দেশে আশ্রয় লাভ করেন। আসাম-কাছাড় ও ত্রিপুরার কিছু পার্ব্বত্য অঞ্চল লইয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম ছিল নানগাতা। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ রাজা বাবলাসুন্দরের কনিষ্ঠ পুত্র সুন্দরহাচি এই নানগাতার রাজা ছিলেন। এই ভাবে খৃষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা কামরূপে প্রবেশ করিয়া এ দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিকধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কামরূপ পূর্ব্বেই শৈবপ্রধান দেশ ছিল; এখন বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্ম উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া খুব জোরের সহিত চলিতে লাগিল, এবং বৌদ্ধতান্ত্রিকের বজ্রযোগিনী সাধনার মন্ত্রে আসামের বহু স্থানের নামও যুক্ত হইল—

—ওঁ ওড্ডিয়ান বজ্রপুষ্পে স্বাহা, ওঁ পূর্ণগিরি বজ্রপুষ্পে স্বাহা, ওঁ কামরূপ বজ্রপুষ্পে স্বাহা, ওঁ শ্রীহট্ট বজ্রপুষ্পে স্বাহা ইত্যাদি।[৮]

রত্নপালের রাজধানী ছিল সুনির্ম্মিত দুর্জ্জয় নগর। ইন্দ্রপালের গৌহাটী-তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, রত্নপালের রাজ্য "সুধাধবলিত শিবাধিষ্ঠিত" মন্দির দ্বারা শোভিত ছিল, এবং তাঁহার রাজ্যের ব্রাহ্মণগণের গৃহ নানাপ্রকার ধনসম্পদ্ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।[৯] লামা তারানাথের মতে সিদ্ধা সরহপাদ পূর্ব্বদেশে রাজ্ঞীতে চন্দনপালের রাজত্বে জন্মগ্রহণ করেন, এবং অত্যাশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক বিভূতি দেখাইয়া রাজা রত্নপাল ও তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদিগকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ কামরূপ দেশের এক ধীবরের পুত্র ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ওড্ডিয়ান দেশের নৃপতি ইন্দ্রভূতির কর্ম্মচারী ছিলেন। ইন্দ্রভূতির পুত্র পদ্মসম্ভব জাহর দেশের নৃপতির কন্যাকে বিবাহ করেন।[১০] ওড্ডিয়ান দেশ বৌদ্ধতান্ত্রিকদের একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল। চৌরাশী সিদ্ধার ইতিহাসে দেখা যায়—ওড্ডিয়ান দেশে পাঁচ লক্ষ নগর ছিল, এবং ইহা দুই প্রদেশে বিভক্ত ছিল; এক প্রদেশের নাম শাম্ভব, অপরের নাম লঙ্কাপুরী। লঙ্কা জাহর দেশের সন্নিকটে ছিল।[১১]

৮। রাজরত্ন বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত সাধনমালা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪৫৫, সাধনসংখ্যা ২৩৪।

৯। কামরূপ-শাসনাবলী—১২৬ পৃঃ।

১০। পদ্মসম্ভব অদ্যাপি সিকিমের রাজপ্রাসাদসংলগ্ন মন্দিরে দেবতারূপে পূজিত হইতেছেন। ডাক-বিভাগের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় তিব্বত পর্য্যটনকালে সিকিমের রাজমন্দির হইতে পদ্মসম্ভবমূর্ত্তির একখানি ফটো আনিয়াছেন।

১১। Waddel's Lamaism, page 182.

বালপাদ বা হাড়িপা সিদ্ধা ছিলেন সিন্ধুদেশের লোক, জাতিতে শূদ্র। তিনি ওড্ডিয়ানে থাকিয়া যোগধর্ম্ম শিক্ষা করেন এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক ও ঐন্দ্রজালিক শাস্ত্রে তাঁহার এত অধিকার জন্মিয়াছিল যে, একবার অবন্তীদেশে দেবতার নিকট বলি দিবার নিমিত্ত আনীত কয়েক হাজার ছাগ তাঁহার মন্ত্রবলে নেকড়ে বাঘে পরিণত হইয়া গিয়াছিল; তাঁহার মন্ত্রবলে নেপালের মন্দিরের প্রধান শিবলিঙ্গটী ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছিল। ময়নামতীর বাগানে বসিয়া তাঁহার জলপানের ইচ্ছা হইলে নারিকেলগাছ হইতে ডাব আপনি আসিয়া তাঁহার মুখে জল ঢালিয়া দিয়া, আবার স্বস্থানে প্রস্থান করিত।

কামরূপে এরূপ যাদুবিদ্যার প্রবাদের কথা কাহারও অবিদিত নাই। এখানে লোককে ভেড়া করা হয়, ইহা আধুনিক কালেও অনেকে বিশ্বাস করেন। গুরু নানকের অনুচর মর্দ্দানাকে কামাখ্যার নিকটবর্ত্তী স্ত্রীরাজ্যে এক জন নারী, গলায় একগাছা সূতা বাঁধিয়া ভেড়া করিয়া ফেলিয়াছিল। দ্বিতীয় অনুচর বালার নিকট হইতে জানিতে পারিয়া বাবা সাহেব অনেক চেষ্টায় সঙ্গীটীকে উদ্ধর করেন। এই কাহিনীটী ভাই বালা গুরুজীর "জনমসাখী" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।[১২] ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য এই যাদুবিদ্যার দেশে মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এবং কয়েক বৎসর পরে যখন দ্বিতীয় বার সৈন্য প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত হইল, তখন যাদুবিদ্যার ভয়ে সৈন্যেরা বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া এই ভয়ঙ্কর দেশে পদার্পণ করিতে সাহস করিল না। 'আলমগীরনামা'র সুশিক্ষিত লেখক পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্য তাজমহলের সন্নিকটস্থ সুসভ্য অধিবাসিগণকে এই অত্যাশ্চর্য্য কাহিনীটি বলিয়া গিয়াছেন।[১৩] অনেক লোকের বিশ্বাস যে, গৌহাটী হইতে ২১ মাইল দূরবর্ত্তী নগাঁও জেলার অন্তর্গত মায়ং মৌজাতে এখনও যাদুবিদ্যার প্রচলন আছে; এবং এখনও সুদূর মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া অনেক লোক যাদুমন্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য মায়ংএর পার্ব্বত্য রাজার উমেদারী করিয়া থাকে।[১৪]

Waddel সাহেবের মতে ওড্ডিয়ানা, উদ্দীয়ানা বা ওজ্জিয়ানা বর্ত্তমান সোবাট ও চিত্রলের নিকটে, Sylvan Levi-র মতে উহা খাসগড়ে এবং ৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে উহা উড়িষ্যায়।[১৫] কামরূপীয় রাজা ধর্ম্মপালের রাজত্বে একাদশ খৃষ্টাব্দে লিখিত কালিকাপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, ওড্ডিয়ানে সতীর উরুযুগল পতিত হইয়াছিল, এবং পীঠমালার মতে আসামের জয়ন্তিয়ায় উহা পতিত হইয়াছিল; বর্ত্তমানে সে স্থানের নাম বাউরভাগ—দেবী জয়ন্তেশ্বরী, ভৈরব ক্রমদীশ্বর।

লঙ্কা, গৌহাটী হইতে ৯৫ মাইল পূর্ব্বে নগাঁও জেলায় একটী মৌজা ও রেলস্টেশন।

১২। জনমসাথী ভাই বালাকী, পৃঃ ৩৩৬।

১৩। Alamgirnamah, page 731; Gait's History of Assam, p. 35.

১৪। রামপালের সেনাপতি 'মায়নে'র নাম হইতে মায়ং হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে।

১৫। সাধনমালা, প্রথম ভাগ, ভূমিকা, পৃঃ ৩৭।

অধ্যাপক Jacobi এই লঙ্কাকেই বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের লঙ্কাপুরী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। লঙ্কাতে প্রাপ্ত একটী প্রস্তরলিপিতে "সঙ্ঘারাম" শব্দটী পাঠ করা গিয়াছে। ঐ লিপি বর্ত্তমানে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতিতে আছে—সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই।

Waddel সাহেব জাহরকে লাগোর বলিয়া মনে করেন। রাজরত্ন ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য উহাকে ঢাকার সাভার বলিয়া মনে করেন। কিন্তু লঙ্কার সন্নিকটেই খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ে চেরাপুঞ্জীর সন্নিকটে সাবার নামে একটী ছোট ষ্টেট্ বা রাজ্য বর্ত্তমানেও আছে, এবং নগাঁও হইতে ডবকা হোজাই-লঙ্কা-কারিথানা-পানিমুর হইয়া জয়ন্তিয়ায় যাওয়ার একটী প্রাচীন সদর রাস্তা আজও আছে—লোকে ব্যবহারও করে।

নগাঁও জেলা—যমুনা-কপিলীবিধৌত উর্ব্বরা দেশ,—গৌহাটী হইতে ৭৫ মাইল পূর্ব্বদিকে। বর্ত্তমানে ইহা একটী নাতিবৃহৎ জেলা। সমগ্র যমুনা ও কপিলী উপত্যকায় দশম-একাদশ শতাব্দীর গুপ্ত ও পাল-ভাস্কর্য্যের নিদর্শনপূর্ণ অসংখ্য প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লেখক কর্ত্তৃক ঘোর অরণ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সমগ্র হোজাই-লঙ্কা-ডবকা-যমুনামুখ-বকুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রতি ক্রোশের মধ্যে অন্ততঃ একটী মন্দির ও চারিটী বৃহৎ পুষ্করিণীর নিদর্শন পাওয়া যায়। এককালে দেশটি সুসভ্য জনপদে পূর্ণ ছিল এবং চৌরাশী সিদ্ধার ইতিহাসোল্লিখিত পাঁচ লক্ষ নগরপূর্ণ জনপদ এবং গোরক্ষ-বিজয়ের টঙ্গী ও অসংখ্য পুষ্করিণীপূর্ণ দেশ এতদঞ্চলেই ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

আর একটী কথা লক্ষ্য করিবার আছে। টেঙ্গুরের ক্যাটালগ মতে লুইপাদ বঙ্গদেশের লোক, Grub-o-Tub মতে তিনি কামরূপের ধীবরের ছেলে; চৌরাশী সিদ্ধার ইতিহাস মতে তিনি ওড্ডিয়ানের লোক। সুতরাং ওড্ডিয়ানা, কামরূপ ও বঙ্গদেশের নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল। এই সকল কারণ হইতে নগাঁও জেলার হোজাই বা ওজাই (ওজ্জাই)কে বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের ওড্ডিয়ানা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।[১৬]

ডবকা নগাঁও সহর হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে যমুনানদীর তীরে অবস্থিত। সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের চতুর্থ শতাব্দীর এলাহাবাদ-স্তম্ভে সমতট-ডবাক-কামরূপ-নেপাল-কর্ত্তৃপুর রাজ্যসমূহের সামন্ত নৃপতিগণের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকেও কপিলী উপত্যকা রাজ্যের চন্দ্রবল্লভ (yue-Ai = moonloved) নামে এক রাজা চীনদেশে দূত পাঠাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানের ডবকাই প্রাচীন ডবাক রাজ্য। এতদঞ্চলে মস্তকে বোঝা লইয়া ফেরী করা স্ত্রীলোকদিগকে "পোহরী" বলে। কাণফা সিদ্ধা 'ডাহুকা'তে এক 'বহরী'র গৃহে আশ্রয় নিয়াছিলেন। গোরক্ষবিজয়-সম্পাদক আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মনে করিয়াছিলেন, কাণফা ঢাকায় এক বধির স্ত্রীলোকের গৃহে গিয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধা যে ডবকাতে এক ফেরীওয়ালীর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ডবকা হইতে প্রায় ২১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং লঙ্কা ষ্টেশন হইতে প্রায় ২১ মাইল

১৬। "Antiquities of the Kapili and the Jamuna Valleys—(Hojai and Oddiyana)," published in the Journal of the Assam Research Society, Vol. V, Nos. 1 & 2, pp. 48-57.

পূর্ব্বদিকে বকুলিয়া নামে একটী স্থান আছে। সেখানে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে এবং গভীর অরণ্যপূর্ণ একটী স্থানকে বকুলিয়ার রাজবাড়ী বলিয়া দেখান হইয়া থাকে। এই বকুলিয়ায় বা বকুলে বা বকুলতলায় কাণফার সহিত গোরক্ষনাথের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল।

নগাঁও জেলার অধিকাংশ এক সময়ে জয়ন্তিয়াদের অধীনে ছিল। তাহারা আদিতে ব্রাহ্মণ নরপতি কেদারেশ্বর রায়, ধনেশ্বর রায় প্রভৃতির অধীনে কপিলী যমুনা উপত্যকার উর্ব্বরা ভূমিতে বাস করিত। সেই সময়ে বা তাহার অল্প পরে হোজাই বা ওড্ডিয়ানা বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের তীর্থরূপে পরিণত হয়। কালক্রমে সমতল ভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া জয়ন্তিয়ারা নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে বর্ত্তমান জয়ন্তিয়া পাহাড়ে রাজত্ব স্থাপন করে। কিন্তু নগাঁও জেলার পার্ব্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজ্য—খোলা, নেলি, গোভা, তপাকুচি প্রভৃতির রাজারা আজ পর্য্যন্ত জয়ন্তিয়ার আনুগত্য স্বীকার করেন।

জয়ন্তিয়ারা হিন্দুভাবাপন্ন, কিন্তু তাহাদের উত্তরাধিকারী সূত্রে মেয়েরাই পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী; তাহারা স্ত্রীস্বাধীন জাতি। প্রবাদ আছে যে, জয়ন্ত রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় একমাত্র কন্যা জয়ন্তী পিতৃসিংহাসনের অধিকারিণী হয়েন। তদবধি দেশের নাম জয়ন্তিয়া হয়।

মাসিক অশৌচের সময় নদীতে স্নান করিবার কালে জয়ন্তীর ছায়া হইতে এক কন্যারত্ন উৎপন্ন হয়; রাঘব মৎস্য সেই কন্যাকে ভক্ষণ করে। পরে লাণ্ঢাবর নামক এক বীর যুবক মৎস্যের উদর হইতে কন্যাকে উদ্ধার করিয়া মৎস্যোদরী নাম দিয়া তাহাকে বিবাহ করেন। মৎস্যোদরী ও লাণ্ঢাবরের পুত্র পরে জয়ন্তিয়ার অধীশ্বর হন।[১৭] এই প্রবাদের সহিত নাথসিদ্ধা মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথের জন্মপ্রবাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। গণ্ডযোগে জাত ব্রাহ্মণকুমারকে সমুদ্রে বিসর্জ্জন করা হয়; রাঘব মৎস্য সেই শিশুকে উদরসাৎ করে। পরে ক্ষীরোদ সাগরের টঙ্গীতে রাঘবের উদর হইতে উদ্ধার করিয়া হরপার্ব্বতী সেই শিশুকে যোগধর্ম্ম শিক্ষা দেন। পরিণত বয়সে সেই বালকই মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে ভুবনবিজয়ী সিদ্ধা বলিয়া পরিচিত হন।

সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদকে অনেকে মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ হইতে অভিন্ন মনে করেন। ৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অধ্যাপক Tucci এই মতের বিশেষ সমর্থক। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় তদীয় "গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে"র সম্পাদকীয় মন্তব্যে (পৃঃ ৬৩-৬৫) ও অধ্যাপক ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় "কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে"র ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু একটা কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মৎস্যেন্দ্রনাথ হঠযোগের পক্ষপাতী ছিলেন, হঠযোগে তাঁহার প্রবর্ত্তিত কয়েকটী কষ্টসাধ্য আসনও আছে; গোরক্ষনাথও কায়াসাধনের প্রধান নেতা। গোরক্ষ-

১৭। দেওধাই অসমবুরঞ্জী (সূর্য্যকুমার ভূঞা সম্পাদিত) ১৭২ পৃঃ।

সংহিতায় গোরক্ষনাথের উপদেশ "আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা" এবং "যোগশাস্ত্রঞ্চ পরমং যোগিনাং সিদ্ধিদায়কম্।"[১৮] কিন্তু লুইপাদ এই কষ্টসাধ্য সাধনপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন,—

"সঅল সমাহিত কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতে নিচিত মরিআই॥"—বৌদ্ধগান ও দোহা।

তিনি মহাসুখ লক্ষ্য করিয়া "গুরু পুচ্ছিঅ জান" মতের পোষণকারী। হঠযোগীর নিকট মূলবন্ধ, জালন্ধরবন্ধ ও ওড্ডিয়ানবন্ধ সাধনার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পন্থা—

"মহাবন্ধং সমাসাদ্য উড্ডীনকুম্ভকং চরেৎ।
মহাবেধ সমাখ্যাতো যোগিনাং সিদ্ধিদায়কঃ॥—গোরক্ষসংহিতা, ৭০।

কিন্তু লুইপাদ বলেন—

"এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আশ।
শুণ্পাখ ভীতি লাহুরে পাশ॥"

লুইপাদের এই ভাবই পরবর্ত্তী কালে কৌল তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে—

একভক্তোপবাসাদ্যৈর্নিয়মৈঃ কায়শোষণৈঃ।
মূঢ়াঃ পরোক্ষমিচ্ছন্তি তব মায়াবিমোহিতাঃ॥
দেহদণ্ডনমাত্রেণ কা সিদ্ধিরবিবেকিনাম্।
বল্মীকতাড়নাদ্দেবি মৃতঃ কোঽত্র মহোরগঃ॥"—কুলার্ণব।

লুইপাদের সাধনার পদ্ধতি—"ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা।" অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে ইড়া ও পিঙ্গলার সঙ্গমস্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ বীজবেষ্টিত—(অ হইতে ল বীজ—'আলি', ইড়া বা চন্দ্রনাড়ী-বেষ্টিত ; এবং ক হইতে ল বীজ—"কালি", পিঙ্গলা বা সূর্য্যনাড়ী-বেষ্টিত) ত্রিকোণাকার মণ্ডলমধ্যে পদ্মাসনে সমাসীন নিজ গুরুমূর্ত্তির ধ্যান করা। এই ভাবে গুরুধ্যান পরবর্ত্তী কালে ঘেরণ্ডসংহিতায় ("ধ্যায়েত্তত্র গুরুদেবং দ্বিভুজঞ্চ ত্রিলোচনম্"[১৯]) এবং বিশ্বসারতন্ত্রে দেখিতে পাই। আরও পরবর্ত্তী কালে কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে ঐ স্থানে গুরুর বাম উরুতে গুরুপত্নীকে ধ্যানেরও উল্লেখ আছে। নাথদের ধ্যান এরূপ নহে। তাঁহারা আজ্ঞাচক্রে নাদবিন্দুর ধ্যান করেন, জ্যোতির্ম্ময় বিন্দুর ধ্যান করিয়া নাদ অনুসন্ধান করাই তাঁহাদের চরম লক্ষ্য। গোরক্ষনাথ "মূঢ়গণেরও সম্মত নাদোপাসনা" প্রচলিত করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা হইতে পথের ভিখারী সকলেরই পূজ্য হইয়াছিলেন। লুইপাদের লক্ষ্য মহাসুখ ; মৎস্যেন্দ্রনাথের লক্ষ্য—"মনের সহিত নাদের বিলয় সাধন করিয়া পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা।"[২০] সুতরাং লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ এক ব্যক্তি নহেন।

ডবকার সন্নিকটে নগাঁও সহর হইতে ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে কন্দলী নামে একটী

১৮। প্রসন্নকুমার কবিরত্ন-সম্পাদিত গোরক্ষসংহিতা, ৫, ২০৪।

১৯। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত ঘেরণ্ডসংহিতা, ষষ্ঠ উপদেশ, ১৩-১৪।

২০। ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত হঠপ্রদীপিকা—৪র্থ উপদেশ, ১০০-১০২।

মৌজা আছে।[২১] সেই মৌজার স্থানে স্থানে প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন এবং ভগ্ন হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। ডবকা ও কন্দলীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ২৫৪৬ ফিট উচ্চ কমলা দেবীর পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতের উপর এখনও প্রাচীন মন্দির ও পুষ্করিণীর ধ্বংসাবশেষ আছে। স্থানীয় লোকে এখনও ভক্তিবিমিশ্রিত ভীতির সহিত সেই পর্ব্বতের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া থাকে। কালিকাপুরাণে এই কমলাদেবীর স্থানকে রক্তদেবীর পীঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এই পর্ব্বতের দক্ষিণপূর্ব্বে আর একটি পর্ব্বতে হেরুক নামে শিবলিঙ্গ আছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে।[২২] এই পর্ব্বত বর্ত্তমানে লিঙ্গখোয়া পর্ব্বত নামে পরিচিত।

কন্দলী চা-বাগানের তিন মাইল ঈশান কোণে পাহাড়ের উপর বাদুলী কুরুং নামে একটি গুহা আছে। সরকারী সদর রাস্তা হইতে প্রায় দেড় মাইল পাহাড়ের উপর যাইতে হয়। বৃহৎ শিলাময় পর্ব্বতের নিম্নদেশে পর্ব্বতের ভিতরে এক প্রশস্ত গহ্বর। সম্মুখে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর যেন প্রাচীরস্বরূপে রক্ষিত হইয়াছে। এই প্রাচীর বাহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে, নীচের গহ্বরের দ্বারদেশ দেখা যায়। গহ্বরের দুইটী দ্বার; ভিতর অতি প্রশস্ত, কিন্তু ঘোর অন্ধকারময়।

এই গুহার ভিতর লক্ষ লক্ষ বাদুড়ের বাস। মানুষের আগমনের শব্দে ইহারা এমনই এক তুমুল আলোড়ন তুলিয়াছিল যে, ভয় হইয়াছিল, যেন ভূমিকম্পে সমগ্র পর্ব্বত কম্পিত হইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীরা গুহাটীকে দেবতার স্থান বলিয়াই সম্মান করে; এবং এই বাদুড়গুলি কমলা দেবীরই আশ্রিত অনুচর বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে।

কন্দলী পর্ব্বতের অপর অংশের নাম বামুনী পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত, গুহা ও প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আছে। বাদুলীকুরুংয়ের আট মাইল উত্তরে চম্পানালা পাহাড়ে হংসধ্বজ রাজার নগর ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। সন্নিকটে জিয়াজুরি বাগানে নবম-দশম শতকের প্রস্তরশিল্পের যথেষ্ট নিদর্শন আছে।

ডবকা হইতে ১৫।১৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে মহামায়া পর্ব্বত, ফুলনি, তারাবাসা প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন মন্দিরের ও পুষ্করিণীর অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ আছে। মৎস্যেন্দ্রনাথপাদাবতারিত "কৌলজ্ঞাননির্ণয়" গ্রন্থখানি একদিন কামরূপের গৃহে গৃহে থাকিত।[২৩] ইহাতে মহামায়াইপাদ, চম্পাইপাদ, পুলিন্দাইপাদ, হিড়িম্বাইপাদ প্রভৃতি পীঠমহাপুরুষের পূজার বিধি আছে। মনে হয়, এই সব পীঠস্থান এই অঞ্চলেই ছিল।

কন্দলী ও বামুনীপর্ব্বতের পারিপার্শ্বিক মিকির পাহাড়ে এখনও পর্য্যাপ্ত অগুরু চন্দন

২১। কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটী মৌজা হয়; রাজস্ব আদায়ের জন্য এক একটী মৌজার উপর এক একজন মৌজাদার থাকেন।

২২। কালিকাপুরাণ (বঙ্গবাসী) ৭৯ অঃ, ১৬৫। এখনও লোকের বিশ্বাস, কমলাদেবীর স্থান দর্শন করিতে গেলে পথ হারাইয়া যায়।

২৩। 'কামরূপে ইমং শাস্ত্রং যোগিনীনাং গৃহে গৃহে।'—২২শ পটল, ৭৮ পৃঃ।

পাওয়া যায় এবং মহলদারেরা এখনও উহা দেশ বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। পার্ব্বত্য লোকের নিকট হইতে এখনও অনেক সময় "চারি কড়ায়" 'এক তোলা' চন্দনকাষ্ঠ পাওয়া অসম্ভব নয়।

কন্দলী মৌজার সন্নিকটবর্ত্তী ননই, দীঘলদরি, পেটভরা প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমানেও হাজার হাজার নাথযোগীর বাস। তাহারা বর্ত্তমানেও 'পাটের পাছড়া' প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত এবং তাহাদের মেয়েরা এখনও পাটের চিকণ সূতা কাটিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার করে। পুরুষেরা বর্ত্তমানে অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ও কৃষিকর্ম্মপরায়ণ। এখন কৌলধর্ম্মের চক্রে তাহারা বসে না; সুতরাং সমাজে মদের ঘটী আগে পাইবার আকাঙ্ক্ষা কাহারও নাই।

চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতেও কন্দলীর বিশিষ্ট অধিবাসীদের পদবী 'কন্দলী' ছিল। অনন্ত কন্দলীর মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ সুপরিচিত; মাধব কন্দলীর সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অনুবাদ অসমীয়া ভাষার অমূল্য সম্পদ্। কন্দলী মৌজায় এখনও মাধব কন্দলীর বাড়ী আছে।

নগাঁওবাসীরা একটু অনুনাসিকত্বপ্রিয়; তাঁহারা 'বহুলা আতা'কে 'বন্দুলা আতা' বলেন, বাহুলীকে বান্দুলি বলেন; তাঁহাদের নিকট প্রাচীন 'কদলী' কন্দলী হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নগাঁও জেলার কন্দলীই প্রাচীন কদলীরাজ্য, ডবকাই ডহুকা বা ডাহুকা, বকুলিয়াই বকুলতলা। গোয়ালপাড়া জেলায় যোগিগুফা ও গোরক্ষনাথের পাহাড় বিখ্যাত; সুতরাং সেখানকার বিজনীই 'বিজয়নগর' বলিয়া অনুমিত হয়। কন্দলী পর্ব্বতের বাহুলীকুরুং হইতেই ষোল শত কদলীর বাহুড়রূপে পরিণত হওয়ার কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বঙ্গদেশীয় রাজা রামপাল কর্ত্তৃক কামরূপ অধিকৃত হওয়ার পর এই দেশে দলে দলে ব্যবসায়ীরা আসিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্ব হইতে নাথ ও কৌলজ্ঞানী সাধুদের আসা যাওয়া ছিলই। তাহাদের নিকট হইতে নগাঁও জেলার স্থানসমূহের বর্ণনা শুনিয়া বঙ্গদেশীয় গ্রাম্য কবিরা মুখে মুখে গীত রচনা করিয়া দেশবাসীকে শুনাইত এবং

"যোগীপাল মহীপাল নানামত গীত।
শুনিতে হইত সর্ব্বলোক আনন্দিত॥

দেলপূজার ছড়া

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ

দেলপূজার ছড়া খুল্না জেলার কাড়াপাড়াগ্রামনিবাসী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আসল পুথি আমার হস্তগত হয় নাই। এখনকার নকল পুথি হইতে আলোচ্য দেলপূজার ছড়া তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের পূর্ব্বপুরুষেরা চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে দেউল-উৎসব করিতেন—এখনও গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

দেলপূজা বা দেউল পূজা শিবপূজার নামান্তর মাত্র। বাঙলার সর্ব্বত্র চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দেউলের মধ্যে শিব অধিষ্ঠান করেন। দেউলকে পাটও বলা হয়। চৈত্রসংক্রান্তির কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে এই পাট কাঁধে করিয়া এক দল লোক গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা উপবাস করিয়া থাকে, এবং চৈত্র মাসের চড়ক-সংক্রান্তির দিন অনেক কৃচ্ছ্র সাধন করে। উক্ত দিন বাণ ফোঁড়া, খড়্গের উপর দাঁড়ান প্রভৃতি অনেক অসাধ্য সাধন করিতে দেখা যায়। পূর্ব্বেকার মত সে রকম প্রথা এখন আর নাই ; তবে তাহা যে একেবারে লোপ পায় নাই, অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়।

দেলপূজা বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে ইহাকে গাজনের পূজা বলা হয়—অন্যান্য অঞ্চলে ইহা চড়ক-পূজা নামে খ্যাত। বস্তুতঃ দেল বা দেউলের কথা বাঙলার সর্ব্বত্র শোনা যায়। দক্ষিণ-বঙ্গের খুল্না জেলা হইতে সংগৃহীত ছড়ার মধ্যে দেউলের জন্ম-কথা উল্লিখিত আছে।

> না ছিল পাট, না ছিল খাট, না ছিল সিংহাসন।
> কোথায় আছিল পাট কাহার আসোন ॥
> মহেষের আসন পাট ছুতারে ছাচি আনি।
> দেউল সৃষ্টি, পাট বলে ত্রিভুবনে জানি ॥
> সৃষ্টিকর্ত্তা নিরাঞ্জন করিলেন স্থূল।
> পাটের সঙ্গে দেখি মহেষের ত্রিশূল ॥

দেউল বা পাটের মধ্যে মহাদেব অবস্থান করেন। পাটের উপর মহাদেবের ত্রিশূল দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাট বৎসরের মধ্যে এগার মাস "মড়ার" মত মণ্ডপের এক কোণে পড়িয়া থাকে। চৈত্র মাসে ইহাকে স্নান করাইয়া ঠাকুরের পূজায় লাগাইতে হয়।

> এগার মাস ছিল পাট মরাশরীর ঘরে।
> মধুমাসে শিবের পূজা পাটের তলব পড়ে ॥

স্নান করিয়া পাট ধরে কলেবর।
ত্রিশূলে অধিষ্ঠান হও ভোলা মহেশ্বর ॥
* * * *
বসন ঝাপিতে পাট চক্ররূপ নমস্তে।
সন্ধ্যে গায়ত্রী পড়ি ব্রাহ্মণে দুর্ব্বা তুলি নিলেন হস্তে।
জন্মে জন্মে পাট বনে তুলি বন্দি মস্তে ॥

পশ্চিমবঙ্গের গাজনের ছড়ায় পাটের কথা পাওয়া যায়।

ধবল পাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন।
ধবল পদ্মে বসে আছেন দেব নারায়ণ ॥
দেব বন্দম দেয়াশী বন্দম, খাট পাট লাঠি বন্দম।
সরস্বতী গঙ্গে বামে বীর হনুমান, ইত্যাদি।

শিবের গাজনের সময় উক্ত ছড়া মন্ত্রের আকারে আবৃত্তি করিতে হয়। মালদহের "আদ্যের গম্ভীরা"য় অনুরূপ বিষয়বস্তুর উল্লেখ আছে।

জল বন্দ স্থল বন্দ আদ্যের গম্ভীরা বন্দ।
ডাহিনে ডঙ্গর বন্দ বামে বীর হনুমান ॥
* * * *
দেউল বন্দন, দেহারা বন্দন, শাঠ পাট লাঠী বন্দন।
আদ্যের তুলসী বন্দন, আর বন্দ সরস্বতীর গান।
ডাইনে বন্দ রামলক্ষ্মণ সীতা বামে বীব হনুমান ॥

পশ্চিমবঙ্গের গাজনের ছড়ার মধ্যে "দেয়াশী" বন্দনার কথা আছে। এই দেয়াশী জাতীয় লোকেরাই গাজনের উপবাস করিয়া থাকে। উত্তরবঙ্গে ইহাদিগকে "দেববংশী" নামে অভিহিত করা হয়। দক্ষিণ-বঙ্গের খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলায় ইহাদিগকে "বালা" বলে। বালা, শিবের ভক্ত অনুচরবিশেষ। বালাকে "মহেশ্বর" নামে অভিহিত করার কথা দেলপূজার ছড়ার মধ্যে আছে,—

যেই দিন পৃথিবী হইল অনাদি প্রচার।
ব্রহ্মা হইল পূজা-কারী বালা মহেশ্বর ॥

উক্ত ছড়ার মধ্যে অন্যত্র আছে,—

ব্রহ্মা হইল পূজাকারী, বিষ্ণু হইল ধর্ম্মাধিকারী,
বালা হইল মহেশ্বর।
* * * *
এই সব দেবতা মিলি, সত্যযুগে দেল করি
প্রচারিলে আদ্যের ভবানী।

উল্লিখিত বিষয়ের মধ্য হইতে আর একটি সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। দেল-পূজার অপর নাম ধর্ম্মপূজা। বিষ্ণু সেই ধর্ম্মের অধিকারী দেবতা—তিনিই নিরঞ্জন মহাপ্রভু নামে অভিহিত। দেল-পূজার ছড়ার অনুরূপ পুথিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সৃষ্টির

আদিতে তিনি শবরূপে জলের উপর ভাসমান ছিলেন। তাঁহা হইতে পৃথিবী ও আদ্যা শক্তির জন্ম হয়। পরে আদ্যা শক্তির গর্ভে মহেশ্বরের জন্ম হয়। মহেশ্বর জন্ম গ্রহণ করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলে সৃষ্টি সংরক্ষণ বিষয়ে সমস্যার উদয় হয়। ক্রমে আদ্যা শক্তি পার্ব্বতীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া মহেশ্বরের সহধর্ম্মিণী হইলেন। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে (?) এরূপ বিষয়ের সন্ধান মিলে। খুলনা জেলা হইতে সংগৃহীত দেল-পূজার ছড়ার সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে। দেলপূজার ছড়ার এক স্থানে আছে,—

পৃথিবী স্থাপিয়ে গোসাঞি ভাবে মনে মন।
উল্লুকার বচন তখন হইল স্মরণ॥
আপন দক্ষিণে পশুপতি
অনা শূন্যে জন্মিল বিষ্ণু, বামেতে পার্ব্বতী॥
হুঙ্কার করিতে ভাবিলে আপনি।
ততক্ষণে বাম পার্শ্বে গেলেন নারায়ণী॥

আদ্যা শক্তি নারায়ণী ক্রমে সৃষ্টিসংরক্ষিণীরূপে পরিণত হইলেন। এই সৃষ্টিকার্য্যে নিরঞ্জন গোসাঞি উল্লুকার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উল্লুকার বিবরণ শূন্যপুরাণের মধ্যে অনেক স্থলে আছে। সৃষ্টিকার্য্যের প্রধান সহায়ক উল্লুকার নামের তাৎপর্য্য কি, তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ উল্লুকাকে পেচকের পর্য্যায়ে ফেলিতে চাহেন। কিন্তু উল্লুকাকে পেচকরূপে ধারণা করিতে আপত্তি থাকিতে পারে। যে উল্লুক পক্ষী বল্লুক নদী পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিল, সেই উল্লুক সাধারণ পেচক হইতে পারে কেমন করিয়া? আমরা জানি, বিষ্ণুর বাহন গরুড় পক্ষী; তাহার শক্তিও নাকি অসাধারণ। সেইরূপ উল্লুক পক্ষীও খুব শক্তিশালী—তাহাকে গরুড়ের পর্য্যায়ে ফেলা না গেলেও, গরুড়ের মত শক্তিশালী পক্ষিরূপে ধারণা করা যাইতে পারে। এখন বল্লুকা লইয়া একটু আলোচনা করা যাউক। কেহ অনুমান করেন যে, বল্লুকা নদী বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত—বর্দ্ধমানের দামোদর নদ হইতে বাহির হইয়া ইহা নাকি মৃজাপুরের খালে পড়িয়াছে। এই নদীর তীরে নাকি ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির ছিল। অন্য পক্ষে আমরা দক্ষিণ-বঙ্গের দেলপূজার মধ্যে উল্লুক সাগরের কথা পাই। এই উল্লুক সাগরের কূলে নাকি মালঞ্চ সৃষ্টি করিবার জন্য নন্দী বীর মহাদেবের নিকট হইতে আজ্ঞা পাইয়াছিলেন।

আইস ২ নন্দি নারদ বাটা তাম্বুল খাও।
বল্লুক সাগরের কূলে মালঞ্চ সৃজাও॥
একে ত নন্দি বীর আরও আজ্ঞা পায়।
বল্লুক সাগরের কূলে মালঞ্চ সৃজায়॥

ইহার দ্বারা অনুমান করা অসম্ভব নহে যে, বল্লুক সাগর[১] বঙ্গোপসাগরের একটি শাখাবিশেষ।

১। সাগর=বৃহৎ বিলকেও সাগর বলা হইয়া থাকে। প্রান্তিক পূর্ব্ববঙ্গে (শ্রীহট্টে) ইহা হাওর নামে পরিচিত। "সায়র" শব্দ একই অর্থদ্যোতক।

যাহা হউক, বল্লুক সাগরের কূলে মহাদেবের কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। বৈদিক রুদ্র পরবর্ত্তী কালে শিবরূপে যে পূজা পাইয়া আসিতেছেন, তাহার প্রমাণ শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। শিবই ধর্ম্মের প্রতীকস্বরূপ এবং তিনি সত্য ও সুন্দর। সকলেই তাঁহার পূজা করিবার অধিকারী। তিনি সর্ব্বজনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার কথা বাঙলার ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যের উদ্ভব লইয়া একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পর হইতে নাথপন্থী সাহিত্য গড়িয়া উঠে। আমাদের দেশের নাথসম্প্রদায়ের লোকেরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবিশেষ। গোরক্ষনাথ তাঁহাদের গুরু—ময়নামতীর গান কিংবা গোরক্ষবিজয়ে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নাথ-সম্প্রদায়ের লোকেরা শিবকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সব ছড়াগান রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের উপর বৌদ্ধপ্রভাব বর্ত্তমান। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। লৌকিক আচারে এবং পূজাপদ্ধতিতে বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন পাওয়া যায়! নাথ-সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়ায় বর্দ্ধিত হইলেও, তাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ ছিলেন; এমন কি, তাঁহারা বেদকে মানিয়া চলিতেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ না পাইলেও বেদ আলোচনা করিতে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন না। এখনও নাথেরা নিজদিগকে সামবেদী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন এবং শিব-গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দেন। দেলপূজার ছড়ার এক স্থান সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে বেদের সঙ্গে মিলিয়া যায়।

প্রজাপতির মুখে বিপ্র আরও চারি বেদ।
বাহুতে জন্মিল ক্ষৈত্র শুন তার ভেদ।
উরুতে জন্মিল বৈশ্য বানেজ্জ অধিকারী।
পদেতে জন্মিল শূদ্র পালন আচারী।

ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে জাতিভেদ সম্বন্ধে অনুরূপ বিষয় উক্ত হইয়াছে,—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।

সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে দেলপূজার ছড়ায় যে সব বিষয় উক্ত হইয়াছে, সে সব বিশেষ উপভোগ্য। মন, প্রাণ, চক্ষু প্রভৃতি হইতে কি কি উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা ছড়ার মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গেও ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তের সাদৃশ্য আছে।

মনেতে জন্মিল চন্দ্র চক্ষে দিবাকর।
মুখেতে জন্মিল ইন্দ্র অতি খরতর।
প্রাণেতে জন্মিল পবন জগতের প্রাণ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর জন্মিল স্থানে স্থান।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের (?) সহিত দেলপূজার ছড়ার সাদৃশ্য আছে। শূন্যপুরাণের শূন্যবাদের সঙ্গে দেলপূজার ছড়ার শূন্যবাদ হুবহু মিলিয়া যায়। শূন্যপুরাণের এক স্থলে বলা হইয়াছে,—

নহি রেক্ নহি রূপ নহি বন্ন চিন।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার না ছিল, না ছিল কৈলাস॥

দেল-পূজার ছড়ার মধ্যেও অনুরূপ বিষয় উক্ত হইয়াছে।

রূপ রেক না ছিল গোসাঞির নিঃস্ব মহাধনী (?)।
কিরূপে আছিল গোসাঞি অবট্ট পরিমাণি॥
না ছিল জল না ছিল স্থল না ছিল পবন হুতাশ।
না ছিল স্থাবর না ছিল জঙ্গম না ছিল আকাশ॥
জলং নাস্থি স্থলং নাস্থি নাস্থি স্থিতি পৃথিবী।
স্বর্গ মর্থ পাতাল নাস্থি দেবের স্থিতি হইল কিথি॥

শূন্য হইতে পূর্ণ ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্য্য কি করিয়া সম্ভব হইল, তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। চিন্তাশক্তির উদ্ভবের সঙ্গে মানুষ জানিতে চাহিয়াছে, এই প্রপঞ্চময় জগৎ কে সৃষ্টি করিল, কেমন করিয়াই বা সৃষ্টিকার্য্য চলিতে লাগিল। এইরূপ জিজ্ঞাসার ফলে দর্শনের উদ্ভব; দর্শনের সহায়ে আত্মা ও বাহিরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে।

শূন্যবাদ আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে প্রচলিত। ঋগ্‌বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদাদি গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। তবে বৌদ্ধ-শূন্যবাদ আমাদের দেশে বেশী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধ-সাহিত্যে এবং বৌদ্ধ-দর্শনে শূন্যবাদের বিশেষ উল্লেখ আছে। উপনিষদের সহিত তাহার যে পার্থক্য থাকিবে, তাহা স্বাভাবিক; কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যেও শূন্যবাদ লইয়া মতভেদ বিদ্যমান। মিলিন্দ-পঞ্‌হে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে,—"শূন্য পরমতত্ত্ব; তাহা অভাব বা নঞ্‌ নহে।" সাধারণতঃ শূন্যতাবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকেরা জগতের পরিবর্ত্তনকে শূন্যের স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। তাহার অদল-বদল করিয়া পরবর্ত্তী কালে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ প্রচারিত হয়। বৌদ্ধদের মতে শূন্য স্বয়ংপ্রকাশ, তাহা আলোকময় এবং এই আলোক হইতে অন্ধকারের উদ্ভব হইয়া থাকে। বেদপন্থী হিন্দুদর্শন বলে, অন্ধকারই শূন্যের স্বরূপ; তাহা হইতে আলোর বিকাশ। নাথ-পন্থী সাহিত্যের মধ্যে যে শূন্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা ধর্ম্মের নামান্তর মাত্র। শিব ও ধর্ম্ম আমাদের দেশে একযোগে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যে তাঁহাদের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত।

ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্য

শিব ও ধর্ম্ম নিরঞ্জনকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রাচীন বাঙলায় যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্য নামে পরিচিত। ধর্ম্ম-পূজাবিধান, শূন্য-পুরাণ, ময়ুর ভট্টের পুথি প্রভৃতিকে ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যের অন্তর্গত করা চলে। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল এবং মনসামঙ্গল কাব্যগুলিও ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে। বস্তুতঃ বাঙলা দেশে গাজনের ছড়ার আকারে যে সব ছড়া প্রচলিত, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের সন্ধান মিলে।

ধর্ম্ম নিরঞ্জনের কথা বাঙলার প্রাচীন পুথিতে অনেক আছে। ইনি নারায়ণের স্বরূপ-বিশেষ। সৃষ্টির প্রথমে যখন শূন্য ভিন্ন কিছুই ছিল না, তখন তিনি একাকী জগতের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি জীব-জগতের সৃষ্টি করিলেন।

জন্মিল পার্ব্বতী, বাহির হইল ক্ষিতি,
ধর্ম্ম-মাত্র এ সব কারণ ॥

ধর্ম্মের জন্য জীব-জগতের উদ্ভব, ধর্ম্মের মধ্যে জীব ও জগতের অবস্থিতি এবং ধর্ম্মেই জীব-জগতের পরিণতি। মানুষের মধ্যে ধর্ম্মের যে বিরাট্ যোগসূত্র আছে, তাহা মানুষ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না।

ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যে লাউসেন রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্ম-পূজার প্রচার করেন। দেলপূজার ছড়ায় লাউসেন রাজার উল্লেখ আছে।

রাউসেন নামে রাজা ছিল নৃপবর।
কঠোর করিল স্তব কয়েক বৎসর ॥
দান ধ্যান যাক্ যজ্ঞ করিল সেই রাজা।
সেই হইতে প্রকাশ হইল শিবপূজা ॥

শিবপূজা ধর্ম্মপূজার নামান্তর মাত্র। শিবই ধর্ম্মের প্রতীকস্বরূপ,—তিনি সত্য এবং সুন্দর। লাউসেনের পিতা কর্ণসেন ধর্ম্মপালের সেনাপতি ছিলেন। তিনি ঢেকুর গড়ের ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। পরে কর্ণসেন গৌড়ের রাজার শ্যালিকা রাণী রঞ্জাবতীকে বিবাহ করেন। রঞ্জাবতী ধর্ম্ম ঠাকুরের কাছে বহু কৃচ্ছ্ সাধন করেন এবং লাউসেনকে পুত্ররূপে লাভ করেন। লাউসেন রামাই পণ্ডিতের সহায়তায় ইছাই ঘোষকে নিহত করিয়া স্বীয় পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতের কাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ লামা তারানাথের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া অনুমান করেন, লব সেন বা লাউসেন খুব সম্ভব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। রামাই পণ্ডিতও এই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। রামাই পণ্ডিত শূন্যপুরাণের (?) রচয়িতা। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় "শূন্যপুরাণ" (?) ষোড়শ শতকের লেখা বলিয়া মনে করেন। অনেকে মনে করেন, লাউসেনের কাহিনী শুধু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাঙলার অন্যত্রও যে তাঁহার কাহিনী শ্রুত হয়, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে খৃষ্টীয় নবম শতকের পর নাথ-সম্প্রদায় একপ্রকার সাহিত্য গড়িয়া তুলেন। মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের গান তাঁহাদের অমূল্য অবদান। নাথেরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবিশেষ। তাঁহারা শিবের উপাসক—নিজদিগকে "শিব-গোত্রীয়" বলিয়া প্রচার করেন। অন্য পক্ষে গোরক্ষনাথ তাঁহাদের ধর্ম্মগুরু। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। কিন্তু বাঙলায় আসিবার পর, আর তিব্বতীয়দের সঙ্গে মিশিতে পারেন নাই। তখন তিনি বাঙলা দেশে এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি

করেন। তাহারা নাথসম্প্রদায় নামে বিদিত। নাথসম্প্রদায় বর্ণাশ্রমী হিন্দুধর্ম্মের সহিত যুক্ত হইতে পারে নাই—তাহাদের আচার-পদ্ধতি সাধারণ হিন্দু হইতে একটু ভিন্ন। নাথপন্থী সাহিত্যে আমরা যে ধর্ম্ম নিরঞ্জনের উল্লেখ পাই, তিনি স্বয়ং বুদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে বিশেষ ভাবে কৃচ্ছ্রসাধনের সন্ধান পাওয়া যায়। এরূপ আত্মনিগ্রহ অন্য কোন ধর্ম্মে নাই। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, নাথসম্প্রদায় ধর্ম্মমঙ্গলের প্রবর্ত্তক (?)। ধর্ম্মমঙ্গল বা ধর্ম্মপূজার প্রচলন তাহাদের মধ্যে বেশী—উহা তাহাদের মধ্য হইতে রূপ পাইয়া, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেলপূজার ছড়ায় "অমুক নাথকে বর দেও ভোলা মহেশ্বর" কথার উল্লেখ আছে। দক্ষিণ-বঙ্গের নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে দেলপূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত। উত্তরবঙ্গের নাথেরা "ধর্ম্ম-ঠাকুরের" পূজা করে। তাহাদের মধ্যে অনেকে চড়ক পূজায় দেবাংশী বা দেববংশী হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থলে ধর্ম্মরাজ পূজার প্রচলন আছে। ধর্ম্মরাজ পূজা মেয়ে-পুরুষে করিয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন, এই ধর্ম্মরাজ-পূজার সহিত লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতের বীরত্বকাহিনী বিজড়িত। পশ্চিমবঙ্গে ডোম বাগ্‌দী প্রভৃতি সম্প্রদায়েরাও এই পূজা করিয়া থাকে—রামাই পণ্ডিত তাহাদের লইয়া একটি যোদ্ধসম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। সকল জাতি এক করিবার জন্য ধর্ম্মপূজার প্রচলন হয়; কারণ, গাজনের মধ্যে শুদ্ধিতত্ত্বের উল্লেখ আছে। আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারি না। তবে গাজনের ছড়ার আকারে যে সব ছড়া আমাদের হাতে আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শুদ্ধি-প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা বাঙলার বিশেষ কোন অঞ্চলের নিজস্ব নহে; দৃষ্টি প্রসারিত করিলে এ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে।

যাহা হউক, ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা নাথ-সম্প্রদায়ের উল্লেখ না করিয়া পারি না। ধর্ম্মমঙ্গল-সাহিত্যে তাঁহাদের দান অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রচয়িতা

আলোচ্য গ্রন্থের কবি কিংবা রচয়িতা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ কোন কবির নাম পাওয়া যায় না। কোন কোন ছড়ার শেষে কবি বিন্দু, অনন্ত ঘোষ, কালিদাস প্রভৃতির নামের উল্লেখ আছে। তাঁহাদের কাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। দেলপূজার ছড়া যে কোন একজন কবির রচিত নহে, এবং এক সময়েও যে রচিত হয় নাই, তাহাই শুধু বলা যাইতে পারে।

অষ্টকের গান

দেলপূজার ছড়ার আবৃত্তির সঙ্গে একদল লোক নানারূপে সঙ সাজিয়া গান করিয়া বেড়ায়। দক্ষিণ-বঙ্গে ইহাকে অষ্টকের গান বলে। অষ্টকের গান প্রধানতঃ শিবের বিষয়-

বস্তু লইয়া রচিত—শিবের বিবাহ, শিবদুর্গার ঘরকন্না, গঙ্গা ও দুর্গার বিবাদ প্রভৃতি উক্ত গানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দী কিংবা তৎপরবর্ত্তী অনেক বাঙালী কবির রচনায় এরূপ বিষয়বস্তুর সন্ধান মিলে। ৺দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে এরূপ বিষয়েব উল্লেখ আছে। শিবের বিষয় ভিন্ন আলোচ্য গানের মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে—রাম সীতার বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণ রাধার বিরহ এবং নিমাইসন্ন্যাস প্রভৃতি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

অষ্টকের গানকে দেলপূজার সঙ-গান বলা হয়। আসল পূজার ৫।৬ দিন পূর্ব্ব হইতে সমভাবে এই গান চলিতে থাকে। গ্রাম্য যুবকেরা "অষ্ট সখী" সাজিয়া নাচ-গান করিতে থাকে—এ জন্য ইহাকে অষ্টকের গান বলা হয়। এদিকে দেউল কিংবা পাট কাঁধে করিয়া "বালা"শ্রেণী মন্ত্র-ছড়া আবৃত্তি করিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন পূজা করিবার জন্য মণ্ডপে দেউল উঠান হয়। তার পর বালা-সম্প্রদায় অনেক কৃচ্ছ্র সাধন করে। এ সময় নাচ-গান স্থগিত রাখিবার কথা। কিন্তু গ্রাম্য যুবকেরা নাচ-গানে এমন বিভোর হইয়া যায় যে, সে কথা তাহাদের মনে থাকে না। সে জন্য কথায় বলে,—"দেল মণ্ডপে উঠল, এখনো নাচনা থামল না।"

অষ্টক গানের সামান্য কিছু উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের সম্বন্ধ আছে—শিবের গানে তাহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

দেলপূজার ছড়া

কৈলাসে আছিলে মাতা জগৎজননী,
পাষাণে ভাঙ্গিলে মাতা গজ গহিনী (?) ॥
গজ গহিনী ত্রিণগজা করি নমস্কার।
পতিতপাবনী গঙ্গা করিবেন উদ্ধার ॥

চৈতন্য করান

১। প্রথম মাসে জন্মে শিশু লোক বেদন।
পাতক পিতক সবেদন ॥
দৈত্য বলি জন রায়, কভু নাকি দন্ত।
তবে জানি সজাকি প্রভু চৈতন্য ॥

২। মঙ্গলা সে জন্মে মনোরত দিষ্টে।
ধরণী ধরিলে তিল কৃত নব সৃষ্টে ॥
ব্রজ ভানু রূপ ভুবন আনন্দ।
তবে জানি সজাকি প্রভু চৈতন্য ॥

৩। দীর্ঘ দীর্ঘ ধারা দৈত্য শরীর রূপ।
পরম উল্লাসিত গোসাঞির পরম গভীর রূপ।
ত্রিভুবন ভার্য্যা ভুবন আনন্দ।
তবে জানি সজাকি[১] প্রভু চৈতন্য ॥

নিদ্রাভঙ্গ

১। প্রভু হে, যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ, সেবকেরে দেখাও রঙ্গ,
পরিহার তোমার চরণে।
কার্ত্তিক গণেশ ল'য়ে কোলে, শুয়েছ নিদ্রার ছলে
প্রণাম করিব কেমনে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র প্রজাপতি, তাহারা করেন স্তুতি,
আর দেব কোন কাজে লাগে।
চলন বৃষরাজে, শিঙ্গে ভুম্বুরু ভুজে,
গৌরী রহেন বামভাগে ॥
তোমার নিদ্রা ভাঙ্গিতে, গোসাই মনে করিয়ে
অপরাধ ক্ষমা করি রাখ রাঙ্গা পায় ॥

১। সজাকি=সজাগ, জাগরিত।

২। ষট্‌ক্ষরের প্রণাম ঃ—ওঁ নমঃ শিবায়।
ওকারং বিন্দং সমযুক্ত নিত্যা ধ্যান্তিং যোগিনঃ।
কামদে মুক্ষদাশ্চৈব ওঁঙ্কারই নমঃ নমঃ। ১।
ন জাতা নৈবশ্ব খেয়ং যস্ব্য ন বিদ্যাতে
নমত্র্ন দেবতা সৰ্ব্বে নকারয়ই নমঃ নমঃ ॥
মহাদেব মহাত্তনং মহাযোগী মহেশ্বরং।
মহাপাপং হর দেব মকারাই নমঃ নমঃ। ৩॥
শিব শান্তং জগন্নাথঃ নকাল্লাগ্রিহ কাককং
শিবমৈর্বং হরঃ দেব সকারাই নমঃ নমঃ ॥৪ ॥
বাহন বৃষ ভুজস্ব বাসকী কণ্ঠে ভুষণম্।
বামে শক্তিৎধরং দেবঃ বকারৈ নমঃ। ৫ ॥
যত্র তত্র স্থিতে দেবী জগৎ ব্যাপিত মহেশ্বরঃ
জগৎকৰ্ত্তা জগন্নাথ যকারৈ নমঃ নমঃ। ৬ ॥

গাজনের ছড়া (হাওড়া জেলায় সংগৃহীত)

ওহে যোগপতি যোগেশ্বর
যোগে থাক নিরন্তর,
গৌরী আছেন বাম ভাগে,—
কার্ত্তিক গণপতি লয়ে কোলে,
সুখে নিদ্রা যাও সকলে।
প্রণাম করিব কেমনে।
যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ, সেবকের দেখ রঙ্গ
পরিহার তোমার চরণে। ইত্যাদি—

ধূপতির জন্ম

৩। মাটির ধূপতি লুকায়, মাটিতে লুকায়ে ধরে নানা মূর্ত্তি
মহেশ্বর গুরু বলে তুলে দিলেন হস্তে।
জন্মে ২ এই কমল তুলে বন্দি মস্তে।

৪ নং—ধূপীর জন্ম।
যেই দিন পৃথিবী হইল অনাদি প্রচার।
ব্রহ্মা হইল পুজা-কার, বালা হইল মহেশ্বর।
বিষ্ণু বলেন শুন সকল দেবতা।
নিরাঞ্জন হবে পুজা ধূপ পাবে কোথা।
এতেক শুনিয়া শিব বসিলেন যোগেতে।
যোগবলে এক বৃক্ষ জন্মিল আচম্বিতে।
মারিল ত্রিশুলের বাড়ী দেব গঙ্গাধর।
বৃক্ষ হ'তে আটা ঝ'রে পড়িল সত্বর।
সূর্য্যের কিরণে আটা শুকাইল তখন।
যোগে বলে ধূপ সৃষ্টি কর্লেন ত্রিলোচন।
দেখিয়া তুষ্ট হইল দেবী দশভুজা।
এই ধূপ দিয়ে কর ত্রিলোচনের পুজা।

৫ নং। ধূপ পোড়ান।
(ক) এই ত সভার মধ্যে* বইছ যত জন।
ধূপতির মাহিত্য কথা শুন দিয়া মন।
এই ধূপতিতে কাষ্ট দিয়ে স্থাপিত আগুনি।
এই ধূপতি হস্তে লইলে কম্পিত মেদিনী।
এই ধূপতি লইলাম মোরা হস্তে করিয়া।
হরি বল হরি বল বদন ভরিয়া ॥১॥
(খ) করালবদনী কালী অসুরনাশিনী।
কুমদ্যা শশি তুমি শ্মশানবাসিনী।
ঘোররূপে পদতলে রাখ ত্রিপুরারী।
জয়স্থিররূপেতে ধূপ লহ মাতা মহেশ্বরী।

ধূপতির মাহিত্য বা ধূপ পোড়া

(গ) দুর্ব্বাসার সাপে লক্ষ্মী খিরদ গমন।
ইন্দ্রদর্প চুর করিলে বিষাদ ভাবন।
মন্থনে জন্মিলে মাগো পাইলাম সাক্ষী।
নিবেদন করি ধূপ লহ মাতা লক্ষ্মী।
(ঘ) তমগুণে মহাদেব সৃষ্টির সংহারণ।
বিভূতি ভুষণ সিবের বলদ বাহন।
ফনিমনি জটাজুট নবগৃহ রূপ।
বাহন সহিত সিবেকে নিবেদিলাম ধূপ।
(ঙ) স্বতো গুনে বিষ্ণু দেব সৃষ্টির পালন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কস্তরী ভুষণ।
গরূঢ় বাহন বিষ্ণু নিলোৎপল রূপ।
বাহন সহিতে বিষ্ণুকে নিবেদিলাম ধূপ।
(চ) স্বেত ধূপ নীল ধূপ ধূপ করিয়ে চুর।
ধূপীর গন্ধ হয়ে গেল শ্রীকৈলাশ পুর।
কৈলাষে থাকিয়া ধূপ মর্ত্তে কর বর।
অমুক নাথকে বর দেও ভোলা মহেশ্বর।
(ছ) কুমট মকুট মায়ের মুণ্ডমালা গলে।
কাটিলে ধনুক জন পড়িল ভুমিতলে।
সকল দানব শিব বাম করে ধরি।
মঙ্গল রূপেতে ধূপ লহ মহেশ্বরী।

---

* বইছ=বসিয়াছ

প্রাচীন বাঙলার শ্রেণীবিভাগ

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

পূর্বে এক অধ্যায়ে* দেখিয়াছি, প্রাচীন বাঙলায় ধনোৎপাদনের তিন উপায়—কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। সেই অধ্যায়ে ইহারও আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ব্যবসা-বাণিজ্যই এই তিন উপায়ের মধ্যে ধনাগমের প্রথম ও প্রধানতম উপায় ছিল বলিয়া মনে হয়। এই তিন উপায় ও বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তিনটী প্রধান শ্রেণী প্রাচীন কালে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া অনুমান সহজেই করা যায়। আশ্চর্যের বিষয়, প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলিও এই অনুমান সমর্থন করে, এবং এই তিনটি এবং অন্যান্য শ্রেণীগুলিও তাহাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লইয়া কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও সুস্পষ্ট সীমারেখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু সে-কথা বলিবার আগে আমাদের উপকরণগুলি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন।

এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র উপকরণ—ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলিগুলি। এই পট্টোলিগুলি সম্বন্ধে একটা বিষয় কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। মহাস্থান শিলাখণ্ড-লিপি বা চন্দ্রবর্মনের শুশুনিয়া-লিপি আমাদের বক্ষ্যমাণ বিষয়ে বিশেষ কোনও কাজে লাগিতেছে না। যদি অনুমান করা যায় যে, মৌর্যকালে বাঙলাদেশ অথবা তাহার কতকাংশ মৌর্যসম্রাট্‌দের করতলগত ছিল, এবং মৌর্যশাসন-পদ্ধতি এ দেশেও প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হয় যে, মৌর্যরাষ্ট্রে আমরা যে-সব রাজপুরুষদের পরিচয় অশোকের লিপিমালা, কৌটিল্য ও মেগাস্থিনিস্ হইতে পাই, সেই সব রাজপুরুষেরা এদেশেও বিদ্যমান ছিলেন, এবং মৌর্যপ্রাদেশিক-শাসনের যন্ত্র পুংনগলের মহামদাতের নির্দেশে বাঙলা দেশেও পরিচালিত হইত। কিন্তু তাহা হইলেও এই অনুমান বা প্রমাণ হইতে আমরা একমাত্র রাজপুরুষশ্রেণী বা সরকারী চাকুরীয়া ছাড়া আর কোনও শ্রেণীর খবর পাইলাম না। পরবর্তী যুগেও কতকটা তাহাই; উত্তর-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সমসাময়িক লিপিগুলি অধিকাংশই ত রাজরাজড়ার বংশ-পরিচয় ও যুদ্ধজয়বিজয়ের এবং অন্যান্য কীর্তিকলাপের বিবরণ। এই সব লিপিতেও রাজপুরুষ-শ্রেণী ছাড়া আর কাহারও খবর বড় একটা নাই। সমসাময়িক সংস্কৃত-সাহিত্যে, যেমন শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে, ভাসের দু'একটি নাটকে, কালিদাসের শকুন্তলায় পরোক্ষ ভাবে সমাজের অন্যান্য বৃত্তি ও শ্রেণীর খবরাখবর কিছু কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত অস্পষ্ট। শুঙ্গ আমলের ভরহুত স্তূপের বেষ্টনীতে কিংবা কিছু পরবর্তী কালের সাঁচীর শিলালিপিগুলিতে ও মথুরায় প্রাপ্ত কোনও কোনও লিপিতে, কোন কোনও প্রাচীন মুদ্রায়ও এই ধরণের পরোক্ষ কিছু কিছু খবর আছে; শিল্পী ও বণিক্-ব্যবসায়ি-শ্রেণীর আভাস তাহাতে আছে। একমাত্র জাতক-গ্রন্থ ছাড়া আর কোন উপাদানের ভিতরই প্রাচীন ভারতের শ্রেণীবিন্যাসের চেহারা

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৪৭, ১৭৬-২০৬ পৃষ্ঠা। লিপিগুলির বিস্তৃতি পরিচয়ের জন্য উক্ত প্রবন্ধের পাদটীকা দেখুন।

খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পঞ্চম শতক পর্যন্ত বাঙ্‌লাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। তবে অনুমান করিয়া একটা অস্পষ্ট চেহারা আঁকিয়া লওয়া যায়। কিন্তু সে চেষ্টা আমরা করিব না।

পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত বাঙ্‌লাদেশ-সংক্রান্ত পট্টোলিগুলি সমস্তই ভূমিদান-বিক্রয়ের দলিল। এই পট্টোলিগুলির মধ্যে আমরা শ্রেণীসংবাদ যে খুব বেশী পাইতেছি, তাহা নয়; তবে দুইটি শ্রেণী বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে, সে-অনুমান সহজেই করা চলে, একটি রাজপুরুষ শ্রেণী, আর একটি বণিক্‌ ও ব্যবসায়ী শ্রেণী। তাহা ছাড়া মহত্তরাঃ, ব্রাহ্মণাঃ, কুটুম্বিনঃ, ব্যবহারিণঃ ইত্যাদি, সাধারণ ভাবে 'অক্ষুদ্র প্রকৃতি' অর্থাৎ গণ্যমান্য জনসাধারণ ইত্যাদি কতকগুলি শব্দের সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। ব্রাহ্মণদের বৃত্তি কি ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু মহত্তর (মহতর = মাহাতো = মাতব্বর লোক), কুটুম্ব অর্থাৎ গ্রামবাসী গৃহস্থ যাহারা এবং 'অক্ষুদ্রপ্রকৃতি' জনসাধারণ কিংবা যে সমস্ত 'সমব্যবহারী' কোনও বিশেষ প্রয়োজনে নিজেদের মতামত দিবার জন্য স্থানীয় অধিকরণের (তথা রাষ্ট্রের) সাহায্য-নিমিত্ত আহূত হইতেন, তাঁহাদের বৃত্তি কি ছিল, তাঁহারা কোন্‌ শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন, এ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন আভাস এই লিপিগুলিতে পাওয়া যায় না। ভূমি দান-বিক্রয় উপলক্ষে যাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হইতেছে, যাহাদের এই দান-বিক্রয় বিজ্ঞাপিত করা প্রয়োজন হইতেছে, তাহাদের মধ্যে শ্রেণী হিসাবে কোন শ্রেণীর উল্লেখ নাই; তবে যাহারা এই ব্যাপারে প্রধান, তাহাদের মধ্যে রাজপুরুষশ্রেণী এবং বণিক্‌ ও ব্যবসায়িশ্রেণীর লোকেদেরই দেখিতে পাওয়া যায়; অন্য যাহাদের উল্লেখ আছে, তাহারা কোনও বিশেষ শ্রেণীপর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করিবার উপায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, এই যে রাজপুরুষদের উল্লেখ, তাহা তাহাদিগের অধিকৃত পদমর্যাদার জন্যই; সুস্পষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাদিগকে উল্লেখ করা হইতেছে না; তেমন উল্লেখের প্রয়োজনও হয় নাই।

অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলির স্বরূপ একটু ভিন্ন প্রকারের। এই-গুলি সবই ভূমি দানের দলিল; পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের দলিলগুলিতে ভূমি কি ভাবে বিক্রীত হইতেছে, এবং পরে দান করা হইতেছে, তাহার ক্রমের বা procedure-র সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে; অষ্টমশতক-পরবর্তী দলিলগুলিতে ভূমি ক্রয়ের যে ক্রম (process), তাহা আমাদের দৃষ্টির বাহিরে; আমরা শুধু দেখি, রাজা ভূমি দান করিতেছেন, এবং সেই ভূমি-দান বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। এই বিজ্ঞাপন যাহাদের করা হইতেছে, তাহাদের উপলক্ষ্য করিয়া সমসাময়িক প্রায় সমস্ত শ্রেণীর লোকদের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, যাহাদিগকে বিজ্ঞাপিত করার কোনও প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না, তাহাদেরও জানান হইতেছে; যেমন, যে-গ্রামে ভূমিদান করা হইতেছে, সেই গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের সমস্ত শ্রেণীর লোকদের নিশ্চয়ই জানান প্রয়োজন, সেই গ্রাম যে বীথি, অথবা মণ্ডল বা বিষয় বা ভুক্তিতে অবস্থিত, তাহার রাজপুরুষদেরও জানান প্রয়োজন, কিন্তু রাজনক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, সেনাপতি ইত্যাদি

সকল রাজপুরুষদের জানাইবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া ত সহজ বুদ্ধিতে আসে না, কিংবা মালব, খস, হুণ, কর্ণাট, লাট ইত্যাদি ভিন্নদেশাগত বেতনভোগী সৈন্যদের বিজ্ঞাপিত করিবার কারণও কিছু বুঝা যায় না। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে এই ধরণের সর্বশ্রেণীর, সকল বৃত্তির লোকের উল্লেখ নাই; সেখানে যে-বিষয়ে অথবা মণ্ডলে ভূমি দান-বিক্রয় করা হইতেছে, সেই বিষয়ের অথবা মণ্ডলের রাজপুরুষ, বণিক্ ও ব্যবসায়ী, মহত্তর, ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ইত্যাদির বাহিরে আর কাহারও উল্লেখ করা হইতেছে না।

এইবার একে একে লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক, প্রাচীন বাঙলার শ্রেণী-বিভাগের চেহারাটা ধরিতে পারা যায় কি না। বলা বাহুল্য, পঞ্চম শতকের পূর্বে এ-বিষয়ে স্থির করিয়া কিছু বলিবার, এমন কি, অনুমান করিবারও কিছু উপাদান আমাদের নাই।

প্রথম কুমারগুপ্তের ধনাইদহ (১১৩ গুঃ সং = ৪৩২-৩৩ খৃঃ) লিপিতে দেখিতেছি, ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারটি বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে গ্রামের কুটুম্ব অর্থাৎ অন্যান্য গৃহস্থদের, ব্রাহ্মণদের এবং মহত্তর অর্থাৎ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের; বিজ্ঞাপন দিতেছেন একজন রাজপুরুষ। এই সম্রাটের ১নং দামোদরপুর-লিপিতে (১২৪ গুঃ সং = ৪৪৩-৪৪খৃঃ) রাজপুরুষ হইতেছেন কোটিবর্ষ বিষয়ের বিষয়পতি কুমারামাত্য বেত্রবর্মন্ এবং ভূমি-বিক্রয় ব্যাপারে তাঁহার সহায়ক ও পরামর্শদাতা হইতেছেন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক এবং প্রথম বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ। ইঁহারা সকলেই অবশ্য রাজপুরুষ নহেন; প্রথম কায়স্থ একজন রাজপুরুষ; বাকী তিন জনের দুই জন বণিক্ ও ব্যবসায়িসম্প্রদায়ের এবং একজন শিল্পিশ্রেণীর প্রতিনিধি। কয়েকজন পুস্তপালের (record-keeper) উল্লেখ আছে, ইঁহারাও রাজপুরুষ। বৈগ্রাম পট্টোলি (১২৮ গুঃ সং = ৪৪৭-৪৮খৃঃ) মতে কুমারামাত্য কুলবৃদ্ধি ছিলেন পঞ্চনগরী বিষয়ের বিষয়পতি; কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহার সহায়ক নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক অথবা প্রথম কায়স্থের সাক্ষাৎ পাইতেছি না; পরিবর্তে ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারটি যেখানে জানান হইতেছে, সেখানে বিষয়াধিকরণকেও জানাইবার ইঙ্গিত আছে; অন্যান্য সমসাময়িক লিপি হইতে আমরা জানি যে, পূর্বোল্লিখিত নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক এবং প্রথম কায়স্থ, ইঁহারাই বিষয়াধিকরণ গঠন করিতেন। ইঁহাদের ছাড়া বিক্রীত-ভূমিসংপৃক্ত দুই গ্রামের কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও সমব্যবহারীদিগকেও বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। এই সমব্যবহারীরা বিষয়, মণ্ডল বা গ্রামের রাজপ্রতিনিধির সহায়ক, কিন্তু রাজপুরুষ ঠিক নহেন। কোনও বিশেষ কারণে বা উপলক্ষে প্রয়োজন হইলে ইঁহারা আহূত হন্ এবং স্থানীয় রাজ-প্রতিনিধিকে সাহায্য করেন। ২নং দামোদরপুর-লিপির সাক্ষ্য (১২৮ গুঃ সং = ৪৪৭-৪৮ খৃঃ) প্রথম কুমারগুপ্তের ১নং দামোদরপুর-লিপিরই অনুরূপ। পাহাড়পুর পট্টোলিতেও (১৫৯ গুঃ সং = ৪৭৮-৭৯ খৃঃ) আয়ুক্তক ও পুস্তপালের উল্লেখ পাইতেছি, অধিষ্ঠানাধিকরণের উল্লেখও আছে এবং ভূমি মাপিয়া সীমা ঠিক করিয়া দিতে বলা হইয়াছে গ্রামের ব্রাহ্মণ, মহত্তর ও কুটুম্বদিগকে। ৩নং ও ৪নং দামোদরপুর-লিপির (৪৮২-৮৩ খৃঃ ও দ্বিতীয়টির তারিখ অজ্ঞাত) সাক্ষ্যও এই পর্যন্ত যাহা পাওয়া গেল, তাহাও এইরূপই। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-লিপিতে

(১৮৮ গুঃ সং = ৫০৭-৮ খৃঃ) পঞ্চাধিকরণোপরিক, পুরপালোপরিক, সন্ধিবিগ্রহাধিকরণ কায়স্থ ইত্যাদি রাজপুরুষদের উল্লেখ দেখিতেছি; অন্য কোন শ্রেণীর লোকদের উল্লেখ নাই। দত্ত ভূমি কোনও ব্যক্তিবিশেষ ক্রয় করিয়া, পরে দান করিতেছেন কি না, সে খবর উল্লিখিত অন্যান্য লিপিগুলিতে যেমন আছে, এই লিপিটিতে তেমন নাই। শুধু আছে, জনৈক মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত শাসন-নির্দিষ্ট ভূমি দান করিতেছেন। সপ্তম শতকে ত্রিপুরায় প্রাপ্ত লোকনাথের পট্টোলিও ঠিক্ গুণাইঘর-লিপিরই অনুরূপ। ঠিক্ এই ক্রমটি দেখা যায় পাল ও সেন-যুগের লিপিগুলিতে। গুপ্তযুগের লিপিগুলি একটু অন্যরূপ; সেখানে কোনও ব্যক্তিবিশেষ রাজসরকারের নিকট হইতে ভূমি কিনিয়া দান করিতেছেন; সেখানে রাজসরকারের অর্থ লাভ এবং পুণ্য লাভ দুইই হইতেছে (বৈগ্রাম-লিপি ও পাহাড়পুর-লিপি দ্রষ্টব্য; "···অর্থোপচয়ো ধর্ম্মষড়্ভাগাপ্যায়নঞ্চ ভবতি"—পাহাড়পুর-লিপি)। পাল ও সেন যুগে দানটা করিতেছেন রাজা স্বয়ং কোনও ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধে (ধর্ম্মপালের খালিমপুর-লিপি এবং দামোদরদেবের চট্টগ্রাম-পট্টোলি দ্রষ্টব্য); সেই ব্যক্তিবিশেষ ভূমির মূল্য রাজাকে দিতেছেন কি না, সে সংবাদ তাম্রপট্টে নাই। যাহাই হউক, বৈন্যগুপ্তের লিপিটি কিংবা সপ্তম শতকের লোকনাথের লিপিটি গুপ্ত আমলের হইলেও ধারাটা যেন পরবর্ত্তী পাল ও সেন আমলের, গুপ্ত আমলের অন্যান্য লিপি-নির্দিষ্ট ধারা যেন নয়। যাহাই হউক, গুপ্ত আমলের লিপিগুলিতে আবার ফিরিয়া যাওয়া যাক্। দামোদরপুরের ৫নং লিপি বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সাক্ষ্যব্যাপারে এই স্থানে প্রাপ্ত অন্যান্য লিপির অনুরূপ। ফরিদপুরের ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব প্রভৃতির তাম্রপট্টোলির সাক্ষ্য একটু অন্য প্রকার। ধর্মাদিত্যের ১নং শাসনে ভূমি-ক্রয়েচ্ছা জ্ঞাপন করা হইতেছে বিষয়মহত্তরদিগকে, অর্থাৎ বিষয়ের প্রধান প্রধান লোকদের এবং সাধারণ লোকদেরও (প্রকৃতয়ঃ), এবং এই লিপিতেই প্রথম প্রধান প্রধান লোকদের সঙ্গে সাধারণ লোকদেরও গ্রামীয়-ভূমির দান বিক্রয়ের খবর দেওয়া হইল। ধর্মাদিত্যের ২ নং লিপিতে নূতন খবর কিছু নাই; গোপচন্দ্রের লিপিতে বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধানব্যাপারিণঃ অর্থাৎ স্থানীয় প্রধান ব্যবসায়ীদের উল্লেখ আছে। সমাচারদেবের ঘুঘ্রাহাটি পট্টোলিতে নূতন খবর কিছু নাই। জয়নাগের বপ্যঘোষবাট-পট্টোলিতেও তাই। লোকনাথের ত্রিপুরা-লিপিতে রাজপুরুষদের ছাড়া, বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে 'সপ্রধান-ব্যবহারিজনপদান্' অর্থাৎ স্থানীয় প্রধান রাষ্ট্র-সহায়ক ও জানপদদের নাম করা হইতেছে। অষ্টম শতকের খড়্গবংশীয় দেবখড়্গের আস্রফপুর-পট্টোলিতে বিষয়পতিদের সঙ্গে সঙ্গে কুটুম্বগৃহস্থদিগকেও বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে।

এই বিশ্লেষণ হইতে আমরা যাহা পাইলাম, তাহা হইতে এক শ্রেণীর লোক আমরা পাইতেছি, যাহারা রাজপুরুষ, রাজপ্রতিনিধি। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোথাও তাহাদের রাজপুরুষ বা রাজপ্রতিনিধি বলা হইতেছে না, এবং সেই ভাবে বিশেষ কোনও একটি শ্রেণীভুক্তও করা হইতেছে না। আর এক ধরণের লোকের উল্লেখ পাইতেছি, যাঁহারা

বিশেষ প্রয়োজনে আহূত হইলে রাষ্ট্রব্যাপারে রাজপুরুষের সহায়তা করিয়া থাকেন; ইঁহাদিগকে কোথাও ব্যবহারিণঃ, কোথাও সংব্যবহারিণঃ, বিষয়ব্যবহারিণঃ, প্রধান-ব্যবহারিণঃ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইঁহাদের বৃত্তি কি ছিল, আমরা জানি না; তবে ইহাই অনুমেয় যে, নানা বৃত্তির প্রধান প্রধান লোকদেরই আহ্বান করা হইত; বিষয় বা অধিষ্ঠান-অধিকরণের সভ্য, নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক, ইঁহারাও সেই হিসাবে সংব্যবহারী, এবং কোন কোন পট্টোলিতে তাঁহারাও এই আখ্যায়ই উল্লিখিত হইয়াছেন। কুটুম্বিনঃ অর্থাৎ গৃহস্থ, মহত্তরঃ অর্থাৎ প্রধান প্রধান লোক, তাঁহারা বিষয়েরই হোন্ বা গ্রামেরই হোন্ বা জনপদেরই হোন্, অক্ষুদ্রপ্রকৃতয়ঃ বা শুধু প্রকৃতয়ঃ অর্থাৎ প্রধান প্রধান অধিবাসী অথবা সাধারণ অধিবাসী প্রভৃতি যাঁহাদের উল্লেখ পাইতেছি, তাঁহাদের কাহার কি বৃত্তি ছিল, বলিবার উপায় নাই, কিংবা ইঁহারা কে কোন্ শ্রেণীর লোক, তাহাও জানা যায় না। তবে রাজপুরুষ ও রাজপ্রতিনিধি ছাড়া এমন কতগুলি ব্যক্তির খবর পাওয়া গেল, যাঁহাদের বৃত্তি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই, যেমন নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ ও প্রথম কুলিক। ইঁহাদের কথা আগেই বলিয়াছি, এবং যে-ভাবে ইঁহাদের উল্লেখ পাইতেছি, তাহাতে ইঁহারা যে এক একটী বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রতিভূ, তাহা বুঝা যাইতেছে, এবং তাহা সমর্থিত হইতেছে গোপচন্দ্রের পট্টোলিতে প্রধান-ব্যাপারিণঃ বা প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের উল্লেখ দ্বারা। রাজপুরুষ ও এই বণিক্-ব্যবসায়ি-শিল্পিশ্রেণী ছাড়া আর একটি শ্রেণীর পরোক্ষ উল্লেখও আছে, সেটি ব্রাহ্মণদের। ইঁহাদের বৃত্তি কি ছিল, তাহাও সহজেই অনুমেয়; পূজা, ধর্মকর্ম ইত্যাদির জন্যই ত ইঁহারাই ভূমি দান গ্রহণ করিতেছেন; শিক্ষাদান ইত্যাদিও ইঁহাদের অন্যতম বৃত্তি ছিল। অবশ্য ইঁহাদের মধ্যে অনেকে রাজপুরুষের বৃত্তি কিংবা অন্যান্য বৃত্তিও গ্রহণ করিতেন, লিপিগুলিতে তাহার প্রমাণও আছে, কিন্তু তাহা ব্যতিক্রম মাত্র; সাধারণ ভাবে এই সব বৃত্তি তাঁহাদের ছিল না এবং সর্বদাই লিপিগুলিতে তাঁহারা পৃথক্ ভাবে বর্ণবদ্ধ শ্রেণীহিসাবেই উল্লিখিত হইয়াছেন।

এইবার অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই দুই পর্বের অর্থাৎ পঞ্চম হইতে অষ্টম, এবং অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের লিপিগুলির স্বরূপের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ধর্মপালের খালিমপুর-শাসনে দেখিতেছি, নরপতি ধর্মপাল দুইটি গ্রাম দান করিতেছেন। দানের প্রার্থনা জানাইতেছেন, মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্মা; দানের হেতু হইতেছে নারায়ণ বর্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নারায়ণবিগ্রহের এবং তাহার প্রতিপালক লাট বা গুজরাটদেশীয় ব্রাহ্মণদের এবং মন্দির-ভৃত্যদের ব্যবহার। যাহাই হউক, এই দান বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে—

"এষু চতুর্ষু গ্রামেষু সমুপগতান্ সর্বানেব রাজ-রাজনক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-সেনাপতি-বিষয়পতি-ভোগপতি-ষষ্ঠাধিকৃত-দণ্ডশক্তি-দণ্ডপাশিক-চৌরোদ্ধরণিক-দৌসাধসাধনিক-দূত-

খোল-সমাগমিকাভিত্বরমাণ-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষাজবিকাধ্যক্ষ-নাকাধ্যক্ষ-বলাধ্যক্ষ-তরিক - শৌল্কিক-গৌল্মিক-তদাযুক্তক-বিনিযুক্তকাদি রাজপাদোপজীবিনোঽন্যাংশ্চাকীৰ্ত্তিতান্ চাটভটজাতীয়ান্ যথাকালাধ্যাসিনো জ্যেষ্ঠকায়স্থ-মহামহত্তর দাশগ্রামিকাদি-বিষয়ব্যবহারিণঃ সকরণান প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণমাননাপূর্বকং যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ।

এই সূত্রটি এই খালিমপুর-লিপিতে প্রথম পাইলাম ; ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভূমিদানের যত পট্টোলি আছে, তাহার প্রায় সবটিতেই এই ধরণের একটি সূত্র উল্লিখিত আছে ; প্রভেদের মধ্যে দেখা যায়, কোথাও রাজপুরুষদের তালিকাটি সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তৃততর (যেমন, মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত পট্টোলিতে)। আমি এই বিস্তৃততর তালিকার উল্লেখ আর করিব না। কিন্তু একটু আধটু নূতন সংযোজনা কোথাও কোথাও আছে, সেগুলি আমাদের কাজে লাগিবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই যেখানে এই ধরণের নূতন সংযোজনা পাওয়া যাইবে, আমি তাহাদের উল্লেখ করিব।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, দেবপালের মুঙ্গের-লিপিতে রাজপাদোপজীবীদের (এ ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে স্বপাদপদ্মোপজীবিনঃ) তালিকায় চাটভাটজাতীয় সেবকদের সঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে—"গৌড়-মালব-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাটভাট-সেবকাদীন্ অন্যাংশ্চাকীর্তিতান্" এবং প্রতিবাসী ও ব্রাহ্মণোত্তরদের সঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে,—"মহত্তর-কুটুম্বি-পুরোগমেদান্ধ্রক(অন্যত্র অন্ধ্রক)চণ্ডালপর্যন্তান্"। নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতেও ঠিক এই ধরণের উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ পালরাজাদের সমস্ত লিপিই এইরূপ। শুধু "গৌড়-মালব-খস-হূণ"দের সঙ্গে কোথাও কোথাও চোড়দেরও (মদনপালের মনহলি-লিপি দ্রষ্টব্য) উল্লেখ আছে, চাটভটদের জায়গায় চট্টভট্ট অথবা চাটভাটদের উল্লেখ পাওয়া যায়, বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে "ক্ষেত্রকরান্"দের পরিবর্তে পাওয়া যায় "কর্ষকান্।" কিন্তু দশম শতকের কম্বোজরাজ নয়পালদেবের ইর্দা-পট্টোলিতে বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা একটু অন্যরূপ। এখানে উল্লেখ পাইতেছি, স্থানীয় "সকরণান্ ব্যবহারিণঃ"-দের, (কেরাণীকুল সহ অন্যান্য রাষ্ট্রসহায়কদের) কৃষক ও কুটুম্বদিগের এবং ব্রাহ্মণদের ; অন্যত্র যেমন, এখানেও তাহাই ; ব্রাহ্মণদের যে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে, ঠিক তাহা নয়, তাঁহাদের সম্মান জ্ঞাপনের পর (মাননাপূৰ্ব্বকং) অন্যদের বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে। আর রাজমহিষী, যুবরাজ, মন্ত্রী, পুরোহিত, ঋত্বিক্, প্রাদেষ্টৃবর্গ, সকল শাসনাধ্যক্ষ, করণ (বা কেরাণী), সেনাপতি, সৈনিকসংঘমুখ্য, দূতবর্গ, গূঢ়পুরুষবর্গ, মন্ত্রপালবর্গ এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদের বলা হইতেছে—এই দান মান্য করিবার জন্য।

সেনরাজাদের এবং সমসাময়িক অন্যান্য রাজবংশের লিপিগুলি সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছু নাই, বক্ষ্যমাণ বিষয়ে তাহাদের সাক্ষ্য পাললিপিগুলিরই অনুরূপ। তবে পাল ও সমসাময়িক অন্য রাজাদের লিপিতে যেখানে পাইতেছি প্রতিবাসীদের কথা, পরবর্তী লিপিগুলিতে ঠিক সেইখানেই আছে জনপদবাসী(জনপদান্ কিংবা জানপদান্)দের কথা। কিন্তু একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। পাল ও সমসাময়িক অনেকগুলি লিপিতে

দেখা যায়, বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষেত্রকর ইত্যাদির পরেই নিম্নস্তরের অন্যান্য যে অগণিত লোক, তাহাদিগকে সব একসঙ্গে গাঁথিয়া দিয়া বলা হইতেছে—"...অন্ধ্র চণ্ডালপর্যন্তান্" অথবা "আচণ্ডালান্" অর্থাৎ নিম্নতম স্তরের চণ্ডাল পর্যন্ত। পরবর্তী লিপিগুলিতে কিন্তু এই পদটি কোথাও নাই, বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা ক্ষেত্রকরদের পর্যন্ত আসিয়াই ঠেকিয়া গিয়াছে। ইহারাই এই লিপিগুলিতে নিম্নতম স্তর, ইহাদের পর আর কাহারও উল্লেখ নাই; চণ্ডাল পর্যন্ত নিম্নতম স্তরের অন্যান্য লোকেরা অনুল্লিখিত। পালযুগের পরে সেন আমলে রাষ্ট্রের ও সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি কি বদলাইয়া গিয়াছিল? এ প্রশ্ন যেন মনকে অধিকার করে।

এই বিশ্লেষণের ফলে আমরা কি পাইলাম, তাহা এইবার দেখা যাইতে পারে। রাজপুরুষদের লইয়াই আরম্ভ করা যাউক। পঞ্চম শতক হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, বিভিন্ন রাজপুরুষদের উল্লেখ আছে; রাজকর্ম্মচারীদের একটা শ্রেণী ত ছিলই। কিন্তু পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে শুধু বিচিত্র রাজপুরুষের উল্লেখই যে আছে, তাহা নয়, রাজা রাজপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক, নিম্নস্তরের যত রাজকর্মচারী আছে, তাহাদের উল্লেখই শুধু নয়, তাহাদের সকলকে একত্রে এক মালায় গাঁথিয়া বলা হইয়াছে "রাজপাদোপজীবিনঃ" এবং সুদীর্ঘ তালিকায়ও যখন সমস্ত রাজপুরুষের নাম শেষ হয় নাই, তখন তাহার পরই বলা হইয়াছে, "অধ্যক্ষপ্রচারোক্তানিহ কীর্তিতান্," অর্থাৎ আর যাহাদের কথা এখানে বলা হয় নাই, কিন্তু অধ্যক্ষ পরিচ্ছেদে যাহাদের নাম উল্লিখিত আছে। এই যে সমস্ত রাজপুরুষকে এক সঙ্গে গাঁথিয়া একটা সীমাবদ্ধ শ্রেণীতে উল্লেখ করা, তাহা পাল ও সেন আমলেই দেখিতেছি; অথচ আগেও রাজপুরুষ, রাজপাদোপজীবিশ্রেণী ছিল না, তাহা ত সত্য নয়। বোধ হয়, এইরূপ উল্লেখের কারণ আছে। পাল আমলেই সর্বপ্রথম বাঙ্‌লা দেশ নিজস্ব রাষ্ট্র লাভ করিল, নিজস্ব শাসনযন্ত্র লাভ করিল, নিজের সুনির্দিষ্ট রাজ্য-সীমা পাইল, এক কথায় রাষ্ট্রীয় স্বাজাত্য লাভ করিল, যে-জিনিসটা আরম্ভ হইয়াছিল শশাঙ্কের সময় হইতেই; বোধ হয়, এই কারণেই রাষ্ট্র ও রাজপাদোপজীবীদের শুধু সবিস্তার উল্লেখই নয়, শাসনযন্ত্রের যাহারা পরিচালক, তাহাদিগকে একত্র গাঁথিয়া স্বসীমায় সুনির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর নামকরণ করাটাও সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। যাহাই হউক, সোজাসুজি রাজপাদোপজীবী অর্থাৎ সরকারী চাকুরীয়াদের একটা শ্রেণীর খবর আমরা পাইলাম।

কিন্তু এই "রাজপাদোপজীবী" শ্রেণীর বাহিরে এক শ্রেণীর লোকের খবর আমরা পাইতেছি, যাঁহারা ঠিক পঞ্চমশতকপূর্ব লিপিগুলিতে রাজসরকারে চাকুরী করিতেন কি না, ঠিক বলা যায় না, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আহূত হইলে রাজপুরুষদের সহায়তা করিতেন, তাহা বুঝা যায়; তাঁহাদের উল্লেখ আগেই করিয়াছি। পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতেও ইঁহাদের উল্লেখ আছে, কিন্তু এখানে ইঁহারা উল্লিখিত হইতেছেন রাজা অথবা রাষ্ট্রসেবকরূপে; ইঁহারা হইতেছেন চাটভাটজাতীয় লোক, জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহামহত্তর, দাশগ্রামিক, করণ, বিষয়ব্যবহারিণঃ ইত্যাদি। কোন

কোনও লিপিতে মহত্তর, মহামহত্তর ইত্যাদি স্থানীয় ব্যক্তিদের এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু চাটভাট ইত্যাদি অন্যান্য নিম্নস্তরের রাজকর্মচারীরা সর্বদাই সেবকাদি অর্থাৎ (রাজ)সেবকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। অষ্টমশতক-পূর্ব লিপিগুলিতে জ্যেষ্ঠকায়স্থ বা প্রথম কায়স্থ (chief clerk)ত রাজপুরুষ বলিয়াই অনুমিত হন ; যে পাঁচ জন মিলিয়া স্থানীয় অধিকরণ গঠন করেন, তিনি তাঁহাদের একজন। রাজপুরুষ না হইলেও তিনিও যে একজন রাজসেবক, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এই (রাজ)সেবকদের মধ্যে গৌড়-মালব-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চোড় ইত্যাদি জাতীয় ব্যক্তিদের উল্লেখ পাইতেছি। ইঁহারা কাহারা ? এটুকু বুঝিতেছি, ইঁহারাও কোনও উপায়ে রাষ্ট্রের সেবা করিতেন। যে-ভাবে ইঁহাদের উল্লেখ পাইতেছি, আমার ত মনে হয়, এই সব ভিন্নপ্রদেশের লোকেরা বেতনভোগী সৈন্যরূপে (mercenery troops) রাষ্ট্রের সেবা করিতেন। পুরোহিতরূপে লাট বা গুজরাট-দেশীয় ব্রাহ্মণদের উল্লেখ ত খালিমপুর-লিপিতেই আছে। কিন্তু ঐ দেশীয় সৈন্যরাও এদেশে রাজসৈনিকরূপে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন সময়ে অন্য প্রদেশ হইতে যে-সব যুদ্ধাভিযান বাঙলা দেশে আসিয়াছে, যেমন কর্ণাটদের, তাহাদের কিছু কিছু সৈন্য এদেশে থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও যে তাহারা আসে নাই, তাহাও অবশ্য বলা যায় না। তবে যে ভাবেই হউক, এদেশে তাহারা যে-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা রাজসেবকের বৃত্তি। অবশ্য সমাজের সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল বলিয়া মনে হয় না।

যাহাই হউক, রাজপাদোপজীবিশ্রেণীরই আনুষঙ্গিক বা ছায়ারূপে পাইলাম রাজসেবকশ্রেণী। এই দুই শ্রেণীর সমস্ত লোকেরাই এক স্তরের ছিল না, পদমর্য্যাদা এবং বেতনমর্য্যাদাও এক ছিল না, তাহা ত সহজেই অনুমান করা যায়। উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন স্তরের বিত্ত ও মর্য্যাদার লোক এই উভয় শ্রেণীর মধ্যেই ছিল ; কিন্তু যে স্তরেই হউক, ইহাদের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রাষ্ট্রের সঙ্গেই যে একান্তভাবে জড়িত ছিল, তাহা স্বীকার করিতে কল্পনার আশ্রয় লইবার প্রয়োজন নাই।

মহত্তর, কুটুম্ব, মহামহত্তর, প্রতিবাসী, জনপদবাসী ইত্যাদিরা কোন্ শ্রেণীর লোক ছিলেন, ইঁহাদের কাহার কি বৃত্তি ছিল, বলা কঠিন। তবে শাসনাবলীতে উল্লিখিত রাজ-পাদোপজীবী, ক্ষেত্রকর, ব্রাহ্মণ, এবং নিম্নতম স্তরের চণ্ডাল পর্যন্ত লোকদের বাদ দিলে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ভূমি-সম্পদে বা ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্পদে বা ব্যক্তিগত গুণে ও চরিত্রে সমাজে মান্য ও সম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারাই মহত্তর, মহামহত্তর ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন। মহত্তর, মহামহত্তর, কুটুম্ব, প্রতিবাসী, জনপদবাসী—ইঁহারা সাধারণ ভাবে গ্রামবাসী গৃহস্থ, কৃষি ও শিল্প যাঁহাদের বৃত্তি। কৃষি ইঁহাদের বৃত্তি বলিলাম বটে, কিন্তু ইঁহারা নিজেরা নিজেদের হাতে চাষের কাজ করিতেন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না, যদিও কৃষ্ট ও কর্ষণযোগ্য ভূমির মালিক ইঁহারা ছিলেন। চাষের কাজ নিজে যাঁহারা করিতেন, তাঁহারা ক্ষেত্রকর, কর্ষক, কৃষক ইত্যাদি বলিয়াই পৃথক্ ভাবে

উল্লিখিত হইয়াছেন। অষ্টম শতকের দেবখড়্গের আস্রফপুর লিপির একটি স্থানে দেখিতেছি, ভূমি ভোগ করিতেছেন একজন, কিন্তু চাষ করিতেছে অন্য লোকেরা—শ্রীশর্বান্তরেণ ভুজ্যমানকঃ মহত্তরশিখরাদিভিঃ কৃষ্যমাণকঃ (এখানে মহত্তর একজন ব্যক্তির নাম)। এই ব্যবস্থা শুধু এখন নয়, প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল; বস্তুত যিনি ভূমির মালিক, তাঁহার পক্ষে নিজের হাতেই সমস্ত ভূমি রাখা এবং নিজেরাই চাষ করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। জমি নানা সর্তে বিলিবন্দোবস্ত করিতেই হইত, তাহার ইঙ্গিত পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে ইতিপূর্বেই করিয়াছি। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত লিপিতে দেখিতেছি, হলায়ুধ শর্মা নামক জনৈক আবল্লিক মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ একা নিজের ভোগের জন্য নিজের গ্রামের আশে পাশে তিন চারিটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ৩৩৬২ উন্মান ভূমি, রাজার নিকট হইতে দানস্বরূপ পাইয়াছিলেন; এই ভূমির বার্ষিক আয় ছিল ৫০০ কপর্দক পুরাণ। এই ৩৩৬২ উন্মানের মধ্যে অধিকাংশ ছিল নাল ভূমি অর্থাৎ চাষের ক্ষেত্র। ইহা ত সহজেই অনুমেয় যে, এই সমগ্র ভূমি হলায়ুধ শর্মার সমগ্র পরিবার পরিজনবর্গ লইয়াও নিজেদের চাষ করা সম্ভব ছিল না, এবং হলায়ুধ শর্মা ক্ষেত্রকর বলিয়া উল্লিখিতও হইতে পারেন না। তাঁহাকে জমি নিম্ন প্রজাদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করিয়া দিতেই হইত। এই নিম্নপ্রজাদের মধ্যে যাঁহারা নিজেরা চাষবাস করেন, তাঁহারাই ক্ষেত্রকর। এইখানে এই ধরণের একটা অনুমান যদি করা যায় যে, সমাজের মধ্যে ভূমি-সম্পদে ও শিল্পবাণিজ্যাদি সম্পদে সমৃদ্ধ নানা স্তরের একটা শ্রেণীও ছিল এবং এই শ্রেণীরই প্রতিনিধি হইতেছেন মহত্তর, মহামহত্তর, কুটুম্ব ইত্যাদি ব্যক্তিরা, তাহা হইলে ঐতিহাসিক তথ্যের বিরোধী কিছু বলা হয় না। বরং যে প্রমাণ আমাদের আছে, তাহার মধ্যে তাহার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন, এ কথা স্বীকার করিতে হয়।

ব্রাহ্মণ শ্রেণীর উল্লেখ ত পরিষ্কার। দান ধ্যান, ক্রিয়াকর্ম যাহা কিছু করা হইতেছে, ইঁহাদের সম্মাননা করার পর। ভূমি দান ইঁহারাই লাভ করিতেছেন, ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজপাদোপজীবি-শ্রেণীতে উল্লিখিত হইয়াছেন; মন্ত্রী, এমন কি, সেনাপতি, সামন্ত, মহাসামন্ত ইত্যাদিও হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়মে ইঁহারা পুরোহিত, ঋত্বিক্, নীতিপাঠক, শান্ত্যাগারিক, শান্তিবারিক, ধর্ম্মজ্ঞ, স্মৃতি ও ব্যবহারশাস্ত্রাদির লেখক, প্রশস্তিকার, কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদির রচয়িতা। ইঁহাদের উল্লেখ পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে সমসাময়িক সাহিত্যে বারংবার পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মণ-শাসিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম ছাড়া পাল আমলের শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাধান্যও কম ছিল না। ব্রাহ্মণেরা যেমন শ্রেণী-হিসাবে সমাজের ধর্ম, শিক্ষা, নীতি ও ব্যবহারের ধারক ও নিয়ামক ছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মসংঘগুলিও ঠিক সমাজের কতকাংশের ধর্ম, শিক্ষা ও নীতির ধারক ও নিয়ামক ছিল, এবং তাহাদেরও পোষণের জন্য রাজা ও অন্যান্য সমর্থ ব্যক্তিরা ভূমি ইত্যাদি দান করিতেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এই বৌদ্ধ স্থবির ও সংঘ, সভ্যদের এবং ব্রাহ্মণদের লইয়া প্রাচীন বাঙ্লার intellectual class বা বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্মজীবী শ্রেণী।

ক্ষেত্রকর শ্রেণীর কথা ত প্রসঙ্গক্রমে আগেই বলা হইয়াছে। অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিতেই ক্ষেত্রকরদের বা কৃষকদের অথবা কর্ষকদের উল্লেখ আছে। অথচ আশ্চর্য এই, অষ্টম শতকের আগে প্রায় কোনও লিপিতেই ইহাদের উল্লেখ নাই; অথচ উভয় যুগের লিপিগুলি, একাধিক বার বলিয়াছি, ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ও দানের পট্টোলী। এ তর্ক করা চলিবে না যে, ক্ষেত্রকর বা কৃষক পূর্ববর্তী যুগে ছিল না, পরবর্তী যুগে হঠাৎ দেখা দিল। খিল অথবা ক্ষেত্র ভূমি দান ক্রয় বিক্রয় যখন হইতেছে, চাষের জন্যই হইতেছে, এ সম্বন্ধে তর্কের সুযোগ কোথায়? আর ভূমি দান বিক্রয় যদি মহত্তর, কুটুম্ব, শিল্পী ব্যবসায়ী, রাজপুরুষ, সাধারণ ও অসাধারণ (প্রকৃতয়ঃ এবং অক্ষুদ্রপ্রকৃতয়ঃ) লোক, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সকলকে বিজ্ঞাপিত করা যায়, তাহা হইলে ভূমি ব্যাপারে যাহার স্বার্থ সকলের বেশী, তাহার উল্লেখ নাই কেন? আর অষ্টম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী লিপিগুলিতে তাহাদের উল্লেখ আছে কেন? তর্ক তুলিতে পারা যায়, পূর্ববর্তী যুগের লিপিগুলিতে কৃষকদের অনুল্লেখের কথা যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য নয়; কারণ, তাঁহারা হয় ত ঐ গ্রামবাসী কুটুম্ব-গৃহস্থ-প্রকৃতয়ঃ অর্থাৎ সাধারণ লোক, ইঁহাদের মধ্যেই তাঁহাদের উল্লেখ আছে। ইহার উত্তর হইতেছে, যদি ইহাই হয় তর্ক, তাহা হইলে এই সব কুটুম্ব, প্রতিবাসী, জনপদবাসী জনসাধারণের কথা ত অষ্টমশতক-পরবর্তী লিপিগুলিতেও আছে, তৎসত্ত্বেও পৃথক্‌ভাবে ক্ষেত্রকরদের, কৃষকদের উল্লেখ আছে কেন? আমার কিন্তু মনে হয়, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে কৃষকদের অনুল্লেখ এবং পরবর্তী লিপিগুলিতে প্রায় আবশ্যিক উল্লেখ একেবারে আকস্মিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহার একটা কারণ আছে এবং এই কারণের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্‌লার সমাজ-বিন্যাসের ইতিহাসের একটু ইঙ্গিত আছে। একটু বিস্তারিত ভাবে সেটি বলা প্রয়োজন।

ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পূর্বতন একটি অধ্যায়ে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক্—অন্যতম একটি কারণ পরে বলিতেছি—সমাজে ভূমির চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, সমাজের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ভূমি কেন্দ্রীকৃত হইবার দিকে একটা ঝোঁক (tendenoy) একটু একটু করিয়া বাড়িতেছিল। সামাজিক ধনোৎপাদনের ভারকেন্দ্রটী ক্রমশঃ যেন ভূমির উপরই আসিয়া পড়িয়াছিল, পাল ও বিশেষ করিয়া সেন আমলের লিপিগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িলে এই কথাই মনের মধ্যে জুড়িয়া বসিতে চায়। কোন্ ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য কি, কোন্ ভূমির দাম কত, বার্ষিক আয় কত ইত্যাদি সংবাদ খুঁটিনাটি সহ সবিস্তারে যে ভাবে দেওয়া হইতেছে, তাহাতে সমাজের কৃষি-নির্ভরতার ছবিটাই যেন বুদ্ধি ও দৃষ্টি অধিকার করিয়া বসে। তাহা ছাড়া জনসংখ্যা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ভূমির আবাদ, জঙ্গল কাটিয়া গ্রাম বসাইবার ও চাষ করিবার জমি বাহির করিবার চেষ্টাও চোখে পড়ে। বস্তুত তেমন প্রমাণও দু'একটি আছে; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সপ্তম শতকের লোকনাথের ত্রিপুরা-পট্টোলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই

ক্রমবর্ধমান কৃষি-নির্ভরতার প্রতিচ্ছবি সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, এবং পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে তাহাই হইয়াছে। সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে বর্ণিত ও উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কৃষকশ্রেণীর ব্যক্তির উল্লেখ কৃষক বা ক্ষেত্রকর হিসাবে যে নাই, তাহার কারণ হইতেছে, সমাজ তখন একান্তভাবে কৃষি-নির্ভর হইয়া উঠে নাই, এবং কৃষক ও ক্ষেত্রকর, কৃষিকর্ম ইত্যাদি সমাজের মধ্যে থাকিলেও কৃষক বা ক্ষেত্রকরেরা তখনও একটা বিশেষ অথবা উল্লেখযোগ্য শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠে নাই। আমার এই যে অনুমান, তাহার সবিশেষ সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট প্রমাণ ঐতিহাসিক উপাদানের বর্তমান অবস্থায় দেওয়া সম্ভব নয়, অনুমানের অধিক মূল্যও আমি দাবী করি না ; কিন্তু আমি যে যুক্তির মধ্যে এই অনুমান প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলাম, তাহা ঐতিহাসিক যুক্তি-নিয়মের বহির্ভূত, পণ্ডিতেরা আশা করি তাহা বলিবেন না।

যাহাই হউক, এই পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাসের যে তথ্য আমরা পাইলাম, তাহাতে দেখিতেছি, রাজপাদোপজীবীরা একটি সুসংবদ্ধ সুস্পষ্ট সীমারেখায় নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী এবং তাঁহাদেরই আনুষঙ্গিক ছায়ারূপে আছেন (রাজ)সেবকশ্রেণী। ইহারা রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক। বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্মজীবীরা আর একটি শ্রেণী ; ইঁহারা সাধারণ ভাবে জ্ঞানধর্ম সংস্কৃতির ধারক ও নিয়ামক। তৃতীয় একটি শ্রেণী হইতেছে ভদ্র, মহত্তর, মহামহত্তর, কুটুম্ব, প্রধান প্রধান গৃহস্থ অর্থাৎ যাঁহাদের বলা হইয়াছে "অক্ষুদ্রপ্রকৃতয়ঃ"। ইঁহাদের মধ্যে খুব সম্ভব ভূমিসম্পদের অধিকারীরা আছেন, শিল্পীরাও আছেন। চতুর্থ একটি শ্রেণী হইতেছে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদের লইয়া ; দেশের ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় ইঁহাদের হাতে। পাল ও সেন-লিপিগুলিতে পঞ্চম একটি শ্রেণীর উল্লেখ আছে। এই শ্রেণী নিম্নস্তরের মনো-বৃত্তিধারী লোকদের লইয়া গঠিত। লিপিগুলিতে বিশদ ভাবে ইঁহাদের কথা বলা হয় নাই, অথচ সকলকে লইয়া নিম্নতম বৃত্তি ও স্তরের নাম পর্যন্ত করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে "চণ্ডালপর্যন্তান্"—একেবারে চণ্ডাল পর্যন্ত। ইঁহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বৃত্তিধারী কোন্ কোন্ স্তরের লোকদের ধরা হইয়াছে, অনুমান হয় ত করা যাইতে পারে, কিন্তু সঠিক বলা কঠিন। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশবের লিপিতে যে রজক সিরুপা ও নাপিত গোবিন্দের কথা আছে, তাঁহারা বোধ হয় এই পর্যায়ভুক্ত। "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়" গ্রন্থের বহু পদে যে ডোম্ ও ডোম্নীদের কথা আছে, তাঁহারাও বোধ হয় এই শ্রেণীর ; কারণ, একটি পদে বলা হইতেছে, ডোম্নীর যে কুটীর বা কুঁড়িয়া, তাহা নগরের বাহিরে ; ঠিক এখনও গ্রামে ও নগরের বাহিরেই যাহা থাকে। তন্তুবায় বা তাঁতীরাও বোধ হয় এই শ্রেণীর ; চর্যাপদের একটি গানের ইঙ্গিত হইতেছে যে, বাঁশের চাংগাড়ী ও বাঁশের তাঁত তৈরী করা ডোম্দের কাজ, এবং পদরচয়িতা সিদ্ধ তন্ত্রীপাদের সিদ্ধিপূর্বজীবনে তিনি তাঁত-গুরু ছিলেন বলিয়াই অনুমান হয়।

কিন্তু অষ্টমশতকপরবর্তী কালের এই যে বিভিন্ন শ্রেণীর সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট ইঙ্গিত

আমরা পাইলাম, ইহার মধ্যে বণিক্-ব্যবসায়ী শ্রেণীর উল্লেখ কোথায় ? এই সময়ের ভূমি-দান বিক্রয়ের একটি পট্টোলীতেও ভুল করিয়াও বণিক্ ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর কোনও ব্যক্তির উল্লেখ নাই। ইহা আশ্চর্য্য নয় কি ? অষ্টমশতকপূর্ববর্তী লিপিগুলিও ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিল ; সেখানে ত দেখিতেছি, স্থানীয় অধিকরণ উপলক্ষেই যে শুধু নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ ও প্রথম কুলিকের নাম করা হইতেছে, তাহাই নয়, কোন কোনও লিপিতে প্রধানব্যাপারিণঃ বা প্রধান ব্যবসায়ীদেরও উল্লেখ করা হইতেছে, অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিদের সঙ্গে বণিক্ ও ব্যবসায়ীদেরও বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে। রাষ্ট্র-ব্যাপারেও তাহাদের কতকটা আধিপত্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু অষ্টম শতকের পর এমন কি হইল, যাহার ফলে পরবর্তী লিপিগুলিতে এই শ্রেণীটির কোন উল্লেখই রহিল না ? ভূমি দানের ব্যাপারে বণিক্ ও ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপিত করিবার কোনও প্রয়োজন হয় নাই, এই তর্ক উঠিতে পারে। এ যুক্তি হয় ত কতকটা সত্য, কিন্তু প্রয়োজন কি একেবারেই নাই ? যে গ্রামে ভূমিদান করা হইতেছে, সে গ্রামের সকল শ্রেণী ও সকল স্তরের লোক, এমন কি, চণ্ডাল পর্যন্ত সকলের উল্লেখ করা হইতেছে, অথচ শ্রেণী হিসাবে বণিক্ ও ব্যবসায়ীদের কোনও উল্লেখই হইতেছে না। এতগুলি গ্রাম ও তৎসংপৃক্ত ভূমিদানের উল্লেখ আমরা পাইতেছি, অথচ তাহার মধ্যে একটি গ্রামেও বণিক্ ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক কি ছিল না ? আর যেখানে রাজসেবকদের উল্লেখ করা হইতেছে, সেখানেও ত নগরশ্রেষ্ঠী বা সার্থবাহ ইত্যাদির কাহারও উল্লেখ পাইতেছি না। অথচ সপ্তম শতক পর্যন্ত তাঁহারাই ত স্থানীয় অধিকরণে প্রথম সহায়ক, তাঁহারা এবং ব্যাপারীরাই স্থানীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সংব্যবহারী। অথচ ইঁহাদেরও কোন উল্লেখ নাই। এখানেও আমার মনে হয়, এই অনুল্লেখ আকস্মিক নয়। অষ্টম শতকের পরে বণিক্ ও ব্যবসায়ী ছিল না, এ অনুমান মূর্খতা মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, বণিক্ লোকদত্তের কথা। ৯৭৬ (?) খৃষ্টাব্দে বিলকীন্দক গ্রামবাসী বিষ্ণুভক্ত এই বণিক্ লোকদত্ত একটি নারায়ণমূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া খালিমপুর-লিপির "প্রত্যাপণে মানপৈঃ" দোকানে দোকানে মানপদের দ্বারা ধর্মপালের যশ কীর্তিত হইত, এই উল্লেখের মধ্যেও হয় ত ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও ব্যাপারীদের অস্তিত্বের ইঙ্গিত আছে। বণিক্ ও ব্যবসায়ী তাহা হইলে নিশ্চয়ই ছিলেন, কিন্তু অষ্টম শতকের পূর্বে শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের সে প্রাধান্য ছিল এবং যে কারণে তাঁহারা রাষ্ট্রে কতকটা আধিপত্য করিতে পারিয়াছিলেন, সেই প্রাধান্য ও আধিপত্য সপ্তম শতকের পর হইতেই কমিয়া গিয়াছিল। আমি পূর্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ঠিক এই সময় হইতেই প্রাচীন বাঙলার সমাজ কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে এবং ক্ষেত্রকররা বিশেষ একটা শ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠে এবং সেই ভাবেই সমাজে স্বীকৃত হয়। অষ্টম শতকের আগে তাহারা সুনির্দিষ্ট শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া ওঠে নাই। বণিক্ ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর পক্ষে হইল ঠিক তাহার বিপরীত। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত দেখি, বিশেষ ভাবে সুনির্দিষ্ট শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের উল্লেখ না থাকিলেও রাষ্ট্রে ও সমাজে তাঁহাদেরই আধিপত্য অন্যান্য

শ্রেণীর লোকদের অপেক্ষা বেশী। ইহার একমাত্র কারণ, তদানীন্তন বাঙালী সমাজ অধিকতর ব্যবসা-বাণিজ্য-নির্ভর। এই যুগে কৃষি ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় বটে, কিন্তু প্রধান উপায় ব্যবসা-বাণিজ্য। অষ্টম শতকের পর হইতে সমাজ অধিকতর কৃষি-নির্ভর, কতকটা শিল্প-নির্ভরও বোধ হয়; কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য আর ধনোৎপাদনের প্রধান ও প্রথম উপায় নয়; অন্যতম উপায় মাত্র। এবং এই কারণেই সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসে বণিক্ ও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য নাই; ব্যক্তি হিসাবে থাকিলেও শ্রেণী হিসাবে পৃথক্ মর্যাদা নাই। আমার এই মন্তব্যও অনুমান, তবু আমার যুক্তিটি যদি ঐতিহাসিক মর্যাদার বিরোধী না হয় এবং ভূমি-ব্যবস্থা অধ্যায়ে আমি যাহা বলিয়াছি, প্রাচীন বাঙলার ধনসম্বলের সামাজিক ইঙ্গিত ও মুদ্রার ইঙ্গিত আমি যে-ভাবে নির্দেশ করিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয় এবং সমাজবিজ্ঞানের ধারা যদি ইতিহাস রচনায় প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে আমার এই অনুমানও হয় ত ঐতিহাসিক সত্যের দাবী রাখে, সবিনয়ে আমি এই নিবেদন করি।

এইবার প্রমাণ ও অনুমানের সাহায্যে আমরা যাহা পাইলাম, তাহার সার মর্ম এই ভাবে আমরা প্রকাশ করিতে পারি। প্রাচীন বাঙলার শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে পঞ্চম শতকের আগে উপাদানের অভাবে কিছু বলা যায় না। পঞ্চম শতকের গোড়া হইতে আনুমানিক সপ্তম শতকের শেষ পর্যন্ত বাঙালী সমাজ প্রধানতঃ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য-নির্ভর। রাজ-পুরুষ, সংব্যবহারী ও রাজসেবকদের দেখা আমরা পাই; কিন্তু স্বসীমাবদ্ধ স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দেশে তখনও গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া রাজকর্মচারী বা রাজসেবকদের সুনির্দিষ্ট শ্রেণী তখনও গড়িয়া উঠে নাই; তাহার সূচনা মাত্র দেখা যাইতেছে। বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও সংস্কৃতির ধারক ও নিয়ামক বুদ্ধি-বিদ্যা-জ্ঞান-ধর্ম-জীবী শ্রেণীর পরিচয় এই যুগে সুস্পষ্ট। বণিক্ ও ব্যবসায়ীরা শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া না উঠিলেও সমাজে ও রাষ্ট্রে তাহা-দের প্রাধান্য পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। কৃষক, ক্ষেত্রকর, কৃষিকর্ম সমাজে রহিয়াছে, কৃষি-কর্মের বলে ধনোৎপাদনও হইতেছে, কিন্তু কৃষকেরা শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠে নাই এবং সেই ভাবে স্বীকৃতও হয় নাই; কারণ আগেই বলিয়াছি, সমাজ প্রধানতঃ বাণিজ্য-নির্ভর। নিম্নতর শ্রেণীর ও স্তরের লোকেরা ত নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু তাহারা সমাজের প্রধান শ্রেণী-গুলির দৃষ্টির বাহিরে; শ্রেণী হিসাবে তাহাদের কোনও মূল্য নাই, উল্লেখও নাই।

অষ্টম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাঙালী সমাজ প্রধানতঃ কৃষি-নির্ভর। স্বতন্ত্র স্বাধীন স্বসীমাবদ্ধ রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার ফলে রাজপাদোপজীবী বলিয়া একটা বিশেষ শ্রেণী সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর আনুষঙ্গিকরূপে রাষ্ট্রসেবকশ্রেণীর আভাসও সুস্পষ্ট। ভূমি-সম্পদে ও শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ সমাজের মধ্যে প্রাধান্যসম্পন্ন একটি শ্রেণীর রেখাও ক্রমশঃ যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-ধর্ম-জীবী শ্রেণীও সুস্পষ্ট। সমাজ প্রধানতঃ কৃষি-নির্ভর বলিয়া ক্ষেত্রকর ও কৃষক শ্রেণীও সুস্পষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা ধরিয়া চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বণিক্ ও ব্যবসায়ীরাও সমাজে আছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যও চলিতেছে; কিন্তু সমাজে বা রাষ্ট্রে তাঁহাদের প্রাধান্য আর নাই। কৃষি-নির্ভর সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য ধনোৎপাদনের অন্যতম উপায় মাত্র, প্রধান উপায় নহে, সেই জন্য শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের অস্তিত্বের খবরও নাই। পাল আমলে চণ্ডাল পর্যন্ত সমাজের নিম্নতম স্তর সমাজ-দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়াছে, তাহারাও একটি শ্রেণী; যদিও তাহা-দের সীমারেখা অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন। কিন্তু সেন আমলে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্ত্তনের ফলেই হউক্ বা অন্য যে-কোন কারণেই হউক্, তাহারা আবার সমাজ-দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

কাশ্মীরী জাতি কি আদিতঃ ইহুদি ?

শ্রীবিমলাচরণ দেব, এম্ এ, বি এল

হিন্দু সমাজ যে সময়ে প্রাণবান্ ছিল, সে সময়ে তাহার উদার উৎসঙ্গে কত বিদেশী ব্যক্তি ও জাতি স্থান পাইয়াছে ও কালক্রমে তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত জাতি হিন্দু সমাজের সহিত এরূপ সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইয়া গিয়াছে যে, "তাহারা আদিতঃ বিদেশী" বলিলে অনেকে আশ্চর্য্য হইবার সম্ভাবনা। আজ ঐরূপ একটী জাতির সম্বন্ধে আমি নিবেদন করিতেছি। আমার বোধ হয়, কাশ্মীরীরা আদিতঃ ইহুদি জাতির শাখা। আমার এইরূপ ভাবিবার কারণ নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

অনেক দিন পূর্ব্বে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের একটী ভদ্রলোকের নিকট শুনি যে, যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মরেন নাই। বিসংজ্ঞমাত্র হইয়াছিলেন। তৎপরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ছদ্মবেশে প্যালেষ্টাইন হইতে পলাইয়া কাশ্মীরে আশ্রয় লন এবং তথায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার কবর এখনও কাশ্মীরে বর্ত্তমান ও ঈশা নবীর কবর বলিয়া পরিচিত।

খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার পর তৃতীয় দিবসে খ্রীষ্ট উত্থান করেন (ম্যাথিউ ২৮; মার্ক ১৬; লিউক ২৪; জন ২০)। শেষোক্ত সাধু (জন) খ্রীষ্টের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত পুস্তকে একটি বিষয় বেশী আছে ; যথা— যখন মেরী ম্যাগডালীন গুহামধ্যে রক্ষিত খ্রীষ্টদেহ দেখিবার জন্য আসিয়া দেখেন যে, গুহা-মধ্যে দেহ নাই, মাত্র তাঁহার বস্ত্রাদি আছে, তখন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন এবং নিকটে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি যখন তাঁহাকে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মেরী তাঁহাকে ঐ বাগানের মালী মনে করিয়া খ্রীষ্টের দেহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তখন সেই ব্যক্তি তাঁহাকে "মেরী" বলিয়া সম্বোধন করায় মেরীর চমক ভাঙ্গিল। তখন তিনি দেখিলেন, খ্রীষ্ট স্বয়ং দাঁড়াইয়া। ইহাতে বেশ মনে হয় যে, খ্রীষ্ট সংজ্ঞা লাভ করিবার পর মালীর ছদ্মবেশে প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করেন। আরও সে সময়ে তিনি যে শরীরে পলায়ন করেন, তাহা যে প্রেতশরীর নহে, তাহা অন্ততঃ লিউক ২৪, ৩৬-৪৩ ও জন ২০, ২৪-২৯ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। আমার বোধ হয়, তাঁহার সশরীরে স্বর্গারোহণের কাহিনী প্যালেষ্টাইন হইতে অন্তর্ধানের পর সৃষ্ট ভক্তজনসুলভ অতিপ্রাকৃত কাহিনী মাত্র।

এক্ষণে তিনি প্যালেষ্টাইন ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন। উক্ত কিম্বদন্তী অনুসারে তিনি কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও তথায় তাঁহার জীবনের শেষ অংশ যাপন করেন। ইহাতে আমার মনে হয়, কাশ্মীরিগণ তাঁহার স্বজাতি ছিল। লোকে বিপদে পড়িলে সাধারণত

আপন জনের নিকটই যায়। প্যালেষ্টাইনের ইহুদিরাও তাঁহার স্বজাতি ছিল বটে, কিন্তু তাহারা বিজাতীয় রোমান সরকারের সাহায্য লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দ্রোহাচরণ করিতেছিল। এ অবস্থায় তাঁহার বিরুদ্ধে দ্রোহবুদ্ধি ও বিজাতীয় প্রভাব হইতে বিমুক্ত স্বজাতির মধ্যে আশ্রয় লওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

ইহা ছাড়া আরও কয়েকটী কথা আছে, যাহা উক্ত অনুমানের পোষকতা করে—

১। কাশ্মীরীদের শরীরের বর্ণ ও নাসিকার আকার

২। তাহাদিগের দাড়ি রাখার প্রথা

৩। ইহুদিদিগের gaberdine-এর মত পোষাক

৪। অগ্নিপক্ক খাদ্যদ্রব্যাদি মুসলমানের দ্বারা আনীত হইলেও তাহা কাশ্মীরী হিন্দুদের ব্যবহারে কোনও বাধা নাই।

৫। যে অঞ্চলে কাশ্মীর অবস্থিত, সে অঞ্চলে প্রচলিত লিপি ছিল খরোষ্ঠী। উদাহরণস্বরূপ অশোকের শিলালিপি সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ, কেবল মাত্র সাহবাজগড়ি ও মানসেহরা, এই দুই স্থানে খরোষ্ঠী লিপিতে। এই দুই স্থান কাশ্মীরের সংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থিত। তাহা ছাড়া কাশ্মীর-সংলগ্ন তক্ষশিলাতেও খরোষ্ঠী লিপিতে লেখন পাওয়া গিয়াছে।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী, উভয় লিপিই আংশিক ভাবে Hebrew or Aramaic হইতে উদ্ভূত। ব্রাহ্মী লিপির সহিত প্রাচীন Aramaicএর সংযোগ বহু প্রাচীন কালে ছিল। পরে তাহার প্রভাব হইতে ব্রাহ্মী লিপি মুক্ত হইয়া স্বাধীন লিপিতে পরিণত হইয়াছিল। Aramaic দক্ষিণ হইতে বামে লিখিতে হয়, কিন্তু ব্রাহ্মী লিখিত হয় বাম হইতে দক্ষিণে। ইহাতে মনে হয়, কোনও কালে ব্রাহ্মী আংশিক ভাবে Aramaic হইতে উদ্ভূত হইলেও ঐতিহাসিক সময়ে আমরা উহাকে Aramaic প্রভাব-বিমুক্ত স্বাধীন লিপিরূপে পাই।

কিন্তু খরোষ্ঠী সম্বন্ধে অবস্থা অন্যরূপ। Aramaicএর সহিত ইহার সংযোগ খুব প্রাচীন নহে, তাহা ছাড়া ইহা দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হওয়ায় Aramaic প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই বলিয়া মনে হয়।

ইহা হইতে মনে হয় যে, ঐ স্থানে ইহুদি-সভ্যতার প্রভাব বেশ ছিল।

৬। আলবেরুণী এ দেশে আসিয়া ইং ১০৩০ সালে গজনী ফিরিয়া যান। তাঁহার পুস্তকে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি কাশ্মীরে ঢুকিতে পারেন নাই। আরও লিখিয়াছেন—"In former times they used to allow one or two foreigners to enter their country, *particularly Jews.*"

আর একটি কথা। কথাটি অপ্রিয়। এ দেশে ইহুদি-বিরোধী বাদ (anti-semitism) নামে কোন বাদ, ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাবে ছিল বা আছে কি না, জানি না। কিন্তু পঞ্জাবে দুইটী "কহাবত" শুনিয়াছি, যাহা হইতে মনে হয় যে, ঐরূপ বাদ একটা ছিল, হয় ত এখনও

আছে। কারণ, ফ্রান্স ও বর্ত্তমান জার্ম্মানীতে **anti-semitism**এর যে ভিত্তি, অর্থাৎ ইহুদি জাতির নৈতিক অখ্যাতি (সত্য বা মিথ্যা), তাহা এই দুইটী কহাবতেরও ভিত্তি। কহাবত দুইটী এই—(১) "আব্বল আফগান, দোয়েম কম্বো, সোয়েম বদ্‌জাত কাশ্মীরী" অর্থাৎ বজ্জাত হইতেছে প্রথম নম্বর আফগান, দ্বিতীয় নম্বর কম্বো (পাঞ্জাবের একটি চাষী জাতি) ও তৃতীয় নম্বর কাশ্মীরী। (২) "কাশ্মীরী বে-পীরী"—অর্থাৎ কাশ্মীরীরা তাহাদের গুরুকে পর্য্যন্ত ঠকাইতে কুণ্ঠিত হয় না।

উপরে যাহা লিখিলাম, তাহার কোন একটি বিষয় যে আমার প্রতিপাদ্য চূড়ান্ত প্রমাণ করিবে, তাহা বলি না। কিন্তু সবগুলি এক সঙ্গে লইলে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় একেবারে অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইবে না বোধ হয়।

আসিরীয়ার রাজা দ্বিতীয় সার্গন, খৃঃ পূঃ ৭২১ সালে সামারিয়া জয়ের পর, ইহুদিদের দশটী দলকে নির্ব্বাসিত করেন। তাহাদের পরে কোন খোঁজ না পাওয়া যাওয়ায় তাহাদিগকে **Last Tribes of Israel** বলে। কাশ্মীরীরা তাহাদের কোন অংশ নয় ত ?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ট্চত্বারিংশ ক

বর্ত্তমান ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সপ্তচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত ষট্চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষশেষে ইঁহারা বান্ধব আছেন,—

১। মহারাজ স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীবিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর, এবং ৩। কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৮	...	৭
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৪	...	১৪
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	...	৯
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৯১৫	...	৮২৬
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১২	...	১৪
		৯৫৮		৮৭০

(ক) আলোচ্য বর্ষে নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচন হয় নাই। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৭ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন,—

১। স্যর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪। স্যর জর্জ এ. গ্রীয়ার্সন, ৫। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৬। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এবং ৭। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) আলোচ্য বর্ষে আজীবন-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বর্ষশেষে যাঁহারা আজীবন-সদস্য আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্‌টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্‌টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্‌টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(গ) আলোচ্য বর্ষে ৯ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন এবং বর্ষশেষে তাঁহাদের স্থিতিকাল পূর্ণ হয়। বর্ষমধ্যে অধ্যাপক-সদস্য-সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্ত্তনের ফলে ইঁহারা অধ্যাপক-সদস্য-পদে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে তিন বৎসরের জন্য পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৫। শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৯১৫ ছিল। বর্ষমধ্যে ১১ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, একজন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং বহুদিন হইতে চাঁদা অনাদায় হেতু ও পদত্যাগ করায় মোট ১৮০ জনের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১০৩ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮২৬ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে ২ জন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বর্ষমধ্যে সহায়ক-সদস্য সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ইঁহাদের অধিকাংশের পদ বর্ষশেষে শূন্য বিবেচিত হইয়াছে এবং ইঁহাদের মধ্যে ৮ জনের পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব অদ্য উপস্থিত করা হইবে।

পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—ডক্‌টর দীনেশচন্দ্র সেন।

সাধারণ-সদস্য—১। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ২। W. Sutton Page, ৩। মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, ৪। নগেন্দ্রনাথ সোম, ৫। নলিনাক্ষ বসু, ৬। বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ৭। রায় রমেশচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, ৮। শরৎচন্দ্র ঘোষ, ৯। শিশিরকুমার বসু, ১০। সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক এবং ১১। ডাক্তার সত্যানন্দ রায়।

ইঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সহিত পরিষদের সম্পর্কের কথা এই কার্য্যবিবরণের অল্প পরিসরের মধ্যে লেখা সম্ভবপর নহে। পরিষদের বাল্যাবস্থা হইতে তিনি ইহার সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সহকারী সম্পাদক, গ্রন্থাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও সহকারী সভাপতিরূপে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এবং বিবিধ শাখা-সমিতির সভ্য ও

সভাপতিরূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া এবং কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া তিনি পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ সোম পরিষদের সহকারী সম্পাদক এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও বহু শাখা-সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের বিশেষ সেবা করিয়া গিয়াছেন। মহাশয় তারকনাথ ঘোষ চিত্রশালার জন্য প্রাচীন মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র ঘোষ গ্রন্থাদি দান করিয়া এবং শিশিরকুমার বসু নানাবিধ মূল্যবান্ দপ্তর সরঞ্জামীর দ্রব্য বর্ষে বর্ষে দান করিয়া এবং ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ রায় কেশবচন্দ্র সেনের চিত্র দান করিয়া পরিষদের উপকার করিয়া গিয়াছেন।

সহায়ক-সদস্য—নারায়ণচন্দ্র মৈত্র। তিনি বহু টাকা মূল্যের পুস্তক ও সুবর্ণ মুদ্রা পরিষদের বিভিন্ন ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুর বিয়োগে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি অনুভব করিতেছেন—

১। অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও ৩। রায় হেমকুমার মল্লিক বাহাদুর। ইঁহারা এক সময়ে সকলেই পরিষদের সদস্য ছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল—(ক) পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) **পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন**—৩১এ শ্রাবণ, বুধবার। সভাপতি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। (ক) ডক্‌টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা-প্রদত্ত প্রিয়নাথ সেনের এবং (খ) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষের পুত্রবধূ ও ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা শ্রীযুক্তা সরযূবালা ঘোষ-প্রদত্ত ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয় এবং ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয় এবং সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন হয়।

(খ) **মাসিক অধিবেশন**—১। ৩১এ ভাদ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত-লিখিত "দুর্গাদেবী" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

২। ১৯এ ফাল্গুন—(ক) ডক্‌টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার-লিখিত "সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ", (খ) ডক্‌টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন-লিখিত "দোম আন্তোনিয়োর পুথিতে অশোক-

যুগের ভাষা" এবং (গ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" নামক প্রবন্ধত্রয় পঠিত হয়।

৩। ৩রা চৈত্র—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত "রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৪। ২১এ চৈত্র—(ক) স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার-লিখিত "রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা" এবং (খ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" (২য় অংশ) প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

(গ) **বার্ষিক স্মৃতিসভা**—১। ২৬এ চৈত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বার্ষিক স্মৃতিসভা—সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। 'বন্দে মাতরম্' গানের পর শ্রীশান্তি পালের "বন্দে মাতরম্" ও শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের "বঙ্কিমচন্দ্র" কবিতা পঠিত হয়, শ্রীসজনীকান্ত দাসের "সীতারাম" ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলী কলেজে অধ্যয়ন" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয় এবং শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'কমলাকান্তে'র অংশবিশেষ আবৃত্তি করেন। সভাপতি, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ এবং শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন।

২। বর্ত্তমান বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ শ্রীকিরণচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বার্ষিক স্মৃতিসভা হয়। অধ্যাপক শ্রীরঙ্গীন হালদার, রেভারেণ্ড ফাদার এ দোঁতেন, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন। সভায় রামেন্দ্রসুন্দরের সমগ্র গ্রন্থ, পরিষৎ হইতে প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হয়।

৩। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক স্মৃতিসভা—বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ই আষাঢ় মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব হয়। প্রাতে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিপার্শ্বে অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসুর নেতৃত্বে প্রার্থনাদি হয়। কলিকাতার মেয়র মিঃ এ আর সিদ্দিকী, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীসন্তোষকুমার বসু প্রভৃতি প্রার্থনায় যোগদান করেন। এই উপলক্ষে গান ও কবিতাদি পঠিত হয়। ঐ দিন অপরাহ্ণে স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে পরিষদে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের গান হইলে পর অধ্যাপক শ্রীরঙ্গীন হালদার, অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। শ্রীসজনীকান্ত দাস অধ্যাপক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার-রচিত "মধু-উদ্বোধন" কবিতা পাঠ করেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষে মধুসূদনকে প্রদত্ত মানপত্রদান" সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

(ঘ) **শোকসভা**—১। ডক্টর ৺দীনেশচন্দ্র সেনের পরলোকগমনে শোকসভা—৩রা পৌষ। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শোক প্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কবিতা পাঠ করেন, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ

পাঠ করেন, এবং শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। মহারাষ্ট্র সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রী ডি. ডি. পোদ্দার দীনেশবাবুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

২। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য বর্ত্তমান বর্ষের ১৮ই বৈশাখ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ডক্‌টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বক্তৃতা করেন। সভায় শোক প্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(ঙ) **বিশেষ অধিবেশন**—২৪এ ভাদ্র। সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার। 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতিপদক' এবং 'স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতিপদক' দান উপলক্ষে আহূত এই বিশেষ অধিবেশনে রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সর্ত্তানুযায়ী ডক্‌টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো এই অধিবেশনে "আমীর খুসরু-কৃত 'দেবলরাণী—খিজির খাঁ' কাব্য" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে তাঁহাকে উক্ত পদক দেওয়া হয়। শ্রীযুক্তা সতী ঘোষকে স্বর্ণকুমারী দেবী সুবর্ণপদক প্রদানের বিষয় বিজ্ঞাপিত হয়।

(চ) **ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা**

পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এ বিষয় গত বৎসরই জানান হইয়াছে। বিগত বর্ষে যে এপিডায়োস্কোপ খরিদ করা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে বক্তৃতাকালে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তৃগণ যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্‌টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং ঐ শাখার আহ্বানকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই সকল বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিম্নে বক্তৃতা ও বক্তার নাম দেওয়া হইল।

(১) ১লা ভাদ্র, "খাদ্য সম্বন্ধে দু' একটি কথা", বক্তা—ডাক্তার শ্রীঅজিতমোহন বসু।

(২) ১৫ই ভাদ্র, "বিজ্ঞানে কালের ধারণা", বক্তা—ডক্‌টর শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।

(৩) ২২এ ভাদ্র, "কয়লার উৎপত্তি ও স্বরূপ," বক্তা—অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(৪) ৬ই পৌষ, "বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের আবিষ্কার", বক্তা—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শতবার্ষিক জন্মোৎসব

আলোচ্য বর্ষের ১৮ই ফাল্গুন কালীপ্রসন্ন সিংহের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে রমেশ-ভবনে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিভিন্ন বয়সের চিত্র,

তাঁহার দুই পত্নীর চিত্র, তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, তাঁহার হস্তলিপি এবং তাঁহার লিখিত পুস্তকাদি সজ্জিত করা হইয়াছিল। কালীপ্রসন্নের আত্মীয়গণ এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার পৌত্র শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র সিংহ ও শোভাবাজার রাজবাটীর গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য দান করিয়া পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে রমেশ-ভবনে বিশেষ অধিবেশন হয়। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীসজনীকান্ত দাস, অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, ডক্‌টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা সরসীবালা সিংহ-লিখিত এক প্রবন্ধ রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর পাঠ করেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্তা রাণী দেবী ও শ্রীযুক্তা শোভনা দাস গান করেন।

সংবর্দ্ধনা

গত ১৩।১৪ই ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস্‌ কমিশনের যে অধিবেশন হয়, তদুপলক্ষে সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে ১৪ই ডিসেম্বর পরিষদ্‌ মন্দিরে সংবর্দ্ধিত করা হয়। পরিষদের সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের নেতৃত্বে উক্ত সভ্যগণ পরিষদে সমাগত হইলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য এবং কর্ম্মাধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগকে পরিষদের সকল বিভাগ প্রদর্শন করান।

কার্য্যালয়

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত; সহকারী সভাপতিগণ—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, রায় শ্রীযোগেশ-চন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ; সম্পাদক—শ্রীমন্মথমোহন বসু; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৎসরের শেষে তিনি পদত্যাগ করিলে শ্রীসজনীকান্ত দাস; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বৎসরের শেষভাগে তিনি পদত্যাগ করিলে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। ডক্‌টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ২। ডক্‌টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ৩। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ৪। শ্রীঅমলচন্দ্র হোম, ৫। শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ৬। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৮। শ্রীমাখনলাল সেন, ৯। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১০। রেভারেণ্ড এ. দোঁতেন, ১১। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ১২। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৪। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৫। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, ১৭। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৮। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ২০। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

২১। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীমনীষিনাথ বসু।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

২৬। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৭। ডাক্তার শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, পরে পুনর্নির্ব্বাচনে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৯টি সাধারণ ও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা দুই বার সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

(ক) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্পর্কে পরিষদের প্রবর্ত্তিত "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র অন্তর্ভুক্ত ২য় পুস্তক 'কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য' শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণয়ন করিয়াছেন এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয়ে এই চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ লিখিবেন এবং ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার গ্রন্থসূচী লিখিবেন।

(খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরোজিনী বসু পদক সমিতি'তে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস।

(গ) নিম্নোক্ত সদস্যগণ এই সকল অনুষ্ঠানে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, —১। শ্রীমন্মথমোহন বসু—ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস উৎসব সমিতিতে, ২। শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন—ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স-এর অধিবেশনে, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়—কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হিষ্ট্রি কংগ্রেসের অধিবেশনে, শ্রীপ্রমথনাথ বিশি বার্ণপুর 'আগমনী সাহিত্য-সম্মিলনে'।

(ঘ) নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—(ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শন-শাখা, (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি, (চ) পুস্তকালয় সমিতি, (ছ) চিত্রশালা সমিতি, (জ) ছাপাখানা সমিতি, (ঝ) প্রাইমারী এডুকেশন বিল আলোচনা সমিতি, (ঞ) উদ্বৃত্ত পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর ব্যবস্থা সমিতি, (ট) পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সমিতি, (ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি এবং (ড) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

(ঙ) (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪।১৫ ডিসেম্বর '৩৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হিষ্ট্রি কংগ্রেস প্রদর্শনীতে, (২) রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (৩) ৮ই ফাল্গুন হইতে ১৭ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত সিউড়ীতে অনুষ্ঠিত বীরভূম কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে, (৪) ২৮এ মাঘ ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (৫) বর্ত্তমান বর্ষের ৪।৫।৬ই জ্যৈষ্ঠ মেদিনীপুরের শাখা-পরিষদের ২৭শ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা ও গ্রন্থাগার হইতে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

(চ) স্থির হইয়াছে যে, ডক্‌টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান' বক্তৃতামালার অন্তর্গত একটি বক্তৃতা করিবেন।

রমেশ-ভবন

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে মন্দির-সংস্কারাদি কার্য্যের জন্য চিত্রশালার দ্রব্যগুলি গুদামজাত ছিল। পরিষদের গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি সুবিন্যস্তভাবে রাখিবার স্থানাভাব বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। এই অভাব দূরীকরণের জন্য রমেশ-ভবনের ত্রিতলে একখানি ঘর তৈয়ার করা হইয়াছে। চিত্রশালার দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য আপাততঃ একটি শো-কেস্ খরিদ করা হইয়াছে। মন্দির-সংস্কার কার্য্য সমাপ্ত হইলেই চিত্রশালার দ্রব্যগুলি সাজাইবার ও তজ্জন্য আবশ্যকমত শো-কেস প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইবে। আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত দ্রব্য-গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি উল্লেখযোগ্য—৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত আকবরের একটি স্বর্ণমুদ্রা, শ্রীগুরুসদয় দত্ত-প্রদত্ত সামসুদ্দিনের একটি মুদ্রা, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়-প্রদত্ত দুইটি প্রস্তরমূর্ত্তি—(ক) মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি এবং (খ) রুদ্রের আবির্ভাব মূর্ত্তি, শ্রীঅজিত ঘোষ-প্রদত্ত কুবের-মূর্ত্তি, শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-প্রদত্ত একটি বুদ্ধমূর্ত্তি।

রমেশ-ভবনের দ্বিতলের হলে বক্তৃতামঞ্চের উপর যে পর্দ্দা খাটান হইয়াছে, তাহার পরিকল্পনা করিয়াছেন শ্রীনন্দলাল বসু। সাহিত্যিকগণের চিত্রগুলি মেরামত করিয়া এবং উপযুক্ত ফ্রেমে বাঁধাইবার পর হলের দেওয়ালে টাঙ্গান হইয়াছে।

বঙ্কিম-ভবন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়াস্থ বৈঠকখানা সুসংস্কৃত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব ইতিহাসের পুনরুল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বর্ষে বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের দিবসে ২৬এ চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া থাকেন। বিগত ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ঐ স্মৃতিসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এড্‌ভোকেট শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বৈঠকখানাবাটীর জীর্ণাবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া পরিষৎকে উহার সংস্কারের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়াস্থ তাঁহার বৈঠকখানা-বাটীর সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বৈঠকখানা সংস্কারের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে বৈঠকখানা-বাটীর এক-চতুর্থাংশের মালিক বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ অংশ পরিষৎকে দান করেন এবং তৎপরে কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন ঐ বৈঠকখানার তাঁহাদের স্বত্বাধিকৃত ত্রিচতুর্থাংশ (যাহা তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের অপর তিন দৌহিত্রের নিকট খরিদ করিয়াছিলেন) পরিষৎকে দান করেন। উভয় দানপত্র যথারীতি রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। তৎপরে নৈহাটীস্থ কণ্ট্রাক্টার শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্য্যের উপর বঙ্কিম-ভবনের সংস্কারকার্য্যের ভার অর্পিত হয়। ইতিমধ্যে পরিষৎ সংবাদপত্রের সাহায্যে ও পত্রদ্বারা বঙ্কিমের গুণগ্রাহী ভক্তগণের নিকট এবং পরিষদের সদস্যগণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদের পক্ষে পরিষদের প্রবীণ বন্ধু শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ ও সহকারী সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতায় এবং কলিকাতার বাহিরে বহু স্থানে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে ঘুরিয়াছেন। এই ভাবে কিঞ্চিদধিক ৩০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংস্কারকার্য্যে কিঞ্চিদধিক ২০০০৲ ব্যয় হইয়াছে। উহার বিল পরীক্ষান্তে বর্ত্তমান বর্ষেই শোধ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ও এই উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য যে সকল সংবাদ ও সাময়িকপত্র পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে ২৫এ ফাল্গুন বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা-বাটীর সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরক্ত ভক্তগণ এই তীর্থসদৃশ ভবনের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন। এজন্য অন্যূন ৫০০০৲ টাকার ভাণ্ডারের প্রয়োজন। প্রার্থনা, সকলে এই ভাণ্ডার স্থাপন বিষয়ে মুক্তহস্ত হইবেন।

ভবন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিষদের পক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক ঠাকুরদালানে ২৫এ ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্নে বিরাট্‌ সভার অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীহেমচন্দ্র সেন ও তাঁহার সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের ছাত্র-

ছাত্রীগণ "বন্দে মাতরম্" গান করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীরেজাউল করিম, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার, শ্রীমতী রাধারাণী দেব বক্তৃতা করেন। সম্পাদক শ্রীমন্মথমোহন বসু এই বৈঠকখানা সংস্কার সম্বন্ধে কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন এবং শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র "সুবর্ণ গোলক" আবৃত্তি করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বৈঠকখানাবাটীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঐ ভবন সমর্পণ করেন। এই বৈঠকখানা সংস্কারের জন্য যে ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু তাহাতে ১০০৲ দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন এবং স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার ১০৲, শ্রীদুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ ৫৲, শ্রীপ্রভাত সিংহ ১৲ এবং শ্রীশচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲ সভাস্থলেই এই উদ্দেশ্যে দান করেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। নৈহাটি-নিবাসী শ্রীঅতুল্যচরণ দে, শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানের জন্য পরিষদ্‌কে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে যে সকল পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্য হইতে ৪৬ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত পুথি ৩৮ খানি এবং বাঙ্গালা পুথি ৮ খানি। এ পর্য্যন্ত পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত হয় নাই, এরূপ কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পুথি—বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, উভয় বিভাগেই পাওয়া গিয়াছে।

যে সকল হিতৈষী ব্যক্তি উপরোক্ত পুথিগুলি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা এই,—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ২৮ খানি, মহারাজা শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ১০ খানি, শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৫ খানি, নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ৩ খানি। উপরোক্ত পুথিগুলি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি	—৩২০৬	অসমীয়া পুথি	—৩
সংস্কৃত „	—২২৬৮	ওড়িয়া „	—৪
তিব্বতী „	— ২৪৪	হিন্দী „	—২
ফার্সী „	— ১৩	মোট	৫৭৪০

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ মন্দির সংস্কারের জন্য পুথিশালার সমগ্র পুথি একটি গৃহমধ্যে ছয় মাসের অধিক কাল স্তূপীকৃত করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। এই জন্য বৎসরের শেষ ছয় মাসে পুথিশালার কোনও কার্য্য আশানুরূপ সম্পাদিত হইতে পারে নাই। পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-সম্পাদিত প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণের মুদ্রণও অধিক অগ্রসর হয় নাই। তবে এই অবসরে বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীর অন্তর্গত প্রাচীন পুথির একটি বিষয়ানুক্রমিক সবিবরণ তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ২৪৮ খানি পুথি খেরো দিয়া ও ১২০ খানি পুথি পাটা ও খেরো দিয়া বাঁধা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথি আলোচনা করিয়া অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'শূলপাণিকৃত শ্রাদ্ধবিবেকের টীকা'র (১৫৯১) রচয়িতা হরিদাস তর্কাচার্য্য বা রামচন্দ্র ন্যায়বাচস্পতির মোটামুটি সময় নিরূপণ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার গ্রন্থে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতা বিশারদের লুপ্ত স্মৃতিগ্রন্থের যে সকল উল্লেখ আছে, তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন (Indian Historical Quarterly, ১৬।৬১-৬২)।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ৪২২২৩ খানি পুস্তক পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে ৫৭৮ খানি পুস্তক উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ২৬৪ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। বর্ষশেষে গ্রন্থাগারে মোট পুস্তকসংখ্যা ৪৩০৬৫ হইয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য,—

প্রদাতা—শ্রীসরলকুমার নাগ চৌধুরী—১। বঙ্গদূত ১২৩৬ (সাময়িক পত্রিকা), শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। গীতানন্দলহরী, ১৭৭০ শক, ২। বৈরাগ্যশতক, ১৭৭৭ শক, ৩। মুরশিদাবাদের ইতিহাস, ১৮৬৪, ৪। উনবিংশ পুরাণ, ১২৭৬, ৫। পত্রচিন্তামণি গ্রন্থ, ১৭৬৭ শক, ৬। কৃষ্ণলীলারসোদয়, ১২৬১, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, ১৭৮৬ শক, শ্রীকৃষ্ণশেখর বসু—১। সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, ২। The Prem Sagur, নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। ধর্ম্মপুস্তক, ১৮৭৪, ২। ধর্ম্মপুস্তকের আদি ভাগ অর্থাৎ পুরাতন ধর্ম্ম নিয়মের গ্রন্থসমূহ, ১২৬৮, ৩। Thirtyfour Conferences between the Danish Missionaries and the Malabarian Bramans.

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক-পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,—

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publication, Delhi, ৫। Kern Institute, Holland, ৬। Bengal Library, ৭। Imperial Library, ৮। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১০। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১১। বিশ্বভারতী, ১২। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

ক্রীত সাময়িক পত্র ও পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি দুষ্প্রাপ্য,—

১। বঙ্গদর্শন (মূল ও সম্পূর্ণ), ২। সবুজপত্র, ১ম বর্ষ, ৩। দুর্জ্জনদমন মহানবমী, ১২৫৪, ১৭শ সংখ্যা, ৬। Calendar of Persian Correspondence, vol. II (1781-85), ৭। ইন্দিরা, ১ম সং।

পরিষদ্‌গ্রন্থাগার হইতে নিম্নলিখিত স্থানে পুরাতন পুস্তক ও পত্রিকা প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল,—

১। Indian History Congress, কলিকাতা

২। Royal Asiatic Society of Bengal, কলিকাতা

৩। কৃত্তিবাস-স্মৃতি-উৎসব, ফুলিয়া, শান্তিপুর

৪। সিউড়ি কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী, বীরভূম

এতদ্ব্যতীত কালীপ্রসন্ন সিংহের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে পরিষদ্ মন্দিরে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এই প্রদর্শনীতে কালীপ্রসন্ন সিংহের পুস্তকাদি প্রদর্শিত হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থাদি ক্রয় করিবার জন্য কলিকাতা করপোরেশন ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট এই জন্য পরিষৎ কৃতজ্ঞ।

পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের একটি সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকার অভাব সদস্যগণ বহুদিন হইতে বোধ করিতেছিলেন। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুরোধে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তক-তালিকা প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে পুস্তক-তালিকা প্রণয়ন ও মুদ্রণের কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ইতিমধ্যে 'বিদ্যাসাগর', 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', 'ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর' ও 'রমেশচন্দ্র দত্ত' এই চারিটি বিশিষ্ট গ্রন্থ-সংগ্রহের সমস্ত সংস্কৃত বাঙ্গালা পুস্তক ও সাধারণ গ্রন্থ-সংগ্রহের বহু পুস্তক তালিকাভুক্ত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসমেত ৪০ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। এই তালিকাপ্রণয়ন কার্য্যে শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিনা পারিশ্রমিকে পরিষৎকে সাহায্য করিতেছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থ-প্রকাশ

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে—

(ক) ন্যায়দর্শন—১ম খণ্ড (দ্বিতীয় ও পরিবর্ত্তিত সংস্করণ), সম্পাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইল। ইহাতে মূল সূত্র, বাৎস্যায়নভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ফুরাইয়া যাওয়ায় সম্পূর্ণ নূতন ভাবে এই খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভাষ্যার্থ-ব্যাখ্যার বিশদীকরণের জন্য ও অনেক স্থলে জ্ঞাতব্য বহু অতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশের জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই অনুবাদ প্রভৃতি নূতন করিয়াই লিখিত হইয়াছে। ৪০৬+১।০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থশেষ হইয়াছে।

(খ) আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ হইতে **সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা** নামে এক শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। এই চরিতমালার পুস্তকের প্রত্যেকখানির

দাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র চারি আনা। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকদের জীবনী ও কীর্ত্তিকথা প্রচারই এই চরিতমালার উদ্দেশ্য। নিম্নোক্ত পুস্তক তিনখানি প্রকাশিত হইয়াছে :—

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(গ) আলালের ঘরের দুলাল—প্যারীচাঁদ মিত্র (ওরফে 'টেকচাঁদ ঠাকুর') প্রণীত। সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের সাহায্যে পরিষৎ-প্রকাশিত বর্ত্তমান সংস্করণের পাঠ নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ইহা যে প্রামাণিক সংস্করণ, তাহা না বলিলেও চলে। অনেকগুলি চিত্র, গ্রন্থকারের জীবনী ও গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত দুরূহ শব্দের অর্থসমেত ৩৲+।০+১৯২+২৶০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

(ঘ) ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে—১। লোকরহস্য (পৃ. ৯৬), ২। গদ্যপদ্য বা কবিতা পুস্তক (পৃ. ১১৮), ৩। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (পৃ. ২৮), ৪। সীতারাম (পৃ. ১৯২), ৫। কৃষ্ণকান্তের উইল (পৃ. ১৩২) ৬। Rajmohan's Wife (পৃ. ১০০), ৭। Letters on Hinduism (পৃ. ৫৫)।

এতদ্‌ব্যতীত ১। রাজসিংহ, ২। রজনী, ৩। রাধারাণী, এই তিনখানি পুস্তকের মূল মুদ্রিত হইয়াছে, ভূমিকাদি মুদ্রিত হইলেই প্রকাশিত হইবে এবং বঙ্কিমের ইংরেজী রচনা ও ইংরেজী পত্রাবলীর মুদ্রণ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায়, এক মাস মধ্যে এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। বঙ্কিম-গ্রন্থ বিক্রয়াদির ব্যবস্থা করিবার ভার শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহার উপর অর্পিত আছে। বিশেষ যত্নের সহিত তিনি এ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগের আরব্ধ কার্য্যগুলির মধ্যে (ক) 'বাংলা পুথির বিবরণ' মুদ্রণের কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। (খ) রিকার্ডোর 'ধনবিজ্ঞান' মুদ্রণের কার্য্য আলোচ্য বর্ষে বন্ধ ছিল, এবং (গ) 'বঙ্কিমজীবনীর' খসড়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে স্থির হইয়াছে যে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সমগ্র গ্রন্থের একটি সংস্করণ পরিষৎ হইতে প্রকাশ করা হইবে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে ৪৬শ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা নির্দ্দিষ্ট সময়ে চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলির এবং লেখকগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

(ক) **প্রাচীন সাহিত্য**—১। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২। গঙ্গারাম দত্তের রামায়ণ—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির

মিলন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৪। তন্ত্রে কৃষ্ণচরিত—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ৫। দীন চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৬। দোম আন্তোনিয়োর পুথিতে অশোক-যুগের ভাষা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ৭। পাঁচু ঠাকুরের পাঁচালি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ৮। মুসলমান-সাহিত্যে ভারতবাসীর দান—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

(খ) **ইতিহাস**—১। আমীর খুস্রু-কৃত 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্য—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, ২। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী-সমাজের সমস্যা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। খোদাই-চিত্রে বাঙালী—ঐ, ৪। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ—ঐ, ৫। গুপ্ত-যুগে ত্রিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিস্থিতি—শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, ৬। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে ইতিহাস—শ্রীযদুনাথ সরকার, ৮। বঙ্গদেশে জৈনধর্ম্মের প্রারম্ভ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, ৯। বাংলা-গদ্যের প্রথম যুগ (৫-৮)—শ্রীসজনীকান্ত দাস, ১০। বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, ১১। মহাভারতের কয়েকটি টীকাকার—শ্রীসুশীলকুমার দে, ১২। মুসলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ—শ্রীযদুনাথ সরকার, ১৩। শাহজাদা দারা শুকোর পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজ্ঞান—শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, ১৫। সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৬। সেকালের সংস্কৃত কলেজ ১।২—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত—ঐ।

(গ) **দর্শন**—১। দুর্গাদেবী—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। ব্রহ্মসূত্রার্থে মতভেদ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩। বিজ্ঞানবাদ—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

(ঘ) **বিজ্ঞান**—১। গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন যৌগিক—শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ২। দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবন—শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, ৩। মন্দিরের অন্তর—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আবেদনের ফলে বঙ্গীয় রাজসরকার পরিষদের উন্নতিকল্পে ৫০০০৲ এককালীন দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এবং সহৃদয় মন্ত্রিগণের নিকট এই দানের জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের টেক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ ঋণী।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

পদক ও পুরস্কার

(ক) আলোচ্য বর্ষে ২৪এ ভাদ্র বিশেষ অধিবেশনে 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার' শাখা-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনে অধ্যাপক শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগোকে বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য "রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতিপদক" (সুবর্ণ) দেওয়া হইয়াছে। এই পুরস্কারের সর্ত্তানুসারে কালিকারঞ্জন বাবু এই বিশেষ অধিবেশনে "আমীর খুস্রু-কৃত 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(খ) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কারের জন্য বিজ্ঞাপিত "বঙ্গসাহিত্যে স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর দান" বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীমতী সতী ঘোষকে "স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পদক" (সুবর্ণ) উক্ত বিশেষ অধিবেশনে প্রদর্শনান্তে দেওয়া হইয়াছে। এই প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(গ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য স্বর্গত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র তাঁহাকে একটি পদক দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে, একজন সাহিত্যিকের পুত্রবধূকে এবং একজন গ্রন্থকর্ত্রীকে প্রতি মাসে নিয়মিত সাহায্য দান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একজন সাহিত্যিকের পত্নীকে এককালীন কিছু সাহায্য করা হইয়াছে। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য অনেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডারের জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে (ক) ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা-প্রদত্ত প্রিয়নাথ সেনের এবং (খ) শ্রীযুক্তা সরযূবালা ঘোষ-প্রদত্ত তাঁহার পিতা রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসুর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং (গ) শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু-প্রদত্ত আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র

বসুর মূর্ত্তি (Bas-relief) সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। (ক) অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং (খ) ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের চিত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ দীনেশচন্দ্রের চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপরি-উক্ত চিত্র এবং মূর্ত্তি দানের জন্য প্রদাতৃগণের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

পরিষদ্ মন্দিরে এ যাবৎ সাহিত্যিকগণের চিত্র এত অধিক সংগৃহীত হইয়াছে যে, সেগুলি যথোপযুক্ত ভাবে রক্ষা করার স্থানাভাব ঘটিতেছে। এই হেতু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন, অতঃপর ১৭"×২৩" (বিনা ফ্রেম) অপেক্ষা বড় মাপের চিত্র গ্রহণ করা পরিষদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত সমস্ত চিত্র মেরামত করা হইয়াছে এবং রমেশ-ভবন ও পরিষদ্ মন্দিরে সেগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই বাবদ প্রায় এক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছে।

পরিষদ্ মন্দির

গত বর্ষের সঙ্কল্প অনুসারে আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের সংস্কারাদি কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, আশা করা যায়, তাহা এক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে। নিম্নোক্ত কাজগুলি প্রধানতঃ সম্পন্ন হইয়াছে—

রমেশ-ভবনে—(ক) ছাদ মেরামত, (খ) ত্রিতলের ছাদে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি রাখিবার ঘর নির্ম্মাণ, (গ) পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ত্রিতলের ছাদে সংযোজক সিঁড়ি, (ঘ) দ্বিতলের হলে মঞ্চ ও তদুপরি পর্দ্দা প্রভৃতি, (ঙ) রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মূর্ত্তি দেওয়াল-গাত্রে সংযোজন, (চ) পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত সাহিত্যিকগণের চিত্রের অধিকাংশ দ্বিতলের হলে সাজাইয়া রাখা এবং (ছ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থসংগ্রহ দ্বিতলের হলে স্থানান্তরিত করা প্রভৃতি।

পারষদ্ মন্দিরে—(ক) সমগ্র মন্দিরের ভিতর ও বাহিরের খিলান প্রভৃতি মেরামত করিয়া বালির কাজ ও রং করা, (খ) পুঁথির ঘরের মেঝে ফেলিয়া দিয়া নূতন মেঝে প্রস্তুত করা, (গ) দ্বিতলে উঠিবার সিড়ি খুলিয়া তৎস্থান বন্ধ করা, (ঘ) ঐ সিঁড়ি মন্দির ও রমেশ-ভবনের মধ্যস্থলে খাটাইয়া দেওয়া, (ঙ) সদর দরজা বদল করিয়া তৎস্থানে নূতন ও মজবুদ দরজা বসান, (চ) দরজার উপরের অংশ নূতন পরিকল্পনায় পুনর্নির্ম্মাণ করা, (ছ) একটি ঘরের মার্বেল পাথর বদল করা ও পালিশ করা, (জ) দ্বিতলের বক্তৃতামঞ্চ খুলিয়া ফেলিয়া উপরে একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা, (ঝ) ত্রিতলের লোহার সিঁড়ি খুলিয়া তৎস্থলে কাঠের সিঁড়ি প্রস্তুত করা, (ঞ) সমস্ত জানালা দরজা মেরামত ও রং করা, (ট) উপরের পুথিশালার র‍্যাক খুলিয়া নূতন ও বড় র‍্যাক প্রস্তুত করা, (ঠ) সমস্ত আলমারী, টেবিল, চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অধিকাংশই মেরামত ও রং পালিশ করা, (ড) নূতন শো-কেস ও কাউণ্টার প্রভৃতি খরিদ করা, (ঢ) নূতন পাখা খরিদ করা এবং (ণ) ইলেক্‌ট্রিক

আলো ও পাখার তার বদল ও নূতন লাগান, (ত) উভয় ভবনের মধ্যস্থলে দ্বিতলে শৌচাগার নির্ম্মাণ, (থ) গ্রন্থাদি রাখিবার জন্য গুদাম-ঘর প্রস্তুত করা এবং (দ) সাময়িক-পত্রাদি রাখিবার জন্য বৃহৎ র‍্যাক প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং বহু খুচরা কাজও হইয়াছে। এই সকল কার্য্যের অধিকাংশই কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে ও শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পরিষৎকার্য্যালয় হইতেই করা হইয়াছে; কিছু কাজ মেসার্স জে. সি. ব্যানার্জি কোম্পানীও করিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত কোম্পানীর কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছেন।

এই সকল কাজ ব্যতীত নিম্নোক্ত কাজগুলি এখনও করা দরকার,—১। পুস্তকালয়ের জন্য র‍্যাক, ২। কতকগুলি চেয়ার, ৩। নূতন একটি গুদাম-ঘর, এবং আরও কতকগুলি পাখা। এইগুলি না হইলে মন্দির-সংস্কারাদির কাজ সম্পূর্ণ হইবে না।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা

আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য-বিভাগের প্রবন্ধ-সংখ্যাই বেশী হইয়াছিল বলিয়া সাহিত্য-শাখার ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস-বিভাগে ১টি এবং দর্শন-বিভাগে ১টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান-শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে শিলঙে পরিষদের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। সেখানকার উদ্যোগী কর্ম্মিগণ নানা ভাবে পরিষদের উদ্দেশ্যানুকূল কার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বাঁকুড়ায় লুপ্ত শাখার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং মালদহে ও রাজসাহী-নওগাঁতে নূতন শাখা স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সাহিত্য-সম্মিলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরপাড়া, বর্দ্ধমান, রঙ্গপুর, চট্টগ্রাম, মীরাট ও গৌহাটী শাখা নানারূপ অধিবেশনাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান-শাখার নবগৃহের ভিত্তি আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আগ্রা-শাখাটি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখা হইয়াছে।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) হইতে পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিষয় সবিশেষ জানা যাইবে। প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই বলিয়া পরিষৎ বহু সঙ্কল্পিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। তৎসত্ত্বেও পরিষৎ আলোচ্য বর্ষে দুইটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। প্রথম—বঙ্গীয় রাজসরকারের অর্থানুকুল্যে পরিষদ্ মন্দির সংস্কার এবং দ্বিতীয়—বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ দেশবাসীর সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়াস্থ বৈঠকখানাবাটী সংস্কার।

পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের জন্য নানারূপ অসুবিধাবশতঃ ঝাড়গ্রামরাজ তহবিল হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের মজুত গ্রন্থগুলির হিসাব আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্রে সন্নিবিষ্ট করিতে পারা যায় নাই। উহা প্রস্তুত হইতেছে এবং পরে দেখান হইবে স্থির হইয়াছে।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ এবং পরিষৎ-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়াদি দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য সদস্য ও সদস্যেতর হিতৈষিগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে ;—

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের এককালীন দান

২। ঐ বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)

৩। ঐ ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)

৪। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান

৫। সাধারণ তহবিলে দান

৬। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান

৭। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান

৮। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কারের এবং সংরক্ষণের জন্য দান

৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান

১০। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নীর সমাধি নির্ম্মাণের জন্য দান

১১। পদকের জন্য ৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্রের দান

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত পরিষদের কার্য্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যের সাহায্যের জন্য বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ, বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং পক্ষে স্বর্গত শিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানী এবং স্বর্গত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র দপ্তর-সরঞ্জামীর বিবিধ দ্রব্য দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন

আলোচ্য বর্ষের ৩১এ ভাদ্র পরিষদের মাসিক অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবমত পরিষদের নিয়মাবলীর নিম্নলিখিত পরিবর্দ্ধন, সংশোধন ও পরিবর্জ্জন হইয়াছে,—

১। নূতন নিয়ম—১০ (খ) অধ্যাপক-সদস্য তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

১২ (খ) মৌলবী-সদস্য তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

২। পরিবর্ত্তন—২০ (গ) নিয়মের 'পাঁচ' স্থলে 'তিন' হইবে।

৩। পরিবর্জ্জন—৪২ (ঙ) সংখ্যক নিয়ম উঠিয়া যাইবে।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ হইতে এই সকল পরিবর্ত্তিত নিয়ম কার্য্যকর বিবেচিত হইবে।

উপসংহার

পরিশেষে আমি পরিষদের হিতৈষী বন্ধুবর্গকে এবং আমার সহযোগী কার্য্যাধ্যক্ষগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। প্রধানতঃ তাঁহাদের সাহায্যেই পরিষদ্ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছে। ভগবৎকৃপায় পরিষদ্-গৃহটি আমূল সংস্কৃত হইয়া নব কলেবর ধারণ করিয়াছে, পুথিশালা ও গ্রন্থাগারের সকল আবর্জ্জনা পরিষ্কৃত হইয়া গ্রন্থাদি রক্ষণের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং রমেশ-ভবনটি হস্তগত হওয়াতে সভাধিবেশনাদি কার্য্যের সকল অসুবিধা দূর হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পরিষদ্ অনেকগুলি নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যথা;—(১) বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানার স্বত্বাধিকারিত্ব লাভ করিয়া তাহার আমূল সংস্কার সাধন; (২) বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর রাজসংস্করণ প্রকাশ; (৩) বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্য-সাধকগণের জীবনী প্রকাশ; (৪) 'আলালের ঘরের দুলালে'র ন্যায় বঙ্গভাষার প্রাচীন গদ্যগ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ; (৫) পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকগুলির একটি বিজ্ঞানসম্মত তালিকা প্রস্তুত করণ; (৬) এপিডায়-স্কোপের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাদির ব্যবস্থা; (৭) পরিষদ্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি।

কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পরিষদের ঈদৃশ উন্নতি বিশেষ আশাপ্রদ হইলেও ইহার ভবিষ্যৎ এখনও সম্পূর্ণরূপে আশঙ্কাশূন্য বলা যায় না। পরিষদের সদস্যগণের বার্ষিক চাঁদার উপরেই পরিষদের সাধারণ ব্যয়নির্ব্বাহ নির্ভর করে। সুতরাং সে চাঁদা রীতিমত আদায় না হইলে, পরিষদের ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে অনেকে এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য মনে করেন না। ফলে অনেক টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য পরিষদ্ একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহার একটি ভিত্তিও সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। পরিষদের প্রত্যেক হিতৈষী বন্ধুকে এই ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য আমি সানুনয় প্রার্থনা জানাইতেছি। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা এ বিষয়ে যত্নবান্ হইলে অচিরে লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব হইবে না। বঙ্গদেশে সহৃদয় সমর্থ দাতার অভাব নাই। আশা করি, তাঁহারা দেশের এই শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করিতে মুক্তহস্ত হইবেন। ভগবান্ তাঁহাদের মঙ্গল করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৭ই শ্রাবণ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

অষ্টচত্বারিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বঙ্গাব্দ ১৩৪৮

কলিকাতা, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রবন্ধ-সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
১৩৪৮

"সর্ব্বজ্ঞ"

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্

১

বহুবিধ বিচারের দ্বারা মীমাংসকাচার্য্যগণ প্রতিপন্ন করেন যে, সর্ব্বজ্ঞ কেহই নাই। তাঁহাদের সেই সমস্ত অতি সূক্ষ্ম বিচার স্থূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ তাঁহারা দেখান যে, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সম্বন্ধে কোনই প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা প্রতিপাদন করেন যে, সর্ব্বজ্ঞতা অসম্ভব। মীমাংসাচার্য্যগণের বিচার-প্রণালীর উক্ত দুই ধারা আমরা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

মীমাংসামতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম ও অর্থাপত্তি, এই পাঁচটী এবং ভট্টমতে ইহাদের সহিত অভাবকে ধরিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টী প্রমাণ অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের সাধন বা উপায়। মীমাংসকগণ বলেন, কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আছেন, ইহা কোনও প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয় না।

আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করি, তাহাই আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান; যেমন রূপাদি জ্ঞান আমাদের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ জ্ঞান, শব্দজ্ঞান আমাদের শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইত্যাদি। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা আমরা কোনও বিষয়ের শুধু ততটুকুই উপলব্ধি করি, যতটুকু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে ("সন্নিকর্ষে") আসে; বিষয়ের যেটুকু ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে না আসে, সেটুকু প্রত্যক্ষজ্ঞানের অবিষয় অর্থাৎ বাহিরেই থাকিয়া যায়। প্রত্যক্ষজ্ঞান তাই অতি সংকীর্ণ। আমার বাহিরে যে সকল পুরুষ দেখিতে পাই, তাঁহাদের শরীরের রূপ, আকার, গঠন প্রভৃতিই আমার প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়; কিন্তু তাঁহাদের মনের ভিতর কি আছে, তাহা আমি কখনই প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। যদি অপর ব্যক্তির জ্ঞান আমার অপ্রত্যক্ষ, তাহা হইলে আমি কিরূপে কোনও ব্যক্তিকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইব? সাধারণ লোকের হৃদয়স্থ সামান্য জ্ঞানটুকু যখন প্রত্যক্ষ করিবার আমার সামর্থ্য নাই, তখন যাঁহার জ্ঞানে অনাদি, অনন্ত, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, সূক্ষ্ম ("অনাদ্যনন্তাতীতা-নাগতবর্ত্তমানসূক্ষ্ম") প্রভৃতি নিখিল বিষয় প্রতিভাত রহিয়াছে, এমন কোনও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, ইহা কোনও ক্রমেই বলা যায় না।

যে বিষয় জানা আছে, তাহা হইতে, তাহার সহিত যাহার অচ্ছেদ্য ("অবিনাভাব") সম্বন্ধ আছে বলিয়া জানা আছে, তাহার বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অনুমান। যেমন,

কোনও পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া ঐ পর্ব্বতে বহ্নি আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। অনুমান-প্রমাণে হেতু উপযুক্ত হওয়া চাই। ধূম হইতে বহ্নি-অনুমানে, ধূম উপযুক্ত হেতু; কেন না, ("সাধ্য")-বহ্নির সহিত ("হেতু")-ধূমের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, ইহা জানা আছে। যেখানে সাধ্যের সহিত হেতুর অবিনাভাব-সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতে জানা থাকে না, সেখানে অনুমান অসম্ভব হয়। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞতার সহিত যাহার অবিনাভাব-সম্বন্ধ অবধারিত আছে, তাহাই সর্ব্বজ্ঞ-অনুমানে সদ্ধেতু। কিন্তু এই সম্বন্ধ কিরূপে জানা যাইবে? প্রত্যক্ষের দ্বারা এ সম্বন্ধ জানা সম্ভব নয়; কেন না, পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রত্যক্ষের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞের উপলব্ধি হয় না; সুতরাং প্রত্যক্ষ যখন সাধ্য সর্ব্বজ্ঞ বিষয়েই জ্ঞান উৎপাদনে অসমর্থ, তখন তাহা আবার সর্ব্বজ্ঞতার সহিত অপর কোনও বিষয়ের অবিনাভাব-সম্বন্ধ কিরূপে বুঝাইয়া দিবে? সম্বন্ধির জ্ঞান না থাকিলে সম্বন্ধের জ্ঞান সম্ভবপর হয় না। আবার অনুমানের দ্বারা এই অবিনাভাব-সম্বন্ধ জানা যাইতে পারে, ইহাও বলা যায় না। তাহাতে "ইতরেতরাশ্রয়-দোষ" হয়। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ প্রতিপন্ন করিতে অনুমানের আশ্রয় লইতে হইবে, বলা হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সম্বন্ধে অনুমান করিতে গেলে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে অবিনাভাব-সম্বন্ধ বিষয়ে যে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সে জ্ঞান সাধ্য (অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ) বিষয়ে পূর্ব্ব-উপলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ-অনুমানে উপযুক্ত হেতু পাওয়া যাইতেছে না এবং সেই কারণে সর্ব্বজ্ঞ-প্রতিপাদনে অনুমান-প্রমাণ অসমর্থ, ইহা বলা যাইতে পারে।

একটী পদার্থ হইতে তাহার সদৃশ অপর পদার্থ বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে উপমান বলা যায়। যদি কোনও ব্যক্তিকে বলা হয়,"গবয় গো-সদৃশ", তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি যখন অরণ্যে গমন করিয়া গো-সদৃশ কোনও পশুকে দেখিতে পায়, তখন সে ঐ পশুকে গবয় বলিয়া বোধ করে; ইহারই নাম উপমান। সর্ব্বজ্ঞের সদৃশ এমন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা হইতে সাদৃশ্য-সাহায্যে সর্ব্বজ্ঞ সম্বন্ধে উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব সর্ব্বজ্ঞ উপমানের দ্বারা অধিগম্য নহেন, ইহাই মীমাংসামত।

মীমাংসকাচার্য্যগণ বলেন, যাগাদি কর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল বিধি-নিষেধ বেদে বর্ত্তমান, ঐগুলিই মনুষ্যকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে "প্রেরণা" প্রদান করে; সেই জন্য বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভাগেরই প্রামাণ্য; এতদ্ব্যতীত বেদের অন্যান্য ভাগের (যথা, উপনিষৎ) প্রামাণ্য নাই। মীমাংসামতে আগম-প্রমাণ বলিতে বেদের এই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগই বুঝায়। বৈদিক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণসমূহে কোথাও সর্ব্বজ্ঞের উল্লেখ দেখা যায় না। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে যে সর্ব্বজ্ঞের কোনও নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না, তাহার কারণও আছে; মন্ত্র ও ব্রাহ্মণসমূহ যাগাদি কর্ম্মের বিধিবিধানের জন্যই প্রকাশিত; বৈদিক যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন করিবার জন্য কোনও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং আগম-প্রমাণ সর্ব্বজ্ঞের প্রতিপাদন করে না এবং বেদের যদি কোথাও সর্ব্বজ্ঞ সম্বন্ধে কোনও উক্তি থাকে, মীমাংসামতে সে উক্তির কোনও প্রামাণ্য নাই। যদি বলা যায়,—বেদ নিত্য আগম; নিত্য আগমে সর্ব্বজ্ঞের উল্লেখ না থাকিলেও অনিত্য আগমে অর্থাৎ বেদ-অতিরিক্ত বহু পুস্তকাদিতে

সর্ব্বজ্ঞের উল্লেখ দেখা যায়; ঐ সমস্ত লৌকিক আগমের সর্ব্বজ্ঞ-বিবরণ অপ্রমাণ হইবে কেন? মীমাংসকগণ এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, অনিত্য লৌকিক আগম হয় সর্ব্বজ্ঞ-প্রণীত, নয় অসর্ব্বজ্ঞ-প্রণীত বলিতে হইবে। যদি বলা হয়, লৌকিক আগম সর্ব্বজ্ঞ-প্রণীত, তাহা হইলে "অন্যোন্যাশ্রয়"-দোষ হয়; কেন না, বলা হইতেছে—সর্ব্বজ্ঞ আছেন, যেহেতু লৌকিক আগমে তাঁহার উল্লেখ আছে এবং লৌকিক আগম প্রমাণ অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য, যেহেতু সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ঐ আগম প্রণয়ন করিয়াছেন। দ্বিতীয় কল্পে অর্থাৎ লৌকিক অনিত্য আগম অসর্ব্বজ্ঞ-প্রণীত হইলে, তাহার প্রামাণ্য সুনিশ্চিত বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না।

মীমাংসাসম্মত অর্থাপত্তি-প্রমাণের স্বরূপ নিম্নলিখিত প্রকার,—দেখা যাইতেছে, দেবদত্ত স্থূলকায়; আরও দেখা যাইতেছে, দেবদত্ত দিবসে ভোজন করে না; অতএব বুঝিতে হইবে, দেবদত্ত রাত্রিকালে ভোজন করে। এই প্রকার প্রমাণের সাহায্যে এইরূপ আপত্তি করা হয়,—দেখা যাইতেছে, বুদ্ধ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন; ইহাও স্বীকার্য্য, তাঁহারা বেদজ্ঞ নহেন; তাহা হইলে তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন কিরূপে? সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, বুদ্ধ প্রভৃতি উপদেষ্টাগণ সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। মীমাংসাচার্য্যগণ এই অর্থাপত্তি-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত আপত্তির উত্তরে বলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইলে যে উপদেষ্টাকে সর্ব্বজ্ঞ হইতে হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। বুদ্ধাদি অবেদজ্ঞগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, সত্য; কিন্তু তাঁহাদের উপদেশের মূলে সর্ব্বজ্ঞতা নাই। অজ্ঞানীর পক্ষেও উপদেশ-দান অসম্ভব নয়। বুদ্ধ-প্রভৃতি উপদেষ্টাগণ অজ্ঞানবশতঃ—"ব্যামোহাদেব কেবলাৎ"—ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। মীমাংসামতের বিরুদ্ধে অর্থাপত্তিমূলক যে দ্বিতীয় প্রকার আপত্তির উত্থাপন হয়, তাহা এইরূপ:—বুদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক উপদেষ্টাগণ হয় ত অজ্ঞানবশতঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন; কিন্তু মনু প্রভৃতি প্রাজ্ঞগণও ত ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন; তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ না হইলে, তাঁহাদের উপদেশ কিরূপে সম্ভবপর হয়? মীমাংসাচার্য্যগণ এ আপত্তির উত্তরে বলেন, মনু প্রভৃতি প্রাজ্ঞগণ অজ্ঞানী নহেন; কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞও নহেন; তাঁহাদের উপদেশের মূলে সর্ব্বজ্ঞতা নাই; তাঁহারা উৎকৃষ্ট বেদবেত্তা ছিলেন এবং এই বেদজ্ঞতাবলেই তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ-দানে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যে স্থলে একটী বস্তু নাই বলিয়া জানা যাইতেছে, তথায় ঐ পদার্থটী নাই, এইরূপ যে প্রতীতি হয়, তাহার নাম অনুপলব্ধি-প্রমাণ। ঘট একটী উপলব্ধির যোগ্য পদার্থ; কোনও স্থলে যখন ঘট দেখা গেল না, তখন আমরা বলি, এখানে ঘট নাই। অনুপলব্ধি-প্রমাণ-বলে অভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়। মীমাংসকগণ বলেন, অসর্ব্বজ্ঞ পুরুষই সর্ব্বত্র দেখা যায়; ইহা হইতে, অসর্ব্বজ্ঞ পুরুষের প্রতিযোগী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কুত্রাপি নাই, ইহাই অনুপলব্ধি-প্রমাণ-বলে প্রতিপন্ন হয়।

সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আছেন, ইহা কোনও প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না।

সর্ব্বজ্ঞ সম্বন্ধে মীমাংসাচার্য্যগণের দ্বিতীয় অভিমত এই যে, কোনও পুরুষের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞতা অসম্ভব। ধর্ম্মাদি পদার্থ ইন্দ্রিয়ের অগোচর; প্রত্যক্ষের দ্বারা ধর্ম্মাদি বস্তু জানা যায় না; অতএব প্রত্যক্ষ দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতালাভ অসম্ভব। ধর্ম্মাদি পদার্থ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হওয়ায় উহাদের সম্বন্ধে হেতু-প্রয়োগও সম্ভব নহে এবং তন্নিমিত্ত ধর্ম্মাদি পদার্থ সম্বন্ধে অনুমানও নিষ্ফল; সে কারণ, অনুমানের দ্বারাও সর্ব্বজ্ঞ পাওয়া যায় না। যদি অনুমানের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা-লাভ সম্ভব হইত, তাহা হইলে সকল মনুষ্যই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিত। এমন আগমও দেখা যায় না, যাহা পাঠ করিলে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করা যায়। বিশেষতঃ, অনুমান ও আগম হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা এতই অস্পষ্ট যে, তাহাকে কোনক্রমেই সর্ব্ব-বস্তু-জ্ঞান বলা যাইতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে:—ইহা কি নিখিল বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান, না কতিপয় প্রধান বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান? যদি সর্ব্বজ্ঞত্ব নিখিলবস্তু-জ্ঞান হয়, তাহা হইলে ইহা কিরূপে উৎপন্ন হয়? যদি বল, ক্রমে ক্রমে বস্তুসকল সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, তাহা হইলে অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান, অনন্ত বস্তুসমূহের সম্বন্ধে জ্ঞান কোনও কালেই সমাপ্ত হওয়া সম্ভবপর না হওয়ায় সর্ব্বজ্ঞতা অসম্ভব হয়। আর যদি বল, নিখিল বস্তুসমূহের জ্ঞান যুগপৎ অর্থাৎ একবারেই উৎপন্ন হয়, তাহাতেও দোষ হয়। বস্তুসমূহ শীত-উষ্ণাদি-ভেদে বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন; পরস্পর-বিরোধী বস্তুসমূহের জ্ঞান যুগপৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। মানুষের মনে রাগ-দ্বেষাদি ভাব বর্ত্তমান; যিনি সর্ব্বজ্ঞ হইবেন, তাঁহাকে অপরের মনের রাগদ্বেষাদিও অনুভব করিতে হইবে; ফলে, সর্ব্বজ্ঞ রাগদ্বেষবান্ পুরুষ হইয়া পড়েন। আর যদি বলা যায় যে, কতিপয় প্রধান পদার্থ জানিলেই সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, তাহাতে এই আপত্তি হয় যে, কোন্ কোন্ পদার্থ প্রধান অর্থাৎ কোন্ কোন্ পদার্থ জানিলে অপর পদার্থ জানিবার আবশ্যকতা থাকে না, ইহা স্থির করিতে হইলে আগে সকল পদার্থের স্বরূপ জানিতে হয় অর্থাৎ প্রথম হইতেই সর্ব্বজ্ঞ হইতে হয়। সর্ব্বজ্ঞ সম্বন্ধে আরও জিজ্ঞাস্য এই, সর্ব্বজ্ঞ কিরূপে অতীত ও ভবিষ্যৎ বস্তু জানিবেন? অতীত ও ভবিষ্যৎ অবর্ত্তমান, সুতরাং অসৎ। অসতের জ্ঞান অপ্রমাণ। যদি বলা যায়, সর্ব্বজ্ঞ অতীত ও অনাগতকে বর্ত্তমানরূপেই গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অতীত ও অনাগত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অগৃহীত হয়। ফলে, সর্ব্বজ্ঞের জ্ঞান সর্ব্বপ্রকারেই অপ্রমাণ হইয়া ওঠে।

বেদ-প্রামাণ্যের একনিষ্ঠ ও দৃঢ়তম সমর্থক মীমাংসাসম্প্রদায় এইরূপে শুধু সর্ব্বজ্ঞ নহে, সৃষ্টিকর্ত্তারও অপলাপ করেন,—ইহা অবিশেষজ্ঞ হিন্দু আস্তিকগণের নিকট আপাততঃ অবিশ্বাস্য হইলেও, সত্য। আগম (Scripture বা Revelation)-এ অচঞ্চল বিশ্বাস রাখিয়া নিরীশ্বর-বাদ-পোষণ,—খ্রীষ্টান, মুসলমান, ইহুদী প্রভৃতি কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায় না, ইহা শুধু ভারতবর্ষীয় মীমাংসাচার্য্যগণের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

২

কিন্তু সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি হইলেও কল্পে কল্পে জগতের প্রলয় ও নূতন সৃষ্টি হয়, ইহা বেদপন্থী সকল দার্শনিকই স্বীকার করেন। সুতরাং সৃষ্টির একটা বিবরণ সকল দর্শনের

মধ্যে পাওয়া যায়। জীব কর্ম্মবশে শুধু অদৃষ্ট-পরিচালিত হইয়াই জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া সংসারে অনাদিকাল হইতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—মীমাংসকগণ কেবল এইটুকু বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। সাংখ্যকার কপিল অসংখ্য স্বয়ম্ভু নিত্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া জগতের মূলে এক বিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতি আছেন, ইহাই বলেন। এই প্রকৃতি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্রী।

"ইতশ্চাস্তি প্রধানম্—বৈশ্বরূপ্যস্যাবিভাগাৎ। বৈশ্বরূপ্যং হি লোকত্রয়মভিধীয়তে। তচ্চ প্রলয়-কালে ক্বচিদবিভাগং গচ্ছতি। উক্তং চ—প্রাক্ পঞ্চভূতানি পঞ্চসু তন্মাত্রেষবিভাগং গচ্ছন্তীতি। অবিভাগো হি নামাবিবেকঃ। যথা ক্ষীরাবস্থায়ামন্যৎ ক্ষীরমন্যদ্দধীতি বিবেকো ন শক্যতে কর্তুং তদ্বৎ প্রলয়কালে ব্যক্তমিদমব্যক্তং চেদমিতি। অতো মন্যামহেঽস্তি প্রধানং যত্র মহদাদ্যবিভাগং গচ্ছতীতি।"—"প্রকৃতেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং জগৎকর্তৃত্বঞ্চ ইতি শঙ্কা"-প্রকরণে প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডঃ।

দুগ্ধ হইতে দধি হয়। দুগ্ধ যখন দুগ্ধ থাকে তখন তাহার মধ্যে দধি অব্যক্ত অবস্থায় থাকে; দধিকে তখন দুগ্ধ হইতে পৃথক্‌ভাবে দেখা যায় না। ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ ভূত, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্বসকল প্রলয়কালে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত থাকে না; তখন তাহাদের কোনই বিভাগ অর্থাৎ পৃথক্ সত্তা বুঝিতে পারা যায় না। প্রলয়কালে ইহারা যাহার মধ্যে অব্যক্ত-ভাবে অবস্থিত হয়, তাহার একত্ব ও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইহারই নাম প্রকৃতি বা প্রধান। এই প্রকৃতিতেই "বৈশ্বরূপ্য" বা লোকত্রয় প্রলয়কালে অব্যক্ত অবস্থায় প্রবিষ্ট ও অবস্থিত হয়। সৃষ্টিকালে এই প্রধান হইতেই বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্বসকল ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জগদ্ব্যাপারে পরিণত হয়। সুতরাং প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী।

সাংখ্যকার এই প্রকৃতিকে অচেতনা বলেন। অচেতনা হইলেও ইনিই বিশ্বসৃষ্টি করেন। এই অচেতন প্রধানের সহিত বর্ত্তমান যুগের Voluntarist দার্শনিকগণের The Unconscious-এর কতকটা সাদৃশ্য আছে।

'According to v. Hartmann......the Unconscious is the absolute principle, active in all things, the force which is operative in the inorganic, organic and mental alike......The Unconscious exists independently of space, time and individual existence, timeless before the being of the world.''—'Unconscious''—Dictionary Of Philosophy And Psychology.

কিন্তু কোনও কোনও সাংখ্যাচার্য্যগণের মত,—প্রকৃতিকে সর্ব্বজ্ঞ বলিলে দোষ হয় না। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্রী, সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞা।

"নিখিলজগৎকর্তৃকত্বাচ্চাস্যা এবাশেষজ্ঞত্বমস্তু।"—"প্রকৃতেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং জগৎকর্তৃত্বঞ্চ ইতি শঙ্কা"-প্রকরণে প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডঃ।

ইহাও লক্ষণীয় যে, সাংখ্যমতে প্রকৃতি ব্যতীত শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ পুরুষসকলও আছেন। এই পুরুষ বা আত্মাগুলিও অনাদি। এই জ্ঞানময় পুরুষের সন্নিধানবশতঃ প্রকৃতি স্বভাবতঃ অচেতন হইলেও তাঁহাতে একটা জ্ঞানের আভাস হয়। প্রকৃতি এই জ্ঞানাভাস পাইয়া বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ব প্রসব করেন। সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্রী প্রকৃতি, পুরুষের ন্যায় শুদ্ধজ্ঞানময়ী না হইলেও, জ্ঞানচ্ছায়াময়ী এবং তজ্জন্য তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞা বলা যাইতে পারে। Voluntarist

দার্শনিকগণের সহিত সাংখ্যাচার্য্যগণের এইখানেই একটা মৌলিক প্রভেদ আছে। Schopenhauer প্রভৃতি Voluntarist দার্শনিকগণের Unconscious Will-এর সন্নিধানে কোনও শুদ্ধজ্ঞানময় পুরুষ থাকে না। সুতরাং Unconscious Will অচেতনভাবেই জগৎসৃষ্টি করে। জগৎসৃষ্টির বহু সহস্র সহস্র বৎসর পরে যখন সহসা চৈতন্যময় জীবের উদ্ভব হয়, তখনও Unconscious Will অচেতনই থাকে; কারণ, Voluntarist মনীষিগণের মতে মানবের চৈতন্য বা জ্ঞান একটা তুচ্ছ অতিরিক্ত ব্যাপার (Excrescence) মাত্র; ইহাতে বিশ্বস্রষ্টা Unconscious Will-এর অচেতনতার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং Voluntarist দার্শনিকগণের অচেতন Will চিরকালই অচেতন থাকে; তাহার সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে কোনও কথাই ওঠে না।

কিন্তু জগৎ সৃষ্টি করিলেও প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বজ্ঞ কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। প্রলয়াবস্থায় ও সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতি অচেতন, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপারে প্রকৃতি জ্ঞানপূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহা স্পষ্টতঃ বলা হয় নাই। নীড় রচনা বিষয়ে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকিলেও পক্ষী নীড় রচনা করে; পক্ষীকে এ বিষয়ে জ্ঞানী বলা যায় না। দুগ্ধ-ধারণ-বিষয়ে গোবৎসের পুষ্টির সম্বন্ধে গাভীর কোনও জ্ঞান না থাকিলেও গাভী দুগ্ধ ধারণ করে; দুগ্ধ-ধারণ-বিষয়ে গাভীকে জ্ঞানবতী বলা যায় না। জগৎ-সৃষ্টির-ব্যাপারে ইহার উদ্দেশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকিলেও প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করিয়া যান। জগৎ সৃষ্টির জন্য প্রকৃতিকে সর্ব্বজ্ঞ বলিবার কারণ নাই। বর্ত্তমান যুগের Voluntarist দার্শনিকগণও জগৎ সৃষ্টির মূলে যে Unconscious Will-তত্ত্ব রহিয়াছে বলেন, সেই তত্ত্ব জ্ঞানপূর্ব্বক যে এই জগৎ রচনা করিয়াছে, তাহা না বলিয়া,—মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে যাহা Instinct অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবণতা, তাহারই সদৃশ একটা অন্ধ-বৃত্তি-বশে ঐ অচেতন Will জগৎ সৃষ্টি করিয়া যাইতেছে, এইরূপই বলেন। জগৎস্রষ্ট্রী হইলেও, প্রকৃতিও সেইরূপ অচেতনা;—অসর্ব্বজ্ঞা তো বটেই।

কিন্তু অচেতনা হইলে কার্য্যে প্রকৃতির প্রেরণা হয় কিরূপে? আবার, অচেতনা হইলেও প্রকৃতি ঠিক যে স্বৈরাচারিণী অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ে যে তিনি কোনও বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করেন না, ইহাও সাংখ্যকার বলেন না। সৃষ্টি-ব্যাপারে জীবের অদৃষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্ব-জন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মও একটী কারণ।

"কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্।"—সাংখ্যসূত্রম্, তন্ত্রার্থসংক্ষেপাধ্যায়ঃ, ৪২

"উপাদানাভেদেঽপি নিমিত্তভেদেন ভেদ ইত্যর্থঃ।"—উক্ত সূত্রে অনিরুদ্ধভট্টকৃতবৃত্তিঃ।

এই জীবকৃত কর্ম্ম বা অদৃষ্টকে উপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি হয় না। বরং সৃষ্টি-বিষয়ে প্রকৃতিকে ইহার উপর পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতি অচেতনা; অসংখ্য জীবের অসংখ্য বিভিন্নপ্রকার অদৃষ্টের সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়া বিবিধ-বৈচিত্র্যময় অথচ সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল বিশ্ব-সৃজন অচেতন-স্বভাব প্রধানে কিরূপে সম্ভব হয়? সাংখ্যাচার্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা "সেশ্বরসাংখ্যবাদী" নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহারা এই স্থলে একজন অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর স্বীকার

করেন। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি অচেতনা; অদৃষ্টের অনুযায়ী বিশ্ব-সৃষ্টি, এমন কি, কোনও প্রকার কার্য্যই তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় না। প্রকৃতি জড়া, অতএব স্বভাবতঃ পরবশা। সুতরাং সৃষ্টিব্যাপারে এমন একজন নিয়ন্তা, অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর স্বীকার করিতে হয়, যিনি অস্বতন্ত্রা, জড়া প্রকৃতিকে অদৃষ্টানুযায়ী বিশ্বসৃজনের পথে চালিত করিতে পারেন।

"ন প্রধানাদেব কেবলাদমী কার্য্যভেদাঃ প্রবর্ত্তন্তে তস্যাচেতনত্বাৎ। ন হ্যচেতনোঽধিষ্ঠায়কমন্তরেণ কার্য্যমারভমাণো দৃষ্টঃ।......তস্মাদীশ্বর এব প্রধানাপেক্ষঃ কার্য্যভেদানাং কর্ত্তা।"—"প্রকৃতেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বকর্তৃত্বঞ্চ ইতি শঙ্কা"-প্রকরণে প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডঃ।

এই পরমেশ্বর সমস্ত অদৃষ্ট সম্বন্ধে জ্ঞানবান্; তদনুসারে কিরূপ সৃষ্টিকার্য্য হওয়া উচিত, তাহা তিনি জানেন এবং সেইরূপ সৃষ্টিকার্য্য সম্বন্ধে প্রকৃতিকে কিরূপ ভাবে পরিচালিত করা উচিত, তাহাও তাঁহার জ্ঞানে পরিস্ফুট। এই অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ।

কিন্তু সাংখ্যাচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেই এই ঈশ্বর-বাদ গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মতে, সূত্রকার কপিল কোথাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন নাই; বরং ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই, এই কথাই তিনি একাধিক সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ন্যায় ও বৈশেষিক দার্শনিকগণের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে দেখা যায়। জীবসমূহের কর্ম্মসম্ভূত অদৃষ্ট তাহাদের সংসারে অনাদি কাল হইতে জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া পরিভ্রমণের কারণ, ইহা ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিকগণের ন্যায় বৈশেষিক ও ন্যায়াচার্য্যগণও স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারা সাংখ্যসম্মত বিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতির অস্তিত্ব বা কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা সাংখ্যাচার্য্যগণের ন্যায় অসংখ্য, নিত্য, স্বয়ংভূ আত্মা মানেন; এবং প্রকৃতির পরিবর্ত্তে জগতের উপাদানভূত অনাদি অনন্ত সংখ্যাতীত ভৌতিক পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

নৈয়ায়িকগণের মতে এক দিকে অসংখ্য ভৌতিক পরমাণু, অপর দিকে অদৃষ্ট-যুক্ত অসংখ্য জীব। প্রশ্ন হয়, কিরূপে ভোগ ও উপভোগের উপযোগী শরীরাদি ও এই বিশ্বের সৃষ্টি হইতে পারে? জীব স্বভাবতঃ জড় ও নিষ্ক্রিয়; সুতরাং তাহার দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য হইতে পারে না। পরমাণুও জড়; সুতরাং তাহাদের দ্বারাও সৃষ্টিকার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করেন, জীবের শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করাইবার জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ভৌতিক পরমাণুর উপাদানে ভোগায়তন শরীরাদি ও ভোগ্য জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্ব-সৃষ্টি-ব্যাপারে পরমেশ্বরের অনন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। যদি কোনও একটী পদার্থ তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অংশের সংযোগে গঠিত দেখা যায়, তাহা হইলে ঐ পদার্থকে "কার্য্য" বলা যায়। একটী প্রাসাদ তদপেক্ষা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রতর অংশের সংযোগে রচিত হয়, সুতরাং প্রাসাদ একটী কার্য্য। কিন্তু অবয়ব বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ হইতে কোনও কার্য্য-পদার্থ গঠন করিতে হইলে, তাহার স্রষ্টা-স্বরূপে একজন বুদ্ধিমান্ রচয়িতা

স্বীকার করিতে হয়,—যিনি আপন বুদ্ধি ও প্রযত্নবলে ঐ বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষুদ্র অংশগুলিকে আপনার উদ্দেশ্য অনুসারে একত্র করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য-পদার্থটীকে গড়িয়া তুলিতে পারেন। একটী প্রাসাদ-রচনার মূলে দেখা যায় যে, ইষ্টকাদি উপাদানসমূহকে আপনার বুদ্ধি ও প্রযত্নবলে যথানিয়মে স্থাপন ও সন্নিবেশাদি করিয়া উহা গড়িয়া তোলে, এমন বুদ্ধিমান্ রচয়িতা আছেই। যাহা কার্য্য, তাহা অবশ্যই বুদ্ধিমানের দ্বারা রচিত; অর্থাৎ কার্য্য-পদার্থমাত্রেরই বুদ্ধিমান্ রচয়িতা স্বীকার করিতে হয়। বিচারপূর্ব্বক দেখিলে দেখা যায় যে, ক্ষিতি প্রভৃতি ভূত, অবয়ব অর্থাৎ সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে জনিত; সুতরাং ক্ষিতি প্রভৃতি "কার্য্য"। তাহা হইলেই প্রশ্ন হয়, এই যে ক্ষিতি প্রভৃতি কার্য্য-পদার্থ, কে ইহাদিগকে গড়িয়া তোলে? ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ বলেন, যখন ক্ষিতি প্রভৃতি কার্য্য-পদার্থ, তখন অবশ্যই এ-সকলের একজন বুদ্ধিমান্ রচয়িতা আছেন।

ক্ষিত্যাদিকং বুদ্ধিমদ্ধেতুকং কার্য্যত্বাৎ। যৎ কার্য্যং তদ্বুদ্ধিমদ্ধেতুকং দৃষ্টম্। যথা ঘটাদি। কার্য্যং চেদং ক্ষিত্যাদিকম্। তস্মাদ্বুদ্ধিমদ্ধেতুকম্। ন চাত্র কার্য্যত্বমসিদ্ধম্। যথা হি। কার্য্যং ক্ষিত্যাদিকং সাবয়বত্বাৎ। যৎ সাবয়বং তৎ কার্য্যং প্রতিপন্নম্। যথা প্রাসাদাদি। সাবয়বং চেদম্। তস্মাৎ কার্য্যম্।"—"ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বসমর্থনম্"-প্রকরণে প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডঃ।

এই বিশ্ব-রচয়িতা, অনন্ত বুদ্ধির অধিকারী পরমেশ্বর। বিশ্ব সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের এই "বুদ্ধিমদ্ধেতুক" বাদের সহিত বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের Teleological Argumentএর কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

"That theistic argument, which proceeds on the principle of finality and which reasons from the rational constitution of the world to the necessity that it should be grounded in a purposive intelligence. It is also called the 'design argument'." —"Teleological Argument"—Dictionary Of Philosophy And Psychology.

নৈয়ায়িক মতে পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। তিনি যে জীবের যেরূপ অদৃষ্ট, তাহাকে তদনুযায়ী ফল ভোগ করাইবার জন্য সেইরূপ শরীরাদি সৃষ্টি করেন।

"যস্য যথাবিধোঽদৃষ্টঃ পুণ্যরূপোঽপুণ্যরূপো—বা তস্য তথাবিধফলোপভোগায় তৎসাপেক্ষস্তথাবিধশরীরাদীন্ সৃজতীতি"।—"ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বসমর্থনম্"-প্রকরণে প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডঃ।

অনন্ত জীবের অনন্তবিধ অদৃষ্ট, অনন্তবিধ কর্ম্মফল, অনন্তবিধ ভোগোপকরণ ও শরীরাদি সৃষ্টি-প্রণালী এবং সৃষ্টির উপাদানসমূহের প্রকৃতি ও যোগ্যতা প্রভৃতি সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারই সেই অনন্ত বুদ্ধির অধিকারী পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞানে অবস্থিত। নতুবা তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব অসম্ভব হয়। এজন্য তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকার করিতে হয়।

"সর্ব্বজ্ঞতা চাস্যাশেষকার্য্যকরণাৎ সিদ্ধা। যো হি যৎ করোতি স তৎসোপাদানাদিকরণকলাপং প্রয়োজনং চাবশ্যং জানাতি"।—"ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বসমর্থনম্"-প্রকরণে প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডঃ।

৪

বেদান্তিসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা মায়াবাদী বা বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী নহেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রস্থানগত যতই কেন ভেদ থাকুক না, ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ, এ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে ঐকমত্য

আছে। জগতের সহিত ব্রহ্মের মৌলিক ভেদ থাকিলেও "দণ্ডধারী ব্যক্তির হস্তস্থ দণ্ডের ন্যায়" জীব ও জড়জগৎ ব্রহ্মের ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়া থাকে, ইহা দ্বৈতবাদী বেদান্তিগণের মত; ঈদৃশ ব্রহ্ম, নৈয়ায়িক-সম্মত ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ, ইহা সহজেই অনুমেয়। সেইরূপ জীবজগৎ ও জড়জগতের "অন্তর্য্যামি"স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে স্পষ্টতঃই স্বীকৃত; এবং ব্রহ্ম "পূর্ণ" এবং জীবাদি তাঁহার "অপূর্ণ অংশ",—এইরূপে ব্রহ্ম ও জীবাদির মধ্যে যাঁহারা ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করেন, সেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণও ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ পোষণ করেন না। এমন কি, ব্যবহার-দৃষ্টিতে শুদ্ধাদ্বৈত-বাদিগণ মায়িক জগতের মূলে যে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কল্পনা করেন, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকৃত হয় এবং তাঁহার সম্বন্ধেও স্পষ্টতঃ বলা হয়—

"এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বেশ্বরত্বসর্ব্বনিয়ন্তৃত্বগুণকং, সদসদব্যক্তমন্তর্য্যামি জগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে।"—বেদান্তসারঃ।

৫

বিশ্বের মূলে সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি ও পুরুষকে মূল তত্ত্বস্বরূপে স্বীকার করিয়াও যোগ-দর্শনকার ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন। এই ঈশ্বর তাঁহার মতে অজ্ঞানাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও আশয় বা সংস্কারের দ্বারা একেবারেই স্পৃষ্ট নহেন। পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার ভোজরাজ বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি ও স্থিতি এবং বিয়োগে প্রলয় হয়; প্রকৃতি ও পুরুষের অতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার না করিলে, প্রকৃতি ও পুরুষের এই সংযোগ ও বিয়োগ অসম্ভব হয়; অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে সংযোগ বা বিয়োগ হইতে পারে না।

"প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ-বিয়োগয়োরীশ্বরেচ্ছাব্যতিরেকেণানুপপত্তেঃ।"

—যোগসূত্রম্, সমাধিপাদঃ, ২৪, ভোজবৃত্তিঃ।

যোগদর্শনের প্রতিপাদিত এই ঈশ্বর পূর্ণরূপে সর্ব্বজ্ঞ। সূত্রকার বলেন,—

"তত্র নিরতিশয়সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্।"—যোগসূত্রম্, সমাধিপাদঃ, ২৫

স্থূল, সূক্ষ্ম, বর্ত্তমান, অতীত, অনাগত, সকল পদার্থ ও সকল ব্যাপারই ঈশ্বরের জ্ঞানে নিত্য প্রতিভাত; তাঁহাতে সকল জ্ঞানই পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত এবং তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে কিছুই নাই।

৬

বেদানুগ দর্শনসমূহের মধ্যে যে সকলে উপরোক্তরূপে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্টিকার্য্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অদৃষ্টের অপেক্ষা আছে, এইরূপ বলিয়া থাকেন; অর্থাৎ জীব-কৃত কর্ম্মের অনুরূপ ফল উপভোগ করাইবার জন্যই ঈশ্বর তদুপযোগী জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ইহাই ঐ সকল দর্শনের মত। কিন্তু বেদপন্থী দার্শনিকগণের মধ্যে এমনও কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের উপরোক্তরূপ অদৃষ্ট-অপেক্ষা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, জীবের কর্ম্ম অনেক সময়েই নিষ্ফল দেখা

যায় ; সুতরাং জীবকৃত কর্ম্মের অনুরূপ ফল ভোগ করাইবার উদ্দেশ্যে যে ঈশ্বর উপযুক্ত বিশ্বসৃষ্টি করেন, এইরূপ বলিবার কোনও কারণ নাই। কথিত হয়, ন্যায়দর্শনকার এই সকল দার্শনিকগণের মতবাদই নিম্নলিখিত সূত্রে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—

"ঈশ্বরঃ কারণম্,—পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ।"—ন্যায়সূত্রম্, ৪।১।১৯

(সৃষ্টিবিষয়ে) ঈশ্বরই (একমাত্র) কারণ ; (তিনি এ বিষয়ে অদৃষ্টের অপেক্ষা করেন না) কারণ, জীবের কর্ম্ম অনেক সময়েই নিষ্ফল দেখা যায়।

কিন্তু সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরকে অদৃষ্ট-নিরপেক্ষ ও প্রকৃতপক্ষে স্বৈরাচার বলিয়া কীর্ত্তন করিলেও, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, এ বিষয়ে উপরোক্ত পাশুপতমতাবলম্বী দার্শনিকগণের কোনও আপত্তি নাই।

সুতরাং বেদপন্থী দর্শনসমূহের মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন ব্যতীত সকলেরই অভিমত এই যে, যাঁহার প্রভাবে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়, তাঁহাকে "প্রধান" অথবা "ঈশ্বর" অথবা "সগুণ-ব্রহ্ম" অথবা "পরমপুরুষ", যাহাই বল না কেন,—তিনিই সর্ব্বজ্ঞ।

৭

বৌদ্ধ আচার্য্যগণ বিশ্বের মূলে কোনও সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর মান্য করেন না। সুতরাং যদি সর্ব্বজ্ঞ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে জীবেই সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভব, ইহা অঙ্গীকার করিতে হয় ; নচেৎ সর্ব্বজ্ঞ কেহই নাই, ইহাই বলিতে হয়। অতএব বৌদ্ধমতে জীব সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে কি না, ইহাই এক্ষণে বিচার্য্য হইতেছে।

সংসারী অ-মুক্ত জীবসমূহ যে সর্ব্বজ্ঞ নহে, ইহা শুধু মীমাংসকগণ নয়, সকল দার্শনিকই স্বীকার করেন ; ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণ যে ইহা আদৌ অস্বীকার করিবেন না, তাহা সহজেই অনুমেয়। মুক্ত জীব, বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় "নির্ব্বাণতা-গত"। বৌদ্ধ-সম্মত নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ লইয়া মনীষিগণের মধ্যে মতভেদ আছে ; কিন্তু নির্ব্বাণ-পদ-প্রাপ্ত জীবের সর্ব্বজ্ঞতাবিষয়ে ঐ মতভেদে কিছু আসে যায় না। কারণ, দীপশিখার নির্ব্বাণের ন্যায় যদি "শূন্য" বা অনস্তিত্বই নির্ব্বাণের অর্থ হয়, তাহা হইলে নির্ব্বাণকালে জীব আর বাঁচিয়া থাকে না ; সুতরাং মুক্ত জীব সর্ব্বজ্ঞ, এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অর্থহীন। আর যদি "অনন্তন্", "অচ্যুতন্", "অসংখাতন্", "অনুত্তরন্", একটা "শরণন্", "পরায়ণন্" বা "অকুথরণ"—স্থিতি,—যাহা "খেমন্," "শিবন্", "সচ্চন্", "কেবলন্", "পদন্" বলিয়া বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে বহু স্থানে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই যদি "নির্ব্বাণ"-এর অর্থ হয়, তাহা হইলে নির্ব্বাণ-পদবী-গত জীব যে অস্তিত্বহীন, তাহা হয় ত নাও হইতে পারে। কিন্তু এতাদৃশ নির্ব্বাণ-গত জীব সম্বন্ধেও সর্ব্বজ্ঞতার কথা ওঠে না। কারণ, সকল বস্তুরই জ্ঞানের মূলে "তন্হা" ; এই "তন্হা" বা বাসনাবশতঃই ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণভঙ্গুর বস্তুবিষয়ক ক্ষণিক জ্ঞান-সকল উদ্ভূত হইতে থাকে ; যখন বাসনা-ক্ষয়ে নির্ব্বাণ-লাভ হয়, তখন এই ক্ষণিকজ্ঞান-"সন্তান"

(series) আর থাকে না। সুতরাং নির্ব্বাণগত জীবে বিশ্ববস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান বা সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভব হয় না।

৮

বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণ-গত জীবে সর্ব্বজ্ঞতা যেরূপ অসম্ভব, ন্যায়দর্শন-সম্মত "অপবর্গ" বা মুক্তির অধিকারী জীবেও সর্ব্বজ্ঞতা সেইরূপ অসম্ভব। গৌতমমতে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান, এই কয়টী আত্মার গুণ বা অসাধারণ ধর্ম্ম; কোনও কোনও দার্শনিক আত্মার জ্ঞানাদি ছয়টী গুণের স্থলে নয়টী গুণের উল্লেখ করেন। সে যাহাই হউক, যখন "অপবর্গ" বা মোক্ষলাভ হয়, তখন আত্মার ঐ সকল গুণের ঐকান্তিক উচ্ছেদ হয়, ইহাই ন্যায়দর্শনের মত।

"তদেবং ধিষণাদীনাং নবানামপি মূলতঃ।
গুণানামাত্মনো ধ্বংসঃ সোঽপবর্গঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

—প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কারে ৭।৫৭ সূত্রে রত্নাকরাবতারিকা।

সুতরাং অপবর্গ-গত জীবে অন্যান্য আত্মগুণের ন্যায় জ্ঞানও বর্ত্তমান থাকে না। অতএব মহর্ষি গৌতম জীবের পক্ষে মুক্তির অবস্থা যে অনেকটা প্রস্তরবৎ জড়-অচেতন অবস্থার সদৃশ বলিয়াই মনে করেন,—

"—মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্" —নৈষধীয়-চরিতম্, ১৭।৭৫

এরূপ ধারণা করিলে বিশেষ ভুল হয় না। বৈশেষিক দার্শনিকগণের মতেও জ্ঞানাদি সমস্ত আত্মগুণ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইলে আত্মা যখন শুধু আকাশের ন্যায় অবস্থিত হয়, তখনই তাহার মুক্তাবস্থা।

"অত্যন্তনাশে গুণসংগতের্যা
স্থিতির্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে।
মুক্তিঃ" —সংক্ষেপশঙ্করজয়ঃ, ১৬।৬৯

মুক্ত অবস্থায় আত্মা অচেতন; সুতরাং মুক্ত জীব সর্ব্বজ্ঞ নহেন, ইহাই ন্যায় ও কাণাদ মত বলিয়া বুঝিতে হইবে। অবশ্য মুক্ত অবস্থায় আত্মার একটা "নিত্য-সুখের" অনুভূতি থাকে, ইহা কোনও কোনও নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত হইলেও তৎকালে আত্মার জগৎসম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকায়, মুক্ত আত্মা যে সর্ব্বজ্ঞ নহেন, ইহা সকল নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ই স্বীকার করেন।

৯

শুদ্ধাদ্বৈত-বেদান্ত-মতে আত্মার বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। যদি ব্যবহার-দৃষ্টিতে বদ্ধ আত্মার মুক্তি কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও মুক্ত আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, মুক্ত আত্মা স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত; অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ মুক্ত আত্মার নিজের মধ্যে ("স্ব-গত") কোনও ভেদ নাই; অদ্বৈত আত্মার সদৃশ বা বিসদৃশ অপর কিছুই

না থাকায় মুক্ত আত্মার "সজাতীয়" বা "বিজাতীয়" কোন প্রকারই ভেদ থাকিতে পারে না। সুতরাং মুক্ত আত্মাকে "জ্ঞানী" না বলিয়া "জ্ঞান-ই" বলিতে হয়। তাঁহার নিকট তাঁহার অতিরিক্ত কিছুই নাই।

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—শ্রুতিঃ।

আত্মার তথাকথিত বদ্ধ অবস্থায় অবিদ্যাবশতঃ জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান হইতে পারে—

'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি"—শ্রুতিঃ

কিন্তু আত্মার মুক্তাবস্থায় আত্মা ব্যতীত আর কিছুই না থাকায় অপর কিছুরই উপলব্ধি হইতে পারে না—

"যত্র তস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ"—শ্রুতিঃ।

সুতরাং মুক্ত আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব শুদ্ধাদ্বৈতবেদান্তমতে অসম্ভব।

১০

সাংখ্য ও যোগদর্শনকারের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে বিশ্বের সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃতি যতক্ষণ কোনও পুরুষের সন্নিধানে থাকেন, ততক্ষণ পুরুষের বদ্ধাবস্থা কল্পিত হয়। কিন্তু পুরুষ অসঙ্গ; তাঁহার সহিত প্রকৃতির প্রকৃত সংসর্গ হইতে পারে না; অবিবেকবশতঃই নিঃসঙ্গ পুরুষ প্রকৃতিকর্ত্তৃক উপরক্ত বলিয়া কথিত হয়েন।

"নিঃসঙ্গেঽপ্যুপরাগোঽবিবেকাৎ"

—সাংখ্যসূত্রম্, তন্ত্রার্থসংক্ষেপাধ্যায়ঃ, ২৮

রক্তজবা স্ফটিকের সন্নিধানে রক্ষিত হইলে ঐ স্ফটিকে যে ছায়া পড়ে, তাহা দ্বারা যেরূপ স্ফটিকের স্বভাবের কোনও প্রকার বিকার হয় না, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের সন্নিধানে আসিলে অসঙ্গ পুরুষের প্রকৃত ভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না।

"জপাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্ত্বভিমানঃ"

—সাংখ্যসূত্রম্, তন্ত্রার্থসংক্ষেপাধ্যায়ঃ, ২৯

অবিবেকবশতঃই প্রকৃতির সংসর্গে পুরুষের বদ্ধাবস্থা ও প্রকৃতির বিয়োগে পুরুষের মুক্তাবস্থা কল্পিত হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি ও প্রকৃতির প্রসূত বিষয়সমূহের সহিত পুরুষের কোনই সম্বন্ধ নাই,—পুরুষের মোক্ষাবস্থায় ত কোন সম্বন্ধ কল্পনা পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে না। সুতরাং সাংখ্য ও যোগদর্শনের মতে মুক্ত পুরুষকে বিশ্ববস্তুর জ্ঞাতা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না।

অতএব দেখা যায়, বৌদ্ধদর্শন ও বেদসম্মত দর্শনসমূহের মতে সংসারের বদ্ধ জীব ত সর্ব্বজ্ঞ নহেই,—পরিনির্ব্বাণগত ও বিদেহমুক্ত জীবকেও সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না।

১১

সংসারী জীব ও মুক্ত জীব, উভয়ের কেহই সর্ব্বজ্ঞ না হইলেও মুক্তিপথের পথিক সাধনাবস্থায় মুক্তির অব্যবহিত প্রাক্‌কালে একপ্রকার জ্ঞানের অধিকারী হয়েন, যাহাকে

সর্ব্বজ্ঞতা বলা যাইতে পারে। যোগদর্শনকার ইহাকে "প্রাতিভ" জ্ঞান বলেন এবং এইরূপ প্রাতিভ-জ্ঞান যে সাংখ্যদর্শনের মতেও সম্ভবপর, তাহা বলা বাহুল্য। পতঞ্জলির মতে প্রাতিভ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সকল বিষয়েরই জ্ঞান হয়।

"প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্"—যোগসূত্রম্, বিভূতিপাদঃ, ৩৪

যোগদর্শনের টীকাকার ভোজরাজ বলেন,

"যথোদেষ্যতি সবিতরি পূর্ব্বং প্রভা প্রাদুর্ভবতি
তদ্বদ্বিবেকখ্যাতেঃ পূর্ব্বং তারকং সর্ব্ববিষয়ং জ্ঞানমাবির্ভবতি "

—উক্ত সূত্রে ভোজবৃত্তিঃ

যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আকাশে একটা প্রভা পূর্ব্ব হইতে দেখা যায়, সেইরূপ (মুক্তিসম্বন্ধি) "বিবেকখ্যাতি"-র পূর্ব্বে "তারক"-নাম জ্ঞান আবির্ভূত হয়; এই তারক-জ্ঞানবলে সকল বিষয়ই অবগত হওয়া যায়। তারক-জ্ঞানের অপর নাম প্রাতিভ।

১২

নৈয়ায়িক আচার্য্যগণের মতে জ্ঞানের যাহা করণ, তাহা যুগপৎ অর্থাৎ একবারে একের অধিক বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না; সেই জন্য যুগপৎ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান তাঁহাদের মতে অসম্ভব। কিন্তু তাঁহারাও স্বীকার করেন যে, যোগিগণের নিকট সকল পদার্থের স্মৃতি বা জ্ঞানের কারণ যুগপৎ উপস্থিত হইতে পারে; তখন যোগিগণ ঐ পদার্থ-"সমূহ" সম্বন্ধে যে যুগপৎ-সমুত্থিত জ্ঞানের অধিকারী হয়েন, তাহার নাম "সমূহালম্বন"। এই সমূহালম্বন জ্ঞান প্রাতিভ জ্ঞান এবং ইহা সর্ব্বজ্ঞতার নামান্তর। বৈশেষিক আচার্য্যগণ এই সর্ব্ববিষয়ক যে প্রাতিভ জ্ঞান, ইহাকে "আর্ষজ্ঞান" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

১৩

মুক্ত ও বদ্ধ, উভয়বিধ জীবই শুদ্ধাদ্বৈতপক্ষে সর্ব্বজ্ঞত্বের অনধিকারী হইলেও, সর্ব্বজ্ঞতা যে উচ্চস্তরের জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব, তাহা আচার্য্য শঙ্করের প্রতি প্রযুক্ত উক্তি হইতেই বুঝা যায়। কথিত হয়, শঙ্করাচার্য্যের পরিভ্রমণকালে, জনৈক নৈয়ায়িক তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কণাদ-সম্মত মোক্ষ ও গোতম-সম্মত মোক্ষে প্রভেদ কি? ঐ নৈয়ায়িক অত্যন্ত গর্ব্বিত ছিলেন; গর্ব্বভরে তিনি আচার্য্য শঙ্করকে ঐ প্রশ্ন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"...বদ সর্ব্ববিচ্চেৎ নোচেৎ প্রতিজ্ঞাং ত্যজ সর্ব্ববিত্বে"

—সংক্ষেপশঙ্করজয়ঃ, ১৬।৬৮

যদি তুমি সর্ব্ববিৎ হও, তাহা হইলে ঐ প্রশ্নের উত্তর দাও; যদি প্রশ্নের উত্তর না দিতে পার, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞত্ব বিষয়ে প্রতিজ্ঞা ত্যাগ কর।

উপরোক্ত সম্ভাষণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সর্ব্বজ্ঞত্ব বিশুদ্ধাদ্বৈত-বেদান্তের অসম্মত

নহে। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বঞ্চ" প্রভৃতি মুক্ত আত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপে

"ন চৈতন্যবৎ স্বরূপত্বসম্ভবঃ"—৪।৪।৬ বেদান্তসূত্রভাষ্যে শঙ্করঃ।

কিন্তু সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য যে সগুণ আত্মায় অবস্থাবিশেষে প্রযোজ্য, তাহা তিনি স্বীকার করেন,—

"বিদ্যমানমেবেদং সগুণাবস্থায়ামৈশ্বর্য্যং ভূমবিদ্যাস্তুতয়ে সঙ্কীর্ত্ততে—"

—৪।৪।১১ বেদান্তসূত্রভাষ্যে শঙ্করঃ।

অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় তাঁহার সাযুজ্যাদিলাভে জীব সর্ব্বজ্ঞতাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার মত—

"সগুণবিদ্যাবিপাকস্থানন্ত্বেতৎ"—৪।৪।১৬ বেদান্তসূত্রভাষ্যে শঙ্করঃ।

১৪

"সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধঃ ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ"

পরিনির্ব্বাণে ও সংসারাবস্থায় সর্ব্বজ্ঞত্ব অসম্ভব হইলেও বুদ্ধের উপরোক্ত নামাবলির মধ্যে "সর্ব্বজ্ঞ" নামের উল্লেখে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বৌদ্ধ মতে জীবের পক্ষে অবস্থাবিশেষে সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকৃত। ইন্দ্রিয়জনিত বা অনুমানজনিত জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ যে অসম্ভব, তাহা অবশ্য বৌদ্ধাচার্য্যগণ স্বীকার করেন; কারণ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ও অনুমানের দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা অতি স্বল্প-পরিসর ও অস্পষ্ট; বস্তু সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট জ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞাতার সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধি হইয়াছে, ইহা কোনও ক্রমেই বলা যায় না। বিশ্ব-বস্তু সম্বন্ধে এই যে স্পষ্টতম ও সম্পূর্ণ জ্ঞান, ইহাকে বৌদ্ধাচার্য্যগণ "স্ফুটাভ" বলিয়া থাকেন। এই স্ফুটাভ-জ্ঞান তাঁহাদের মতে "যোগি-প্রত্যক্ষ"-লব্ধ। তাঁহারা বলেন, প্রমাণের দ্বারা যে অর্থসম্বন্ধে জ্ঞান হয়, তাহাকে "ভূতার্থ" বলে এবং এই ভূতার্থকে মনে মনে পুনঃ পুনঃ বিনিবেশ করার নাম "ভূতার্থ-ভাবনা"। ভূতার্থ-ভাবনার ফলে ঐ অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান স্পষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু ভাবনা যতই প্রকৃষ্ট হউক না কেন, "ভাবনা-প্রকর্ষে"র দ্বারা বিশ্ব-বস্তু সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ও স্পষ্টতম জ্ঞান হইতে পারে না। ভাবনা-প্রকর্ষের যে শেষ সীমা, বৌদ্ধগণ তাহাকে "ভাবনা-প্রকর্ষ-পর্য্যন্ত" বলেন। এই ভাবনা-প্রকর্ষ-পর্য্যন্ত হইতে যোগিগণের হৃদয়ে বিশ্ববস্তু সম্বন্ধে যে একটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই "যোগি-প্রত্যক্ষ।"

"ভূতার্থভাবনাপ্রকর্ষান্তজং যোগিজ্ঞানং চেতি"—ন্যায়বিন্দুঃ, ১ম পরিচ্ছেদঃ।

ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, মানস-প্রত্যক্ষ ও স্বসংবেদন, এই ত্রিবিধ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের দ্বারা অথবা অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা কখনই সর্ব্বজ্ঞত্ব হইতে পারে না; কারণ, উহা অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। এমন কি, ভূতার্থ-ভাবনা-প্রকর্ষপর্য্যন্ত জ্ঞানও পরিপূর্ণ ও স্পষ্টতম নহে। কোনও বস্তুকে অভ্রের মধ্য দিয়া দেখিলে, তাহার সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, এই জ্ঞান তাহার সদৃশ।

"অভ্রকব্যবহিতমিব যদা ভাব্যমানং বস্তু পশ্যতি সা প্রকর্ষপর্য্যন্তাবস্থা।"—ন্যায়বিন্দুটীকা।

যোগি-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বস্তু করস্থিত আমলকের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে ও স্পষ্টতমরূপে প্রতিভাত হয়।

করতলামলকবদ্ভাব্যমানস্যার্থস্য যদ্দর্শনং তদ্যোগিনঃ
প্রত্যক্ষম্। তদ্ধি স্ফুটাভম্।"—ন্যায়বিন্দুটীকা।

এই অনন্যসাধারণ যোগিপ্রত্যক্ষের ফলেই বুদ্ধের নিকট বিশ্ববস্তু "করতলামলকবৎ" প্রতিভাসিত ছিল এবং ইহারই প্রসাদে তাঁহার ও তৎসদৃশ সিদ্ধগণের সর্ব্বজ্ঞতা-সিদ্ধি হইয়াছিল।

১৫

মুক্তি বা নির্ব্বাণের পূর্ব্বে উপরোক্ত প্রকারে সর্ব্বজ্ঞতালাভ সাধকের পক্ষে সম্ভব হইলেও, মুক্ত বা পরিনির্ব্বাণ-পদবী-গত সিদ্ধ পুরুষ যে সর্ব্বজ্ঞ নহেন, ইহা সাংখ্য ও যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক, শুদ্ধ-অদ্বৈত-বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের সম্মত, তাহা পূর্ব্বে একাধিক বার বলা হইয়াছে। তবে বেদান্তি-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা জীব ও ব্রহ্মের একান্ত ঐক্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন; তাঁহাদের মতে মুক্ত জীব সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। দ্বৈত বেদান্তিগণের এরূপ সিদ্ধান্ত সহজেই অনুমেয়। তাঁহারা সগুণ-ব্রহ্ম ব্যতীত নির্গুণ-ব্রহ্ম স্বীকার করেন না। নির্গুণ ব্রহ্মে লীন যে পরিমুক্ত জীব, তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতার আরোপ করা চলে না, ইহাই বিশুদ্ধাদ্বৈত মত; কিন্তু যে সাধক সাধনাবলে সগুণ-ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করেন, তাঁহার যে সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধি হয়, ইহা বিশুদ্ধাদ্বৈত বেদান্তীরও অনভিপ্রেত নহে। ব্রহ্ম সগুণ; এই সগুণ-ব্রহ্ম ব্যতীত নির্গুণ-ব্রহ্ম সত্য নহে; সাধনাবলে জীব যখন সগুণ-ব্রহ্মের সাযুজ্যাদি লাভ করেন, তখনই তাঁহার মুক্তি হয় এবং ঈদৃশ মুক্ত জীব ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন, ইহাই শুদ্ধাদ্বৈত ব্যতীত অন্যান্য বেদান্তিসম্প্রদায়ের অভিমত।

উপরোক্ত বেদান্তিসম্প্রদায়ের মতে মুক্ত জীবে সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভব হইলেও, মুক্ত জীবের সর্ব্বজ্ঞতা যে ন্যায়-কাণাদ-সেশ্বরসাংখ্য-যোগ-বেদান্ত-সম্মত পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা হইতে কিছু বিভিন্ন প্রকারের, ইহাই যেন মনে হয়। পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা নিত্য, অসীম-প্রসারি। জীব স্বভাবতঃ বিশেষগ্রাহী; মুক্ত হইলেও তাহার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় না; সুতরাং মুক্ত জীবে যে অনাদি-অনন্ত-দেশ-কাল-প্রসারি সর্ব্বজ্ঞতা নিত্য প্রতিভাত থাকে, ইহা বোধ হয়, বলা সঙ্গত হয় না। জীব ঈশ্বরসন্নিধি লাভ করিয়া মুক্ত হইলেও ব্রহ্মের তুলনায় তাহার কিছু কিছু অসামর্থ্য থাকে। "জগদ্ব্যাপার" অর্থাৎ জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে মুক্ত জীবের কোনও সামর্থ্য নাই। মুক্ত জীবের বহু ঐশ্বর্য্য-লাভের বর্ণনা আছে বটে; তিনি সর্ব্বস্থানেই যাইতে পারেন।

"সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৭।২৫।।২

কিন্তু তাঁহার এই অব্যাহত গতি যে তাঁহার সঙ্কল্প-সাপেক্ষ, তাহা "কাম"-শব্দ হইতেই বুঝা যায়। বিশ্বের অতীত-বর্ত্তমান-দূর-সূক্ষ্ম-অনাগতাদি বস্তু বা ব্যাপারসমূহ যে মুক্ত

জীবের নিকট নিত্য-প্রতিভাত, তাহা নহে; তিনি ইচ্ছা করিলে, ঐ সমস্তই আয়ত্ত করিতে পারেন, ইহাই মুক্তাত্মার ঐশ্বর্য্য। উদাহরণস্বরূপে বলা যাইতে পারে,—পিতৃগণ যে মুক্ত জীবের নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন, তাহা নহে; তবে তিনি যখন তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রেই পিতৃগণ তখনই তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন।

"স যদা পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য
পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।২।১

বিশ্বের সমস্ত বস্তু ব্যাপারাদি মুক্ত জীবের জ্ঞানে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, এরূপ নহে; তিনি ইচ্ছা করিলে যাহা জানিতে চাহেন, তাহাই জানিতে পারেন,—ইহাই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা। পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা কিন্তু এরূপ নহে। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা নিত্য; বিশ্বের তাবৎ বস্তু ও ব্যাপার, তাঁহার জ্ঞানে সর্ব্বদা অবস্থিত। মুক্ত জীব সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, এরূপ নিত্য-সর্ব্বজ্ঞতার অধিকারী নহে, ইহাই দ্বৈত-দ্বৈতাদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী বেদান্তিগণের অভিপ্রেত। এইরূপ সর্ব্বজ্ঞতা শুদ্ধাদ্বৈত-বেদান্তে সগুণ-ব্রহ্মের সিদ্ধ উপাসককে অর্পিত হইয়াছে এবং বোধ করি, এই প্রকার এবং ইহার অনতিরিক্ত সর্ব্বজ্ঞতাই অমুক্ত জীবের লভ্য বলিয়া ন্যায়দর্শনে "সমূহালম্বন", কণাদমতে "আর্ষজ্ঞান," সাংখ্য ও যোগদর্শনে "প্রাতিভ" এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে "যোগি-প্রত্যক্ষ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

১৬

সংসারী জীব সর্ব্বজ্ঞ নহে, এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ সিদ্ধান্ত অন্যান্য দর্শনের ন্যায় জৈন দর্শনেও স্বীকৃত। স্ব-স্ব-কৃত কর্ম্মের প্রভাবে জীবগণ অনাদি কাল হইতে জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং এ-জগতের কোনও রচয়িতা বা জীবের নিয়ামক নাই,—কর্ম্মফলের নিরঙ্কুশ-প্রভাব-স্বীকার ও সৃষ্টিকর্তৃ-বা-নিয়ন্তৃ-অস্বীকার, এই দুই বিষয়ে বেদনিষ্ঠ মীমাংসা-সম্প্রদায় ও বেদ-বিরোধী জৈন দার্শনিকগণের মধ্যে একটা বিস্ময়কর ঐকমত্য দেখা যায়। কিন্তু জগৎস্রষ্টার অপলাপ করিলেও জৈনগণ মীমাংসকগণের ন্যায় আপনাদিগকে নিরীশ্বরবাদী বলিতে ইচ্ছুক নহেন। বেদ-পন্থী সেশ্বর দর্শনসমূহে সৃষ্টিকর্তৃত্ব ব্যতীত ঈশ্বরের আর একটী বিষয়ে কর্তৃত্ব বর্ণিত হইয়া থাকে। বেদ ধর্ম্মযোনি এবং ঈশ্বর বেদের কর্ত্তা বা প্রকাশক; সুতরাং তিনি ধর্ম্মদ্রষ্টা ও আদিমতম গুরু বা উপদেষ্টা। ব্রহ্মের "সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চেতি" প্রতিপাদন করিতে আচার্য্য শঙ্কর,

"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদঃ
—১।১।৩ বেদান্তসূত্রে শাঙ্করভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রুতিঃ।

এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলেন, ঋগ্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ সেই মহাভূত অর্থাৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় বাহির হইয়াছে। বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিতে ন্যায়সূত্রকার বলিয়াছেন,—

"তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ"—ন্যায়সূত্রম্, ২।১।৬৮

বেদের প্রামাণ্য আপ্তের প্রামাণ্য হইতেই প্রতিপন্ন হয়। এ স্থলে 'আপ্ত'-শব্দের অর্থ বেদবক্তা ঈশ্বর, যিনি "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা" অর্থাৎ সমস্ত তত্ত্বই যাঁহার জ্ঞানে প্রতিভাত এবং যিনি "যথাদৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা" অর্থাৎ যথার্থরূপে যিনি তাঁহার জ্ঞাত বিষয়ে উপদেশ করেন। ঠিক এই ভাবেই মহর্ষি কণাদ ঈশ্বরের বেদকর্তৃত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন,—

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"—বৈশেষিকসূত্রম্, ১।১।৩

আম্নায় অর্থাৎ বেদ ঈশ্বরের বচন; ঈশ্বরের বচন বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের এই উপদেষ্টৃত্ব লক্ষ্য করিয়া যোগসূত্রকার বলিয়াছেন—

"স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"

—যোগসূত্রম্, সমাধিপাদঃ, ২৬

সেই অনাদি পরমেশ্বর ব্রহ্মাদি পূর্ব্বাচার্য্যগণেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা।

সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও, জৈনাচার্য্যগণও এমন পুরুষপ্রবর স্বীকার করেন, যিনি শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা; তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং তাঁহার উপদেশে ধর্ম্মাদি সকল তত্ত্বের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুরুষশ্রেষ্ঠই তীর্থঙ্কর এবং জৈনগণ তীর্থঙ্করকে ঈশ্বর আখ্যা প্রদান করেন। তীর্থঙ্করের উপদেশ ঋক্-যজুঃ-সাম-অথর্ব্ব না হইলেও তত্ত্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ এবং জৈনগণ তীর্থঙ্কররূপী ঈশ্বরের বচনাবলিকে জৈন-বেদ অভিধা প্রদান করেন; তাঁহাদের মতে জৈন-বেদই ঈশ্বরের অবিতথ উপদেশ এবং ইহাই প্রকৃত বেদ। সুতরাং জৈনদর্শন বেদকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অপলাপ করেন না, ইহাই তাঁহারা বলিতে চাহেন। তবে জৈনাচার্য্যগণের সম্মত ঈশ্বর ও বেদপন্থী দার্শনিকগণের স্বীকৃত ঈশ্বরে মৌলিক প্রভেদ আছে। জৈনের সম্মত ঈশ্বর জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন; তিনি মর্ত্ত্য মানব, অনুত্তম সাধনাবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া উপদেষ্টৃত্ব-রূপ ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েন; তীর্থঙ্করপদবাচ্য ঈশ্বরগণ সংখ্যাতেও একাধিক। পক্ষান্তরে বৈদিক ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনি অনাদি-অনন্তকাল ধরিয়াই এক এবং অদ্বিতীয়, নিত্যমুক্ত, পরমগুরু, পরমেশ্বর।

তীর্থঙ্কর বা অর্হৎ জৈনদর্শনে ঈশ্বরপদবাচ্য। তিনি মুক্ত পুরুষ। ঈদৃশ ধর্ম্মোপদেষ্টা ঈশ্বর স্বীকার করিয়া জৈনগণ মীমাংসাসম্প্রদায় হইতে যেরূপ বিভিন্ন মত পরিপোষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ জীবের মুক্তি সম্বন্ধেও জৈনগণ মীমাংসকগণের সহিত স্পষ্টই বিভিন্ন মত পোষণ করেন। মীমাংসাচার্য্যগণের মতে সদাচারী জীব স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিতে পারে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ মুক্তি নাই; জীবের সংসারগতি মীমাংসামতে শুধু অনাদি নহে, অনন্তও বটে। কিন্তু জৈনগণের মতে একান্ত অভব্য জীব ব্যতীত সকল জীবই মুক্তি লাভ করিতে পারে। মুক্ত জীব কেবল-জ্ঞানের অধিকারী। এই কেবল-জ্ঞান সর্ব্বজ্ঞতারই নামান্তর। সুতরাং মুক্ত জীব সর্ব্বজ্ঞ, ইহাই জৈনমত। এই বিষয়ে এবং সর্ব্বজ্ঞতার প্রকৃতি সম্বন্ধে জৈন দর্শনের সহিত অন্যান্য দর্শনের একটা মতানৈক্য আছে বলিয়াই বোধ হয়। মুক্ত জীবে সর্ব্বজ্ঞতা ভারতবর্ষীয় অপর কোনও দর্শনেই স্বীকৃত হয় নাই, বৌদ্ধ-

দর্শনেও নহে। শুদ্ধাদ্বৈত ব্যতীত বেদান্তের কোনও কোনও সম্প্রদায়ে মুক্ত জীবে সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকৃত হইয়াছে বটে এবং যোগাদি দর্শনে মুক্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞতার উদয় হয়, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু জীবের এই সর্ব্বজ্ঞতা কতকটা সীমাবদ্ধ, ইহাই যেন মনে হয়। পরন্তু মুক্ত জীবে জৈনগণ যে সর্ব্বজ্ঞতার বর্ণনা করেন, তাহা সম্পূর্ণ, অবাধ ও অসীম।

জৈনগণের মতে জীব স্বভাবতঃ সর্ব্বজ্ঞ। স্বচ্ছ ও নির্ম্মল সলিল যেমন পঙ্কসংমিশ্রণে মলিন হইয়া পড়ে, স্বভাবতঃ সর্ব্বজ্ঞ জীবও সংসারী অবস্থায় সেইরূপ কর্ম্মমলীমসায় অসর্ব্বজ্ঞ ও বদ্ধরূপে সংসারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। মলিন জলের পঙ্ক অপসৃত হইলে সেই জল যেরূপ আপনার স্বচ্ছস্বভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সংসারী বদ্ধ জীবও সাধনাবলে যে দিন কর্ম্ম-সংস্পর্শ দূর করিতে পারে, সে দিন সে আপনার শুদ্ধ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই জীবের মুক্তাবস্থা। এই মুক্তাবস্থায় তাহার স্বাভাবিক বিশুদ্ধ জ্ঞানের পক্ষে কর্ম্মজনিত কোনও প্রকার আবরণ থাকে না। তজ্জন্য এই মোক্ষ—

"সমস্তাবরণক্ষয়াপেক্ষম্"—প্রমাণ-নয়-তত্ত্বালোকালঙ্কারঃ, ২।২৩

বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যখন আত্মা হইতে কর্ম্মজনিত সমস্ত আবরণ নিঃশেষে অপসৃত হইয়া যায়, তখন জীবে কেবল-জ্ঞান উদিত হয়। এই কেবল-জ্ঞান সর্ব্বজ্ঞতা এবং এই সর্ব্বজ্ঞতা আদৌ সাপেক্ষ বা সসীম নহে—

"নিখিলদ্রব্যপর্য্যায়সাক্ষাৎকারিস্বরূপং কেবলজ্ঞানম্"

—প্রমাণ-নয়-তত্ত্বালোকালঙ্কারঃ, ২।২৩

বিশ্বের অতীত, বর্ত্তমান, অনাগত যত বস্তু আছে এবং তাহাদের অনন্ত অনন্ত যে সমস্ত গুণ এবং বিবর্ত্ত ও পরিণাম-গত যত অসংখ্য অসংখ্য তাহাদের বিভেদ আছে, সে সমস্তই কেবল-জ্ঞানের প্রভাবে মুক্ত জীবের নিকট প্রকাশিত ও পরিস্ফুট হয়। জৈনসম্মত এই সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বতোভাবে নিরঙ্কুশ, বাধাহীন এবং সীমাহীন। বোধ হয়, জীবের পক্ষে এতাদৃশ একান্ত অপ্রতিহত সর্ব্বজ্ঞতা অন্য কোন দর্শনে স্বীকৃত হয় নাই।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৬

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-শ্রেণী

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার

১ জানুয়ারি ১৮২৪ তারিখে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ হয়। এই সময় সাহিত্য-শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন—স্বনামধন্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।

জয়গোপালের নিবাস নদীয়া (বর্ত্তমানে যশোহর) জেলার অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে* প্রকাশ, সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, জয়গোপাল প্রথমে তিন বৎসরকাল কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন, তৎপরে ১৮০৫ সন হইতে ১৮২৩ সন পর্য্যন্ত—১৮ বৎসর পাদরি কেরীর অধীনে শ্রীরামপুরে চাকরি করেন। শ্রীরামপুরে অবস্থানকালে তিনি কিছু দিন মিশন-স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাহার পর জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮ সনের ২৩এ মে বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইলে, তিনি প্রথমাবধি ১৮২৩ সন পর্য্যন্ত ইহার সম্পাদকীয় বিভাগের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ২ জুলাই ১৮৩৬ তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক লেখেন :—"শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার…কবিবর পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশ বৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন।"

জয়গোপাল দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত সংস্কৃত কলেজে কাব্য বা সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন ৬০৲ হইতে বাড়িয়া ৯০৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় জয়গোপাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> বিদ্যাসাগর…যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্য্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি অতি সুরসিক, সুলেখক, ভাবগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু পড়া শুনা বড় একটা তাঁহার কাছে কিছু হইত না। শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন; ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেক ব্যাখ্যা হইতে না হইতেই তাঁহার 'ভাব লাগিয়া' গেল, গলার স্বর গদগদ হইয়া উঠিল, 'আহা, হা, দেখ দেখি, কেমন লিখেছে।' এই বলিয়া তিনি কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল; সেদিনকার মত পড়া এই স্থানেই

---

* Annual Return . . . dated 1 May 1845. ইহাতে জয়গোপালের বয়ঃক্রম "৭৩ বৎসর" বলিয়া উল্লিখিত আছে।

সমাপ্ত হইল। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল;...জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দুইটি কবিতা আমার মুখস্থ আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিতেছেন,—

ত্বৎকীর্ত্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য
রোহিণ্যপি স্বপতিসংশয়জাতশঙ্কা।
শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্রনৃপ কজ্জললাঞ্ছনেন
প্রেয়াংসমঙ্কয়দসৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ॥

হে কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ! তোমার কীর্ত্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হইয়াছে; ইহা দেখিয়া চন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হইল যে, পাছে তাঁহার স্বামীকে তিনি চিনিতে না পারেন; এই ভাবিয়া তিনি আপনার স্বামীর গায়ে একটি দাগ দিলেন, তাহাই আমরা চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকি।

দ্বিতীয় শ্লোকটি রচিত হয়, যখন মেকলে প্রভৃতি য়ুরোপীয়েরা সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কলেজের মুরুব্বি হরেস্ হেম্যান উইলসন তৎকালে বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছিল,—

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংপ্রতি পুনর্ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্তান্ যদি পাসি পালক তদা কীর্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি॥

এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবরতুল্য; ইহাতে যে সকল বিদ্বান্ লোককে আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া আশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হংসের তুল্য। এক্ষণে সেই সরোবরের নিকটে কয়েকজন ব্যাধ আসিয়া সেই হংসবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই ব্যাধের হস্ত হইতে আপনি যদি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে।

সুকবি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাশীরামদাসের মহাভারত edit করিয়া কিন্তু অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ ২২৩-২৫।

জয়গোপাল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা বা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল:—

(১) **শ্রীবিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণবিষয়কশ্লোকাঃ**। ইং ১৮১৭। পৃ. ৫২।

ইহাতে ১০৯টি শ্লোক ও পয়ারে তাহার বঙ্গানুবাদ আছে। পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রণকাল এইরূপ দেওয়া আছে:—"কলিকাতাতে ছাপা হইল॥ ১২২৪"। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় জয়গোপাল তাঁহার পরিচয় এই ভাবে দিয়াছেন:—

চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি ভূমিপতি ভূমিসুরপতি।
তার রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম। সমাজপূজিতগ্রাম বজরাপুরেতে নিবসতি।
শ্রীজয়গোপালনাম হরিভক্তিলাভকাম উপনাম শ্রীতর্কালঙ্কার।
ভক্তবৃন্দমধ্যরবি শ্রীবিল্বমঙ্গল কবি কবিতার প্রকাশে পয়ার।

(২) **শিক্ষাসার**।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের ২য় সংস্করণের এক খণ্ড (পৃ. ৭২) আছে; তাহার আখ্যাপত্র এইরূপ:—

শিক্ষাসার। ।অর্থাৎ।গুরুদক্ষিণা ও চাণক্য শ্লোক ও দিনপঞ্জিকা ও।শুভঙ্করকৃতা আর্য্যা।।বালকেরদের শিক্ষার্থে।শ্রীজয়গোপালতর্কালঙ্কার।কর্ত্তৃক সংগৃহীত।।শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বার ছাপা হইল।।সন ১৮১৮।—।

এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

গুরুদক্ষিণা।—

কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংসকুঞ্জরকেশরী।
কালিন্দীজলকল্লোলকোলাহলকুতূহলী॥ সা তে ভবতু
সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী। উগ্রেণ তপসা লব্ধো
যয়া পশুপতিঃ পতিঃ॥ প্রণামে জুড়িয়া পাণি
বন্দো মাতা বীণাপাণি তব পদে রহুক মোর মতি।
তোমার চরণ সেবি ব্যাস বাল্মীকি কবি তোমা বিনা
আর নাহি গতি॥ কৃপাদৃষ্টে চাহ যারে ইন্দ্রপদ দেহ
তারে তুমি মাতা সকলের সার। তব ভক্ত যেই জন
পুজে তারে ত্রিভুবন তব পদে মতি রহে যার॥ বন্দো
হর গৌরী গঙ্গা বিপদনাশিনী। একে২ বন্দো যত
সুর সিদ্ধ মুনি॥ পঞ্চদেব নবগ্রহ আদি যত জন।
সাবধান হয়ে বন্দো সভার চরণ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বন্দো
করিয়া ভকতি। মাতা পিতা বন্দিলাম স্থির করি মতি॥

(৩) **পত্রের ধারা।** ইং ১৮২১। পৃ. ৫৬।

ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

পত্রের ধারা।।অর্থাৎ।পাঠাপাঠ ও পট্টা ও কবুলিয়ত ও দরখাস্ত প্রভৃতি।যাহা।বালকেরদের শিক্ষার্থে সংগৃহীত হইল।।শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।।সন ১৮২১ শাল।।

এই পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। কিন্তু ইহার লেখক যে জয়গোপাল, পাদরি লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকায় (নং ২২৫ দ্রষ্টব্য) তাহার উল্লেখ আছে।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'পত্রের ধারা' হইতে একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

বয়ঃকনিষ্ঠ খুড়াপ্রভৃতিকে এই পাঠ লিখিবেক।

পুজনীয় শ্রীযুত রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খুড়া

মহাশয় চরণেষু।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষি শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ শর্ম্মণঃ

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদং মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে এ জনের সমস্ত মঙ্গল। পরং শ্রীরামপুরে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা অন্য২ লোকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসের নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন যদ্যপি অধ্যয়ন করিতে বাসনা থাকে তবে শ্রীরামপুরের পাঠশালাতে আসিবেন এখানে বাসাখরচও পাইবেন অতএব এইখানে থাকিয়া অধ্যয়ন করা উপযুক্ত। আগামি মাসে পাঠ আরম্ভ হইবেক একারণ লিখিতেছি যে আপনারা অতিশীঘ্র আসিবেন কেননা এস্থানে অনেক শাস্ত্রের আলোচনা আছে এবং শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিসুপণ্ডিত এঁহার নিকট থাকিলে অনেক উপকার আছে ইহা জ্ঞাত কারণ লিখিলাম ইতি তাং ৯ কার্ত্তিক।—পৃ. ৯।

১৮৪৫ সনে এই পুস্তক চতুর্থবার মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণের পুস্তকে একটি নূতন অংশ দেখিতেছি; এই নূতন অংশ ৬০-৮৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "চাণক্যকর্ত্তৃক সংগৃহীত নীতিগ্রন্থ। সারসংগ্রহ।"

(৪) **চণ্ডী।** ইং ১৮১৯ (?)

জয়গোপাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'চণ্ডী' আমি কোথাও দেখি নাই। সাহিত্য-পরিষদে আখ্যাপত্রবিহীন একখানি প্রাচীন 'চণ্ডী' আছে, তাহা জয়গোপালের সংস্করণ হওয়া বিচিত্র নহে।

(৫) **বাল্মীকিকৃত রামায়ণ।** কৃত্তিবাসঃকর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় রচিত। ১৮৩০...।

এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণ' লিখিয়াছিলেন :—

রামায়ণ।—কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বহুকালপর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রচলিত আছে কিন্তু ঐ রামায়ণ গ্রন্থে লিপিকর প্রমাদে ও শিক্ষক ও গায়কদিগের ভ্রমপ্রযুক্ত অনেকং স্থানে বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ও পয়ার লুপ্তইত্যাদি নানা দোষ হইয়াছে এইক্ষণে ঐ গ্রন্থ সুপণ্ডিতদ্বারা বর্ণশুদ্ধ্যাদি বিচারপূর্ব্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে...(৩০ মে ১৮২৯)

এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে।—বাঙ্গলা ভাষার কাব্য অর্থাৎ রামায়ণের আদ্যকাণ্ড কৃত্তিবাসপণ্ডিতকর্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা এবং উত্তম পণ্ডিতকর্তৃক সংশোধিত। মূল্য ৩ টাকা। (২০ মার্চ ১৮৩০)

(৬) **মহাভারত।** ইং ১৮৩৬। পৃ. ৪২৪।

The/ MUHABHARUT:/ Translated into Bengalee Verse,/ By/ KASEE DASS;/ and/ Revised and collated with various manuscripts,/ By/ Joy Gopal Turkulunkar,/ of the Government Sungskrit College, Calcutta,/ in two volumes./ Vol. I./ Printed at the Serampore Press./ 1836./

মহাভারত। | আদি সভা বন পর্ব্ব। | গৌড়ীয় ভাষাতে কাশীদাস কর্তৃক পদ্য রচিত। | সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক সং|শোধিত হইল। | দুই বালম। | তন্মধ্যে প্রথম বালম। | শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। | শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে অথবা | কলিকাতার লালগির্জার ছাপাখানায় ডিরোজারূ সাহেবের | দ্বারা বিক্রেয়। | ১৮৩৬। |

ইহার "দ্বিতীয় বালম"-এর আখ্যা-পত্রও পূর্ব্ববৎ। এই "বালমে" "বিরাটাদি অবশিষ্ট পর্ব্ব" আছে। ইহাও ১৮৩৬ সনে প্রকাশিত হয়, পৃ. সংখ্যা ৫২১।

'মহাভারত' প্রকাশিত হইলে, ২ জুলাই ১৮৩৬ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লিখিয়াছিলেন :—

মহাভারত।—অনেক কালের পর আমরা পরমানন্দপূর্ব্বক অস্মদীয় এতদ্দেশীয় বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে যে মহাভারত সংশোধিত হইয়া প্রায় দুই বৎসরেরও অধিক হইল মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহা এইক্ষণে সুসম্পন্ন হইয়াছে ঐ মহাগ্রন্থ পঞ্চম বেদ নানা লিখিত গ্রন্থ পর্য্যালোচনায় শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্তৃক সংশোধিত হইয়াছে।...কাশীদাসকর্তৃক বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদিত ঐ গ্রন্থ এই প্রথমবার সমগ্র মুদ্রাঙ্কিত হইল।

পরন্তু বিজ্ঞের বিবেচনায় বোধ হইতে পারে যে সামান্য অজ্ঞ লোকের লিখন ও পঠনেতে ঐ প্রাচীন

গ্রন্থ অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞের অনাদরপ্রযুক্ত মুমূর্ষুপ্রায় হইয়াছিল এইক্ষণে সুপণ্ডিতের সংশোধনরূপ মহৌষধসেবনেতে পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইল।

(৭) **পারসীক অভিধান।** ইং ১৮৩৮। পৃ. ৮৪।

পারসীক অভিধান | অর্থাৎ | পারসীক শব্দস্থলে স্বদেশীয় সাধুশব্দ সংগ্রহ | শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্তৃক | সংগৃহীত | শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইল। | সন ১২৪৫ সাল। |

ইহার "ভূমিকা"র কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

এই ভারতবর্ষে প্রায় নয় শত বৎসর হইল যবন সঞ্চার হওয়াতে তৎসমভিব্যাহারে যাবনিক ভাষা অর্থাৎ পারসী ও আরবীভাষা এই পুণ্যভূমিতে অধিষ্ঠান করিয়াছে অনন্তর ক্রমে যেমন যবনেরদের ভারতবর্ষাধিপত্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমন রাজকীয় ভাষা বোধে সর্বত্র সমাদর হওয়াতে যাবনিক ভাষার উত্তরোত্তর এমত বৃদ্ধি হইল যে অন্য সকল ভাষাকে পরাস্ত করিয়া আপনি বর্দ্ধিষ্ণু হইল এবং অনেক অনেক স্থানে বঙ্গভাষাকে দূর করিয়া স্বয়ং প্রভুত্ব করিতে লাগিল বিষয় কর্ম্মে বিশেষত বিচারস্থানে অন্য ভাষার সম্পর্কও রাখিল না তবে যে কোন স্থলে অন্য ভাষা দেখা যায় সে কেবল নাম মাত্র। সুতরাং আমারদের বঙ্গভাষার তাদৃশ সমাদর না থাকাতে এইক্ষণে অনেক সাধুভাষা লুপ্তপ্রায়া হইয়াছে এবং চিরদিন অনালোচনাতে বিস্মৃতিকূপে মগ্না হইয়াছে যদ্যপি তাহার উদ্ধার করা অতি দুঃসাধ্য তথাপি আমি বহুপরিশ্রমে ক্রমে ক্রমে শব্দ সঙ্কলন করিয়া সেই বিদেশীয় ভাষাস্থলে স্বদেশীয় সাধু ভাষা পুনঃ সংস্থাপন করিবার কারণ এই পারসীক অভিধান সংগ্রহ করিলাম।

ইহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন যে স্বকীয় ভাষার মধ্যে কত বিদেশীয় ভাষা লুক্কায়িতা হইয়া চিরকাল বিহার করিতেছে এবং তাঁহারা আর বিদেশীয় ভাষার অপেক্ষা না করিয়াই কেবল স্বদেশীয় ভাষা দ্বারা লিখন পঠন ও কথোপকথনাদি ব্যবহার করিয়া আপ্যায়িত হইবেন এবং স্বকীয় বস্তু সত্ত্বে পরকীয় বস্তু ব্যবহার করাতে যে লজ্জা ও গ্লানি তাহাহইতে মুক্ত হইতে পারিবেন এবং প্রধান ও অপ্রধান বিচারস্থলে বিদেশীয় ভাষা ও অক্ষর ব্যবহার না করিয়া স্বস্ব দেশ ভাষাও অক্ষরেতেই বিচারীয় লিপ্যাদি করিতে সম্প্রতি যে রাজাজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতেও সম্পূর্ণ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এই গ্রন্থে প্রায় পঞ্চশতাধিক দ্বিসহস্র চলিত শব্দ অকারাদি প্রত্যেক বর্ণক্রমে সূচী করিয়া বিন্যস্ত করা গিয়াছে ইহার মধ্যে পারসীক শব্দই অধিক ক্বচিৎ আরবীয় শব্দও আছে…।

(৮) **বঙ্গাভিধান।** ইং ১৮৩৮ (?)

২৫ আগষ্ট ১৮৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এই বাংলা-ইংরেজী অভিধান সম্পর্কে নিম্নাংশ মুদ্রিত হইয়াছে :—

বঙ্গাভিধান।—স্বস্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন। বঙ্গভূমি নিবাসি লোকের যে ভাষা সে হিন্দুস্থানীয় অন্য২ ভাষা হইতে উত্তমা যে হেতুক অন্যভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচুর্য্য আছে বিবেচনা করিলে জানা যায় যে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের চলন যদ্যপি ইদানীং ঐ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা পুর্ব্বক কেবল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষা লিখিতে ও তদ্দারা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে নির্ব্বাহ করিতে পারেন এই প্রকার লিখন পঠন ধারা অনেক প্রধান২ স্থানে আছে। এবং ইহাও উচিত হয় যে সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুতা প্রকাশ করেন অসাধুভাষা ব্যবহার করিয়া অসাধুর ন্যায় হাস্যাস্পদ না হয়েন। অতএব এই বঙ্গভূমীয় তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্ব্বদা ব্যবহারে উচ্চার্য্যমাণ যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল শব্দ লিখনে ও পরস্পর কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কৃতানভিজ্ঞ

বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মানসিক ক্ষোভ সদা জন্মে তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলনপূর্ব্বক (বঙ্গাভিধান) নামক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।...

এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষারও বিন্যাস করা গেল তাহাতে ইঙ্গলণ্ড ভাষা ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা আছে...। শ্রীজয়গোপালশর্ম্মণঃ।

ইহা ছাড়া ১৮৩৪ সনে গঙ্গাদাসের 'ছন্দোবিবৃতিঃ' (পৃ. ৩১) ও চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের 'বৃত্তরত্নাবলী' (পৃ. ১৫) জয়গোপাল প্রকাশ করিয়াছিলেন ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯ দ্রষ্টব্য)।

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে দেবনাগর অক্ষরে 'শ্রীমহাভারত' প্রকাশিত হয়, তাহার তৃতীয় খণ্ড যে তিন জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক "পরিশোধিত" হইয়া ১৮৩৭ সনে বাহির হয়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

১৩ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে ৭৪ বৎসর বয়সে জয়গোপাল পরলোকগমন করেন।* মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল; তাঁহার স্থলে সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ অস্থায়ী ভাবে সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

জয়গোপাল সম্বন্ধে ইহার অধিক সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতের উল্লেখ পাইয়াছি, কিন্তু বইখানি দেখিবার সুবিধা হয় নাই। বইখানি—বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত '৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনচরিত' (পৃ. ১০, ১৩০৮)।

* "I have the honor to report the death of Joy Gopal Tarkalankar, the Professor of Sahitya at this Institution on the 13th April last."—Letter dated 5 May 1846 from Russomoy Dutt, Secretary, Sanscrit College, To the Secretary, Council of Education.

রামকৃষ্ণের শিবায়ন

শ্রীপাঁচুগোপাল রায়

রামকৃষ্ণের শিবায়ন নবাবিষ্কৃত না হইলেও ইহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই। ইহার যে খণ্ডিত পুথি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ডে) কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। কাজেই সম্পূর্ণ পুথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

শিব-কীর্ত্তি-গাথা গাহিয়া যে সকল কবি তাঁহাদের লেখনী পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, রামকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম। কবির নিবাস রসপুর গ্রামে। ইহা হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতা থানার মধ্যে—হাওড়া আমতা লাইট রেলওয়ের আমতা ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে দামোদর নদের বাম তীরে অবস্থিত। কবির পূরা নাম রামকৃষ্ণ রায়। কবির পিতা শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতামহ যশশ্চন্দ্র রায়। কবির মাতার নাম রাধাদাসী। তিনি ছিলেন কাশ্যপগোত্রীয় দেব উপাধিবিশিষ্ট। তিনি আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

পিতামহ রায় যশশ্চন্দ্র মহামতি।
তাঁর পদাম্বুজে মোর অশেষ ভকতি ॥
পিতামহী বন্দিলাঙ নাম নারায়ণী।
সরস্বতী বন্দিলাঙ তাঁহার সতিনী ॥
মাতামহ বন্দিলাঙ নাম সূর্য্য মিত্র।
তেয়জ কুলীন তিঁহো পবিত্রচরিত্র ॥
পিতা কৃষ্ণ রায় বন্দো সর্ব্বশাস্ত্রে ধীর।
যাঁহার প্রসাদে এই মনুষ্যশরীর ॥
মাতা রাধাদাসীর চরণে দণ্ডবত।
যার গর্ব্ভবাস হৈতে দেখিল জগত ॥
কায়স্থ দক্ষিণরাঢ়ি বংশেতে উৎপত্তি।
গোত্র কাশ্যপ আমার দেবতা প্রকৃতি ॥
নিবাস বন্দিনু আমি রসপুর দেশ।
এত দূরে ভাই রে বন্দনা হৈল শেষ ॥

কবির উপাধি ছিল কবিচন্দ্র। তাঁহার ভণিতায় পাই :—

কবিচন্দ্র রচিলা সঙ্গীত শিবায়ন।
ভক্ত নায়কে দয়া কর পঞ্চানন ॥

অন্যত্র—

কল্পমুখে কমলে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
শিবায়ন গীত কবিচন্দ্রের ভারতী ॥

এইরূপ অনেক ভণিতা আছে। কিন্তু এই উপাধি কোন্ সময় কাহার দ্বারা প্রদত্ত, তাহা কাব্যের কোথাও উল্লিখিত হয় নাই।

রামকৃষ্ণ কাব্যের রচনা-কালের উল্লেখ কোথাও করেন নাই। তবে তিনি যে শুভ দিন দেখিয়া তাঁহার কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ তিনি করিয়াছেন,—

দিবাভাগে পৌর্ণমাসী কৃষ্ণা প্রতিপদ নিশি
আরম্ভ করিব শুভ ক্ষণে।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশ তিথি দীপমালা দিয়া ব্রতী
সংপ্রদা সহিত জাগরণে॥

রামকৃষ্ণের দুই বিবাহ; প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ছয় এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটিমাত্র পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইহাতে মনে হয়, তিনি স্বল্পায়ুঃ ছিলেন না। কিম্বদন্তী এই যে, তিনি বর্দ্ধমান-রাজসরকারে কোন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ মহারাজার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলে মহারাজ তাঁহাকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। তিনি ১০৯১ বঙ্গাব্দে (ইং ১৬৮৪) ঐ ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। জগন্নাথের সাত পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দপ্রসাদও জগন্নাথের মৃত্যুর পর ১১০০ বঙ্গাব্দে (ইং ১৬৯৩) উক্ত মহারাজের নিকট কিছু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। যদি জগন্নাথের মৃত্যু ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে এবং পরমায়ুঃ পঞ্চাশ বৎসর ধরা হয়, তাহা হইলে ১৬৪৩ (১৬৯৩-৫০) খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পুরুষে গড়ে পঁচিশ বৎসর ধরিলে রামকৃষ্ণের জন্ম ১৬১৮ (১৬৪৩-২৫) খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী হওয়া সম্ভব নয়। তিনি যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ধরিয়া লইলে বিশেষ ভুল হইবে না।

কবি তাঁহার কাব্যের শেষাংশের দিকে তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র জগন্নাথ ও বলরামের কল্যাণ কামনা করিয়া গিয়াছেন,—

কবিচন্দ্র গায় এ সত্য সভায়
প্রসন্ন হইবে দেবী।
জগন্নাথ রায়ে রক্ষিবে সদায়ে
যেন হয় চিরজীবি॥

অন্যত্র—

রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
বলরামে কল্যাণ করিবে ত্রিলোচন॥

কবি যে সময়ে তাঁহার কাব্য শেষ করেন, সে সময়ে তাঁহার দুইটি মাত্র পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যদি তখন অন্য কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে তিনি সম্ভবতঃ তাহারও কল্যাণ কামনা করিয়া লিখিতেন অথবা অন্য কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলেও তখনও তাহার নামকরণ হয় নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, রামকৃষ্ণ তাঁহার বয়সের প্রথমার্দ্ধে অর্থাৎ প্রায় ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই শিবায়নের রচনা শেষ করেন।

শিবায়নের যে পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা মূল গ্রন্থ হইতে অনুলিখিত। উহা ১১৩৩ বঙ্গাব্দে লিখিত হইয়াছিল। পুথিখানি তুলট কাগজে লেখা এবং উহার ২৪১ খানি পাতা। এক একখানি কাগজ দুই ভাঁজ করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিত। প্রত্যেক পৃষ্ঠা ১´—১´´ দীর্ঘ এবং ৪½´´ ইঞ্চ প্রস্থ। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রায় আটটি করিয়া সারি, নয় বা দশ সারিও কোন কোন পৃষ্ঠায় দেখা যায়। পুথিখানি পঁচিশটি পালায় বিভক্ত। পালার কোন নামকরণ না থাকিলেও প্রত্যেক পালার শেষে "পালা সাঙ্গ" লিখিত আছে। কবি পুরাণাদি নানা শাস্ত্রের সারাংশ গ্রহণ করিয়া শিবায়ন লিখিয়াছেন।

শুনিমু দর্শন ছয়	বেদশাস্ত্রে যত কয়
অষ্টাদশ পুরাণ ভারত।
বাল্মিকাদি মুনিবর	বেদব্যাস পরাশর
ভিন্ন ভিন্ন সভাকার মত॥
আপনার মনোরথে	নানা পুরাণের মতে
বিরচিল পাঁচালি প্রবন্ধ।

কাব্যের প্রথম পালা সৃষ্টিবিষয়ক। ইহাতে দেবতা, গুরুজন বন্দনা এবং সৃষ্টি সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে।

ঈশ্বর জনক মায়া মাতা।
পাইল অন্তরে বোধ	সকলশাস্ত্র নির্বিরোধ
ইথে নাহি অনেকবাক্যতা॥
এক ব্রহ্ম সনাতন	নিরাকার নিরঞ্জন
নিত্য নির্গুণ নির্বিকার।
নাহি তার হ্রাস বৃদ্ধি	শক্তি জন্মাইল বুদ্ধি
ইচ্ছা হৈল সৃজিতে সংসার॥
আদি সঙ্গে তেজোময়	বর্ণ বিম্ব অনির্ণয়
নির্ম্মল নিগূঢ় সুপ্রকাশ।
এক বিনে নাহি অন্য	নহে স্থূল নহে শূন্য
নহে নীর সমীর হুতাশ॥
সগুণা হইলা শিব	সকল ভূতের জীব
শরীর ধরিতে অভিলাষ।
সর্ব্বত্র বদন দৃষ্ট	নাহি অধো উর্দ্ধ পৃষ্ঠ
নাহিক অম্বর পরকাশ।
নহে তনু পরমিত	তপিতে না হৈত প্রীত
সংহারিল অদ্ভুত আকার।
গম্ভীর সুস্থির তেজে	সেই আগুনের মাঝে
হৈল পঞ্চ ভূতের সঞ্চার।

দ্বিতীয় পালায় দক্ষের কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ প্রভৃতি, তৃতীয় পালায় কাল-ভৈরবের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মহত্যার পাপ খণ্ডাইতে কালভৈরবের তীর্থভ্রমণ প্রভৃতির বর্ণনা

আছে। চতুর্থ পালায় দক্ষের যজ্ঞের উদ্যোগ। দক্ষ শিবের প্রতি ক্রোধপরবশ হইয়া, তাঁহাকে বাদ দিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিলেন। নারদের নিকট গোপনে সেই সংবাদ পাইয়া সতীর যজ্ঞ দর্শনের ইচ্ছা হইল। তখন সতী পিত্রালয়ে যাইবার জন্য মহাদেবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে যাইতেছেন,—

মন্দ মন্দ গতি যোড় করে সতী
দাণ্ডাএ পতির পাশে।
দেখিয়া ঈশ্বর পুছিলা উত্তর
সতী প্রতি পরিহাসে॥
শুন সুবদনী আমি মনে জানি
হারিয়াছি তিন গুণে।
জিনিএাছ পাশা কিবা কর আশা
কোন বর চাহ মনে॥

সতী তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পর :—

শুনি ত্রিলোচন জানি মনে মন
হাসিয়া করিলা উক্তি।
নিমন্ত্রণ বিনে উৎসবের দিনে
যাইতে না হয় যুক্তি॥
প্রিয়ে না বল এ সব বোল।
পতি পরিহরি পতিব্রতা নারী
না চাহে মায়ের কোল॥

শিবের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সতী দক্ষালয়ে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সতীর পিতা মাতা সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু দক্ষ শিবের উদ্দেশে নানাপ্রকার কটূক্তি করিতে লাগিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া,—

বাপের বদনে শুনি বল্লভার গালি।
সত্যবতী দিল দুই শ্রবণে অঙ্গুলী॥
না বল না বল বাপা বিরূপ ঈশানে।
বোল দুই চারি মাত্র শুনিলাঙ কানে॥
যত প্রতারণা তুমি করিছিলে পূর্ব্বে।
প্রত্যয় না ছিল তাহা শুনিলাঙ ইবে॥
এত নিষ্ঠুর নাঞি বলি নিজ পরে।
জামাতা দুষনি হইলে শ্বশুরে সম্বরে॥
কন্যাদান করিয়া বিচার কর দোষ।
উচিত না ছিল এত করিতে আক্রোশ॥
হয় নয় বলিবেন এই দেবসভা।
এত যদি জান আমা কেন দিলে বিভা॥

সতী দেহত্যাগ করিলেন। সতীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া শিব দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিলেন।

৬ষ্ঠ পালায় ময় তারকের উপাখ্যান। ময় তারকের উপদ্রবে দেবতারা অস্থির হইয়া পড়িলেন। শিবের পুত্র ভিন্ন তারককে বধ করিবার আর কাহারও শক্তি নাই। শিব গভীর তপে নিমগ্ন। এ দিকে সতী হিমালয়ের গৃহে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মদন শিবের তপ ভঙ্গ করিতে যাইয়া ভস্মীভূত হইলেন। গৌরী কঠোর তপস্তা দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করিতে মনস্থ করিয়া আপনার সঙ্কল্প পিতামাতার নিকট ব্যক্ত করিলেন। মেনকা গৌরীকে নিষেধ করিয়া কহিলেন,—

তনু তোর যেন কাঁচ…
রৌদ্রে মিলাবে হেন জানি ॥
স্বভাবে তুমি সে কমলিনী।
হিমপাতে হারাবে পরাণী ॥
তপেরে না যাইয় মা গ উমা।
গলায় বান্ধিয়া থাকো তোমা ॥
বনে যাবে কেমন সাহসে।
কি বুদ্ধি জন্মিল তোর বাপে।
কি লাগি পাঠায় তোমা তপে ॥
শিবের কঠিন বড় সেবা।
সেবাতে থামাতে পারে কেবা ॥
বর কি নাহিক ত্রিভুবনে।
তপস্তা করিবে কি কারণে ॥
বয়স দেখিয়া দিব বরে।
বসাইব অদরিদ্র ঘরে ॥
রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে।
অম্বিকা নিষেধ না মানে ॥

সপ্তম ও অষ্টম পালায় গৌরীর তপোবর্ণন ও পুষ্পচয়ন উপাখ্যান। গৌরী তপস্তা করিতে বনে গেলেন। বন হইতে ফল পুষ্পাদি চয়ন করিয়া শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া পূজা করেন। এক দিন গৌরী শিবের উদ্যানে পুষ্প চয়নে গিয়াছেন, এমন সময় শিবের অনুচরেরা আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। অনুচরগণ শিবের নিকট যাইয়া পুষ্পচয়নকারিণীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছে,—

অমরনাথ, মালঞ্চে দেখিল কমলিনী।
সুন্দর কনককান্তি　　কুঙ্কুম কুসুম ভ্রান্তি
কি বর্ণিব সে বরবর্ণিনী ॥
ভ্রূযুগ কামান জনু　　অতনু লুকাইল ধনু
সম তাহে পাইয়া পরাভব।
নাসিকা গঠন দেখি　　লজ্জিত গরুড় পাখী
অভিমানে ভজিল মাধব।

নেত্র দেখি ইন্দীবর প্রবেশিল সরোবর
কুরঙ্গিনী শৃঙ্গী নাহি বহে।
শফরী প্রবেশ জলে খঞ্জন উড়িয়া বুলে
কথোকালে দেশে নাহি রহে ॥
ওষ্ঠ অধরের ছবি উপমিতে নাহি ভুবি
মাণিক্য না দেই তেঞি দেখা।
বিম্বফল লজ্জা পাই না হইল চিরস্থাই
বিদ্রুম হরিল পত্র শাখা ॥
দেখিয়া দশনপংক্তি মুক্তা আশ্রাইল শুক্তি
দাড়িম ফাটিল অভিমানে।
উপমা না পাইয়া হীরা প্রবেশ করিল শিলা
কেহ নহে তাহার সমানে ॥

নবম পালায় শিবের বিবাহোদ্যোগ উপাখ্যান। দশম পালায় কুমারের জন্ম ও মহিষ বধোপাখ্যান। একাদশে শিবের বিবাহোপাখ্যান। এই প্রসঙ্গে কবি প্রায়.তিন শতাব্দী পূর্ব্বে রাঢ় দেশের বিবাহপদ্ধতির একখানি সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। শিব বিবাহ করিতে ছাতাতলায় দাঁড়াইয়াছেন, বরকে দেখিয়া রমণীরা পরিহাস করিতেছেন,—

দোজবরা বরে সই কিছু নহে হারা।
উর্দ্ধমুখে আছে চক্ষে দেখিবেক তারা ॥
মোরা নাহি যাব কেহ বরের নিকট।
চৌদিকে চরায় চক্ষু চাহে কটমট ॥
আইয় বলে হের দেখ নারদের নাট।
উঠানে দাণ্ডাল্য বর যেন ইন্দ্রকাঠ ॥
বরিব বার্দ্ধক বর বল কোন সুখে।
সুতনি খুজিবে রাণী কোন কোন মুখে ॥
কণ্ড হাতে অঞ্জন পরাবে একদিঠে।
হাত বাড়াইয়া পাব যদি উঠ উটে।

ত্রয়োদশ পালায় বাসরোপাখ্যান। বিবাহ শেষ হইবার পর বাসরঘরে যাইবার সময় অরুন্ধতী, তারা প্রভৃতি দেববালারা সতীকে উপদেশ দিলেন :—

বৃদ্ধ বা দরিদ্র জড় যদি হয় পতি।
কন্দর্পসমান দেখে সেই নারী সতী।
কোপদৃষ্টে স্বামী যদি চাহে মনোদুঃখে।
পতিব্রতা পতিরে সম্ভাষে হাস্যমুখে ॥
গুরুর গঞ্জনা নাঞি সতন্তর ঘর।
শাশুড়ী ননদ নাঞি শ্বশুর দেবর।
সকল প্রকারে তুমি জানাইবে শীল।
স্বামী ছাড়া কোথাও না যাবে এক তিল।

কার্য্যকালে দাসীর সমান পতিব্রতা।
ভোজন সমএ স্নেহ করে যেন মাতা।
শয়নে বেশ্যার ভাব বিপত্তে মন্ত্রিনী।
সুস্ত্রীর লক্ষণ এই শুন গ ভবানী॥

বাসরগৃহে গমনকালে কবি উমার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,—

আজু রাজকুমারী গৌরী নবসমাগমশঙ্কিনী।
চলি দুই পদ চারি যাএ
চমকি চহে আই মাএ
ঝমরু ঝমরু নূপুর। পাএ
রুণু ঝুণু কটিকিঙ্কিণী॥
সাজিল গৌরী সখী সমাঝ
ভবন মাঝ শশী বিরাজ
পথে অকারণ করহ ব্যাজ
চরণে মন্দ গামিনী।
কেহ করে ধরি করএ অঙ্গ
কেহ কেহ কহে এহ কলঙ্ক
পতি প্রতি কেন বদন বঙ্ক
অভিসার বর কামিনী॥
উরু ধুকধুকি ঘন নিঃশ্বাস
সজল নয়ন করুণ ভাষ
নিশি না যাইব প্রভু পাশ
অপসর কর যামিনী॥

* * *

চতুর্দ্দশ পালায় শিবদুর্গার কৈলাস যাত্রার বর্ণনা। গৌরী সন্তর্পণে শিবসম্ভাষণে যাইতেছেন, তাঁহার সঙ্কুচিত ভাব দেখিয়া শিব গৌরীকে বলিতেছেন,—

আচ্ছাদন কর যদি শোভা।
তবে কুন্তলে পরিলে কেন গাভা॥
সম্মুখে না দেও যদি দেখা।
তবে বিফল তিলকালক লেখা॥
সুধামুখী বিমুখে বসিলে কার কোলে।
ঝাঁপি তনু রুচির নিচোলে॥
চাহ যদি নয়নের কোণে।
তবে অঞ্জনে রঞ্জিলে অকারণে॥
হাস যদি অধরে মুচকি।
তবে সুন্দর দন্তের কাজ কি॥
পুছিলে না কহ যদি কথা।
তবে বদনে রসনা বহ বৃথা॥

ইহার পর সমুদ্রমন্থন, বলি রাজা, অগস্ত্য ও সগর রাজা, গঙ্গা এবং ত্রিপুরের উপাখ্যান। একবিংশ পালায় দুর্গার কন্দলোপাখ্যান। এই পালায় সংসারের নানারূপ অভাব অভিযোগ লইয়া শিবের সহিত দুর্গার কলহ। দুর্গা শিবকে বলিতেছেন,—

শয়নে তোমার পাশে নিদ্রা নাহি হয় ত্রাসে
জটায় জলের কুলকুলি।
সাপের ফোঁ ফাঁস শুনি সাত পাঁচ মনে গুনি
পালাইতে পরম আকুলি॥
হস্তপদ যদি নাড়ি চামড়ার খড়খড়ি
গলে সাপ করে ইলিমিলি।
এমত সুখের শয্যা ইতে পতিপরিচর্য্যা
যদি করে নারী তারে বলি॥
ভোলানাথ, আমি যেই তেঁই সে সম্বরি।
অন্যে সহে হেন তাপ স্বামীরে বলিয়া বাপ
পলাইত হৈয়া দিগম্বরী

দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ পালায় যথাক্রমে তারক, শুক্র ও অন্ধক এবং পরশুরামের উপাখ্যান। পঞ্চবিংশ এবং শেষ পালায় বাণ রাজার উপাখ্যান। বাণকে শিবের বরদান, পার্ব্বতীর নিকট উষার পতিলাভের বর প্রার্থনা প্রভৃতি এই পালায় বর্ণিত আছে। উষা এক দিবস স্বপ্নে আপনার অভীষ্ট স্বামীর দর্শন পাইলেন।

নীল মণিবর সম কলেবর
বদন চাঁদের আভা।
চাঁচর চিকুর ঢেউ থরে থর
লোচনে ফুলের গাভা॥
বিকচ কমল লোচন যুগল
উন্নত নাসিকা ভুরু।
বাহু সুবলিত আজানু লম্বিত
পরিসর উর উরু॥
উষা স্বপনে মেলিল নাথে।
পূরিল আরতি বঞ্চিল সুরতি
কামকুমারের সাথে॥

নিদ্রাভঙ্গের পর উষা স্বপ্নদৃষ্ট পতির বিরহে কাতর হইয়া পড়িলেন। সখী চিত্রলেখা তামসী বিদ্যায় পারদর্শিনী। তিনি আকাশমণ্ডলে থাকিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত রাজা ও রাজপুত্রদের চিত্র অঙ্কিত করিয়া উষাকে দেখাইলেন। উষা যাদববংশের অনিরুদ্ধকে স্বপ্নদৃষ্ট পতি বলিয়া চিনিতে পারিলেন। চিত্রলেখা দ্ব্যর্থক উক্তিতে তাঁহার পরিচয় দিলেন,—

এহ ত তস্কর উষা নহে রাজবংশী।
রাজা দেশ নাহি নহে পৃথিবীর অংশী।

স্ত্রীচোর বলিআ বংশের অপকীর্ত্তি।
দেশে না রহিতে দিল যত চক্রবর্ত্তী॥
জরাসন্ধ সার্ব্বভৌম মহারাজা কাশী।
খেদাড়িআ গোবিন্দে করিল সিন্ধুবাস॥
গোয়ালা বলিয়া পিতামহের খেয়াতি।
বলিতে না পারি উষা চোর কোন জাতি॥
চোরের পিতার কথা শুন সাবধানে।
সম্বরের পুষ্ট পুত্র সর্ব্বলোকে জানে॥
জননী বলিআ যারে করিল সম্ভাষ।
তাহা লৈয়া মদনের মৈথুন বিলাস॥
নর্ত্তক হইআ বজ্রনাভের নগরে।
রহিল তাহার কন্যা গিয়া অন্তঃপুরে॥
তাহার তনয় এই অনিরুদ্ধ নাম।
কহিলাও যাদবগোষ্ঠীর গুণগ্রাম॥

উষা চিত্রলেখাকে অনিরুদ্ধের সহিত মিলন করাইতে অনুনয় করায়, চিত্রলেখা গোপনে অনিরুদ্ধকে উষার অন্তঃপুরে আনিলেন। তথায় তাহাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া গেল। ক্রমে ইহা বাণ রাজার কর্ণগোচর হইলে বাণ অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। নারদের মুখে অনিরুদ্ধের দুর্দ্দশা শুনিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। যাদবদের সহিত বাণ রাজার যুদ্ধ হইল। শেষে শিবের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের বিবাদের অবসান হইয়া অনিরুদ্ধের সহিত উষার মিলন হইল।

কাব্যের মোটামুটি আখ্যানভাগ প্রদান করিলাম। রামকৃষ্ণের শিবায়ন তাঁহার সমসাময়িক বা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের কাব্য অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়, বরং স্থানে স্থানে ইহার কবিত্বে ও মনোহারিত্বে উৎকৃষ্টই মনে হয়। রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিবায়নের প্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই এই প্রবন্ধ লিখিবার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

জগদীশ পঞ্চানন

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ

নবদ্বীপে প্রায় একই সময়ে জগদীশ নামে দুই জন গ্রন্থকার আবির্ভূত হইয়াছিলেন— জগদীশ তর্কালঙ্কার ও জগদীশ পঞ্চানন। মহানৈয়ায়িক জগদ্‌গুরু জগদীশ তর্কালঙ্কারের দিগন্তবিশ্রুত কীর্ত্তি পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যকে এত দূর গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে যে, বর্ত্তমানে দ্বিতীয় জগদীশের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে তাঁহার নাম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং নিরতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় স্বয়ং জগদীশ পঞ্চাননের অধস্তন বংশধর হইয়াও সাধারণ সংস্কার-বশতঃ নিজপূর্ব্বপুরুষরচিত একখানি গ্রন্থের রচনা তর্কালঙ্কারের স্কন্ধে আরোপ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ব্যতীত বোধ হয়, কোন প্রত্নবিৎ পণ্ডিত এযাবৎ উভয় গ্রন্থকারের পার্থক্য লক্ষ্য করেন নাই।[১] আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দ্বিতীয় জগদীশের লুপ্ত কীর্ত্তি পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব।

জগদীশ পঞ্চানন বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, অধিকাংশই টীকাগ্রন্থ। তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—

১। **কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশ**। যদিও এই টীকাগ্রন্থ বর্ত্তমানে বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে, তথাপি ইহা বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল বলিয়া বুঝা যায় না। ইহার একটিমাত্র সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং লোকলোচনের প্রায় অগোচরে নবদ্বীপে সযত্নে রক্ষিত আছে। ইহার প্রারম্ভাংশ ও পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল—[২]

১। J. A. S. B., 1915. p. 282. স্বর্গত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়ও উভয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন—নব্যভারত, ১২৯৪, পৃঃ ৫৭৬। পক্ষান্তরে নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজের ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ নবদ্বীপ-মহিমা (১ম সং, পৃঃ ৭২) প্রভৃতি গ্রন্থে, শব্দশক্তিপ্রকাশিকার ভূমিকায় (কাশী সং,পৃঃ ১), কাব্যপ্রকাশের টীকাকার বামনাচার্য্য ঝলকীকার এবং সর্ব্বশেষে ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ও, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্পষ্ট নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া, কাব্যপ্রকাশের টীকা "নৈয়ায়িক" জগদীশ-রচিত বলিয়াই স্থাপন করিয়াছেন। (কাব্যপ্রকাশ, কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ, ভূমিকা পৃঃ ১)।

২। নবদ্বীপগৌরব গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন ও তৎপুত্র হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত এই অতিদুষ্প্রাপ্য পুথির অধিকারী ছিলেন: Mitra: *Notices of Sans.* Mss. No. 16 51. বর্ত্তমানে এই গ্রন্থ এবং গোলোক ন্যায়রত্নের স্বহস্ত-লিখিত অন্যান্য বহু গ্রন্থ নবদ্বীপের অন্যতম প্রধান নৈয়ায়িক শ্রীযুত প্রাণগোপাল তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে। শ্রদ্ধেয় তর্কতীর্থ মহাশয় তাঁহার গ্রন্থরাজি পরীক্ষা করিয়া দেখার সুযোগ দিয়া আমাদিগকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

নিদ্রাণেব মদৈকমুদ্রিতমতৌ পুষ্পায়ুধে সায়ুধে
প্রীতেবাপিতলোচনাম্বুজবলৌ চক্রায়ুধেঽনায়ুধে।
সৈবাসীৎ কুপিতেব কিঞ্চ জগতাং বিদ্রাবণে রাবণে
শম্ভোঃ কাপি কৃপা দৃগন্তকলিতা জীয়াদবিদ্যামদং॥
সম্প্রতি স্বমতিপ্রীত্যৈ শ্রীজগদীশদ্বিজো ধীমান্।
কাব্যপ্রকাশসূক্তৌ সরসরহস্যং প্রকাশয়তি॥

শেষাংশ,--

শ্রীঃ। বালে ত্বং কিমু কাতরাসি পিশুনব্যালাবলীব্যাহতো
হা মাতঃ সবনৌনধিব্যাতিকরে কস্মাদসৌ ব্যাহতিঃ।
তৎ কিং হন্ত তদোষবং প্রতিপদং মা গাস্তদীয়াস্পদং
তেষামন্তর্দ্বিষপূর্ণকর্ণকুহরে কোপীচ্ছয়া গচ্ছতি॥

ইতি শ্রীজগদীশপঞ্চাননভট্টাচার্যাকৃতে কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশেঽর্থালঙ্কারনিরূপকো দশমোল্লাসঃ সমাপ্তঃ॥ শ্রীঃ।

কন্দর্পং দহতে বিধুঞ্চ বহতে ভাগীরথীং বিভ্রতে
মৃত্যুং বারয়তে বিষং বশয়তে ব্রহ্মাণমুচ্ছাসতে।
বাণং বর্জ্জয়তে বৃষং কলয়তে দক্ষাধিমাতন্বতে
পাপং পণ্ডয়তে জগন্নটয়তে কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥
শাকে রন্ধ্রাদ্রিবাণক্ষিতিপরিগণিতে মাঘমাসে নবম্যাং
পক্ষে চৈবাবলক্ষে গ্রহপতিদিবসে জীবযুগ্যুগ্মলগ্নে।
ন্যায়ালঙ্কারবীরো নিজগুরুরচিতং পুস্তমেতৎ সমস্তং
স্বীয়ং স্বীয়াঙ্গনস্থো বালিখদনলসোঽধ্যাপনার্থং সুখেন॥
শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৭৯।— (১৮৫ খ পত্র)।[৩]

জগদীশের প্রমাণপঞ্জী রিক্তপ্রায়—চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী (১ পত্র) এবং চণ্ডীদাস (১১৬ ও ১২১ পত্র দ্রষ্টব্য) ব্যতীত অন্য কোন টীকাকারের নামোল্লেখ নাই। মাত্র এক স্থলে (১১৫খ পত্রে) দেবনাথের পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত পাওয়া যায়—তিনি সম্ভবতঃ কাব্য-কৌমুদীকার প্রসিদ্ধ মৈথিল পণ্ডিত দেবনাথ তর্কপঞ্চানন। পাদটীকায় জগদীশকর্ত্তৃক খণ্ডিত এক অজ্ঞাতনামা সমসাময়িক টীকার সন্দর্ভ গবেষণাযোগ্য বোধে উদ্ধৃত হইল।[৪] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জগদীশের মতে কাব্যপ্রকাশের কারিকাকার মম্মটভট্ট নহেন, পরন্তু ভরত ঋষি।

৩। ১৫৭৯ শকে মাঘ মাসের কৃষ্ণা নবমী বস্তুতই রবিবারে ছিল—১৭ জানুয়ারি ১৬৫৮ খ্রীঃ = ১৯ মাঘ, রবিবার, কৃষ্ণা নবমী প্রায় ৪২।৪৩ দণ্ডব্যাপী ছিল। এই প্রতিলিপির ২৬ক পত্রের এককোণে "শ্রীমথুরেশ" লেখা আছে। সুতরাং "মথুরেশ ন্যায়ালঙ্কার"ই এই পুথির লেখক এবং জগদীশ পঞ্চাননের অন্যতম ছাত্র ছিলেন। এই পুথিরই সহচর অপর একটি পুথি "শ্রাদ্ধচিন্তামণি" (L. 1650) এক্ষণে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় রক্ষিত আছে—তন্মধ্যে ১০৪৬ সন ২০ আশ্বিন তারিখের (১৬৩৯ খ্রীঃ) একটি দলীল পাওয়া গিয়াছে, গ্রাহক "শ্রীমথুরেশ ন্যায়ালঙ্কার"। (*Descr. Cat., Sans. mss., A. S. B., Vol. III, p. 89*) উভয় ন্যায়ালঙ্কার অভিন্ন সন্দেহ নাই।

৪। এতেন কুণ্ডলত্বজাতিবোধকাৎ কুণ্ডলপদাদশক্যাপি শ্রবণযোগ্যতা স্যা……র্য্যতে অতস্তত এব শ্রবণ-যোগ্যতালাভে শ্রবণপদমধিকমিত্যধিকপদদোষোদ্ধার এবাত্র কৃত ইতি পণ্ডিতম্মন্যপ্রলপিতমপাস্তম্" (সপ্তমোল্লাস, ১২২ খ পত্র)।

২। **শ্রাদ্ধবিবেকটীকা**—এই গ্রন্থও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। পূর্ব্বস্থলীনিবাসী স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তদীয় "স্মৃতিসিদ্ধান্ত" গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯-১০ ও ৫৪) সর্ব্বপ্রথম ইহার বচন উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,—জগদীশ "তর্কালঙ্কার"কৃত এই টীকা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের পূর্ব্ববর্ত্তিনী এবং ইহা অসম্পূর্ণ বিধায় সম্ভবতঃ গ্রন্থকারের সর্ব্বশেষ রচনা। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের বিপুল পুথিসংগ্রহমধ্যে এই গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। তদীয় অধ্যাপক পূর্ব্বস্থলীনিবাসী নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারের ভ্রাতৃবংশধর দুর্গাদাস ন্যায়রত্নের নিকট ইহার যে প্রতিলিপি ছিল, তাহাই ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের উপজীব্য। উক্ত প্রতিলিপি বর্ত্তমানে অপ্রাপ্য, তবে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের উক্তি হইতে বুঝা যায়, ইহা খণ্ডিত ছিল। রাজা রাজেন্দ্রলালের বর্ণিত পুথিও (L.2080) খণ্ডিত। আমরা বহু অনুসন্ধানের পর নবদ্বীপ জোড়াবাড়ীর স্বর্গত শশিভূষণ স্মৃতিরত্নের নিকট রক্ষিত একটি প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।[৫] ইহাও খণ্ডিত এবং দ্বিপিতৃকশ্রাদ্ধপ্রকরণারম্ভ পর্য্যন্ত লিখিত। গ্রন্থারম্ভ এই :—

প্রণম্য নিত্যাং ত্রিপুরাং ত্রিনেত্রাং শ্রীচক্ররাজপ্রবরং তথৈব।
মনোহরশ্রাদ্ধবিবেকরত্নৈরেবার্থমেব (?) প্রকটীকরোতি॥
শ্রীমতা জগদীশেন স্মৃতিতত্ত্ব (?) বিজানতা।
শূলহস্তকৃতগ্রন্থনিষ্কর্ষার্থোঽত্র কথ্যতে॥[৬]

এই গ্রন্থে পূর্ব্বটীকাকারগণের মত উদ্ধৃত হইলেও কোথায়ও নামোল্লেখ নাই। মলমাসপ্রকরণের একটি স্থল উল্লেখযোগ্য :—

"মীনস্থেতি লক্ষণমিদং ক্ষয়মাসাব্যাপকং বদন্তীত্যনেনাস্বরসো দর্শিতঃ। তথা হি দ্বিষষ্ট্যধিকচতুর্দ্দশশতশকাব্দে শুক্লপ্রতিপদি ধনুঃসঙ্কারঃ অমাবাস্যায়াঞ্চ মকরসঞ্চারঃ, তস্য চ মাসস্য বৃশ্চিকস্থরবিপ্রারব্ধত্বেন মার্গশীর্ষত্বাৎ তৎপরস্য চ মাসস্য মকরস্থরবিপ্রারব্ধত্বেন মাঘত্বাৎ ধনুঃস্থরবিপ্রারব্ধমাসাভাবাৎ পৌষলোপঃ স্যাৎ। অস্ত্বেবমিতি চেন্ন তদ্বর্ষমধ্যে তন্মাসবিহিততিথিকৃত্যসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধাদীনাং লোপঃ স্যাৎ তদা চ প্রতিসাম্বৎসরিকবিধিবাধাপত্তেঃ।" (৩১ খ পত্র)।

উদ্ধৃত শকাব্দ ১৪৬২ (১৫৪০ খ্রীঃ) ও ক্ষয়মাসঘটিত ব্যবস্থা গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্য-বিরচিত শ্রাদ্ধবিবেকের "অর্থকৌমুদী" টীকা হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।[৭]

৫। স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পুত্র মুঙ্গের জামালপুরপ্রবাসী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এস্‌সি মহাশয় যত্নপূর্ব্বক এই গ্রন্থ এবং এতদ্ভিন্ন কতিপয় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পুথির পত্রসংখ্যা ৫১ এবং লেখা প্রায় ২০০ বৎসর প্রাচীন।

৬। রাজেন্দ্রলাল-বর্ণিত পুথির পাঠ উভয় শ্লোকেই কিঞ্চিৎ বিভিন্ন :—

"মনোহরশ্রাদ্ধবিবেকগ্রন্থভাবার্থদীপং প্রকটীকরোতি।"

"শূলহস্তকৃতগ্রন্থে ক্রিয়তে কৌশলং কিয়ৎ।"

৭। গোবিন্দানন্দের শ্রাদ্ধবিবেকটীকা সুপ্রাপ্য নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে ইহার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (২০২ সং সংস্কৃত পুথি)—তাহার ৬২ক পত্র দ্রষ্টব্য। এই টীকা তাঁহার মূল গ্রন্থ শ্রাদ্ধকৌমুদী, শুদ্ধিকৌমুদী ও সম্বৎসরকৌমুদী প্রভৃতির পরে রচিত এবং এক স্থলে স্বরচিত একটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব গ্রন্থের উল্লেখ আছে—"মদীয়জ্যোতিঃকৌমুদ্যাং জ্ঞেয়ং" (৬৪খ)।

এই সন্দর্ভের ভাষা হইতে প্রতিপন্ন হয়, গোবিন্দানন্দ ঘটনার পূর্ব্বেই টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

পুষ্পিকার অভাবে এ স্থলে জগদীশের উপাধি বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যায়, কিন্তু ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের সংস্কার যে ভ্রান্ত, তাহা মঙ্গলাচরণশ্লোক হইতে এবং "স্মৃতিতত্ত্বং বিজানতা" বিশেষণ হইতেই প্রতিপন্ন করা যায়; নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার শাক্তও ছিলেন না, স্মার্ত্তও ছিলেন না। পক্ষান্তরে জগদীশ পঞ্চানন উভয়ই ছিলেন, তাহার প্রমাণ ক্রমশঃ ব্যক্ত হইবে।

৩। **আনন্দলহরীস্তবরহস্যপ্রকাশ**ঃ এই গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য নহে। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে ইহার একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি রক্ষিত আছে—লিপিকাল ১৫৭০ শক ২২ চৈত্র। নবদ্বীপের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের গ্রন্থাগারে একটি প্রাচীনতর পুথি আছে, তাহার পুষ্পিকা এই :—

"ইতি শ্রীজগদীশপঞ্চাননভট্টাচার্য্যবিরচিতানন্দলহরীস্তবরহস্যপ্রকাশঃ সম্পূর্ণঃ॥ শ্রীরাজীবন্যায়ালঙ্কারস্য পুস্তকঞ্চ॥ শকাব্দাঃ ১৫৬২" (৫৮ ক পত্র)

গ্রন্থারম্ভে আছে :—

শঙ্করচরণসরোজং শ্রীজগদীশদ্বিজো নত্বা।
শঙ্করকবিবরসূক্তেঃ সরসরহস্যং প্রকাশয়তি॥

৪। **মহিম্নঃস্তবরহস্যপ্রকাশ**ঃ ইহাও সুপ্রাপ্য। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত পুথির তারিখ ১৫৭০ শক ১৫ চৈত্র। এই টীকার বিশেষত্ব—ইহাতে প্রত্যেক শ্লোকের শিবপক্ষে, সূর্য্যপক্ষে এবং বিষ্ণুপক্ষে ত্রিবিধ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভ এই :—

অর্দ্ধস্থাণুবিলগ্নাপ্যর্দ্ধমপর্ণা লতা কাপি।
অবিকলফলজনয়িত্রী ভবতাং ভূত্যৈ চিরং ভূয়াৎ॥
পুষ্পদন্তসমুদ্গীতস্তবে সম্প্রতি শূলিনঃ।
আদরাৎ জগদীশেন রহস্যার্থঃ প্রকাশ্যতে।
শৈবাঃ কতিচন সৌরা বৈষ্ণবা বিলসন্তি কিয়ন্তঃ।
ব্যাখ্যাত্রয়েণ তেষাং বয়মিহ মুদমাচরিষ্যামঃ।

এই গ্রন্থের পুষ্পিকায়ও স্পষ্ট "জগদীশ পঞ্চানন" লিখিত আছে।

৫। **ভগবদ্গীতারহস্যপ্রকাশ**ঃ ভগবদ্গীতার উপর পৃথক্ বাঙালী-রচিত টীকা দুর্ল্লভ—জগদীশ পঞ্চানন-রচিত এই টীকার তজ্জন্য একটা মূল্য আছে।[৮]

৮। *Notices of Sans. mss.* (H. P. Sastri) vol. 1, pp. 255-56।

কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তী নামক একজন গ্রন্থকার "বুদ্ধিপ্রদীপ" নামক জ্যোতিষগ্রন্থে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৬৩ সং পুথি, ২১ খ পত্র দ্রষ্টব্য) সম্ভবতঃ এই টীকারই বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"অতএব মায়াবচ্ছিন্নব্রহ্মৈব জীব ইতি ভগবদ্গীতাটীকায়াং জগদীশতর্কালঙ্কারেণ ব্যাখ্যাতং।" বহুপূর্ব্ব হইতেই "পঞ্চানন" জগদীশ "তর্কালঙ্কার" মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইয়া আছেন!

৬। **মহিষমর্দ্দিনীস্তবরহস্যপ্রকাশ :** স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই দুর্ল্লভ গ্রন্থের বিবরণ দিয়াছেন, পুষ্পিকায় "জগদীশ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যবিরচিত" বলিয়াই লিখিত আছে।[৯]

৭। **সংক্ষেপসার :** একটি তান্ত্রিক নিবন্ধ। ইহার একটি মাত্র খণ্ডিত পুথি স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের গ্রন্থমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে—পত্রসংখ্যা মাত্র ১৬। গ্রন্থারম্ভ এই :—

বার্দ্ধক্যাদিতি সর্ব্বপর্ব্বতপতিশ্মেনাতু শৈত্যাদিতি
প্রোবাচ স্মরশাসনাদিতি পুনর্ম্মেনাকসীমন্তিনী।
ইত্থং সংশয়কোটিভিঃ কবলিতঃ কোঽপ্যেস কম্পঃ করে
শম্ভোঃ শৈলসুতাকরপ্রণয়নে ভূয়াচ্চিরং ভূতয়ে॥
প্রাচীনতন্ত্রাণ্যবধায় ধীরঃ সন্তো গুরুভ্যঃ সমুপেতা শিক্ষাং।
সংপ্রীতয়ে শ্রীজগদীশশর্ম্মা সংক্ষেপসারং পরমাতনোতি॥
দুর্ম্মেধানাং দরিদ্রাণাং কলাবচিরজীবিনাং।
অলসানামনায়াসসাধ্যো বিধিরিহোচ্যতে॥
তত্রাদৌ দীক্ষাকালঃ যথা কালোত্তরে···

পুষ্পিকার অসদ্ভাবে এ স্থলেও গ্রন্থকার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে, কিন্তু তিনি যে নৈয়ায়িক তর্কালঙ্কার নহেন, ইহা নিশ্চিত এবং কাব্যপ্রকাশ-টীকার মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের সহিত উদ্ধৃত শ্লোকের ভাবগত সাদৃশ্য সকল সন্দেহ দূর করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

৮। **দায়ভাগের টীকা :** একটি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির তালিকায় দায়ভাগের "জগদীশকৃত টীকা"র উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই গ্রন্থ এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

উল্লিখিত বিবরণীর সারাংশ এই যে, জগদীশ পঞ্চানন নামক স্মৃতি, তন্ত্র ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের একজন মহাপণ্ডিত অনুমান ১৬০০ খ্রীঃ জীবিত ছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ নবদ্বীপ অঞ্চলে প্রচারিত এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারের সহিত অভিন্ন ধরিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তিনি নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়েই নবদ্বীপের একটি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশে স্মৃতি ও তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ এক জগদীশ পঞ্চাননের নাম পাওয়া যায়। আমরা তাঁহাকেই উক্ত গ্রন্থরাজির রচয়িতা বলিয়া ধরিতে পারি। পাশ্চাত্য বৈদিকশ্রেণীর অগ্নিবেশ্যগোত্রীয় "অর্জ্জুন মিশ্র" এই বংশের আদিপুরুষ সর্ব্বপ্রথম (মিথিলা হইতে) নবদ্বীপে আসেন। ইহাঁদের মধ্যে একটি অমূলক প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ইনিই ভারতটীকাকার। অর্জ্জুন মিশ্রের পুত্র "নয়নানন্দ"—তিনিই অমরকোষের টীকাকার কি না, জানিবার উপায় নাই।[১০]

৯। H. P. Sastri : *Notices of Sans. Mss.*, vol. ii, p. 142

১০। পূর্ব্বস্থলীর ৺ন্যায়পঞ্চাননগৃহে নয়নানন্দ-রচিত অমরকোষটীকার ১৫৯৮ শকাব্দের একটি প্রতিলিপি আছে। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অর্জ্জুন মিশ্রের বংশলতা "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে" (ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৮৩) ও বিশ্বকোষে (২য় সংস্করণে) মুদ্রিত করিয়াছেন।

নয়নানন্দের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশের ধারা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং তৃতীয় পুত্র মথুরেশের ধারাও ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায়। নয়নানন্দের দ্বিতীয় পুত্রই জগদীশ পঞ্চানন; তাঁহার ধারা বিস্তৃত, পণ্ডিতবহুল এবং খ্যাতনামা। এই বংশের সমস্ত পণ্ডিত আত্যন্ত স্মৃতিশাস্ত্র-ব্যবসায়ী এবং ইহাঁদের মন্ত্রশিষ্য সমগ্র বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারে ছড়াইয়া আছে। দুঃখের বিষয়, এই বংশের সমস্ত কীর্ত্তিকাহিনী কালক্রমে বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ (জগদীশ পঞ্চাননের প্রপৌত্র) "গোপাল ন্যায়ালঙ্কার"কে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, অর্জ্জুন মিশ্র ব্যতীত উর্দ্ধতন পুরুষগণের এবং তৎসঙ্গে স্বয়ং জগদীশ পঞ্চাননেরও স্মৃতিকথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া আছে। গোপাল ন্যায়ালঙ্কার সম্বন্ধে প্রচলিত নানাবিধ ভ্রান্ত মত সংশোধনের পূর্ব্বে আমরা উর্দ্ধতন কতিপয় কৃতী পুরুষের কীর্ত্তিকথা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব।

এই বংশে চিরপ্রচলিত প্রবাদ আছে যে, ইহাঁদের দ্বারাই রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব বঙ্গদেশে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। স্বর্গত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মতে প্রবাদটি এই—নয়নানন্দের এক পুত্র (নাম অজ্ঞাত) রঘুনন্দনের ছাত্র ছিলেন। রঘুনন্দন "সংস্কারতত্ত্বে"লিখিত স্বকীয় নূতন মতানুসারে নিজ পুত্রের উপনয়ন দিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি ("উভয়তো ব্রাহ্মণত্বাসিদ্ধেঃ" বলিয়া) তাহা অসিদ্ধ প্রতিপন্ন করায় "সংস্কারতত্ত্ব" ও তাঁহার রচিত অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থের প্রচারে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বৈদ্যনাথ ধামে গ্রন্থপ্রচার প্রার্থনায় রঘুনন্দনের উপর স্বপ্নাদেশ হয়, "তাঁহার (উক্ত) ছাত্রের অধস্তন পুরুষে ইহা পূর্ণপ্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।" এই আশ্চর্য্য প্রবাদবাক্যে স্মৃতিলোপহেতু জগদীশের নামোল্লেখ না থাকিলেও নয়নানন্দের অন্যতম পুত্র বলিয়া যে তাঁহাকেই ধরা হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় "স্মৃতিতত্ত্বং বিজানতা" পদের অক্ষরানুগত ব্যাখ্যাও তাহাই সূচিত করে। সুতরাং জগদীশ পঞ্চানন স্বয়ং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ছাত্র ছিলেন, উক্ত প্রবাদের এই সারাংশ আলোচনাযোগ্য। রঘুনন্দনের "জ্যোতিস্তত্ত্বে" সংক্রান্তি গণনার প্রণালী ১৪৮৯ শকাব্দ-(১৫৬৭ খ্রীঃ) ঘটিত বটে, সুতরাং জ্যোতিস্তত্ত্ব ১৫৬৭ খ্রীঃ পূর্ব্বে রচিত হয় নাই, অথচ জ্যোতিস্তত্ত্ব তাঁহার শেষ গ্রন্থ নহে। কৃত্যতত্ত্বে জ্যোতিস্তত্ত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং মলমাস তত্ত্বে ২৮ গ্রন্থের নামোল্লেখমধ্যে জ্যোতিস্তত্ত্ব বিংশ গ্রন্থ। অতএব ১৫৭৫ খ্রীঃ এবং কিঞ্চিৎ পরেও রঘুনন্দন জীবিত ছিলেন নিঃসন্দেহ। পক্ষান্তরে জগদীশ পঞ্চাননের ছাত্র মথুরেশ ন্যায়ালঙ্কারের অভ্যুদয়কাল ১৬৩৯—১৬৫৮ খ্রীঃ মধ্যে নিশ্চিত এবং এ যাবৎ আবিষ্কৃত তাঁহার গ্রন্থের প্রাচীনতম প্রতিলিপির তারিখ ১৬৪০ খ্রীঃ। তাঁহার গ্রন্থরচনার তারিখ ১৬০০ খ্রীঃ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না এবং রঘুনন্দনের শেষ সময়ে জগদীশ পঞ্চানন তাঁহার ছাত্র ছিলেন অসম্ভব মনে হয় না।

আমরা নবদ্বীপের স্থানীয় কোন কোন অধ্যাপকের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, উপাধিপ্রভেদ সত্ত্বেও উল্লিখিত গ্রন্থরাজি জগদীশ তর্কালঙ্কার-রচিত বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় সংস্কার দূর হয় নাই। প্রতিলিপিতে লিপিকারের অনবধানতাবশতই "তর্কপঞ্চানন" কিম্বা

"পঞ্চানন" উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। বস্তুতঃ তাঁহাদের এ ধারণা কোনক্রমেই প্রমাণসিদ্ধ হয় না। উল্লিখিত গ্রন্থরাজির একটি প্রতিলিপিতেও "তর্কালঙ্কার" উপাধি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং তর্কালঙ্কারের ন্যায়গ্রন্থের শত-সহস্র প্রতিলিপির একটিতেও "পঞ্চানন" উপাধি পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, আনন্দলহরীটীকার ১৬৪০ খ্রীঃ প্রতিলিপি যখন (নবদ্বীপে) লিখিত হয়, তখন জগদীশ পঞ্চানন ও তর্কালঙ্কার উভয়ই খুব সম্ভবতঃ জীবিত ছিলেন। কারণ, তখন গদাধরের প্রথম অভ্যুদয়কাল এবং জগদীশের অনুমানখণ্ডের প্রাচীনতম প্রতিলিপির তারিখ ১৫৩২ শকাব্দ (১৬১০ খ্রীঃ)। উক্ত আনন্দলহরীটীকার স্বত্বাধিকারী রাজীব ন্যায়ালঙ্কার উপাধি ভুল লেখাইয়াছিলেন, ইহা তৎকালে নিতান্তই অসম্ভব। শ্রাদ্ধ-বিবেকের টীকার মঙ্গলাচরণে যাঁহাকে প্রণাম করা হইয়াছে, তিনি এখনও নবদ্বীপের অগ্নিবেশ্য-বংশের ইষ্টদেবতা এবং ঐ বংশের যে কয়টি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বংশলতা আমরা পরীক্ষা করিয়াছি, সর্ব্বত্র জগদীশের "পঞ্চানন" উপাধিই লিখিত আছে। সুতরাং তিনিই যে আলোচ্য গ্রন্থকার বটেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না।

জগদীশের ৫ পুত্রমধ্যে ২য় রামভদ্রের বংশ মহেশপুরে অবস্থিত এবং ৩য় মহাদেব (বিদ্যাবাগীশ) অপুত্রমৃত। ৪র্থ হরিদেব তর্কবাগীশ পূর্ব্বস্থলীর খ্যাতনামা মৌদ্গল্যবংশীয় মুকুটরাম রায়ের পৌত্র বাণেশ্বর রায়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং গুরুর আদেশে বাণেশ্বর অন্ধ গুরুকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হরিদেবের পুত্র **কাশীনাথ তর্কালঙ্কার** একজন গ্রন্থকার। তিনি **"মন্ত্রপ্রদীপ"** নামে এক তন্ত্রনিবন্ধ রচনা করেন, যথা :—

বিখ্যাতো হরিদেবপূর্ব্ব ইতি যোঽভূত্তর্কবাগীশ্বর-
স্তাতো যস্য মহীতলে বিবিধসদ্বিদ্যাদিভিঃ সংযুতঃ।
তস্মাত্তন্ত্রবরাণ্যধীতা বহুশঃ সচ্ছিষ্যচেতোমুদে
কাশীনাথ ইতি দ্বিজো বিতনুতে মন্ত্রপ্রদীপং শুভং ॥

তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ **ষট্চক্রের টীকা**, যথা :—

মনাক্‌কটাক্ষবিক্ষেপাৎ পালয়ন্তী জগত্রয়ং।
কুণ্ডলী ভবতাং ভূত্যৈ ভূয়াদ্ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥
বৈদিকান্বয়সম্ভূতনবদ্বীপনিবাসিনা।
ষট্চক্রে ক্রিয়তে টীকা শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণা ॥১১

কাশীনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। জগদীশের ৫ম পুত্র বিশ্বনাথ সার্ব্বভৌমই স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন (১২৪০-১৩১৮) মহাশয়ের সাক্ষাৎ পূর্ব্বপুরুষ।[১২]

১১। মন্ত্রপ্রদীপের খণ্ডিত পুথি পূর্ব্বস্থলীর ৺ন্যায়পঞ্চাননের গৃহে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও একটি প্রতিলিপি আছে (১৯০৪ ৬ সং পুথির ৬৬-৯৪ পত্র—৮৩থ পত্রে ১ম পরিচ্ছেদের পুষ্পিকা দ্রষ্টব্য); ৩ পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থ সমাপ্ত। ষট্চক্রটীকার ২টি প্রতিলিপি (তন্মধ্যে একটি খণ্ডিত) উক্ত ন্যায়পঞ্চাননের গৃহে রক্ষিত আছে।

১২। বিশ্বনাথ সার্ব্বভৌমের তৃতীয় পুত্র রামনাথ ন্যায়বাগীশ, তজ্জ্যেষ্ঠপুত্র রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত (জন্ম-শকাব্দাঃ ১৬৪৩।১।২২), তাঁহার পঞ্চম পুত্র অভয়াচরণ তর্কবাচস্পতি (জন্মশকাব্দাঃ ১৬৯১।৬।৯), তৎপুত্র কেশবচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও তৎপুত্র কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন। অভয়াচরণ প্রথম নবদ্বীপ হইতে পূর্ব্বস্থলী যান, কিন্তু পূর্ব্বস্থলীতে ঐ সময়ে অভয়াচরণ তর্কভূষণ নামে ভিন্নবংশীয় একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।

জগদীশের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবদেব (ন্যায়বাগীশ) ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়রাম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এই জয়রামই সম্ভবতঃ "নব্যধর্ম্মপ্রদীপ"কার স্মার্ত্ত কৃপারাম (তর্কভূষণ) ভট্টাচার্য্যের গুরু ছিলেন। কৃপারাম গ্রন্থারম্ভে "পলিতশিরাঃ" জয়রাম গুরুর বন্দনা করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ গ্রন্থরচনাকালে (১৭৬৪ খ্রীঃ) জয়রাম অতিবার্দ্ধক্যাবস্থায় জীবিত ছিলেন।[১৩]

গোপাল ন্যায়ালঙ্কার

জয়রামের জ্যেষ্ঠ পুত্রই নবদ্বীপসমাজের তৎকালীন মুকুটমণি "রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য", সংক্ষেপে গোপাল ন্যায়ালঙ্কার। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত মত নানা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে প্রচারিত হইয়া সংস্কারবদ্ধ হইয়া আছে, বর্ত্তমানে তাহা সংশোধন করা দুরূহ ব্যাপার। ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভে রাজশক্তির আহ্বানে নানা স্থান হইতে যে ১১ জন পণ্ডিত মিলিত হইয়া "বিবাদার্ণবসেতু" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শীর্ষস্থানে ছিলেন এই রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার। এই গ্রন্থরচনার আমূল বৃত্তান্ত Halhed সাহেব দিয়াছেন। তৎপাঠে জানা যায়, ১১৮০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে আরম্ভ হইয়া ১১৮১ সনের ফাল্গুন মাসে গ্রন্থ রচনা শেষ হয়। রচনাকার্য্যে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারেরই সম্ভবতঃ প্রাধান্য ছিল; কারণ, মূল গ্রন্থের শেষ শ্লোকে সর্ব্বাগ্রে বাণেশ্বরের নাম আছে। কিন্তু Halhed সাহেব পণ্ডিতদের নাম ও উপাধির যে সম্পূর্ণ তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কারই সর্ব্বপ্রথম এবং বাণেশ্বর চতুর্থ। এই তালিকা বয়ঃক্রমানুসারে রচিত; পণ্ডিতদের প্রবীণতা প্রসঙ্গে এক স্থলে লিখিত আছে যে, তাঁহাদের মধ্যে একজন ৮০ উত্তীর্ণ এবং একজন মাত্র ৩৫এর নীচে।[১৪] সৌভাগ্যক্রমে গোপাল ন্যায়ালঙ্কারই যে গ্রন্থরচনাকালে অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। শ্রীরামপুরের

১৩। নব্যধর্ম্মপ্রদীপের রচনাকাল ১৬৮৬ শকাব্দ গ্রন্থমধ্যে দুই স্থলেই লিখিত আছে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৬০২ সং পুথির ৩খ ও ২৫ খ পত্র দ্রষ্টব্য)। কৃপারাম মুখবংশীয় নন্দরামের পুত্র এবং নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও বর্দ্ধমানরাজ ত্রিলোকচন্দ্রের প্রীত্যর্থে এই বিপুল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

১৪। N. B. Halhed : *A Code of Gentoo Laws*, London, 1776 : Preface p. lxviii (Chap. xx.) ১১ জনের মধ্যে ৩ জন নবদ্বীপের—রামগোপাল, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ (দশম নাম, বয়স অনূন ৩৫) এবং বীরেশ্বর পঞ্চানন (দ্বিতীয় নাম, বয়স ৮০র নীচে)। বাণেশ্বর গুপ্তপল্লীনিবাসী। বাকী ৭ জনের পরিচয় অজ্ঞাত। রাজা নবকৃষ্ণের "নবরত্ন" সভার সদস্য "পশপুরের স্মার্ত্ত কৃপারাম" (মাধব-মালতী, ১২৫৭, পৃঃ ৪) ইঁহাদের অন্যতম ধরা হয়, কিন্তু পশপুরের কৃপারাম (১১০০-১২১১) "তর্কবাগীশ" ছিলেন, তর্কসিদ্ধান্ত নহে। কেরী সাহেবের দ্বারস্থ গোপাল ন্যায়ালঙ্কার নিশ্চিতই বিভিন্ন লোক—নবদ্বীপের গোপাল ন্যায়ালঙ্কার কেরী সাহেবের এদেশে আগমনের পূর্ব্বেই স্বর্গী হইয়াছিলেন; আর নবদ্বীপসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সাহেবের লিপিকার (amanuensis) হইবেন, ইহা তৎকালে কল্পনার অতীত ছিল। "গোপাল তর্কালঙ্কার" নামে ওয়ার্ড সাহেবের দ্বারস্থ পণ্ডিত ১৮১৭ সনে শ্রীরামপুর প্রেসের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন (*The Hindoos*: Vol. II. p. 314); তিনিই সম্ভবতঃ কেরী সাহেবের লেখকরূপে কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন।

পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার হিন্দু জাতির বিবরণ গ্রন্থে সতীদাহপ্রকরণে প্রসঙ্গক্রমে এই মূল্যবান্ তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—

"About the year 1791, Gopalu Nayalunkaru, a very learned bramhun, died at Nudeeya. He was supposed to have been one hundred years old at the time of his death; his wife about eighty. She was almost in a state of second childhood, yet her grey hairs availed nothing against this most abominable custom."
(Ward : *The Hindoos*. . . London, 1822, Vol. III, p. 321)

অর্থাৎ, প্রায় ১৭৯১ খ্রীঃ নদীয়ার গোপাল ন্যায়ালঙ্কার ১০০ বৎসর বয়সে স্বর্গী হইলে তাঁহার অশীতিবর্ষবয়স্কা পত্নী সহমরণ গিয়াছিলেন। এই সতীদাহের স্মৃতি এখনও এই বংশে বাঁচিয়া আছে। এই সতীশিরোমণি পত্নীর নাম ছিল "মহামায়া দেবী" এবং ভাগীরথীর তীরে সহগামিনী হওয়ার পূর্ব্বে প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি অম্লানবদনে তপ্ত তৈলে হস্তদাহ প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। একটি প্রাচীন পত্রে এই ঘটনার তারিখ "১৬ শ্রাবণ" লিখিত আছে, কিন্তু সঠিক সন অজ্ঞাত।

গোপাল ন্যায়ালঙ্কারের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপের এই বিখ্যাত পণ্ডিতগোষ্ঠী "জোড়াবাড়ীর ভট্টাচার্য্য" নামে পরিচিত। এই নামের ইতিবৃত্ত এখন বিস্মৃত-প্রায় হইয়াছে। প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে পুরাতনগঞ্জ নামক পাড়ায় গোপাল ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত ন্যায়বাগীশ একত্র বাস করিতেন। ভ্রাতৃদ্বয় পৃথগন্ন হইয়া এক বসতবাটীতে ২টি দ্বার ও এক টোলবাটীতে ২টি দেউড়ি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহাতে ঐ বাটী "জোড়াবাড়ী" নামে খ্যাতিলাভ করে। পুরাতনগঞ্জ এখন গঙ্গাগর্ভে বা অপর পারে গিয়াছে বটে, কিন্তু জোড়াবাড়ী নামটি এখনও পূর্ব্বস্মৃতি বহন করিয়া চলিতেছে। গোপালের ২য় পুত্র রামদাস সিদ্ধান্তপঞ্চানন ব্যতীত নবদ্বীপের অন্যতম প্রধান স্মার্ত্ত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (মৃত্যু ১৮১৮ খ্রীঃ) এবং শান্তিপুরের মহাপণ্ডিত রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য্য গোপালের ছাত্র ছিলেন।[১৫] বংশের প্রবাদ অনুসারে গোপালই নব্য ন্যায়ের অধ্যাপনা ছাড়িয়া নবদ্বীপে সর্ব্বপ্রথম পৃথক্‌ভাবে স্মৃতির অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত করেন। এই প্রবাদ অমূলক হইলেও গোপাল ন্যায়ালঙ্কার ন্যায়শাস্ত্রেও কৃতবিদ্য ছিলেন সন্দেহ নাই।[১৬]

১৫। আমরা বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছি, বিবাদার্ণবসেতু রচনাকালে গোপাল ও কালীশঙ্করের অনুপস্থিতিতে জোড়াবাড়ীর জোড়া চতুষ্পাঠীর একটিতে রামদাস এবং অপরটিতে গোপালের অপর এক জন প্রধান ছাত্র ও মন্ত্রশিষ্য পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতম প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত "কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার" (১১৫৬-১২২৫) অধ্যাপক হইয়াছিলেন। রাজবাড়ীর এক উপনয়ন ব্যাপারে 'সন্ধ্যাগর্জন'-ঘটিত কূটবিচারে নবদ্বীপরাজসমক্ষে কৃষ্ণচন্দ্র জয়ী হইয়া অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে নিয়ম ছিল, কৃতী ছাত্র পাঠ সাঙ্গ হওয়ার পরও অধ্যাপকের সহকারিরূপে কিছুকাল থাকিয়া অধ্যাপনায় অভিজ্ঞতা লাভ করিত। উক্ত কৃষ্ণচন্দ্র প্রবন্ধলেখকের বৃদ্ধপ্রপিতামহ পর্য্যায়ের জ্ঞাতি ছিলেন।

১৬। নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশের গৃহে এখনও অনেক হস্তলিখিত গ্রন্থ রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে "কেবলান্বয়ী" গ্রন্থের একটি টীপ্পনীর শেষে লিখিত আছে :—

"শ্রীগোপালন্যায়ালঙ্কারেণ ময়া শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া লিখিতাসৌ"

শ্রীকৃষ্ণ (সার্ব্বভৌম ?) সম্ভবতঃ গোপালের ন্যায়গুরু ছিলেন।

বৈদ্যবংশাবতংস রাজনগরাধিপ মহারাজ রাজবল্লভ দ্বিজাচারে উপনয়নসংস্কার প্রবর্ত্তন উপলক্ষে নানাদেশীয় বহু প্রধান পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের ব্যবস্থা লইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন (*Hindoos* : Vol. I. p. 32 f. n.), তদুপলক্ষে কোন কোন পণ্ডিত ১০,০০০৲ মুদ্রা পর্য্যন্ত নগদ দক্ষিণা পাইয়াছিলেন। রাজবল্লভবংশীয় কালীনাথ সেন ১৭৬৭ শকে মুদ্রিত "অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা" গ্রন্থে ঐ ব্যবস্থা ও পণ্ডিতদের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন (পৃঃ ৮২-৮৮)—এই ব্যবস্থা অনুমান ১৭৫০ খ্রীঃ রচিত এবং ঐ সময়ের বঙ্গদেশীয় খ্যাতনামা পণ্ডিতদের নাম, উপাধি ও বাসস্থান এই অমূল্য গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নবদ্বীপের নিম্নলিখিত ১৬ জন পণ্ডিতের নাম আছে :—

গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, তিতুরাম তর্কপঞ্চানন, হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত, রামকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার, শিবরাম বাচস্পতি, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার, শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, রামহরি বিদ্যালঙ্কার, বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার, সদাশিব ন্যায়ালঙ্কার, কৃপারাম তর্কভূষণ, বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন, রামকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও শঙ্কর তর্কবাগীশ। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এখানে গোপালই নবদ্বীপের নায়করূপে সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

গোপাল ন্যায়পঞ্চানন

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় গোপাল ন্যায়ালঙ্কারের কীর্ত্তিকথা জানিয়াও ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ তাঁহাকে "নির্ণয়কার গোপাল ন্যায়পঞ্চাননে"র সহিত অভিন্ন ধরিয়া "স্মৃতিসিদ্ধান্ত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫-১৭) :—

"তত্র নবদ্বীপনিবাসিনঃ স্মৃতিতত্ত্বাধ্যয়নপ্রবর্ত্তকস্য অস্মদতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ-ভ্রাতৃপৌত্রস্য নির্ণয়াদিগ্রন্থপ্রণেতুঃ পূজ্যপাদগোপালন্যায়পঞ্চাননস্য তনয়ো রামদাসসিদ্ধান্তপঞ্চাননঃ··· ।"

তদনুসারে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি অনেকে বিভিন্ন গ্রন্থে তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন।[১৭] এই অভেদকল্পনা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণবিরুদ্ধ। গোপাল ন্যায়পঞ্চাননের একটি গ্রন্থ "অশৌচনির্ণয়" ১৫৩৫ শকাব্দে (১৬১৩ খ্রীঃ) অর্থাৎ গোপাল ন্যায়ালঙ্কারের জন্মের প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এবং তাঁহার নির্ণয়াদিগ্রন্থের বহু প্রতিলিপি ন্যায়ালঙ্কারের জন্মের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।[১৮] প্রাণতোষণীকার রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার দ্বিতীয় ধর্ম্মকাণ্ডের শেষে আত্মপরিচয়স্থলে লিখিয়াছেন, তন্ত্রসারকর্ত্তা কৃষ্ণানন্দের পৌত্র গোপালই "নির্ণয়"কার :—

১৭। *Des. Cat. of Sans. Mss.*, *A. S. B.*, vol. iii. p. 199. নবদ্বীপমহিমা, পৃঃ ১২৭। Jayaswal & Sastri : *Mithila Mss* (*Smriti :*) p. ix.

১৮। অশৌচনির্ণয়—L. 3184 : প্রতিলিপির তারিখ ১৬১৪ শক ও রচনাকাল "শাকে শরৈর্বহ্নিশরেন্দুমানে।" তদ্রচিত "সম্বন্ধনির্ণয়ে"র প্রতিলিপির তারিখ ১৫৪৪ শক (Jayaswal & Sastri : *Smriti Mss. of Mithila* p. 493.) রঘুনন্দনের টীকাকার কাশীরাম বাচস্পতি বহু স্থলে গোপালের সন্দর্ভ "বৃদ্ধপঞ্চানন" নামে উদ্ধৃত করিয়াছেন (শুদ্ধিতত্ত্ব, বঙ্গবাসী ২য় সং, পৃঃ ১৫২, ১৮১, ২১৭, ২৪৪ ইত্যাদি)। নবদ্বীপ জোড়াবাড়ীর (গোপাল ন্যায়ালঙ্কারেরই অধস্তন বংশধর) স্বর্গত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের গ্রন্থাগারে ১৫৮০ শকাব্দে লিখিত গোপাল ন্যায়পঞ্চানন-রচিত ৪ খানা গ্রন্থের প্রতিলিপিতে পুষ্পিকায় "ইতি বৃদ্ধগোপালন্যায়পঞ্চাননবিরচিতঃ" পাওয়া যায়—লেখক কৃষ্ণজীবন শর্ম্মা। এই "বৃদ্ধ" সংজ্ঞার মধ্যে কোন্ উপাখ্যান অন্তর্নিহিত আছে, এখন জানিবার উপায় নাই।

ধীমান্ শ্রীমান্ ভুবনবিদিতস্তন্ত্রসারস্য কর্ত্তা,
কৃষ্ণানন্দোঽজনি ভুবি নবদ্বীপদেশপ্রদীপঃ।
কাশীনাথোঽভবদিহ সুতস্তস্য সারাবলীকৃৎ
বিদ্বান্ মান্যোঽজনি তদনুজো বিশ্বনাথাহ্বয়োঽতঃ॥
গোপালো নির্ণয়কৃতিযশস্বী মধোঃ সূদনশ্চা-
ভূতাং পুত্রৌ...... (৭৯ খ পত্র)

রামতোষণের এই উক্তিও নিঃসন্দিগ্ধ নহে। কৃষ্ণানন্দের পৌত্র এবং হরিনাথের পুত্র (বিশ্বনাথের নহে) গোপাল "পঞ্চানন" (ন্যায়পঞ্চানন নহে) "তন্ত্রদীপিকা" নামে এক বিরাট্ তান্ত্রিক নিবন্ধ রচনা করেন ; তিনি সমকালীন হইলেও "বৃদ্ধ পঞ্চানন" হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।[১৯] উভয়ের মঙ্গলাচরণ-শ্লোক হইতেও এইরূপ অনুমান সঙ্গত হয়।" শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে (২য় খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৭০) অপর একটি নিষ্প্রমাণ উক্তি লিখিত হইয়াছে যে, "নির্ণয়"কার গোপাল ("রামগোপাল ন্যায়পঞ্চানন") পুঁঠিয়ার রাজসভায় ছিলেন এবং তাঁহার বংশ এখন শ্রীহট্টে অবস্থিত। গোপাল নাম ও ন্যায়পঞ্চানন উপাধি এতই সুলভ যে, বহু গ্রামেই এক একজন 'নির্ণয়'কারের অস্তিত্ব মিলিতে পারে! এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ন্যায়পঞ্চাননের সমকালীন অপর একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত গোপাল সিদ্ধান্তবাগীশ "আলোক" নামে কতিপয় স্মৃতিনিবন্ধ লিখিয়াছিলেন।[২০] গোপাল ন্যায়ালঙ্কার উপাধি ও আবির্ভাবকাল দ্বারা ইঁহাদের প্রত্যেক হইতেই পৃথক্ ছিলেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থামূলক বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ নবদ্বীপাদি অঞ্চলে প্রচলিত আছে—ইহাদের রচয়িতা নির্ণয় করা বিষম সমস্যা। স্বর্গত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়দিগের প্রবল সংস্কার হইতে আমাদের অনুমান হয়, তাদৃশ কোন কোন ক্ষুদ্র গ্রন্থ গোপাল ন্যায়ালঙ্কার-রচিত হইলেও হইতে পারে।[২১]

গোপালপুত্র রামদাস সিদ্ধান্তপঞ্চাননের মৃত্যুর পর রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত ছিলেন। ওয়ার্ড সাহেব (১৮১৭ সালের) নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতেও রামনাথই প্রধান স্মার্ত্ত। রামনাথের মৃত্যুর পর রামদাস সিদ্ধান্তপঞ্চাননের একমাত্র পুত্র সুপ্রসিদ্ধ দেবীচরণ তর্কালঙ্কার (১১৬৫—১২৫৪ সাল) সুদীর্ঘকাল প্রধানপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—দেবীচরণের জীবদ্দশায় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন (১২০৯—১২৯১) কিম্বা তাঁহার পিতা লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ প্রাধান্যপদ অধিকার করিতে পারেন নাই। তৎপর দেবীচরণের পৌত্র রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে নবদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীর নবম দশকে রামনাথের পুত্র শ্রীনাথ শিরোমণির দেহত্যাগ হইলে কালমাহাত্ম্যে এই প্রসিদ্ধ বংশের অবনতি আরম্ভ হয়।

১৯। H. P. Sastri : *Notics cof Sans. Mss.* vol. 1. pp. 142-43.

২০। *Darbar Lib. Cat.* 1. pp. 212-13. গোপাল সিদ্ধান্তবাগীশ রঘুনন্দনের পরবর্ত্তী ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

২১। "গোবধপ্রায়শ্চিত্তপত্রলিখনাকারঃ" নামক একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ দুষ্প্রাপ্য নহে, কিন্তু প্রতিলিপিতে গ্রন্থকারের নাম নাই। রাজসাহী মিউজিয়ামে ইহার যে প্রতিলিপি আছে (১৯৭২ সং পুথি), তাহার পুষ্পিকায় "ইতি গোপালন্যায়ালঙ্কারকৃত" লিখিত আছে। "কীরদূত" নামক খণ্ডকাব্য এক রামগোপালরচিত বটে, কিন্তু তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। H. P. Sastri : *Notices of Sans. Mss.* vol. 1, pp. 62-64.

ভুসুকু

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম্ এ, বি এল, ডি লিট

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, ভুসুকু একজন কবির নাম। পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত "বৌদ্ধ-গান ও দোহার" অন্তর্গত "আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়" পুস্তকের ২৩ জন চর্য্যাপদ-কর্ত্তার মধ্যে ভুসুকু একজন। পঞ্চাশটি চর্য্যাপদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (তেরটি) কৃষ্ণাচার্য্যের রচিত। প্রাচুর্য্য হিসাবে কৃষ্ণাচার্য্যের পরই ভুসুকুর স্থান। তিনি আটটি পদের রচয়িতা। তিনি কে এবং কোন্ সময়ের লোক, তাহা আমাদের আলোচ্য।

মহাযান বৌদ্ধমতের তিনখানি গ্রন্থ বোধিচর্য্যাবতার, শিক্ষাসমুচ্চয় ও সূত্রসমুচ্চয়ের লেখক শান্তিদেব। তাঁহার ডাক-নাম ভুসুকু। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের ৯৯৯০ পুথিতে,[১] তারনাথের (১৬০৮ খ্রীঃ অঃ) বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে[২] এবং বু-স্তোনের (১২৯০-১৩৬৪ খ্রীঃ অঃ) বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে[৩] লিপিবদ্ধ আছে। তিনের বৃত্তান্তে যথেষ্ট ঐক্য পাওয়া যায়।

শান্তিদেব ছিলেন সৌরাষ্ট্র দেশের রাজপুত্র। কিন্তু তিনি পিতার মৃত্যুর পর রাজ-সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করিয়া নালন্দে পলাইয়া যান। সেখানে বৌদ্ধাচার্য্য জয়দেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাসমুচ্চয়, সূত্রসমুচ্চয় ও বোধিচর্য্যাবতার নামক তিনখানি পুস্তক রচনা করেন। তিনি গোপনে নিজের কুটীরে বসিয়া লেখাপড়া করিতেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা মনে করিতেন, তিনি ভোজন, শয়ন এবং কুটীরে বসিয়া থাকা ছাড়া আর কিছুই করেন না। তাহাতে তাঁহারা তাঁহাকে ভুসুকু বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ভুক্তি হইতে ভু, সুপ্তি হইতে সু এবং কুটীর হইতে কু। তাঁহারা তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য এক সভায় তাঁহাকে কিছু নূতন বিষয় পাঠ করিতে বলেন। তিনি স্বরচিত বোধিচর্য্যাবতার হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন :—

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতি॥ (৯।৩৫)

ইহার পর তিনি কিছু দিন দক্ষিণদেশে শ্রীদক্ষিণমন্দিরে বাস করেন। তৎপরে তিনি পূর্ব্বদেশে অরিবিশনের রাজাকে বিদ্রোহী প্রজা হইতে রক্ষা করেন। সেই সময় অস্ত্রের মধ্যে তাঁহার একখানি কাঠের তরবারি ছিল। তিনি ইহা কোষবদ্ধ রাখিতেন। রাজার আগ্রহাতিশয্যে তরবারি কোষমুক্ত করিলে, তাহার তেজে রাজার এক চক্ষু কাণা

১। বৌদ্ধগান ও দোহার ভূমিকা, পৃঃ ৯-১১

২। Geschichte des Buddhismus in Indien, পৃঃ ১৪৬, ১৬২-৬৮

৩। History of Buddhism in India and Tibet. Part II, পৃঃ ১৬১-৬৬

হইয়া যায়। তারনাথ এই রাজার নাম পঞ্চমসিংহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মঞ্জুশ্রী মূলতন্ত্রে পঞ্চমসিংহকে কাশীখণ্ডের মূর্দ্ধান দেশের রাজা বলা হইয়াছে।

ইহার পর শান্তিদেব কলিঙ্গদেশে চলিয়া যান। তথা হইতে তিনি দক্ষিণদেশে শ্রীপর্ব্বতে বাস করিতে থাকেন। তথায় অবস্থিতিকালে খতবিহারের রাজার অনুরোধে তিনি পাষণ্ড-গুরু শঙ্করদেবের ইন্দ্রজাল ব্যর্থ করিয়া দেন। এই ঘটনার জন্য সেই স্থানের নাম জিততীর্থ হয়।

সুম্পা ম্খন্-পো (১৭৪৭ খ্রীঃ অঃ) তাঁহার দ্পগ্-ব্সম্-ল্জোন্ বজন্[৪] পুস্তকে বু-স্তোনের বৃত্তান্তকে অনুসরণ করিয়া শান্তিদেব ভুসুকু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি সৌরাষ্ট্রের রাজা কল্যাণবর্ম্মার পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত নাম শান্তিবর্ম্মা ছিল।

তারনাথ বলেন, ভুসুকু শ্রীহর্ষের পুত্র শীলের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন এবং তিনি নালন্দের জয়দেবের শিষ্য ছিলেন। এই জয়দেব ধর্ম্মপালের স্থলাভিষিক্ত। ধর্ম্মপাল রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। ইহাতে শান্তিদেবের সময় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধে স্থাপন করা যাইতে পারে।

এই শান্তিদেব ভুসুকু ও চর্য্যাপদের ভুসুকু একই ব্যক্তি কি না, আমরা এক্ষণে ইহার আলোচনা করিব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়[৫] উভয়ের ভিন্নত্ব অনুমান করিয়াছিলেন। তারনাথ[৬] দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের পাঁচ শিষ্যের মধ্যে এক ভুসুকুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সময় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে। খুব সম্ভবতঃ ইনিই চর্য্যাপদের ভুসুকু। তাহা হইলে শান্তিদেব ভুসুকু এবং চর্য্যারচয়িতা ভুসুকু, উভয়ে পৃথক্ ব্যক্তি। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ভুসুকুর নামকরণ প্রথম ভুসুকুর নাম হইতেই হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় ভুসুকুর চর্য্যাপদের—

আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী

এই দুই চরণ হইতে ভুসুকুকে বাঙ্গালী বলিয়া স্থির করেন। তিনি ইহার অনুবাদ করিয়াছেন,—"রে ভুসু, আজ তুই সত্য সত্যই বাঙ্গালী হইলি, যেহেতু নিজ ঘরিণীকে চণ্ডালী করিয়া লইলি।"[৭] কিন্তু এই অনুবাদ শুদ্ধ নয়। বঙ্গালীর অনুবাদ বাঙ্গালী হইতে পারে না। ইহা বঙ্গাল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। এই জন্য ইহার ক্রিয়াপদ ভইলী স্ত্রীলিঙ্গ। চর্য্যাপদের সংস্কৃত টীকাতে আছে,—"অদ্যৈব বঙ্গালিকা ভূতা।" চণ্ডালী ভ্রান্ত পাঠ। প্রকৃত পাঠ চণ্ডালেঁ। সংস্কৃত টীকাতে আছে,—"চণ্ডালেন নীতা"। সুতরাং শুদ্ধ অনুবাদ হইবে,—"হে ভুসুকু, আজি বঙ্গবাসিনী (জাত) হইল। নিজ গৃহিণীকে

৪। শরৎচন্দ্র দাসের সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ xcix, ১০৩ এবং Cxivii, ১২৬

৫। বৌদ্ধগান ও দোহার ভূমিকা, পৃঃ ২৩

৬। পূর্ব্বোক্ত Geschichte, পৃঃ ২৪৮-২৪৯

৭। বৌদ্ধগান ও দোহার ভূমিকা, ১২ পৃষ্ঠা

চণ্ডালে লইল।" কাজেই এই উদ্ধৃত পদাংশ হইতে ভুসুকুর বাঙ্গালী হওয়া প্রমাণিত হয় না। কোর্দিয়ের পুস্তকতালিকায়[৮] শ্রীগুহ্যসমাজমহাযোগতন্ত্রবালবিধির রচয়িতা এক শান্তিদেবের নিবাস জহোর (Zahor) বা সহোর (Sahora) বলা হইয়াছে। এই শান্তিদেব ও শান্তিরক্ষিত যে একই ব্যক্তি, তাহা নিশ্চিত। সুতরাং তিনিও ভুসুকু হইতে পারেন না।

ভুসুকুর চর্য্যাপদের[৯] ভাষা হইতে আমরা বলিতে পারি, তিনি প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য সে কালের বাঙ্গালা, আসামী ও উড়িয়া হইতে সামান্যই পৃথক্ ছিল। তাঁহার পদে দ্বিতীয়া ও চতুর্থীর বিভক্তি -রে, -ক, -এ—কাহেরে (মুদ্রিত কাহৈরি, ৬); অনুঅণারে (৪৩); নাশক (২১); সহজে (২৭); আনন্দে (৩০)। তৃতীয়ার বিভক্তি -এঁ -এ—মাংসেঁ (৬); বোহে (২১); মাসে, বোহেঁ (২৩); মেলেঁ, লীলেঁ, (মুদ্রিত লোলেঁ) (২৭); চান্দে (৩০); ভান্তিএঁ, সারে (মুদ্রিত ষারে), সহাবেঁ (মুদ্রিত সভাবেঁ), বাতাবত্তেঁ (৪১); সমরসে (৪৩); চণ্ডালেঁ (মুদ্রিত চণ্ডালী), মহাসুহে (৪৯)। পঞ্চমীর বিভক্তি তেঁ—তরঙ্গতেঁ (মুদ্রিত তরঙ্গন্তে) (৬)। ষষ্ঠীর বিভক্তি র, এর—হরিণির, হরিণার (৬); মুসার (মুদ্রিত সুসার), মুষাএর (২১); সসর (৪১)। সপ্তমীর বিভক্তি—এ, -এঁ -ত, (-হি)—গঅণে, নিসিত, (মুদ্রিত নিসিঅ) (২১); মাগে, নিবাণে, পণালেঁ (২৭); মাঝেঁ, নিহুএ (মুদ্রিত নিহু) তেলোএ (মুদ্রিত তৈলোএ) (৩০); তেলোএ, জলে (৪৩); থালেঁ, পরিবারে, জীবন্তে, মইলেঁ (৪৯)।

ক্রিয়ার অতীত কালে—ইল (ইঅ, ইআ, ইউ) ভেলা, মএল, বাধেলি (২৩); ফুলিলা (৪১); ভইলী, লেলী, (৪৯)। ক্রিয়াবাচক বিশেষণে -ইল—বেঢ়িল (মুদ্রিত বেটিল) (৬); মইলেঁ (৪৯)।

মধ্যযুগের বাঙ্গালায় এই সমস্ত বিভক্তি দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (১ম সংস্করণ) হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি,—

মানুষ নিয়োজিল **মারিবাক** তাএ। পৃঃ ৩
তোহ্মাক না দেখিআঁ রোষিব **আহ্মারে**। পৃঃ ৩০৮
নিশিত সপন দেখিল জগন্নাথ। পৃঃ ২৩
ত্ৰতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে। পৃঃ ১
সেই **উপদেশেঁ** হয়িব সকল রক্ষণে। পৃঃ ৩
শ্রমে বড়ায়ি **ভইলী** বেআকুলী। পৃঃ ৩৮৯
কুসুমিত লতাকুঞ্জে **বেঢ়িল** বিবিধ গুঞ্জে মনমথ করে ঝঙ্কারে। পৃঃ ২০৭

ভুসুকু ৬ সংখ্যক চর্য্যাপদে একটী প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন।—

অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।

এই প্রবাদ-বাক্য বাঙ্গালা দেশে এক সময় প্রচলিত ছিল। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের তিন স্থানে এবং কবিকঙ্কণের চণ্ডীর এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।—

৮। P. Cordier প্রণীত Catalogue du Fonds Tibetain, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪০
৯। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের ৬,২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯ সংখ্যক পদগুলি ভুসুকুর রচিত

---যেন বনের হরিণী ল
নিজ মাসে জগতের বৈরী। পৃঃ ৭৮, শ্রীকৃ. কী.
আপনার মাংসে হরিণী জগতের বৈরী। পৃঃ ৮৮, ঐ
আপনা গাএর মাংসে হরিণি বিকলী। পৃঃ ১০০, ঐ
হরিণ জগৎ-বৈরী আপনার মাংসে। পৃঃ ৫৪, কবিকঙ্কণ (বঙ্গবাসী)

বোধ হয়, বঙ্গদেশে হরিণ শিকারের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ না থাকায় প্রবাদ বাক্যটী অপ্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও আসামে প্রবাদ-বাক্যটী প্রচলিত আছে। যথা—হরিণার মাংসই বৈরী।[১০] হয় ত বঙ্গদেশের কোনও স্থানে প্রবাদ-বাক্যটি এখনও প্রচলিত আছে।

একটি কারণে মনে হয়, ভুসুকু পূর্ব্ববঙ্গের লোক হইবেন। তিনি ৪৯ চর্য্যায় বলিয়াছেন,—

বাজনাব পাড়ী পঁউআ খালে বাহিউ
অদঅ বঙ্গাল দেশ[১১] লুড়িউ ॥
আজি ভুসুকু[১২] বঙ্গালী ভইলী,
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে[১৩] লেলী।

অর্থ :—বজ্ররূপ নৌকায় পাড়ি দিয়া পদ্মার খালে বাহিলাম। অদ্বয়রূপ বাঙ্গাল দেশ লুঠ করিলাম। হে ভুসুকু, আজি বাঙ্গালিনী জন্মিলেন। চণ্ডালে (তোমার) নিজ গৃহিণীকে লইয়া গেল।

এই যে নৌকায় পাড়ি দিয়া, পদ্মার খাল বাহিয়া "বাঙ্গাল দেশ" লুঠ করা এবং সেখানে অধিকাংশ চণ্ডালের বাস, ভুসুকুর যুগে এই ভৌগোলিক তথ্য বিদেশীয় কবির পক্ষে জানা এবং তাহা কবিতায় ব্যবহার করা অপ্রত্যাশিত। কাজেই ভুসুকু এই 'বঙ্গাল' দেশেরই এক প্রাচীন কবি, যেমন তাঁহার গুরু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এই বিক্রমপুরেরই প্রাচীন বৌদ্ধ আচার্য্য।

খুব সম্ভবতঃ এই ভুসুকুই চতুরাভরণের (রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলের ৪৮০১ নং পুথির) লেখক। তাহাতে সংস্কৃতের সহিত কয়েকটী বাঙ্গালা পদও দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহার পাঠ অত্যন্ত বিকৃত। তাহার একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

সুর চাপি শশি সমরস জায়
রাউতু বোলে জরমরণ ভয়।[১৪]

এখানে ভণিতায় "রাউতু" আছে। ভুসুকুর—৪১ ও ৪৩ সং গানের ভণিতাতেও "রাউতু" আছে। ইহার ভাবও ভুসুকুর গানেরই মত সহজসিদ্ধি সম্বন্ধে। এই পুথির কাল নেপালী সং ৪১৫ = ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

১০। Some Assamese Proverbs by Major P. R. T. Gordon, No. 327.
১১। মুদ্রিত পাঠ—বঙ্গালে ক্লেশ (পুথি—বঙ্গালে স্লেশ)।
১২। মুদ্রিত পাঠ—ভুষু।
১৩। মুদ্রিত পাঠ—চণ্ডালী।
১৪। পাঠান্তর—সুর চাপি শশি সমরসং জাঈ
রাউতু বোল্লে জর মরণ ভয়—(Descriptive Catalogue of Skt. Ms. vol. 1. p. 85)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
১৩৪৮

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

'ইতি' ও 'হ' এই দুইটি অব্যয় শব্দের উত্তর 'আস'*-পদ যুক্ত হইয়া ইতিহাস। আর ঐ 'ইতি-হ' শব্দের উত্তর 'ঞ্য' প্রত্যয় করিয়া ঐতিহ্য। অতএব ইতিহাস ও ঐতিহ্য কেবল মূলতঃ কেন—অর্থতঃও সম্পর্কিত শব্দ। ইতিহ তথা ঐতিহ্যের প্রাচীন অর্থ ছিল—পারম্পর্য-উপদেশ। ক্রমশঃ ঐতিহ্য প্রমাণের মধ্যে গণ্য হইল—যদিও চরক-সংহিতায়ও ঐতিহ্যের অর্থ আপ্ত উপদেশ—

ঐতিহ্যং নাম আপ্ত উপদেশো বেদাদিঃ ইতি।—চরকে বিমানস্থান

কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, বাল্মীকি-রামায়ণে (যাহা নিশ্চয়ই চরকের পূর্ববর্তী গ্রন্থ) 'ঐতিহ্য' প্রমাণের কোটিতে আরোহণ করিয়াছে—

ঐতিহ্যমনুমানঞ্চ প্রত্যক্ষমপি চাগমম্।
যে হি সম্যক্ পরীক্ষন্তে কুতস্তেষামবুদ্ধিতা॥—৫।৮৭।২৩

আরও লক্ষ্য করিতে হয় যে, কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের দ্বিতীয় অনুবাকে একটি যে প্রাচীনতর মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও ঐতিহ্যের গণনা আছে।

স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষম্ ঐতিহ্যম্ অনুমানচতুষ্টয়ম্।
ঐতৈরাদিত্য-মণ্ডলং সর্বৈরেব বিধাস্যতে॥—১।২

ইহার ভাষ্যে সায়ণাচার্য 'ঐতিহ্যে'র অর্থ করিয়াছেন—'ইতিহাস-পুরাণ-মহাভারত-ব্রাহ্মণাদিকম্'।

সে যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যায়, পৌরাণিকদিগের মতে 'ঐতিহ্য' অন্যতম প্রমাণ এবং ঐ প্রমাণের প্রয়োগস্থলে তাঁহারা উদাহরণ দেন, 'এই বট বৃক্ষে যক্ষিণী বাস করে'—এইরূপ পরম্পরাগত বাক্যই ঐ বৃক্ষে যক্ষিণী-বাসের 'ঐতিহ্য' প্রমাণ।

ইতিহাস কি? ইতিহাস বলিলে এখন আমরা 'হিষ্টরি' বুঝি। হিষ্টরির লক্ষণ কি? History, আর্ণল্ডের মতে, 'is the biography of a nation'—অর্থাৎ, ইতিহাস ব্যক্তি-সংঘের বা জাতির জীবনবৃত্ত। ইতিহাসের ইহাই কি প্রাচীন অর্থ?

* তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস—কঠ, ১।১

শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে একটি বচন আছে—যাহাতে চতুর্বেদ ও ইতিহাস-পুরাণাদিকে ব্রহ্মের নিশ্বাস বলা হইয়াছে—

এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাস-পুরাণং বিদ্যোপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি অনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবেতানি নিশ্বসিতানি।*

—শতপথ, ১৪।৫।৪।১২

এই বচন বৃহদারণ্যক-উপনিষদের ২।৪।১০ মন্ত্রে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।† শ্রীশঙ্করাচার্য ঐ মন্ত্রোক্ত ইতিহাস-পুরাণের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

ইতিহাস ইতি উর্বশী-পুরূরবসোঃ সংবাদাদিঃ—'উর্বশী হাপ্সরাঃ' ইত্যাদি ব্রাহ্মণম্, এবং পুরাণম্—অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ইত্যাদি।

অর্থাৎ, ঐ মন্ত্রে ইতিহাসের অর্থ আখ্যানমূলক ব্রাহ্মণাংশ এবং পুরাণের অর্থ সৃষ্টি-প্রতিপাদক বৈদিক বাক্য।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত একটি প্রাচীনতর মন্ত্রেও ইতিহাস-পুরাণের উল্লেখ আছে—

ঋচো যজূংষি সামানি অথর্বাঙ্গিরসশ্চ যে।
ইতিহাস-পুরাণং চ সর্প-দেব-জনাশ্চ যে॥

ইহার ভাষ্যে সায়ণাচার্য ইতিহাস অর্থে মহাভারত এবং পুরাণ অর্থে ব্রহ্মপুরাণ, পদ্ম-পুরাণ প্রভৃতি বুঝিয়াছেন। এ অর্থ কি সঙ্গত? বিশেষতঃ যখন তিনি নিজেই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যে 'পুরাণ' শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলিয়াছেন —

'ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ ন দ্যৌরাসীৎ ইত্যাদিকং জগতঃ প্রাগবস্থানম্ উপক্রম্য সর্গপ্রতিপাদকং বাক্যজাতম্।'

শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্রও ইতিহাস-পুরাণের একত্র উল্লেখ আছে—

সোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ ইতিহাসম্ আচক্ষীত এবমেব অধ্বর্যুঃ সংপ্রেষ্যতি—১৩।৪।৩।১২

সোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণম্ আচক্ষীত এবমেব অধ্বর্যুঃ সংপ্রেষ্যতি—১৩।৪।৩।১৩

গোপথ ব্রাহ্মণেও অনুরূপ বচন দৃষ্ট হয়—

ইমে সর্বে বেদা নির্মিতাঃ সকল্পাঃ সরহস্যাঃ সব্রাহ্মণাঃ সোপনিষৎকাঃ সেতিহাসাঃ সপুরাণাঃ ইত্যাদি—১।২।৯

(বিশ্বকোশধৃত)

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ও ইতিহাস-পুরাণের দ্বন্দ্বযোগ করিয়া বলিয়াছেন—

ইতিহাস-পুরাণং পুষ্পম্—৩।৪।১

ইহার শ্রীশঙ্করকৃত ভাষ্য এইরূপ :—

তয়োশ্চ ইতিহাসপুরাণয়োঃ অশ্বমেধে পারিপ্লবাসু রাত্রিষু কর্মাঙ্গত্বেন বিনিয়োগঃ সিদ্ধঃ।

এখানে শঙ্করাচার্য বলিতেছেন যে, বহুদিনব্যাপী অশ্বমেধ যজ্ঞে রাত্রিকালে যজমান ইতিহাস-পুরাণ শ্রবণ করিবেন—বেদে এইরূপ বিধি আছে।

ঐ রাত্রির পারিভাষিক নাম 'পারিপ্লবা রাত্রি'। বিবিধ উপাখ্যান-সমষ্টিকে বৈদিক যুগে

* যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ—সায়ণ

† বৃহদারণ্যকের ৪।১।২ ও ৪।৫।১১ মন্ত্রও অবিকল ঐরূপ।

'পরিপ্লব' বলা হইত। যে সকল রাত্রিতে ঐরূপ উপাখ্যান বিবৃত হইত, তাহার সার্থক নাম ছিল 'পারিপ্লবা রাত্রি'। ঐ শঙ্করভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি লিখিতেছেন—

অশ্বমেধ-কর্মণি জামিতা-পরিহারার্থং পারিপ্লবো নানাবিধ উপাখ্যান-সমুদায়ঃ— যত্র তৎ পারিপ্লবং আচক্ষীত ইতি বিধিবশাৎ প্রযুজ্যতে; তাসু রাত্রিষু তস্যৈব কর্মণো অঙ্গত্বেন 'মনুর্বৈবস্বতো রাজা' ইত্যেবংপ্রকারয়োঃ ইতিহাস-পুরাণয়োঃ বিনিয়োগস্য পূর্বতন্ত্রে পারিপ্লবার্থাধিকরণেনৈব সিদ্ধতা—তৎসম্বন্ধি কর্ম পুষ্পম্‌ ইত্যর্থঃ।

গৃহ্য সূত্রে ও মনুসংহিতায় শ্রাদ্ধাদি কার্যে ইতিহাস ও পুরাণ শ্রবণের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্মশাস্ত্রাণি চৈবহি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ।—মনু, ৩।২৩২

উহা বোধ হয়, ঐ বৈদিক বিধিরই প্রতিধ্বনি।

ছান্দোগ্য উপনিষদের বিখ্যাত সনৎকুমার-নারদ-সংবাদে নারদ স্বীয় অধীত বিদ্যার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যেও ইতিহাস-পুরাণের উল্লেখ আছে—

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থম্‌ ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং† পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যম্‌ একায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজন-বিদ্যাম্‌—এতদ্‌ ভগবোঽধ্যেমি—ছান্দোগ্য, ৭।১।২

"আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যজুর্বেদ ও সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, চতুর্থ অথর্ববেদ তাহাও অধ্যয়ন করিয়াছি। পঞ্চম বেদ ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি, পিত্র্য (পিতৃবিদ্যা), রাশি (গণিত), দৈব (Science of Portents), নিধি (জ্যোতিষ), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (ধনুর্বেদ), নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা (নৃত্য-গীত-বাদ্য-শিল্পাদি-বিজ্ঞানানি—শঙ্কর) —এ সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছি।"

এই তালিকা হইতে বৈদিক যুগে বিদ্যার পরিমাণ, প্রকার ও ভেদ কতকাংশে বুঝিতে পারা যায়।

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য ইতিহাস-পুরাণের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদম্‌। বেদানাং ভারতপঞ্চমানাং বেদং ব্যাকরণম্‌ ইত্যর্থঃ। ব্যাকরণেন হি পদাদি-বিভাগশঃ ঋগ্‌বেদাদয়ো জ্ঞায়ন্তে।

অর্থাৎ, পঞ্চম বেদস্বরূপ ইতিহাস-পুরাণ (মহাভারত) লইয়া পঞ্চসংখ্যক বেদ। এখানে শ্রীশঙ্করাচার্য মহাভারতের প্রসঙ্গ কোথায় পাইলেন, নির্ধারণ করা দুরূহ। তাঁহার কথার ভিত্তি বোধ হয়, আদিপর্ব মহাভারতের এই শ্লোক—

বেদান্‌ অধ্যাপয়ামাস মহাভারত-পঞ্চমান্‌—৫৮।১২৮

মৈত্রী উপনিষদের ৬।৩৩ মন্ত্রেও ইতিহাস-পুরাণের একত্র উল্লেখ আছে—

সৈষঃ অগ্নিঃ তস্য ইমা ইষ্টকাঃ যদ্‌ ঋক্‌, যজুঃ সামাথর্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণম্‌।‡

---

† ঐ বচন (ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্‌) ছান্দোগ্যের অন্যত্রও দৃষ্ট হয়—যথা, ৭।২।১ ও ৭।৭।১

‡ ইহার দীপিকার শ্রীরামতীর্থ ইতিহাস-পুরাণের অর্থ না দিয়া এইমাত্র বলিয়াছেন—তস্য ইমা ইষ্টকাঃ সেতিহাসপুরাণাঃ চত্বারো বেদাঃ * * ইহ ইতিহাস-পুরাণয়োঃ একত্বং দ্রষ্টব্যম্‌।

ঋষি রূপকের ভাবে বলিতেছেন—অগ্নির এই সকল ইষ্টক—ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব এবং ইতিহাস ও পুরাণ।

এ সম্পর্কে যথাসাধ্য আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বৈদিক সাহিত্যে ইতিহাসের অর্থ ছিল বেদের 'ব্রাহ্মণ' ভাগে রক্ষিত প্রাচীন পুরাবৃত্ত। *

বেদোত্তর সাহিত্যের অনেক স্থলেও 'ইতিহাস' শব্দ ঐ অর্থেই প্রযুক্ত দেখা যায়—

ঋক্ যজুঃ সাম অথর্বাঙ্গিরসঃ ব্রাহ্মণ কল্প গাথা নারশংসী ইতিহাস-পুরাণম্—আশ্বলায়ন, ৩।৩।১

(আশ্বলায়ন 'নারশংসী'র নাম করিলেন। নারশংসী কি? সায়ণাচার্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-ভাষ্যে বলেন—"মনুষ্যবৃত্তান্তপ্রতিপাদিকা ঋচো নারাশংস্যঃ"।† ইহারাই কি পরবর্তী কালে সংকলিত হইয়া 'হিষ্টরি'-রূপী ইতিহাসের আকার ধারণ করিয়াছিল ?)

রামায়ণে কুশীলবের পরিচয় দিতে কবি বলিতেছেন—

রূপানুরূপৌ রামস্য বিম্বাৎ বিম্বৌ ইবোদ্গতৌ।
বেদ-বেদাঙ্গেতিহাস-পুরাণ-পরিনিষ্ঠিতৌ॥—১।৪।৫১

মহাভারতকার সম্যক্ ভাবে বেদ বুঝিবার জন্য ইতিহাস-পুরাণের সাহায্য লইতে উপদেশ দিয়াছেন—

ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ ‡—আদি, ১।২৬৭

এ সকল স্থলে ইতিহাস ও পুরাণ শব্দ যে সেই প্রাচীন অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়।

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কর্তৃক বেদ ও পুরাণ সংকলনের যে বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে, তৎপ্রসঙ্গে এই শ্লোকটি দেখা যায়।

রোমহর্ষণনামানং মহাবুদ্ধিং মহামুনিম্।
সূতং জগ্রাহ শিষ্যং স ইতিহাস-পুরাণয়োঃ॥—বিষ্ণু, ৩।৪।১০

এখানেও 'ইতিহাস পুরাণ' সেই প্রাচীন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু পূজ্যপাদ টীকাকার শ্রীধর স্বামীর ভিন্ন মত। তিনি এই স্থলে ইতিহাসের অর্থ বুঝাইতে এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

আর্যাদি বহুধাখ্যানং দেবর্ষিচরিতাশ্রয়ম্।
ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাদ্ভুতধর্মযুক্।

* নবপর্যায়ের বিশ্বকোশ (চতুর্থ ভাগ, ১৮৯ পৃষ্ঠা)-লেখকেরও ঐ সিদ্ধান্ত।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত কাশীদাসি মহাভারতের আদি-পর্বের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"প্রথম 'ইতিহাস' মানে ছিল কোন রাজারাজড়া বা বংশাবলী সম্বন্ধে সত্য ঘটনা পর পর লেখা।" বোধ হয় এখানে শাস্ত্রী মহাশয়ের লক্ষ্য—বেদোত্তর সাহিত্যে প্রযুক্ত 'ইতিহাস' শব্দ।

† এ প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।৫ ও ১১।২, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৬।৩২, শতপথ, ১১।৫।৬।৮ এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১।৩ ও ২।৬ দ্রষ্টব্য। ইহার মধ্যে কোথাও কোথাও নারাশংসী গাথার উল্লেখ আছে।

‡ এই শ্লোক বশিষ্ঠ-সংহিতায় অবিকল পাওয়া যায়।

বিষয়টার একটু বিচার করিতে চাই। বিষ্ণুপুরাণকার বলিতেছেন, ব্রহ্মার আদেশে বেদব্যাস বেদ সংকলনে নিযুক্ত হইলেন—

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুম্ প্রচক্রমে—৩।৪।৭

তিনি শিষ্য দ্বারা ঋক্ সংগ্রহ করিয়া ঋগ্বেদ, যজুঃ সংগ্রহ করিয়া যজুর্বেদ, সাম সংগ্রহ করিয়া সামবেদ সংহিতা সঙ্কলন করিলেন—

ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজুংষি চ যজুর্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥—বিষ্ণু, ৩।৪।১৩

আর—

রাজ্ঞস্ত্বথর্ববেদেন সর্বকর্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয়! ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥—বিষ্ণু, ৩।৪।১৪

বেদসংহিতা-সংকলন শেষ হইলে বেদব্যাস পুরাণসংহিতা সংকলনে মনোযোগী হইলেন। চারি বেদের সংহিতা সংকলিত করিতে বেদব্যাসের চারি জন শিষ্য—(পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত) যেমন সাহায্য করিয়াছিলেন, পুরাণ-সংহিতা সংকলন বিষয়ে সূতপুত্র রোমহর্ষণ সেইরূপ সাহায্য করিলেন। তাই বিষ্ণুপুরাণ বলিলেন—'সূতং জগ্রাহ শিষ্যং স ইতিহাস-পুরাণয়োঃ।' কি উপাদান হইতে পুরাণসংহিতা সংকলিত হইল? আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পসিদ্ধি—

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থ-বিশারদঃ॥—বিষ্ণু, ৩।৬।১৬

এবং যেহেতু শিষ্য রোমহর্ষণ এ বিষয়ে গুরুর সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই জন্য বিষ্ণুপুরাণকার বলিলেন—

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ।
পুরাণ-সংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥—বিষ্ণু, ৩।৬।১৭

অতএব আমরা বলিতে চাই, উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে (সূতং জগ্রাহ শিষ্যং স ইতিহাস-পুরাণয়োঃ)—ইতিহাসের অর্থ মহাভারত নয় এবং পুরাণের অর্থ ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি নয়।

মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' রামায়ণ ও মহাভারতকে—বিশেষতঃ মহাভারতকে 'ইতিহাস' বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে তিনি 'ইতিহাস'-শব্দের প্রাচীন প্রয়োগ বা অর্থের কোন বিচার করেন নাই। তাঁহার কথা এই :—

"এখন ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থসকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও রামায়ণই ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস-পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।"

ইতিহাসের মহাভারতোক্ত লক্ষণ এই :—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশ-সমন্বিতম্।
পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

যখন ইতিহাসের এই লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়, তখন ইতিহাস প্রাচীন অর্থ পরিত্যাগ করিয়া 'হিষ্টরী'তে পরিণত হইয়াছে—এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র রামায়ণকে ইতিহাস বলিলেন। কিন্তু রামায়ণ নিজেকে কোথাও ইতিহাস বলেন নাই—'কাব্য' বলিয়াছেন।

বাল্মীকি ঐ ধর্মকামার্থসংযুক্ত 'কাব্য' রচনা করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—কে এই 'কাব্য' পৃথিবীতে প্রচার করিবে?

কৃত্বা চেদম্ অশেষেণ কাব্যং রামায়ণাহ্বয়ম্।
চিন্তয়ামাস ক ইদং লোকেঽস্মিন্ প্রথয়িষ্যতি ।—রামায়ণ, ১।৪।৩৯

তখন শ্রীরামচন্দ্রের অজ্ঞাতবাসী পুত্রদ্বয় কুশীলব আসিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিল—

কুশীলবৌ ইতি খ্যাতৌ সীতারামাঙ্গসম্ভবৌ।

বাল্মীকি তাঁহাদিগকে বলিলেন—'তোমরা এই রামায়ণ-কাব্য আমার নিকট গ্রহণ কর'—

আর্ষং রামায়ণং কাব্যমিদং তাবন্ময়া কৃতম্।
গৃহীতং মন্নিয়োগেন পুণ্যশ্রবণকীর্তনম্ ।—রামায়ণ, ১।৪।৪৩

কুশীলব 'গ্রহণ' করিয়া ঐ আখ্যান গান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা রামের সভায় উপনীত হইলেন এবং শ্রীরামের আদেশে—

ততস্তু তৌ রাঘব-সংপ্রচোদিতৌ
অগায়তাং কাব্যমিদং যথাক্রমম্।—১।৪।৭৩

তাঁহাদিগের প্রতি রামচন্দ্রের আদেশ এইরূপ ছিল—

মমেতিবৃত্তং কিল গেয়মদ্ভুতম্
মহর্ষিবাল্মীকিকৃতং প্রগাস্যতঃ।—১।৪।৭২

লক্ষ্য করুন,—এখানে রামায়ণকে 'ইতিবৃত্ত' বলা হইল। ইতিবৃত্তের সহিত ইতিহাসের নিকট-জ্ঞাতি-সম্বন্ধ। অমর সিংহ তাঁহার বিখ্যাত কোশে ইতিহাস ও পুরাবৃত্তকে প্রতিশব্দ বলিয়াছেন। পুরাবৃত্ত ও ইতিবৃত্ত অভিন্ন। তাহার বহু পূর্বে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বলিয়াছিলেন—ইতিহাস-অর্থে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র।

পুরাণম্ ইতিবৃত্তম্ আখ্যায়িকা-উদাহরণং ধর্মশাস্ত্রম্ অর্থশাস্ত্রং চেতি ইতিহাসঃ

—প্রথম অধিকরণের পঞ্চম অধ্যায়

মহাভারত কিন্তু নিজেকে স্পষ্টভাবে 'ইতিহাস' বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। আদি পর্বের প্রথম অধ্যায়ে ঋষিরা সৌতিকে বলিতেছেন—

ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্।
সংস্কারোপগতাং ব্রাহ্মীং নানাশাস্ত্রোপবৃংহিতাম্॥
জনমেজয়স্য যাং রাজ্ঞো বৈশম্পায়ন উক্তবান্।
যথাবৎ স ঋষিস্তুষ্ট্যা সত্রে দ্বৈপায়নাজ্ঞয়া।—১।৩।১৯-২০

পুনশ্চ—

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনম্।
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ।—১।৩।৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায়, সৌতি বলিতেছেন—

ভারতস্যেতিহাসস্য শ্রূয়তাং পর্বসংগ্রহঃ—১।২।৪১

এ কথাও সৌতি বলিয়াছেন—ইতিহাসের মধ্যে ভারতই শ্রেষ্ঠ—এখানে ইতিহাস অর্থে 'হিষ্টিরি'।

হ্রদানামুদধিঃ শ্রেষ্ঠো গৌর্বরিষ্ঠা চতুষ্পদাম্।
যথৈতানীতিহাসানাং তথা ভারতমুচ্যতে।—১।১।২২৭

এই মহাভারতের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিতে চাই—বিস্তার করিব না, কারণ, এ বিষয়ে আমি একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' বেশ নিপুণভাবে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে, মহাভারত কল্পনামূলক কাব্য নয়, অনেকাংশে প্রামাণিক ইতিহাস (History)। কিন্তু সে কোন্ মহাভারত? প্রচলিত মহাভারত—না মহাভারতের আদিম কঙ্কাল? বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং তাঁহাদের প্রাচ্য শিষ্যেরা যে বলেন, 'প্রাচীন মহাভারতের উপর অনেক প্রক্ষিপ্ত উপন্যাসাদি চাপান হইয়াছে, প্রাচীন মহাভারত তাহার ভিতর ডুবিয়া আছে, তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নাই।' সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ সতর্কভাবে মহাভারতের ঐ আদিম কঙ্কালের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। তিনি এ সম্পর্কে লিখিতেছেন—

"মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং উপরিলিখিত প্রণালীর অনুবর্তী হইয়া বিচারপূর্বক আমি এইটুকু বুঝিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে।—প্রথম, একটি আদিম কঙ্কাল; তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছু নাই। ইহা বড় সংক্ষিপ্ত। বোধ হয়, ইহাই সেই চতুর্বিংশতিসহস্রশ্লোকাত্মিকা 'ভারতসংহিতা'।* তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত; অথচ তাহার অংশ সমুদায় এক লক্ষণাক্রান্ত। * * প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি এক জনের রচনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তির রচনা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক বা আদিম; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়া, তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। * * অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশগুলিকে আমি প্রথম স্তর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা করি। * * ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে। তাহাকে তৃতীয় স্তর বলিতেছি। তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া "বেশ রচিয়াছি" মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পুরিয়া দিয়াছে।"

মহাভারতে যে তিনটি স্তর আছে (সম্ভবতঃ চারিটি)—এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদের অবকাশ নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়টিকে যে ভাবে বিবৃত করিলেন, তাহাতে কথাটা বেশ

* চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্—মহাভারত আদিপর্ব, ১।১০২

স্পষ্ট হইল না। এ সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমত উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার সম্পাদিত ও সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত আদিপর্ব কাশীদাসি মহাভারতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"লোকে বলে, মহাভারত তিনবার লেখা হয়—একবার ৮৮০০ শ্লোকে, একবার ২৪০০০ শ্লোকে, আর একবার এক লাখ শ্লোকে। ৮৮০০ শ্লোকের কথা একেবারে মিছে।* গল্পগুজব, উপদেশ প্রভৃতি আলাত পালাত বাদ দিলে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা ২৪০০০ হয় বটে। সেও হয় পাঞ্চাল নগরে লক্ষ্য ভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিষেক পর্যন্ত।"

অতএব শাস্ত্রী মহাশয়ও ২৪০০০ শ্লোকাত্মক মহাভারতের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার বিবৃতি আরও ব্যাপক। তিনি বলেন—"মহাভারতের অনুক্রমণিকা-পর্ব ও পর্বসংগ্রহ-পর্ব পড়িলে মনে হয়, মহাভারত অন্ততঃ পাঁচ বার সংস্কার করা হইয়াছে :—

প্রথম সংস্কারের সূচীপত্র—

দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ। স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা ইত্যাদি।

যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ। স্কন্ধোঽর্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা ইত্যাদি।

এই সংস্কারের বহি কত বড় ছিল জানি না। মোটামুটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবটাই ছিল : আর বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না।†

দ্বিতীয় সংস্করণের সূচীপত্র—

পাণ্ডুর্জিত্বা বহূন্ দেশান্ যুধা বিক্রমণেন চ।

অরণ্যে মৃগয়াশীলো ন্যবসৎ সজনস্তথা ॥—আদি. ১।১৩০

এই শ্লোক হইতে প্রথম পর্ব, প্রথম অধ্যায় ৩০১ শ্লোক পর্যন্ত দ্বিতীয় সংস্করণের সূচী। ইহারই মধ্যে 'যদাশ্রৌষং ধনুরায়ম্য চিত্রং' প্রভৃতি ৫৭টি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের কবিতা আছে। তাহাতে বোধ হয়, এই সূচীর মহাভারত লক্ষ্যভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত।

* আমারও এই মত। প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ বেবার ঐরূপ কথা বলিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথা ভিত্তিহীন। সম্ভবতঃ বেবার তথাকথিত 'ব্যাসকূটে'র সংখ্যা দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন। প্রচলিত মহাভারতে আছে যে, ব্যাসের amanuensis গণেশের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, ব্যাস অনর্গল বলিয়া যাইবেন এবং গণেশ লিখিয়া যাইবেন—যদি কোনও কারণে গণেশের কলম একবার থামে, তবে তিনি আর উহা ধরিবেন না। ব্যাস কিন্তু একটা সর্ত করিলেন যে, গণেশ অর্থ না বুঝিয়া কোন কিছু লিখিতে পারিবেন না, এবং গণেশের লেখনীকে মন্থর করিবার উদ্দেশ্যে ঘন ঘন একটি করিয়া দুরূহ কবিতা বলিতে লাগিলেন—যাহার অর্থ বুঝিতে গণেশের বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। সেই অবসরে ব্যাস অন্য কবিতা রচনা করিয়া লইতেন। ঐ দুরূহ কবিতাগুলির নাম—'ব্যাসকূট'। মহাভারতে ঐ ব্যাসকূটের সংখ্যা ৮৮০০।

অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ।

* * তৎশ্লোককূটম্ অদ্যাপি গ্রথিতং সুদৃঢ়ং মুনে।—আদি, ১।৮১-২

† শাস্ত্রী মহাশয় যে 'দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ' ও 'যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ'—এই দুই শ্লোককে প্রথম সংস্করণের মহাভারতের সূচী বলিলেন—ইহার প্রমাণ কি? নীলকণ্ঠ নিজ টীকায় ঐ দুই শ্লোককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—ইদানীং ভারততাৎপর্য-সংগ্রাহকৌ যৌ শ্লোকৌ পঠতি দুর্যোধন ইতি। অর্জুন মিশ্রের

তৃতীয় সংস্করণের সূচী—

১ম পঃ ১ম অঃ ১ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ১ম পঃ ১ম অঃ ২৭ শ্লোক পর্যন্ত। ইহাতে এই কয়টি ছোট বড় পর্ব আছে—সংগ্রহ, পৌলোম, আস্তীক, সম্ভব, সভা, আরণ্য, বিরাট, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, স্ত্রী, ঐষিক, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমবাস এবং মৌষল। বোধ হয়, এই সংস্করণেই ২৪০০০ শ্লোক ছিল এবং প্রায় ১৫০ শ্লোকে তাহার সূচীপত্র ছিল।*

চতুর্থ সংস্করণে ব্যাসদেব মহাভারতকে ৯৮ পর্বে ভাগ করেন। সেই সব পর্ব ছোট। তাহাতে লক্ষ শ্লোক ছিল কি না জানা যায় না।

পঞ্চম সংস্করণের সূচীপত্রে ১৮টি বড় পর্বের কথা আছে—সেগুলিতে কত অধ্যায় এবং কত শ্লোক, তাহাও লেখা আছে। শ্লোকের সংখ্যা ৮৪৮৩৬ অর্থাৎ, ৩২ অক্ষর-শ্লোকের ১০০০০০।"†

এইবার মহাভারতের স্তর-নির্ণয় সম্পর্কে আমার নিজ সিদ্ধান্তের কথা বলি।

আদি পর্ব ৬২তম অধ্যায়ে লিখিত আছে—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিন বৎসর অনন্যকর্মা হইয়া এই অদ্ভুত মহাভারত-আখ্যান রচনা করেন।

ত্রিভির্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভারতম্ আখ্যানং কৃতবান্ ইদম্ অদ্ভুতম্ ॥‡—৫২

ইহাই মহাভারতের আদিম কঙ্কাল—'ভারতসংহিতা',—ইহাই প্রথম স্তর।

চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্—১।১।১০২

ইহার আরম্ভ ছিল—পাণ্ডুর দিগ্‌বিজয়ে—

পাণ্ডুর্জিত্বা বহূন্ দেশান্ যুধা বিক্রমণেন চ।
অরণ্যে মৃগয়াশীলো ন্যবসৎ মুনিভিঃ সহ ॥—১।১।১১২

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই:—কথা-নায়ক-প্রতিনায়কয়োঃ যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনয়োঃ জয়-পরাজয়বীজং ধর্মাধর্মময়ং শ্লোকাভ্যাং সংক্ষিপতি। ইহাই সঙ্গত মনে হয়।

* শাস্ত্রী মহাশয়ের এ সকল কথার আমি মর্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। তিনি নিজেই পূর্বে বলিয়াছেন—"গল্পগুজব আলাত পালাত বাদ দিলে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা ২৪০০০ হয় বটে; সেও হয় পাঞ্চাল নগরে লক্ষ্যভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিষেক পর্যন্ত।" তবে তিনি এখানে ঐষিক, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমবাস ও মৌষল পর্বের কথা বলিলেন কিরূপে? বিশেষতঃ যখন সর্ববাদিসম্মতি মতে সংগ্রহ, পৌলোম, আস্তীক ও সম্ভব পর্বাধ্যায়গুলি সৌতির যোগ করা—বৈশম্পায়ন-রচিত নহে।

আর এক কথা। প্রথম পর্ব প্রথম অধ্যায়ের ১ হইতে ২৭ শ্লোকে কোন পর্ব বা পর্বাধ্যায়ের প্রসঙ্গই নাই। এখানে শাস্ত্রী মহাশয়ের কোন্ শ্লোকগুলি লক্ষিত?

† এই কথার সম্প্রসারণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় ঐ ভূমিকার অন্যত্র লিখিয়াছেন:—"মহাভারতেরই পর্বসংগ্রহ পর্বে প্রতি পর্বের কবিতা গণিয়া সবেমাত্র ৮৪৮৩৬টি কবিতা পাওয়া গিয়াছে। মহাভারতের ভণিতা লইয়া, মঙ্গলভাগ লইয়া, বড় বড় কবিতায় ৩২ অক্ষরের বেশী যে অংশ থাকে, তাহা লইয়া আমরা দেখিয়াছি যে, ৮৪৮৩৬টি কবিতায় এক লক্ষ শ্লোক হয়।" এ প্রণালীতে এক লক্ষ সংখ্যা পূরণ কি সঙ্গত?

‡ স্বর্গারোহণ পর্বে ইহার প্রতিধ্বনি আছে।

ত্রিভির্বর্ষৈরিদং পূর্ণং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
অখিলং ভারতং চেদং চকার ভগবান্ মুনিঃ ॥—৫।৪৮

—এবং অবসান ছিল দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের পরে যুধিষ্ঠিরের বিজয়ে। সে জন্য ভারতসংহিতার উপনাম ছিল—'জয়'—ততো জয়ম্ উদীরয়েৎ।

জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা—আদি, ৬২।২০

জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো মোক্ষমিচ্ছতা—স্বর্গারোহণ, ৫।৫১

কাষ্ণঃ চ পঞ্চমো বেদো যৎ মহাভারতং স্মৃতম্।

* * জয়েতি নাম চৈবেমাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

জয়াখ্যং ভারতং মহৎ—১৮।৫।৪৯

এই ভারতসংহিতার বক্তা ছিলেন সঞ্জয় এবং শ্রোতা ধৃতরাষ্ট্র। অতএব ইহা ছিল—সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ। সে জন্য ইহাকে 'সঞ্জয়ের মহাভারত' বলিতে চাই।*

সঞ্জয়ের মহাভারত বা ভারতসংহিতার কি কি বর্ণনীয় বিষয় ছিল? ১।৯৯-১০১ শ্লোকে তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বিস্তরং কুরুবংশস্য গান্ধার্যা ধর্মশীলতাম্।

ক্ষত্তুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুন্ত্যাঃ সম্যগ্ দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ॥

বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং পাণ্ডবানাঞ্চ সত্যতাম্।

দুর্বৃত্তং ধার্তরাষ্ট্রানাম্ উক্তবান্ ভগবান্ ঋষিঃ॥

অর্থাৎ, কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য, শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সত্যশীলতা এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের দুর্বৃত্ততা—উহাতে বর্ণিত ছিল।

পরবর্তী কালে ১৫০ শ্লোকে এই ভারত-সংহিতার সংক্ষেপ করা হইয়াছিল—

ততোঽধ্যর্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবান্ ঋষিঃ—১।১।১০০
(অধ্যর্ধশতং = সার্ধ শতং—নীলকণ্ঠ)

প্রচলিত মহাভারতের গহন মধ্যে হয় ত ঐ ১৫০ শ্লোক প্রচ্ছন্ন আছে—আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহার উদ্ধার করিতে পারি নাই—যদি কেহ পারেন, তবে তাঁর গবেষণা সার্থক হইবে এবং মূল ভারত-সংহিতার লুপ্তোদ্ধার হইবে। এ কথা কিন্তু নিঃসংশয় যে, যাহাকে 'ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ' বলে, ঐ বিলাপের মধ্যে আমরা ভারত-সংহিতার সারসংগ্রহ পাই। টীকাকার নীলকণ্ঠেরও ঐ মত—

ভারতার্থঞ্চ সংগৃহ্লাতি যদাশ্রৌষং ধনুরিত্যাদিভিঃ সপ্তষষ্ট্যা শ্লোকৈঃ। †

---

* লক্ষ্য করা উচিত, দুর্যোধনের মৃত্যুর উত্তরবর্তী যে মহাভারত—সঞ্জয় তাহার বক্তা নহেন—বৈশম্পায়ন। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করুন—সৌপ্তিক পর্বের নবম অধ্যায় (যাহার নাম 'দুর্যোধন প্রাণত্যাগ')-পর্যন্ত সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ। সঞ্জয়ের শেষ শ্লোক এই—

তব পুত্রে গতে স্বর্গং শোকার্তস্য মহানঘ।

ঋষিদত্তং প্রণষ্টং তদ্দিব্যদর্শিত্বমদ্য বৈ॥

† এখানে নীলকণ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপকে ৬৭ শ্লোকাত্মক বলিলেন। ঐ শ্লোকগুলি ত্রিষ্টুভ্ ছন্দে রচিত। অর্জুন মিশ্রেরও ঐ মত—যদাশ্রৌষং ইত্যাদয়ঃ সপ্তষষ্টিঃ শ্লোকাঃ। পুণা ভাণ্ডারকার-ইন্সটিটিউট হইতে প্রকাশিত মহাভারতে তৎস্থলে মাত্র ৫৭টি শ্লোক আছে। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সম্পাদিত মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপের শ্লোকসংখ্যা ৬৮। অতএব এ স্থলেও গোলযোগ।

ঐ বিলাপের আরম্ভ—দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরে—

যদাশ্রৌষং ধনুরায়ম্য চিত্রং
বিদ্ধং লক্ষ্যং পাতিতং বৈ পৃথিব্যাম্।
কৃষ্ণাং হৃতাং প্রেক্ষতাং সর্বরাজ্ঞাং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

—এবং শেষ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী বিনাশের সহিত যুধিষ্ঠিরের বিজয়ে—

কৃতং কার্যং দুষ্করং পাণ্ডবেয়ৈঃ
প্রাপ্তং রাজ্যম্ অসপত্নং পুনস্তৈঃ।
দ্বানা বিংশতিরাহতাক্ষৌহিণীনাং
তস্মিন্ সংগ্রামে ভৈরবে ক্ষত্রিয়াণাম্ ॥

অর্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয় কুরুরাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর তক্ষশিলা জয় করেন এবং ঐ তক্ষশিলায় মহা আড়ম্বরে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ সর্পযজ্ঞে জনমেজয়ের অনুরোধে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন তাঁহাকে মহাভারত শুনাইয়াছিলেন।*

জনমেজয়ের এই প্রশ্ন ছিল—

কথং সমভবদ্ভেদস্তেষামক্লিষ্টকর্মণাম্।
তচ্চ যুদ্ধং কথং বৃত্তং ভূতান্তকরণং মহৎ ॥—৬০।১৯

উত্তরে বেদব্যাস বলিলেন—আমার শিষ্য বৈশম্পায়ন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন—কিরূপে কৌরব-পাণ্ডবের ভেদ ঘটিয়াছিল।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা।
শশাস শিষ্যম্ আসীনং বৈশম্পায়নম্ অন্তিকে ॥ ৬১।২১

ব্যাস বলিলেন—বৎস বৈশম্পায়ন! আমার নিকট পূর্বে যেরূপ শুনিয়াছ, তৎসমুদয় কীর্তন কর—

কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ যথা ভেদোঽভবৎ পুরা।
তদস্মৈ সর্বমাচক্ষ্ব যন্মত্তঃ শ্রুতবানসি ॥—৬১।২২

তখন বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিলেন—

শৃণু রাজন্! যথা ভেদঃ কুরুপাণ্ডবয়োরভূৎ।
রাজ্যার্থে দ্যূতসম্ভূতো বনবাসস্তথৈব চ ॥
যথাচ যুদ্ধমভবৎ পৃথিবীক্ষয়কারকম্।
তত্তেঽহং কথয়িষ্যামি পৃচ্ছতে ভরতর্ষভ ॥—আদি, ৬১।৪-৫

অতএব আমি বলিতে চাই যে, বৈশম্পায়ন কর্তৃক সম্প্রসারিত ব্যাসদেবের 'ভারত-

* 'সংস্কৃত মহাভারতে পাই যে, জনমেজয় তক্ষশিলা জয় করেন, সেখানেই তিনি সর্পযজ্ঞ করেন এবং সেইখানেই মহাভারত পাঠ হয়। বৈশম্পায়ন ব্যাসের শিষ্য; তিনি জনমেজয়কে মহাভারত শুনাইয়াছিলেন। কথাটা বিশ্বাস করা যায়'।—হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মহাভারতের পূর্বধৃত ভূমিকা

তেনৈবমুক্তা ভ্রাতরস্তস্য তথা চক্রুঃ।
স তথা ভ্রাতৄন্ সন্দিশ্য তক্ষশিলাং প্রত্যভিপ্রতস্থে ॥
তঞ্চ দেশং বশে স্থাপয়ামাস ॥—আদি, ৩।২১-২
শ্রুত্বাতু সর্পসত্রায় দীক্ষিতং জনমেজয়ম্।
অভ্যাগচ্ছদ্ ঋষির্বিদ্বান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা ॥—আদি, ৬০।১

সংহিতা'ই মহাভারতের দ্বিতীয় স্তর। এই মহাভারতের বক্তা ছিলেন বৈশম্পায়ন ও শ্রোতা জনমেজয় ;—অর্থাৎ, ঐ মহাভারত জনমেজয়-বৈশম্পায়ন-সংবাদ ছিল। মহাভারত হইতে যত দূর বুঝা যায়, বৈশম্পায়নের মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব-বিভাগ ছিল না—উহা কতকগুলি পর্বাধ্যায় বা Section-এ বিভক্ত ছিল। ইহার পর হইতে ভারত-সংহিতার নাম হয় 'মহাভারত'। মহাভারতের নিরুক্তি কি? যেহেতু এ গ্রন্থে ভরতবংশীয়দিগের মহৎ জন্ম কীর্তিত হইয়াছে, অতএব ইহা মহাভারত।

ভরতানাং মহৎ জন্ম মহাভারতমুচ্যতে—আদি, ৬২।৩৯

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, যেহেতু তুলাদণ্ডে চতুর্বেদ এক ধারে ও মহাভারত অন্য ধারে তৌল করাতে মহাভারতই গুরুতর হইয়াছিল—তাই এ গ্রন্থের নাম মহাভারত।

তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে।
মহত্বে চ গুরুত্বে চ ধ্রিয়মানং যতোঽধিকম্ ॥—আদি, ২।২৭৩

এই উভয় মত মিলাইয়া স্বর্গারোহণ পর্বে বলা হইয়াছে—

ভরতানাং মহজ্জন্ম তস্মাদ্ভারতমুচ্যতে।
মহত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।
নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥—৫।৪৫

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে কেবল যে পঞ্চ পাণ্ডব, কুন্তী, দ্রোণ ও বাসুদেবের নাম পাওয়া যায়, তাহা নহে ; পাণিনি 'মহাভারত' শব্দও সিদ্ধ করিয়াছেন—

মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্নগৃষ্টীষ্বাসজাবাল-ভার-ভারত-
হৈলিহিল-রৌরব-প্রবৃদ্ধেষু—৬।২।৩৮

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পাণিনিকে খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে ফেলিয়াছেন। কিন্তু আমার ধারণা, পাণিনি বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী। কারণ, যে সময় পাণিনি সূত্র রচনা করেন, তখনও 'নির্বাণ' শব্দ মোক্ষ-অর্থে প্রচলিত হয় নাই এবং 'আরণ্যক' শব্দ দ্বারা 'আরণ্যক'-গ্রন্থ বুঝাইত না। পাণিনির সূত্র দুইটি এই :—

'অরণ্যাং মনুষ্যে'—অরণ্য-শব্দের উত্তর 'ঞ্চিক' প্রত্যয় দ্বারা অরণ্যবাসী মনুষ্যবাচক 'আরণ্যক'-শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

'নির্বাণোঽবাতে'—নির্বাণ শব্দের অর্থ নির্বাত (বায়ুশূন্য স্থান)।

আশ্বলায়ন তাঁহার গৃহ্যসূত্রে যাঁহাদিগকে তর্পণীয় বলিয়াছেন, ঐ গণনায় 'ভারত-মহাভারত-ধর্মাচার্যাঃ'-র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাতে মনে হয়, তাঁহার সময়ে ভারত-সংহিতা ও মহাভারত যুগপৎ বিদ্যমান ছিল। আশ্বলায়নের সূত্রটি এই :—

সুমন্তু-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্রভাষ্য-ভারত-
মহাভারতধর্মাচার্যাঃ যে চান্যে আচার্যাস্তে সর্বে তৃপ্যন্তু— ৩।৪

প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ ব্যূলার সাহেব বলেন, আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্র খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত। কাহারও কাহারও মতে আশ্বলায়ন বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী। সে যাহা হউক, তাঁহার পূর্বে ভারত-সংহিতা যে মহাভারতের আকার ধারণ করিয়াছিল—ইহা নিঃসংশয়।

পূর্বে বলিয়াছি, বৈশম্পায়নের মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব ছিল না—উহা মাত্র কতকগুলি

পর্বাধ্যায়ে (Section-এ) বিভক্ত ছিল। প্রশ্ন উঠিবে, কতগুলি পর্বাধ্যায়ে? প্রচলিত মহাভারত বলেন—এক শত।

এতৎ পর্বশতং পূর্ণং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা—আদি, ২।৮৩

কি কি? মহাভারতকার বলিতেছেন—

ভারতস্যেতিহাসস্য শ্রূয়তাং পর্বসংগ্রহঃ

এবং ৪১ হইতে ৮১ শ্লোকে ঐ পর্ব বা Section-সমূহের পরিচয় দিয়াছেন—অনুসন্ধিৎসু পাঠককে ঐ শ্লোকগুলি সযত্নে পাঠ করিতে বলি। তাহা করিলে পাঠক লক্ষ্য করিবেন, সমস্ত মিলাইলে ১০০ পর্ব হয় না—৯৮টি পর্ব হয়—তাহাও আবার সৌতি-রচিত পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, অংশাবতারণ ও সম্ভবপর্ব এবং অনুক্রমণী ও পর্বসংগ্রহপর্বদ্বয় (যাহা নিশ্চয়ই সৌতির পরবর্তী) মিলাইয়া। টীকাকার নীলকণ্ঠ ২য় অধ্যায়ের ৩৯৫-৬ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—

তত্র পর্বসংগ্রহো বররুচি-প্রোক্তয়া 'কাদি নব টাদি নব পাদি পঞ্চ যাদি অষ্টৌ' ইতি পরিভাষয়া ক্রিয়তে। যথা আদিপর্ব ১৯, সভা ৯, বন ১৬, বিরাট ৪, উদ্‌যোগ ১১, ভীষ্ম ৫, দ্রোণ ৮, কর্ণ ১, শল্য ৪, সৌপ্তিক ৩, স্ত্রী ৫, শান্তি ৪, অনুশাসন ২, অশ্বমেধ ২, আশ্রমবাসিক ৩, মৌষল ১, মহাপ্রস্থান ১ ও স্বর্গারোহণ ১—মোট ৯৮। ইহার উপর হরিবংশ—যাহার ভূমিকা-অধ্যায় হইতে দেখা যায়, ঐ গ্রন্থ মহাভারতের পরে রচিত হইয়াছিল—

মহাভারতমাখ্যানং বহ্বর্থং শ্রুতিবিস্তরম্
কথিতং ভবতা পূর্বং বিস্তরেণ ময়া শ্রুতম্ ॥
*　　*　　*
তত্র জন্ম কুরূণাং হি ত্বয়োক্তং লোমহর্ষণে।
ন তু বৃষ্ণ্যন্ধকানাঞ্চ তদ্ ভবান্ ব্যক্তমর্হতি ॥
(তত্র = মহাভারতে)

—ঐ হরিবংশের দুই খণ্ড যোগ করিয়া তবে শত সংখ্যা পূরণ হয়।*

বিষ্ণুপর্ব শিশোশ্চর্যা বিষ্ণোঃ কংসবধস্তথা—আদি, ২।৮২

আমার মনে হয়, বৈশম্পায়নের মহাভারতের শতপর্ব আন্দাজি কথা। ঐ মহাভারতে ঠিক কত পর্ব ছিল এবং শ্লোকসংখ্যাই বা কত ছিল, এক্ষণে তাহা নির্ধারণ করা দুরূহ।

এইবার মহাভারতের তৃতীয় স্তরের কথা বলি। মহাভারতেই উল্লিখিত আছে যে, কুলপতি শৌনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী সত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—

লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতিঃ পৌরাণিকো নৈমিষারণ্যে শৌনকস্য কুলপতেঃ দ্বাদশবার্ষিকে সত্রে।

—আদি ১।১

—এবং তদুপলক্ষে লোমহর্ষণ-তনয় উগ্রশ্রবাঃ সৌতি (সূতপুত্র বলিয়া তাঁহার উপাধি 'সৌতি') বৈশম্পায়ন-রচিত মহাভারত আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

---

* অর্জুন মিশ্র ঐ ২য় অধ্যায়ের ৩৮০ শ্লোকের টীকায়ও ঠিক ঐরূপেই শতপর্ব সংখ্যা পূরণ করিয়াছেন।

যৎতু শৌনক ! সত্রে তে ভারতাখ্যানম্ উত্তমম্। জনমেজয়স্য তৎ সত্রে ব্যাসশিষ্যেণ ধীমতা॥ কথিতং···
—আদি, ২।৩৩-৪

সৌতি-রচিত মহাভারতই মহাভারতের তৃতীয় স্তর। এ মহাভারতের বক্তা সৌতি এবং শ্রোতা শৌনক (ও তাঁহার যজ্ঞে সমবেত ঋষিবৃন্দ); অতএব এ সংস্করণের মহাভারত সৌতি-শৌনক-সংবাদ। প্রচলিত মহাভারতের যেখানেই দেখিব 'সৌতিঃ উবাচ'—বুঝিতে হইবে, উহা বৈশম্পায়নের মহাভারতের উপর সৌতির সংযোগ;—যেখানেই দেখিব 'বৈশম্পায়ন উবাচ', বুঝিতে হইবে যে, উহা সঞ্জয়ের মহাভারত-রূপ আদিম স্তরের উপর বৈশম্পায়নের বিস্তৃতি—আর যেখানেই দেখিব 'সঞ্জয় উবাচ'—বুঝিতে হইবে, উহা আদিম স্তরের মহাভারত—যেমন ভগবদ্গীতা—যাহার বক্তা সঞ্জয় ও শ্রোতা ধৃতরাষ্ট্র এবং যাহার প্রতি ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে লক্ষ্য করা হইয়াছে—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

সৌতির মহাভারত আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্‌যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ—এই অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত (পূর্বেই বলিয়াছি, সৌতির পূর্বে এইরূপ অষ্টাদশ পর্ব-বিভাগ ছিল না)।

উক্তানি নৈমিষারণ্যে পর্বাণ্যষ্টাদশৈব তু—২।৮৪
অষ্টাদশৈবম্ এতানি পর্বাণ্যুক্তান্যশেষতঃ—২।৩৭৮

প্রত্যেক পর্ব আবার কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। টীকাকার অর্জুন মিশ্র পর্বসংগ্রহ পর্বের ৩৭৯-৮০ শ্লোকের টীকায় অষ্টাদশ পর্বের কোন্ পর্বে কত অধ্যায় ও কত শ্লোক আছে, তাহার একটা তালিকা দিয়াছেন। হরিবংশ বাদ দিলে, তাঁহার মতে অধ্যায়ের সংখ্যা হয় ১৯৩৩ ও শ্লোকের সংখ্যা হয় ৮৫০৪৬। আমরা দেখিয়াছি, অনুক্রমণিকা-অধ্যায়ের গণনা অনুসারে অষ্টাদশ পর্বের মোট শ্লোকসংখ্যা ৮৪৮৩৬। অর্জুন মিশ্র তাহাকে করিলেন ৮৫০৪৬।

সৌতির মহাভারতকেই বিশেষ ভাবে শত-সাহস্রী বা লক্ষ শ্লোকাত্মক বলা হইয়াছে।*

ইদং শতসহস্রং তু লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্।—১।১০১
একং শতসহস্রং তু ময়োক্তং বৈ নিবোধত—১।১০৯
একং শতসহস্রন্তু মানুষেষু প্রভাষিতং —১।১০৭

সেই জন্য দেখা যায়, অনেক হস্তলিখিত মহাভারতের পুথির পুষ্পিকায় এইরূপ লিখিত—'ইতি মহাভারতে শত-সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অমুক পর্বণি এত-তম অধ্যায়ঃ'।

* যদিও এক স্থলে শতসাহস্র মহাভারত বেদব্যাসের উপর আরোপিত হইয়াছে। ইদং শতসহস্রংহি শ্লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্। সত্যবত্যাত্মজেনেহ ব্যাখ্যাতমমিতৌজসা।—আদি, ৬২।১৪

এই লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারতের কথা এ দেশে এত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, ৫০২ সম্বতে লিখিত গুপ্ত রাজাদিগের শিলালিপিতে লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারতের উল্লেখ আছে।*

সৌতির মহাভারতের বয়ঃক্রম কত? ইহা নির্ধারণ করা অতিশয় দুরূহ। তবে মহামতি বালগঙ্গাধর তিলক কয়েকটি প্রমাণের সমবায়ে সিদ্ধ করিয়াছেন যে, এই মহাভারত-রচনার কাল খৃষ্টপূর্ব ৫০০ বর্ষ। তিনি বলেন, চন্দ্রগুপ্তের দরবারস্থ গ্রীকদূত মেগেস্থিনিস্ ৩২০ খৃষ্টপূর্বে মহাভারতের কথা জানিতেন। তিলক মহোদয় আরও দেখাইয়াছেন যে, বোধায়নের ধর্মসূত্রে ও গৃহ্যসূত্রে (অধ্যাপক ব্যূলারের মতে বোধায়নের কাল ৪০০ খৃঃ পূর্ব) মহাভারত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত আছে। বোধায়ন-ধর্মসূত্রে (২।২।৪।২৬) উদ্ধৃত শ্লোক এই :—

যাচতস্ত্বংহি দুহিতা স্তবতঃ প্রতিগৃহ্নতঃ।
সুতাহং স্তূয়মানস্য দদতোঽপ্রতিগৃহ্নতঃ॥
—আদিপর্ব, ৭৮।১০

(যযাতি-উপাখ্যানে শর্মিষ্ঠা দেবযানীর সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ বলিয়াছিলেন।)

বোধায়ন-গৃহ্যশেষ সূত্রের (এ অংশ বোধ হয় বোধায়নের পরবর্তী) দ্বিতীয় প্রশ্নে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের ৯ম সূত্রটি এই—

দেশাভাবে দ্রব্যাভাবে সাধারণে কুর্যাৎ মনসা বার্চয়েৎ—তথাহ ভগবান্
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মস্তক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতং অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন—ইহা ভগবদ্গীতার ৯ম অধ্যায়ের ২৬ শ্লোক।

পুনশ্চ—গৃহ্যশেষের ১।২২।৮ সূত্রে মহাভারতোক্ত বিষ্ণু-সহস্র-নামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকটি উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়—

বিষ্ণোর্নামসহস্রং বা শৈবং বাপি তথা জপেৎ
(এ সূত্রও বোধ হয় বোধায়নের পরবর্তী)।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর—বিশেষতঃ প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তর এরূপভাবে ওতপ্রোত-বিজড়িত যে, প্রচলিত মহাভারতের কোন্ অংশ কোন্ স্তরভুক্ত, তাহা নির্ধারণ করা অতি দুরূহ। ধরিবার একটা উপায়—কে বক্তা? সঞ্জয়, বৈশম্পায়ন, না সৌতি? এ বিষয়ে পূর্বে ইঙ্গিত করিয়াছি। আর একটা উপায়—বিবৃত বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইয়া আবার বিস্তৃতভাবে বলা হইতেছে কি না? যথা—যযাতির আখ্যান। উহা সংক্ষেপে আদিপর্বের ৭৫ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়া আবার ৭৬ হইতে ৯৪ অধ্যায় পর্যন্ত 'বিস্তরেণ' উক্ত হইয়াছে। আর একটা উদাহরণ—দ্রোণ বধ। দ্রোণপর্বের ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে সংক্ষেপে দ্রোণবধ কথিত হইবার পর পরবর্তী অধ্যায়সমূহে ঐ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত দেখা যায়। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও আছে।

* There is inscriptional evidence that the Mahabharata had attained its aggregate bulk of 100000 slokas by about 400 A. D. —Macdonald.

এইবার চতুর্থ স্তরের কথা বলি। এ স্তরের ভিত্তি-ইষ্টক সৌতির মহাভারতের উপর পরবর্তী কালে (এক সময়ে নহে—ভিন্ন ভিন্ন সময়ে) প্রক্ষিপ্তযোগ। প্রচলিত মহাভারতে যে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণ-চরিত্রে' লিখিয়াছেন :—"অনুক্রমণিকাধ্যায়েই আছে যে, কেহ কেহ প্রথমাবধি ; কেহ বা আস্তীক পর্বাবধি ; কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করেন।"*

"সুতরাং যখন এই মহাভারত উগ্রশ্রবাঃ ঋষিদিগকে শুনাইতেছিলেন, তখনই পর্ব-সংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সমস্তটা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রবাদ ছিল। এই পর্ব-সংগ্রহাধ্যায় পাঠ করিলেই বিবেচনা করা যায় যে, প্রক্ষিপ্তাংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে ভবিষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলনপূর্বক অনুক্রমণিকাধ্যায়ের পর কেহ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইবার পূর্বেও যে অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাই অনুমেয়।" বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন ; যাহা পর্ব-সংগ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহা যদি প্রচলিত মহাভারতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ অংশগুলি পর্বসংগ্রহ অধ্যায় রচিত হইবার পর মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই নিকষ-পাষাণে ঘষিয়া লইলে মহাভারত হইতে সনৎসুজাতীয়, মার্কণ্ডেয় সমস্যা, নলোপাখ্যান, রামচরিত, শাল্ববধ, অনুগীতা, ব্রাহ্মণগীতা প্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বাদ দিতে হয়।

এ সম্পর্কে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে প্রতি পর্বে কতগুলি অধ্যায় ও কতটি শ্লোক আছে, তাহার একটি সযত্ন-সঙ্কলিত তালিকা পাওয়া যায়। ভাণ্ডারকর ইনিষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত মহাভারত-দত্ত ঐ তালিকার সহিত বর্তমান প্রচলিত মহাভারতের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা তুলনা করিলে প্রক্ষিপ্তের বিপুল বহরের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। আরও দেখা যায় যে, অষ্টাদশ পর্বের দুই একটি পর্ব সম্পর্কে প্রচলিত মহাভারতের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে গণিত অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যাপেক্ষা ন্যূন।

কেহ কেহ খোদার উপর খোদকারি করিয়া পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের গণনাকারী শ্লোকগুলির অদলবদল করিয়াছেন। এ সকল দুঃসাহসীর সহিত প্রক্ষিপ্ত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক —তেষাং প্রতি নৈষ যত্নঃ। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে আমরা তুলনামূলক একটি তালিকা সঙ্কলিত

* মন্বাদি ভারতং কেচিৎ আস্তীকাদি তথাপরে।
তথোপরিচরাদ্যন্যে বিপ্রাঃ সম্যক্ অধীয়তে ॥—১।৫২

মন্বুর্মন্ত্রো 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইতি নীলকণ্ঠঃ। আস্তীকাদি = আস্তীকপর্ব (১৩শ অধ্যায়) ; উপরিচরাদি = উপরিচর বসুর বৃত্তান্ত (৬৩ তম অধ্যায়)।

করিয়া দিলাম। প্রচলিত পর্বসংগ্রহাধ্যায় ও বঙ্গবাসী সংস্করণ* আমাদের তুলনার ভিত্তি। পাঠক মৎসংকলিত ঐ তালিকাটির প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রক্ষিপ্ত সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোক প্রাপ্ত হইবেন। এ বিষয়ে এখানে সবিস্তার বিচার করিবার অবসর নাই। আমার মোট বক্তব্য এই যে, প্রক্ষিপ্ত সত্ত্বেও এবং প্রথম স্তরের উপর বৈশম্পায়ন ও সৌতির যোগবিয়োগ সত্ত্বেও মহাভারতের আদিম স্তর বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রবন্ধের পরিশিষ্ট

	পর্বসংগ্রহাধ্যায় অনুসারে		বঙ্গবাসী সংস্করণ অনুসারে	
	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
আদি পর্ব	২২৭	৮৮৮৪	২৩৪	৮৬৩২
সভা	৭৮	২৫১১	৮১	২৭১১
বন	২৬৯	১১৬৬৪	৩১৪	১১৮৩৮
বিরাট	৬৭	২০৫০	৭২	২২৭৪
উদ্‌যোগ	১৮৬	৬৬৯৮	১৯৮	৭৬৫৭
ভীষ্ম	১১৭	৫৮৮৪	১২২	৫৮৫৯
দ্রোণ	১৭০	৮৯০৯	২০১	৯৪৩১
কর্ণ	৬৯	৪৯৬৪	৯৬	৪৮৯০
শল্য	৫৯	৩২২০	৬৫	৩৪৯৮
সৌপ্তিক	১৮	৮৭০	১৮	৭৯১
স্ত্রী	২৭	৭৭৫	২৭	৮০৬
শান্তি	৩২৯	১৪৭০৭	৩৬৫	১৩৭৮১
অনুশাসন	১৪৬	৮০০০	১৬৮	৭৬৯৪
আশ্বমেধিক	১৩০	৩৩২০	৯২	২৮৩৬
আশ্রমবাসিক	৪২	১৫০৬	৩৯	১১০৩
মৌষল	৮	৩২০	৮	২৮৭
মহাপ্রস্থানিক	৩	৩২০	৩	১১০
স্বর্গারোহণ	৫	২০৯	৬	২১৬
মোট	১৯৫০	৮৪৮১১	২১০৯	৮৪৪১৪

কিন্তু ভাণ্ডারকার-ইনিষ্টিটিউটের মহাভারতে গৃহীত পাঠ অনুসারে মোট অধ্যায়সংখ্যা ৯৪৮ এবং মোট শ্লোকসংখ্যা মাত্র ৮২১৩৬।

* পাঠকের জানা উচিত যে, বঙ্গবাসী সংস্করণ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত। সম্পাদকের ভিত্তি প্রধানতঃ বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত সংস্করণ এবং বর্ধমানরাজাধিরাজ কর্তৃক মুদ্রিত মূল মহাভারত।

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক প্রবন্ধে জৈন মহাপণ্ডিত ন্যায়াচার্য্য "যশোবিজয় গণি"র (১৬০৮-৮৮ খ্রীঃ) জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।[১] ইনি যৌবনারম্ভে প্রতিভার প্রেরণায় দুরূহ নব্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য ব্রাহ্মণের ছদ্ম বেশ ধারণ করিয়া কাশীতে ১২ বৎসর (১৬২৬-৩৮ খ্রীঃ) অবস্থান করেন এবং কৃতবিদ্য হইয়া "ন্যায়খণ্ডনখাদ্য" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনাপূর্ব্বক নব্য ন্যায়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন। স্থলবিশেষে তিনি গর্ব্বভরে লিখিয়াছিলেন :

> ন্যায়াম্বুধির্দীধিতিকারযুক্তি-কল্লোলকোলাহলদুর্ব্বিগাহঃ।
> তস্যাপি পাতুং ন পয়ঃ সমর্থো কিং নাম ধীমৎপ্রতিভাম্বুবাহঃ ॥

তিনি যখন কাশীতে অধ্যয়ন করেন, তখনও জগদীশ-গদাধরের গ্রন্থ সুপ্রচারিত হয় নাই, কিন্তু যে মহানৈয়ায়িকের গ্রন্থ তখন অন্ততঃ কাশী অঞ্চলে প্রচারিত ছিল এবং যাঁহার মত যশোবিজয় গণি "ন্যায়খণ্ডনখাদ্য" গ্রন্থে খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহার নাম **"গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ"**। বর্ত্তমানে গুণানন্দের নাম ও গ্রন্থ নবদ্বীপ অঞ্চলে এবং বাঙ্গলার নৈয়ায়িক-সমাজে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ; যদিও এক সময়ে বাঙ্গলা দেশেও তাঁহার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[২] বৈশেষিকদর্শনের "কর্ম্ম"লক্ষণঘটিত একটি ক্ষুদ্র বাদগ্রন্থের এক স্থলে "বিদ্যাবাগীশাস্তু" বলিয়া গুণানন্দের মত লিখিত পাওয়া যায়।[৩] গদাধরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে অনুমান ১৬০০ খ্রীঃ বাঙ্গলার নৈয়ায়িকসমাজে যে চারিজন মাত্র সর্ব্বপ্রধান মহানৈয়ায়িকের গ্রন্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, গুণানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পৈতৃক পুঁথিসংগ্রহমধ্যে একটি নব্য ন্যায়গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রে নিম্নলিখিত মনোহর শ্লোকটি পাওয়া গিয়াছে :—

> গুণোপরি গুণানন্দী ভাবানন্দী চ দীধিতৌ।
> সর্ব্বত্র মথুরানাথী জাগদীশী ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা গুণানন্দের লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব।

উক্ত শ্লোকে গুণানন্দ-রচিত যে গ্রন্থের নির্দেশ রহিয়াছে, তাহা রঘুনাথ শিরোমণি-রচিত (১) **"গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতির"** উপর **"বিবেক"** নামক টীকা। এই গ্রন্থই, দেখা যায়, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া গৃহীত হইত। লণ্ডনে এই গ্রন্থের যে

১। J. A. S. B., 1910, pp. 463-69

২। *Ibid.* p. 466 "অষ্টসাহস্রীবিবরণ" নামক গ্রন্থে। দীধিতিকার ব্যতীত যশোবিজয় গণি ৩ জন বাঙ্গালী নৈয়ায়িকের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন—নারায়ণাচার্য্য (p. 468), গুণানন্দ (উভয়ই 'ন্যায়খণ্ডনখাদ্য' গ্রন্থে) এবং রঘুদেব (অষ্টসাহস্রীগ্রন্থে)।

৩। অস্মন্নিকটে বর্ত্তমান পুঁথির ৬ পত্রে।

প্রতিলিপি রক্ষিত ছিল, তাহার লিপিকাল "বেদাগ্নিবাণেন্দুযুতে (১৫৩৪) শকাব্দে" অর্থাৎ ১৬১২-১৩ খ্রীঃ—ইহাই গুণানন্দরচনার প্রাচীনতম প্রতিলিপি এবং তাঁহার অভ্যুদয়কালের অর্ব্বাচীন সীমার নির্দ্দেশক বটে। গ্রন্থের আরম্ভ ও পুষ্পিকা এই :—

নমো(স্তু) নীলকণ্ঠায় বলয়ীকৃতভোগিনে।
ভোগীন্দ্রাবদ্ধচূড়ায় ভোগিহারাবতংসিনে।
গুণপ্রকাশবিবৃতৌ প্রকাশে চ যথাযথং।
যত্নাত্তাৎপর্য্যসন্দর্ভো গুণানন্দেন তন্যতে।

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীবিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতঃ গুণবিবৃতি-বিবেকঃ সমাপ্তঃ।[৪]

তাঁহার প্রতিষ্ঠাকালে "বিদ্যাবাগীশ" উপাধি "শিরোমণি" কিম্বা ভবানন্দের 'সিদ্ধান্তবাগীশে'র ন্যায় রূঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই একনিষ্ঠ হইয়াছিল বুঝা যায়।

গুণানন্দের সময়ে বাঙ্গলায় নব্য ন্যায়ের পূর্ণ সমৃদ্ধি এবং দেখা যায়, তৎকালে যাহারাই গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই রঘুনাথ শিরোমণির প্রচলিত সমগ্র গ্রন্থের উপর টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। গুণানন্দও সম্ভবতঃ তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এ যাবৎ আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। **বৌদ্ধাধিকারদীধিতিবিবেক** : গ্রন্থের প্রারম্ভ এই :

নমো দৈত্যকুলাক্রান্তভুবো ভারজিহীর্ষবে।
বৃষ্ণিবংশাবতীর্ণায় চতুর্ব্ব্যূহায় বিষ্ণবে।
আত্মতত্ত্ববিবেকস্য ভাবোদ্ভাবকমাদরাৎ।
বিবিচ্যতে প্রযত্নেন গুণানন্দেন ধীমতা।

এই গ্রন্থে তদ্রচিত অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত অপর একটি গ্রন্থের নির্দ্দেশ আছে—

২। **অনুমানদীধিতিবিবেক** : যথা,

প্রারিপ্সিতবিঘ্নাপনুত্তয়েঽনুষ্ঠিতমোঁকারোচ্চারণপূর্ব্বকং ভগবন্নমস্কারস্বরূপং মঙ্গলং নিবধ্নাতি 'ওঁ নম' ইত্যাদি। ব্যাখ্যাতমিদমনুমানদীধিতিবিবেকেঽস্মাভিঃ।[৫]

৩। **লীলাবতীদীধিতিবিবেক** : এই গ্রন্থের প্রতিলিপি কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত আছে।[৬]

শিরোমণির কোন বাদগ্রন্থের উপর গুণানন্দরচিত টীকা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অনুমান হয়, আখ্যাতবাদাদির উপরও তিনি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ-রচিত আখ্যাতবাদের টীকায় গুণানন্দের সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে।[৭]

৪। Eggeling: *Ind. Off. Cat.* p. 660. এই প্রতিলিপির পত্রসংখ্যা ১০৩ এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত। "গুণদীধিতি" গ্রন্থ সম্প্রতি সরস্বতীভবন গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। Peterson: *Cat. of Ulwar Mss.* p. 54. চৌখাম্বা হইতে আত্মতত্ত্ববিবেকের যে নূতন সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে, তাহার পাদটীকায় বহু স্থলে গুণানন্দের টীকার সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬। *Cat. of Mss. Benares* (Dr. Venis), p. 180.

৭। তত্ত্বচিন্তামণি (সোসাইটি সং), শব্দখণ্ড, পৃঃ ৮৮৬। এই রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ "নঞ্‌বাদে"রও টীকাকার এবং "লক্ষ্মণানন্দের" পুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। নবদ্বীপে ১০৮৪ সনে এক রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ জীবিত ছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ অভিন্ন।

এতদ্ব্যতীত তিনি আরও বহুতর টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তিনখানি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে :

৫। **প্রত্যক্ষমণিটীকা** : এই গ্রন্থের আদ্যন্তখণ্ডিত একমাত্র প্রতিলিপি কাশীর সরস্বতীভবন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (ন্যায়বৈশেষিক ৩৪১ সং পুথি)। মূল প্রামাণ্য-বাদাদির উপর ইহা রচিত, দীধিতি কিম্বা আলোকের উপর নহে। পার্শ্বে "গুণানন্দী" লিখিত থাকায় গ্রন্থকার বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৬। **ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতাৎপর্য্যবিবেক** : এই গ্রন্থও কাশীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ইহাতে কারিকাংশ ও গদ্যাংশ, উভয়েরই ব্যাখ্যা রহিয়াছে। এই গ্রন্থও এক সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কাশীর গ্রন্থাগারে "নবদ্বীপীয়" ত্রিলোচনদেব ন্যায়পঞ্চানন-রচিত কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যার প্রতিলিপি আছে। ত্রিলোচন গ্রন্থমধ্যে শিরোমণি ও গুণানন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।[৮]

৭। **শব্দালোকবিবেক** : পক্ষধর মিশ্র-রচিত "আলোক" গ্রন্থের শব্দখণ্ডের উপর টীকা। কাশীর সরস্বতীভবনে আমরা ইহার দুইটি প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ; একটি খণ্ডিত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আদিসমন্বিত। প্রারম্ভাংশ উদ্ধৃত হইল।

সিদ্ধেশ্বর্য্যৈ নমঃ। অথ।
নমো দৈত্যকুলাক্রান্তভুবো ভারজিহীর্ষবে।
বৃষ্ণিবংশাবতীর্ণায় চতুর্ব্যূহায় বিষ্ণবে।
মধুসূদনসদ্ব্যাখ্যাসুধাক্ষালিতচেতসা।
গুণানন্দেন কৃতিনা শব্দালোকো বিবিচ্যতে। (ন্যায়বৈশেষিক ৩৬৬ সং পুথি)

মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি অবিকল বৌদ্ধাধিকারটীকায় আছে। নাগরাক্ষরে লিখিত এই প্রতিলিপির পার্শ্বে "শব্দ গুং" পরিচয়লিপি আছে। দ্বিতীয় প্রতিলিপি আদ্যন্তখণ্ডিত (২-৫৮, ১-৭৫, ১০২-৩৫ পত্র)—পার্শ্বের পরিচয়লিপি 'বিং বাং', 'বিদ্যাং', 'বিং শাং' ও 'বিদ্যাবা' দেখিয়া স্বর্গত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় ভ্রমক্রমে ইহা (বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা) "বিদ্যাবাচস্পতি"-রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা প্রথমোক্ত প্রতিলিপির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি, অবিকল একই গ্রন্থ। লিপিকার গ্রন্থকারের "বিদ্যাবাগীশ" উপাধিই পার্শ্বে সংক্ষেপে লিখিয়াছেন। (ন্যায়বৈশেষিক ২৮১ সং পুথি)।[৯]

দ্বিতীয় শ্লোকে একটি মূল্যবান্ নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, গুণানন্দের গুরুর নাম ছিল "মধুসূদন"। এই মধুসূদন কে ছিলেন, নির্ণয় করিবার উপায় নাই, কিন্তু বিদ্বৎসমাজের আলোচনার জন্য এ বিষয়ে আমাদের একটা অনুমান প্রমাণাবলী সহ উপস্থিত করিতেছি।

৮। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—*S. B. Studies*, Vol. V, p. 157.

৯। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের প্রবন্ধ এ স্থলে সংশোধনীয়—*S. B. Studies*, Vol. IV, pp. 61-69.

মধুসূদন বাচস্পতি

স্বর্গত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী প্রণীত "নবদ্বীপমহিমা" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন মুদ্রিত হয় (১২৯৮ সন), তখন নিজ নবদ্বীপে মহানৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের বংশধরগণ জীবিত ছিলেন—বর্ত্তমানে ভবানন্দের বংশ নবদ্বীপে বিলুপ্ত হইয়াছে। ১২৯৮ সনে ঐ গ্রন্থে (৮১ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে :—

"কিন্তু ভবানন্দের পুত্র মধুসূদনের বংশধর বর্ত্তমান আছেন। দণ্ডপাণীতলার বিনোদগোপাল ভট্টাচার্য্য এই বংশসম্ভূত।"

অন্যত্রও (৭০ পৃঃ) ভবানন্দের পুত্র মধুসূদনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। স্বর্গত রাঢ়ী মহাশয় পরে সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, এই মধুসূদনের উপাধি "বাচস্পতি" ছিল। ফলে, ভবানন্দের এক পুত্রের নাম "মধুসূদন বাচস্পতি" ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইনিই গুণানন্দের ন্যায়গুরু বলিয়া আমাদের অনুমান। সংক্ষেপে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিব। ভবানন্দের "কারকচক্রে"র উপর অতিপ্রসিদ্ধ "রৌদ্রী" টীকার বহুতর প্রতিলিপিতে এইরূপ পুষ্পিকা দৃষ্ট হয়[১০] :—

"ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীরুদ্রদেবতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতা **পিতামহকৃত**-কারকার্থনির্ণয়রৌদ্রী সমাপ্তা"

সুতরাং "রুদ্রদেব" সংক্ষেপে "রুদ্র" তর্কবাগীশ (প্রারম্ভশ্লোকে আছে "**রুদ্রেণ** তন্যতে রৌদ্রী কারকাদ্যর্থনির্ণয়ে") ভবানন্দের পৌত্র ছিলেন নিঃসন্দেহ। বাঙ্গলার নৈয়ায়িক-সমাজ বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে যে, এই রুদ্র তর্কবাগীশ অন্যান্য বহু গ্রন্থও রচনা করিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী রৌদ্রী", "অনুমানদীধিতি রৌদ্রী" এবং একটি ক্ষুদ্র বাদগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনিই মুক্তাবলীর একমাত্র বাঙ্গালী টীকাকার। গ্রন্থের পরিচয়-শ্লোক ও পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল :—

তাতং শ্রী-রামধীরেশং ধীরং শ্রীমধুসূদনং।
নত্বা রুদ্রেণ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী বিশদ্যতে।

"ইতি ভট্টাচার্য্যচূড়ামণি শ্রীল শ্রীরুদ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যরচিতা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী রৌদ্রী সমাপ্তা।"[১১]

এই টীকার এক স্থলে গ্রন্থকার স্বরচিত 'অনুমানদীধিতি রৌদ্রী'র উল্লেখ করিয়াছেন

১০। অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির ২৬ পত্র। পুরুষোত্তমদেব হইতে আরম্ভ করিয়া বহু পণ্ডিত 'কারকচক্র' রচনা করিয়াছেন। রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি-রচিত কারকপরিচ্ছেদ (Tanjore Mss., Vol. XI, No. 6006—"শ্রীরুদ্রোঽতিচুরুহং বিবেচয়ত্যেষ কারকব্যূহং") এবং রমানাথ ভট্টাচার্য্যকৃত 'কারকচক্র' (অভিরাম বিদ্যালঙ্কারের 'সমাসটিপ্পনী' পৃঃ ৫৫) উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। সুতরাং রৌদ্রীকারের পক্ষে 'পিতামহকৃত' নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইয়াছিল।

১১। কাশীর সরস্বতীভবনস্থ ন্যায়বৈশেষিক ৮৮০ সং পুথি। তথায় অপর একটি খণ্ডিত পুথিও আছে, উভয়ই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। লণ্ডনে যে পুথি আছে (*I. O.* p. 673) তাহাও বঙ্গাক্ষরে লিখিত। অস্মন্নিকটে প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন একটি খণ্ডিত পুথি (৩১ পত্র মাত্র) আছে এবং নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারেও একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি দেখিয়াছি (৬২৬ সং পুথি)। এই গ্রন্থ সুপ্রাপ্য নহে এবং ইহার রচনাশৈলী অবিকল কারকচক্রের রৌদ্রীর সদৃশ—ক্ষুদ্র টিপ্পনী ব্যতীত বিস্তৃত সন্দর্ভ বিরল। দীনকরীর টীকাকার রামেশ্বরসুত "রামরুদ্র ভট্ট" দাক্ষিণাত্যনিবাসী খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক—রামরুদ্রীয়ের কোন পুথি বঙ্গদেশে পাওয়া যায় নাই।

এবং শেষোক্ত গ্রন্থের একমাত্র প্রতিলিপির বিবরণীতে তিনি 'মধুসূদনাত্মজ রামের পুত্র' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।[১২] এতদ্ভিন্ন বিবাহবাদ রৌদ্রী নামক গ্রন্থের একটি মাত্র ত্রুটিত পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার আরম্ভশ্লোক এই :—

"* * * তাতং শ্রীতর্কালঙ্কারমাদরাং। প্রণম্য তনুতে রৌদ্রীং বিবাহস্য মুদে সতাং॥"

সুতরাং ভবানন্দের দুই পুত্রের নাম উদ্ধার হইল—মধুসূদন বাচস্পতি এবং "রাম তর্কালঙ্কার" (শ্রীরাম নহে)। পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিলোচনদেব ন্যায়পঞ্চানন ও "নবদ্বীপনিবাসী এক রামে"র ছাত্র ছিলেন[১৩] এবং তাঁহার গ্রন্থে গুণানন্দের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয়, ইঁহারা সকলেই ভবানন্দের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ফলে গুণানন্দের গুরু 'মধুসূদন' ভবানন্দের পুত্র হওয়া সম্ভব।

মধুসূদন ও রাম তর্কালঙ্কারের কাল নির্ণয় সহজসাধ্য বলিয়া আমাদের ধারণা। "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামীর বিদ্যাগুরুর নাম 'মধুসূদন বাচস্পতি' লিখিত আছে। তিনি অভিন্ন হইলে খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর ৬ষ্ঠ ও ৭ম দশকে মধুসূদনের সময় নির্ণয় করা যায়; কারণ, জীব গোস্বামী ১৫০৬ শকাব্দ হইতে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঠিক এই সময়ই নবদ্বীপে "রাম তর্কালঙ্কার" নামক একজন প্রধান পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আছে।

নবদ্বীপের একটি প্রাচীন লেখা

৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় ১৪৯০ শকাব্দের একটি বাটীবিক্রয়পত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন (উষা নামক বৈদিক পত্রিকার প্রথম ভাগ, ১০ম খণ্ড, ১৮১৩ শাকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ২৩-২৪ পৃষ্ঠা)। এ যাবৎ কোন ঐতিহাসিক এই মূল্যবান্ প্রমাণপত্রটি যথাযথ আলোচনা করেন নাই। আমরা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের অনুগ্রহে ইহার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীনাথাচার্য্যচূড়ামণি-রচিত "বিবাহতত্ত্বার্ণব" গ্রন্থের একটি জীর্ণ প্রতিলিপি সামশ্রমী মহাশয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; লিপিকালাদি এই :—

শাকে বিধুনবভুবনৈরব্দে রামং প্রণম্য লিপিমকরোৎ।
শ্রীযুতবাণীনাথো বিবাহতত্ত্বার্ণবস্যাস্য॥

এই বাণীনাথ শ্রীনাথের পৌত্র ছিলেন বলিয়া সামশ্রমী মহাশয় লিখিয়াছেন। কিন্তু কি প্রমাণবলে, তাহা লিখিত হয় নাই। প্রতিলিপির আদ্য পৃষ্ঠে "শ্রীজগদীশ শর্ম্মা"র এক পুত্রের জাতপত্র লিখিত ছিল (জন্মশক ১৪৯৬)—সামশ্রমী মহাশয় এই জগদীশকে জগদীশ তর্কালঙ্কারের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন। লিপিকার বাণীনাথ শ্রীনাথের পৌত্র হইলে তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু জগদীশ তর্কালঙ্কারের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল "বাণীনাথ ভট্টাচার্য্য" এবং তিনিই যদি লিপিকার হন, তাহা হইলে উক্ত জাতপত্র জগদীশ তর্কালঙ্কারের

১২। "অনুমানদীধিতিরৌদ্রামধিকঃ প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ" (মুক্তাবলীরৌদ্রী, ৩১ ক পত্র)। এই গ্রন্থের প্রতিলিপি আলোয়ার মহারাজের গ্রন্থাগারে আছে: Peterson: *Cat. of Ulwar Mss.*, p. 27. বলা বাহুল্য, বিদ্যানিবাসপুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি।

১৩। **Hall : *Contributions* p. 84 "pupil of one Rama of Navadwip"**

জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের হওয়া অসম্ভব নহে। এই জীর্ণ গ্রন্থমধ্যে তালপত্রে লিখিত একটি বিক্রয়পত্র ছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল :

স্বস্তি সমস্ত সুপ্রশস্তীত্যাদি মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রী**হজরত আল্লে**-দেবপাদানামভ্যুদয়িনি গৌড়রাজ্যে ওজীর শ্রী**সেখ ফরিদ** মহা (? সাহা)ধিষ্ঠিত-হুসেনাবাজমুল্লুকে শ্রী**শিখিমহাপাত্র**-মহাশয়াধিকৃতনবদ্বীপসীকে নবত্যধিকচতুর্দ্দশশতাব্দীয়শ্রাবণে মাসি শ্রী**রামতর্কালঙ্কার**ভট্টাচার্য্যাণাং সদসি শ্রীজগন্নাথাচার্য্যাং শিবাঙ্কাধিক সমুদ্রীং মূল্যমাদায়, পূর্ব্বস্যাং গোবিন্দশরণবাটী দক্ষিণস্যাং শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্ত্তিবাটী পশ্চিমায়াং পুষ্করিণী উত্তরস্যাং দিশি শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যবাটী ইত্থং চতুঃসীমাবদ্ধং বাব (? র) কোণারামান্তর্গত বাটীখণ্ডং শ্রীবল্লভাচার্য্য-হরিদাস-পণ্ডিতাভ্যামুপরিলিখিতনাম্নি বিত্তদাতরি বিক্রীতমিতি শাক ১৪৯০ তি ৪ শ্রাবণস্য॥

শ্রীবল্লভাচার্য্যস্য। শ্রীহরিদাস সম্মনঃ (বালকঃ)।

"অত্রার্থে সাক্ষিণঃ" বলিয়া ২১ জনের নাম আছে, তাহা 'উষা' পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। 'হজরত আল্লে' সুলেমান কররাণীর উপাধি ছিল ইতিহাসে পাওয়া যায়। নবদ্বীপ তৎকালে "হুসেনাবাদ" পরগণার অন্তর্ভূত একটি "সীক" ছিল এবং শাসনকর্তৃদ্বয়ের নাম সম্পূর্ণ নূতন। তখনও ভবানন্দের বংশ নবদ্বীপাধিকার প্রাপ্ত হন নাই বুঝা যায়। যাঁহার সভায় পত্র লেখা হয়, তাঁহার নাম "রাম তর্কালঙ্কার"—শ্রীরাম নহে এবং তিনি পূর্ব্বোদ্ধৃত ভবানন্দপুত্র হইতে অভিন্ন বলিয়া আমরা অনুমান করি।

উদ্ধৃত আলোচনার ফলে ১৫৬৮ খ্রীঃ ভবানন্দের পুত্র রাম তর্কালঙ্কারের জীবিতকাল নির্ণীত হইলে তৎপুত্র রুদ্রদেব তর্কবাগীশ এবং মধুসূদনের ছাত্র গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশের অভ্যুদয়কাল অনুমান ১৬০০ খ্রীঃ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এতদ্দ্বারা যে অপ্রত্যাশিত এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে, তাহার মীমাংসার জন্য বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি : ভাষাপরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলীকার বিশ্বনাথ পঞ্চানন ১৫৫৬ শকাব্দে (১৬৩৪ খ্রীঃ) বৃন্দাবনে থাকিয়া "ন্যায়সূত্রবৃত্তি" রচনা করেন। মুক্তাবলীর রচনাকাল সুতরাং ১৬০০ খ্রীঃ পূর্ব্বে যাইবে না। দিগন্তবিশ্রুতকীর্ত্তি ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পৌত্র হইয়া রুদ্রদেবের পক্ষে ভিন্ন সম্প্রদায়ের এক সমসাময়িক গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করা অসম্ভব। সুতরাং প্রশ্ন হইবে—

ভাষাপরিচ্ছেদ কাঁহার রচনা ?

প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে ভাষাপরিচ্ছেদের এক জীর্ণ প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হয়, তাহার পুষ্পিকা এই :

"ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রী**কৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌম**ভট্টাচার্য্যবিরচিতো ভাষাপরিচ্ছে......"

ইহা এক নামের ভিন্ন গ্রন্থ নহে, অবিকল প্রচলিত ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থই বটে। আমরা প্রথমতঃ লিপিকারের বিচিত্র ভ্রম বলিয়া ইহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি কুমিল্লার রামমালা গ্রন্থাগারের পুথিবিভাগে শ্রীহট্ট হইতে ভাষাপরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলীর প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন প্রতিলিপি সংগৃহীত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থের পুষ্পিকা যথাযথ উদ্ধৃত হইল (৩১৬ সং সংস্কৃত পুথি)—

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীকৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য-বিরচিতঃ ভাসাপরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ
বাগীশ্বর্য্যাঃ পদদ্বন্দ্বং নিধায় হৃদি সর্ব্বদা।
লিখিতা পুস্তিকা চৈষা সতাং চিত্তবিহারিণী ॥

শ্রীরামঃ শরণম্।

মধুসূদনসদ্ব্যাখ্যাস্বর্গঙ্গাকণসম্ভবা।
শুদ্ধির্যা জায়তে সা কিং বুধান্তরবচোঽম্ভসা ॥

(৮ খ পত্র)

ইতি শ্রীযুতমহামহোপাধ্যায়শ্রীকৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য-বিরচিতা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমাপ্তা।

(৭৬ খ পত্র)

মুক্তাবলীর প্রারম্ভে শ্লোকমধ্যে "বিষ্ণোর্বক্ষসি **বিশ্বনাথ**-কৃতিনা" লিখিত আছে। উক্ত প্রতিলিপিতেও লিপিকার এই পাঠই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সংশোধনপূর্ব্বক উপরে "কৃষ্ণদাস" লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, তদ্দ্বারা ছন্দঃপতন ঘটে না। বুঝা যায়, বিশ্বনাথের নামে এই গ্রন্থের প্রচার সম্যক্ জানিয়াও লিপিকার স্পষ্টাক্ষরে তাহা সংশোধন করিয়াছেন। মূল গ্রন্থের পুষ্পিকায় সর্ব্বশেষ শ্লোকটির সহিত গুণানন্দের শব্দালোক-বিবেকের গুরুবন্দনা-শ্লোকের আশ্চর্য্য মিল দেখিয়া অনুমান হয়, দুই মধুসূদন অভিন্ন এবং মুক্তাবলীর উপরও যে মধুসূদনের একটা সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, লিপিকারের উদ্ভট শ্লোকটিতে তাহার লুপ্তস্মৃতি নিবদ্ধ থাকিয়া রুদ্রদেবের উক্তির আশ্চর্য্য সমর্থন বহন করিতেছে। অনুসন্ধান করিলে ভাষাপরিচ্ছেদ-মুক্তাবলীর অপর অপর প্রতিলিপিতেও উক্তরূপ পুষ্পিকা পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। কয়েক মাস পূর্ব্বে বাঁশবেড়িয়ার শেষ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ৺শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারের গৃহে ১৭৮৫ শকাব্দে লিখিত মুক্তাবলীর একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাতেও অবিকল উক্তরূপ পুষ্পিকা রহিয়াছে এবং আরম্ভ-শ্লোকের "বিশ্বনাথ" সংশোধন করিয়া 'কৃষ্ণদাস' লিখিত হইয়াছে। চিরপ্রচলিত বিশ্বনাথ পঞ্চাননের গ্রন্থবিষয়ে তিনটি বিভিন্ন স্থানের এবং বিভিন্ন সময়ের প্রতিলিপিতে ভিন্নকর্ত্তৃত্বের আরোপ উপেক্ষা করা চলে না—একটা সুপ্রাচীন প্রবাদের ক্ষীণ স্মৃতির লুপ্তোদ্ধার ইহার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সম্বন্ধেও এইরূপ বিরোধ বিরল নহে। রৌদ্রী টীকার অস্মন্নির্দ্দিষ্ট কালনির্ণয় দ্বারা বিশ্বনাথ অপেক্ষা কৃষ্ণদাসের কর্ত্তৃত্বেরই পরিপোষণ হয়। কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম দীধিতির একজন সুপ্রাচীন টীকাকার। তদ্রচিত "অনুমানদীধিতিপ্রসারিণী"র মুদ্রিতাংশের (সোসাইটির সংস্করণ) সহিত ভবানন্দীর তুলনা করিলে অনায়াসে উপলব্ধি হয় যে, তিনি ভবানন্দেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ তাঁহার অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা যায়। মুক্তাবলী এই কৃষ্ণদাসের রচনা বলিয়া গৃহীত হইলে ভবানন্দের সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুমান করিতে হইবে।

বিশ্বনাথের কর্ত্তৃত্বে সন্দেহ করার অপর একটি কারণও বিদ্যমান আছে। জগদীশ-বংশীয় নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের বিপুল পুথিসংগ্রহমধ্যে অন্যূন

৩০০ বৎসরের প্রাচীন মুক্তাবলীর এক প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থের প্রথম পত্রটি নাই এবং পুষ্পিকায়ও গ্রন্থকারের নাম নাই। লিপিকালাদি এই :—

ইতি সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমাপ্তা। খৌআল সং শ্রীউমানন্দেন লিখিতৈষা পুস্তীতি। **দেশীয় সক**॥ **২০৫ দুই শত্র পাচ সকা** তারিখ ৩ অগ্রহণ।

লিপিকার মৈথিল "খৌআল বংশ"সম্ভূত ছিলেন, মুরারির টীকাকার রুচিপতিও এই বংশীয় ছিলেন। "দেশীয় শকে"র উল্লেখ এই সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যাইতেছে, ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ইহা লক্ষ্মণাব্দও নহে, পরগণাতি সনও নহে নিশ্চিত। বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গারাজের সৃষ্টি হইতে যদি কোন শকের কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে পুথিটি খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগের হইয়া পড়ে; কিন্তু তদপেক্ষা ইহা যে অনেক প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের অনুমান, মিথিলার কর্ণাটবংশের ধ্বংসের পর খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে শ্রোত্রিয় কামেশ্বরবংশের রাজ্য-প্রতিষ্ঠা হইতে এই দেশীয় শকের উৎপত্তি। তদনুসারে প্রতিলিপির তারিখ হয় অনুমান ১৫৭০ খ্রীঃ—যখন বিশ্বনাথ পঞ্চানন বাল্য অতিক্রম করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সুতরাং কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমই ভাষাপরিচ্ছেদ-মুক্তাবলীর গ্রন্থকার ছিলেন ধরিতে হইবে।

গুণানন্দের বংশ-পরিচয়

আমরা মূল প্রসঙ্গ হইতে বহু দূর আসিয়া পড়িয়াছি। নবদ্বীপে গুণানন্দের নাম বিলুপ্ত হওয়ায় বুঝা যায়, তাঁহার বাড়ী নিজ নবদ্বীপে ছিল না। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া জেলার প্রান্তবর্ত্তী বিখ্যাত গণ্ডগ্রাম "সুবর্ণপুর"নিবাসী স্বর্গত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় "ব্রাহ্মণ-বংশবৃত্তান্ত" (১৩২২ সন) নামক গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম গুণানন্দের বংশ-পরিচয় মুদ্রিত করিয়া একটি মূল্যবান্ তথ্য কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শরৎবাবু গুণানন্দের কোন গ্রন্থাদির পরিচয় জানিতেন না। তৎসত্ত্বেও কেবল প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন যে, গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশের সন্তান নদীয়া, গাঙ্গুরিয়া গ্রামে অবস্থিত।

"গুণানন্দ সুপণ্ডিত, সুতার্কিক ও সিদ্ধপ্রভাবসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। স্মৃতি, শ্রুতি, ন্যায়, মীমাংসা ও দর্শনাদি নানা শাস্ত্রে ইঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, ন্যায়শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থকার জগদীশ তর্কালঙ্কার, ইঁহার তর্কশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার পত্নী মহাদেবী, অদ্ভুত সহনশীলতা দেখাইয়া সহমৃতা হন।" (৩২ পৃঃ)

উদ্ধৃত লেখা হইতে বুঝা যায়, গুণানন্দের স্মৃতি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গেলেও তাঁহার উপাধি "বিদ্যাবাগীশ" ও জগদীশ তর্কালঙ্কারের সহিত তাঁহার সমকালীনত্বের ক্ষীণ স্মৃতি শরৎবাবুর গ্রন্থরচনাকালেও বাঁচিয়া ছিল এবং এই গুণানন্দ যে আমাদের আলোচ্য মহা-নৈয়ায়িক হইতে অভিন্ন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শরৎবাবুর গ্রন্থে (পৃঃ ৩২-৩৩ ও ১১৪-৫ পৃঃ) গুণানন্দবংশীয় বহু পণ্ডিতের নাম এবং একটি শাখার নামমালা মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু গুণানন্দের ধারাবাহিক বংশাবলী শরৎবাবু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং বর্ত্তমানেও অপ্রাপ্য।

আমরা গুণানন্দের বর্ত্তমান বংশধর সিমহাটনিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবদাস

ভট্টাচার্য্য (বয়স ৭১) মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জ্ঞাত হইয়াছি, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম। গুণানন্দ ভরদ্বাজগোত্রীয় "ডিংসাই" গাঞি রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার বাড়ী নদীয়া জিলার অন্তর্গত সুবর্ণপুর ও সিমহাট গ্রামের সংলগ্ন "গাঙ্গুরিয়া" গ্রামে অবস্থিত ছিল। কাঁচড়াপাড়া হইতে ৯।১০ মাইল দূরবর্ত্তী এই গ্রাম সুপ্রাচীন 'বহরমপুর রাস্তা'র পার্শ্বে অবস্থিত এবং বহু পূর্ব্বে একটি শাখানদী 'শুঠী' বা "সূক্ষ্মাবতী" গ্রামটির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছিল। এই মড়া 'গাঙ্গে'র খাত এখনও বিদ্যমান এবং তদনুসারেই গ্রামের নামকরণ ('গাঙ্গ্ ঘুরিয়া') হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। সংলগ্ন সিমহাট (পুরাতন পত্রানুসারে 'ছিমহাট') গ্রাম 'কেশর' ভাবাপন্ন বহু কুলীন বংশের প্রসিদ্ধ একটি সমাজস্থান ছিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ও নাগরিক সভ্যতার আকর্ষণে সিমহাটের সমৃদ্ধ অধিবাসিবৃন্দ পতনোন্মুখ বিশাল অট্টালিকাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া গ্রামটিকে রিক্তপ্রায় করিয়া গিয়াছে।

গাঙ্গুরিয়া গুণানন্দবংশীয় ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীর নামেই চিরকাল পরিচিত। তাঁহার বিস্তৃত বংশলতার পাণ্ডিত্যপ্রভাবে এক সময়ে ইহা "ছোট নবদ্বীপ" নামে পরিচিত ছিল। কিম্বদন্তী আছে, জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সমস্ত পণ্ডিতসমাজ জয় করিয়া এখানে আসিয়া বহুদিনব্যাপী বিচারে পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিসম্পাতেই বংশের ভীষণ অধঃপতন সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে গ্রামটি প্রায় জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে এবং মুষ্টিমেয় অধিবাসীর মধ্যে এক ঘরমাত্র গুণানন্দের বংশধর বিদ্যমান আছে। নামমালা যথা,—
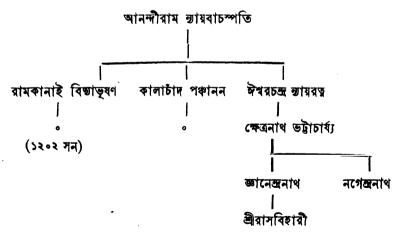
ক্ষেত্রনাথ শ্রীযুত শিবদাস ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতৃসম্পর্কিত "ত্রিরাত্র" জ্ঞাতি ছিলেন। এই বাড়ীর নিকটে কতিপয় ইষ্টকাময় বাস্তবাটীর ধ্বংসাবশেষ, তন্মধ্যে ৩টি ভগ্ন শিবলিঙ্গ এবং অদূরে একটি নাতিবৃহৎ দীর্ঘিকা গাঙ্গুরিয়ার ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীর পূর্ব্বস্মৃতি বহন করিতেছে। বাস্তবাটীর একটিতে দয়ারাম বাচস্পতি ও কালীশঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত বাস করিতেন, কালীশঙ্করের পৌত্র চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্য, তৎপুত্র বিশ্বেশ্বর, তৎপুত্র আশুতোষ ও তৎপুত্র শ্রীঅনাথবন্ধু

(বর্ত্তমানে সিমহাটনিবাসী)। এই দুই ঘর ও শ্রীযুক্ত শিবদাস ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ব্যতীত গুণানন্দের বিশাল বংশবৃক্ষের সমস্ত ধারা প্রলয়কারী কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহাদের নাম উদ্ধার করা অসাধ্য এবং শরৎবাবুর গ্রন্থে যে সকল নাম মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে প্রমাণসিদ্ধ নহে। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের গৃহে রক্ষিত তায়দাদ ও অন্যান্য প্রচীন পত্রাদি পরীক্ষা করিয়া আমরা এই বংশের প্রধান একটি শাখার এইরূপ নামমালা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি :—
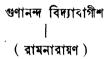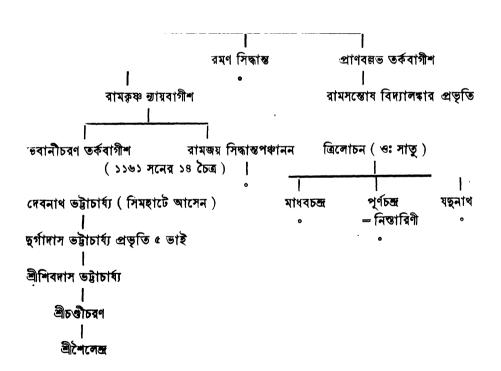
গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ

(রামনারায়ণ)

রমণ সিদ্ধান্ত — ০

প্রাণবল্লভ তর্কবাগীশ — রামসন্তোষ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি

রামকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ

ভবানীচরণ তর্কবাগীশ (১১৬১ সনের ১৪ চৈত্র)

রামজয় সিদ্ধান্তপঞ্চানন — ০

ত্রিলোচন (ওঃ সাতু)

মাধবচন্দ্র — ০

পূর্ণচন্দ্র = নিস্তারিণী — ০

যদুনাথ — ০

দেবনাথ ভট্টাচার্য্য (সিমহাটে আসেন)

দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ৫ ভাই

শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য

শ্রীচণ্ডীচরণ

শ্রীশৈলেন্দ্র

প্রাণবল্লভ তর্কবাগীশের ৫ পুত্র—রামসন্তোষ, রামানন্দ বিদ্যাভূষণ, ভৃগুরাম ন্যায়পঞ্চানন, রামশরণ ন্যায়বাগীশ কবিরঞ্জন ও হরিরাম ন্যায়ালঙ্কার। রামসন্তোষ ভিন্ন সকলেই নিঃসন্তান এবং (হরিরাম ভিন্ন) সকলের সম্পত্তি ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য ১২০২ সনের পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১২৮৩ সনে যদুনাথ স্বর্গী হইলে নিস্তারিণী দেবী ও তৎপর যদুনাথের "সপিণ্ড

জ্ঞাতিভ্রাতুস্পুত্র" দুর্গাদাস প্রভৃতিরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র একই তারিখে ১১৬০ সনের ১৭ শ্রাবণ—রামসন্তোষ প্রভৃতি ৫ ভাইয়ের প্রত্যেককে ৫০/০ বিঘা ভূমি দান করেন। সম্ভবতঃ ইহা পূর্ব্বতন একটা বৃহৎ ভূমিদানের অংশবিভাগ মাত্র—প্রবাদ আছে, এই ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠী ১০০০/০ বিঘা ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন (ব্রাহ্মণবংশ-বৃত্তান্ত, পৃঃ ৩৩)। শ্রীযুত শিবদাস ভট্টাচার্য্যের সহিত জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে উপরিলিখিত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য যদুনাথের ধারা অপেক্ষা দূরবর্ত্তী এবং ক্ষেত্রনাথ আরও দূরতর ভ্রাতৃ-পর্য্যায়ের লোক ছিলেন। সুতরাং গুণানন্দ অন্যূন ১০ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন সন্দেহ নাই।

রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে 'ডিংসাই'বংশীয় একজন খ্যাতনামা গুণানন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। 'চৈতল' চট্টবংশীয় বিখ্যাত কুলীন চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের ভ্রাতুস্পুত্র (মাধবের পুত্র) রাজারামের কুলক্রিয়ার বর্ণনায় লিখিত আছে[১৪] ঃ

"রাজারামে দিণ্ডী গুনানন্দস্য পৌত্রী রামনারায়ণস্য কন্যাবিবাহঃ।"

বুঝা যায়, গুণানন্দ প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাবেই এই কুলক্রিয়া সম্ভব হইয়াছিল। ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশে' (পৃঃ ১৩৩) মাধব ও চন্দ্রশেখরের পিতামহ "উদয় কুলবরে"র কুলকারিকা ১০৭ সমীকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে, তদনুসারে খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে চন্দ্রশেখরাদি ও গুণানন্দের অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা যায়।

গুণানন্দের বিলুপ্ত বংশাবলীর অপর কতিপয় নাম এখানে সংগৃহীত হইল :—জগদীশ তর্কালংকার (১১৭৩ সনের সনদ, অপুত্রক), রামগোপাল বিদ্যানিবাসের পুত্র নন্দরাম ন্যায়ালংকার (১১৬০ সন, পুত্র পার্ব্বতীচরণ প্রভৃতি), মনোহর তর্কভূষণ, জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন, কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত (দৌহিত্র রামপ্রসাদ চট্ট প্রভৃতি), কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত (১১৬০ সন), আনন্দীরাম ন্যায়পঞ্চাননের পুত্রদ্বয় রামকান্ত ন্যায়ভূষণ ও কাশীনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীধর বিদ্যাভূষণের ভ্রাতা রামকান্ত তর্কালঙ্কার ও রামকান্তপুত্র রামলোচন বিদ্যানিধি (১১৬২ সন)॥

বাসুদেব সার্ব্বভৌম হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যূন ৪০০ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা দেশে নব্য ন্যায়ের যে অগণিত গ্রন্থাবলি রচিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই নিজ নবদ্বীপে বসিয়া লিখিত। বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত নবদ্বীপের এই আভিজাত্য অপ্রতিহত ছিল—কতিপয় "পত্রিকা"কার ব্যতীত নবদ্বীপের বাহিরে নব্য ন্যায়ের কোন গ্রন্থকারই প্রায় জন্মে নাই; কিম্বা তাদৃশ গ্রন্থ প্রচার লাভ করে নাই। কেবল কাশীধামে প্রাচীন কাল হইতেই যে বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট পণ্ডিতসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তন্মধ্যে কয়েক জন খ্যাতনামা নব্য ন্যায়ের গ্রন্থকার ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে এক গুণানন্দ ব্যতীত প্রায়

১৪। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ সং সংস্কৃত পুথির (কুলসারাবলী) ৩২৬ক পত্র। অপর একটি কুলপঞ্জীতেও (১৮১৫খ সং) রাজারাম সম্বন্ধে আছে "দীণ্ডী বিভাহ গুণানন্দস্য পৌত্রী"।

কাহারও নাম করা যায় না, যাঁহার গ্রন্থ ভারতের নানা স্থানে প্রচার লাভ করিয়া নবদ্বীপের সহিত অধুনালুপ্তস্মৃতি এক "ছোট" নবদ্বীপের মহিমা ঘোষণা করিয়াছিল এবং এ বিষয়ে গুণানন্দের কীর্ত্তি বঙ্গদেশে প্রায় অতুলনীয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় এক গুণানন্দ-রচিত "স্মৃতিসার" নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে।[১৫] গ্রন্থারম্ভে ২য় শ্লোকে আছে ঃ

স্মৃতি(ং) বীক্ষ্য গুরুং নত্বা প্রীতয়ে বিদুষাং মুদা।
ক্রিয়তে স্মৃতিসারস্তু গুণানন্দেন ধীমতা॥

পুষ্পিকায় ('ইতি গুণানন্দরচিতং স্মৃতিসারং সমাপ্তং', ৪থ পত্র) উপাধি না থাকায় ইহাঁর সহিত আলোচ্য গ্রন্থকারের অভেদ কল্পনার কোন হেতু নাই। স্মৃতিশাস্ত্রের অতি সাধারণ কতিপয় বিষয়ে প্রচলিত মুনিবচনের সংগ্রহস্বরূপ এই শ্লোকাত্মক গ্রন্থের রচনা একান্তভাবে বৈশিষ্ট্যহীন এবং ইহা প্রায় নিশ্চিতই বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের রচনা নহে :

১৫। ১৭৫৩ সং সংস্কৃত পুথি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায়ও এই গ্রন্থের প্রতিলিপি আছে। (১২৯ঘ পুথি)।

বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠ আলোচনা

ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, এম এ, বি এল

বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠে অনেক বিকৃতি প্রবেশ করিয়াছে। ইহার কয়েকটী কারণ আছে। প্রথমতঃ, এইগুলি লোকমুখ হইতে মূল পুস্তকে সংগৃহীত হয়। শ্রুতিপরম্পরায় পাঠবিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়তঃ, মূলের প্রতিলিপিতে লিপিকর-প্রমাদ। তৃতীয়তঃ, মুদ্রিত পুস্তকের মুদ্রাকরপ্রমাদ। কাহ্নপাদের একটী গীত হইতে এই পাঠবিকৃতি দেখাইতেছি।

মুদ্রিত পাঠ (চর্য্যা ৭)

অলি এঁ কালি এঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন বিমন ভইলা।ধ্রু।
কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস
জো মন গোঅর সো উআস। ধ্রু।
তেতিনি তেতিনি তিনি হো ভিন্না
ভণই কাহ্নু ভবপরিচ্ছিন্না। ধ্রু।
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইঈলা।ধ্রু।
হেরি সে কাহ্নি ণিঅড়ি জিনউর বট্টই
ভণই কাহ্নু মোহিঅহি ন পইসই। ধ্রু।

সৌভাগ্যক্রমে এই অংশের আদর্শ পুথির আলোকচিত্র মুদ্রিত পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে আমরা দেখি যে, মুদ্রিত "কাহ্ন" (২ বার) "কাহ্নু" (৩ বার) স্থানে আদর্শ পাণ্ডুলিপিতে "কাহ্ন" আছে। ইহাই বিশুদ্ধ পাঠ। আদর্শ লিপিতে ৪র্থ চরণে "মণগোঅর", ৮ম চরণে "বিমণ" ও ৯ম চরণে "ণিঅড়ী" পাঠ আছে। আদর্শ পাণ্ডুলিপিতেও কিন্তু লিপিকর-প্রমাদ আছে। ১ম চরণে "বাট" ও "রুন্ধেলা" শব্দ দুইটীর মধ্যে একটী বৃথা একার আছে, ২য় চরণে "কহিঁ" ও "গই" এই দুই শব্দের মধ্যে একটী বৃথা ব আছে। শাস্ত্রী মহাশয় মুদ্রিত পুস্তকে ইহা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এ দুটী ভিন্ন ৮ম চরণে "ভইঈলা" "ভইলা" স্থানে লিপিকরপ্রমাদ। লিপিকর ন ও ণ যদৃচ্ছাক্রমে লিখিয়াছেন, প্রমাণ—২য় চরণে "বিমন"; কিন্তু ৮ম চরমে "বিমণ"; কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে উভয় স্থলে "বিমন"। লিপিকর হ্রস্ব দীর্ঘের মধ্যে পার্থক্য করেন নাই, যেমন "তিনি"; ইহা তীনি হইবে (প্রাকৃত তিন্নি, সংস্কৃত ত্রীণি)। ৮ম ও ৯ম চরণে "কাহ্ন" (মুদ্রিত কাহ্নু) ও "কাহ্নি" গায়কের প্রক্ষেপ বা আখর। মূল পুস্তক যে লোকমুখ হইতে সংগৃহীত, ইহা তাহার প্রমাণ। এই গীতটী পাদাকুলক ছন্দে রচিত। ইহার বিশুদ্ধ পাঠ নিম্নে দেওয়া হইল। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রাকৃতের

ন্যায় কেবল ণ লেখা হইত কি, । যদৃচ্ছাক্রমে ণ ন লেখা হইত, তাহা অমীমাংসিত থাকায়, আদর্শ পাণ্ডুলিপির ণ ন যথাদৃষ্ট লিখিত হইল। আমার মনে হয়, মূল পুস্তকে মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী প্রাকৃতের অনুসরণে সর্ব্বত্র ণ ও স লেখা হইত। আমি সর্ব্বত্র স দিয়া বানান করিয়াছি।

বিশুদ্ধ পাঠ

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ণু বিমনা ভইলা। ধ্রু।
কাহ্ণু কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মণগোঅর সো উআস। ধ্রু।
তে তীনি তে তীনি তীনি হো ভিন্না।
ভণই কাহ্ণু ভব পরিছিন্না। ধ্রু।
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে (কাহ্ণু) বিমণা ভইলা। ধ্রু।
হেরি সে (কাহ্নি) ণিঅড়ি জিনউর বট্টই।
ভণই কাহ্ণু মো হিঅহি ন পইসই। ধ্রু॥

এই পাঠ ছন্দ ও ভাষাতত্ত্বানুযায়ী। অপভ্রংশ ছন্দের নিয়মানুযায়ী একার ও ওকার আবশ্যকমত হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়, ইহা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। চরণান্তে হ্রস্ব স্বরকে আবশ্যক হইলে দীর্ঘ গণনা করিতে হইবে। ছন্দের অনুরোধে মূল শব্দের আ, ঈ, উ হ্রস্ব উচ্চারিত হইতে পারে; অন্য পক্ষে অ, ই, উ দীর্ঘ উচ্চারিত হইতে পারে; যথা—উআস শব্দের উ দীর্ঘ। এই নিয়ম মধ্য যুগের মৈথিল কবিতায়ও দৃষ্ট হয়। অনুনাসিকের পূর্ব্বস্বর আবশ্যকমত হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়। এই জন্য রুন্ধেলা শব্দের রু হ্রস্ব। লিপিকর বর্গীয় ও অন্তঃস্থ বকারদ্বয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য করেন নাই। বস্তুতঃ প্রাচ্য ভারতীয় লিপিতে ইহার পার্থক্য ছিল না। ভাষাতত্ত্বের অনুরোধে আমরা ঈ, উ এবং অন্তঃস্থ ব আমাদের প্রস্তাবিত বিশুদ্ধ পাঠে নির্দ্দেশ করিয়াছি।

ছন্দ ও ভাষাতত্ত্ব ব্যতীত সংস্কৃত টীকা ও তিব্বতী অনুবাদ আমাদিগকে পাঠ সংশোধন করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—

মুদ্রিত পাঠ—

তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গতা
তোহোর অন্তরে ছাড়িনড় এট্টা। (চর্য্যা ১০)

সংস্কৃত টীকা—

"তন্ত্রীতি…চাঙ্গিতমিতাদি…এতয়োঃ…মম বিক্রয়ণং…করোষি ভো ডোম্বি…। অতএব নটবৎ সংসার-পেটকং ময়া পরিত্যক্তং তবান্তরেণেতি।"

তিব্বতী অনুবাদ—গ্যঁদ্ ছোঙ্ গ্যঙ্-মো গ্শন্ য়ঙ্ মে-তো-গ্ স্তেগ্স্।
খ্যোদ্ ক্যি ছেদ্ দু 'দম্-বু' ই স্নন্[১] গ্শগ্-গো ॥

(অর্থ—হে ডোম্বী, তন্ত্র আরও পুষ্পপাত্র বেচ। তোমার জন্য নলের পেটরা ছাড়িয়াছি।)

বিশুদ্ধ পাঠ—

তান্তি বিকণহ (ডোম্বী) অবর মো চাঙ্গিড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পোড়া ॥

এখানে 'ডোম্বী' ছন্দের অতিরিক্ত পদের আখর মাত্র। আর একটি উদাহরণ দিতেছি।

মুদ্রিত পাঠ—

শাখি করিব জালন্ধরি পাত্র
পাখি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআ চাদে ॥ (চর্য্যা ৩৬)

সংস্কৃত টীকা—

শাখি করীত্যাদি। শ্রীগুরুজালন্ধরিপাদান্…সাক্ষিণঃ কৃত্বা…। যে যে…পণ্ডিতাচার্য্যাঃ। তে তে মম পাশসান্নিধানান্তরমপি[২] ন পশ্যন্তি।

তিব্বতী অনুবাদ—জা-ল-ন্দ-রি'ই শব্স লস্ ম্ঙোন্ স্নুম্ ব্রিদ্-দু ব্যস্।
ঝগ্-গিস্ ছুর্ য়ঙ্ পণ্-ডি-ত-য়িস্ ল্ত মি ব্যেদ্ ॥

(অর্থ—জালন্ধরি পাকে সাক্ষী করিব। আমার নিকটে সত্ত্বেও পণ্ডিত দেখেন না[৩]।

বিশুদ্ধ পাঠ—

সাখী করিব জালন্ধরি পাএ।
পাসি ণ চাহই (মোরে) পাণ্ডিআচাএ ॥

সংস্কৃত টীকায় উদ্ধৃত পাঠ অনেক স্থলে আমাদিগকে সাহায্য করে। এই পদের সংস্কৃত টীকায় "শাখি" উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মুদ্রিত পুস্তকে "শাখি" ও "পাত্র" মুদ্রাকরপ্রমাদ মাত্র। Royal Asiatic Society of Bengalএর প্রতিলিপিতে "শাখি" ও "পাএ" আছে। (এই প্রতিলিপি অনেক স্থলে মুদ্রাকরপ্রমাদ সংশোধন করিতে সাহায্য করে।) এই প্রস্তাবের সর্ব্বপ্রথমে উদ্ধৃত চর্য্যার ১ম চরণের সংস্কৃত টীকায় আছে— "আলীত্যাদি" এবং ৩য় চরণের সংস্কৃত টীকায় আছে "কাহ্ন[৪] কহি গই ইত্যাদি।"

প্রাচীন লিপিতত্ত্বও আমাদিগকে পাঠ সংশোধন করিতে সহায়তা করে। শেষ উদ্ধৃত পদে আমরা মুদ্রিত "রাহঅ" স্থানে "চাহই" পড়িয়াছি। সংস্কৃত টীকা ও তিব্বতী অনুবাদ এই পাঠ সমর্থন করে। অধিকন্তু বাঙ্গালার প্রাচীন লিপিতত্ত্ব হইতে আমরা জানি যে, র ব চ, এই তিন অক্ষরের মধ্যে গোলযোগ সম্ভবপর ছিল।

১। স্নন্ অপপাঠ। শুদ্ধ পাঠ স্নোদ্ বা সূগম হইবে। তিব্বতী অক্ষরে ইহা অসম্ভব নহে।

২। বিশুদ্ধ পাঠ "পার্শ্বসন্নিধানান্তরমপি" হইবে।

৩। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি ইহার সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন—"পণ্ডিতং ন পশ্যামি।" প্রকৃত অনুবাদ "পণ্ডিতো ন পশ্যতি" হইবে।

৪। মুদ্রিত পুস্তকে কাহ্নু।

সংস্কৃত টীকা কিংবা তিব্বতী অনুবাদ সকল স্থলে নির্ভরযোগ্য নহে, ইহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। কোনও কোনও স্থলে মূল পুস্তকের ভ্রান্ত পাঠ সম্মুখে রাখিয়া এই টীকা বা অনুবাদ রচিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মুদ্রিত পাঠ—

গুরুবোধসে সীসা কাল। (চর্য্যা ৪০)

তিব্বতী অনুবাদ—ব্ল-ম'ই থোব্‌স্‌-ক্যিস্‌ স্লোব্‌-ম 'থল্‌-পর্‌ ব্য। (=গুরুর বোধের দ্বারা শিষ্য ভ্রান্ত হইবে)।

সংস্কৃত টীকা—

...বজ্রগুরুঃ...বচনদরিদ্রত্বেন যুক্তঃ। তস্য শিষ্যোণাপাবচস্তেন...কিঞ্চিন্ন শ্রুতম।

এখানে তিব্বতী অনুবাদ মূলের ভ্রান্ত পাঠ সমর্থন করিতেছে। কিন্তু সংস্কৃত টীকা হইতে আমরা শুদ্ধ পাঠ পাই—

গুরু বোব সে সীসা কাল।

মুদ্রিত পাঠ—

কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা। (চর্য্যা ৪০)

সংস্কৃত টীকা—

যথা বধিরঃ সংকেতাদিনা মূকস্য সংবোধনং করোতি।

তিব্বতী অনুবাদ—স্কগ্‌স্‌-পস্‌ ওন্‌-পর্‌ স্মু-ব জি ব্‌শিন্‌ নো (=বোবা কালাকে যেমন উপদেশ দিল)।

এখানে সংস্কৃত টীকা মূলের ভ্রান্ত পাঠ সমর্থন করিতেছে। কিন্তু তিব্বতী অনুবাদ হইতে আমরা শুদ্ধ পাঠ পাই—

কাল বোবেঁ সংবোহিঅ জইসা।

ইহা দ্রষ্টব্য যে, তিব্বতী অনুবাদ সংস্কৃত টীকা হইতে স্বাধীন। কোন স্থলে তিব্বতী অনুবাদ সংস্কৃত টীকার ভুল সংশোধন করে, আবার কোনও স্থলে সংস্কৃত টীকা তিব্বতী অনুবাদের ভুল সংশোধন করে।

বৌদ্ধ গানের পাঠ সংশোধনের উপায় সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা দোহা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অধিকন্তু চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের[৬] টীকা ও সুভাষিতসংগ্রহের কয়েক স্থলে দোহা উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে দোহার পাঠান্তর পাওয়া যায়। একটী উদাহরণ দিতেছি। কৃষ্ণাচার্যাপাদের দোহাকোষের ২২নং শ্লোক মুদ্রিত পুস্তকে এইরূপ—

জই পবন গমন দুআরে দিত তালা বিভিজ্জই।
জই তসু ঘোরান্ধারে মন দিবহো কিজ্জই॥
জিণ রঅণ উঅজ্জই।
ভণই কাহ্ণু ভব ভুংজতে নিব্বাণ বি মিজ্জই॥

৫। লোন—অপপাঠ। ইহার কোন অর্থ নাই।
৬। পুস্তকের প্রকৃত নাম আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়। ইহা আমি Sir Asutosh Memorial Volumeএ আমার প্রবন্ধের পাদটীকায় দেখাইয়াছি।

ইহা রোলা ছন্দে রচিত। কিন্তু তৃতীয় চরণ একেবারে অসম্পূর্ণ। অন্যান্য চরণেও ছন্দের দোষ আছে। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের টীকায় (পৃঃ. ১০) এই শ্লোকটী নিম্নলিখিতরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

জহি মণ পবণ গঅণ দুআরে দিট তাল বিদিজ্জই।
জই ত সুঘোর অন্ধাঁরে মণি দিব হো কিজ্জই॥
জিণ রঅণ উঅরে জই অম্বরু ছুপ্পই।
ভণই কহ্ন ভব ভুঞ্জন্তে নিব্বাণ বিসিস্সই॥

সৌভাগ্যক্রমে এই দোহাকোষের তিনটী তিব্বতী অনুবাদ আছে। (সরহের দোহাকোষের দুইটী অনুবাদ আছে)। মূলের মেখলানাম্নী একটি সংস্কৃত টীকাও আছে। ইহাদের অতিরিক্ত ভাষাতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব ও ছন্দের সাহায্যে আমরা এই শ্লোকের নিম্নলিখিতরূপ বিশুদ্ধ পাঠ প্রস্তুত করিতে পারি।

জই পবণ-গমণ-দুআরে দিঢ় তালা বি দিজ্জই।
জই তসু ঘোর অন্ধারেঁ মণ দীবহো কিজ্জই॥
জিণ-রঅণ উঅরেঁ জই সো বর অম্বরং ছুপ্পই
ভণই কহ্নু ভব ভুঞ্জন্তে ণিব্বাণো বি সিজ্ঝই॥

মুদ্রিত পুস্তকের আদর্শ পুথির লিপিকরের কয়েকটী বানান-প্রবৃত্তি আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। যথা,—

(১) কোন কোন স্থলে সংস্কৃতের বানান অনুসরণ করা হইয়াছে। যথা—

চর্য্যা (২নং চর্য্যা) [চজ্জা হইবে]
কুলিশ (৪ নং ,,) [কুলিস হইবে]
ধামার্থে (৫ নং ,,) [ধামাথে হইবে]
বিদ্যা (৯ নং ,,) [বিজ্জা হইবে]
শক্তি (১১ নং ,,) [সত্তি হইবে]
দেশ, শাস্ত্র, শালী (ঐ) [দেস, সাস্ত্র, সালী হইবে]
জিতা (১২ নং চর্য্যা) [জিত্তা বা জীতা হইবে]
তিশরণ, শূন (১৩ নং ,,) [তিসরণ, সূণ হইবে] ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(২) বানানে কোন নিয়ম অনুসরণ করা হয় নাই। যথা—

সুণ (১৩ নং চর্য্যা)
সুন (১৭, ২৮, ৩১, ৪৪, ৪৫ নং চর্য্যা) } [সুণ হইবে]
শূন (১৩, ৩৫ নং চর্য্যা)
শূণ (৪৫ নং চর্য্যা)

মূসা (২১ নং চর্য্যা ৪ স্থানে) } মূষা (২১ ,, ৩ স্থানে)	ষামায় (৩৩ নং চর্য্যা) } সমাঅ (৪৩ নং ,,) সমায় (৪০ নং ,)
ণাবী (১৩ নং ,,) } নাবী (৮ নং ,,)	ষষহর (২৭ নং ,, ২ বার) } সসহর (১৮ নং ,,)
ণাব (৪৯ নং ,,) } নাব (১৫ নং ,,)	শশী (১১ নং ,,) } সসি (১৭ নং ,,)
অম্ভে (২২ নং ,,) } অম্হে (৪ নং ,,) আম্হে (১নং ,,) আম্হে (১২ ,,)	ণইরা মণি (২৮ নং ,,) } নিরামণি (ঐ ,,) নৈরামণি (৫০ নং ,,)। } ইত্যাদি

(৩) বানানে স্বরের দীর্ঘত্ব রক্ষিত হয় নাই। ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে এবং ছন্দ দ্বারা আমরা দীর্ঘত্ব নিরূপণ করিতে পারি।—

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই। (চর্য্যা ২)
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে। (চর্য্যা ৩৩)

উভয় স্থলে পিটা পীঢ়া-রূপে শুদ্ধ করিতে হইবে। পীঢ়া, প্রা. পীঢ়অ, সং পীঠক। ছন্দেও ৪ মাত্রা প্রয়োজন। পিটা হইলে ৩ মাত্রা হয়। তিনা তীণি-রূপে শুদ্ধ করিতে হইবে। তীণি, প্রা. তিণ্ণি, সং. ত্রীণি। এইরূপ অন্যান্য স্থানে।

(৪) বানানে ঢ় স্থানে ট লেখা হইয়াছে। যথা,—দিট (চর্য্যা ১, ৩, ১১, ৪১ ; শুদ্ধ দিঢ়)। বট (চর্য্যা ২৯ ; শুদ্ধ বঢ়)। বাটই (চর্য্যা ৪৫ ; শুদ্ধ বাঢ়ই)। বেটিল (চর্য্যা ৬ ; শুদ্ধ বেঢ়িল)। গটই (চর্য্যা ৫ ; শুদ্ধ গঢ়ই) ইত্যাদি।

(৫) কতিপয় স্থলে বানানে ড়, ঢ় স্থানে ড্‌হ্‌ লিখিত হইয়াছে। যথা,—বাড্‌হ্‌ী (চ. ৫০ ; শুদ্ধ বাঢ়ী)। বড্‌হিল (চ. ৩৩ ; শুদ্ধ বাঢ়িল)।

(৬) কতিপয় স্থলে বানানে ল স্থানে ড় লেখা হইয়াছে। যথা,—গাইড় (চ. ২ ; শুদ্ধ গাইল)। সনাইড় (চ. ২ ; শুদ্ধ সমাইল)। লীড়েঁ (চ. ১৮ ; শুদ্ধ লীলেঁ) ; সুচ্ছড়ে (চ. ১৪ ; শুদ্ধ সুচ্ছলে)।

(৭) প্রায় ছ স্থানে চ্ছ লেখা হইয়াছে। যথা,—

চ্ছিণালী (চ. ১৮) ; চ্ছিজই (চ. ৪৬) ; চ্ছাড়ী (চ. ১৫) ; চ্ছড়ই (দোহা, পৃঃ ১১২) ; চ্ছারে (দোহা, পৃঃ ৮৪) ; আচ্ছন্তেঁ (চ. ৩৯) ; কাচ্ছি (চ. ৮) ; কাচ্ছী (১৪) ; ইত্যাদি।

(৮) বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব একরূপে লেখা হইয়াছে। পদের আদিতে সম্ভবতঃ উভয় বর্ণের উচ্চারণ এক ছিল। কিন্তু পদমধ্যে অন্তঃস্থ ব ধ্বনিতত্ত্ব দ্বারা কতিপয় স্থলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। যথা,—পিবই (চ. ৬) ; নাবী, ঠাবী (৮) ; কবড়ী (১৪) ; নাব

(১৫); ণাব (৪৯); দেবী (হোই সঙ্গে মিল, ১৭); অবণাগবণা (২১); পড়বেষী (৩৩); চেবই (৩৪,৩৬); সহাব, পাব (পরস্পর মিল, ৪১); ইত্যাদি। [নাই (১৪), কোই (৪২) প্রভৃতি কতিপয় স্থানে অন্তঃস্থ ব লোপ করা হইয়াছে; শুদ্ধ রূপ নাবী, কোবি।]

(৯) কয়েক স্থলে অন্ত্য হ স্থানে অ লেখা হইয়াছে। যথা, বিকণঅ (চ. ১০, বিকণহ স্থানে); খাঅ (ঐ, খাহ স্থানে); বাহঅ (১৩, বাহহ স্থানে); ইত্যাদি।

(১০) বর্ত্তমান কালের ১ম পুরুষের একবচনের বিভক্তি -ই স্থানে স্বেচ্ছামত অ, এ, য় লেখা হইয়াছে। যথা,— জাই (চ. ২, ১৫, ২০, ২৯, ৩২ ইত্যাদি); কিন্তু জাঅ (চ. ৪, ১৯, ৩৩ ইত্যাদি), জায় (চ. ৪০)। বাজই (চ. ১৭); কিন্তু বাজঅ (চ. ৩১)। বাজএ (চ. ১১); ইত্যাদি। খাঅ (চ. ২, মিল "জাই" সঙ্গে); দীসঅ (চ. ৬, মিল "পইসঈ" সঙ্গে); বাজঅ (চ. ৩১, মিল "রাজই" সঙ্গে); পতিভাসঅ (ঐ; মিল "পইসই" সঙ্গে)।

(১১) কতিপয় স্থানে অন্ত্য স্বরে ঁচন্দ্রবিন্দু লোপ করা হইয়াছে। যথা,—অচ্ছহু (চ. ৬); ঠাবী (চ. ৮); বাসে (চ. ৫০); বোহে (চ. ২১); রঅণহু (চ. ২৭);। তহি (চ. ৩১),; নাহি (চ. ৩, ৮, ১৮, ২০, ৩৩, ৪২, ৪৯; তুলনীয় নাহিঁ, চ. ৩৭, ২ বার; নাঁহি, চ. ৩৩); ণাহি (চ. ২২, ৪৩); কইসে (চ. ২৮, ২৯, ৩৯, ৪২; তু. কইসেঁ ৮, ৪০); লীলে (চ. ১৪; তু. লীড়েঁ = লীলেঁ, ১৮); ইত্যাদি।

(১২) কতিপয় স্থলে ঁ যথাস্থানে না হইয়া অন্য অক্ষরের উপর লেখা হইয়াছে। যথা,—খেঁপহু (চ. ৪; শুদ্ধ খেপহুঁ); বিআরেঁতে (চ. ১৫; শুদ্ধ বিআরেতেঁ); হাঁউ (চ. ২০, ৩৫; শুদ্ধ হাউঁ বা হউঁ); জাণঁহু (চ. ২২; শুদ্ধ জাণহুঁ); নাঁহি (চ. ৩৩; শুদ্ধ নাহিঁ); কাঁহি (চ. ৩৭; শুদ্ধ কাহিঁ); হিঁএ (চ. ৪৪; শুদ্ধ হিএঁ); পঁউআ (চ ৪৯; শুদ্ধ পউআঁ); তঁহি (চ ৫০; শুদ্ধ তহিঁ); ইত্যাদি।

(১৩) কতিপয় স্থলে অনর্থক চন্দ্রবিন্দু লেখা হইয়াছে। যথা,—জইসোঁ তইসোঁ (চ. ১৩; আদর্শ পাণ্ডুলিপি জইসো তইসো); বুঝএঁ (চ. ২০; R. A. S. B.র পাণ্ডুলিপি বুঝএ); সঁএঁ (চ. ২৬); তঁহিঁ (চ. ২৮); পণিআঁ (চ. ৩৫); পমাএঁ (চ. ৩৮); ইত্যাদি।

(১৪) লিপিকর যদিও স্বেচ্ছামত শ, ষ, স, ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের উচ্চারণ যে একই ছিল, তাহা মিল (Rhyme) হইতে বুঝা যায়। যথা,—অবকাশ, পাস ॥ (চ. ৩৭); রোষে। কইসে ॥ (চ. ২৮); কীষ। দিস ॥ (চ. ২৯); সেস। বিশেষ ॥ (চ. ৪৯)।

(১৫) এইরূপ ণ, নএর উচ্চারণ যে এক ছিল, তাহা মিল হইতে ধরা যায়। যথা,—বখানে। নিবাণে ॥ (চ. ৩৮); জান। বিহাণ ॥ (চ. ৪৪); ঠাণা। ণিবানা ॥ (চ. ১৬)।

দ্বাদশ শতকের গীতগোবিন্দ হইতেও প্রমাণিত হয় যে, শ, ষ, সএর উচ্চারণ বাঙ্গালা দেশে (অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে) এক ছিল। ইহা সকার বা শকার উচ্চারণ, তাহা অন্য প্রমাণসাপেক্ষ। তাহাতে আমরা নিম্নলিখিত মিল দেখি ;—হংস। দিনেশ॥ বিকাশে। বিলাসে॥ কৃতহাসে। দন্তুরিতাসে॥ বংশে। প্রশশংসে॥ বংশম্। বতংসম্॥ নিমেষম্। নিবেশম্॥ বিকাশম্। বিলাসম্॥

বঙ্গদেশের পালরাজত্ব সময়ের তাম্রলিপি হইতেও ১১শ ও ১২শ শতকে পূর্ব্বোক্তরূপ একটি উচ্চারণ প্রমাণিত হয়। প্রথম মহীপালদেব (১০২৩ খ্রীঃ অব্দের সময়), বৈদ্যদেব (অনুমান ১১০০ খ্রীঃ অব্দ) এবং মদনপালদেবের (অনুমান ১১১৯ খ্রীঃ অঃ) তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে, ২১ স্থানে শ ষ স্থানে স এবং ১০ স্থানে স স্থলে শ সংস্কৃত শব্দের বানানে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১০০০ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের ন্যায় কেবল স উচ্চারণ ছিল কিংবা মাগধীর ন্যায় শ উচ্চারণ ছিল অথবা ঢক্কী ও ওড্রী প্রাকৃতের ন্যায় শ, স উচ্চারণ ছিল, তাহা অনুমিত ভিন্ন প্রমাণিত হয় না। সম্ভবতঃ গৌড়ী প্রাকৃতে এবং আদিম বাঙ্গালা (Proto-Bengali) ভাষায় শ, স, দুইই উচ্চারণ ছিল।[৭] কিন্তু অন্ততঃ একাদশ শতক হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের অনুকরণে সম্ভবতঃ পণ্ডিতী বানানে, উচ্চারণ যাহাই হউক না কেন, কেবল স ব্যবহৃত হইতে থাকে ; কিন্তু সাধারণ বানানে যদৃচ্ছাক্রমে শ ষ স ব্যবহৃত হয়। আমরা বানানে কেবল স ব্যবহার করিতে চাই। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় (৭০০—১২০০ খ্রীঃ অঃ) দন্ত্য স উচ্চারণই ছিল। যেমন একটি ব দ্বারা বর্গীয় ও অন্তঃস্থ দুই উচ্চারণ নির্দ্দিষ্ট হইত, সেইরূপ স দ্বারা হয় ত দন্ত্য ও তালব্য দুই উচ্চারণ প্রদর্শিত হইত, নয় ত আধুনিক বাঙ্গালার সএর ন্যায় কেবল তালব্য উচ্চারণ প্রকাশিত হইত, নয় ত মৈথিলীর ন্যায় কেবল দন্ত্য উচ্চারণ সূচিত হইত। উচ্চারণ সম্বন্ধে এই সকারযুক্ত বানানে কিছুই প্রমাণিত হইবে না।

প্রাচীন বাঙ্গালায় সাধারণ প্রাকৃতগুলির ন্যায় কেবল ণ ছিল কিংবা পৈশাচীর ন্যায় কেবল ন ছিল, কিংবা ন ণ উভয়ই ছিল, তাহা বলা দুষ্কর। উচ্চারণ যাহাই হউক না কেন, বানানে বোধ হয়, কোনই নিয়ম ছিল না। প্রাকৃত সম্বন্ধে বররুচি বলেন—"নো ণঃ সর্ব্বত্র" (২।৪২) সর্ব্বত্র ন স্থানে ণ হইবে। কিন্তু হেমচন্দ্রের মতে আদিতে ণত্ব বৈকল্পিক—"বাদৌ" (৮।১।২২৯)। কিন্তু সংযুক্ত বর্ণ হইলে আদিতে ন থাকিবে ; যথা,—প্রা. নাও, সং. ন্যায়ঃ। আর্ষে পদমধ্যেও ন ব্যবহৃত হইতে পারে ; যথা, অনিলো, অনলো (৮।১।২২৮)। মার্কণ্ডেয়ের ১।৪২ সূত্রের টীকার মতে দ্বিত্বে বিকল্পে ন্ন হয় ; যথা,—আসণ্ণং, আসন্নং ; সণ্ণদ্ধং, সন্নদ্ধং। দেখা যাইতেছে যে, বররুচির পরবর্ত্তী প্রাকৃত বৈয়াকরণদের মতে একমাত্র অনাদি স্থানে ন হয় না, কেবল ণ হয়। কিন্তু আর্ষ প্রয়োগে এই অনাদি স্থানেও ন থাকিতে পারে। ফলে সাধারণ প্রাকৃতে (অর্থাৎ পৈশাচী ভিন্ন সর্ব্বত্র) ণ স্থানে ন হইবে না। কিন্তু আর্ষ

৭। দ্রষ্টব্য—মদীয় Les Chants Mystiques, পৃঃ ৫৪

প্রয়োগে ন স্থানে যে কোন অবস্থায় ন, ণ, দুই-ই হইতে পারে। আমরা যদিও সরলতার জন্য বররুচির অনুসরণে সর্ব্বত্র ণ বানান রাখিতে চাই; কিন্তু এ ক্ষেত্রে উচ্চারণের অনিশ্চয়তার জন্য আদর্শ পাণ্ডুলিপিরই বানান বজায় রাখা সঙ্গত মনে করি। আমার অচির-প্রকাশিত বৌদ্ধ গানের ইংরেজি সংস্করণ The Buddhist Mystic Songsএ (Dacca University Studies, 1940) সর্ব্বত্র স বানান করিয়াছি; কিন্তু ন, ণ সম্বন্ধে আদর্শ পুথির পাঠ অনুযায়ী প্রায়শঃ যথাদৃষ্ট বানান রক্ষা করিয়াছি।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.

[প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তক ও ১১৯২ বঙ্গাব্দের পুথির পাঠভেদ নির্ণয়।]

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর একখানি বিশুদ্ধ সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া উচিত, বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় কিছু দিন পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এ বিষয়ের সমর্থক স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর ১১৯২ সালের পুথির প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ইহার পর শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুপ্রেরণায় পুথি ও মুদ্রিত পুস্তকের পাঠভেদ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই।

সুনীতিবাবুর প্রবন্ধে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতচন্দ্রের সর্ব্বপ্রাচীন পুথি (১১৯১ সালের) প্যারি নগরে আছে। সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় যেগুলি আছে, তাহা কয়েক বৎসর পরের। সুতরাং ১১৯২ সালের পুথিখানি প্রাচীনত্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেছে।

এই পুথিখানি নড়াইলের অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি গঙ্গারাম দত্তের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীধরের সম্পত্তি ছিল। একখানি পুথির মধ্যেই "অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দর" পর পর লিখিত। মোট পত্রসংখ্যা ১৩৭। প্রত্যেক পত্রের উভয় পৃষ্ঠেই লেখা। পত্রগুলির আয়তন ১৪ × ৫ ইঞ্চি। প্রত্যেক পত্রে ৯টী ছত্র। ৭৮ সংখ্যক পত্রের এক অংশে "অন্নদামঙ্গল" সমাপ্ত ; এবং সেইখানেই "বিদ্যাসুন্দর" আরম্ভ। ১৩৭ সংখ্যক পত্রে বিদ্যাসুন্দর সমাপ্ত হইলে, পুস্তকের স্বত্বাধিকারীর নাম, পুথি সমাপ্তির তারিখ ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে।

যে মুদ্রিত পুস্তকের সঙ্গে পুথি মিলাইয়াছি, সেখানি "বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত" ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর চতুর্দ্দশ সংস্করণ। এই বইখানি হাতের কাছে থাকায় ইহাই ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু কাজ করিতে করিতে দেখা গেল যে, ঐ পুস্তকের (অন্নদামঙ্গল অংশের) ৪২, ৪৩ এবং ৪৬, ৪৭ পৃষ্ঠা নাই। এই স্থানটী, ১২৯৬ সালে "বঙ্গবাসী" কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে মিলাইয়াছি। ইহা ব্যতীতও, বঙ্গবাসী সংস্করণের বইএর সঙ্গে পুথির অনেক স্থল মিলাইয়াছি এবং সেই সেই স্থানে উহা উল্লেখ করিয়াছি।

বাম দিকে মুদ্রিত পুস্তকের অংশ, এবং ডান দিকে সমরেখায় পুথির লেখা উদ্ধার করা হইয়াছে। সাধারণতঃ এক এক ছত্রের যে অংশটী পুথি ও পুস্তকে বিভিন্ন, কেবল সেইটুকুই দেখান হইয়াছে। ছত্রের অন্য অংশের স্থানে কেবল একটী রেখা (————) দেখান হইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, ঐ স্থানটি পুথি ও পুস্তকে অভিন্ন।

পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, স্থানে স্থানে এক একটী প্রস্তাবের কোন অংশ পুথিতে আছে, পুস্তকে নাই ; অথবা পুস্তকে আছে, পুথিতে নাই। আবার কোন স্থানে পংক্তি-গুলি পুস্তকে যেরূপ পর পর সাজান আছে, পুথিতে সেরূপ নাই। কোন শ্লোক আগে, কোনটা বা পরে আছে।

পুথির লেখক (লিপিকার) সুশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অসংখ্য বানান-ভুল আছে। দন্ত্য "ন", মূর্দ্ধন্য "ণ", "শ", "ষ" "স", হ্রস্ব দীর্ঘ ই-কার, উ-কার ইত্যাদির বিচার নাই। গ্রাম্যতা দোষও আছে। বানানগুলি প্রায়ই সংশোধন করিয়া লিখিয়াছি, কোন কোন স্থলে "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্"।

এই পাঠভেদ নির্ণয় দ্বারা সাহিত্যিকগণের যদি কথঞ্চিৎ সাহায্যও হয়, তবে শ্রম সার্থক মনে করিব। পরিশেষে পুথির স্বত্বাধিকারী, কবি গঙ্গারামের সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। দীর্ঘকাল পুথিখানি আমার ব্যবহারের জন্য তিনি ছাড়িয়া না দিলে, আমার কাজ করা অসম্ভব হইত।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্নদামঙ্গল

গণেশ বন্দনা

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—১
	গ্রন্থারম্ভে এই সংস্কৃত অংশটী পুথিতে আছে ; মুদ্রিত পুস্তকে নাই। উহা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি — নমো গণেশায় ঃ নমো বাগ্দেব্যৈ ॥ যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শ্বেত-পদ্মাসনা। যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা। যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর-প্রভৃতিভিঃ দেবৈঃ সদা বন্দিতা। সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা ॥
মুদ্রিত পুস্তকে আরম্ভ "গণেশায় নমো নমঃ" এই হইতে।	ইহার পর—"গণেশায় নমো নমঃ" ইত্যাদি।
তব নামে সিদ্ধ সর্ব্বকাজ	তব নাম সিদ্ধি সর্ব্ব কাজ ... ...
শিবের তনয় হয়ে	শিবের তনয় হৈয়া ঐরূপ — "কৈয়া" — "হৈয়া"

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—১
খেলাচ্ছলে	খেলাছলে
জানিতে নারিনু কভু	জানিতে না পারি কভু
	পুথির পত্র —২
শুন প্রভু গণেশ্বর	শুন দেব গণেশ্বর
নিবেদিনু বন্দনাবিশেষে	···বন্দনাবিশেষ
ভারতচন্দ্র সরল ভাষে	ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে	··· আদেশ।

শিববন্দনা

গিরিসুতা প্রিয়তম	······ প্রেমথম (?)
হিমকরশেখর শঙ্কর	··· শিখর ···
সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়	সঙ্গের নাচিয়া বেড়ায়
যোগীর অগম্য হয়ে···	··· হৈয়া —
··· যোগ লয়ে	··· লৈয়া —
মায়ামুক্ত তুমি জীব	······ মায়াযুক্ত ···

সূর্য্যবন্দনা

তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা	তোমার মহিমা কে জানিবে সীমা
অপরাধ ক্ষম ক্ষীণে	অপরাধ ক্ষম দীনে
··· ···	··· ··
সর্ব্বদেবময় সর্ব্ববেদাশ্রয়	সর্ব্বময়মন সর্ব্ববেদশ্রজন (স্বজন ?)
··· ···	··· ···
অতি খরতর	অতি খর কর
··· ···	··· ···
করি হে কোটি প্রণাম	করি যে···
··· ···	··· ···
মাথার মাণিকবর	মাথার মাণিকবর
··· ···	··· ···
স্মরিলে তোমায়···	সেবিলে তোমায়···
··· ···	··· ···
আসরে উদয় হবে	আসরে সদয় হবে

বিষ্ণুবন্দনা

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩
পুরাণ পুরুষোত্তম…	পুরাণে পুরুষোত্তম…
… …	… …
বরণ জলদঘটা	বরণ জলদজটা…
রতননূপুর বাজে তায়	রতননূপুর পায়। বাজে তায়।
… …	… …
মুখসুধাকরে সুধাহাস	মুখসুধাকর…
… …	…
রূপে দশ দিশ পরকাশ	রূপে ত্রিভুবন পরকাশ…
… …	… …
কদম্বের কুঞ্জবনে…	কদম্ব নিকুঞ্জবনে

কৌষিকীবন্দনা

শুম্ভ নিশুম্ভঘাতিনী ॥ ইহার পরেই—মহিষমর্দ্দিনী ইত্যাদি।	"শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী"র পরে ও "মহিষমর্দ্দিনী"র পূর্ব্বে—"শঙ্করী সিংহবাহিনী" এইটুকু আছে।
… …	… …
দুর্গবিঘাতিনী	দুর্গতিনাশিনী
…	…
রতন কদলীকায়	রতন কদলী কাম
…	…
অমূল্য অম্বর তায়	অমূল্য অম্বরতাম ("অম্বরতাম" নিশ্চয়ই লিপিকরপ্রমাদ)
…	…
করি সুত কুম্ভ উচ	করিসুত কুচ উচ
…	…
কনকমৃণাল রাজে	কনকমৃণাল সাজে
…	..
মুকুতা রঞ্জিত	মুকুতা ললিত

পুথির পত্র—৪

পুথিতে "অর্দ্ধশশী ভালে শোভে" এই

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৪
মুদ্রিত পুস্তকের—	
“মালতীমালায়” হইতে	পংক্তির পরই—কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাখ রাঙ্গা পায়
“ভারতে করহ দয়া” পর্য্যন্ত অংশ	অভয়া দেও অভয়ে ॥
পুথিতে বাদ পড়িয়াছে।	এইখানে কৌষিকীবন্দনা সমাপ্ত।

লক্ষ্মীবন্দনা

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র
কমলা কমলালয়া	কমলা কমল দিয়া
সনাল কমল সনাল উৎপল	সনসে কমল সনশে উৎপল
...	... (সনসে ?)
কমল কোরক কদম্বনিন্দক	কমলা ভাবুক ভ্রমরচুচুক
...	...
—	করি অরি মাঝে জিনি করিরাজে
:ত সুধা প্রকাশ	দৃষ্টিসুধা প্রকাশ
...	...
লাক্ষার কাঁচলি	লক্ষের কাচলি
চমকে বিজলী	চমকে বিজুলী
...	...
রূপ গুণ গান	রূপ গুণ জ্ঞান
...	...
তুমি হও যারে বাম	তুমি যারে হও বাম
...	...
—লয়ে—হয়ে	—লৈয়া— —হৈয়া—
...	...(এই পাঠভেদ বহু স্থলে আছে। আর দেখান অনাবশ্যক)
উর মহামায়া দেও পদচ্ছায়া	উর মহামায়া দেহ পদছায়া
রাজলক্ষ্মী স্থিরা হয়ে	রাজলক্ষ্মী স্থির হৈয়া
...	...

সরস্বতীবন্দনা

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র
স্তবে কর অনুমতি	স্তবে কর অবগতি
বাগীশ্বরী বাক্যবিনোদিনী	রাগেশ্বরী বাক্যবিনোদিনী

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৪
অনুরাগ সে সব রাগিণী	অনুরাগী যে অনুরাগিণী
সপ্ত স্বর তিন গ্রাম, মূর্চ্ছনা	শাতপ্রৱতীন গ্রাম মুছস্থনাকাশীনাম
একুশ নাম শ্রুতিকলা	ক্রুতকলা সতত সঙ্গীণী
সতত সঙ্গিনী	(যেমন বানান আছে, তেমনি লিখিলাম। এই লাইন কয়টী বিকৃতশব্দপূর্ণ)
	পুথির পত্র—৫
দূর কর অজ্ঞান সকল	দূর কর কুজ্ঞান সকল
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি	কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
গীতে দিলা অনুমতি	গীতে দিলে অনুমতি

অন্নপূর্ণাবন্দনা

দেহ মোরে পদচ্ছায়া	দেও মোরে পদছায়া
করিয়ে প্রণাম।	করিনু প্রণাম
শুন আপনার গুণগ্রাম।	শুনহ আপন গুণগ্রাম।
...	...
ভক্তের দুরিত হর	ভকতের দুঃখ হর
দারিদ্র্য দুর্গতি কর চূর্ণ	দারিদ্রের দুঃখ কর চূর্ণ
সুখদাত্রী দুঃখহরা	দারিদ্রের দুঃখহরা
...	...
কণ্ঠকম্বুরাজ রাজে	কণ্ঠকন্দ রাজ রাজে
নানা অলঙ্কার সাজে	নানা আভরণ সাজে
...	...
মৃণালের গর্ব্বহর	মৃণালের মনোহর
...	...
কঙ্কনের কন্‌কনি	কঙ্কনের ঝন্‌ঝনি
নানা অলঙ্কার ঝলমল	নানা অলঙ্কারে ঝলমল
...	...
সঘৃত পলান্ন তাতে	জগৎ পূর্ণিত ভাতে
..	...
বিবিধ বিলাসে পরশিয়া	বিবিধ বিধানে পরশিয়া

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৫
সিধ্য সিধ্যা বিদ্যাধর	সিদ্ধি সিদ্ধা বিদ্যাধর
...	...
ললিত কবরী ভার	ললিত কুচের ভার
...	...
চৌদিকে বেড়িয়া গান করে	—করে গান
—তুমি দেবী উরহ আসরে।	—তুমি দেবী পুরুষ প্রধান।
ঘটে কর অধিষ্ঠান, শুন নিজ গুণগান	শুন নিজ গুণগান আশরে হইয়া অধিষ্ঠান
...	...
গায়কের কণ্ঠে—	গায়েনের কণ্ঠে—
স্বপনে রজনী শেষে	আপনি রজনী শেষে

গ্রন্থসূচনা

	পুথির পত্র—৬
—অচ্যুত অনুজা	—অজুতা অমুজা
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অম্বিকা অভয়া	অনাদ্যা অনন্তা আদ্যা অম্বিকা অজয়া। (১২৯৬ সালের বঙ্গবাসী সংস্করণে "অজয়া" আছে)
অপরাধ ক্ষম অগো অব গো অব্যয়া	অপরাধ ক্ষমা কর অরোগা অরূয়া (অরোগা অরূয়া অর্থশূন্য শব্দ-বিকৃতি মনে হয়)
শুন শুন নিবেদন সভাজন সব।	স্থন স্থন সভাজন নিবেদন সব।
যেরূপে প্রকাশ অন্নপূর্ণা মহোৎসব ॥	জেইরূপে হৈল অন্নপূর্ণামহোৎসব ॥
	দেওয়ান আলামচন্দ্র রায়ে রাঞীয়া ॥
(মুদ্রিত পুস্তকে পাঠভেদ দ্রষ্টব্য)	আলাবির্দ্ধি খা ছিল পাটনায় নওয়াব।
	আশীয়া করিয়া জুদ্ধ বধিল নওয়াব ॥
	...পাতশা খেতাব ॥
	কটকে হইল আলাবিদ্ধির আলম।
	ভাইপো সৌলাতযঙ্গ দিলেক কলাম ॥
	... ...
	মুরাদ বাখর খা তারে দিলেক ফটকে
	লুট্যা লইয়া—
	উত্তর ফটকে গেল হৈয়া ত্বরা ২।

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৬
(মুদ্রিত পুস্তকে পাঠভেদ দ্রষ্টব্য)	উড়িশ্যা—
	— ঘুম।
	ভুবনে ভুবনেশ্বরে মহাদেবের স্থান।
	... ...
	দুরন্ত মোগল—
	দেখিয়া নন্দীর বড় ক্রোধ উপজিল।
	মারিতে লইল হাতে।—
	করিব জবন সব— ॥
	...
	—গড়শ্বেতরায়।
	...
"বর্গী মহারাষ্ট্র" ইত্যাদি দুই লাইন	পাঠাইয়া দিল রঘু ভাস্কর পণ্ডিত।
পুথিতে নাই।	ইহার পরেই আছে—
	গঙ্গা পার হৈল বাঁধি নৌকার জাঙ্গাল।
(মুদ্রিত পুস্তকে পাঠভেদ দ্রষ্টব্য)	লুটিয়া বাঙ্গালার লোক করিল কাঙ্গাল ॥
	কাটিল বিস্তর লোক গ্রামে২ পড়ি।
	... ...
	নগর পুড়িল কত দেবালয় তায়।
	বিস্তর ধার্ম্মিক তাহে ঠেকে গেল দায় ॥
"নদীয়া প্রভৃতি" হইতে	
১০টী লাইন	
(এই পাপে সেই রাজা ঠেকিলেন	নওয়াব মুরশীদাবাদে ধর‍্যা নিয়া জায়
দায়—এই পর্য্যন্ত)	
পুথিতে বাদ গিয়াছে।	
	পুথির পত্র—৭
বন্ধ করি রাখিলেন মুরশিদাবাদে	পিতাপুত্রে রহিলেন মুরশীদাবাদে
	... ...
	চৌত্রিশ অক্ষরে নাহি জাহা কৈল স্তব
	অন্নপূর্ণা স্বপনে হইলা অনুভব ॥

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র —৭
(মুদ্রিত পুস্তক দ্রষ্টব্য)	শুন বাছা কৃষ্ণচন্দ্র—
	... ...
	কয্যা দিব প্রজুক্তি গীতের ইতিহাস।
পুস্তকে—	ইহার পরেই—
"চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়" এই ছত্র হইতে "অন্নদামঙ্গল কহে নবরসতর।" পর্য্যন্ত বারটি ছত্র আছে। পুথিতে "গীতের ইতিহাস"এর পর মাত্র দুই ছত্র।	তাহাতে ভুপতি অন্নপূর্ণারে পূজিয়া। কহিছে ভারতচন্দ্র সপন দেখিয়া—

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়	কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পক্ষ সদা তেজময়
পঞ্চম ঈশানচন্দ্র তুল্য দিতে নাই	পঞ্চমে মহেশচন্দ্র তুল্য দিতে নাই। (পুথিতে চতুর্থ ও পঞ্চম উভয়ের নামই মহেশচন্দ্র ; ইহা নিশ্চয়ই ভুল)
(মুদ্রিত পুস্তকে পাঠভেদ দ্রষ্টব্য)	ফুল্বার মুখটি বাম জয়গোপাল জামাই ("রাম" লিখিতে কি "বাম" লেখা হইয়াছে ? "রামজয়গোপাল"ই বা কিরূপ নাম হয় ? অথবা "রায় জয়গোপাল ?")
	দ্বিতীয় পক্ষের যুব যুবরাজ কায়ে। (মুদ্রিত পুস্তকের—"শ্রীগোপাল ছোট সবে" ইত্যাদি হইতে "চট্ট-বলরাম" পর্য্যন্ত ৪ ছত্র পুথিতে নাই)
পাঠকেন্দ্র গদাধর—	পাঠক গোবিন্দ গদাধর—
ভূপতির পিসা—	ভূপতির শিষ্য—
তার কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্তুতি	তার সুত কৃষ্ণদেব রাজকিশোর সন্তুতি
ভূপতির পিসার জামাই তিন জন	ভূপতির পিতার—
কৃষ্ণানন্দ মুখুর্য্যা পরমযশোধন	কৃষ্ণচন্দ্র মুখপাধ্যা পরমভাজন।
মুখুর্য্যা আনন্দিরাম কুলের সাগর	মুখর্য্যা আনন্দীরাম মঙ্গলে আগর (আগর=আকর ?)

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৭
মুখরাজকিশোর কবিত্বকলাধর	মুখর্য্যা রাজকিশোর করিণাকার (করিনাকার=?)
শুকদেব রায় ঋষি শুকদেবপ্রায়	শুকদেব রায় বুঝি শুকদেব প্রায়
...	
কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ	কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত সভাসদ (এই পর্য্যন্ত ১১৯টী পাঠভেদ পাওয়া গেল)

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

	পুথির পত্র—৮
হরষিত রামবোল-	হরষিতে বলরাম সদা রঙ্গ ভঙ্গ।
মোহন ঘোষালচন্দ্র—	মোহন খোশালচন্দ্র—
ভোজপুরে সোয়াল বেঁদেলা শত শত।	ভোজপুর্য্যা শোয়ার বোন্দেলা শত শত
...	...
আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ	আমীন বাড়ুয্যা দ্বিজ
...	..
কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ।	কোঠায়ে কাঙ্গালিবিঘরে নিশান নৌবৎ। (?)
পাতসাই শিরপা	পাতশাহী শিরোপা
সুলতানী-সুলতানৎ	সুলতনী শালবনাত
শিরপেঁচ মোরছী কালগী নিরমল (বঙ্গবাসী সংস্করণ— সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল)	সরমুরছল লাগীয়া নিরমল
...	
ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে	ধর্ম্মচন্দ্র রাজা নাম কহি যে সভারে
...	...
স্বপনে কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে	স্বপন কহিলা আশী জননির বেশে
	পুথির পত্র—৯
—আনন্দে শিখাবে	—আনন্দে শিখিবে
এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা।	এত বলি অমৃত মুখে তুলি দিলা।
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা॥	সেই রশে সুধাগীত ভারত রচিলা॥

গীতারম্ভ

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৯
সংসার যাহার ছায়া	সংসারে যাহার দয়া
প্লাবিত কারণ জলে, বসিস্থল বিনা স্থলে	বসিস্থল বিনাসনে, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তিনে
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা।	বিনে গর্ভে প্রসব হইলা।
দেখিয়া শিবের কর্ম্ম,	দেখিয়া শিবের কর্ম্ম,
তাহাতে পশিলা মর্ম্ম	তাহাতে বশিল মর্ম্ম
ভার্য্যারূপা ভবানী হইয়া।	ভগরূপা ভবানী হইলা।
পতিরূপ পশুপতি,	লিঙ্গ হইয়া পশুপতি,
দুজনে সন্তুষ্ট অতি	দুজনে সম্ভোগ রতি
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা॥	ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা
...	...
শিবের বিকট সাজ	শিবের বিবাহ সাজ
. .	...
আরম্ভিয়া দেবযাগ	আরম্ভ করিয়া জাগ

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ

	পুথির পত্র—১০
	পুথিতে মাত্র দুই লাইন ধুয়া—
"কালীরূপে কত শত পরাৎপরা গো"	কালীরূপা কত শত পরা ও পরা।
ইত্যাদি ৭টি লাইন।	অন্নপূর্ণা নামে মাতঙ্গি কমলা তারা॥
তাহার পর—	ইহার পরেই—
নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।	নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ	ক্রোধে সতী হৈলা তবে কালিকার বেশ
মহামেঘবরণা দন্তুরা	মহাঘোর বদন দন্তুরা
...	...
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশাণ	আর এক করেতে শোভে কৃপাণ খরশাণ
...	...
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর	চারি হাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর।
	(লিপিকার চারিটী ছত্র ডিঙ্গাইয়া এইখানে পৌছিয়াছেন)

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—১০
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে	ভৈরবী হইয়া দেবী গেলেন তথাতে
...	...
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে	নাগবঙ্গ নাগঅঙ্গ বিপরিত গলে।
	(অথবা—নাগবস্ত্র নাগঅস্ত্র ?)
	...
	পুথির পত্র—১১
—ভীম সভয় হইলা	শিব সভয় হইলা
...	...
রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিতা।	রত্নমাঝে সিংহাসন তার মাঝে স্থিতি।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণ ভূষিতা ॥	পিতবাশ পিতবর্ণা ভুবনভূশীতি ॥
—এক অসুরের জিহ্বা ধরি	—একাসুরের মুণ্ড ধরি
...	...
চন্দ্রখণ্ড সুশোভন	চন্দ্র সূর্য্য সুশোভন
...	...
রক্তপদ্মাসনা শ্যামা—	রক্তবর্ণা পদ্মাসন—
...	...
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে	চমকিত বিশ্বনাথ বিশ্বের ঠমকে।
...	...
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছ ভয়।	তোমরা যে কহিলা পলাইয়াছি ভয়ে।
(বঙ্গবাসীসং—পাইয়াছি ভয়)	
...	
প্রকৃতিরূপেতে তোমা করিনু ভজন ॥	ভগ হৈয়া আমি তোমা করিনু ভজন ॥
পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে।	লিঙ্গরূপ হইলা তুমি আমার ভজনে।
	পুথির পত্র—১২
—সতী হৈলা সতী	—রাখিলেন সতী
—কালীর মুরতি	—কালিয়া মুরতি
...	...
জটাভস্ম আদি ধৃত	জটাভস্ম অবধৃত
নাগের পৈতা গলায়	সর্পের পৈতা গলায়
...	...
গৃহী বলা দায়	গৃহে নাহি রয়—
	(১৩ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত ৪টী পত্র হারাইয়াছে।)

পীঠমালা

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—১৭
মহোদর ভৈরব সর্ব্বার্থ যাঁরে সেবি	মহোদর——সর্ব্বদা যাহা সেবি।
উজানিতে কফোনি—	উজানিতে কুর্পর—(খর্পর ?)
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ—	ভৈরব কপিলেশ্বর ভয়ে—
...	...
দেবী তাহে জয়দুর্গা সর্ব্বসিদ্ধি সাথ	দেবী দুর্গা সর্ব্বসিদ্ধি সেই বৈদ্যনাথ
...	...
দেবগর্ভা দেবতা—	দেবগর্ব্ব দেবতা –
নল নামে ভৈরব ত্রিপুরা দেবী তায়	অনন্ত নামেতে ভৈরব ত্রিপুরা তথায়।
নকুলেশভৈরব—	নকুলীশ ভৈরব—
—সংবর্ত্তভৈরব	—সন্মত্ত ভৈরব

শিববিবাহের মন্ত্রণা

উমা দয়া কর গো।	উমা দয়া কর গো মা উমা দয়া কর গো।
বিষম শমনভয় হর গো॥	
	পুথির পত্র—১৮
ভবে ঋণিচক্র ঋণে তার গো।	তবে বুলে চক্রবুলে তবো—(?) (বুনে—বুনে ?)

নারদের গান

দুর্গবিঘাতিনী—	দুর্গতিঘাতিনী—
জয় কালি কপালিনী মস্তকমালিনি	কালী কপালীকা মস্তকমালিকা
জয় চণ্ডি দিগম্বর—	জয় চণ্ড দিগম্বরী—
	"শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি দুই ছত্র পুথিতে নাই।
আমারে বুঝিলে বৃদ্ধ—	আমারে দেখিলে বৃদ্ধ—

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—১৮
—বাঁয়ে নড়ে দাঁত	বায়ে নড়ে দাত।
(বঙ্গবাসীসং—"বায়ে")	
	পুথির পত্র—১৯
—ডেক্‌রা বামন	—বোকড়া বামন
...	...
—না পারি কহিতে	—না পারি সহিতে
...	...
কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয়	কি কহিব অকথ্য তোমার ভাগ্যোদয়
...	...
বিবাহ কাহারে দিবে ভাবিয়াছ কিবা। শিবপতি ইঁহার ইঁহার নাম শিবা॥	বিবাহ কাহারে দিবা ভাবিয়াছ মনে। শিব পতি এহার হইবে সভে জানে॥
...	...
জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি	তব ঘরে উমা মাতা আস্যাছে যখনি
...	...

শিবের ধ্যানভঙ্গ ও কামভস্ম

	পুথির পত্র—২০
দিন দুই স্থির রহ।	দিন দুই তিন রহ।

রতির বিলাপ

ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে	ভাসে রতি লোচনতরঙ্গে
...	...
বিপরীত এ নহে বিধান	প্রিতের (পিরীতের ?) এ নহে বিধান
...	...
আহা আহা হরি হরি—	হাহা হাহা—
	পুথির পত্র—২১
এই ফল বিরহীর শাপে	এই ফল বিরহিণীর শাপে

রতির প্রতি দৈববাণী

অগ্নিকুণ্ড জালি রতি সতী হৈতে চায়	অগ্নি জালি রতি সতী মরিবারে চায়
...	...
—তনু ত্যাগ না কর	—প্রাণ ত্যাগ—

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—২১
তার ঘরে এই কাম জনমিবে গিয়া	তাঁর গর্ত্তে—
...	...
মোহিনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে	মোহিনী মোহিত শরে—
মৎস্য গিলিবেক তারে আহার বলিয়া	গিলিবে বোদালি (?) তারে আহার বলিয়া
...	পুথির পত্র—২২
শুনি রতি সাত পাঁচ ইত্যাদি	স্থনি রতি সাত পাচ করিয়া ভাবনা। নিভায় অনলকুণ্ড ছাড়িয়া ক্রন্দনা ॥

শিবের বিবাহযাত্রা

সবে হৈলা যত্নবান্	সভে হৈলা হৃষ্টমান
...	
ব্রহ্মা পুরোহিত　চলিলা ত্বরিত	—নারদ সহিত
...	
কুবের ভাণ্ডারী যক্ষগণ ভারী ইত্যাদি	—যক্ষ অধিকারী ভোজনের দ্রব্য সাজি।
...	
যাবৎ বিবাহ　না হবে নির্ব্বাহ উপবাস তবে সবে।	যাবৎ বিবাহ　তাবৎ নির্ব্বাহ শেষে উপবাস রবে।
(ইহার পরেই—"এরূপ করিয়া বর সাজাইয়া" ইত্যাদি)	(ইহার পর পুথিতে এইটুকু বেশী আছে :— রথ হস্তী আর　কি কাজ তোমার যে বুড়া বলদ আছে। তোমার যে গুণ　কত কোটি গুণ কব মৈনকার কাছে। তার পর—"এইরূপ কৈয়া, বর সাজাইয়া" ইত্যাদি)
অন্ধকারে শোভিল ভালো	আধারে শোভিল ভালো।
...	...
করে জড়াজড়ি	করে চড়াচড়ি
...	...
করে চড়াচড়ি	করে জড়াজড়ি

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—২৩
যত কন্যাযাত্র দেখিয়া সুপাত্র	—কন্যাযাত্রে দেখি বরপাত্রে
	...

শিববিবাহ

করবিলসিত নিশিত পরশু	করবিরাজিত প্রখর পরশু
(পুস্তক দ্রষ্টব্য)	লক ২ ফণী জটা বিরাজে ধক ধক ধক দহন সাজে বিমলচরণ অঙ্গিয়া। (মুদ্রিত পুস্তকে একটু বেশী আছে) ... ডম২ ডম বদন ভালে —ডমরু গালে রুদ্র ধরে তাল, নাচয়ে বেতাল ভৃঙ্গী অঙ্গরঙ্গে ভঙ্গিয়া।
সভা মাঝে হিমালয়—	—গিরিরাজ— ..
উত্তরাস্যে—	উত্তর দিকে— ...
—কহে ধীরগণ	—দ্বিজগণ ...
—দক্ষযজ্ঞ ভাবে মনে	কহিতে না পারে কিছু দুঃখ ভাবে মনে। ...
ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া	ধুতরার ঝোকে হর ঢুলিয়া ঢুলিয়া
—বিধির বিহিত বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা স্মরহর বর বরপিতা পুরহর ...	—বিধির সহিত হাসিয়া২ বিধি বিশেষ কহিলা স্মরহর বর হর পিতা ত শঙ্কর ...
—কোন্দল লাগাইতে ..	—কোন্দল ভেঙ্গাইতে ...
—ভয় দেখাইয়া এয়োগণ সঙ্গে করি—	—দরশন দিয়া আইয়াগণ—

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—২৪
মেদিনী বিদরে—সামাই	——শাভাই।
	"কেমন জামাই পাল্যা বুঝ্যা শুঝ্যা লও"
	এই ছত্রের পর পুথিতে দুইটী অতিরিক্ত ছত্র আছে, যাহা মুদ্রিত পুস্তকে নাই :—
	শুনহ মেনকা বলি কহেন নারদ।
	ভালো জামাই পাইয়াছ সুঅঙ্গ সুপদ ॥

কোন্দল ও শিবনিন্দা

বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে—	বিয়ার বরে আই মাঝারে—
—তামার শলা—	—তামার তার—
—কান্ধে বীণাযন্ত্র	— কান্ধে লই তন্ত্র
	পুথির পত্র—২৫
মেয়েগুলা মাথা কোঁড়ে—	মায়্যাগুলা মাথা কোটে (কোট্যা) তোরে রক্ত দিব
বেণা ঝোড়ে ইত্যাদি	বিনা গাহে ঝুটী বাধে কি কর বশিয়া (বেনাগাছে—পাঠান্তর)
...	...
ঘুরুলে বাতাস ইত্যাদি	ঘুরল্যা (অথবা ঘুরল্যা) বাতাস লৈয়া জলের ঘুরল্যা (ঘুরল্যা)।
	সেহাকুলের কাটা ঝাট আন চায়্যা
	পুথির পত্র—২৫
এক ঠাঁই এত মেয়ে ইত্যাদি	এক ঠাঞি এত মায়্যা দেখ না আসিয়া।
	দোহাই চণ্ডীর মেনে (মেলে) ঝাট আয় ধাইয়া ॥
	...
এ বলে উহারে সই ওটা বড় ঠেঁটা	এ বলে উহারে সহী তুমি বড় ঠেঁটা
(ইহার পরের ৪ ছত্র পুথিতে নাই)	
গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা	গোবিন্দের মুখ দেখি চাহি রহিল কেটা
...	...
পথিকেরে ভুলাইয়া	পথিকেরে ভুলাইতে সদা আখি ঠারে।
ইহার হইয়া— মকর	—পামর।

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—২৫
চারি মুখো রাঙ্গাটা	চারি মুখ রাঙ্গাদিষ্টি—
বাঁয়ে নড়ে ভাঙ্গে বেড়ী বুড়ার দশন।	বাতাসেতে নড়ে বুড়া নাঙ্গটার দশন।
...	...
বুড়ার গলায় হাড়মালা এ কি জ্বালা	বুড়ার গলায় দেখি এ কি মুণ্ডমালা
...	...
আলো নিবাইনু সবে দারুণ লজ্জায়।	অনল নিভাইল সভ দেবতা লজ্জায়।
	(ইহার পরে মুদ্রিত পুস্তকে দুই ছত্র বেশী আছে)

শিবের মোহন বেশ

	পুথির পত্র—২৬
	("আমায় শঙ্কর করুণা কর গো" ইত্যাদি ৬ লাইন পুথিতে নাই)
—উমারে না সহে।	—সতীরে না সহে।
	("যে দুঃখে দক্ষের ঘর" ইত্যাদি দুই ছত্র পুথিতে পরে আছে। ইহার ঠিক আগে আছে—"বর লৈয়া নরলীলা" ইত্যাদি ২ ছত্র)
হর নিয়া নরলীলা—	বর লৈয়া নরলীলা—
কৃপা করি মেনকারে—	মায়া লাগি—
মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়	মেনকার হইল বোধ উমার কৃপায়
...	...
ছাই দিব্য চন্দন—	ছাই দেখে চন্দন—
...	...
হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই	হরগুণ উমাগুণ—
...	...
ঋষিগণ বেদগানে পূরিল ভুবন	বিধি দেবগণ আশী পূরিল ভুবন।
অশোক কৌতুক করে যত বিদ্যাধর	অশেষ কৌতুক—

[ক্রমশঃ]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
১৩৪৮

কৃত্তিবাসের কুলকথা ও কালনির্ণয়*

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌.এ

অমর কবি কৃত্তিবাসের কালনির্ণয় আলোচনার এখনও অবসান হয় নাই। এই আলোচনার প্রধান অবলম্বন কৃত্তিবাসের তথাকথিত আত্মবিবরণী এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রথম নামোল্লেখকারী কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্রের তথাকথিত 'মহাবংশ' গ্রন্থ। সম্প্রতি আত্মবিবরণীর ঐতিহাসিক অংশের 'যথার্থতা' বা প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন করিয়া অভিনব যুক্তির অবতারণা হইয়াছে।[১] তর্কস্থলে সংশয়বাদীর ঐ যুক্তি মানিয়া লইলেও আত্মবিবরণীর কুলপরিচয়াংশের ও ধ্রুবানন্দ-রচিত গ্রন্থের প্রামাণ্য এখনও সন্দেহনির্ম্মুক্ত থাকায় কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়ব্যাপারে একটি পথ উন্মুক্ত পাওয়া যায়। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সর্ব্বপ্রথম রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্র হইতে কৃত্তিবাসের বংশপরিচয় প্রকাশ করেন এবং তাঁহার প্রকাশিত উপকরণ অবলম্বন করিয়া স্বর্গত ডক্‌টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কৃত্তিবাসের কালবিচার করিয়া গিয়াছেন।[২] কিন্তু রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্ররূপ সুনিবিড় অরণ্য-পথে খুব কম লোকই বিচরণ করিয়াছেন; স্বর্গত বসু মহাশয়ের পর বিগত অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যে (শ্রদ্ধেয় ডক্‌টর শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ব্যতীত) কৃত্তিবাসের অনুসন্ধানে কেহ সাহসপূর্ব্বক এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা পরিজ্ঞাত নহি। নব্য ন্যায়ের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থের ন্যায় দুরূহ বিলুপ্তপ্রায় কুলশাস্ত্রের এই পরিণতি অস্বাভাবিক না হইলেও শোচনীয় সন্দেহ নাই। ফলে, ধ্রুবানন্দের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া স্থূলভাবে এ যাবৎ যাঁহারা বিচার করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই ভ্রম প্রমাদের হাত হইতে রক্ষা পান নাই। আমরা একটি উদাহরণ দিতেছি।

কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক 'গৌড়েশ্বর' যাঁহাদের মতে রাজা কংসনারায়ণ, তাঁহারা কেহই ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশে'র রচনাকাল ১৪৮৫ খৃঃ (১৪০৭ শকাব্দ) সম্বন্ধে এ যাবৎ কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই এবং এই রচনাকাল ধরিয়া গণনা করিয়াও কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৩৩ খৃঃ কিম্বা আরও পরে নির্ণয় করিতে তাঁহারা একটুও বাধা কিম্বা দ্বিধা বোধ করেন নাই। সুপ্রতিষ্ঠিত গবেষণাশীল মনীষীদের এই অনবধানতা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। ধ্রুবানন্দের গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণে মোট ১১৭টি 'সমীকরণে'র উল্লেখ

* ১৩৪৮।২১এ অগ্রহায়ণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪৮ সন, পৃঃ ১৫১-২—শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। বিশ্বকোষ (১ম সং), ৪র্থ ভাগ, ১৩০০ সন, পৃঃ ৩৩৬ ও ৪০২। বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, পৃঃ ৪৮৬-৮৮।

দৃষ্ট হয়, এই সমীকরণসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম সম্বন্ধে আশা করি, কাহারও সন্দেহ হইবে না। ৫৩ সংখ্যক সমীকরণে কৃত্তিবাসের পিতা বনমালী ওঝার কুলকারিকায় (পৃঃ ৬৫) কৃত্তিবাস ও তাঁহার ভ্রাতাদের নাম আছে। কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৩৩ খৃঃ সনে হইলে তাঁহার সহোদর ভ্রাতা শান্তির জন্মকাল ১৪৩৪ সনের পূর্ব্বে নহে নিশ্চিত। এই ভ্রাতা ৭৪ সমীকরণে (পৃঃ ৯১) উল্লিখিত হইয়াছেন এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র ভরত (যাহার জন্ম ১৪৫৪ সনের পূর্ব্বে কিছুতেই নহে) ৮৭ সমীকরণে (পৃঃ ১১৩) বিখ্যাত কুলীন মনোহর-দুর্গাবরের সহিত সম্মানিত হইয়াছেন। ভরতের কুলকারিকায় তাঁহার পুত্রদ্বয় গোপাল-মাধবের নাম আছে—ইহাদের জন্মকাল কিছুতেই ১৪৭৪ ও ১৪৭৬ সনের পূর্ব্বে পড়ে না। অতঃপর আরও ৩০টি সমীকরণ হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে কৌলীন্যহ্রাস হেতু কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পৌত্র গোপাল-মাধবের নাম নাই বটে ; কিন্তু ভরতের সমকক্ষ মনোহর-দুর্গাবরের পুত্রগণ ১০৮ সমীকরণে (পৃঃ ১৩৪-৩৫) উল্লিখিত হইয়াছেন এবং গোপাল-মাধবও কুলক্রিয়ায় ত্রুটি না থাকিলে হইতে পারিতেন।[৩] সমীকরণ কালে কুলীনদের বয়স মাত্র ২০ বৎসর ধরিয়াও এবং পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিয়াও ১০৮ সমীকরণের কাল ১৪৯৪ সনের পূর্ব্বে যায় না, তাহার পরেও কতিপয় সমীকরণ হইয়াছিল। সুতরাং মহাবংশের রচনাকাল ১৪৮৫ সন ধরিলে কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ ১৪৩৩ সন হওয়াই একান্ত ভাবে অসম্ভব, ১৪৪০ কিম্বা ১৪৬০ সনের কথা ছাড়িয়াই দিলাম।[৪]

এযাবৎ কোন কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রতিলিপিতে কিম্বা কোন রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে কৃত্তিবাসের অধস্তন পুত্রাদি কাহারও নাম পাওয়া যায় নাই।[৫] সম্প্রতি আমাদের সংগৃহীত একটি প্রাচীন কুলপঞ্জীতে প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার যথাযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পূর্ব্বে ধ্রুবানন্দের গ্রন্থ ও তাহার রচনাকাল সম্বন্ধে প্রচলিত মত সংশোধনপূর্ব্বক কৃত্তিবাসের কুলপরিচয় যথোচিত বিশুদ্ধভাবে কীর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।

৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে কতিপয় মূল্যবান্ কুলগ্রন্থের পুথি রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে একটিতে (১৮১৫ খ সংখ্যক পুথির ৩৪৯ খ পত্রে) গোপাল-মাধবের কুলক্রিয়া এই ভাবে লিখিত হইয়াছে :—"মাধবস্তাৰ্ত্তিবং বলভদ্র মিশ্র অত্র কৈবরাভাবঃ বংশে কুলাভাবশ্চ।...গোপালঃ কাকুৎস্থিমেলে গতঃ বংশে কুলাভাবশ্চ।" আমাদের সংগৃহীত কুলগ্রন্থে (ফুল্যাপ্রকরণ ২০ পত্র) গোপাল-মাধব ও তাঁহাদের অধস্তন ৩।৪ পুরুষের কুলক্রিয়া বিবৃত হইয়াছে এবং গোপাল সম্বন্ধে একটি কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে : "কিং ন কাঞ্জিপুরাইশ্চ কাকুৎস্থে মূচ্ছিতোভবৎ। সংসর্গদোষাৎ গোপালে কুলাভাসোভবত্তদা।" মাধবসুত অনন্ত এবং গোপালসুত দৈবকী কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন।

৪। *Des. Cat. of Bengali Mss.*, Cal. Univ., Vol. 1., Introd., pp. x-xii ; শারদীয় সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৮, পৃঃ ১৫২ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৫। সরল কৃত্তিবাস, যোগীন্দ্রনাথ বসু, ভূমিকা, পৃঃ ৮০।

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থাবলী ও আবির্ভাবকাল

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের ইতিহাসে তিনটি স্থনির্দ্দিষ্ট যুগের পরিকল্পনা আছে—আদিযুগ অর্থাৎ প্রাগ্‌বল্লাল যুগ, মধ্যযুগ অর্থাৎ বল্লাল হইতে দেবীবরের মেলবন্ধনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং আধুনিক যুগ, দেবীবর হইতে বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত। আদিযুগের পৃথক্ কোন প্রামাণিক গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু ধ্রুবানন্দ-রচিত প্রচলিত মিশ্রগ্রন্থ পৃথক্ মধ্যযুগের একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ বটে—ইহাতে প্রাগ্‌বল্লাল যুগের কিম্বা মেলবন্ধনের পরবর্ত্তী যুগের বিবরণ নাই। ১৩২৩ সনে স্বর্গত বসু মহাশয় এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। নানাবিধ মনোহর ছন্দের শ্লোকাবলীঘটিত এই গ্রন্থ সম্যক্ ভাবে আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকে না যে, ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রথমতঃ "মহাবংশাবলি" নামে ('মহাবংশ' নহে) ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় কুলীনদের ধারাবাহিক বংশাবলি ও কুলক্রিয়ার বিবরণ পর্য্যায়ক্রমে লিখিয়া নানাপ্রকরণে বিভক্ত এক পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং পরে ন্যূনাধিক ১১৭টি সমীকরণের জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কারিকা গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি স্বয়ং কিম্বা অন্য কোন প্রাচীন কুলাচার্য্য তাঁহার উল্লিখিত মূল গ্রন্থের শ্লোকগুলি ভাঙ্গিয়া প্রত্যেক সমীকরণকারিকার সঙ্গে যোজনা করিয়া দিয়াছেন। চট্টবংশীয় অন্যতম প্রথম কুলীন অরবিন্দ ও তৎপুত্র আহিতের কুলক্রিয়া উপজাতিছন্দের ৩ শ্লোকে কীর্ত্তিত হইয়াছিল—বর্ত্তমান মিশ্রগ্রন্থে তাহা ভাঙ্গিয়া ১½ শ্লোক ২য় সমীকরণে (পৃঃ ২) এবং ১½ শ্লোক ৭ম সমীকরণে (পৃঃ ৭) পড়িয়াছে। একটি শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের শ্লোকার্দ্ধের একপাদ ৩০ সমীকরণে (পৃঃ ৩৩, চং ধনোজ রঘুপতির বিবরণের শেষ পঙ্‌ক্তি) এবং অপর পাদ ৪৫ সমীকরণে (৫৬ পৃঃ, মধুকস্ত প্রথম পঙ্‌ক্তি)! এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে। 'মহাবংশাবলি' এবং 'সমীকরণকারিকা'র এই অপূর্ব্ব অভিন্ন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিই কালক্রমে ঘটকসম্প্রদায়ে 'মিশ্রগ্রন্থ' নামে সুপ্রচারিত হইয়াছে, মূল গ্রন্থদ্বয় পৃথক্‌ভাবে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। রাজসাহী মিউজিয়ামে সংযুক্ত মিশ্র গ্রন্থের ১৭১০ শকের একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপির শেষে পুষ্পিকা আছে, "ইতি **সমীকরণসারঃ** সমাপ্তঃ" এবং কুলকারিকাংশ-বর্জ্জিত কেবল সমীকরণ কারিকার ক্ষুদ্র একটি প্রতিলিপিও সেখানে রক্ষিত আছে।[৬] এই সংযুক্ত মিশ্র গ্রন্থের আলোচনা কুলাচার্য্যের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও ঐতিহাসিকের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। প্রথমতঃ, যে সময়ে এক একটি সমীকরণ সাধিত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে ব্যক্তিগত কুলকারিকায় উল্লিখিত সমস্ত কুলক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছিল কিছুতেই বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, সমীকরণে কুলীন মাত্রেই স্থান লাভ করিতে পারেন নাই; সমীকরণ-বহির্ভূত কুলীনদের বিবরণ প্রায়শঃ ভ্রাতার সঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে এবং বহু বিবরণ বিলুপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। সমীকরণ গ্রন্থ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কুল-বিবরণাংশ বিচার করিতে হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ নবদ্বীপের সাধারণ পাঠাগারে মিশ্রগ্রন্থ

৬। ১৮৮৩ সংখ্যক পুথি। ইহাতে মোট ১১৮ সমীকরণ পাওয়া যায়।

হইতে পৃথক্ মূল মহাবংশাবলি গ্রন্থের যে জীর্ণ বিচ্ছিন্ন অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বয়ং ধ্রুবানন্দ মিশ্রের ও কৃত্তিবাসের পিতার কুলকারিকা যথাযথ পাওয়া গিয়াছে।[৭]

প্রচলিত মিশ্র গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-শ্লোক সমীকরণ গ্রন্থের নহে, পরন্তু মূল মহাবংশাবলিরই সন্দেহ নাই।[৮] এ যাবৎ এই গ্রন্থদ্বয়ের কিম্বা মিশ্র গ্রন্থের কোন প্রতিলিপিতে গ্রন্থের রচনাকালের কোনপ্রকার নির্দ্দেশ আবিষ্কৃত হয় নাই। স্বর্গত বসু মহাশয় ধ্রুবানন্দের কালসূচক নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রথম আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ করেন:[৯]

সপ্তাকাশপিতামহাননবিধোঃ শাকে গতে শ্রীশিবং
নত্বা তাং কুলদেবতাং হৃদি জপন্ মিশ্রধ্রুবানন্দকঃ।
যোগৈঃ কুত্র কুলং জগাদ বরতো দর্ভপ্রদানৈর্বুধৈঃ
জ্ঞাত্বা সাংশ (?) সতথ্যকঞ্চ কুলবিৎ তস্মিন্ ব্যবস্থাপকঃ।

কাল নির্দ্দেশ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এতই দুর্ল্লভ বস্তু যে, তাহা প্রাপ্তি মাত্র সকলকে মুগ্ধ করিয়া দেয়। স্বর্গত বসু মহাশয় উল্লিখিত শকাব্দ ১৪০৭ (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ) মুগ্ধচিত্তে বিনা বিচারে তথাকথিত 'মহাবংশের' রচনাকাল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজ অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাহাই গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। অথচ যে গ্রন্থে ঐ শ্লোক পাওয়া গেল, তাহা ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলি'ও নহে, সমীকরণ গ্রন্থও নহে, কিম্বা মিলিত মিশ্রগ্রন্থও নহে; পরন্তু "৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত কুলকারিকা" এবং এই অজ্ঞাত কুলকারিকায়ই আবার দেবীবরের মেল বন্ধনের কালসূচক শ্লোকটিও ছিল। সাধারণ ভাবে ধ্রুবানন্দের আবির্ভাব-কাল সূচনা ব্যতীত উদ্ধৃত শ্লোকটির কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই; শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতে বুঝা যায়, ধ্রুবানন্দ ঐ শকে কৌলীন্য প্রথার নিয়মাবলী ও অংশাদিব্যবস্থাঘটিত কোন পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন, তাঁহার মহাবংশাবলি কিম্বা সমীকরণ গ্রন্থের রচনাকাল ঐ শ্লোকে নিবদ্ধ

৭। ভারতবর্ষ, ১৩৪৭ বৈশাখ, পৃঃ ৬৯৮-৭০১ অস্মল্লিখিত প্রবন্ধে এই দুষ্প্রাপ্য পুথির বিবরণ ও ধ্রুবানন্দের অন্যান্য কথা দ্রষ্টব্য। "মুখটী কুলের" নৃসিংহ প্রকরণটী এই পুথিতে প্রায় সম্পূর্ণ আছে। বনমালি, তৎপুত্র শান্তি ও তৎপুত্র ভরতের কুলবিবরণীর পর, বনমালির অপর পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কুলকারিকায় নৃসিংহ প্রকরণ শেষ হইয়াছে। কৃত্তিবাস কিম্বা তাঁহার অপর কোন ভ্রাতার কুলবিবরণ মিশ্রগ্রন্থে কিম্বা এই পুথিতে নাই। বনমালির পূর্ব্বে অনিরুদ্ধ প্রভৃতির ধারা (১০৮ সমীকরণ পর্য্যন্ত) যথাযথ আছে,—সামান্য পাঠভেদ মাত্র। লক্ষ্য করিবার বিষয়, কোন কোন সমীকরণকারিকা এই পুথির পার্শ্বদেশে লিপিকার উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থদ্বয়ের পার্থক্য স্পষ্ট সূচনা করিয়াছেন।

৮। "শ্রীমদ্বন্দ্যঘটীয়কাদিকমহাবংশাবলিং" পদের সরলার্থ গ্রন্থের প্রারম্ভে বন্দ্যবংশের বিবরণ ছিল। নবদ্বীপের পুথিতে বন্দ্যবংশের প্রারম্ভাংশ নাই। মহেশের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকাদি আধুনিক সব গ্রন্থও বন্দ্যবংশ দিয়াই আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ঘটকসম্প্রদায় এই পদের যে কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা করে, তাহা গ্রহণ করা যায় না (সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সং, ৭২৬ পৃঃ)।

৯। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১মাংশ (২য় সং) ১৮৭ পৃঃ।

হয় নাই নিশ্চিত। সুতরাং নূতন করিয়া অন্তর্লীন ও বহিঃস্থিত প্রমাণাবলীর সাহায্যে মহাবংশাবলির রচনাকাল নির্ধারণ করা আবশ্যক হইয়াছে।

মুদ্রিত মিশ্রগ্রন্থের ৫০ সমীকরণে (পৃঃ ৬১-৬২) সাগরদিয়া বন্দ্যবংশীয় মাধবসুত বিষ্ণুর কুলকারিকায় তাঁহার আট পুত্রের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ স্বয়ং গ্রন্থকার "সর্ব্বেষাং চ কৃপাস্থলং তদনুজো মিশ্রো ধ্রুবানন্দকঃ।" পরবর্ত্তী ৭০ সমীকরণে (পৃঃ ৮৭-৮৮) বিষ্ণুর তৃতীয় পুত্র পৃথ্বীধর ও জ্যেষ্ঠ পুত্র "সৎপণ্ডিত" শঙ্কর এই দুই ভাই মাত্র সম্মানিত হইয়াছিলেন; সমীকরণবহির্ভূত অপর ছয় ভাইএর কুলকারিকাও তৎসঙ্গে মিশ্রগ্রন্থে যোজিত পাওয়া যায়। নবদ্বীপ গ্রন্থাগারের মূল মহাবংশাবলির খণ্ডিত পুথিতে ৮ ভ্রাতারই কুলবিবরণ ধারাবাহিক প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বশেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্কর ও তাঁহার অধস্তন ২।৩ পুরুষের কুলবিবরণ আছে। ৭ম ও ৮ম ভ্রাতার কুলবিবরণের পাঠ এইরূপ :—

লম্বোদরার্ত্তিঃ শুভপূতিগাঙ্গঃ কামাইচট্টেঽপি চ তুল্যতা চ।
লম্বোদরস্যাত্মজবিশ্বনাথঃ **মিশ্রধ্রুবানন্দকুলং প্রবক্ষ্যে।**
আর্ত্তিঃ কৃতা শ্রীবরমিশ্রকে চ ক্ষেম্যশ্চ বাণেশ্বরকো মুখোঽসা-।
বুৎসাহকংশৈর্দ্বয়মেব চক্রে আর্ত্তিশ্চ চট্টো মকরন্দনামা।
লভ্যোচিতশ্চট্টজবিষ্ণুশর্ম্মা॥

মুদ্রিত মিশ্রগ্রন্থে এ স্থলে শ্লোকমধ্যে ধ্রুবানন্দের নাম নাই, ইহা গ্রন্থরচনার প্রণালী-বিরুদ্ধ। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ৮ ভ্রাতার মধ্যে ৭ ভ্রাতারই পুত্রগণের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ধ্রুবানন্দের কোন পুত্রের নামোল্লেখ নাই। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, তিনি অপুত্রক ছিলেন। আমাদের নূতন সংগৃহীত কুলপঞ্জীতে ধ্রুবানন্দের কুলবিবরণ এইরূপ পাওয়া যায় :—

ধ্রুবানন্দমিশ্রস্যার্ত্তি চট্টশ্রীবরমিশ্র ক্ষেম্য মুখ বানঘটক পুনরার্ত্তি চট্ট মকো লভ্য চট্ট বিষ্ণু **অপুত্রোঽয়ং।**
(সাগরদিয়া প্রকরণ, ২০ খ পত্র)

ধ্রুবানন্দের পুত্র সর্ব্বানন্দ মিশ্র-রচিত "কুলতত্ত্বার্ণব" গ্রন্থের কৃত্রিমতা বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

অপরিচিত উৎসাহ-কংশের কথা বাদ দিয়া ধ্রুবানন্দ ৪ জন কুলীনের সহিত কুল করিয়াছিলেন—বঙ্গভূষণ চট্ট শ্রীবরমিশ্র (৬৩ সমীকরণে গৃহীত), কাঁচনা মুখ বাণেশ্বর (৭৬ সমীকরণ), খনিয়া চট্ট মকরন্দ (৬১ সমীকরণ) এবং বিভোচট্ট বিষ্ণু (৬৭ সমীকরণ)। ইঁহারা প্রত্যেকেই সমীকরণগৃহীত কুলীন। তন্মধ্যে চট্ট মকরন্দের সম্পর্কিত এবং এক সমীকরণীয় কুলীন পূতি শোভাকরের মৃত্যুশকাঙ্ক (১৩)৭৭ অর্থাৎ ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়া লিখিত আছে (পৃঃ ৭৭)।

কুলীনদের কুলক্রিয়ার উল্লেখ মধ্যে একটা পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রম পরিলক্ষিত হয়। শোভাকরের ৯টি কুলক্রিয়ার মধ্যে চট্ট মকরন্দের সহিত সম্বন্ধ সপ্তম, মকরন্দের শেষ বা চতুর্থ কুলক্রিয়া উক্ত শোভাকরের সহিত এবং তৎপূর্ব্বে তৃতীয় কুলক্রিয়া ধ্রুবানন্দের সহিত;

পক্ষান্তরে ধ্রুবানন্দ চট্ট মকরন্দের সহিত সম্বন্ধের পর একটিমাত্র কুলক্রিয়া করিয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দের স্বকীয় এবং স্বসম্পর্কিতবিষয়ক এই ক্রমনির্দ্দেশ প্রামাণিক বলিয়া ধরা অসঙ্গত হইবে না। তদনুসারে ১৪৫৫ সনে শোভাকরের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে মকরন্দের হিতস কুল, তৎপূর্ব্বে মকরন্দের সহিত ধ্রুবানন্দের কুল এবং তাহারও পূর্ব্বে ধ্রুবানন্দের অপর কতিপয় কুলক্রিয়া ঘটিয়াছিল ধরিতে হইবে। তর্কের খাতিরে আমরা এই সব কয়টি কুলক্রিয়ার ঘটনা একই বৎসর ১৪৫৫ সনে ধরিলাম এবং তৎকালে ধ্রুবানন্দের বয়স মাত্র ২০ বৎসর ধরিলাম। মহাবংশাবলি রচনাকালে ধ্রুবানন্দের বয়স যদি ৯০ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলেও ১৫২৫ সনের পরে যায় না। ইহাই রচনাকালের অধস্তন পরমসীমারূপে ধরিতে হইবে।

বস্তুতঃ শোভাকরের মৃত্যুকালে ধ্রুবানন্দের বয়স ৩৫।৪০ ধরাই যুক্তিসঙ্গত এবং তদনুসারে মহাবংশাবলির রচনাকাল প্রায় ১৫১০ সনে নির্দ্ধারণ করা যায়। ধ্রুবানন্দ অতি-বার্দ্ধক্যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; কারণ, ধ্রুবানন্দের ভ্রাতা পৃথ্বীধরের বহুসংখ্যক প্রপৌত্রের নাম পর্য্যন্ত সমস্ত মিশ্রগ্রন্থে পাওয়া যায় এবং মহাবংশাবলির পুথিতে দুইটি প্রপৌত্রের কুল-ক্রিয়ারও উল্লেখ আছে।[১০]

১১৪ সমীকরণে কাঁচনামুখ পরমানন্দ সম্মানিত হইয়াছেন। তিনি ধ্রুবানন্দের সম্পর্কিত বাণেশ্বরের সমকক্ষ জ্ঞাতিভ্রাতা জগন্নাথের পৌত্র (৭৬ সমীকরণ দ্রষ্টব্য)। পরমানন্দের কুলকারিকায় তাঁহার তিন পুত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"লোকনাথো রঘুশ্চৈব ভবনাথোপি তৎসুতঃ" (১৩৯ পৃঃ)। এই লোকনাথ চৈতন্যসম্প্রদায়ের বিখ্যাত লোকনাথ গোস্বামী এবং আধুনিক যুগের বহু কুলপঞ্জিকায় কাঁচনা প্রকরণে "লোকনাথ সন্ন্যাসী" বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ সং পুথির ১৮৬ পত্র)। লোকনাথের জন্মাব্দ ১৪৮৩ সন বলিয়া অনুমিত হয় (সপ্ত গোস্বামী, পৃঃ ১৭)। মিশ্রগ্রন্থের রচনাকাল ১৪৮৫ সন ধরা হইলে ১১৪ সমীকরণের কাল ১৪৮০ সনের পরে নহে, তৎকালে পরমানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র লোকনাথের বয়স ন্যূনকল্পে ২০ ধরিয়াও জন্মকাল হয় ১৪৬০ সন অর্থাৎ মহাপ্রভুর ২৬ বৎসর পূর্ব্বে। ইহা সম্ভব নহে। গ্রন্থ-রচনাকালে লোকনাথের বয়স ২০ ধরিয়া এবং ১৪৮০ সনে তাঁহার জন্ম ধরিয়া ধ্রুবানন্দের গ্রন্থের তারিখ হয় ১৫০০ সন।

বঙ্গভূষণ চট্টবংশীয় শ্রীগর্ভ আচার্য্যশিরোমণি ৮০ সমীকরণে সম্মানিত এবং তাঁহার

১০। ১০৭ সমীকরণে (পৃঃ ১৩৩) পৃথ্বীধরের পৌত্র ভগীরথের কুলকারিকায় তাহার ৫ পুত্রের উল্লেখ আছে। মহাবংশাবলির নবদ্বীপস্থ পুথিতে অপর পৌত্র রত্নগর্ভের কুলক্রিয়া ও ৩ পুত্রের উল্লেখ আছে—"কমলাকান্তঃ শ্রীকান্তো বল্লভশ্চ সুতা ইমে"; কিন্তু অস্মৎসংগৃহীত কুলপঞ্জীতে (সাগরদিয়া ১৫ খ পত্র) রত্নগর্ভের ৭ পুত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বুঝা যায়, গ্রন্থ রচনার পরেও রত্নগর্ভের আরও ৪ পুত্র জন্মিয়াছিল। ১৩৬ পৃঃ অপর পৌত্র (দামোদরজ) গোবিন্দের বিষয়ে নবদ্বীপের পুথিতে এক পঙ্ক্তি বেশী আছে—"রামচন্দ্রস্তার্ত্তিরভূচ্চট্টজো লোকনাথকঃ।" ঐ পৃষ্ঠে জহ্নুজ গোবর্দ্ধনের পুত্র ষষ্ঠীদাস সম্বন্ধেও ঐ পুথিতে এক পঙ্ক্তি অধিক আছে—"ষষ্ঠীদাসস্ত ন্যূনোভূৎ সুরানন্দো মুখোদ্ভবঃ।"

কুলকারিকার সঙ্গে সমীকরণবহির্ভূত তাঁহার ৫ ভ্রাতার কারিকা আছে। ২য় ভ্রাতা কমলনয়নাচার্য্যের তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র মাধব (১০৩ পৃঃ)। ইনিই নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গার স্বামী বটেন। শ্রীগর্ভের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র কেহ কেহ ৯৮ সমীকরণে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। মাধবকে যদি স্বয়ং নিত্যানন্দের (জন্ম ১৪৭৩ সন) সমবয়স্ক ধরা যায় এবং পিতৃব্যপুত্রদের সমীকরণকালে মাধবের বয়স যদি ২।১ বৎসর মাত্র ধরা যায়, তাহা হইলেও ১১৭ সমীকরণের অর্থাৎ ধ্রুবানন্দের গ্রন্থরচনার কাল ১৫০০ সনের পূর্ব্বে হয় না। সুতরাং ইহাই মিশ্রগ্রন্থের রচনাকালের উর্দ্ধতন পরমসীমা বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে।

ধ্রুবানন্দের গ্রন্থে কালনির্ণয়ের প্রায় অসংখ্য সূত্র বিদ্যমান আছে—একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য সূত্র ধরিয়া আমরা উক্ত মতের পরিপোষণ করিতেছি। খড়দহ মুখবংশীয় বিখ্যাত কুলীন কামদেবের ১১ পুত্র ছিল (পৃঃ ১০৭)—দশম পুত্র সুধাকরের কুলবিবরণে (পৃঃ ১২৯) সর্ব্বশেষে লিখিত আছে :—

"ততোঽস্য তনয়া নীতা জনেশভট্টসূনুনা।"

এই "জনেশ ভট্ট" (কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত একটি মিশ্রগ্রন্থের পুথিতে—১০৮৬ সং পুথির ১৫৫ পত্রে "জলেশভট্ট" পাঠ আছে) বিখ্যাত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের জ্যে[illegible] "জলেশ্বরবাহিনীপতি ভট্টাচার্য্য"। কিন্তু সুধাকরের কুলক্রিয়া জলেশ্বরের সঙ্গেই হইয়াছিল, জলেশ্বরের পুত্রের সঙ্গে নহে। কারণ, অস্মৎসংগৃহীত কুলপঞ্জীতে (খড়দহ, ২৯খ পত্র) সুধাকরের কুলক্রিয়ায় স্পষ্ট লিখিত আছে :—

"শেষে কন্যা **দেবলবন্দ্য বাহিনীপতৌ** গতা অতো নাসঃ।"

সম্ভবতঃ "জলেশভট্টসূরিণা" পাঠ বিকৃত হইয়া কালক্রমে 'ভট্টসূনুনা' হইয়াছে সার্ব্বভৌমের জন্মকাল প্রায় ১৪৪৫-১৪৫০ সন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম দশকে পড়ে সন্দেহ নাই।[১১]

কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষগণ

বল্লালী কুলীন মুখবংশীয় উৎসাহের পুত্র **আহিত** বা **আয়িত** প্রথম সমীকরণের প্রথম কুলীন। প্রচলিত মিশ্রগ্রন্থে দ্বিতীয় সমীকরণের প্রারম্ভে একটি গদ্য পঙ্‌ক্তি লিখিত আছে :—(২ পৃঃ)

'ইদানীং লক্ষ্মণসেনস্য সভাশ্রিতা কুলীনা নিগদ্যন্তে।''

তদ্দ্বারা অনুমান করিতে হয়, প্রথম সমীকরণ বল্লাল সেনের রাজত্বকালেই সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না; ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থে গদ্যাংশের প্রক্ষিপ্ততা ও অপ্রামাণ্য প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। ঘটকসমাজে সমীকরণের প্রবর্ত্তকরূপে লক্ষ্মণ সেনের নামই চিরপ্রচলিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে রামনাথ-রচিত "কুলমঞ্জরী"

১১। ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৭, ৪২৬ পৃঃ।

নামক একটি দুষ্প্রাপ্য কুলগ্রন্থের খণ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (১৮১৫ক সংখ্যক পুথি)। এই গ্রন্থ নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল নিঃসন্দেহ। ফুলিয়া মেলের কুলীন মুখবংশীয় শ্রীগোপাল সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আছে :

"শ্রীগোপাল অসৌ কেশরকোণী রাজকৃষ্ণচন্দ্রশেষকন্যাবিবাহী শিবনিবাসে মহতী ঘটা সন ১১৫৮ ৯ অগ্রহায়ণঃ।" (১৮ ক পত্র)

ইহা প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে আহিত সম্বন্ধে লিখিত আছে :— (১ পত্রে)

পূর্ব্বরাজাভিষেককালীন উৎসাহগরুড়য়োরবিদ্যমানে স্বপর্য্যা(য়)শুদ্ধতয়া রাজ্ঞানুমত্যা আত্মতুল্যপুত্রত্বাৎ আত্মন উৎসাহস্ত পর্য্যায়ে আয়িতোমুখস্য সমীকরণতা সিদ্ধা যথা আয়িতো বহুরূপাখ্য ইত্যাদি।"[১২]

সুতরাং লক্ষ্মণসেনের অভিষেককালেই প্রথম সমীকরণ হইয়াছিল, এইরূপ একটি মত কুলাচার্য্যমধ্যে প্রচলিত ছিল এবং তাহাই সমীচীন বলিয়া ধরা যায়। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ ১১৭০ সনের পূর্ব্বে নহে এবং ১১৭৮ সনের পরে নহে নিশ্চিত; আমরা ১১৭৫ সন ধরিয়াই গণনা করিব। সমীকরণব্যাপার কুলমর্য্যাদানির্ণয়ের একটা বিশিষ্ট অনুষ্ঠান এবং এই কৌলীন্য-নির্ভর করে নিজের এবং পুত্রকন্যার বিবাহঘটনার উপর। সুতরাং সমীকরণকালে কুলশ্রেষ্ঠের বয়স অন্যূন ৪০ ধরিতে হইবে, ৫০-৬০ হওয়াই স্বাভাবিক। মহাবংশাবলির কুলকারিকায় আহিতের নয়টি কুলক্রিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে দ্বিতীয় কার্য্য চট্ট বহুরূপের সহিত 'উচিত' সম্বন্ধ বটে। সৌভাগ্যক্রমে এই সম্বন্ধের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়; কারণ, আহিতের পুত্র উধোর সহিত বহুরূপের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল, ইহা উধোর কারিকায় (পৃঃ ৪) স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। এতদনুসারে আহিতের জন্মকাল ১১৩০ সনের পরে নহে, প্রায় নিশ্চিতরূপেই নির্দ্ধারণ করা যায়।

আহিতের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ **উধো** (উদ্ধরণ) ৪র্থ সমীকরণে সম্মানিত। উধোর দ্বিতীয় পুত্র **শিয়ো** খঞ্জ ছিলেন (৭ম সমীকরণ, ৮ পৃঃ) এবং তদ্ধেতু তাঁহার 'ন্যূনতা' ঘটিয়াছিল। এ বিষয়ে পূর্ব্বোদ্ধৃত রামনাথের "কুলমঞ্জরী"র বচন উল্লেখযোগ্য :—

"শিয়োমুখস্য খঞ্জস্য দীনভাবত্বাৎ বাং দুর্ব্বলিঃ করং গৃহীতবান্ এতেন লঘ্বীভূতঃ। নূনস্তু মুংশিয়ো ইতি প্রকৃতিকোমলত্বং অতঃ প্রভৃতি ফুলস্থাননির্দ্দেশশ্চ। পুত্রে নৃসিংহে ফুল্লরবো ভবিষ্যতি।" (২ ক পত্র)

এই শিয়োর জ্যেষ্ঠ পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ **"নরসিংহ ওঝা"**—যিনি ১৪শ সমীকরণে প্রসিদ্ধ আখণ্ডল বন্দ্য প্রভৃতির সহিত প্রতিষ্ঠালাভ করেন (পৃঃ ৩)। তাঁহার কাল নির্ণয়ের উপর কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় অনেকটা নির্ভর করে।

দনুজমাধব ও নরসিংহ

প্রচলিত মিশ্রগ্রন্থে তৃতীয় সমীকরণের শিরোভাগে একটি গদ্য বচন উদ্ধৃত পাওয়া

১২। সম্বন্ধনির্ণয়ে (৩য় সং ২৬৮ পৃঃ পাদটীকা) কোন অজ্ঞাত কুলগ্রন্থ হইতে অনুরূপ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ (২য় সং), পৃঃ ১৫১ সমীকরণবিষয়ে দ্রষ্টব্য।

যায়—"ইদানীং দনুজমাধবস্য সভাশ্রিতা কুলীনা নিগদ্যন্তে।" তদনুসারে স্বর্গত বসু মহাশয় (তদীয় গ্রন্থের ১৫৪ পৃঃ) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ৩য় সমীকরণ হইতে (ষষ্ঠ পর্য্যন্ত) দনুজমাধবের রাজত্বকালে ঘটিয়াছিল। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত প্রমাণসিদ্ধ নহে। উক্ত গদ্য বচন ধ্রুবানন্দের 'সমীকরণকারিকা' কিম্বা 'মহাবংশাবলি'র অন্তর্ভুক্ত নহে নিশ্চিত, ইহা পরবর্ত্তী যোজনা। সমীকরণ গ্রন্থে এক স্থলে মাত্র (২য় সমীকরণকারিকায়) রাজা লক্ষ্মণসেনের নাম আছে—আর অন্য কোথাও কোন রাজার নাম নাই। মহাবংশাবলি গ্রন্থের সহিত সমীকরণগ্রন্থের সাক্ষাৎ কোনই সম্বন্ধ নাই, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। মহাবংশাবলিতে ধ্রুবানন্দের নিজ পূর্ব্বপুরুষ বন্দ্য মহেশ্বরের কুলকারিকায় পাওয়া যায়, মহেশ্বর ও তৎপুত্র মহাদেব উভয়েই লক্ষ্মণসেনের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন (পৃঃ ২)। পঞ্চমসমীকরণীয় মুখবংশীয় মহাদেবের কুলকারিকায় একবারই মাত্র দনুজমাধবের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা কোন্ সমীকরণ কাহার সময়ে হইয়াছিল, নির্দ্ধারণ করা কঠিন। লক্ষ্মণসেনের আশ্রিত বন্দ্য (মহেশ্বরসুত) মহাদেব চতুর্থ সমীকরণের কুলীন; সুতরাং অন্ততঃ চতুর্থ সমীকরণ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণসেনের সময়ে পড়িয়াছিল অনুমান করা চলে। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সমীকরণস্থ সকলেই ১ম ও ২য় সমীকরণীয়দের পুত্র, কেবল আশ্চর্য্যের বিষয়, ধ্রুবানন্দ যাঁহাকে দনুজমাধবের সম্মানভাজন করিয়াছেন, সেই ৫ম সমীকরণীয় মহাদেব মুখ ১ম সমীকরণের ১ম কুলীন আহিতের অন্যতম ভ্রাতা ছিলেন। পক্ষান্তরে ষষ্ঠ সমীকরণীয় ১২ জনের মধ্যে ৬ জনই প্রথম কুলীনদের পৌত্র, ৫ জন পুত্র এবং ১ জন উক্ত ৫ম সমীকরণীয় মুখ মহাদেবের পুত্র। পিতার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সমীকরণে পুত্রের অবস্থান সমগ্র মিশ্রগ্রন্থে আর কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সমীকরণের মধ্যে কালের ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল এবং ইহার একমাত্র ঐতিহাসিক কারণ হইতেছে তুরক্ক আক্রমণ। এতদনুসারে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের প্রথম ভাগে ১ম ও ২য় সমীকরণ এবং শেষ ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটি সমীকরণ—৩য়, ৪র্থ ও ৫ম—ঘটিয়াছিল অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত। মুখ মহাদেব (জন্ম অনুমান ১১৪৫ সন) বর্ত্তমান মিশ্রগ্রন্থের স্থূলদৃষ্টিতে একই সময়ে সমীকরণের সম্মান ও দনুজমাধবের সম্মান লাভ করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ নাই। তুরক্ক আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে সমীকৃত হইয়া বার্দ্ধক্যে দনুজমাধবের সভায় তাঁহার অবস্থিতি মোটেই অসম্ভব নহে।

এড়ুমিশ্রের কারিকানুসারে লক্ষ্মণপুত্র কেশবসেন তুরক্কভয়ে দেশত্যাগ করিয়া সসৈন্যে বিপ্রগণ সহ "বঙ্গে" দনুজমাধবের আশ্রয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন।[১৩] এই ঘটনার কাল অনুমান ১৩শ শতাব্দীর তৃতীয় কি চতুর্থ দশকে পড়িবে এবং বিজয়সেনের ন্যায় তাঁহার সুদীর্ঘ (৬০ বৎসরের) রাজত্ব অনুমান করিলে সোনারগাঁর দনুজরায়ের সহিত তাঁহার অভেদ কল্পনা একই স্থানে অল্প সময়ের মধ্যে দুই দনুজের অস্তিত্বকল্পনা অপেক্ষা অধিকতর

১৩। ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃঃ ৭০৩।

যুক্তিযুক্ত। কেশবসেনের সঙ্গে যে সকল ব্রাহ্মণ গিয়াছিলেন, অতিবৃদ্ধ মুখ মহাদেব সম্ভবতঃ তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন এবং ধ্রুবানন্দ তজ্জন্য তাঁহারই কুলকারিকায় দনুজমাধবের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, আহিতের জন্মাব্দ ১১৩০ সনের পরে যাইবে না। এক পুরুষে ৩৫ বৎসর (অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূন ৩ পুরুষে শতাব্দী) ধরিলে নরসিংহ ওঝার জন্মকাল হয় ১২৩৫ সন এবং ১ পুরুষে ৪০ বৎসর (অর্থাৎ ২½ পুরুষে শতাব্দী) ধরিয়া হয় ১২৫০ সন। সুতরাং যৌবনে নরসিংহ দনুজমাধবের সভায় ছিলেন নিঃসন্দেহ। এড়ুমিশ্রের নবাবিষ্কৃত কুলপরিচয় ও বংশাবলী দ্বারাও ইহা সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলির নবদ্বীপস্থ একমাত্র পুথি অনুসারে মুখ আহিতের প্রপিতামহ "গুঞ্জিক"। এই গুঞ্জিকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা "জিয়া"র অধস্তন সপ্তম পুরুষ এড়ুমিশ্র বটেন এবং নরসিংহ ওঝা তদনুসারে এড়ুমিশ্রের 'জ্ঞাতিভ্রাতা' হইতেছেন—উভয়ের দনুজমাধবের সভায় অবস্থান সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়।[১৪] এই নরসিংহ ওঝাকে দনুজমর্দ্দনের সভায় ১৪১৮ সনে টানিয়া আনা একেবারেই ...

নরসিংহের একমাত্র পুত্র **গর্ভেশ্বর** (২১ সমীকরণ) এবং জ্যেষ্ঠ পৌত্র সুবিখ্যাত **মুরারি ওঝা** (৩৪ সমীকরণ, পৃঃ ৩৯)। মুরারির বিবরণে ধ্রুবানন্দের পরবর্ত্তী আধুনিক যুগের কুলপঞ্জীতে "দেবকুটস্থাননির্ণয়ঃ" বলিয়া এক অভিনব বাসস্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[১৫] ফুলিয়ার নিকটে

১৪। প্রচলিত কুলপঞ্জীতে আহিত গুঞ্জিকের বৃদ্ধপ্রপৌত্র বলিয়া বর্ণিত হয় (সম্বন্ধনির্ণয়৩ পৃঃ ৩৪২, নগেন বসু, পৃঃ ১৪১); কিন্তু ধ্রুবানন্দের মতই প্রামাণিক (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃঃ ৭০০), তাহাতে সন্ন্যাসীর পুত্রকল্পনা নাই! 'এড়ুমিশ্রের পরিচয়' নামে সম্বন্ধনির্ণয়ে (পৃঃ ৭১২-১৭) মুলো পঞ্চাননের এক দীর্ঘ কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে—'এড়ুমিশ্র গিরিসুত রোষাকর পৌত্র'—কিন্তু ইহা 'বাসুদেবের তিন শিষ্য চৈয়ে রঘোত্তম'এর মতই সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা এবং অপ্রামাণিক। কুলগ্রন্থের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা কবে হইবে জানি না। এড়ুমিশ্রের বংশাবলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক পুথি দেখিয়া আমরা মুদ্রিত করিয়াছিলাম (ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৪৭, পৃঃ ৩৫৫), কিন্তু সম্প্রতি কাশীর সরস্বতীভবনস্থ অধিকতর প্রামাণিক পুথি হইতে তাহা সংশোধন করিতেছি: "জিয়োসুৎ শালু তৎসুত শঙ্কর তৎসুতৌ বলদেববশিষ্ঠৌ, বলদেবসুতাঃ গদো........., গদাধরমিশ্রসুৎ দুর্য্যোধন মিশ্র তৎসুতাঃ এড়ুমিশ্র চক্রপাণি গণপতিকাঃ। **এড়ুমিশ্র পঞ্জিকাকারঃ তৎসুৎ কুশধ্বজমিশ্র** তৎসুত মাঙ্‌-বাঙ্‌-হিঙ্গল-অচ্যুতকা......" (১০৮৭ নং পুথির ১৪৩ খ পত্র—'সমুদ্রগৌড়কুলং' নামে এই পুথিতে ১৪৩-৪৫ পত্রে এড়ুমিশ্রের বিস্তৃত অধস্তন বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে)। ঢাকার পুথিতে শালু ও কুশধ্বজের নাম বাদ পড়িয়াছে। এড়ুমিশ্র ধ্রুবানন্দের ন্যায় অতিবার্দ্ধক্যে "পঞ্জিকা" রচনা করিয়াছিলেন; কারণ, মিশ্রগ্রন্থের এক পুথিতে (পরিশিষ্ট, ১৪৮ পৃঃ) **"কিঞ্চ এড়ুমতে"** বলিয়া ২৩ সমীকরণস্থ কাঁটাদিয়া বন্দ্য ভীমজ হরির কুলকারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে—এই হরি প্রথম কুলীন মকরন্দের বৃদ্ধপ্রপৌত্র এবং নরসিংহ ওঝার এক পুরুষ পরবর্ত্তী।

১৫। অস্মৎসংগৃহীত কুলপঞ্জীর ১ম পত্র। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ নং পুথিতে (১৩২ খ পত্র) 'দেবগৃহে' পাঠ আছে এবং "অত্র কুম্ভীরতলা স্থান নির্ণয়" বলিয়া আর একটি গ্রামেরও উল্লেখ আছে। রামনাথের 'কুলমঞ্জরীর' পাঠ 'জম্বীরমূলস্থান' এবং 'দেবকুটা' (১৮১৫ ক সং পুথির ২ খ পত্র)।

কিম্বা অন্যত্র এই নামের গ্রাম আছে কি না, গবেষণাযোগ্য। ধ্রুবানন্দ স্পষ্ট মুরারির আট পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কুলগ্রন্থে এই নামগুলিতে বিন্দুমাত্রও পাঠভেদ নাই। সম্ভবতঃ এক জনকে ("নিবাস") অপুত্রমৃত বলিয়া কৃত্তিবাস বাদ দিয়াছেন। আমাদের সংগৃহীত কুলপঞ্জীতেও "তৎসুতাঃ ভৈরবশৌরি বনমালি অনিরুদ্ধ মদন মার্কণ্ডব্যাসকাঃ" (ফুল্যাপ্রকরণ ১ পত্র) বলিয়া ৭ পুত্রেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আত্মবিবরণীতে অকুলজ্ঞ লিপিকারের হস্তে পড়িয়া প্রায় সবগুলি নামই অবোধ্য হইয়া আছে; আমরা যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি :—

মহাপুরুষ "সৌরি" (মুরারি নহে) জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে "আনি"॥
মদরহিত ("মদন") ওঝা সুন্দরমূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস যমজ (?) শাস্ত্রে অবগতি॥

মুরারির ভ্রাতৃদ্বয় সূর্য্য ও গোবিন্দের কুলবিবরণাদি মিশ্রগ্রন্থে কিম্বা মহাবংশাবলিতে নাই, পরবর্ত্তী কুলগ্রন্থেও দুষ্প্রাপ্য। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সংগৃহীত কুলপঞ্জীর পাদটীকায় সূর্য্যপণ্ডিতের এইরূপ বিবরণ আছে: "সূর্য্যস্যার্ত্তি চট্ট কুবের ক্ষেম্য চট্ট বনমালি, তৎসুতাঃ গণপতিনিশাপতিবিশ্বম্ভরশঙ্করকাঃ।" (ফুল্যা, ১ পত্র)। তদনুসারে আত্মবিবরণীর 'বিভাকর' কাটিয়া 'বিশ্বম্ভর' করিতে হইবে। অস্মদীয় কুলপঞ্জীতে মুরারির কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দের অধস্তন বংশাবলি পাওয়া যায়: যথা, "গোবিন্দস্যার্ত্তি গাং কণ্ড কেশবসুত তৎসুতাঃ আদিত্যবিদ্যাপতিরুদ্রকাঃ ...(বিদ্যাপতির এক পুত্রের নাম 'বিভাকর')।" (ফুল্যা, ২১ক পত্র)। এতদনুসারে আত্মবিবরণীর এক স্থলের সংশোধিত পাঠ হইবে :—

"গোবিন্দজ আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর॥

ভৈরবসুত 'গজপতি'র নাম যথাযথ মিশ্রগ্রন্থে পাওয়া যায় (৬৫ পৃঃ)।

কৃত্তিবাসের ভ্রাতৃগণ

কৃত্তিবাসের ভ্রাতৃগণের নামোল্লেখে আত্মবিবরণী ও মিশ্রগ্রন্থের মধ্যে অনুপেক্ষণীয় প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। মিশ্রগ্রন্থের পাঠ নবদ্বীপস্থ মহাবংশাবলি প্রভৃতির সহিত মিলাইয়া সংশোধন করিলে দাঁড়ায় (৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) :—

তৎসুতা জজ্ঞিরে শুভাঃ।
কৃত্তিবাসাঃ কবির্ধীমান্ সাম্যাৎ শান্তির্জনপ্রিয়ঃ।
মাধবঃ সাধুরেবাসীৎ মৃত্যুঞ্জয়ো জলাশয়ঃ।
বলো শ্রীকণ্ঠকঃ শ্রীমান্ চতুর্ভুজ ইমে সুতাঃ॥
(নবদ্বীপ পুথির পাঠ—মাধুঃ সাধুতরোপ্যাসীৎ)

এখানে স্পষ্ট ৮ পুত্রের উল্লেখ আছে, 'শ্রীমান্' পদ বিশেষণ করিলেও ৭ পুত্রের। অস্মদীয় কুলপঞ্জীর পাঠে কোন প্রভেদ নাই :—"তৎসুতাঃ কীর্ত্তিবাস পণ্ডিৎ মৃত্যুঞ্জয় শান্তী মাধব শ্রীকণ্ঠ শ্রীমান বল্লোচতুর্ভুজকাঃ।" (১৯ক পত্র)। পক্ষান্তরে আত্মবিবরণীতে দুইবার স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে—'ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী', এবং 'ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী'। কিন্তু নিরতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়, নামোল্লেখকালে কৃত্তিবাস অন্ততঃ ৭ ভাইয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,

সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস।
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর (পাঠান্তর শ্রীকণ্ঠ) ভাই তার নিত্য উপবাসী।
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারে 'শান্তিমাধব' এক নাম এবং ভাস্কর চতুর্ভুজেরই অপর নাম। কিন্তু ধ্রুবানন্দ প্রভৃতি সকলেই মাধবকে শান্তি হইতে পৃথক্ ধরিয়াছেন। আমাদের ধারণা, কৃত্তিবাস এখানে 'সহোদর' ও 'ভাই' শব্দ পৃথগর্থে ব্যবহার করিয়াছেন—'সহোদর' তাঁহারা ছয় জনই (কৃত্তিবাস, শান্তি, মাধব, বলভদ্র, চতুর্ভুজ ও ভাস্কর) এবং বৈমাত্রেয় 'ভাই' দুই জন (মৃত্যুঞ্জয় ও শ্রীধর)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কুলপঞ্জীতে বনমালির নয় পুত্রের উল্লেখ আছে :—

"বনমালিকস্ত সন্দিগ্ধমুখরপণ্ডিতবিবাহঃ তত আর্ত্তি গাং পুরাই লভ্যবং শ্রীকরমিশ্র গং বনমালিজ ক্ষেম্য চং পাং বৃহস্পতি। তৎসুতাঃ মাধব শান্তি বলভদ্র মৃত্যুঞ্জয় জগোভাসো কৃত্তিবাসপণ্ডিত শ্রীনাথ শ্রীকান্তাঃ। (১৮১৫ খ পুথি, ৩৪৯ খ পত্র)।

লক্ষ্য করিতে হইবে, এখানেও মাধবকে শান্তি হইতে স্পষ্ট পৃথক্ ধরা হইয়াছে, এবং আত্মবিবরণীর 'ভাস্কর' কুলগ্রন্থসুলভ বিকৃতির ফলে 'ভাসো' হইয়াছে। সম্ভবতঃ অল্প বয়সে ভাস্কর গত হওয়ায় ধ্রুবানন্দ তাঁহার নাম জানিতে পারেন নাই। 'শ্রীধর' শ্রীকণ্ঠের পাঠান্তর ধরা যায় এবং শ্রীমান্ (ও জগো, শ্রীনাথ প্রভৃতি) হয় ত রামায়ণ রচনার পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাসের নূতন সম্বাদ

যে কুলপঞ্জীতে কৃত্তিবাসের সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। মহেশের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকার ন্যায় ইহা ধারাবাহিক পত্রাঙ্ক সহ লিখিত নহে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ পৃথক্ পত্রাঙ্ক দিয়া লিখিত এবং অধিকাংশই খণ্ডিত। খড়দহ-প্রকরণের শেষে একটি শ্লোক আছে :—

ইতি খড়দহকুলং সমাপ্তং।
শেখো ঘোষপ্রসূতোয়ং নাম্না ঘটককেশরী।
সন্ততিং মুখমুখ্যস্ত ব্যাখনং (?) কৃবিতং (?) খলু। (৩৭ খ পত্র)

ঘোষাল প্রকরণে এই ঘটকবংশের সম্পূর্ণ বংশাবলী লিখিত হইয়াছে (১৩-১৫ পত্র)—ইহারা বংশজ এবং "ঘটককেশরী" প্রথম কুলীন শিরো ঘোষালের অধস্তন ১৭শ পুরুষ। মিশ্রগ্রন্থে ঘোষালবংশের ১১।১২ পুরুষ পর্য্যন্ত নাম আছে, সুতরাং ঘটককেশরী আরও ৫।৬ পুরুষ পরবর্ত্তী ১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদের লোক। ফুল্যা প্রকরণে নবদ্বীপরাজ রঘুরামের কন্যা-বিবাহের উল্লেখ আছে, কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কন্যাবিবাহের উল্লেখ নাই—তদ্দ্বারাও ১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদে তাঁহার সময় নির্ণয় করা যায়। দক্ষিণরাঢ়ের অধুনালুপ্ত এক ঘটক-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বিধায় প্রচলিত কুলপঞ্জী হইতে বৈশিষ্ট্য হেতু ইহাতে কিছু কিছু নূতন বিবরণ পাওয়া যায়, যাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। দুঃখের বিষয়, কাগজের দোষে বর্ত্তমান প্রতিলিপিটির অনেক স্থল নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

মিশ্রগ্রন্থে ৬৪ সমীকরণে (৮১ পৃঃ) সমীকরণ-বহির্ভূত হইলেও গাঙ্গুলীবংশীয় মুরারির জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাবরের কুলকারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে; দুর্গাবরের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম গোপীনাথ। অতঃপর মিশ্রগ্রন্থে এই ধারার আর বিবরণ নাই। উল্লিখিত কুলগ্রন্থে গোপীনাথ প্রভৃতির কুলবিবরণ পাওয়া যায়। গোপীনাথের ৪ পুত্র "যদু রঘু সাতু সুরানন্দকাঃ।" যদুর বিবরণ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল (গাঙ্গুলিপ্রকরণ, ৮ ক পত্র) :—

"যদোলভা চট্ট পরমানন্দ পাটল্যা চতুর্ভুজসুত বশিষ্ঠপৌত্রঃ কেশবপ্রপৌত্রঃ, **ক্ষেৎ মুখ কালীদাস কৃর্ত্তিবাসপন্ডিতপৌত্রঃ বনমালিওঝাপ্রপৌত্রঃ শঙ্করসুত কির্ত্তিবাসসো নাসপূর্ব্বে,** চট্টহরি ধনো পিথাইগোদসুত ভত্তিত্বপূর্ব্বে. চট্টজনার্দ্দন বিভো রামাচার্য্যসুত বারমুণ্ডাবিষ্ণুপৌত্রঃ তৎসুতা রাম বাণীনাথ জগদীশকাঃ।"

এই প্রসঙ্গোক্তি হইতে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে তিনটি নূতন কথা জানা গেল। তাঁহার পুত্রের নাম শঙ্কর, পৌত্রের নাম কালীদাস এবং **বার্দ্ধক্যে কৃত্তিবাস কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন**। তাঁহার কৌলীন্যনাশের পূর্ব্বেই তাঁহার পৌত্রের কুলক্রিয়া (সম্ভবতঃ বিবাহ) সম্পাদিত হইয়াছিল এবং কৃত্তিবাস অন্যূন ৭০ বৎসর পরমায়ু পাইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, মিশ্রগ্রন্থে কিম্বা মহাবংশাবলীতে কৃত্তিবাসের কুলকারিকা নাই, যদিও তাঁহার দুই ভ্রাতা (শান্তি ও মৃত্যুঞ্জয়) এবং এক ভ্রাতুষ্পুত্র ভরত সমীকরণদ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাসকে উপেক্ষা করার কারণ এত দিনে আবিষ্কৃত হইল। কুলগ্রন্থে অনুসন্ধান করিলে কৃত্তিবাস কি ভাবে কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

উল্লিখিত কুলপঞ্জীর পাটুল্যা (চট্ট)প্রকরণে প্রসঙ্গতঃ কৃত্তিবাসের একটি কুলক্রিয়ার নির্দ্দেশ আছে। মিশ্রগ্রন্থের ৩৮ সমীকরণে (৪৪ পৃঃ) পাটুলির চট্টবংশীয় বিখ্যাত কুলীন কৃষ্ণের পুত্র কেশবের কারিকায় তাঁহার ৮ পুত্রের উল্লেখ আছে—৭ম পুত্র বামন। মিশ্রগ্রন্থে বামনের কুলবিবরণ নাই, মহাবংশাবলির প্রতিলিপিখানিতেও কৃষ্ণপ্রকরণে বামনের কুল পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঘটককেশরী বামনের অধস্তন ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত নামমালা দিয়াছেন :—

বামনস্যার্ত্তি মুখ কীর্ত্তিবাস পণ্ডিৎ তৎসুত বিজয় ইত্যাদি (পাটুল্যা, ১৪ ক পত্র)।

এখানে পূর্ব্বোদ্ধৃত লিপির ন্যায় বিবৃতি না থাকিলেও "পণ্ডিত" উপাধিধারী মুখ-বংশীয় কৃত্তিবাস ঐ যুগে অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই।

এক পুরুষে কত বৎসর ?

কৃত্তিবাসের জন্মকাল নির্ণয়ের সাহায্যকল্পে মধ্যযুগের রাঢ়ীয় কুলীন-সমাজে কত বৎসরে এক পুরুষ হইত, তাহার গড়পড়তা অবধারণ করা কর্ত্তব্য। আধুনিক যুগের মেলী কুলীনদের অবস্থা দৃষ্টে তাহা গণনা করিলে অত্যন্ত ভুল হইবে। মিশ্রগ্রন্থে এ বিষয়ে অসংখ্য সূত্র ছড়াইয়া আছে, যাহা ধরিয়া গণনা করা সম্ভব। আমরা ২।১টি দৃঢ় সূত্র ধরিয়া গণনা করিতেছি। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলির রচনাকাল ১৫০০ হইতে ১৫২৫ সনের মধ্যে সুনিশ্চিত। শেষ ১৫টি সমীকরণে (১০৩ হইতে ১১৭) যে সকল কুলীন সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রথম কুলীন হইতে ১০ম পুরুষ অধস্তন—কেবলমাত্র ২টি বংশে (খড়দহ মুখ ও ধনো চট্ট) ৯ম পুরুষ দেখা যায় (১০৫ সমীকরণ দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে, সমগ্র মিশ্রগ্রন্থে একটি মাত্র বংশে (ঘোষাল) ১১শ পুরুষ পাওয়া যায়। ১১৩ সমীকরণে ঘোষাল ভ্রাতৃপঞ্চক সম্মানিত হইয়াছেন (পৃঃ ১৩৮-৩৯) ; ইঁহাদের কারিকায় ইঁহাদের পুত্রদের নামোল্লেখ আছে। তাঁহারা ১২শ পুরুষ হইতেছেন এবং তন্মধ্যে ৩ জনকে 'কর্ম্মকুণ্ঠ' বলা হইয়াছে অর্থাৎ এই তিন জন কুলক্রিয়াসমর্থ বয়সে বিদ্যমান ছিলেন। শেষ ১১৭ সমীকরণের কাল ১৫০০ সনের পূর্ব্বে কিছুতেই নহে, আর ১১৩ সমীকরণ দশ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া থাকিলেও ১৪৯০ সনের পূর্ব্বে কিছুতেই হয় না। ১২শ পুরুষ ভ্রাতৃত্রয়ের বয়স তৎকালে ৩৫ ধরিলে তাঁহাদের জন্ম হয় ১৪৫৫ সনে : প্রথম কুলীন শিরো ঘোষালের জন্ম ১১২৫ সনের পরে নহে। গণনা দ্বারা ১ পুরুষে ঠিক ৩০ বৎসর হয়, ইহাই ন্যূন কল্পের পরমসীমা। মিশ্রগ্রন্থের বহুসংখ্যক বংশধারার মধ্যে এই একটি মাত্র বংশে কমাইবার চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াও এক পুরুষে ৩০ বৎসরের কম হয় না, যুক্তিযুক্ত গণনায় ৩২ বৎসর হইবে। শেষ সমীকরণের ১০ম পুরুষীয় কুলীনদের ধারায় গণনা দ্বারা এক পুরুষে ৩৫—৩৭ বৎসর পাওয়া যাইবে। ১০৫ সমীকরণস্থ ৯ম পুরুষীয় কুলীনের ধারায় বেশী পক্ষে চূড়ান্ত গণনায় এক পুরুষে ৪০ বৎসর হয়। ইহাই অধিক কল্পে পরমসীমা ধরিয়া মিশ্রগ্রন্থের ১০-১২ পুরুষব্যাপী গণনার ফলে একপুরুষে গড়পড়তা দাঁড়াইল ৩৫ বৎসর অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূন ৩ পুরুষে এক শতাব্দী। আমরা বাহুল্য ভয়ে অন্য গণনা পরিত্যাগ করিলাম।

কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ

আহিতের জন্মাব্দ ১১৩০ সনের পরে নহে। ৩৫ বৎসরে এক পুরুষ ধরিয়া কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ হয় ১৩৭৫ সন ; ৪০ বৎসরে ধরিলে হয় ১৪১০ সন। গড়পড়তা ধরিয়া গণনায়

কৃত্তিবাসের জন্মাব্দের অধস্তন সীমা ১৪১০ সনের পরে যাইবে না। মিশ্রগ্রন্থে ইহার পরিপোষক অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, আমরা কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পিতা বিষ্ণু (৫০ সমীকরণ) ও কৃত্তিবাসের পিতা বনমালী (৫৩ সমীকরণ) সমসাময়িক এবং প্রায় একবয়স্ক। বিষ্ণুর আট পুত্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ ধ্রুবানন্দের জন্মাব্দ প্রকারান্তরে গণনা করিয়া প্রায় ১৪২০ সন আমরা নির্ণয় করিয়াছি: বনমালীর ৮ পুত্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কৃত্তিবাস তদপেক্ষা ১৫।২০ বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া স্বাভাবিক।

পূতি শোভাকর ৬১ সমীকরণে সম্মানিত হইয়াছেন—৯ কুলক্রিয়া শেষ করিয়া ১৪৫৫ সনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তর্কস্থলে ঐ বৎসরই তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ৬১ সমীকরণের কাল ধরিয়া গণনা করা যাউক। ঐ সমীকরণস্থ পূতিবংশীয়দের পিতৃগণ ৩৯ সমীকরণে কুলীন ছিলেন এবং চট্ট মকরন্দের পিতা গণপতি ৪১ সমীকরণে গৃহীত অর্থাৎ এক পুরুষে ২০।২২টি সমীকরণ হইয়াছিল। এক পুরুষে ন্যূনকল্পে ৩০ বৎসর ধরিয়াও কৃত্তিবাস-পিতা বনমালীর ৫৩ সমীকরণের কাল হয় ১৪৪৩ সন। ১৪৩৩ সনে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়া থাকিলে পিতার সমীকরণকালে তাঁহার প্রথম পক্ষের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র কৃত্তিবাসের বয়স হয় মাত্র ১০।১১ বৎসর অর্থাৎ পুত্রকন্যার একটিরও সম্বন্ধ যোজনার বহু পূর্ব্বেই বনমালী কৌলীন্য-মর্য্যাদায় সমীকৃত হইতেছেন—কুলীন-সমাজে এইরূপ হওয়া অসম্ভব। যুক্তিযুক্ত গণনায় শোভাকরের মৃত্যুর ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সমীকরণমর্য্যাদার কাল ধরিয়া প্রায় ১৪২৫ সনে বনমালীর সমীকরণকালে কৃত্তিবাসের বয়স ২৫।৩০ ধরা যায় এবং ১৪শ শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁহার জন্মাব্দ খুঁজিতে হয়।

ঘটককেশরীর কুলপঞ্জী অনুসারে পাটুলির চট্টবংশীয় বামনের সহিত কৃত্তিবাসের 'আর্ত্তিত্ব' সম্বন্ধ ছিল। বামনের কোন কোন ভ্রাতা ৫৭ সমীকরণে (পৃঃ ৭০-৭১) সম্মানিত হইয়াছিলেন। বামনকে যদি ৬১ সমীকরণেও ধরা যায় এবং ১৪৫৫ সনই ঐ সমীকরণের কাল হয়, তথাপি (১৪৩৩ সনে জন্ম ধরিয়া) মাত্র ২২ বৎসর বয়সে কৃত্তিবাসের 'আর্ত্তিত্ব'রূপ প্রবীণ সম্বন্ধ অসম্ভব। পক্ষান্তরে ১৪৩০-৩৫ সনে বামনের মর্য্যাদাকাল ধরিয়া কৃত্তিবাসের জন্ম ধরা যায় প্রায় ১৩৯০ সনে।

কৃত্তিবাসের জন্মকালে তাঁহার পিতামহ মুরারি ওঝা জীবিত ছিলেন। আত্মবিবরণীতে পাওয়া যায়:—

দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ।

এই শ্লোকটির অর্থ দুর্ব্বোধ্য। কৃত্তিবাসের জন্মদিন শ্রীপঞ্চমী, তাহার দুই দিন পরে মাকরী সপ্তমী, তদুপলক্ষ্যে ফুলিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত কোন তীর্থে (যেখানে মহাদেব প্রতিষ্ঠিত) মুরারি ওঝার গমনেচ্ছা এখানে সূচিত হইতে পারে। কিম্বা, হয় ত কৃত্তিবাসের জন্মের অব্যবহিত পরেই মুরারি 'দক্ষিণযাত্রা' অর্থাৎ মহাযাত্রা করিয়াছিলেন। পঞ্চম পুত্র

বনমালীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মকালে মুরারির বয়স যদি অধিককল্পে ৮৩ ধারা যায়,[১৬] তাহা হইলেও কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৩৩ সনে হইলে মুরারির জন্ম হয় ১৩৫০ সনে। আহিত হইতে মুরারি পর্য্যন্ত (এক শিয়ো ব্যতীত) সকলেই জ্যেষ্ঠ পুত্র, তৎস্থলেও এক পুরুষে ৪০ বৎসর ধরিয়া মুরারির জন্মাব্দ ১৩৩০ সন হইবে। ১৩৫০ হইলে গড়পড়তা দাঁড়ায় এক পুরুষে ৪৪ বৎসর অর্থাৎ ২ ট্ট পুরুষে এক শতাব্দী এবং তাহাও জ্যেষ্ঠানুক্রমিক বংশধারায়। সুতরাং কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৩৩ সনে প্রতিপন্ন করিয়া কংসনারায়ণের সভায় তাঁহাকে স্থাপন করিতে হইলে সমগ্র কুলশাস্ত্র, আত্মবিবরণীখানি ও পুরুষকালের গড়পড়তা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

আত্মবিবরণীর 'পুণ্য মাঘ মাস' পাঠ ধরিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩৯৯ সনে (১৩২০ শকাব্দ) কৃত্তিবাসের জন্ম নির্ণয় করিয়াছেন।[১৭] আমরা ১৩৭৫ হইতে ১৪০০ সন মধ্যে গণনাদ্বারা ৪টি বৎসরেই ঐ যোগ পাইয়াছি। যথা,

(১) ১৩৭৫, ৭ জানুয়ারি = ১১ মাঘ রবিবার, শুক্লা পঞ্চমী ৪৮।৪৫ পল।
(২) ১৩৭৯, ২৩ ঐ = ২৭ ঐ ঐ ঐ ৪২।৪৭ পল।
(৩) ১৩৮৯, ৩ ঐ = ৭ ঐ ঐ ঐ ১৫।২৪ পল।
(৪) ১৩৯৯, ১৩ ঐ = ১৭ ঐ সোমবার ঐ ৫।২০ পল।
(রবিবার চতুর্থী ৩।৫০ পল মাত্র)।

প্রথম তিন অব্দে ষষ্ঠীযুক্ত পঞ্চমীতেই ৺সরস্বতীপূজা ঘটিয়াছিল। রাজা গণেশের সভায় উপস্থিতিকালে কৃত্তিবাসের আনুমানিক বয়স সম্বন্ধে মতভেদ হইবে। কৃত্তিবাস "পণ্ডিত" তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে একমাত্র উপাধিধারী ব্যক্তি ছিলেন এবং ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীতে অনধিক ৮ বৎসর মধ্যে সকল শাস্ত্র নিয়মপূর্ব্বক গুরুর নিকট পাঠ করিয়া শেষ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। আমরা তজ্জন্য ১৩৮৯ সনেই তাঁহার জন্মাব্দ অবধারণ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করি।

১৬। প্রবন্ধলেখক পিতার ষষ্ঠ সন্তান, প্রবন্ধলেখকের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মকালে তাঁহার পিতার বয়স ছিল ৬৪।

১৭। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪০, পৃঃ ১৩-১৪।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৭

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেক্রেটরী

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সেক্রেটরী-রূপে প্রধানতঃ এক জন সাহেব কলেজের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। তিনিই শিক্ষা-বিভাগের সহিত কলেজ-সংক্রান্ত পত্রাদি ব্যবহার করিতেন। ১৮৫১ সনের পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপ্যাল বলিয়া কোন পদের সৃষ্টি হয় নাই; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ। তাঁহার পূর্ব্বে সেক্রেটরী-রূপে সংস্কৃত কলেজে যাঁহারা কার্য্য করিয়াছিলেন, কলেজের পুরাতন নথিপত্র-দৃষ্টে তাঁহাদের কার্য্যকাল-সমেত একটি তালিকা দিতেছি।

১। **মেজর এ. প্রাইস্**·· ইনিই সংস্কৃত কলেজের প্রথম সেক্রেটরী। কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২৪ সন হইতে ১৮৩২ সনের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ইঁহার কার্য্যকাল; এই পদের বেতন ছিল মাসিক ৩০০৲।

২। **এইচ. এইচ. উইলসন**···প্রাইস সাহেবের স্থলে স্থায়ী ভাবে কেহ নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উইলসন সাহেব প্রায় এক মাস সেক্রেটরীর কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন।*

৩। **লেফ্টেনাণ্ট এইচ. টড**···মেজর প্রাইসের স্থলে লেঃ টড্ (Todd) স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৩২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগ হইতে পরবর্ত্তী মার্চ মাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া পরলোকগমন করেন। ইঁহারও বেতন ছিল মাসিক ৩০০৲।†

৪। **এইচ. এইচ. উইলসন**··টড্ সাহেবের স্থলে স্থায়ী ভাবে কেহ নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উইলসন সাহেব দেড় মাস সেক্রেটরীর কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন।

৫। **ক্যাপ্টেন এ. ট্রয়ার**···লেঃ টডের স্থলে হিন্দুকলেজের সেক্রেটরী ক্যাপ্টেন ট্রয়ার (Troyer) মাসিক ৩০০৲ বেতনে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন।‡ তাঁহার কার্য্যকাল—১৮৩২ সনের মে মাসের মধ্যভাগ হইতে ১৮৩৫ সনের ২৬এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত।

* "The final departure of the Secretary for the Sanscrit College Major Price from Calcutta agreeably to the intimation conveyed in his letter of the 30th of last month [December] took place on the 17th instant [ultimo] and no person having been appointed to succeed him, I have assumed charge of the College from that date. With your permission I will continue the charge of the College until a successor to Major Price is appointed."—Letter, dated 12th Feb., 1832 from H. H. Wilson to the Sub-Committee of the Government Sanscrit College.

† " . . . I am also desired to instruct you to take charge of the Institution."—Letter, dated 13th Feb., 1832 to Lt. H. Todd.

‡ "I am directed to inform you that the Hon'ble the Vice-President in Council has this day been pleased to appoint Capt. A. Troyer, Secretary to the Hindoo College in the room of Lt. Todd deceased."—Letter, dated 8th May, 1832 from H. T. Prinsep, Secretary to Government to the General Committee of Public Instruction.

৬। **রামকমল সেন**…ট্রয়ারের পদত্যাগের তারিখ (২৬ ফেব্রুয়ারি) হইতে রামকমল সেন অস্থায়ী ভাবে সেক্রেটরীর কার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে হিসাবরক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষা-বিভাগ ১১ জুন ১৮৩৫ তারিখে রামকমলকে মাসিক ১০০৲ বেতনে স্থায়ী ভাবে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করেন। প্রায় চারি বৎসর কার্য্য করিবার পর ১ জানুয়ারি ১৮৩৯ তারিখে রামকমল এই পদ ত্যাগ করেন।

৭। **রাধাকান্ত দেব**…রামকমল সেন কিছু দিন কার্য্যে অনুপস্থিত ছিলেন। সেই সময় রাজা রাধাকান্ত দেব অস্থায়ী ভাবে সেক্রেটরীর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল প্রায় চারি মাস—১৮৩৬ সনের ১৩ ডিসেম্বর হইতে ১৮৩৭ সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত।

৮। **জে. সি. সি. সদর্ল্যাণ্ড**…১ জানুয়ারি ১৮৩৯ তারিখে রামকমল সেন পদত্যাগ করিলে সদর্ল্যাণ্ড (Sutherland) সাহেব প্রায় তিন মাস সেক্রেটরীর কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

৯। **মেজর জি. টি. মার্শাল**…২৭ মার্চ ১৮৩৯ তারিখে মাসিক ১০০৲ বেতনে মার্শাল (Marshall) সাহেব সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন।* তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরীও ছিলেন। এই পদে তিনি ১৮৪০ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মার্শাল সাহেবের রচিত একখানি বই পরিষদ্ গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি ; বইখানির নাম—

Guide to Bengal: Being a close translation of Ishwar Chandra Sharma's Bengallee Version of that portion of Marshman's History of Bengal, which comprizes the rise and progress of the British Dominion, with notes and observations. (1850).

১০। **ডাঃ টি. এ. ওয়াইজ**…১৮৪০ সনের মে মাস হইতে পর-বৎসরের এপ্রিল মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ডাঃ ওয়াইজ (Wise) সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটরী-রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

১১। **রসময় দত্ত**…১৭ এপ্রিল ১৮৪১ তারিখে মাসিক ১০০৲ বেতনে ছোট আদালতের জজ রসময় দত্ত স্থায়ী ভাবে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই পদে তিনি প্রায় ১০ বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৬ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখে বিদ্যাসাগরকে কার্য্যভার বুঝাইয়া দেন।

১২। **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**…৬ জানুয়ারি হইতে ২১ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখ পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের (সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ ছাড়া) অস্থায়ী সেক্রেটরীর কার্য্যও করিয়াছিলেন।

অতঃপর সেক্রেটরী ও অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদ রহিত করিয়া প্রিন্সিপ্যাল পদের

---

* "... I have this day taken charge of the office of Secretary to the Government Sanscrit College."—Letter, dated 27th March, 1839 from G. T. Marshall, Secretary, Sanscrit College, to T. A. Wise, Secretary, General Committee of public Instruction.

সৃষ্টি হয়। ১৮৫১ সনের ২২ জানুয়ারি হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাসিক ১৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন।

বাংলা শ্রেণী

১৮৩৮ সনে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে বাংলায় পাটীগণিত ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিবার কথা উঠে। এ-বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী রামকমল সেন ৩১ আগষ্ট ১৮৩৮ তারিখে জেনারেল কমিটি অব পাব্‌লিক ইন্‌ষ্ট্রাকশ্যনকে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

3. The Sub-Committee thinks it is desirable that something should be done to give a more popular tone to the minds and pursuits of the students. It fully concurs too in this that the study of arithmetic should be made general. It thinks also that the various works on European Natural Philosophy Geography and History translated into Bengali should be studied in class and that provision should be made for instruction in the Regulations and Forensic practices.

১২ মার্চ ১৮৩৯ তারিখে ইংরেজী-শ্রেণীর ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক নবকুমার চক্রবর্ত্তী বাংলায় পদার্থবিদ্যা ও পাটীগণিত শিক্ষা দবার জন্য মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। পরবর্ত্তী ২৭এ মার্চ তারিখে শিক্ষা-কমিটি নবকুমারের নিয়োগ মঞ্জুর করিয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী মার্শাল সাহেবকে লেখেন :—

. . . I am directed to state that the General Committee has been pleased to appoint Baboo Nubokumar Chuckrobutty as Bengalee teacher of Arithmetic and Natural Philosophy on a monthly salary of 80 Rupees. He will be required to deliver his lectures on Natural Philosophy in the Bengalee language according to the European system.

নবকুমার সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ভূগোল ও কোম্পানীর রেগুলেশ্যনগুলি শিখাইবার অনুমতি চাহিয়া পরবর্ত্তী ১৩ই জুলাই সেক্রেটরী মেজর মার্শালকে লেখেন :—

I would beg the favour of your asking the Hon'ble President and Members of the Sub-Committee to grant me permission to teach the students of the Sanscrit College the principles of Geography which they have not in Sanscrit as well as of Company's Regulations which they so much wish to learn in addition to Natural Philosophy and Arithmetic.

১৮৪২ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত চলিয়া সংস্কৃত কলেজের বাংলা-শ্রেণী উঠিয়া যায়। ইহার পরিবর্ত্তে পুনরায় ইংরেজী-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংরেজী শ্রেণী

কলিকাতা গবমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা দিবার জন্য ১ মে ১৮২৭ তারিখে **এম. ডবলিউ. ওলাষ্টন** (M. W. Wollaston) নামে এক জন সাহেবকে মাসিক ২০০৲ বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ইহা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় ছিল না। ক্রমে ক্রমে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই শ্রেণীর জন্য আরও দুই জন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৪ এপ্রিল ১৮৩০ তারিখে **গঙ্গাচরণ সেন** মাসিক ৫০্ বেতনে এই শ্রেণীর প্রথম সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৩৫ সনের মে মাস হইতে গঙ্গাচরণের স্থলে **শ্যামলাল সেন** ৫০্ বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইংরেজী শ্রেণীর দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষক-রূপে **নবকুমার চক্রবর্ত্তী** ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ তারিখে মাসিক ৪০্ বেতনে নিযুক্ত হন। নবকুমার হিন্দুকলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষও ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী শ্রেণীর তিন জন শিক্ষক—ওলাষ্টন, গঙ্গাচরণ ও নবকুমার কর্ত্তৃক ১৮৩৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম পক্ষে 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহ' নামে একখানি দ্বিভাষিক পাক্ষিক (পরে মাসিক) পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে।

১৮৩৫ সনের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরেজী শ্রেণী উঠিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা-বিভাগ ২৩ নবেম্বর ১৮৩৫ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রামকমল সেনকে লেখেন :—

The General Committee directs me to acknowledge your letter of the 13th instant and its enclosures.

Satisfied of the inutlity of the English Department of the Sanscrit College it will recommend to Government its immediate abolition. No time should be lost therefore by you in giving the masters warning that their salaries will cease on the 31st December.

The General Committee is of opinion that the plan suggested by me of introducing into the Hindoo College from time to time a few young Pundits to prosecute a course of English studies may be attended with useful results and requests the experiment may be made.

It seems desirable that the selection should fall in some of the younger pupils of the Sanscrit College who have evinced by their successful cultivation of Sanscrit Literature habitual application combined with the talents and general aptitude to learn.—Letter, dated 23rd Nov., 1835 from J. C. C. Sutherland, Secretary, General Committee of Public Instruction.

১৮৪২ সনের অক্টোবর মাসে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শ্রেণী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই শ্রেণীতে দুই জন শিক্ষক নিযুক্ত হন :—

রসিকলাল সেন

১ অক্টোবর ১৮৪২ তারিখে রসিকলাল মাসিক ৯০্ বেতনে ইংরেজী শ্রেণীর হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন। তিনি হিন্দুকলেজের এক জন কৃতী ছাত্র। সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রের মধ্যে তাঁহার "Previous Appointments" সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে :—

A Translator of the Smuggled Salt Cases in the Tumluk Salt Agency and subsequently a Writer under J. Ward in 1834 and 1835 the Head Master of the Midnapoor School and 1835 to 1837 ?) to 1842 to the same of Earl Auckland's School at Barrackpore.

রসিকলাল সেন ১৮৫৩ সনের অক্টোবর পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে ছিলেন।

শ্যামাচরণ সরকার

১ অক্টোবর ১৮৪২ তারিখে মাসিক ৭০্ বেতনে শ্যামাচরণ সরকার ইংরেজী শ্রেণীর দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে তিনি পাঁচ বৎসর মাদ্রাসা কলেজের বাংলা-শিক্ষক ছিলেন।

শ্যামাচরণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ পরিষদ্ গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি।—

(১) বাঙ্গলা ব্যাকরণ—শ্যামাচরণ শৰ্ম্ম। ১২৫৯ সাল।

(২) ব্যবস্থা দর্পণ—শ্যামাচরণ শৰ্ম্ম-সরকার। ১৮৫৯।

নবীনচন্দ্র পালিত

শ্যামাচরণ সদর দেওয়ানী আদালতের পেশকারের পদ লাভ করিলে, তৎপদে ২২ মার্চ ১৮৪৮ তারিখে মাসিক ৭০৲ বেতনে হিন্দুকলেজের ছাত্র নবীনচন্দ্র নিযুক্ত হন।

রাজনারায়ণ বসু

নবীনচন্দ্র পালিতের পর রাজনারায়ণ বসু ১২ মে ১৮৪৯ তারিখ হইতে মাসিক ৭০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১ তারিখ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর তিনি মেদিনীপুর স্কুলের হেডমাষ্টার হন।

বিশ্বনাথ সিংহ

ইংরেজী-শ্রেণীর দ্বিতীয় শিক্ষক রাজনারায়ণ বসু পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে ৯ এপ্রিল ১৮৫১ তারিখে বিশ্বনাথ সিংহ নিযুক্ত হন। বিশ্বনাথ সিংহের "Previous Appointments" সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে প্রকাশ :—

Assistant English Master at the Hindu College from May, 1841 to September, 1847—the same at the Normal School from September, 1847 to October, 1849. Supernumerary Master at the Hindu College from November, 1849 to May, 1850—Assistant English Master at the Hooghly College from June, 1850 to 7th April, 1851.

*　　*　　*

১৮৫৩ সনের জুলাই মাসে কাউন্সিল-অব-এডুকেশন সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী শ্রেণীটি নূতন করিয়া গঠন করিবার সঙ্কল্প করেন। ইহার জন্য ইংরেজী-শ্রেণীর শিক্ষকদিগকে অন্যত্র বদলি করার প্রয়োজন হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার পর তাঁহাদিগকে অন্যত্র বদলি করা হয়। ইংরেজী শ্রেণীর পরবর্ত্তী ইতিহাস আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত নহে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.

[পাঠভেদ নির্ণয়—২য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—২৬
বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেল নিজবাসে	ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব গেল নিজ নিজ বাসে
নিত্য সখী আসি—	নিজ সখী—
ডাকিনী যোগিনী আদি—	চৌষট্টি যোগিনী আইলা—

সিদ্ধি উদ্ঘটন

বড় আনন্দ উদয়	আজি বড় আনন্দ উদয়
রায় গুণাকর কহে পুটকর	রায় গুণাকর কহে নিরন্তর
মোরে যেন দয়া হয়।	আমায়ে যেন দয়া রয়।
...	...
—ফেঁকো	—ফাকা
—ভেকো	—ভাকা
—ঘোটনা কুঁড়া—	—ঘোটনা খুড়্যা
...	...
সতী নিবসতি এল—	সতী আইলা বসতি—
...	...
আজি হৈল ইষ্ট সিদ্ধি—	আজি হৈল হৃষ্ট মন—
	পুথির পত্র—২৭
মউরী মরিচ লঙ্গ প্রভৃতি মসলা	মহরি মরিচ আদি জতেক মসলা
	একেত্র সকল দিয়া রশলা করহ।
	ভুঞ্জিবে মনের মত কামনা পুরহ॥
	(এই দুই ছত্র মুদ্রিত পুস্তকে নাই)
—ঘোটনা কুঁড়া—	—ঘোটনা কুড্যা (কুড়্যা ?)
পাকে পাকে ঘোটনায়—	তাকে পাকে—
...	...

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—২৭
সিদ্ধি ভক্ষণ	
মহাদেব আঁখি ঢুল ঢুল।	মহাদেবের তিন আখি দেখি ঢুল ঢুল।
নহ নন্দী ইত্যাদি	সদয়েতে কন নন্দী দেও আসি কোল
...	...
ভবানী ভাবেন ভবভাবভরাকুল	—ভবভাবেতে আকুল
...	...
বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন	জপেন বিজয় বীজমন্ত্র পঞ্চানন
—মন্ত্র পড়িয়া অশেষ	—মন্ত্র পড়িল বিশেষ
—পিয়া করিল নিঃশেষ	—প্রায়—
হুঙ্কার ছাড়িয়া বসে—	হুহুঙ্কার ছাড়ি বৈশে—
...	...
ভাল বলে—	ভালো বলে—
...	...
—আন দেখি তাই	—আন দেখি খাই
...	...
শঙ্কর কহেন সতি সবারে ডাকাও	শঙ্কর বলেন নন্দী—
সাবধানে কেহ যেন না হয় বঞ্চিত।	সভে লৈয়া খাও জেন না হয় বঞ্চিত।
হরগৌরীর কথোপকথন	
	পুথির পত্র—২৮
আমারে ছাড়িও না ভবানী।	আমারে দয়া ছাড়িয় না গো।
এবার পাথারে—	এ ঘোর পাথারে—
—যেন খেলা দিলা	—যেন খেলা দোলা
তেমন এখানে খেলিও না।	তেমন এ খেলা খেলিও না।
...	...
ভারতে এ ফেরে-	ভারতে এ ফাঁদে ফেলিও না গো।
বিনয়ে দেবীর প্রতি—	বিনয় প্রণয়—
—সকল বিশ্বসার	—কারণবিশ্বসার

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—২৮
—তোমার দেখা পানু আরবার।	—তোমারে আমি পানু আরবার।
সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর ॥	সত্য কর আমারে না ছাড়িবেক আর ॥
—এখন কি হয়।	—এমন কি হয়।
...	...
—মৃত পতি অঙ্গে পুড়ে মরে।	—মৃত পতির সঙ্গে পুড়্যা মরে।
	পুথির পত্র—২৯
দশ হাত তোমার আমার দুই হাত	দশ হাত আমার তোমার আট হাত
হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন	হরগৌরী একতনু ইথে নাহি আন
	("দুই জনে সহাস্যবদনে রসরঙ্গে" ইত্যাদি দুই ছত্র পুথিতে "আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র" এই ছত্রের ঠিক পূর্ব্বে আছে।)

হরগৌরীর রূপ

এ কি নিরুপম	কেশ নিরুপম
শ্বেত পীত কায়	শ্বেত রক্ত কায়
...	...
আধ গলে শোভে গরল কালা	আধ কণ্ঠে সাজে গরল কালি
...	...
আধ মুখে ভাঙ্গ ধতুরা	—ধুতুরা ভক্ষণ
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু ইত্যাদি	কাজলে রঞ্জিত এক নয়ান, ভাঙ্গে ঢুলু ঢুল আর লোচন, আধ ভালে শোভে সিন্দুর চন্দন, আধ হরিতাল পুরি রে।
	...
মিলন হইল বড়ই সাধে	মিলি এক হৈল—
—এক অবাধে	—এক আরাধে
হইল প্রণয় করি রে।	হৈমবতি চরি রে।
...	...
শোভ দিল বড় মিলিয়া বাস	—মিলিয়া বসি
—গঙ্গাসরসী	—গঙ্গা শিরসি
...	...
হরগৌরী বিয়া হৈল সায়	—বিভা পালা হৈল সায়

কৈলাস বর্ণন

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩০
ইন্দুরে পোষে বিড়াল	ইন্দুর পোষে বিড়ালে
...	...
কেহ নাহি হিংসে কারে	কেহ না হিংসয়ে কারে
...	...
কেবল সুখের মূল	সকল সুখের মূল
...	...
—সুখের সাগর	—সুধার সাগর
(বঙ্গবাসী সং—সুধার সাগর	
...	
বিধি বিষ্ণু অগোচর	বিধি বিষ্ণুর গোচর
ভারত ব্রাহ্মণ করে নিবেদন	কহে সুবচন ভারত ব্রাহ্মণ

হরগৌরীর বিবাদ সূচনা

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র
বিধি মোরে ইত্যাদি	দারুণ বিধি মোরে লাগিল২ বাদে।
বিধি যার বিবাদী…সাধে	বিধি জারে বিবাদিত কি করে তার সাধে।
—যত করি ছন্দোবন্ধ	—কত মত করি ছন্দ
…তবু তাই সাধ	—তমু তাহে সাধ
...	...
—সে মজে বিষাদে	—সে ঠেকে বিবাদে
—মেগে	—মাগ্যা
—লেগে	—লাগ্যা
	পুথির পত্র—৩১
পরম্পর পরম্পর শুনি এই সূত্র	পরম্পর লোকমুখে শুনি এই সুত্র

হরগৌরীর কোন্দল

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র
আপনি মাখেন ছাই	হর আপনি—
...	...
—কথা কৈতে ভয় হয়	—কহিতে ভয় নাহি হয়
—হেন ঘরে দিল বিয়া	—ভিক্ষুকেরে দিল বিয়া

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩১
শুনিলি বিজয়া ইত্যাদি	শুন লো—
—নাম হৈল চণ্ডী ॥	—হইলাম চণ্ডী ॥
—না দেখি সীমা—	—না দেখি লেশ—
কড় পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।	কড়া পড়িয়াছে তাহে অন্নবস্ত্র দিতে।
কেন সব কটুকথা কিসের লাগিয়া ॥	কেনে সভ কটুকথা কহেনাশ্চর্ম্বিতে ॥
	(কহেন আচম্বিতে ?)
...	...
—পূর্ব্বকালী ধন কই।	—পূর্ব্বকার ধন কই।
...	
বড় পুত্র গজমুখে—	বড় পুত্র গজানন—
(মুদ্রিত পুস্তকে—"সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান" এই ছত্রের পরেই "ভিক্ষা মাগি খুদ কণা যা পান ঠাকুর। তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর ॥" এই দুই ছত্র আছে। পুথিতে ইন্দুর সম্বন্ধীয় দুই লাইন, কিছু পরে একটু পরিবর্ত্তিত আকারে আছে।	(পুথিতে—"বাপের সমান" ইহার পরেই কার্ত্তিকের বর্ণনা) ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয়…খান। উপায়ের সীমা নাহি ময়ুরে শিখান ॥ নিম্নোক্ত দুই ছত্র মুদ্রিত পুস্তকে নাই :— ধনু বান হাতে করি সদাই বেড়ান। খাইতে বাপের সাপ মউরে শিখান ॥ ইহার পরে— ভিক্ষা করি সদা যাহা আনেন ঠাকুর। গনাইর ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর ॥
	পুথির পত্র—৩২

শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ

ঘর উজারিয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব	এ ঘর তেজিয়া যাব ভিক্ষা করিয়া খাইব
..	...
নিষেধ করিয়া কহে জয়া ॥	বিশেষ করিয়া কহে জয়া ॥

জয়ার উপদেশ

খেয়াতি হবে কাঙ্গালী ॥	ক্ষাত হইবে কাঙ্গালী
...	...
অন্ন দেহ কয়ে	অন্ন খাবে চায়্যা ॥

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩৩
রহিতে না দিবে কাছে	রহিতে নারিবে লাজে
. .	. . .
ভাজে দিবে সদা তাড়া	দে খ সভে দিবে তাড়া
. . .	. . .
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া	যদি দেখে অন্নছাড়া
	. . .
তিন ভূমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে	এ তিন ভুবনে যেখানে যেখানে
এই স্থানে দেহ ভক্ষ্য	এইখানে সর্ব্ব ভক্ষ
. .	. . .
কোথাও না পেয়ে অন্ন	কোথাও অন্ন না পাইয়া
. . .	. .
হইয়া অতি বিষন্ন	তোমার এ গুণ গাহিয়া
তন্ত্রে	তন্ত্র
মন্ত্রে	মন্ত্র
. . .	. . .
হইবে লক্ষ্মী অচলা	হইয়া রবে অচলা
. . .	. . .
সব হবে পাছে	সব কবো পাছে
	পুথির পত্র—৩৪

অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি ধারণ

কত মায়া কর কত কায়া ধর	—সর্ব্ব দুঃখ হর
ছাড় ছাড় মায়া	ছাড়ি দেও মায়া
দেবদেবী ভুজঙ্গ কুরঙ্গ আদি যত	—ভুজঙ্গ কিন্নর
. . .	. . .
ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি সাগর সাগর।	ঘৃত দধি দুগ্ধ আদি সাগরে সাগর।
কে রান্ধে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায়।	কেহ রান্ধে কেহ বাড়ে কেহ২ খায়।
কোলাহল গণ্ডগোল কহা নাহি যায়॥	কি হইল গণ্ডগোল কহন না জায়॥

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩৪

শিবের ভিক্ষাযাত্রা

	শিঙ্গা ডম্বরু হাড়ের মালা গঙ্গাধর বহিশাজেলা (?)+ধুয়া। (মুদ্রিত পুস্তকে নাই)
ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া	এথায়ে ত্রিদেশনাথ—
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিলে	ডিমিমি২ ডিমি—
...	...
—যত রঙ্গ চিঙ্গা	—যত রিঙ্গা ডিঙ্গা
...	...
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল ॥	কেহ আনি দেয় ভাঙ্গ আফিঙ্গ গরল
...	...
চেতরে চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ	—চিত ডাকে চেতানন্দ।

শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ

গুমান হইল গুঁড়া	পরিতাপে হইল বুড়া
...	...
	পুথির পত্র—৩৫
হেদে লক্ষ্মী	আজি লক্ষ্মী
...	...
তবু অন্ন নাহি পাই	—তমু ভিক্ষা নাহি পাই
...	...
—লক্ষ্মী করি দিলা ভেদ	—লক্ষ্মী কহি দিলা ভেদ
এ বড় মায়ার পরমাদ	ঘরে যাও না ভাব প্রমাদ
...	...
কৈলাসে রহিলা গিয়া	কৈলাসে কহিলা গিয়া
...	...
দেখি অন্নদার ক্রীড়া ইত্যাদি	দেখি অন্নদার সজ্জা শিবের হইল লজ্জা ভাব কিছু না পান ভাবিয়া।
স্থানু স্থানু হইলা ডরে	স্থানে স্থানে হৈল ডরে
	...
ভারতের উপরোধে বিসর্জ্জন দিয়া ক্রোধে	বিসর্জ্জন দিয়া ক্রোধে ভারতের উপরোধে

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩৫

শিবকে অন্নদান

অন্ন খান শিব সুখ সম্পন্ন	অন্ন খান শিব হৈয়া সম্পূর্ণ ("পায়স পয়োধি সপসপিয়া" হইতে "নাচেন শঙ্কর ভাবে ভুলিয়া" পর্য্যন্ত ৮ ছত্র পুথিতে "মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা" ইহার পরে আছে।)

অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য

	পুথির পত্র—৯
জয় জগদীশ ...	
পরিহর মায়া অব অবিলম্বে যদি কর মমতা ইত্যাদি	পরিহরি মায়া ভব অবিলম্বে যদি তব মমতা হত হয়ে যমতা দেবী ভূবী সমতা গুহ হেরম্বে।
(মুদ্রিত পুস্তকের "তব জন যেবা, সুরপতি কেবা" ইত্যাদি ৬ ছত্র পুথিতে নাই।)	(এইখানে ধূয়া শেষ)
হরিয়া যতেক মায়া মহামায়া হাসি।	হরিলা যতেক মায়া মনে মনে হাসি।
বিধি হরিহর তার করয়ে কামনা	বিধি——————কি করে মাননা ("পরলোকে মোক্ষ পায় শিবের লিখন" এই ছত্রের পরেই "শিবের শিবত্ব" ইত্যাদি। মুদ্রিত পুস্তকের "অন্নপূর্ণা মহামায়া" ইত্যাদি ৪ ছত্র পুথিতে নাই।)
দক্ষসুতা দাক্ষায়ণী দারিদ্র্যদলনী।	দাক্ষায়ণী দক্ষসুতা দানবদলনী।
হৈমবতী হরপ্রিয়া হেরম্বজননী (পুস্তকে ইহার পরে যে দুই লাইন আছে, তাহা পুথিতে নাই)	হৈমবতী—হেরগ (গো) জননী।
হেরি হাহাকার হর হরিণহরিণি কামরিপু—কামনা	হেরি হাহাকার হর হেরি নিহারিণি —কামদা—
করুণা কটাক্ষ কর কিছু কৃপা করি॥	করুণা করিয়া রক্ষা কর কৃপা করি॥
রাজার আনন্দ কর রাজ্যের কুশল।	রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের মঙ্গল।

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩৬
যে শুনে এ নীত তার করহ মঙ্গল ॥	যে স্থানে—কুশল ॥
গায়নে গায়নে মাগো মাগি এই বর।	গায়েনের মনে মাগ (মাগো) মাগি এই বর।

শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা

পুণ্যভূমি বারাণসী—	ধন্য তুমি বারাণসী
মহিমা কহিতে কে বা জানে (বঙ্গবাসী সং—কে বা পারে)	—কে বা পারে
...	
তীর্থ তিন কোটি সাড়ে ইত্যাদি	তীর্থ সাড়ে তিন কোটি দেবতা ছত্রিস কোটি সর্ব্বদা করেন অধিষ্ঠান।
মহেশ্বর রাজধানী—	মহেশের রাজধানী—
	পুথির পত্র—৩৭
...	...
শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত—	শিবলিঙ্গ সঙ্গমিত—
...	...
দেবতা কিন্নর নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর তপস্যা করয়ে মোক্ষ আশে।	—ঋষি দৈত্য বিদ্যাধর অপ্সরা করয়ে মোক্ষ আশ।
...	...
অনেকের হৈল বাস—	অনেক রহিল বাস
...	...
—অন্নজীবী হবে তারা	—অন্নজীবী সভে তারা
...	...
এত ভাবি ত্রিলোচন—	এত বলি ত্রিলোচন—

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি

ভাবি ভাবি চিতে—	ভব ভাবি চিতে—
—কহিলা বিস্তর	—কহিল সত্বর
বিধির সন্ধান অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ	বিবিধ বন্ধনে অপূর্ব্ব নির্ম্মাণে
দিনে দিনে ক্ষীণ—	দিনে মাজা (?) ক্ষীণ—

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩৭
মণিকরিকর—	মণিকনিকর—
...	...
—মাজা ক্ষীণী	—মাজাখানি
সুখসরোবর—	শোভা সরোবর—
...	..
কানের কুন্তল—	গায়ের কুন্তল—
...	...
—কেশমল্লীমালে	—কেশমুক্তি মালে

অন্নপূর্ণার পুরী নির্ম্মাণ

	পুথির পত্র—৩৮
	দেখরে আনন্দ কানন শোভা।
	সরোবর মনোহর মহেশের মনোলোভা ॥
...	(মুঃ পুস্তকে এই দুই ছত্র নাই)
মাণিকে বান্ধিলা ঘাট দেখিতে সুন্দর।	মাণিক্যে বান্ধিল চারু দেখিতে সুন্দর।
...	...
দিয়া কৈল চারি পাশ—	— চারি পাড়ে—
তুলিলা পাতালে গঙ্গা—	তুলিল পাতাল-গঙ্গা—
সুশীতল সুবাসিত গভীর নির্ম্মল ॥	সুশীতল সুগভীর বাসিত নির্ম্মল ॥
—সুরঙ্গ চরণ ॥	—সুরঙ্গ বদন ॥
—গড়িল কমল।	—গড়িল উন্নমল (?)
নীলমণি দিয়া গড়ে—	নীলকান্তমণি গড়ে—
কাদাখোঁচা দলপিপী কামিকোড়া কঙ্ক।	কাদাখোচা জলফেফি কামিকোড় কঙ্ক।
পানিতর বেনে বউ—	পানিতর বাস্থারুই—
চিতল ভেকুট—	চিতল ভেকটী—
বানি লাটা গড়ই উষ্কা শউল শাল	বান নেটা গড়ই ফলই সইল সাল।
গুঁতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোল চেঙ্গা ॥	গুতিয়া ভাঙ্গান বালি ভোলা ভেল চেঙ্গা
মাগুর গাগর আড়ি—	—আতি—

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩৮
কাল বস্থ বাঁশপাতা শঙ্কর ফলুই ॥	কালবাউশ বাসপাতা সহুক ফলই ॥
গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিসা।	গঙ্গদাড়া ভেদা টেপা টেঙ্গরা খলিশা
খরশুলা তপসিয়া—	—তপস্যা—
—পুন্নাগ কেশর।	—পলাস কেশর।
...	...
শেহুলী···রঙ্গন।	সিহলি পারুলী দনা পিয়ালী রঙ্গন।
মালতী···মল্লিকা কাঞ্চন ॥	—কান্দকা কাঞ্চন ॥
	(কন্দিকা ?)
জবা যুথী···মোহন।	অপরাজিতা জুতি জাতি চন্দ্রমল্লিকা
চন্দমণি·· সুশোভন ॥	চন্দমণি সূর্য্যমণি গন্ধেতে অধিকা ॥
...	...
পারিজাত মধুমল্লী ঝাঁটি মুচুকুন্দ।	—অতসী মল্লিকা ঝুটি মুচকুন্দ।
...	...
খাজুর গুবাক শালু পিয়াল তমাল	খর্জ্জুর পিয়াল তাল গুবাক তমাল।
...	...
—বাজবাজতুবমুতী।	—বাজরাজতুরমতী।
কাহাকুহী ইত্যাদি	কুহক কুহকিগণ ঝডাৎ জোতাধুতী ॥
	পুথির পত্র -- ৩৯
ঠেটী ভেটি ভাটা—	জেটি ভেটি ভাট্টা—
...	...
—বারণ গণ্ডার।	—বিবিধ গণ্ডার।
বারশিঙ্গা—	রামসিঙ্গা—
গাধাগোধা হাপা হাউ—	গাধা গোধা হরিণাদি—
হুডান্ নকুল গোলা গবর বিড়াল ॥	ছোতাল নকুল গোয়া মুসক বিড়াল ॥
("কাঁকলাস" ইত্যাদি ছত্রটি পুথিতে নাই)	ইহার পরেই—
	পশু পক্ষী আদি জিবী নির্ম্মাণ হইল।
	সৃষ্টি হেতু জোড়ে জোড়ে বিশাই গড়িল ॥
	অতঃপর—
	"শর্পখণ্ড শশ্মেপে লিখ্যন্তে"
	কেউটিয়া খরিল কালী ইত্যাদি। [ক্রমশঃ]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুথি

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম এ

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময় হইতেই ইহার পুথিশালার সূচনা। বস্তুতঃ, সুশৃঙ্খলভাবে বাংলা পুথির সংগ্রহ ও বিবরণপ্রণয়নের কার্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ই অগ্রণী[১]। পরবর্তী কালে অবশ্য অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অল্পাধিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে, এক হিসাবে আর কোন বড় প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে পরিষদের সমকক্ষ নহে। বাংলা সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালী জনসাধারণের উৎসাহ ও সহানুভূতির ফলে অতি সামান্য খরচে পরিষদের এই বিশাল পুথিশালা গড়িয়া উঠিয়াছে। ছোট বড় অনেকে পুথি উপহার দিয়া এই পুথিশালাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। বস্তুতঃ, ইহার অধিকাংশ পুথিই উপহারলব্ধ—ক্রীত পুথির সংখ্যা নগণ্য।

পরিষৎসংগৃহীত পুথিগুলির মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকখানির পূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক বিবরণ[২]

১। পরিষৎ কেবল নিজ সংগৃহীত পুথির বিবরণ সংকলন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। মুন্সী আবদুল করিম, শিবরতন মিত্র প্রভৃতির সংগৃহীত পুথির বিবরণও পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩০৪ হইতে ১৩২৬ সাল পর্যন্ত প্রায় নিয়মিতভাবে পরিষৎপত্রিকায় নানাস্থানের পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে (১৩০৪, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০৫—১ম, ৩য়, ৪র্থ, ১৩০৬—১ম, ৩য়, ৪র্থ, ১৩০৭—২য়, ৩য়, ৪র্থ, ১৩০৮—১ম, ৩য়, ১৩০৯—২য়, ১৩১০—২য়, ১৩১৩—৩য়, ১৩১৯—৩য়, ১৩২০—১ম, ৩য়, ১৩২৬—২য়, ৩য় সংখ্যা। পরিষৎপত্রিকার দৃষ্টান্তানুসারে অন্যান্য অনেক পত্রিকায়ও নানা পুথির বিবরণ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। তবে এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্য হইতে দরকারমত কোন পুথির বিবরণ খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর নহে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য Catalogus Catalogorum নামক সংস্কৃতপুস্তককোষের অনুকরণে একখানি প্রাচীনবঙ্গ-সাহিত্যকোষ সংকলনের কল্পনা পরিষদের আছে। এই উদ্দেশ্যে কিছু দিন পূর্বে 'প্রাচীনবঙ্গসাহিত্যকোষ-সমিতি' নামে একটী সমিতিও গঠিত হইয়াছিল (পরিষৎকার্যবিবরণ—৩৪শ, ৩৫শ ও ৩৬শ বর্ষ)।

২। রামমোহনের রামায়ণ (২।১,), অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল (৩।১৭১), কবি উদ্ধবানন্দের রাধিকামঙ্গল (৩।১৯৭), হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল (৩।২৫৫), কবি রূপনারায়ণের দুর্গামঙ্গল (৪।৭৩), চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (১৮।১২৩), বাণীকণ্ঠের মোহমোচন (২০।২১১), এগারখানি সংস্কৃত বৈদ্যক-গ্রন্থ (২০।৫১), চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা (২১।৪৯), কৌলমার্গ বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি (৩৭।১২৫), বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ (৩৯।২৪৯), রামচন্দ্র কবিকেশরী (৪৩। ১৭১-৮৩), মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল (৪৫।১১৪), চোরের পাঁচালি (৪৫।২১৫), রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র (সাহানা, পৌষালী সংখ্যা, ১৩৪৪)।

ইহা ছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ও ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকায় ও ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থেও পরিষদের একাধিক পুথির বিবরণ প্রদত্ত ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে।

বিভিন্ন সময়ে পরিষৎপত্রিকায় বা অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে—কতকগুলি[১] পরিষৎ বা অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রন্থাকারেও প্রচারিত হইয়াছে।

গত বর্ষ পর্যন্ত পরিষৎসংগৃহীত যে সমস্ত বাংলা পুথি তালিকাভুক্ত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা—৩২২৭। ১৩২৯ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত পুথিগুলির একটা মোটামুটি বিষয়-বিভাগ ঐ বর্ষের কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া,[২] চারি শত পুথির বিস্তৃত বিবরণ স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, পরিষৎসংগ্রহের বৈশিষ্ট্য ও গৌরবের নির্দেশ এখন পর্যন্ত একত্র কোথাও পাওয়া যায় না। অনেক অজ্ঞাতপূর্ব বা অল্পজ্ঞাত গ্রন্থ এখনও সাধারণের অগোচরে এই পুথিশালায় বিরাজ করিতেছে। বর্তমান প্রবন্ধে পরিষৎসংগৃহীত বাংলা পুথিগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

উপকরণ

আলোচ্য পুথিগুলির মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় ইহাদের উপকরণ। উপকরণের বৈচিত্র্য ভারতীয় পুথির একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য। তালপাতা, ভোজপতা, তেরেটপাতা, গাছের বাকল প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর উপর লিখিত পুথি ভারতের সর্বত্র পাওয়া যায়। পরিষদের বাংলা পুথিগুলি কিন্তু সমস্তই কাগজের উপর লিখিত—তালপাতায় লিখিত পুথি একখানিও ইহাদের মধ্যে নাই। অথচ, বাংলা দেশে তালপাতার প্রচলন কম নহে। বস্তুতঃ বাংলা দেশে—এমন কি, পরিষদের সংস্কৃত পুথিসংগ্রহের মধ্যেও—বিস্তর সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গাক্ষরে লিখিত তালপাতার পুথি দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, তালপাতার মত পবিত্র আধারে ভাষাগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা প্রাচীনগণ সঙ্গত বিবেচনা করিতেন না।

অক্ষর

পুথিগুলি প্রায় সমস্তই বঙ্গাক্ষরে লিখিত—একখানি পুথির অক্ষর নাগর। শেষোক্ত পুথিখানি ক্ষেমানন্দকৃত মনসামঙ্গলের। বঙ্গভাষায় নাগরাক্ষরে লিখিত আরও কতকগুলি পুথির পাতা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, সেগুলি এখন পর্যন্ত সাজান গুছান

১। কৃষ্ণকীর্তন, সংকীর্তনামৃত, মহাভারত (আদি পর্ব), শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, নেপালে বাঙ্গালা নাটক, সাধকরঞ্জন, কৃত্তিবাসী রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড), বিজয়রাম সেনের তীর্থমঙ্গল, কৃষ্ণের জন্মলীলা ও বাল্যলীলা, (চণ্ডীদাসের পদাবলী—পরিষৎসংস্করণ, ১৩৪১, পৃঃ ২২৫—৩০৮, দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১।১—৭৬)।

২। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—৩য় খণ্ড, ১ম—৩য় সংখ্যা। কয়েক বৎসর হইল, সমগ্র বাংলা পুথির সবিবরণ বিষয়ানুক্রমিক তালিকা প্রণয়নের কার্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। মুদ্রণের কার্যও কতক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

হয় নাই। অবশ্য বাংলা দেশে নাগরাক্ষর নূতন বস্তু নহে—সিলেট নাগরী বাংলার একাংশে সুপ্রচলিত। এই প্রসঙ্গে নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত চারিখানি নাটকের পুথিও উল্লেখযোগ্য।[১]

প্রাচীনতা

কয়েকখানি পুথির অক্ষর বিশেষ প্রাচীন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে প্রকাশিত গ্রন্থের পুথিখানিকে পরিষদের পুথিশালার প্রাচীনতম পুথি বলা যাইতে পারে। ইহার আবিষ্কার বাংলার সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণের মতে ইহার অক্ষর খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পাদ বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদের সমকালীন। তারিখযুক্ত পুথির মধ্যে ১০৫০ সালের অর্থাৎ প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বের হস্ত-লিখিত নিম্ননির্দিষ্ট পুথিগুলির নাম করা যাইতে পারে। তবে তারিখের মধ্যে কোন্‌টী বঙ্গাব্দ ও কোন্‌টী মল্লাব্দ, জোর করিয়া বলা সব ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে।

সংখ্যা	গ্রন্থ	অব্দ	সংখ্যা	গ্রন্থ	অব্দ
৫৬৯	মহাভারত (আদিপর্ব)	৯৮৫	১৫৬২	লবকুশের যুদ্ধ	১০১৮
৫৮২	মহাভারত (দ্রোণপর্ব)	১০০০	২১৯৫	মহাভারত (উদ্যোগপর্ব)	১০২০
৫৮৫	মহাভারত (কর্ণপর্ব)	১০০০	১০৭২	মহাভারত (আদিপর্ব)	১০২৩
১২৯৫	গুরুদক্ষিণা	১০০২	৫৭৩	মহাভারত (বনপর্ব)	১০৩৭
৫৯৫	মহাভারত (অশ্বমেধপর্ব)	১০০৩	২৬৬০	প্রহ্লাদচরিত্র	১০৩৮
১৬১৫	মহাভারত (স্বর্গারোহণপর্ব)	১০১১	২১৬১	রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড)	১০৪৩
২৬৬৮	কৃষ্ণবিজয়	১০১১	২৭০৭	মণিহরণ	১০৪৪
১৬১৩	মহাভারত (আশ্রমিকপর্ব)	১০১২	১৫৮২	মহাভারত (বিরাটপর্ব)	১০৪৭
১৫৭৫	মহাভারত (সভাপর্ব)	১০১৭	১৭৪৯	উদ্ধবসংবাদ	১০৪৮

আধুনিকতম পুথির মধ্যে তিনখানি পুথির নাম করা যাইতে পারে। প্রথমখানির নাম 'শৃঙ্গাররসপদ্ধতি' (২১২৫), দ্বিতীয়খানির নাম 'শৃঙ্গারতিলক' (২৩৮৬)। প্রথমখানি ১২৪৮ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত সংস্করণের প্রতিলিপি; দ্বিতীয়খানির মুদ্রণের তারিখ স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই, তবে যে ছাপাখানায় উহা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'ভবসিঙ্গ যন্ত্র'। ইহাদের মুদ্রণের উপরিলিখিত বিবরণ পুথির শেষে পাওয়া যায়।[২] তৃতীয় পুথির নাম 'পাণ্ডবগীতা' (১৯৬১)। এই পুথির শেষে ইহার মুদ্রণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

'ইতি পঞ্জীকা মাধুরী যন্ত্রে ১০০০ গীতা প্রকাশীতা। ইতি পাণ্ডবগীতা শোমাপ্ত। তারিখ ৭ ভাদ্র মঙ্গলবারে।'

১। পরিষদগ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত 'নেপালে বাঙ্গালা নাটক।'এই প্রসঙ্গে বঙ্গাক্ষরে লিখিত উড়িয়া ভাষার দুই একখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। জগন্নাথ দাসের ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় ও দ্বাদশ স্কন্ধের (৯৬৩) বঙ্গাক্ষরে লিখিত দুইখানি পুথি পরিষদে আছে। প্রথমখানির লিপিকাল—১১৯৫ সাল, দ্বিতীয়খানির ১২৬৯ সাল।

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩৯।২৫৮-৯।

পুথিগুলির মধ্যে সময়নির্দেশের জন্য বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত বিভিন্ন অব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গাব্দ বা সন, মল্লাব্দ (৩০৩চি[১]), মঘী সন (৮৬৬), ত্রিপুরাব্দ (১৫১, ১৭২) ও শকাব্দের ব্যবহার (২৩৭৭, ১৬৯, ১৫৭১, ২৬২০, ২৫, ৫৬৪) একাধিক পুথিতে দেখা যায়। অবশ্য ইহাদের মধ্যে বঙ্গাব্দের ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা বেশী। সাধারণতঃ মল্লাব্দ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না হওয়ায় কোন্‌টী মল্লাব্দ, কোন্‌টী বঙ্গাব্দ নির্ণয় করা কঠিন।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

কতকগুলি পুথির মালিক, লেখক বা পাঠকের নাম উল্লেখযোগ্য। রমণীর হস্তলিখিত দুই একখানি পুথির সন্ধান এই সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া যায়। যথা, মুক্তকেশী বসুজায়া-লিখিত 'অন্নদামঙ্গল' (২৬৩৩), বনবিষ্ণুপুররাজ গোপালসিংহদেবের মহিষী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবী-লিখিত 'প্রেমবিলাস' (২৬২)। রামায়ণের লঙ্কা ও উত্তরাকাণ্ডের দুইখানি পুথির (১৩৬, ১৩৭) মধ্যে একখানি মহারাণী আনন্দকুমারীর পিতা গোপালবাবুর বাটীতে লিখিত হইয়াছিল; আর একখানি (১৩৭) আনন্দকুমারীর নিজ পাঠার্থে লিখিত। এই গোপালবাবু ও গোপাল সিংহ অভিন্ন হইতে পারেন। গোপাল সিংহদেব অপরিচিত নহেন—তিনি ১২৭৩ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁহার রচিত কৃষ্ণমঙ্গল নামক গ্রন্থের পুথি (১২৬৯) তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় প্রদান করে। বিষ্ণুপুরের চৈতন্যসিংহনামক আর এক রাজার একখানি পুথি পরিষৎসংগ্রহে আছে। চৈতন্যসিংহ ছিলেন ঐ পুথিখানির মালিক।

বিষয়

বিষয়ভেদে পুথিগুলির আলোচনা করিলে তেমন নূতন বিষয় কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করে না সত্য, তবে সুপরিচিত বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত গ্রন্থকারকৃত গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশের সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বর্ণনীয় বিষয়গত বৈচিত্র্যের অভাব সমগ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ বা তাহাদের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া রচিত গ্রন্থ, বিভিন্ন দেবতার মাহাত্ম্যখ্যাপনের উদ্দেশ্যে একাধিক কবির রচিত মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব উপাসনা ও রাধাকৃষ্ণ এবং বৈষ্ণব মহাপুরুষদিগের লীলা বর্ণনাত্মক বৈষ্ণব সাহিত্য—এইগুলিই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একরূপ সর্বস্ব। ইহা ছাড়া আর যাহা আছে, তাহা অতি সামান্য। পরিষদের সংগৃহীত বাংলা পুথিগুলিও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই প্রকৃতিরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

১। এই পুথির তারিখ রাজড়া সন ১১৩৫ সাল, মন্দারন সন ১২৩৬ সাল।

পরিষৎসংগৃহীত পুথিগুলির মধ্যে মাত্র দুই চারিখানিতে বিষয় হিসাবে কিছু কিছু নবীনত্ব পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্যে বীর কাশীশ্বরকৃত 'চোরচক্রবর্তী', মহানন্দ চক্রবর্তিকৃত 'রেলপথ ভ্রমণ বর্ণনা' এবং শিবরামঘোষকৃত 'কালিকামঙ্গল', এই তিনখানি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রথম ও তৃতীয়খানির বিস্তৃত বিবরণ ইতঃপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে[১]। আশা করা যায়, দ্বিতীয়খানির বিবরণও এই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

চোরের রাজা চোর চক্রবর্তীর চৌর্যকীর্তির বর্ণনা প্রথম গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। চোরের রীতিনীতি সম্বন্ধে সাধারণকে সচেতন করাই আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য—চোরের প্রশংসা বা চৌর্যের উৎসাহদান ইহার কাম্য নহে। তাই গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন—

চৌরচক্রবর্তিকথা শুনিতে মোধুর।
জে কথা শুনিলে লোকে হয়ত চতুর॥

চম্পাবতীর রাজা নিজ রাজ্যে চুরি বন্ধ করার জন্য চোরদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছিলেন। চোরচক্রবর্তী তাঁহাকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে চম্পাবতী পুরী লণ্ডভণ্ড করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া রাজাকে নিজ সংকল্পের কথা জানাইল। পরে রাজার সমস্ত সতর্কতা বিফল করিয়া চোরচক্রবর্তী নগরের ঘরে ঘরে চুরি আরম্ভ করিল। রাজা, কোটাল, কেহই তাহার হাতে নিস্তার পাইলেন না। অথচ শত চেষ্টায়ও চোর ধরা পড়িল না। অবশেষে চোর নিজেই ধরা দিল এবং পূর্বাপর সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। সকল কথা শুনিয়া রাজা সন্তুষ্টচিত্তে চোরের সহিত নিজকন্যা মালাবতীর বিবাহ দিলেন। চোরও কিছু জিনিষ আশ্রয়দাতা মালিকে দিয়া, অপহৃত সমস্ত জিনিষের বাকী অংশ মালিকদের ফিরাইয়া দিল। নাগরিকগণ তখন মুক্তকণ্ঠে চোরের প্রশংসা ও কোটালের নিন্দা করিতে লাগিল।

শিবরাম ঘোষের কালিকামঙ্গলে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা বা বত্রিশ সিংহাসনের এক নব রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত সংস্করণগুলির উপাখ্যান হইতে আলোচ্য গ্রন্থের উপাখ্যান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—পুত্তলিকাগুলির নামও ইহাতে পৃথক্। এই উপাখ্যান কবির স্বকপোলকল্পিত, না বাংলা দেশে প্রচলিত প্রাচীন উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত, স্থির নিশ্চয় করা কঠিন। তবে ইহার মধ্যেই বত্রিশ সিংহাসনের বঙ্গীয় রূপ বজায় থাকা একেবারে অসম্ভব নহে। আর তাহা হইলে বত্রিশ সিংহাসনের ইতিহাসে ইহা এক নূতন আবিষ্কার। দুঃখের বিষয়, পুথিখানি অসম্পূর্ণ।

পাকুড়নিবাসী মহানন্দ চক্রবর্তী ১২৬৪ হইতে ১২৮০ বঙ্গাব্দের মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে নয়খানি গ্রন্থের পুথি পরিষদের পুথিশালায় আছে। 'রেল ভ্রমণ বর্ণনা' গ্রন্থে মফঃস্বল হইতে রেলযোগে কলিকাতায় আগমনের একটি কৌতুকপূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বাংলা ব্যঙ্গরচনার ইতিহাসে আলোচ্য গ্রন্থের মূল্য অবিসংবাদিত। রেলপথপ্রবর্তনের সমসময়ে লিখিত এই বিবরণ কল্পনাপ্রসূত হইলেও ইহা নূতনবস্তুদর্শনে তৎকালীন সমাজের বিস্মিত মনোভাবের অকৃত্রিম চিত্র প্রকাশ করিতেছে সন্দেহ নাই।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৪৫।২১৫-২২১, সাহানা, পৌষালী সংখ্যা, ১৩৪৪।

অনেক দিনের আয়োজনের পর কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইলে 'শুভ' চৈত্র মাসের বিংশ দিবসে—

দশ ঘণ্টা রাত্রিকালে ছাড়িয়া বসতি।
ইষ্টিশানে শক্তিপীঠে করিল বসতি॥
ধ্যানযোগে বসিয়া থাকিল সর্বজনা।
একচিত্তে সবে করে বরের প্রার্থনা॥
বরপত্র পাইলে কামনা সাঙ্গ হয়।
ঘুচয়ে মনের সন্দ ধন্দ দূরে যায়॥
য়েইরূপ ভক্তজন চিন্তে চারি ভিতে।
হেন কালে জয়ঘণ্টা বাজে আচম্বিতে॥
ঘণ্টারব শুনি তবে য়েকে য়েকে গিয়া।
বরপত্র লইলাম প্রণামি সপিয়া॥
... ...
ইত্তমধ্যে জয়ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।
উত্তর দিকে মহাশব্দ শুনিতে পাইল॥
... ...
ভক্তের কারণ লইয়া শতেক আলয়।
অতিদ্রুত উপনীত আসিয়া তথায়॥
ভক্তগণ সবে উঠে জয় জয় দিয়া।
শিষ্যগণ যায় যত আয়োজন লয়া॥
কেহু কেহু আসি করে চরণ মর্দ্দন।
কেহু পদে তৈল দিয়া শান্তি করে শ্রম॥
কেহু যজ্ঞকাষ্ঠ আনি যোগায় ত্বরিতে।
কেহু শান্তিজল আনি রাখে কলসেতে॥
... ...
বৈদ্যবাটী ফরাসডাঙ্গা শ্রীরামপুর এড়ায়।
দশ ঘণ্টা সময়েতে গেলাম হাবড়ায়॥
পীঠস্থান মধ্যে গিয়া স্থকিত হইল।
যেন চণ্ডীমণ্ডপেতে প্রতিমা বসিল॥
চারি দিক্ হইতে ধাইল শিষ্যগণ।
একে একে ভক্তগণে করিলো মোচন।
বরপত্র হস্তে দিয়া লইল বিদাই।
গোলোকের সঙ্গে যেন গোলোকধামে যাই॥

এই প্রসঙ্গে একখানি আধুনিক পুস্তকের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পুস্তকখানির নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম—ইহা দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রতি খণ্ডে ১৬টী করিয়া অধ্যায়। ইহার দুইখানি পুথি পরিষদের পুথিশালায় আছে (৯৪৩—৯৪৫)। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রতি অধ্যায়ে বিভিন্ন

উপনিষৎ হইতে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রুতিগুলির সংস্কৃত ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্যব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতি অধ্যায়ে বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে গার্হস্থ্যধর্মোপযোগী শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। এ স্থলেও শ্লোকগুলির সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। সনাতনমার্গাবলম্বীদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এই পুস্তকের একাধিক খণ্ড পুথির আকারে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

পৌরাণিক গ্রন্থ

পৌরাণিক গ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত অবলম্বন করিয়া রচিত গ্রন্থের আদরই বেশী। তাই অগণিত কবি মুখ্যতঃ এবং গৌণতঃ এইগুলিকে আশ্রয় করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অনুপলভ্যমান কতকগুলি উপাখ্যানও বাংলায় রচিত কাব্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যোগাদ্যার বন্দনা, যযাতির নরমেধ যজ্ঞ ও দণ্ডীপর্ব নামক প্রসিদ্ধ উপাখ্যানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।[১] কাশীরাম দাস (৭২৫), রাজারাম দত্ত (২২৩৪, ৮২১), উমাকান্ত (৮২৪) ও কবি মহীন্দ্র বা মহেন্দ্র- (১৬২০, ৮২২, ৮২৩, ১২৪০) রচিত দণ্ডীপর্বের পুথি পরিষদে আছে। মহেন্দ্রের গ্রন্থে ও শ্রীযুক্ত আবদুল করিম-প্রণীত একখানি পুথির বিবরণে (বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১।২৩৩) উহাকে ভাগবতের অন্তর্গত বলা হইয়াছে।

পরিষৎসংগৃহীত রামায়ণের পুথির মধ্যে কুমুদানন্দ দত্তের রামের অশ্বমেধ (৫৬৩), কৈলাস বসুর অদ্ভুত রামায়ণ (৫৬৬), মহানন্দ চক্রবর্তীর রামায়ণ (আদি, বন ও উত্তরা খণ্ড), সীতাসুতের রামায়ণ (অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কাকাণ্ড) এবং হটু শর্মার রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) অপূর্বপরিচিত।

কুমুদানন্দ দত্তের গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় এইরূপ,—অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য মুনিঋষিগণের উপদেশ, যজ্ঞীয় অশ্ব সংগ্রহের জন্য ভরত শত্রুঘ্ন প্রভৃতির চতুর্দিকে অন্বেষণ, অশ্বপ্রাপ্তি, রামচন্দ্রের যজ্ঞদীক্ষা, অশ্বের ললাটে জয়পত্র বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া এবং তাহার রক্ষার্থ সসৈন্য শত্রুঘ্নের তৎপশ্চাৎ যাত্রা, দেশদেশান্তরে ভ্রমণ, বাল্মীকির আশ্রমে লবকুশ কর্তৃক অশ্ববন্ধন, শত্রুঘ্নের সহিত লবকুশের যুদ্ধ ও শত্রুঘ্নের মৃত্যু, খবর শুনিয়া অযোধ্যায় রামপ্রভৃতির শোক, ভরতের যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ ও মৃত্যু, লক্ষ্মণের যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ ও মৃত্যু, রামের শোক ও দেহত্যাগের সঙ্কল্প, হনুমান্ দ্বারা সুগ্রীব ও বিভীষণকে আনয়ন, বানর, রাক্ষস ও মানুষ সৈন্য সহ রামের যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত ভ্রাতৃগণ দর্শনে রামের শোক, লবকুশের সহিত যুদ্ধ, রামের মৃত্যু, হনুমান্, সুগ্রীব ও বিভীষণের বন্ধন, যুদ্ধ জয় করিয়া লব কুশের মাতৃসমীপে গমন, সীতার শোক ও বিলাপ, দেহত্যাগার্থ সকলের

১। রামায়ণের অন্তর্গত না হইলেও 'বাগদির ব্রাহ্মণ' 'দ্বিজ ভূতনাথের' 'বঞ্চিত রায়ের পালা' (২৫২২) নামক গ্রন্থের উল্লেখ এ স্থানে করা যাইতে পারে। ইহার বর্ণনীয় বিষয় যোগাদ্যার বন্দনার অনুরূপ—কেবল শাঁখারির স্থলে বঞ্চিত রায়ের কথা বলা হইয়াছে, এই পার্থক্য।

অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশোদ্যোগ, বাল্মীকি কর্তৃক সান্ত্বনা, ইন্দ্রের অমৃতবর্ষণ, সকলের জীবনপ্রাপ্তি, অশ্ব লইয়া রাম প্রভৃতির অযোধ্যায় গমন, যজ্ঞসমাপ্তি, লবকুশ কর্তৃক রামায়ণ গান, সীতার পাতালপ্রবেশ।

১২৭৪-১২৮০ এই কয় বৎসরে মহানন্দ চক্রবর্তী রামায়ণ রচনা শেষ করেন। ১২৭৪ সনের ফাল্গুনে আদিকাণ্ডের আরম্ভ, ১২৭৫ সনের শ্রাবণে সমাপ্তি; কার্তিকের শেষে অযোধ্যাকাণ্ড ও অরণ্যকাণ্ডের সমাপ্তি, ১২৮০ সনের কোজাগরী পূর্ণিমার দিন এক বৎসরের প্রযত্নের ফলে উত্তরাকাণ্ডের রচনা সমাপ্ত হয়।[১]

মল্লরাজ গোপালসিংহ ও চৈতসিংহের সমসাময়িক সীতাসুত বোধ হয় তাঁহাদেরই আদেশে ও উৎসাহে রামায়ণ রচনা করেন।[২]

সীতাসুত-রচিত রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা, অরণ্য ও লঙ্কাকাণ্ডের পুথি পরিষদের পুথিশালায় আছে (চি ৩০৩,৩০৪, ৩০৮)। এই পুথিগুলির মূল মালিক গুরুচরণ দাস কর্মকার। পূর্বরাঢ়ের বালিট্টাগ্রামবাসী দর্পনারায়ণ দাস মজুমদার সাত টাকা পারিশ্রমিকে গুরুচরণকে চারি কাণ্ড

১। ফাল্গুনে আরম্ভ শ্রাবণের অর্ধগতে।
বিরচিল আদিকাণ্ড এ পঞ্চ মাসেতে।
অযোধ্যাকাণ্ডের কথা রচিল বিস্তারি।
কার্তিকের অর্ধগতে সমাপন করি।
ইতি সনে পক্ষ শশি সিন্ধুযুক্ত বাণ।
কর্কট অর্ধেক রবির ভৃগু অধিষ্ঠান।
তৃতীয় প্রহরকাল তিথি তায় বেদ।—আদিখণ্ডের পুথি (১৯৬২)
সনে শশি পক্ষ সিন্ধুবাণ যুক্ত।
... ...
বারেতে ভার্গব গোপিকা মাধবরস রাস পূজানিশি।—বনখণ্ডের পুথি (১৯৬৩)
ইতি সন বার শত সাল মিলে আশী।
আশ্বিন কোজাগর পূর্ণমাসী।
সমাপ্ত হৈল বেলা তৃতীয় প্রহর।
... ...
বিরচিল বচ্ছরেকে অবকাশমতে—উত্তরাখণ্ডের পুথি (১৯৬৪)

২। গোতম তন্ত্রের কথা সীতাসুত কয়।
মহারাজা মল্লাবনীনাথের জয় জয়।—অরণ্যকাণ্ড, পত্র৩
বাল্মীকি আদেশ দ্বিজ সীতাসুত গায়।
মহারাজা গোপালসিংহনাথের জয় জয়।—ঐ, পত্র ৪২
দ্বিজ সীতাসুত কহে বাল্মীকপুরাণ।
মহারাজা চৈতসিংহের জয় কর রাম।—লঙ্কাকাণ্ড, পত্র১৪০
বাল্মীকপুরাণ দ্বিজ সীতাসুত গায়।
মহারাজা মল্লাবনীনাথের জয় জয়।—ঐ, পত্র ২০৩

রামায়ণ লিখিয়া দেন। পুস্তক সাঙ্গ হইলে গুরুচরণ বস্ত্র ও মোয়া দিবেন প্রতিশ্রুতি দেন। (লঙ্কাকাণ্ডের পুথির শেষ দ্রষ্টব্য)।

পূর্বপরিচিত কবিদের রচিত গ্রন্থের মধ্যে কৃত্তিবাসের সমগ্র রামায়ণের একখানি সম্পূর্ণ পুথি (২৫৭৪) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃত্তিবাসের সমগ্র রামায়ণের সম্পূর্ণ পুথি নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া এ পুথিখানি বিশেষ মূল্যবান্। সমগ্র রামায়ণের আর একখানি পুথিও (১৯১৭) অবশ্য পরিষদের পুথিশালায় আছে। তবে তাহা তিন চারি স্থলে কিছু কিছু খণ্ডিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মুদ্রিত সংস্করণে অপ্রকাশিত কৃত্তিবাসের নামে প্রচারিত সাত কাণ্ডের বন্দনা (১০৪৫-৭), যোগাদ্যার বন্দনা (১৬০-৩, ১০৪৯-৫৪), আদিকাণ্ডে যজ্ঞরক্ষা ও যযাতির পালা (২৫০৭, ২২, ১৫৯, ৯০৯, ১৬২৩, ২৩২৬, ৭০চি), অরণ্যকাণ্ডে শিবরামের যুদ্ধ (১৫৮, ১০৩২, ১০৬৩, ২১৬২, ২২৮০, ১০৬২) ও লঙ্কাকাণ্ডে বজ্রপাতবধ (২১৭১) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে বজ্রপাতবধের উপাখ্যানটী অপরিচিত বলিয়া মনে হয়। ইহার বর্ণনীয় বিষয় এইরূপ—রাবণের ভাগিনেয় লঙ্কার দক্ষিণস্থ দেশের রাজা বজ্রপাত নারদের মুখে রাবণবধবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া সীতা সহ রামলক্ষ্মণকে লঙ্কা হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। পরে হনুমান্ তাহাকে বধ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনেন।

রামপ্রসাদের রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ডের একখানি পুথিতে (১৭৮৩) গ্রন্থরচনার ইতিহাস-বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, রামপ্রসাদ পিত্রাদেশে এই কার্যে প্রবৃত্ত হন। পিতা জগৎরাম অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম কাণ্ড মিলাইয়া রামায়ণ রচনা করেন—

সীতারাম লীলা নব্য　　রচিলা সুন্দর কাব্য
শ্রীঅদ্ভুত রামায়ণ নাম।
অদ্ভুত অধ্যাত্মমত　　একত্র করিয়া জুত
রচিলা বিবিধ রসধাম। (১খ)

লঙ্কাকাণ্ডের আর একখানি পুথিতে (৫৬৫) কিন্তু ভণিতায় রচয়িতা-হিসাবে জগৎরামের নামই পাওয়া যায়:

জগৎরাম লঙ্কাকাণ্ড গায় গীত।
অদ্ভুতঅধ্যাত্মমত করিঞা সঙ্কিত। (২৫ক)

মহাভারতের পুথির মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের ভীষ্মপর্ব (৭৮৭, ৭৮৮), কৃষ্ণরামের জৈমিনিভারত (৭৮৫) ও অশ্বমেধপর্ব (৭৯২), গোবর্ধনের গদাপর্ব (২৫৭২), রাজীব সেনের উদ্যোগপর্ব (৭৯৩), রাম সরস্বতীর সভাপর্ব (১২৪৭, ১২৪৮), অকিঞ্চন দাসের সৌপ্তিকপর্ব (২৪৭০), হরিদাসের জৈমিনিভারত (২২৩৫), কুমুদ দত্তের যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ (৭৯০, ৭৯১), পঞ্চানন্দের দাতা কর্ণের পালা (৯১৯), রমানাথ রায়ের সাবিত্রীর পালা (৮১৪-৫) ও রাম-নারায়ণের নলরাজার প্রসঙ্গ অপূর্বপরিচিত। পূর্বপরিচিত কবিদের কাব্যের অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত অংশের পুথির মধ্যে কাশীরাম দাসের পাণ্ডবমিলন (২৫১৮), যানপর্ব (৬০২), বৃহৎ-

দ্রোণপর্ব (২৩১৩), স্বপ্নপর্ব (৬০৪), অনুশৌচিকপর্ব (৭৪২), অনুশাস্তিপর্ব (১১৫৮) ও অভিষেকপর্ব (৬০৩) উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত কুন্তী ও পাণ্ডবগণের প্রথম মিলন ও পরিচয় 'পাণ্ডবমিলনে' বর্ণিত হইয়াছে। মৌষল পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্বের উপাখ্যানের সংমিশ্রণে যানপর্বের সৃষ্টি। শুকপরীক্ষিৎসংবাদরূপে বৃহৎ দ্রোণপর্ব রচিত হইয়াছে। দশম স্কন্ধের অমৃতসমান কাহিনী শ্রবণের পর পরীক্ষিৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শুকদেব দুর্যোধনাদির যুদ্ধের বিবরণ প্রদান করিতেছেন, এইরূপে এই পর্বের সূচনা। 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' যুধিষ্ঠিরের এই ঘোষণার বিবরণের দ্বারা গ্রন্থ শেষ করা হইয়াছে। নিদ্রাকালে দৃষ্ট দুঃস্বপ্নের ফল কীর্তন করিয়া ও অন্যান্য বহু সদুপদেশ দিয়া রাণী ভানুমতী রাজা দুর্যোধনকে কৃষ্ণ ভজনা করিবার ও পাণ্ডবপক্ষের সহিত সন্ধি করিবার পরামর্শ দিতেছেন—ইহাই স্বপ্নপর্বের বর্ণনীয় বিষয়। ঋষিগণের নিকট যুধিষ্ঠিরের জ্ঞাতিহত্যাজনিত অনুশোচনা অনুশৌচিকপর্বে বর্ণিত হইয়াছে। অনুশাস্তিপর্বের বর্ণনীয় বিষয়—যুদ্ধে স্বজনবিনাশে যুধিষ্ঠিরের শোক এবং কৃষ্ণ ও ব্যাসকর্তৃক তাঁহার সান্ত্বনা। যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের বর্ণনা অভিষেকপর্বের উপজীব্য। মহাভারতের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত 'নৈষধচরিত' গ্রন্থের (৭৮৬) সূচনা কৌতুকাবহ। এই গ্রন্থের মতে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বৃহদল মহামুনি নলের উপাখ্যান বর্ণনা করেন।

ভাগবতের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত গ্রন্থের পুথির মধ্যে অভিরাম দাসের গোবিন্দ-বিজয় (১২১৩-৪, ১৬২৬),[১] উদ্ধবানন্দের রাধিকামঙ্গল (৮৬৭), কংসারি বা শ্রীকৃষ্ণ মিত্রের প্রহ্লাদচরিত্র (১২৬১, ২৫৯১), কবিশেখরের সম্পূর্ণ গোপালবিজয় (১২৯০), কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল (৮৬৬), গঙ্গারাম দত্তের উষাহরণ (৯৩৮, ১২৩৮), গদাধর দাসের রাসপঞ্চাধ্যায় (২৮৮) ও সুদামার দারিদ্র্যভঞ্জন (৯১৬), মহারাজা গোলাপ সিংহের রাধাকৃষ্ণ-মঙ্গল (১২৬৯),[২] জয়নারায়ণের কৃষ্ণবিলাস (১২৭০), দ্বৈপায়ন দাসের প্রহ্লাদচরিত্র (১২৬০), বলরাম দাসের কৃষ্ণলীলামৃত (৩৫৯)',[৩] রমানাথের কৃষ্ণবিজয় (১২৯৩)[৪] ও কৈলাস বসুর মহাভাগবতপুরাণ (৭৯৯-৮০১) উল্লেখযোগ্য। গঙ্গারাম দত্ত ভাগবত ও হরিবংশ অবলম্বন করিয়া উষাহরণ রচনা করেন :

ভাগবত হরিবংশ ঐক্যতা করিয়া।
গঙ্গারাম দত্ত ভণে বাণী সঙরিয়া। (৭ক)

১। বিশেষ বিবরণ—সুকুমার সেন-কৃত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' পৃঃ ৫৬০-৩। ১২১৪ পুথিখানির ২২৪থ পৃষ্ঠার পর হইতে গুণরাজ খানের রচনা—ইহা লিপিকর স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন : 'ইতি শ্রী অভিরামের কৃত কথক পুস্তক ছিল তাহা সমাপ্ত পাইলাম না। অতএব গুণরাজ খানের কৃত পুস্তক লইএণা শেষে সাঙ্গ করিলাম। ইহাতে কেহ দোষ লইবেন না।'

২। বিশেষ বিবরণ—সুকুমার সেন, পৃঃ ৭০২-৩।

৩। বিশেষ বিবরণ—ঐ, ৭০০-২।

৪। বিশেষ বিবরণ—ঐ, ৭০৩-৪।

গ্রন্থ রচনার তারিখ ১৬৯২ শকাব্দ :—

ভুজ অঙ্ক ঋতু ব্রহ্ম শকে উপনীত।
এই কালে এই পুথি হইল রচিত। (৪০খ)

মহাভাগবতপুরাণের (৭৯৯)[1] শেষে গ্রন্থকারের বংশপরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার মেদিনীপুরবাসী। গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ :—

পূর্ব্ব সমুদ্রের গর্ভে শশির গমন।
পশ্চিম জলধিপৃষ্ঠে শোভে বিন্দু গিরি।
দক্ষিণাস্যে বুদ্ধিমান্ বুঝিবে বিচারি
শকের নির্ণয় এই বৎসরান্ত মাসে।

অন্যান্য পুরাণের মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার উপাখ্যান অবলম্বনে বিভিন্ন গ্রন্থ বিভিন্ন নামে রচিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণ বা কালিকামঙ্গল (১১৭৮), দেবীমাহাত্ম্য (১৯০৪, ২৫০৫), কালিকাবিলাস (১৩৯৭), দুর্গামঙ্গল (৮০৫, ১৪১৭), দেবীমঙ্গল (২৪৫১) প্রভৃতি নামে এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই উপাখ্যানের সঙ্গে কোন কোন গ্রন্থে শুম্ভ নিশুম্ভের জন্ম, দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়ে পুনর্জন্ম, শিবগৌরীর বিবাহ, দেবীর হিমালয়ে আগমন প্রভৃতি উপাখ্যানও দেখিতে পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণ নামক গ্রন্থে (৯০৬) গৌরীর বিবাহ হইতে গণেশের জন্ম পর্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। দুর্গাপুরাণে (৮০৬) দুর্গার হিমালয়ে আগমন ও পূজা লাভ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ত্রিলোচন দাসের কল্কিপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া কৃষ্ণলীলাবিষয়ক বাংলা কাব্যগুলির অন্যতম আশ্রয় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের জন্মখণ্ড। রামপ্রসাদ রায়ের কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু (১৩৪৯) গ্রন্থে এ কথা স্পষ্টতই স্বীকৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মধ্যে জন্মখণ্ড মত।
রচনা করিএ গ্রন্থ কৃষ্ণলীলামৃত।

মুকুন্দ ভারতী-রচিত ব্রহ্মপুরাণে (২৮৯, ২৩৩২) শ্রীক্ষেত্র ও জগন্নাথের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

সংস্কৃতমূলক পুরাণাতিরিক্ত গ্রন্থ

বিভিন্ন পুরাণ অবলম্বনে রচিত নানা গ্রন্থ ব্যতীত এমন কিছু কিছু গ্রন্থও প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যায়, যেগুলির অবলম্বন পুরাণাতিরিক্ত সংস্কৃত গ্রন্থ। বস্তুতঃ সংস্কৃত প্রায় সকল শাস্ত্রের পুস্তকই বাংলায় পাওয়া যায়।[2] অবশ্য ইহাদের অধিকাংশই কেবলমাত্র প্রথম শিক্ষার্থীদের উপযোগী। এই সকল পুস্তকের মধ্যে পরিষদের পুথিশালায় স্মৃতি, আয়ুর্বেদ,

১। ইহার বর্ণনীয় বিষয়—শিবের বিবাহ, কার্ত্তিকেয়োৎপত্তি, তারকাসুরবধ, রাবণবধ প্রভৃতি।
২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩৯। ২৪৯-৫৯।

দর্শন, জ্যোতিষ, কামশাস্ত্র ও কাব্যের পুথি কিছু কিছু পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিদগ্ধমাধব, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, গোবিন্দলীলামৃত, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, মুক্তাচরিত্র প্রভৃতি পুস্তকের বাংলা অনুবাদের পুথিও এখানে আছে। গীতগোবিন্দ ও হংসদূতের একাধিক অনুবাদের প্রচুর পুথি এই দুইখানি পুস্তকের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

মঙ্গলকাব্য

বিভিন্ন দেবতার মাহাত্ম্যবর্ণনাত্মক মঙ্গলকাব্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। পরিষদের মঙ্গলকাব্যের পুথির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানির নাম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

দ্বিজ নিধিরাম গাঙ্গুলী, কবিচন্দ্র ও দ্বিজ রূপরামের অনাদিমঙ্গল, দ্বিজ কবিচন্দ্রের কপিলামঙ্গল, ধনঞ্জয়ের কমলামঙ্গল, কবিচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, কৃষ্ণরামের ও নিধিরাম কাব্যরত্নের কালিকামঙ্গল, হরিনারায়ণ দাসের চণ্ডিকামঙ্গল, মাধবাচার্যের সারদামঙ্গল, শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র ও রূপরামের ধর্মমঙ্গল, দ্বিজ মুকুন্দের জগন্নাথমঙ্গল, দ্বিজ বাণেশ্বর, কবিবল্লভ, রসিকানন্দ ও সীতারাম দাসের মনসামঙ্গল, কৃষ্ণরাম ও রুদ্রদেবের রায়মঙ্গল, রামচরণের বটুরমঙ্গল, রামেশ্বর ঘোষ, শম্ভুসুত ও কবিবল্লভের শীতলামঙ্গল, বীরেশ্বরের সরস্বতীমঙ্গল ও দ্বিজ কবিচন্দ্রের শিবায়ন। ইহাদের মধ্যে কপিলামঙ্গলের বিষয়বস্তু গোপ্রশংসা, দেবগণের গোপূজা ও স্বর্গ হইতে কপিলা গাভীর মর্ত্যে আগমনবৃত্তান্ত। কমলামঙ্গলে লক্ষ্মীর উৎপত্তি, চরিত্র ও মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। জগন্নাথের উৎপত্তি ও মহিমার বিবরণ লইয়া জগন্নাথমঙ্গল বিরচিত। বটুরমঙ্গলে শিবপুত্র বটুকের মাহাত্ম্যসূচক উপাখ্যানের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। শীতলামঙ্গলের বিষয়—বিভিন্ন স্থানে বসন্ত রোগের বিস্তার, শীতলা কর্তৃক তাহার দূরীকরণ ও নিজ মহিমা প্রচার। সরস্বতীর মহিমাবর্ণন প্রসঙ্গে সরস্বতীর বরপুত্র বররুচি, কালিদাস প্রভৃতির উপাখ্যানবর্ণন সরস্বতীমঙ্গলের উপজীব্য।

নাটক

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নাটকের স্বল্পতা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। পরিষদের পুথিশালায় মাত্র চারিখানি নাটকের পুথি আছে—বিদ্যাবিলাপ নাটক, মহাভারত গীতিনাট্য, রামচরিত গীতিনাট্য ও মাধবানলকামকন্দলা। পুথিগুলি নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত ও নেপাল হইতে সংগৃহীত। 'নেপালে বাঙ্গালা নাটক' এই নামে পুথিগুলি সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ দিয়া নাটকগুলির মূল্য অবিসংবাদিত।

মুসলমানী বাংলা

'মুসলমানী বাংলায়' নাতিস্বল্প সাহিত্য বাংলায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার কিছু অংশ ছাপাখানার মারফত জনসাধারণের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিলেও আধুনিক হিন্দু বা মুসলমান সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি এ দিকে তেমন আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ এই সকল 'মুসলমানী কেতাব' যে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে বহুল প্রচলিত, তাহার প্রমাণ—একাধিক কেতাবের একাধিক সংস্করণ প্রকাশ। এই সকল মুদ্রিত কেতাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য—ইহাদের পত্রবিন্যাসরীতি; আরবী পারসী পুস্তকের মত এগুলির পত্রসমূহ দক্ষিণ হইতে বাম দিকে সাজান।

'মুসলমানী বাংলার' কয়েকখানি পুথি পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত হইয়াছে। একখানি ছাড়া ইহাদের সকলগুলিই অন্যান্য সাধারণ পুথির মত—বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বর্ণনীয় বিষয় মুসলমান ঐতিহ্য ও গ্রন্থকার মুসলমান[১]। একখানি পুথির লিপিকর ও ক্রেতা উভয়েই হিন্দু। এই পুথিখানির নাম—আবুসামার পুথি। রচয়িতার নাম—জয়নাল আবেদিন। লিপিকর—যজ্ঞেশ্বর দাস পাল সরকার, 'সাকিন রণডাঙ্গা, পরগণে জাহানাবাদ, জেলা মেদিনীপুর।' ক্রেতা কার্ত্তিক মণ্ডল। সন ১২১৯ সালে রচিত বা লিপীকৃত 'লালমোহনের কেচ্ছা'র পুথিখানি আধুনিক পুস্তকাকারে বাঁধা এবং ইহা পড়িতে হয় বাম হইতে দক্ষিণ দিকে।

বিবিধ

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাচীন বাংলায় শব্দশাস্ত্রবিষয়ক কোনও গ্রন্থই পাওয়া যায় না। আধুনিক ধরণের একখানি বাংলা অভিধানের জীর্ণ পুথিই এ বিষয়ে পরিষদের পুথিশালার একমাত্র সম্পত্তি। পুথিখানিতে নকলের তারিখ, গ্রন্থকারের নাম বা রচনার সময় কিছুই পাওয়া যায় না। ইহাতে পুথির মালিক ও লেখকের নাম এইরূপ ভাবে দেওয়া হইয়াছে :

> এই অভিধানের অধিকারি•••গজনহার আহম্মদ খোন্দকার সাং হ•••জপুর পরগণে বালিয়া। সঅক্ষরমিদং শ্রীমথুরামোহন দাস সাং বাঙ্গলা। পরগনে জীঃ বালিয়া।

অভিধানখানি পূর্ব্ববঙ্গে রচিত বলিয়া মনে হয়। বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বাংলা অভিধানের ইতিহাসে ইহার স্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর হইতে পারে।

শব্দশাস্ত্রের ন্যায় দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। দশ উল্লাসে সমাপ্ত আত্মবোধ (২১২১) নামক গ্রন্থে কিছু কিছু দার্শনিক কথা আছে। গ্রন্থখানি

১। এইরূপ কয়েক জন প্রাচীন গ্রন্থকারের পরিচয় ও তাঁহাদের গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ ডক্টর এনামুল হক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৪১।৩৮-৫৪, ৪৩।৯৩-১০৯, ১৪২-৬০)।

কথাচ্ছলে লিখিত। ইহাতে সুমতি কুমতি, এই দুই স্ত্রীর বিরোধ, তাহাদের কলহ ভঞ্জন ও সুমতি কুমতির সন্তানাদির গুণ দোষ প্রভৃতি বিষয় বর্ণন প্রসঙ্গে কিছু কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

প্রাচীন বাংলার উপাখ্যানগুলি প্রধানতঃ দেবতার মাহাত্ম্যবর্ণন প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। তবে স্বতন্ত্র উপাখ্যান বিরল হইলেও অজ্ঞাত নহে। এইরূপ উপাখ্যানের মধ্যে হুকুম পীরের কবি শঙ্করের রচিত 'ফেস্তারার পালা' (১৭৭৩) উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় এইরূপ—ফেস্তারার কন্যা রাউতি বাপ ভাইকে মারিয়া সাধু মদনের অনুগমন করে। রাজবাড়ীতে মালিনী মদনকে দিনে গাড়র ও রাত্রিতে মানুষ করিয়া রাখে। ছদ্মবেশে রাজার জামাই হইয়া রাউতি তাহাকে উদ্ধার করে।

পরিশিষ্ট

মূল প্রবন্ধে যথাস্থানে অনুল্লিখিত আর কয়েকখানি পুথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইতেছে :

পৌরাণিক গ্রন্থ

গুণরাজ খানের শ্রীধর্ম্ম ইতিহাস বা কথা ইতিহাস গ্রন্থে (২১৭৮) প্রথমে যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা হইতে আরম্ভ করিয়া বনবাস পর্যন্ত বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে দুর্বাসার পারণ, যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পতিব্রতার উপাখ্যান, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম ও তাহার ফল, পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য, কলির প্রভাব ও অজামিলের উপাখ্যান বর্ণন। অবশেষে "কোন পুণ্য কর্ম্ম করিলাম না" বলিয়া যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চতুর্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন। নানা উপদেশ প্রদান ও রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা।

হরেকৃষ্ণ দাসের বাল্মীকপুরাণে (১৭৮১) বাল্মীকির পূর্ব ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের মতে বাল্মীকির পূর্বনাম বৃন্দা দৈত্য।

মঙ্গলকাব্য

রামাই বা রাম পণ্ডিতের অনিলপুরাণ (২৫৬৫) শূন্যপুরাণ হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ধর্মঠাকুরের উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। দয়ারাম দাসের ধুনা কুটার পালা (২৩৪৯) সরস্বতীর মাহাত্ম্যবর্ণনাত্মক কাব্য। দয়ারামের নামযুক্ত সারদামঙ্গল বা সারদাচরিতের উপাখ্যানের[১] সহিত এই গ্রন্থের উপাখ্যানের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইহার বর্ণনীয় বিষয়

১। শ্রীসুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৯১৮-২০।

এইরূপ—সুবাহু রাজা তাঁহার একমাত্র পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ পুরোহিতের নিকট অর্পণ করেন। পুরোহিত দ্বাদশ বৎসর সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও রাজপুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় কৃতকার্য হইতে না পারিয়া রাজাকে জানাইলেন—রাজাও গুণহীন পুত্রকে বধ করিবার জন্য কোটালকে আদেশ দিলেন। কোটাল রাজপুত্রকে ছাড়িয়া দিলে রাজপুত্র বনে পলায়ন করিলেন। এই সময় সরস্বতী এক বৃদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। কিছু কাল পরে 'বৈদের দেশের রাজার বিদ্যালয়ে পড়িলে তোমার বিদ্যালাভ হইবে' এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হন। দেবীর উপদেশানুসারে রাজপুত্র সেখানে গেলে বৈদের দেশের পঞ্চ রাজকন্যা তাঁহাকে পাঠশালা ঝাঁটপাট করা ও ধুনা দেওয়ার কার্যে নিযুক্ত করিলেন। তাই রাজপুত্রের নাম হইল 'ধুনাকুটা'। পরে সরস্বতী পূজার দিন রাত্রিতে রাজপুত্র দেবীর দর্শন লাভ করিলেন এবং তাঁহার বরে অশেষ বিদ্যার অধিকারী হইলেন। অবশেষে তিনি পঞ্চ রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বৈষ্ণব

পদাবলী, চরিতকাব্য, অনুবাদগ্রন্থ, সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থের পুথি পরিষদের পুথিশালায় আছে। আপাতদৃষ্টিতে কতকগুলি গ্রন্থকে দার্শনিক গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণ-ভক্তির মাহাত্ম্যবর্ণনই এগুলির উপজীব্য বিষয়। এ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানির নাম করা যাইতে পারে :—

অক্ষরচৌতিশা (১৫৫৪-৫), সংসারতরণতত্ত্ব (৯১১), গোপীবল্লভদাসের জ্ঞানচৌতিশা (২১৪৬), প্রেমানন্দের জ্ঞানচন্দ্রিকা (২১৪৫)। শিবরহস্যাগমে (৯১৭) গৌরীর প্রশ্নের উত্তরে শিবকর্তৃক কৃষ্ণতত্ত্ব ও কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

বিবিধ

মদনের পালা (৯৩৪) গ্রন্থে সায়েস্তা খাঁর সমকালীন মদন রায় নামক জমিদারের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তিন বৎসরের খাজনা বাকী পড়ায় নবাবের পাইক জমিদারকে ধরিতে আসে। তখন এক মুসলমান কর্ম্মচারীর পরামর্শে মদন রায় মবারক গাজীর শরণাপন্ন হন। গাজীর মধ্যস্থতায় মদন রায় নবাবের শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। গাজী নবাবের সহিত দেখা করিয়া মদন রায়কে ছাড়িয়া দিতে বলেন এবং নবাবও প্রাপ্য রাজস্ব ক্রমশ দিবার আদেশ দিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কমলাকান্তরচিত মদনমোহনের পালা (৯৩২) কিন্তু মদনমোহন ঠাকুরের মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য। বিষ্ণুপুরের মদনমোহন ঠাকুর—কলিকাতাবাসী গোকুল মিত্রের বাটীতে আসার ফলে বিষ্ণুপুর ও বিষ্ণুপুররাজ-

মল্লবংশের দুরবস্থার বর্ণনা এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। একখানি খণ্ডিত পুথিতে (১৫৫৩) জাল প্রতাপচাঁদের কাহিনীর ক্ষুদ্র অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। লেখাপড়ার আর্য্যা (২৩৫১) লেখাপড়া শিক্ষা বিষয়ে উপদেশাত্মক কয়েকটি কবিতা। যথা—

একমন হয়া বৈস অন্য কথা ছাড়।
ঠিক সোজা হয়া বৈস জেন বাঁকে নাঞি ঘাড় ॥
ঘাড় বাঁকিলে অক্ষর হইবেক বাঁকা।
ইহা বুঝিতে নারে তারে বলি বোকা ॥
মজলিসমাফিক বৈস লিখিবে অক্ষর।
একার ঐকার মাত্রা সমতুল্য কর ॥
সজা পাতি লিখিবে বাঁকিয়া নাঞি জার।
কালি কলম কাগজ সমান চাই তার ॥

বৈদ্য কমল সেন ও শুভঙ্কর ভৃগুরাম-রচিত ছত্রিশ কারখানা গ্রন্থে (২৫৯৬) তোষাখানা, পিলখানা, বারুদখানা প্রভৃতি ৩৬টি 'খানা'-অন্ত শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে; যেমন, 'পিলখানা বলি তারে যথা হস্তী থাকে।' ইহা পদ্যময় সংস্কৃত অভিধানের ক্ষুদ্র বাংলা রূপ হিসাবে কৌতুককর ও মূল্যবান্।

অঙ্কপুস্তকের অধিকাংশই শুভঙ্করের আর্য্যার সংগ্রহমাত্র। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণচরণের অঙ্কপুস্তক (৯৪০) উল্লেখযোগ্য। ইহাতে শুভঙ্করের ধরণে কতকগুলি আর্য্যা পাওয়া যায়। কৃষ্ণচরণ বহু স্থানে শুভঙ্করের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

হইয়া অতি ভক্তিযুত বন্দিব মহেশসুত লম্বোদর দেবতাপূজিত।
তদন্তরে শুভঙ্কর বন্দিয়া মস্তকপর রচি ভাষা মহন সঙ্গীত ॥—(প্রারম্ভ)
শুভঙ্কর ভাবি মনে শ্রীকৃষ্ণচরণ ভণে (পত্র ৩, ৪)।*

* পরিষদের বাংলা পুথি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ রচনার উপকরণ সংগ্রহে আমি পরিষদের পুথিশালার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
১৩৪৮

সেকালের সংস্কৃত কলেজ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাকরণ—পাণিনি-শ্রেণী

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ হয়। সংস্কৃত কলেজে প্রথমে ব্যাকরণের দুইটি শ্রেণী ছিল; একটি—পাণিনি, অপরটি—মুগ্ধবোধ।

গোবিন্দরাম উপাধ্যায়

পাণিনি-শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন—গোবিন্দরাম উপাধ্যায়; তাঁহার বেতন ছিল ৪০৲। তিনি ছাত্রগণকে ভট্টোজী দীক্ষিত-কৃত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' পড়াইতেন। সংস্কৃত কলেজে পাণিনি-শ্রেণী তিন বৎসর—১৮২৭ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। গোবিন্দরাম ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য কাশী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি ১৮২৭ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বেতন (তৎকালে ৮০৲) লইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর একখানি পত্রে প্রকাশ :—

> ...Kaumudi Class...As the Pundit of the class has been compelled by ill-health to resign his situation and return to Benares it is worth while to replace him and the abolition of the class will leave about 100 Rs. a month available for any other object.*

ব্যাকরণ—মুগ্ধবোধ-শ্রেণী

প্রথম শ্রেণী—

হরনাথ তর্কভূষণ

সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল—১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে হরনাথ তর্কভূষণ মাসিক ৪০৲ বেতনে ব্যাকরণ-শ্রেণীর প্রথম পণ্ডিত নিযুক্ত হন। নামে প্রথম ব্যাকরণ-শ্রেণী

* Letter dated 7 Feb. 1828 from W. Price, Secretary, Calcutta Government Sanscrit College, to the Sub-Committee of the Hindu College.

হইলেও এই শ্রেণীতে তখন ভট্টিকাব্য ও অমরকোষের অংশবিশেষ পড়ান হইত। হরনাথ সংস্কৃত কলেজের সহিত প্রায় ২০ বৎসর সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৪৩ সনের মাঝামাঝি তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি কাশীবাস করিতে থাকেন। তথা হইতে পর-বৎসরের মাঝামাঝি তিনি পদত্যাগ করেন। পদত্যাগকালে তাঁহার বেতন ছিল—৯০৲।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

শিক্ষা-পরিষদ্ হরনাথের স্থলে একজন উপযুক্ত অধ্যাপক নির্ব্বাচনের ভার দিয়াছিলেন—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী জি. টি. মার্শালের উপর। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মার্শালের অধীনে চাকরি করিতেন। মার্শাল ৯০৲ বেতনের এই পদটি তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ না করিয়া তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে মার্শাল হরনাথের শূন্য পদে তারানাথকে নির্ব্বাচিত করেন। তিনি তাঁহার রিপোর্টে লেখেন :—

> I would recommend that the first Chair, to which is attached a salary of 90 Rupees per mensem should be given to Taranath Tarkavachasputi a resident of Ambika and formerly a student of the Sanscrit College,* which he quitted about ten years ago. This recommendation is made altogether from a conviction of this individual's superior qualifications and without any solicitation, direct or indirect, on his own part : only his willingness to accept the appointment if offered to him, having been ascertained. He does not teach a "*Tole*" or public School, but he has, I am creditably informed, several private pupils and I know from report and also personal conviction that he has kept up and added to the stores of Hindoo Literature and Science, which he acquired at College : in fact his zeal for learning has led him to visit Benares two or three times, on each of which occasions he resided at that city for a considerable period. In every department he is, in my opinion, far above mediocrity and in several branches of Science I doubt if any Pundit of Bengal can compete with him namely, in the Upanishads of the Veds, in Vedanta, Sankhya, Memangsa, Jyotisha, and Patanjula. His general intelligence, especially in Hindu Philosophy, is well known : On this point, the Hon'ble Mr. Millet, to whom I had once occasion to introduce this Pundit, will, I have no doubt, add his testimony.

* তারানাথ ১৫ জানুয়ারি ১৮৩৫ তারিখে সংস্কৃত কলেজ হইতে যে প্রশংসা-পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি ছয় বৎসর কলেজে কাব্য, অলঙ্কার; জ্যোতিষ, ন্যায়, বেদান্ত ও স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

The circumstance of his having been educated at the Institution in which he now aspires to be a Professor gives him the advantage of being thoroughly acquainted with the system of instruction and the best mode of bearing and conduct to be observed towards the students. On the whole, I have not the least doubt that Taranath, if appointed will, by his services, make a worthy return to his Alma Mater for the benefits which he in the past received.—Letter dated 2 Jany. 1845 from G. T. Marshall, to Baboo Rassomoy Dutt, Secy. to the Council of Education, Sanst. Coll. Dept.

২৩ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে তারানাথ তর্কবাচস্পতি মাসিক ৯০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৮৭৩ সনের ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া ৬২ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরগ্রহণকালে তাঁহার বেতন ছিল—১৫০৲। ১ জানুয়ারি ১৮৭৪ হইতে মৃত্যুকাল-পর্য্যন্ত (২০ জুন ১৮৮৫) তিনি মাসিক ৭০৸১০ টাকা পেনসন পাইয়াছিলেন। এই পেনসন-সংক্রান্ত কাগজপত্রে সংস্কৃত কলেজে তাঁহার চাকুরির এইরূপ ইতিহাস দেওয়া আছে :—

Sanskrit College		*Date of beginning*	*Date of end*
1st Grammar Professor	90/-	23 Jany. 1845	11 June 1863
do.	100/-	12 June 1863	30 Apr. 1866
do.	120/-	1 May 1866	27 May 1870
do.	150/-	28 May 1870	11 Sep. 1872
Prof. of Hindu Philosophy and Grammar	150/-	12 Sep. 1872	31 Dec. 1873

তারানাথ তর্কবাচস্পতি বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের কালানুক্রমিক একটি তালিকা দিতেছি :—

১৮৪৭ — কিরাতার্জ্জুনীয় (মল্লিনাথের টীকা সহ)
— শিশুপালবধ ঐ ১৭৬৯ শক।
১৮৪৯ — বৈয়াকরণভূষণসার (স্বকৃত বিবৃতি সহ)। ১৯০৬ সংবৎ।
১৮৫১ — রঘুবংশ (মল্লিনাথের টীকা সহিত)
— কুমারসম্ভব, ১-৭ সর্গ ঐ ১৯০৭ সংবৎ।
— শব্দার্থরত্ন (স্বকৃত) ভাদ্র, ১৭৭৩ শক।
— বাক্যমঞ্জরী (স্বকৃত, বঙ্গাক্ষরে)।
১৮৫৭ — ধনঞ্জয়বিজয় (স্বকৃত টীকা)
— মহাবীরচরিত। ইং ১৮৫৭।
১৮৫৮ — ছন্দোমঞ্জরী (তারানাথ কর্ত্তৃক সংস্কৃত)। ১৯১৫ সংবৎ।
১৮৬১ — গয়ামাহাত্ম্য ও গয়াশ্রাদ্ধাদিপদ্ধতি।

১৮৬৩ — সিদ্ধান্তকৌমুদী (সরলা নাম্নী ব্যাখ্যা)। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৩।
(পূর্ব্বার্দ্ধ ১৭৮৫ শক, পরার্দ্ধ ১৭৮৬ শক)

১৮৬৪ — রত্নাবলী (স্বকৃত প্রাকৃতানুবাদ সহ)। ১৯২১ সংবৎ।

১৮৬৫ — ব্রহ্মস্তোত্রব্যাখ্যাসহিত সিদ্ধান্তবিন্দুসার। বঙ্গাক্ষরে, ১৭৮৭ শক।

১৮৬৬ — তুলাদানাদিপদ্ধতি (স্বকৃত, বঙ্গাক্ষরে)। ভাদ্র, ১৯২৩ সংবৎ।

— কুমারসম্ভব, ৮ম-১৭শ সর্গ।

১৮৬৮ — বেণীসংহার (স্বকৃত টীকা সহ)। ১৯২৪ সংবৎ।

— আশুবোধ ব্যাকরণ। ১৯২৪ সংবৎ।

১৮৬৯ — ধাতুরূপাদর্শ। ১৯২৬ সংবৎ।

— রাজপ্রশস্তি। ১৯২৬ সংবৎ।

১৮৬৯-৭০ শব্দস্তোমমহানিধি।

১৮৭০ — বৃত্তরত্নাকর (টীকা সহ)।

— মুদ্রারাক্ষস (স্বকৃত বিবৃতি সহ)। ২ অগ্রহায়ণ ১২৭৭।

— মালবিকাগ্নিমিত্র ঐ । ইং ১৮৭০।

১৮৭১ -- হিতোপদেশ (স্বকৃত টীকা সহ)। ইং ১৮৭১।

— অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ। আগষ্ট ১৮৭১।
(ইহার "বিজ্ঞপ্তি"র তারিখ ইং ১৮৬৩)

— গায়ত্রী প্রকরণ।

— সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (স্বরচিত বৃত্তি সহ)।

১৮৭২ — পরিভাষেন্দুশেখর।

— ভাষাপরিচ্ছেদ (মুক্তাবলী টীকা সহ)

— ভামিনীবিলাস। ইং ১৮৭২।

— সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

— কবিকল্পদ্রুম। ইং ১৮৭২।

— কাদম্বরী, পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ (সব্যাখ্যান)। ১৭৯৩ শক।

— দশকুমারচরিত (স্বকৃত টীকা সহ)। ১৯২৯ সংবৎ।

— বহুবিবাহবাদ।

১৮৭৩ — লিঙ্গানুশাসন (স্বকৃত বিবৃতি সহ)।

১৮৭৩-৮৪ — বাচস্পত্যাভিধান।

এই সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-রচিত তর্কবাচস্পতির জীবনচরিতে দেওয়া আছে। অপর একখানি জীবনচরিতে তারানাথের আরও দু-একটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

(১) তারাধন তর্কভূষণ 'তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী এবং সংস্কৃত ভাষার উন্নতি' পুস্তকের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

…১৯০৬ সম্বতে পটলডাঙ্গায় টামার্স লেনে বিশ্বপ্রকাশ নামক একটী দেবাক্ষরের ও বঙ্গাক্ষরের মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপন করিয়াছিলাম। এই মুদ্রাযন্ত্রের আয়বৃদ্ধির নিমিত্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই যন্ত্র হইতে একখানি পঞ্জিকা বাহির করিয়াছিলেন। ঐ পঞ্জিকার ভূমিকায় তিনি পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের আকার ও গতিবিধি আদি আর্য্যভট্ট, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির জ্ঞাতানুসারে পয়ার ছন্দে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। এ কথা এ স্থলে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যিনি পঞ্জিকাসন্নিবেশিত পয়ারগুলি পাঠ করিয়াছেন, সে কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে জানিতেন না বলিয়া যে তাঁহার সংস্কার আছে, তাহা বিদূরিত হইবে।

(২) তারাধন পুনরায় ৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

['আবার অতি অল্প হইল'] এই জঘন্য পুস্তিকাতে তারানাথের "ঘূর্ণায়মান" আদি যে দুই একটী ব্যাকরণ অশুদ্ধির কথা উল্লেখ ছিল তর্কবাচস্পতি কেবলমাত্র তাহার উত্তর বঙ্গভাষায় কয়েক পত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর প্রযুক্ত কটুক্তির কোন উল্লেখই করেন নাই। তারানাথ এই প্রবন্ধের নাম দিয়াছিলেন "লাটী থাকিলে পড়ে না।"

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তারানাথ সম্বন্ধে সত্যই লিখিয়াছেন :—

তারানাথ তর্কবাচস্পতি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী এরূপ আর কেহ ছিলেন কি না, সন্দেহ।

রামদাস সিদ্ধান্ত তর্কপঞ্চানন

সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল—১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে দ্বিতীয় পণ্ডিত রামদাস সিদ্ধান্ত তর্কপঞ্চানন ছাত্রগণকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইতেন। কয়েক মাস অধ্যাপনার পরেই—২১ অক্টোবর ১৮২৪ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বেতন ছিল মাসিক ৪০৲।

কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন

রামদাসের শূন্য পদে ১৮২৪ সনের নবেম্বর মাস হইতে ৪০৲ বেতনে কীর্ত্তিচন্দ্র নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগ সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী কর্ত্তৃপক্ষকে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

The Secretary begs to inform the Sub Committee of the Government Sanscrit College that Ramdasa Siddhanta Terka Panchanana the 2d Pundit of the Mugdhabodh Grammar Class died of fever on

the 21st ultimo. Kirti Chandra who is acting as Librarian during the absence of Lakshi Narayana is a candidate for the vacant situation. He has been duly examined and found not only well qualified in the system of Grammar it will be his especial duty to teach but likewise versed in other departments of Science cultivated in the College. The Secretary begs therefore to propose him as a fit person to succeed to the office of the 2nd Mugdhabodha Grammar Pundit in the room of Ramdasa deceased and in the meantime he has been appointed to take charge of the classes until the pleasure of the Sub Committee is known.

1st November 1824.

১৮২৫ সনে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি তাঁহার মৃত্যু হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের বেতন-বই হইতে জানা যায়, তাঁহার হিসাবে অক্টোবরের ১৫ দিনের বেতন ২০৲ দেওয়া হইয়াছিল। কীর্ত্তিচন্দ্রের মৃত্যুতে ২২ অক্টোবর ১৮২৫ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন :—

> সহগমন।—কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন এক ব্যক্তি সুপণ্ডিত যিনি সংপ্রতি শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর স্থাপিত সংস্কৃত কালেজে এক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি গত ২৬ আশ্বিন বুধবার [?] ওলাউঠারোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর হইবেক ঞিহার সাধ্বী স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন।

কীর্ত্তিচন্দ্রের পদে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ নিযুক্ত হন,—তাঁহার কথা মুগ্ধবোধের ৩য় শ্রেণীর বিবরণে আলোচিত হইবে।

২য় শ্রেণী—

হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন

ছাত্রের আধিক্যবশতঃ ১৮২৫ সনের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধের ২য় শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই শ্রেণীর জন্য ২২ জানুয়ারি ১৮২৫ তারিখে ৩০৲ বেতনে হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন নিযুক্ত হন। হাতীবাগানে হরিপ্রসাদের চতুষ্পাঠী ছিল। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বেতন ছিল ৪০৲।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ

হরিপ্রসাদের স্থলে মুগ্ধবোধ ৩য় শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

১৮৪৪ সনের মাঝামাঝি গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্থলে ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে ৫০৲ বেতনে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ স্থায়ী ভাবে ব্যাকরণের ২য় শ্রেণীর

অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহাকে এই পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী জি. টি. মার্শাল; শিক্ষা-পরিষদ্ তাঁহারই উপর নির্ব্বাচনের ভার দিয়াছিলেন। মার্শাল সাহেব লেখেন :—

> The second Professorship of 50 Rupees per mensem I would recommend to be given to Dwarakanath Vidyabhushan an ex-student of the Sanscrit College, who, I have been informed by Dr. Mouat, stood first on the List of Candidates lately examined for these appointments and in fact answered correctly all the questions submitted on the occasion. This last I consider a very satisfactory proof of his perfect efficiency in the particular department which he would be required to teach. In general acquirements also, I know him to be thoroughly qualified. He holds a certificate from the Hindu Law examination Committee, of eminent proficiency in Smriti or Hindu Law. He passed with great credit through the entire regular course of the College, studying every branch of Literature and Science, and quitted the institution last year at the expiry of the prescribed period, 12 years, during 2 last of which he was the head student and held one of the First Scholarships of 20 Rupees a month. His youth (his age is about 25 years) is rather in his favor for this subordinate and laborious situation. I firmly believe no other candidate can produce equal proofs of qualification and I therefore strongly recommend Dwarakanath Vidyabhushan for the vacancy.—Letter dated 2 Jany. 1845 from G. T. Marshall, to Baboo Rassomoy Dutt, Secy. to the Council of Education, Sanst. College Dept.

দ্বারকানাথ এই পদে ১৪ মে ১৮৫৫ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৭৩ সনের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি পেন্‌সনের জন্য আবেদন করেন; এই পেন্‌সনসংক্রান্ত কাগজ-পত্র হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল তথ্য—প্রধানতঃ চাকুরি-জীবন সংক্রান্ত জানিতে পারা যায়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

Dwarakanath Vidyabhushan
Father : Hara Chandra Nyaratna
Brahman
Residence : Changripotha, 24 Pargs.
Date of beginning service : 16 November 1844.
Length of Service : 28 years 7 months 18 days.
Proposed Pension : Rs. 69-3-0
Age : 53 years 3 months.

HISTORY OF SERVICE

Sanskrit College		*Date of beginning*	*Date of End*
Librarian	30 Rs.	16 Nov. 1844	13 Jany. 1845
2d Grammar Prof.	50 ,,	14 Jany. 1845	1 Apr. 1845
do.	50 ,,	2 Apr. 1845	14 May 1855
Asst. to the Principal	100 ,,	15 May 1855	30 Nov. 1855
Prof. of Sanskrit Literature	90 ,,	1 Dec. 1855	11 June 1863
	100 ,,	12 June 1863	28 Feb. 1866
	120 ,,	1 Mar. 1866	27 May 1870
	150 ,,	28 May 1870	9 Aug. 1872
On sick leave		10 Aug, 1872	31 Aug. 1872
Prof. of Sanskrit Literature	150 ,,	1 Sep. 1872	2 Sep. 1872
On sick leave		3 Sep. 1872	17 Sep. 1872
Prof. of Sanskrit Literature		18 Sep. 1872	30 June 1873

১ জুলাই ১৮৭৩ তারিখ হইতে দ্বারকানাথ পেনসন্ গ্রহণ করেন; তাঁহার পেনসনের পরিমাণ ছিল—৬৯।১০।

দ্বারকানাথ কর্তৃক প্রণীত, সম্পাদিত ও "প্রচারিত" পুস্তকগুলির একটি তালিকা দিতেছি :—

১। নীতিসার। ১৮৫৬।

২। রোমরাজ্যের ইতিহাস। ১৬ বৈশাখ ১২৬৪ (ইং ১৮৫৭)। পৃ. ২৫০।

৩। সুবুদ্ধি ব্যবহার। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৭ (ইং ১৮৬০)। পৃ. ৫৭।

৪। গ্রীস ও ম্যাসিডোনিয়ার ইতিহাস। পৃ. ৩৫৭।

ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল নাই, তবে ইহা যে "সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত" তাহার উল্লেখ আছে। সোমপ্রকাশ যন্ত্র ১৮৬২ সনের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুস্তকখানি যে ১৮৬২-৬৪ সনের মধ্যে প্রকাশিত, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ১৮৬৫ সনের 'সোমপ্রকাশে' দ্বারকানাথের অন্য কয়েকখানি পুস্তকের মধ্যে এই পুস্তকখানিরও বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি।

৫। ভূষণসার ব্যাকরণ। ১৮৬৫।* (নূতন প্রণালী অনুসারে বাঙ্গালা ব্যাকরণ)

৬। বিশ্বেশ্বর বিলাপ (পদ্য)। ৪ ভাদ্র ১২৮১ (ইং ১৮৭৪)। পৃ. ১০৭।

৭। সাংখ্যদর্শন (মূল, ভাষ্য ও সরল অনুবাদ সহ)। ১২৯৩। পৃ. ৩০০। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' পুস্তকখানি দ্বারকানাথ কর্তৃক "সম্পাদিত" হইয়া, তাঁহার

* ১ মে ১৮৬৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' ইহার বিজ্ঞাপন প্রথমে প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দুর্গাচরণ রায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে দ্বারকানাথের পুস্তকাবলী সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

ইনি গ্রীস ও রোম রাজ্যের দুই খানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া মুদ্রিত করেন। তদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর পাঠোপযোগী কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন যথা;—নীতিসার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ভাগ, বিশ্বেশ্বর বিলাপ ও উপদেশমালা ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ। সাংখ্যদর্শন এবং ভূষণসার ব্যাকরণ।—২য় সংস্করণ (১২৯৮), পৃ. ৪৯৩-৯৪।

১৩ নবেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' দ্বারকানাথ তাঁহার "প্রণীত" ও "প্রচারিত" কয়েকখানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে "প্রচারিত" পুস্তকখানি—"মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ...৸৹"

দ্বারকানাথ দুইখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই দুইখানি :—

(১) 'সোমপ্রকাশ'—এই সাপ্তাহিক পত্রখানির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৫ নবেম্বর ১৮৫৮ তারিখে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকের ২৪৭-৪৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

(২) 'কল্পদ্রুম'—এই মাসিক পত্রখানির আবির্ভাব ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে। ইহাতে 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

১৮৮৬ সালের ২২এ আগষ্ট দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যু হয়।

তৃতীয় শ্রেণী

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ

কীর্ত্তিচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তৎপদে ১৭ নবেম্বর ১৮২৫ তারিখে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মাসিক ৩০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে যোগদান করিবার পূর্ব্বে তিনি এম. এন্‌স্‌লি ও অন্যান্য সিবিলিয়ানের পণ্ডিত ছিলেন।

গঙ্গাধর হালিশহর—কুমারহট্ট-নিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র। তিনি কলিকাতা সিমুলিয়া শিবচন্দ্র দাসের গলির ভিতর একখানি ক্ষুদ্র বাটী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিতেন।

গঙ্গাধর প্রথমে সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াইতেন। অধ্যাপনা-কার্য্যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রথমে তাঁহার শ্রেণীতেই প্রবেশ করেন ও তথায় তিন বৎসর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের অধ্যাপনা বিষয়ে বিদ্যাসাগর এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন :—

কুমারহট্টনিবাসী পূজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে

স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, অপর দুই শ্রেণীর ছাত্রেরা কোন ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদান-কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্নবান্, ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।—'শ্লোকমঞ্জরী', বিজ্ঞাপন।

মুগ্ধবোধের ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ তারিখে মৃত্যু হইলে গঙ্গাধর তাঁহার স্থলে ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয়ের দু-একটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি এই—

(১) সেতুসংগ্রহ। ১৮৩৫।

'সেতুসংগ্রহ' মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা। এ-সম্বন্ধে ৭ জুলাই ১৮৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' তর্কবাগীশ নিম্নোদ্ধৃত পত্র প্রকাশ করেন :—

> সম্প্রতি মুগ্ধবোধের সুগমার্থ প্রকাশক সেতু সংগ্রহনামক এক পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে ইহা যদি কোন ব্যুৎপন্ন লোকে লিখিয়া গ্রহণ করেন তবে পঞ্চ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন পুস্তকের আকর স্থান গবর্ণমেণ্টসংস্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যামন্দির পত্রসংখ্যা প্রায় ৩০০ শত গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে বহুদূরদর্শির দৃষ্টিপাত হইলে ভ্রমাদি প্রযুক্তাশুদ্ধ যদি থাকে তাহা শুদ্ধ হইতে পারিবে।···কুমারহট্টনিবাসি শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণঃ সংজ্ঞপ্তিঃ।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় 'সেতুসংগ্রহে'র একখানি পুথি আছে। ইহার পত্র-সংখ্যা ২৮৮। পুথিপাঠে জানা যায়, ইহার রচনাকাল ১৭৫৭ শক (ইং ১৮৩৫)।

১৮৭১ সনের জানুয়ারি মাসে গিরিশ তর্করত্ন সটীক 'মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্' প্রকাশ করেন। ইহাতে অন্যান্য টীকার সহিত গঙ্গাধর-কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকাও মুদ্রিত হইয়াছে।

(২) খোসগল্পসার। ইং ১৮৩৯।

এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, ১৪ মার্চ ১৮৪০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' নিম্নাংশ মুদ্রিত হয় :—

> খোসগল্পসার।—সংস্কৃত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগল্পসার নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে দেশের মধ্যে যে সকল রহস্যজনক কথা এবং তদনুরূপ স্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগ্রহীত হইয়াছে। [হরকরা, ১২ মার্চ]

'খোসগল্পসার' যে গঙ্গাধর তর্কবাগীশের রচনা, পাদরি লঙের মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় (পৃ. ৭৫) তাহার উল্লেখ আছে; তিনি লিখিয়াছেন :—

> TALES....*Khos Galpa Sar*, 1839, pleasing tales by Gungadhar Tarkavhagis, of Halishwar.

১৮৪৪ সনের জুন (?) মাসে গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থলে ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ স্থায়ী ভাবে ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

রামগোবিন্দ গোস্বামী (তর্করত্ন)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হইলে তৎপদে ৩য় শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ নিযুক্ত হন। ৩য় শ্রেণীর অধ্যাপকের শূন্য স্থান পূর্ণ করেন রামগোবিন্দ গোস্বামী। তাঁহার নিয়োগকাল ১ ডিসেম্বর ১৮৪০, মাসিক বেতন ৪০৲। সংস্কৃত কলেজে যোগদান করিবার পূর্ব্বে রামগোবিন্দ প্রুফ-সংশোধনের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত ছিলেন।

২য় শ্রেণীর অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সহকারী পদে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার স্থলে ১৫ জুন ১৮৫৫ হইতে রামগোবিন্দ ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২৮ মার্চ ১৮৬০ তারিখে রামগোবিন্দের মৃত্যু হয়।

৪র্থ শ্রেণী—

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর

১৮৪৬ সনের মে মাসে সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধের চতুর্থ শ্রেণী স্থাপিত হয়। ২০ মে ১৮৪৬ তারিখে হরিনাভি-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর (সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদের বেতন ছিল ৪০৲। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার শ্রেণীতে দুই বৎসর থাকিয়া মুগ্ধবোধের সন্ধি ও শব্দ শেষ করিয়াছিলেন। ৭ মে ১৮৫৫ তারিখে প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যু হয়।

প্রাণকৃষ্ণ কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি এই :—

১। কুলরহস্য। ১৮৪৪।

এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৫১ (১১ জুন ১৮৪৪) তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশ :—

> চন্দ্রিকা যন্ত্র হইতে কুলরহস্য নামা এক নূতন পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে, উক্ত যন্ত্রালয়ের পণ্ডিতাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় ঐ পুস্তক রচনা করেন, দুই সপ্তাহ গত হইল পণ্ডিতবর ভট্টাচার্য্য তাহার এক পুস্তক আমারদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন আমরা বিস্মৃতি ক্রমে পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা বিবেচনা করিতে পারি নাই,…গ্রন্থকর্ত্তা সংস্কৃত কবিতায় কুলরহস্যকে রহস্য চতুষ্টয়ে বিভক্ত করিয়া তাহাতে দাক্ষিণাত্য বৈদিক মহাশয়দিগের কুলীন মৌলিক বংশজাদির লক্ষণ ব্যবহার বাসস্থানাদির তাবদ্বিবরণ লিখিয়াছেন, ইহাতে আমরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কবিতাশক্তির বিশেষ প্রশংসা করি, তিনি সংস্কৃত ভাষায় চলিত শব্দে সুললিত কবিতা করিয়াছেন, অতএব ভট্টাচার্য্য মহাশয় বর্ত্তমানকালীন কবিগণের মধ্যে উত্তম শ্রেণীতে গণিত হইতে পারেন,… ।

২। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাশতকং। ইং ১৮৪৫। পৃ. ১৫।
৩। ধর্ম্মসভা বিলাস। ইং ১৮৫০। পৃ. ৪১। (চম্পূকাব্য)
৪। শ্রীশিবশতক স্তোত্ররত্ন। ইং ১৮৫৪। পৃ. ৫৯।
৫। শরীরোৎপত্তিক্রম।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই নামের একখানি ৯ পৃষ্ঠার পুস্তিকা আছে। মিউজিয়মের পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল—"কলিকাতা ১৯১৭" (ইং ১৮৬০) দেওয়া আছে। সম্ভবতঃ ইহা পুনর্মুদ্রিত পুস্তক ; কারণ, ইহা প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর কিছু দিন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

৫ম শ্রেণী—

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

ছাত্রাধিক্য হওয়ায়, চারিটি মুগ্ধবোধ-শ্রেণীতে কুলাইতেছিল না। এই কারণে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণী স্থাপিত এবং মাসিক ৪০৲ বেতনে ঐ শ্রেণীর জন্য এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত ২৯ জানুয়ারি ১৮৪৭ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লেখেন। পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারি মাসে এই প্রস্তাব মঞ্জুর হয়। তদনুসারে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (ভূতপূর্ব্ব স্মৃতি-অধ্যাপক) এই পদে ১২ মার্চ ১৮৪৭ তারিখে মাসিক ৪০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর—একরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন। এই কারণে তাঁহার দ্বারা অধ্যাপনা-কার্য্য আশানুরূপ ভাবে চলিতেছিল না। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইবার প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের আমূল সংস্কার-কল্পে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন ; তাহাতে কাশীনাথ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> The 5th Grammar Professor, Pundit Kashinath Tarkapanchanan, is not quite equal to discharge the duties of his class. He is an old Pundit and seems to be in his dotage. He is altogether unacquainted with that discipline which is absolutely required for so young a class as his. Being an old man, he will not bear to be directed, as is usual with all Pundits of his age.
>
> From all these circumstances his class is the most irregular of all. Therefore, I beg leave to propose that he be placed in charge of the library with his present salary, Rs. 40 a month,...

বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাব শিক্ষা-পরিষদ্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। কলেজের অধ্যাপকদের

বেতন-বইয়ে প্রকাশ, কাশীনাথ ১৮৫১ সনের জুন মাস হইতে "গ্রন্থাধ্যক্ষ" হিসাবে বেতন লইয়াছিলেন।

সাহিত্য-শ্রেণী

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

[এ বৎসরের প্রথম সংখ্যা পত্রিকায় সাহিত্য-শ্রেণীর বিবরণের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইয়াছে]

জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ অস্থায়ী ভাবে সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপনা করিতেছিলেন। জয়গোপালের স্থলে যিনি স্থায়ী ভাবে সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তিনি সংস্কৃত কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র—মদনমোহন তর্কালঙ্কার। জয়গোপালের মৃত্যুকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত ৯০৲ বেতনে সাহিত্য-অধ্যাপকের পদটি বিদ্যাসাগরকে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর ঐ পদ গ্রহণ না করিয়া, সতীর্থ মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে দিতে অনুরোধ করেন। সংস্কৃত কলেজে মদনমোহনের নিয়োগকাল—২৭ জুন ১৮৪৬ : এই পদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি যে-যে স্থলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে তাহার এইরূপ উল্লেখ আছে :—

> Vernacular Teacher of the Pathsala attached to the Hindoo College for 2 months in 1842.
>
> Pundit of the College of Fort William from April 1843 to December 1845.
>
> Pundit of the Kissenagar College from Jany. 1846 to June.

মদনমোহনের 'জীবনচরিতে' (পৃ. ৭) প্রকাশ, তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কর্ম্ম স্বীকার করিবার পূর্ব্বে এক বৎসর বারাসত-গবর্মেণ্ট-বিদ্যালয়ের প্রথম পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন।

মদনমোহন ৫ নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। তিনি পরবর্ত্তী ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে ছিলেন। কাউন্সিল-অব-এডুকেশন তাঁহার পদত্যাগে এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> Ordered to be recorded with an expression of the high opinion entertained by the Council for the zeal and ability with which Pundit Muddonmohun Tarkalankar performed his duties during his connection with the Sanskrit College.

সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হন ; এই পদে ছয় বৎসর কার্য্য করিবার পর তিনি তথাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ইহার এক বৎসর পরে তিনি কান্দীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তথায় ৯ মার্চ ১৮৫৮ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মদনমোহন যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির একটি তালিকা দিতেছি :—

(১) রসতরঙ্গিণী। ইং ১৮৩৪ (?)

মদনমোহনের জীবনীতে প্রকাশ, "অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন সময়েই সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রম কালে তর্কালঙ্কার রসতরঙ্গিণীনামক কবিতা গ্রন্থে বঙ্গভাষায় তাঁহার বিচিত্র কবিত্বশক্তির প্রথম পরিচয় দেন।"

(২) বাসবদত্তা। শক ১৭৫৮ [=ইং ১৮৩৬]। পৃ. ১৫১।

(৩) শিশুশিক্ষা, ১ম-৩য় ভাগ। ইং ১৮৪৯।

মদনমোহন যে-সকল সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেগুলিরও একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্—শ্রীহর্ষবিরচিতম্। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

কবিকল্পদ্রুমঃ—বোপদেব কৃত। পরিভাষা টীকা সহ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

অনুমানচিন্তামণিদীধিতিঃ—রঘুনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য কৃত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

বৈয়াকরণভূষণসারঃ—কৌণ্ড ভট্ট কৃত। তারানাথ তর্কবাচস্পতি পরিশোধিত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

আত্মতত্ত্ববিবেকঃ—উদয়নাচার্য্য কৃত। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন পরিশোধিত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

দশকুমারচরিতম্—দণ্ডিকৃত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

কাদম্বরী—বাণভট্ট কৃত। ১৯০৬ (?) সংবৎ।

মেঘদূতম্—কালিদাস কৃত। মল্লিনাথকৃত টীকা সহ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৭ সংবৎ।

কুমারসম্ভবম্, ১-৭ সর্গ—কালিদাস কৃত। মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৭ সংবৎ।

মদনমোহন যখন সংস্কৃত কলেজে ছিলেন, তখন তিনি ও বিদ্যাসাগর উভয়ে মিলিয়া ১৮৪৭ সনে কলিকাতায় সংস্কৃত যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা উভয়েই এই মুদ্রাযন্ত্রের সমানাংশভাগী ছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'আত্মচরিতে' মদনমোহন তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> মদনমোহন তর্কালঙ্কার সে সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় একজন সুকবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত প্রধান কবিতার নাম বাসবদত্তা। তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। বিটন স্কুল যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন আপনার কন্যাকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া এবং অন্যান্য প্রকারে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাররূপ মহৎ

কার্য্যে বিটন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিটন সাহেব এজন্য তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং "My dear Madan" (প্রিয় মদন) বলিয়া পত্র লিখিতেন। ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "সর্ব্বশুভকরী" নামে পত্রিকা বাহির করেন।* এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটী প্রস্তাব তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য্য হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শিক্ষা-পরিষদের সেক্রেটরী ডাঃ ময়েট মদনমোহনের স্থানে সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু নানা কারণে বিদ্যাসাগর এই পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শেষে ডাঃ ময়েট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় বিদ্যাসাগর জানাইলেন, শিক্ষা-পরিষদ্ তাঁহাকে প্রিন্সিপ্যালের ক্ষমতা দিলে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে পারেন। ডাঃ ময়েট বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র লিখাইয়া লইলেন।

৫ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে ৯০৲ বেতনে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রকৃত অবস্থা কি, এবং কিরূপ ব্যবস্থা করিলে কলেজের উন্নতি হইতে পারে—এ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য বিদ্যাসাগরের উপর ভার পড়িল। ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর 'দীর্ঘচিন্তা ও যথেষ্ট বিবেচনা-প্রসূত' এক বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষা-পরিষদে দাখিল করিলেন।†

শিক্ষা-পরিষদ্ এমনই একজন কার্য্যপটু, দৃঢ়চিত্ত লোককে চাহিতেছিলেন। সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠিত করা যায় কি না—এই কথাই তাঁহারা কিছু দিন হইতে ভাবিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত অবসর গ্রহণ করিলে পুরাতনের বাধা সরিয়া গেল।

২২ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখ হইতে বিদ্যাসাগর ১৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইলেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে সেক্রেটরী ও অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদ রহিত হইল।

---

* 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সনের আগষ্ট মাসে। এই পত্রিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকের ১৭৭-৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† এই দীর্ঘ রিপোর্ট *General Report on Public Instruction*, etc. 1850-51 গ্রন্থের ৩৪-৪৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। সুবলচন্দ্র মিত্রের *Isvar Chandra Vidyasagar* পুস্তকেও এই রিপোর্ট পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

যাঁহারা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সরকারী দপ্তরখানার নথিপত্রের সাহায্যে লিখিত আমার 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' পাঠ করিতে পারেন।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকগণের বিবরণ প্রকাশকালে (৪৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) শেষ সহ-সম্পাদক—শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নামটি অনবধানবশতঃ বাদ পড়িয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে শ্রীশচন্দ্র ১ ডিসেম্বর ১৮৪৭ তারিখে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ২১ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে সংস্কৃত কলেজ হইতে সহ-সম্পাদকের পদ একেবারে রহিত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্যের অধ্যাপক হইতে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইলে, সহকারী সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মাসিক ৯০৲ বেতনে ২২ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখ হইতে সাহিত্যের অধ্যাপক হন। এই পদে তিনি ১৮৫৫ সনের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পর তিনি মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হন। সংস্কৃত কলেজে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ শ্রীশচন্দ্রের শূন্য পদ অধিকার করেন।

শ্রীশচন্দ্র বিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র। আর একটি কারণেও তাঁহার নাম সাধারণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত; বিধবা-বিবাহ-আইন হইলে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিধবা-বিবাহ করেন (৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬)।

সংশোধন ও সংযোজন

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৬৩) ভরতচন্দ্র শিরোমণির পরিচয়দানকালে লিখিয়াছিলাম, "ভরতচন্দ্র খুব সম্ভব ১৮৭৭ সালে পরলোকগমন করেন।" প্রকৃতপক্ষে শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যু হয়—২২ অগ্রহায়ণ ১২৮৫ (ইং ৭ ডিসেম্বর ১৮৭৮) তারিখে।

প্রাচীন বাঙ্‌লার ভূমি-ব্যবস্থা

ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এম. এ.

কৃষিপ্রধান দেশে ভূমি-ব্যবস্থা সমাজ-বিন্যাসের গোড়ার কথা। প্রাচীন বাঙলায় কৃষিই ছিল অন্যতম প্রধান ধনসম্বল। কৃষি ভূমি-নির্ভর ; কাজেই ভূমি-ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে গ্রামের সংস্থান, শ্রেণী-বিন্যাস, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির অথবা সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ, বিভিন্ন প্রকারের ভূমির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের দায় ও অধিকার, ইত্যাদি। সেইজন্য কৃষি-নির্ভর দেশে জনসাধারণের ইতিহাস জানিতে হইলে ভূমি-ব্যবস্থার ইতিহাসের পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

প্রাচীন বাঙ্‌লার ভূমি-ব্যবস্থার এই পরিচয় অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার ; প্রায় দুর্লভ বলিলেও চলে। প্রথমতঃ, ভূমি দান-বিক্রয় ব্যাপার উপলক্ষে যে কয়টি রাজকীয় শাসনের খবর আমাদের জানা আছে, তাহাই এ বিষয়ে আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান। ইহা ছাড়া অপরোক্ষ সংবাদ হয়ত কিছু কিছু পাওয়া যায় প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র জাতীয় সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে ; কিছু উপকরণ ঋগ্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও পালি জাতক গ্রন্থাদি হইতেও সংগৃহীত হইয়াছে। কোন কোনও পণ্ডিত এইসব উপকরণ অবলম্বন করিয়া প্রাচীন ভারতের ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু সার্থক গবেষণাও করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার সুবিস্তৃত এই দেশের বিস্তৃততর শাসন-লিপিলব্ধ সংবাদ লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষের ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয় লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই উভয় চেষ্টারই মূলে একটু গলদ রহিয়া গিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। স্মৃতিশাস্ত্র অথবা অর্থশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থাদিতে যে-সব সংবাদ পাওয়া যায় তাহা বাস্তবক্ষেত্রে কতটা প্রয়োজিত হইয়াছিল, কতটা হয় নাই সে-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এ কথা সহজেই অনুমান করা চলে প্রচলিত নিয়মকানুন বিধি-ব্যবস্থাগুলিই এই সব গ্রন্থে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, অন্ততঃ চেষ্টাটা সেই দিকেই হইয়াছিল ; কিন্তু তখনই প্রশ্ন উঠিবে, এই সুবিস্তৃত দেশের সর্বত্রই কি একই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, অথবা খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে যাহা ছিল, খৃষ্টপরবর্তী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতকেও কি তাহাই ছিল? এই যে একটির পর একটি বিদেশী জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করিয়াছে, রাজত্ব করিয়াছে, তাহারা যদি রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের, রাষ্ট্রাদর্শের অদল বদল করিয়া থাকিতে পারে, এবং তাহা যে করিয়াছে সে প্রমাণের অভাব নাই, তাহা হইলে ভূমি-ব্যবস্থার অদল বদল হয় নাই সে-কথা কেমন করিয়া বলা যাইবে? স্মৃতিশাস্ত্রগুলি সব একই সময়ে রচিত হয় নাই, যদিও মোটামুটি তাহাদের কালনির্ণয় আমাদের অজ্ঞাত নয়। তাহা সত্ত্বেও ইহা ত অনস্বীকার্য যে স্মৃতিশাস্ত্রের সমাজ-ব্যবস্থা আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার দিকে যতটা ইঙ্গিত করে, বাস্তব সমাজ-ব্যবস্থার দিকে ততটা নয়। সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আর কৌটিল্যের

"অর্থশাস্ত্র" সম্বন্ধে এ সন্দেহ যদি উত্থাপন নাই করা যায়, তাহা হইলেও এই জিজ্ঞাসা করা নিশ্চয়ই চলে যে, ইহার সাক্ষ্যপ্রমাণ কি পরবর্তী কাল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য? অথচ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং সামাজিক দাবীর প্রয়োজনে ভূমি-ব্যবস্থা যে পরিবর্তিত হয় তাহা ত একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। স্মৃতিশাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-সব কথা বলা যায়, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে সে-কথা ত আরও বেশী প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া এই জাতীয় গ্রন্থের সাক্ষ্যপ্রমাণ কোনটিই আমরা প্রাচীন বাঙ্‌লা দেশে নিঃসন্দেহে প্রয়োগ করিতে পারি না, কারণ কোন সাক্ষ্যপ্রমাণই নির্দিষ্টভাবে বাঙ্‌লা দেশের দিকে ইঙ্গিত করে না। বাঙ্‌লার বাহিরের শাসনলিপির প্রমাণও বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয়ে ব্যবহার করা চলে না, যদিও সে চেষ্টা পণ্ডিতদের মধ্যে হইয়াছে। চোখের সম্মুখেই আমরা দেখিতেছি, মাদ্রাজে অথবা ওড়িষ্যায়, আসামে অথবা গুজরাতে যে ভূমিব্যবস্থা আজ প্রচলিত, বাঙ্‌লা দেশের সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই। বস্তুতঃ বর্তমান কালে এক প্রদেশের ভূমি-ব্যবস্থা হইতে অন্য প্রদেশের ভূমি-ব্যবস্থা বিভিন্ন। প্রাচীন কালেও এই বিভিন্নতা ছিল না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় কি? ভূমির শ্রেণী বিভাগ নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর; ভাগ, ভোগ, কর, ইত্যাদি নির্ভর করে ভূমিলব্ধ আয়ের উপর, সে-আয়ের তারতম্য ভূমির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তাহা ছাড়া, সব চেয়ে যেটি বড় কথা, ভূমির উপর অধিকার এবং সে-অধিকারের স্বরূপ, তাহাও এই সুবিস্তৃত দেশে বিভিন্ন কালে একই প্রকার ছিল, এই অনুমানই বা কি করিয়া করা যায়? যে-জাতীয় গ্রন্থের উল্লেখ আগে করা হইয়াছে, এই সব গ্রন্থ প্রায় সমস্তই ব্রাহ্মণ্য আদর্শের দ্বারা শাসিত সমাজের সৃষ্টি; কিন্তু এই সমাজের বাহিরে অনার্য, আর্যপূর্ব সমাজ ও সেই সমাজের অগণিত লোক আমাদের দেশে বাস করিত; "শিষ্টদেশ"-বহির্ভূত এই বাঙ্‌লা দেশে তাহাদের সংখ্যা ও প্রভাব কম ছিল না। আমাদের ধর্ম, ধ্যানধারণা, আচারব্যবহার, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদিতে এখনও সেই সব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; আমাদের ভূমি ব্যবস্থায় সেই প্রভাব পড়ে নাই, এ কথা কে বলিবে? সেই প্রভাব ভারতবর্ষের সর্বত্র এক ছিল না। আর্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বর্তমান যুক্তপ্রদেশে এই প্রভাবকে ঠেকাইয়া রাখা হয়ত সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু বাঙ্‌লা দেশে তাহা হইয়াছিল কি? পিতৃপ্রধান আর্য সমাজসংস্থান এবং মাতৃপ্রধান আর্যপূর্ব অথবা অনার্য সমাজসংস্থানে ভূমি-ব্যবস্থার তারতম্য থাকিতে বাধ্য; এবং এই তারতম্য প্রাচীন ভারতের ভূমি-ব্যবস্থাকে বিভিন্ন দেশখণ্ডে বিভিন্ন ভাবে রূপ দান করেন নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় কি? এই সব কারণে কেবল মাত্র পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি অবলম্বনে ভূমি-ব্যবস্থার ইতিহাস রচনা করা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ ভাবে, প্রাচীন বাঙ্‌লার ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয়ে এই জাতীয় উপাদানের উপর কিছুতেই নির্ভর করা চলে না।

অন্যক্ষেত্রে যেমন এক্ষেত্রেও তেমনই, এই ভূমিব্যবস্থার পরিচয়ে আমি আমাদের প্রাচীন ভূমি দান-বিক্রয় সম্বন্ধীয় তাম্র-পট্টোলীগুলিকেই নির্ভরযোগ্য উপাদান বলিয়া

মনে করি। প্রথমতঃ, ইহাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্বন্ধে অবাস্তবতার আপত্তি তুলিবার উপায় নাই; বস্তুতঃ যাহা প্রচলিত ছিল, যে-রীতি ও পদ্ধতি যখন অনুসৃত হইত, তাহাই যথাযথ ভাবে এই পট্টোলীগুলিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের উৎপত্তিস্থান ও কাল সম্বন্ধে কোনও অনিশ্চয়তা নাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে-সব সংবাদ.জানা একান্তই প্রয়োজন তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় এই সব উপাদানে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহা যতটুকু পাওয়া যায়, যতটুকু বুঝা যায়, ততটুকুই মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য; যাহা পাওয়া যায় না তাহা লইয়া অভিযোগ করা চলে, কিন্তু কল্পনার সাহায্যে পূরণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য বুদ্ধিসাধ্য,যুক্তিসাধ্য অনুমানে বাধা নাই, যতক্ষণ সে অনুমান সমাজ-বিবর্তনের সাধারণ ইতিহাসসম্মত নিয়ম, সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিত অতিক্রম করিয়া না যায়। তাহা ছাড়া এইসব প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে এমন কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে, যাহা খুব সুবোধ্য নয়; এমন সব শব্দ ও পদের ব্যবহার এই সব উপাদানে আছে যাহা সমসাময়িককালে নিশ্চয়ই খুব সহজবোধ্য ছিল, কিন্তু আমাদের কাছে এখন আর তেমন নয়। এই সব ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র জাতীয় উপাদানের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে, আমিও লইয়াছি; তাহার একমাত্র কারণ, এই সব গ্রন্থে পূর্বোক্ত শব্দ বা পদের বা দুর্বোধ্য ও কষ্টবোধ্য রীতিপদ্ধতিগুলির সুবোধ্য ও বিস্তৃততর ব্যাখ্যা অনেক সময় পাওয়া যায়।

ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে-সব পট্টোলী প্রাচীন বাঙ্‌লায় এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলি সমস্ত ভূমি-দানবিক্রয় সম্বন্ধীয়; এবং এই লিপিগুলিতে ভূমি-দানবিক্রয়ের উপায়ের ক্রম কম বেশী বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার ফলে ভূমি-সম্পর্কিত দায় ও অধিকার, ভূমির প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক প্রকার সংবাদ এই লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। এই উপায়-ক্রমের একটু পরিচয় এইখানে লওয়া যাইতে পারে। রাজা কর্তৃক ব্রাহ্মণকে কিংবা দেবতার উদ্দেশ্যে ভূমি-দানের লিপি বা দলিল প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত নয়; কিন্তু প্রাচীন বাঙ্‌লার এই পর্বের লিপিগুলি ঠিক এই জাতীয় ব্রহ্মদেয় বা দেবোত্তর ভূমি-দানের দলিল নয়। এই শাসনগুলি একটু বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিলে প্রাচীন বাঙ্‌লার ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এমন সব সংবাদ পাওয়া যায় যাহা প্রাচীন ভারতের ভূমি-দান সম্পর্কিত শাসনগুলিতে নাই।

প্রথমেই দেখিতেছি, ভূমি ক্রয়েচ্ছু যিনি তিনি স্থানীয় রাজসরকারের কাছে আবেদন বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। ক্রয়েচ্ছু একজনও হইতে পারেন, একজনের বেশীও হইতে পারেন, এবং একাধিক ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি একই সঙ্গে ক্রয়ের ইচ্ছা বিজ্ঞাপিত করিতে পারেন। যেমন, বৈগ্রাম তাম্রপট্টোলীতে দেখা যায় একই সঙ্গে দুই ভাই, ভোয়িল ও ভাস্কর, একত্র রাজসরকারে ভূমি-ক্রয়ের আবেদন জানাইতেছেন। * ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা

* পাহাড়পুর পট্টোলীতে দেখি, ব্রাহ্মণ নাথশর্মাও তাঁহার স্ত্রী রামী একই সঙ্গে আবেদন উপস্থিত করিতেছেন।

private individual বা সাধারণ গৃহস্থও হইতে পারেন, অথবা রাজসরকারের কর্মচারী বা তৎসম্পর্কিত ব্যক্তি বা অধিকরণের সভ্যও হইতে পারেন। ধনাইদহ তাম্রপট্টোলীতে দেখা যাইতেছে ভূমি-ক্রেতা ও দাতা হইতেছেন একজন আয়ুক্তক বা রাজকর্মচারী; ৫নং দামোদরপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত নগরশ্রেষ্ঠী রিভুপাল স্থানীয় অধিষ্ঠানাধিকরণের একজন সভ্য; বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলীতে আবেদন-কর্তা হইতেছেন মহারাজ রুদ্রদত্ত যিনি মহারাজ বৈন্যগুপ্তের পদদাস, তবে রুদ্রদত্ত মূল্য দিয়া ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন, না বিনামূল্যেই তাহা লাভ করিয়াছিলেন স্পষ্ট করিয়া শাসনে বলা হয় নাই; ধর্মাদিত্যের ১নং পট্টোলীতে ভূমি-ক্রেতা ও দাতার নাম বটভোগ যিনি ছিলেন সাধনিক, এবং এই উপাধি হইতে মনে হয় তিনি রাজকর্মচারী ছিলেন; গোপচন্দ্রের পট্টোলীতে ভূমি-ক্রেতা ও দাতা হইতেছেন বৎসপাল যিনি ছিলেন বারকমণ্ডলের বিষয়-ব্যাপারের কর্তা, রাষ্ট্রের বিনিযুক্তক (বারক বিষয়-ব্যাপারায় বিনিযুক্তক বৎসপাল স্বামিনা), অর্থাৎ রাষ্ট্র-যন্ত্র সম্পর্কিত ব্যক্তি; ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত লোকনাথের পট্টোলীতেও ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত প্রদোষশর্মণ এই জাতীয় জনৈক রাষ্ট্র-যন্ত্রসম্পর্কিত ব্যক্তি, কিন্তু তিনি মূল্য দিয়া ভূমি লাভ করিয়াছিলেন কিনা তাহা শাসনে সুস্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। রাজসরকার বলিতে সাধারণতঃ যে অধিষ্ঠান বা বিষয়ে প্রস্তাবিত ভূমির অবস্থিতি সেই অধিষ্ঠানের আয়ুক্তক ও অধিষ্ঠানাধিকরণ অথবা বিষয়ের বিষয়পতি ও বিষয়াধিকরণ এবং স্থানীয় প্রধান প্রধান লোকদের বুঝায়। দুই একটি পট্টোলীতে মাঝে মাঝে ইহার অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম যে নাই তাহা বলা চলে না, তবে তাহা খুব উল্লেখযোগ্য নয় এই কারণে যে, সর্বত্রই ভূমির প্রকৃত অধিকারীর স্থানীয় প্রতিনিধিদের বিজ্ঞাপিত করাটাই ছিল সাধারণ নিয়ম। রাজসরকারের উল্লেখ-প্রসঙ্গে তদানীন্তন রাজার এবং ভুক্তিপতি বা উপরিকের নামও উল্লেখ করার রীতি প্রচলিত ছিল; কোন কোন ক্ষেত্রে শাসনের এই অংশে লিপির তারিখও দেওয়া হইয়াছে।

এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তির পরই দেখিতেছি, ভূমি-ক্রয়ের বিশেষ উদ্দেশ্যটি কি, তাহা আবেদন-কর্তা সাধারণতঃ প্রথম পুরুষেই বিজ্ঞাপিত করিতেছেন, এবং তিনি যে ক্ষেত্র, খিল, অথবা বাস্তুভূমির স্থানীয় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মূল্য দিতে প্রস্তুত আছেন তাহাও বলিতেছেন। দেখা যাইতেছে, সর্বত্রই ভূমি-ক্রয়ের প্রেরণা ক্রীত-ভূমি দেবকার্য বা ধর্মাচরণোদ্দেশে দানের ইচ্ছা।

তৃতীয় পর্বে পুস্তপাল বা দলিল-রক্ষকের বিবৃতি। ভূমি-ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তির আবেদন রাজসরকারে পৌছিলেই রাজসরকার তাহা পুস্তপাল বা পুস্তপালদের দপ্তরে পাঠাইতেছেন; পুস্তপাল বা পুস্তপালেরা প্রস্তাবিত ভূমি আর কাহারও ভোগ্য কিনা, আর কাহারও অধিকারে আছে কিনা, অন্য কেহ সেই ভূমি ক্রয়ের ইচ্ছা জানাইয়াছে কিনা, ভূমির মূল্য যথাযথ নির্ধারিত হইয়াছে কিনা, রাজসরকারের কোন স্বার্থ তাহাতে আছে কিনা ইত্যাদি জ্ঞাতব্য তথ্য নির্ণয় করিতেছেন তাহার বা তাহাদের দপ্তরে রক্ষিত কাগজপত্র, শাসন ইত্যাদির সাহায্যে, এবং কোনও প্রকার আপত্তি না থাকিলে প্রস্তাবিত ভূমি বিক্রয়ে সম্মতি

জানাইতেছেন। যে কতগুলি শাসনের খবর আমরা জানি তাহার প্রত্যেকটিতেই পুস্তপাল-দপ্তরের সম্মতিই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ; এই কারণে অনুমান করা স্বাভাবিক যে ব্যাপারটা নেহাৎই একটা কার্য-ক্রমগত ব্যাপারমাত্র। কিন্তু বোধ হয়, এই অনুমান সর্বত্র সঙ্গত নয়। ৫নং দামোদরপুর পট্টোলীতে বিষয়পতির সঙ্গে পুস্তপালের একটু বিরোধের ([বি]ষয়পতিনা কশ্চিদ্বিরোধঃ) ইঙ্গিত যেন আছে! কি লইয়া বিরোধ বাধিয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই ; তবে অনুমান করা চলে যে পুস্তপালের দপ্তর হইতে কোন আপত্তি উঠিয়াছিল। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত পুস্তপালের আপত্তি টেঁকে নাই।

চতুর্থপর্বে রাষ্ট্রের অনুমতি। যথানির্ধারিত মূল্য গ্রহণের পর রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে স্থানীয় রাজসরকার ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ভূমি বিক্রয়ের অনুমতি দিতেছেন ; এবং প্রস্তাবিত ভূমি যে-গ্রামে অবস্থিত সেই গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণ-কুটুম্বদের সম্মুখে, রাজপুরুষদের সম্মুখে বিক্রীত ভূমির সীমা নির্দেশ করিয়া, অন্য ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্থানীয় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভূমির মাপজোখ করিয়া বিক্রীত ভূমি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে হস্তান্তরিত করিয়া দিতেছেন। কি সর্তে তাহা দিতেছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে। দেখা যাইতেছে সর্বত্রই এই সর্ত অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী।

পঞ্চম পর্বে ক্রেতার বা বিক্রেতার পক্ষ হইতে ক্রীত অথবা বিক্রীত ভূমির দানের বিবৃতি। এই পর্বে ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কাহাকে বা কাহাদের কি উদ্দেশ্যে, কোন্ সর্তে ক্রীত ভূমি দান করিতেছেন তাহা বলা হইতেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষ হইতে বিক্রেতাও তাহা করিতেছেন।

ষষ্ঠ অথবা সর্বশেষ পর্বে এই জাতীয় দত্তভূমি রক্ষণাপহরণের পাপপুণ্যের বিবৃতি দিতেছেন এবং শাস্ত্রোক্ত শ্লোকে তাহা সমাপ্ত করিতেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এই পর্বে শাসনের তারিখ উল্লিখিত আছে। স্থানীয় রাজসরকারের শীলমোহর দ্বারা এই সব পট্টোলী নিয়মানুযায়ী রেজেষ্ট্রি করা হইত।

সমস্ত তাম্রশাসনেই যে সব ক'টি পর্বের উল্লেখ একই ভাবে আছে, তাহা নয়। কোন কোনও তাম্রপট্টে সব ক'টি পর্বের বিস্তৃত উল্লেখ নাই, কোন কোনও পর্বের আভাসমাত্র আছে ; আবার কোথাও কোথাও একেবারে বাদও দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া, কোনও কোনও ক্ষেত্রে জমির মাপজোখ ও সীমানির্দেশ রাজসরকার হইতে না করিয়া গ্রাম প্রধানদের তাহা করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যেমন পাহাড়পুর পট্টোলীতে। এইরূপ অল্প ব্যতিক্রম কোথাও কোথাও থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি পট্টোলীগুলি একই ধরণের।

কিন্তু এই পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যায়ে একেবারে অন্য ধরণের ভূমি-দানের পট্টোলীও যে নাই তাহা বলা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলী (৬ষ্ঠ শতক), জয়নাগের বপ্পঘোষবাট পট্টোলী (৭ম শতক), লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলী (৭ম শতক), এবং দেবখড়্গের আস্রফপুরের পট্টোলী (৮ম শতক) দুটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকটিই ভূমি-দানের শাসন, দত্তভূমি ক্রয়ের কোনও উল্লেখই ইহাদের মধ্যে

নাই ; কাজেই, পূর্বোক্ত শাসনগুলির ক্রমের সঙ্গে এই পট্টোলীগুলির তুলনা করা চলে না। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রপট্টোলীতে মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত স্বয়ং কিছু ভূমি দান করিতেছেন মহাযানী সম্প্রদায়ের বৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘকে ; লোকনাথের ত্রিপুরী পট্টোলীতে রাজকর্মচারী ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত প্রদোষশর্মণ এক অনন্তনারায়ণের মন্দির নির্মাণ ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এবং তাহার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য মহারাজ লোকনাথের কাছে কিছু ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন, এবং রাজা সেই ভূমিদান করিতেছেন। জয়নাগের বপ্পঘোষবাট পট্টোলী ও দেবখড়গের আস্রফপুর পট্টোলী দুটিতে ভূমিদানের অনুরোধ বা প্রার্থনা কেহ জানাইতেছেন, এমন উল্লেখও নাই ; রাজা নিজেই যথাক্রমে ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী ও কোন বৌদ্ধসংঘকে ভূমিদান করিতেছেন, এইটুকুই শুধু আমরা জানিতে পাইতেছি।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আগে যে দান-বিক্রয় সম্পর্কিত পট্টোলীগুলির উল্লেখ করিয়াছি সেগুলি সদ্যোক্ত পট্টোলীগুলি হইতে বিভিন্ন। পূর্বোক্ত পট্টোলীগুলি প্রথমতঃ ভূমি-বিক্রয়ের শাসন এবং দ্বিতীয়তঃ ভূমি-দানের শাসনও বটে। সদ্যোক্ত পট্টোলীগুলি শুধুই ভূমি-দানের শাসন। ভূমি-বিক্রয়ের শাসন কাহাকে বলে বার্হস্পত্য ধর্মশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে ; বৃহস্পতি বলেন, ন্যায্য মূল্য দিয়া কোন ব্যক্তি যখন কোনও বাস্তু, ক্ষেত্র অথবা অন্য কোনও প্রকার ভূমি ক্রয় করেন এবং মূল্যের উল্লেখসমেত ক্রয় কার্যের একটি শাসন লিপিবদ্ধ করিয়া লন, তখন সেই শাসনকে বলা হয় ভূমি-ক্রয়ের শাসন। * পূর্বোক্ত লিপিগুলি যে বৃহস্পতি-কথিত ভূমি-ক্রয়ের শাসন এ সম্বন্ধে তাহা হইলে কোনও সন্দেহ নাই। জর্মান পণ্ডিত য়লি (Jolly) মনে করেন, বৃহস্পতি খ্রীষ্টোত্তর ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতকের লোক ; যদি তাহা হয় তাহা হইলে বৃহস্পতি পূর্বোক্ত পট্টোলীগুলির প্রায় সমসাময়িক। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে"র 'বাস্তু' ও 'বাস্তু-বিক্রয়' অধ্যায়ে সর্বপ্রকার ভূমি, ঘরবাড়ী, উদ্যান, পুষ্করিণী, হ্রদ, ক্ষেত্র, ইত্যাদি বিক্রয়ের ক্রম ও রীতির উল্লেখ আছে ; এই অধ্যায় হইতে আমরা খবর পাই, এই ধরণের ক্রয়-বিক্রয় কুটুম্ব, প্রতিবাসী এবং সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্মুখে হওয়া উচিত, এবং যিনি সর্বোচ্চ মূল্য দিয়া ভূমি ডাকিয়া লইয়া ক্রয় করিতে রাজী হইবেন তাঁহার কাছেই প্রস্তাবিত ভূমি বিক্রয় করিতে হইবে। ভূমির মূল্যের উপর ক্রেতাকে রাজসরকারে একটা করও দিতে হইবে, একথাও কৌটিল্য বলিতেছেন। † মূল্যের উপর কোনও প্রকার করের উল্লেখ আমাদের লিপিগুলিতে নাই ; এবং যে-রীতিতে কৌটিল্য ভূমি-বিক্রয়ের কথা বলিতেছেন সে-রীতি অনুযায়ীই ভূমি-বিক্রয় হইয়াছিল, এমন আভাসও লিপিগুলিতে পাইতেছি না ; এগুলি 'নীলাম'-বিক্রয়ের দলিল নহে, অথচ কৌটিল্য যেন 'নীলাম'-বিক্রয়ের কথাই বলিতেছেন। তবে ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারটা যে কুটুম্ব, প্রতিবাসী এবং সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের সম্মুখেই নিষ্পন্ন হইত তাহার উল্লেখ প্রায় প্রত্যেক লিপিতেই পাওয়া যায়।

* Sacred Books of the East. xxxiii, p. 305.

† "অর্থশাস্ত্র", 2nd edn., Mysore. VI, I, p. 168ff., Eng. Trans. by Shamasastry, 2nd edn., p. 204, 206-7.

কতকটা পূর্বোক্ত শাসনানুরূপ ভূমি-বিক্রয়ের অন্ততঃ একটি পাথুরে প্রমাণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। এই লিপিটি নাসিকের একটি বৌদ্ধ-গুহার প্রাচীরে উৎকীর্ণ, এবং ইহার তারিখ খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধ। ইহাতে উল্লেখ আছে যে, ক্ষত্রপ নহপানের জামাতা, দীনীকপুত্র উষবদাত জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ৪,০০০ কার্ষাপণ মুদ্রায় কিছু ক্ষেত্রভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন, এবং তাহা গুহাবাসী ভিক্ষুসংঘকে দান করিয়াছিলেন। * উষবদাত্ত ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন জনৈক গৃহস্থের নিকট হইতে, রাজার বা রাষ্ট্রের নিকট হইতে নয়, কাজেই সে-ক্ষেত্রে যে সুবিস্তৃত ক্রমের উল্লেখ প্রাচীন বাঙ্‌লার পূর্বোক্ত লিপিগুলিতে আছে তাহার কোনও প্রয়োজনই হয় নাই। আমাদের লিপিগুলিতে কিন্তু সাধারণ ভাবে একটি দৃষ্টান্তও পাইতেছি না যেখানে কোনও গৃহস্থ (private individual) কোন ভূমি বিক্রয় করিতেছেন; সর্বত্রই যে-ভূমি বিক্রীত হইতেছে তাহা রাজা বা রাষ্ট্রকর্তৃকই হইতেছে। এ-প্রশ্ন স্বভাবতই মনকে অধিকার করে, প্রাচীন বাঙ্‌লার সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কোনও গৃহস্থই কি ভূমি বিক্রয় করে নাই? সে-অধিকার কি তাঁহার ছিল না? যদি করিয়া থাকেন, যদি সে-অধিকার থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা কি উপায়ে বিধিবদ্ধ হইত? সে-বিক্রয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, কৌটিল্যের ইঙ্গিতানুযায়ী ভূমির মূল্যের উপর রাজাকে বা রাষ্ট্রকে কিছু প্রণামী দিতে হইত কি, না রাষ্ট্র রাজস্ব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত? এই সব অত্যন্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক প্রশ্নের কোনও উত্তর পাইবার সূত্রও লিপিগুলিতে আবিষ্কার করা যায় না।

এ পর্যন্ত খ্রীষ্টোত্তর অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলির কথাই বলিলাম। এইবার অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলি একটু বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। প্রথমেই বলা যায়, যতগুলি শাসনের সংবাদ আমরা জানি, তাহার সব ক'টিই ভূমি-দানের শাসন, ভূমি দান-বিক্রয়ের শাসন একটিও নয়। এই পর্বের শাসনগুলিকে সেই জন্য পূর্বোক্ত গুণাইঘর, বপ্‌পঘোষবাট, লোকনাথ বা আশ্রফপুর লিপিগুলির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, যদিও পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি অনেকটা দীর্ঘায়ত। অন্য কারণেও এই পর্বের কোন কোন শাসনের সঙ্গে গুণাইঘর লিপি অথবা লোকনাথের লিপিটির কতকটা তুলনা করা চলে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধর্মপালের খালিমপুর লিপিটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্মা একটি নারায়ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সেই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও পূজার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি যুবরাজ ত্রিভুবন পালকে দিয়া রাজার কাছে চারিটি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং প্রার্থনানুযায়ী রাজা তাহা দান করিয়াছিলেন। এই ধরণের দৃষ্টান্ত আরও দুই একটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ শাসনে এই ধরণের প্রার্থনা বা অনুরোধের কোনও উল্লেখ নাই; রাজা যেন স্বেচ্ছায় ভূমি দান করিতেছেন, এই রকম ধারণা জন্মায়। অথবা এমনও হইতে পারে, অনুরোধ বা প্রার্থনা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আর বাহুল্য অনুমানে উল্লিখিত হয় নাই। এই ধরণের লিপিগুলির সঙ্গে

* Ep. Ind. VIII, p. 78.

বপ্পঘোষবাট ও আস্রফপুর লিপি দুইটার তুলনা করা যাইতে পারে। পাল আমলে দেখা যায়, কোথাও কোথাও ভূমি দান করা হইতেছে কোনও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, যদিও ব্যক্তিগতভাবে ব্রাহ্মণকে ভূমি-দানের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই; কিন্তু, সেন আমলে সব দানই ব্যক্তিগত দান, এবং সেন রাজাদের যে কয়টি ভূমি-দানের সংবাদ আমরা শাসনে পাই তাহার সব কয়টিরই দান-গ্রহীতা হইতেছেন ব্রাহ্মণ এবং দানের উপলক্ষ্য হইতেছে কোনও ধর্মানুষ্ঠানের আচরণ। এই ধরণের দান কতকটা ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা জাতীয়, এবং এ-সব ক্ষেত্রে ভূমি-দান গ্রহণের কোনও অনুরোধ জ্ঞাপনের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আমার ত মনে হয়, যে-সব ক্ষেত্রে কোনও ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমির প্রয়োজন হইয়াছে, সেই খানেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা রাজাকে ভূমি-দানের অনুরোধ জানাইয়াছেন, এবং রাজাও সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন; গুণাইঘর, লোকনাথ ও খালিমপুর লিপির সাক্ষ্য এই অনুমানের দিকেই ইঙ্গিত করে। আর, যেখানে রাজা অথবা রাষ্ট্র নিজেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা, অথবা যেখানে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোনও আয়তনের প্রয়োজন রাজা নিজেই অনুভব করিয়াছেন, অথবা রাষ্ট্র-কর্মচারীর বা জনপদ-প্রধানদের মুখ হইতে শুনিয়াছেন, সেখানে রাজা নিজেই স্বেচ্ছায় ভূমি-দান করিয়াছেন, কোন অনুরোধের অপেক্ষা বা অবসর সেখানে নাই। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমার এই অনুমানের সাক্ষ্য অষ্টমশতকের আস্রফপুর লিপি দুইটিতে আছে। ইহার সাক্ষ্য এই যে রাজা দেবখড়্গ নিজেই আচার্য সংঘমিত্রের বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর ভূমিদান করিয়াছিলেন, কোনও অনুরোধের উল্লেখ সেখানে নাই। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশব দেবের লিপির সাক্ষ্যও একই প্রকারের।

এই পর্বের লিপিগুলিতে দেখিলাম, ভূমিদান করিতেছেন সর্বত্রই রাজা স্বয়ং, কিন্তু অষ্টম শতকের আগেকার লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহের জন্য ভূমিদান গৃহস্থ ব্যক্তিরাই করিতেছেন, এবং দানের পূর্বে সেই ভূমি মূল্য দিয়া রাজার নিকট হইতে কিনিয়া লইতেছেন। দুচার ক্ষেত্রে রাজাও ভূমিদান করিতেছেন, কিন্তু তাহা ক্রেতার পক্ষ হইতেই; তিনি শুধু দানকার্যের পূণ্যের ষষ্ঠভাগ (ধর্মষড়ভাগং) লাভ করিতেছেন। এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে আগেকার পর্বে অর্থাৎ সপ্তম শতকের পূর্বে ধর্মপ্রতিষ্ঠানে যত ভূমি দান তাহা অধিকাংশ গৃহস্থব্যক্তিরাই করিতেছেন কেন, আর উত্তর পর্বে ভূমি দান শুধু রাজাই করিতেছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কি এই যে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা, ভরণপোষণের দায়ীত্ব আগে ব্যক্তিগতভাবে পুরজনপদবাসি গৃহস্থরাই করিতেন, এবং পরে ক্রমশঃ সেই দায়ীত্ব রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে রাজাই গ্রহণ করিয়াছিলেন? ব্যক্তিগত ভাবে ব্রাহ্মণদের যে-সব ভূমি দান করা হইত, সে-সব দান সম্বন্ধে এ ধরণের কোন প্রশ্নের বা উত্তরের অবকাশ নাই। এইরূপ ব্যক্তিগত দানের পরিচয় ঘাঘ্রাহাটি এবং বপ্পঘোষবাট পট্টোলী দুইটিতে পাওয়া যায়। পাল ও সেন আমলের লিপিতে এই পরিচয় প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ভূমিদান কি কি সর্তে করা হইত, কি কি দায় ও অধিকার বহন করিত তাহা এইবার আলোচনা করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে পূর্ব পর্বের লিপিগুলির সংবাদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

যথামূল্যে প্রস্তাবিত ভূমি ক্রয়ের জন্য গৃহস্থ আবেদন যখন জানাইতেছেন, তখন তিনি ভূমি ক্রয় করিতে চাহিতেছেন, সোজাসুজি এ কথা বলিতেছেন না ; বলিতেছেন, 'আপনি আমার নিকট হইতে যথারীতি যথানির্দিষ্ট হারে মূল্য গ্রহণ করিয়া এই ভূমি আমাকে **দান** করুন।' এই যে ক্রয়ের প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে দানের প্রার্থনাও করা হইতেছে, ইহার অর্থ কি? যে ভূমির জন্য মূল্য দেওয়া হইতেছে, তাহাই আবার দানের জন্যও প্রার্থনা করা হইতেছে কেন, এ কথার উত্তর পাইতে হইলে ভূমি কি সর্তে দান-বিক্রয় হইতেছে, তাহা জানা প্রয়োজন। ধনাইদহলিপিতে আবেদক ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন, "নীবীধর্মক্ষয়েণ" ; দামোদরপুরের ১নং লিপিতে আছে, "শাশ্বতাচন্দ্রার্কতারকভোজ্যে তয়া নীবীধর্মেণ দাতুমিতি" ; ২নং লিপিতে "অপ্রদাক্ষয়নি...মর্যাদয়া দাতুমিতি" ; ৩নং লিপিতে "হিরণ্যমুপসংগৃহ্য সমুদয়-বাহ্যাপ্রদখিলক্ষেত্রানাং প্রসাদং কর্তুমিতি..." ; ৫নং লিপিতে "অপ্রদাধর্মেণ...শাশ্বতকাল-ভোগ্যা" ; পাহাড়পুর-পট্টোলীতে আছে, "শাশ্বতকালোপভোগ্যাক্ষয়নীবী সমুদয়বাহ্যা-প্রতিকর..." ; বৈগ্রাম-পট্টোলীতে "সমুদয়বাহ্যাদি...অকিঞ্চিৎ প্রতিকরাণাম্ শাশ্বতাচন্দ্রার্ক-তারকভোজ্যানাম্ অক্ষয়নীব্যা..." ; বপ্পঘোষবাট গ্রামের পট্টোলীতে আছে, "অক্ষয়ানী[বী]-ধর্ম্ণাপ্রদত্তঃ"। অন্যান্য লিপিগুলিতে শুধু ক্রয়বিক্রয়ের কথাই আছে, কোনও সর্তের উল্লেখ নাই। যাহা হউক, যে-সব লিপিতে সর্তের উল্লেখ পাইতেছি, দেখিতেছি—সেই সর্ত একাধিক প্রকারের: (১) নীবী ধর্মের সর্ত, (২) অপ্রদা ধর্মের সর্ত এবং (৩) অক্ষয়নীবী (ধর্মের) সর্ত, (৪) অপ্রদাক্ষয়নীবীর সর্ত। বৈগ্রাম ও পাহাড়পুর-পট্টোলী দুটিতে অক্ষয়নীবী ধর্মের সর্তের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি সর্তের উল্লেখ আছে, সেটি হইতেছে, "সমুদয়-বাহ্যাপ্রতিকর" বা "সমুদয়বাহ্যাদি...অকিঞ্চিত্ প্রতিকর", অর্থাৎ ভূমি প্রার্থনা করা হইতেছে এবং ভূমি দান করা হইতেছে অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী এবং সকল প্রকার রাজস্ব-বিবর্জিত ভাবে। ইহার অর্থ এই যে, ভূমি-ক্রেতা সুচিরকাল, যাবচ্চন্দ্রসূর্যতারার স্থিতিকাল পর্যন্ত ভোগ করিতে পারিবেন কোনও রাজস্ব না দিয়া। রাজা বা রাষ্ট্র যে সুচিরকালের জন্য রাজস্ব হইতে ক্রেতা ও ক্রেতার বংশধরদের মুক্তি দিতেছেন, এইখানেই হইতেছে দান কথার অন্তর্নিহিত অর্থ। ভূমির প্রচলিত মূল্য গ্রহণ করিয়া রাজা যে-ভূমি বিক্রয় করেন, সেই ভূমিই যখন অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী সমুদয় বাহ্যাপ্রতিকর করিয়া দেন, তখন তাহা দানও করেন, এবং তাহা করেন বলিয়াই ভূমি বিক্রয় করিয়াও তিনি "ধর্মষড়্‌ভাগের" অর্থাৎ দানপুণ্যের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হন। রাজা ভূমির আয়ের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী, সেই এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকার যখন তিনি পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি দানপুণ্যের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হইবেন, ইহাই ত যুক্তিযুক্ত। এই অর্থে ছাড়া পাহাড়পুর-পট্টোলীর "যৎ পরম-ভট্টারক-পাদানাম্ অর্থোপচয়ো ধর্মষড়্‌ভাগোপ্যায়নঞ্চ ভবতি" এ কথার কোনও সঙ্গত যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বৈগ্রাম-পট্টোলীতে এই কথাই আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। ৩নং দামোদর-পুর-পট্টোলীতেও পরমভট্টারক মহারাজের পুণ্যলাভের যে ইঙ্গিত আছে, তাহাও তিনি "সমুদয়বাহ্যাপ্রদ" অর্থাৎ সর্বপ্রকারের দেয়-বিবর্জিত করিয়া ভূমি বিক্রয় করিতেছেন বলিয়াই।

এইবার নীবীধর্ম, অক্ষয়-নীবীধর্ম বা নীবীধর্মক্ষয় এবং অপ্রদা ধর্ম কথা কয়টির অর্থ কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। বাঙ্‌লা দেশের বাহিরে গুপ্তযুগের যে লিপির খবর আমরা জানি, তাহার মধ্যে অন্ততঃ দুইটিতে "অক্ষয়নীবী" ধর্মের উল্লেখ আছে*। কোষকারদের মতে নীবী কথার অর্থ মূলধন বা মূলদ্রব্য †। কোন ভূমি যখন নীবীধর্মানুযায়ী দান বা বিক্রয় করা হইতেছে, তখন ইহাই বুঝান হইতেছে যে, দত্ত বা বিক্রীত ভূমিই মূলধন বা মূলদ্রব্য ; সেই ভূমির আয় বা উৎপাদিত ধন ভোগ বা ব্যবহার করা চলিবে, কিন্তু মূলধনটি কোনও উপায়েই নষ্ট করা চলিবে না। তাহা হইলে "নীবীধর্ম" কথাটি দ্বারা যাহা সূচিত হইতেছে, "অক্ষয়-নীবীধর্ম" দ্বারা তাহাই আরও সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে, এই অনুমান অতি সহজেই করা চলে। যে-ভূমি সম্পর্কে এই সর্তের উল্লেখ আছে, সেই ভূমিই কেবল "শাশ্বতাচন্দ্রার্কতারকা" ভোগ করিতে পারা যায়, ইহাও খুবই স্বাভাবিক। লিপিগুলিতেও তাহাই দেখিতেছি ; বস্তুতঃ যে-সব ক্ষেত্রে "নীবী" বা "অক্ষয়-নীবী" ধর্মের উল্লেখ আছে, সেই সব ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বতাচন্দ্রার্ক-তারকা" ভোগের সর্তও আছে ; যে-ক্ষেত্রে নাই, যেমন বপ্যঘোষবাটগ্রামের লিপিটিতে, সে-ক্ষেত্রেও তাহা সহজেই অনুমেয়। ধনাইদহ-লিপিতে আছে, "নীবীধর্মক্ষয়েণ" ; এ ক্ষেত্রে ভূমি বিক্রয় করা হইতেছে মূলধন অক্ষত রাখিবার রীতি বিলোপ করিয়া দিয়া, অর্থাৎ ভোক্তা স্বেচ্ছায় ঐ ভূমি দান-বিক্রয় করিয়া হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন, ইহাই যেন সূচিত হইতেছে। দামোদরপুরের ৩নং লিপিতে সর্তটি হইতেছে "অপ্রদাধর্মেণ"। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই সর্তের সঙ্গে "শাশ্বতাচন্দ্রার্কতারকা" ভোগের সর্ত নাই। যাহা হউক, অনুমান হয়, এই সর্তানুযায়ী যে-ভূমি বিক্রয় করা হইতেছে, সেই ভূমিও দান অথবা বিক্রয়ের অধিকার ভোক্তার ছিল না। স্বেচ্ছামত ফিরাইয়া লইবার অধিকার দাতার অথবা রাজার ছিল কি না, তাহা বুঝা যাইতেছে না। যাহা হউক, মোটামুটিভাবে "নীবীধর্ম", "অক্ষয়-নীবীধর্ম" ও "অপ্রদাধর্ম" বলিতে একই সর্ত বুঝা যাইতেছে, অন্ততঃ আমাদের লিপিগুলিতে তাহা অনুমান করিতে বাধা নাই ; যদিও মনে হয়, "অপ্রদাধর্মে"র সঙ্গে "নীবী" বা "অক্ষয়নীবী" ধর্মের সূক্ষ্ম পার্থক্য কিছু ছিল।

একটি জিনিস একটু লক্ষ্য করা যাইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে, যে-ভূমি কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে দান করা হইতেছে, সেই সম্পর্কেই শুধু "অপ্রদাধর্ম" বা "অক্ষয় নীবীধর্মে"র উল্লেখ পাইতেছি। ইহার কারণ ত খুবই সহজবোধ্য। তাহা ছাড়া সেই সব ক্ষেত্রেই কেবল রাজা রাজস্বের অধিকার ছাড়িয়া দিতেছেন, ইহাও কিছু অস্বাভাবিক নয়। ব্যতিক্রম দু'একটি আছে ; কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রেও দানের পাত্র কোনও ব্রাহ্মণ এবং তিনি দান গ্রহণ করিতেছেন কোনও ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে। কোনও গৃহস্থ যেখানে ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ভূমি ক্রয় অথবা দান গ্রহণ করিতেছেন, সে ক্ষেত্রে না আছে কোন চিরস্থায়ী সর্তের উল্লেখ, না আছে নিষ্কর করিয়া দিবার উল্লেখ।

* Fleet, *C. I. I, III*, nos, 12,62. † অমরকোষ, ৩, ৩, ২১২ ; হেমচন্দ্র, ২, ৫৩৪

এ পর্যন্ত শুধু সপ্তমশতকপূর্ববর্তী লিপিগুলির কথাই বলিলাম। এই বিষয়ে পরবর্তী লিপিগুলির সাক্ষ্যও জানা প্রয়োজন। অষ্টম হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত যত রাজকীয় ভূমি-দানলিপির খবর আমরা জানি, তাহার প্রত্যেকটিতেই ভূমি-দানের সর্ত মোটা-মুটি একই প্রকার। সর্তাংশটি যে কোনও লিপি হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে। খালিমপুর-লিপিতে আছে, "সদশপচারাঃ অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যাঃ পরিহৃতসর্বপীড়াঃ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং"; শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতে আছে, "সদশপরাধা সচৌরোদ্ধরণা পরিহৃতসর্বপীড়া অচাটভটপ্রবেশ অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যা। সমস্তরাজভোগকরহিরণ্যপ্রত্যায়-সহিতা···আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন।" বিজয়সেনের বারাকপুর-লিপিতে আছে, "সহৃদশাপরাধাঃ পরিহৃতসর্বপীড়া অচট্টভট্টপ্রবেশা অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যা সমস্ত-রাজভোগকরহিরণ্যপ্রত্যায়সহিতা।···আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্র-শাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ।" দেখা যাইতেছে, ধর্মপালের খালিমপুর-লিপিতে যাহা আছে, তাহাই পরবর্তী লিপিগুলিতে বিস্তৃততরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সদশপচারাঃ বা সহৃদশাপরাধাঃ। আমাদের দণ্ডশাস্ত্রে দশ প্রকারের অপচার বা অপরাধের উল্লেখ আছে। তিনটি কায়িক অপরাধ, যথা—চুরি, হত্যা, এবং পরস্ত্রীগমন; চারিটি বাচনিক অপরাধ, যথা—কটুভাষণ, অসত্যভাষণ, অপমানজনক ভাষণ এবং বস্তুহীন ভাষণ; তিনটি মানসিক অপরাধ, যথা—পরধনে লোভ, অধর্ম চিন্তা এবং অসত্যানুরাগ। এই দশটি অপরাধ রাজকীয় বিচারে দণ্ডনীয় ছিল; এবং এই অপরাধ প্রমাণিত হইলে অপরাধী ব্যক্তিকে জরিমানা দিতে হইত। রাষ্ট্রের অন্যান্য আয়ের মধ্যে ইহাও অন্যতম। কিন্তু রাজা যখন ভূমি দান করিতেছেন, তখন সেই ভূমির অধিবাসীদের জরিমানা হইতে যে আয়, তাহা ভোগ করিবার অধিকারও দান-গ্রহীতাকে অর্পণ করিতেছেন।

সচৌরোদ্ধরণা। চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাজার; কিন্তু তাহার জন্য জনসাধারণকে একটা কর দিতে হইত। কিন্তু রাজা যখন ভূমি দান করিতেছেন, তখন দানগ্রহীতাকে সেই কর ভোগের অধিকার দিতেছেন।

পরিহৃতসর্বপীড়াঃ। সর্বপ্রকার পীড়া বা অত্যাচার হইতে রাজা, দত্ত ভূমির অধিবাসীদের মুক্তি দিতেছেন। কোনও কোনও পণ্ডিত পারিশ্রমিক-না-দিয়া আবশ্যিক-শ্রম-গ্রহণ-করা অর্থে এই শব্দটি অনুবাদ করিয়াছেন। আমার কাছে এই অর্থ খুব যুক্তিযুক্ত মনে হইতেছে না, যদিও বহু প্রকারের রাজকীয় পীড়া বা অত্যাচারের মধ্যে ইহাও হয় ত একপ্রকার পীড়া বা অত্যাচার ছিল, এ অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু "পরিহৃতসর্বপীড়াঃ" বলিতে যথার্থতঃ কি বুঝাইত, তাহার সুস্পষ্ট ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রতিবাসী কামরূপ রাজ্যের একাধিক লিপিতে আছে। বলবর্মার নওগাঁ-লিপিতে অনুরূপ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত আছে, "রাজ্ঞীরাজপুত্ররাণকরাজবল্লভমহল্লকপ্রৌঢ়িকাহাস্তিবন্ধিকনৌকাবন্ধিকচৌরোদ্ধরণিকদাণ্ডিক-দাণ্ডপাশিক-ঔপরিকরিক-ঔৎখেটিকচ্ছত্রবাসাদ্যুপদ্রবকারিণামপ্রবেশা।" রত্নপালের প্রথম তাম্রশাসনে আছে, "হস্তিবন্ধনৌকাবন্ধচৌরোদ্ধরণদণ্ডপাশোপরিকরনানানিমিত্তোৎখেটন-

হস্ত্যশ্বোষ্ট্রগোমহিষাজাবিকপ্রচারপ্রভৃতীনাং বিনিবারিতসর্বপীড়া…”। কামরূপের অন্যান্য দু'একটি লিপিতেও অনুরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বপীড়া বলিতে কি কি পীড়া বা অত্যাচার বুঝায়, তাহার ব্যাখ্যা কতকটা সবিস্তারেই পাওয়া যাইতেছে। রাজ্ঞী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজপরিবারের লোকেরা, রাজপুরুষেরা যখন সফরে বাহির হইতেন, তখন সঙ্গের নৌকা, হাতী, ঘোড়া, উট, গরু, মহিষের রক্ষক যাহারা, তাহারা গ্রামবাসীদের ক্ষেত, ঘর-বাড়ী, মাঠ, পথ, ঘাটের উপর নৌকা এবং পশু ইত্যাদি বাঁধিয়া ও চড়াইয়া উৎপাত অত্যাচার করিত। অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধারকারী যাহারা, তাহারা, দাণ্ডিক ও দাণ্ডপাশিক অর্থাৎ যাহারা চোর ও অন্যান্য অপরাধীদের ধরিয়া বাঁধিয়া আনিত, যাহারা দণ্ড দিত, তাহারাও সময়ে অসময়ে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করিত। যাহারা প্রজাদের নিকট হইতে কর আদায় করিত, এবং অন্যান্য নানা ছোটখাট শুল্ক আদায় করিত, তাহারাও প্রজাদের উৎপীড়িত করিতে ত্রুটি করিত না। ইহারা কার্যোপলক্ষে গ্রামে অস্থায়ী ছত্রাবাস (camp) স্থাপন করিয়া বাস করিত বলিয়া অনুমান হয়, এবং শুধু গ্রামবাসীরাই নয়, রাজা নিজেও বোধ হয়, ইহাদের উপদ্রবকারী বলিয়া মনে করিতেন; বস্তুতঃ রাজকীয় লিপিতেই ইহাদের উপদ্রবকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাদের বাঙ্‌লা দেশের লিপিগুলিতে এই সব উপদ্রবের বিস্তারিত উল্লেখ নাই, “পরিহৃতসর্বপীড়াঃ” বলিয়াই শেষ করা হইয়াছে; তবে, একটি উৎপাতের উল্লেখ দৃষ্টান্তস্বরূপ করা হইয়াছে। যে ভূমি দান করা হইতেছে, বলা হইতেছে, সেই ভূমি অচাটভাট অথবা অচট্টভট্টপ্রবেশ, চট্টভট্টরা সেই ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। চাট অথবা চট্ট বলিতে খুব সম্ভব, এক ধরণের অস্থায়ী সৈনিকদের বুঝাইত বলিয়া অনুমান হয়। চাম্বা প্রদেশের কোন কোন লিপিতে পরগণা বা চারকর্তা অর্থে চাট কথাটির ব্যবহার পাওয়া যায়। ভট্ট বা ভাট কথাটি ভাঁড় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু রাজার ভৃত্য বা সৈনিক অর্থে কথাটি গ্রহণ করাই নিরাপদ্। যাহা হউক, চট্টভট্ট দুইই রাজভৃত্য অর্থে গ্রহণ করা চলিতে পারে।

অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্য। দত্ত ভূমি হইতে আয়স্বরূপ কোনও কিছু গ্রহণ করিবার অধিকারও রাজা ছাড়িয়া দিতেছেন, এই সর্তটির উল্লেখ লিপিতে আছে। সেই সব অধিকারের ফলভোগী হইতেছেন দানগ্রহীতা; সেই জন্যই ইহার পরই বলা হইতেছে—'সমস্তরাজভাগ-ভোগকরহিরণ্যপ্রত্যায়সহিতা', অর্থাৎ সেই ভূমি হইতে ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য ইত্যাদি যে সব আয় আইনতঃ রাজার অথবা রাষ্ট্রেরই ভোগ্য, সেই সব সমেত ভূমি দান করা হইতেছে, এবং বলা হইতেছে, দানগ্রহীতা “আচন্দ্রার্ক-ক্ষিতিসমকালং” অর্থাৎ শাশ্বত কাল পর্যন্ত সেই ভূমি ভোগ করিতে পারিবেন।

সর্বশেষ সর্ত হইতেছে “ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন”। ভূমি দান করা হইতেছে ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায় বা রীতি অনুযায়ী। এই কথাটির নানা জনে নানা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।* “বৈজয়ন্তী” মতে

* Ind. Ant. I, p. 46, n.; Ibid, IV, p. 106, n.; C. I. I., III, e. 138, n. 2; Ep. Ind. XI, XI. p, 177.

যে-ভূমি কর্ষণের অযোগ্য, সেই ভূমি ভূমিচ্ছিদ্র, এবং এই অর্থে কৌটিল্য কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন।* বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে আছে, "ভূমিচ্ছিদ্রাঞ্চ অকিঞ্চিৎকরগ্রাহ্যাম্" অর্থাৎ কর্ষণের অযোগ্য ভূমির কোন কর বা রাজস্ব নাই। কর বা রাজস্ব নাই, এই যে রীতি অর্থাৎ রাজস্ব-মুক্তির রীতি অনুযায়ী যে ভূমি-দান, তাহাই ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুযায়ী দান, এবং লিপিগুলিতে এই সর্ত্তেই ভূমি-দান করা হইয়াছে, সমস্ত কর হইতে ভোক্তাকে মুক্তি দিয়া।

লিপিগুলির স্বরূপ বিস্তৃত করিয়া উপরে ব্যাখ্যা করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-দান ও ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে আমরা অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানিলাম। এইবার ভূমি-সম্পর্কিত অন্যান্য সংবাদ লওয়া যাইতে পারে। ভূমি-সম্পর্কিত কি কি সংবাদ স্বভাবতঃই আমাদের জানিবার ঔৎসুক্য হয়, তাহার তালিকা করিয়া লইলে তথ্য নির্ধারণ সহজ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যের হিসাব লওয়া যাইতে পারে—

১। ভূমির প্রকারভেদ
২। ভূমির মাপ ও মূল্য
৩। ভূমির চাহিদা
৪। ভূমির সীমা-নির্দেশ
৫। ভূমির উপস্বত্ব, কর, উপরিকর ইত্যাদি
৬। ভূমিস্বত্বাধিকারী কে? রাজার ও প্রজার অধিকার। খাস প্রজা, নিম্ন প্রজা ইত্যাদি

১। **ভূমির প্রকারভেদ**—অষ্টমশতকপূর্ববর্তী লিপিগুলিতে আমরা প্রধানতঃ তিন প্রকার ভূমির উল্লেখ পাইতেছি; বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিলক্ষেত্র। যে ভূমিতে লোকে ঘরবাড়ী তৈরী করিয়া বাস করিত অথবা বাসযোগ্য যে ভূমি, তাহা বাস্তুভূমি। কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন বৈগ্রামপট্টোলীতে, বাস্তুভূমিকে স্থলবাস্তুভূমিও বলা হইয়াছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের কোন কোন লিপিতে "ব্যাভূ" বলিয়া বাস্তুভূমি নির্দেশ করা হইয়াছে। যথা, দামোদর দেবের অপ্রকাশিত চট্টগ্রাম-লিপিতে, বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য-পরিষৎ লিপিতে। ব্যাভূ "চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন বাস্তুভূমি", অর্থাৎ সীমানির্দিষ্ট বসবাস করিবার ভূমি।

যে-ভূমি কর্ষণযোগ্য ও কর্ষণাধীন, সে-ভূমি ক্ষেত্রভূমি। যেখানে দান-বিক্রয় হইতেছে, এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, সেখানে ভূমি পূর্বেই অন্য লোকের দ্বারা কর্ষিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা রাজার পক্ষ হইতেই হউক বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা বা ব্যক্তির পক্ষ হইতেই হউক। ক্ষেত্রভূমি দান-বিক্রয় যেখানে হইতেছে, সেখানে ভূমি হস্তান্তরিতও হইতেছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের কোন কোন লিপিতে কর্ষণযোগ্য ক্ষেত্রভূমি বুঝাইতে "নালভূ" বা "নাভূ" কথাটির ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন, পূর্বোক্ত দামোদর দেবের অপ্রকাশিত চট্টগ্রাম-লিপিতে। নালজমি কথা ত এই অর্থে এখনও প্রচলিত।

ভূমি কর্ষণযোগ্য ও কর্ষণাধীন যেমন হইতে পারে, তেমনই কর্ষণযোগ্য, কিন্তু অকর্ষিতও

* Ind. Ant, 1922, Pp. 76-77.

হইতে পারে। এ কথা বলিতে বুঝিতেছি, কোন নির্দিষ্ট ভূমি চাষের উপযুক্ত; কিন্তু যে কারণেই হোক, যখন সে ভূমি দান-বিক্রয় হইতেছে, তখন কেহ সে-ভূমি চাষ করিতেছে না। এমন যে ক্ষেত্র বা ভূমি, তাহা খিলক্ষেত্র। চাষ করিয়া করিয়া যে-ভূমির উর্বরতা নষ্ট হইয়া যায়, সে ভূমি অনেক সময় দু'চার বৎসর ফেলিয়া রাখা হয়, তাহাতে ভূমির উর্বরতা বাড়ে, এবং পরে তাহা আবার চাষ করা হয়। খিলক্ষেত্র বলিতে খুব সম্ভব, এই ধরণের ভূমির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর, যে-ভূমি শুধু খিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কর্ষণের অযোগ্য ভূমি। অষ্টমশতকোত্তর কোন কোন লিপিতে নালভূমির সঙ্গে খিল-ভূমির উল্লেখ হইতেও (সখিলনালা, সবাস্তনালখিলা) এই অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। এখনও পূর্ববাঙ্‌লা ও শ্রীহট্টে কোন কোন স্থানে খিল জমি বলিতে অনুর্বর, কর্ষণের অযোগ্য জলাভূমিকেই বুঝায়। ইহার একটু পরোক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে বৈন্য-গুপ্তের গুণাইঘর-লিপিতে। এই ক্ষেত্রে বিশেষ এক খণ্ড খিলভূমি উল্লিখিত হইতেছে 'হজ্জিক খিলভূমি' বলিয়া (water-logged waste land)। হজ্জিক = হাজা, শুখা বা শুক্‌নার বিপরীত, অর্থ জলাভূমি। তবে, এমনও হইতে পারে, খিল ও খিলক্ষেত্র বলিতে একই প্রকারের ভূমি নির্দেশ করা হইতেছে। দুই ভিন্ন অর্থে কথা দুইটি ব্যবহৃত হইতেছে কি না, লিপিগুলির সাক্ষ্য হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কোন কোন লিপিতে, যেমন ১নং দামোদরপুর-লিপিতে, খিল ভূমিকেই আবার বিশেষিত করা হইতেছে 'অপ্রহত' অর্থাৎ অকৃষ্ট বলিয়া। অমরকোষের মতে খিল ও অপ্রহত একার্থক (২, ১০, ৫) এবং হলায়ুধ খিল অর্থে বুঝিয়াছেন পতিত জমি। যাদবপ্রকাশ তাঁহার "বৈজয়ন্তী" গ্রন্থে (একাদশ শতক) এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "খিলমপ্রহতং স্থানমূষবত্যুষরেরিণৌ" (১২৪ পৃ.)। তিনিও তাহা হইলে খিল ও অপ্রহত সমার্থক বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন এবং খিলভূমি বলিতে কর্ষণ-যোগ্য অথচ অকৃষ্ট ভূমির প্রতিই যেন ইঙ্গিত করিতেছেন। "নারদ-স্মৃতি"র মতে যে ভূমি এক বছর চাষ করা হয় নাই, তাহা অর্দ্ধখিল, যাহা তিন বছর চাষ করা হয় নাই, তাহা খিল (১১, ২৬)। ক্ষেত্র ও খিলভূমির পূর্বোক্ত পার্থক্য পরবর্তী কালেও দেখা যায়। "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে (২ খণ্ড, ৫নং) ভূমির প্রকারভেদ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে: (১) যে-ভূমি কর্ষণাধীন, তাহা 'পোলজ' ভূমি ; ইহাই প্রাচীন বাঙ্‌লার ক্ষেত্রভূমি। (২) যে-ভূমি কর্ষণযোগ্য, কিন্তু এক বা দুই বৎসরের জন্য কর্ষণ করা হইতেছে না, উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, সেই ভূমি 'পরৌতি' ভূমি ; (৩) এই ভাবে যে-ভূমি তিন বা চার বৎসর ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা 'চচর' ভূমি ; (৪) এবং যাহা পাঁচ বা ততোধিক বৎসর ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা 'বঞ্জর' ভূমি। আকবরের কালের ২, ৩ ও ৪নং ভূমিই খুব সম্ভব প্রাচীন বাঙ্‌লার খিলভূমি।

এই প্রধান তিন চার প্রকার ভূমি ছাড়া অন্যান্য প্রকারের ভূমির উল্লেখও লিপিগুলিতে দেখা যায়। একে একে সেগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তল, বাটক, উদ্দেশ, আলি—বৈগ্রাম-পট্টোলিতে 'তল বাটক' কথা এক সঙ্গেই ব্যবহৃত

হইয়াছে। যিনি ভূমি ক্রয় করিতেছেন, তিনি বাস্তুভূমি ক্রয় করিতেছেন; উদ্দেশ্য—ঘরবাড়ী তৈরী করা, এবং ঘরবাড়ী করিয়া বাস করিতে হইলেই পায়ে চলিবার পথ এবং জল চলাচলের পথও তৈরী করা প্রয়োজন। খালিমপুর-লিপির "তলপাটক" নিঃসন্দেহে "তলবাটক", এবং বৈগ্রাম-লিপিতে কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানেও ঠিক তাহাই। এখনও বাঙ্‌লাদেশের অনেক জায়গায় পথ অর্থে বাট কথাটির ব্যবহার প্রচলন আছে; বাঙ্‌লার বাহিরেও আছে। এই পথের অর্থাৎ বাটকের সঙ্গে তল কথার উল্লেখ যেখানেই আছে, সেখানে তলের অর্থ নালা বা প্রণুল্লী, এক কথায় নর্দামা বা জল নিঃসরণের পথ। নালা এবং প্রণুল্লী, এই দুইটি শব্দের উল্লেখও অষ্টমশতকোত্তর লিপিতে আছে। সাধারণতঃ পথের ধারে ধারেই থাকিত জল নিঃসরণের পথ, তাহা ছাড়া কথা দুইটি বিপরীতার্থব্যঞ্জক; সেই জন্যই তল এবং বাটক প্রায় সর্বত্রই একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। অষ্টমশতকোত্তর লিপিগুলিতে অনেক স্থলে তলের সঙ্গে উদ্দেশ কথাটিরও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় (সতলঃ সোদ্দেশ)। সে ক্ষেত্রেও তল অর্থে পয়ঃপ্রণালী বুঝাইতে কোন আপত্তি নাই; কারণ, উদ্দেশ বা উৎ+দেশ অর্থে উচ্চ ভূমি, অর্থাৎ বাঁধ, ঢিপি, জমির আলি (আইল, ধর্মপালের খালিমপুর-লিপি দ্রষ্টব্য) বান্ধাইল (বরেন্দ্রভূমিতে এখনও প্রচলিত) ইত্যাদি বুঝায়, এবং বাঁধ বা জমির আলির পাশে পাশেই ত এখনও দেখা যায় ক্ষেতের জল নিঃসরণের বা জলসেচনের প্রণালী। কেহ কেহ তল বলিতে সাধারণভাবে গ্রামের নিম্ন জলাভূমি বুঝিয়াছেন; আমার কাছে এই অর্থ সমীচীন মনে হয় না। কারণ, বাটক বা উদ্দেশ উভয়ের সঙ্গেই পয়ঃপ্রণালী অর্থে তল কথাটির ব্যবহার সার্থকতর, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

জোলা, জোলক, জোটিকা, খাট, খাটা, খাটিকা, খাড়ি, খাড়িকা, যানিকা, স্রোতিকা, গঙ্গিনিকা, হজ্জিক, খাল, বিল ইত্যাদি।—এই প্রত্যেকটি শব্দই প্রাচীন বাঙ্‌লার লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। দত্ত অথবা বিক্রীত ভূমির সীমা নির্দ্দেশ উপলক্ষেই এই সব কথা ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়াছে। জোলা কথাটি ত এখনও উত্তর ও পূর্ববাঙ্‌লায় বহুলব্যবহৃত; যে সরু অনতিপ্রসার খালের পথ দিয়া বিল, পুষ্করিণী, গ্রাম ইত্যাদির জল চলাচল করে, তাহারই নাম জোলা। জোলক, জোটিকা প্রভৃতি শব্দ জোলা শব্দেরই সমার্থক। খাট, খাটা, খাটিকা, খাড়ি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে খাল অর্থে; যে জনপদ খাল-বহুল, তাহাই খাড়িমণ্ডল, আর চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশ যে খালবহুল, তাহা ত সকলেই জানেন। আর খাদা বা খাটার পারে পারে যে জনপদ, তাহাই খাদা (?) বা খাটাপার বিষয় (ধনাইদহ-লিপি)। যানিকা, স্রোতিকা, গঙ্গিনিকাও খাড়ি-খাটিকা কথার সমার্থক বলিয়াই মনে হয়। মরা নদীর খাত অর্থে গঙ্গিনিকা কথা উত্তরবঙ্গে এখনও ব্যবহৃত হয় বলিয়া অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছিলেন; কিন্তু গঙ্গিনিকার অপভ্রংশ গাঙ্গিনা, উত্তর ও পূর্ববাঙ্‌লায় এখনও যে-কোনও মরা পুরাতন খালকেই বুঝায়। হজ্জিকা যে নিম্ন জলাভূমি, তাহার ইঙ্গিত ত আগেই করিয়াছি। ঠিক এই অর্থে জলা বা জল্লা কথা মৈমনসিং, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় আজও প্রচলিত। খাল, খাটা, খাটিকা, খাড়িকা

ইত্যাদি কথারই সমার্থক। বিল কথার উল্লেখ দামোদরদেবের অপ্রকাশিত লিপিটিতে আছে ; এই বিল ও গুণাইঘর-লিপির বিলাল কি একই শব্দ ?

হট্ট, হট্টিকা, ঘট্ট, তর—হট্ট, হট্টিকা সহজবোধ্য এবং আমাদের হাট, বাজার অর্থেই সর্বত্র ইহার ব্যবহার। ঘট্ট=ঘাট, এবং তর—পারঘাট বা খেয়াপারাপারের ঘাট।

গর্ত্ত, উষর (সগর্ত্তোষর)—গর্ত্ত ত সহজবোধ্য। বদ্ধ ডোবা, অনতিগভীর অনতিপ্রসার কর্ষণ-অযোগ্য ভূমি অর্থেই এই শব্দটির ব্যবহার লিপিতে আছে। উষর অর্থে অনুর্বর কর্ষণ-অযোগ্য উচ্চ ভূমি। প্রতি গ্রামেই এই ধরণের গর্ত্ত ও উষর ভূমি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

গর্ত্ত এবং উষর ভূমি সহ যেমন ভূখণ্ড দান-বিক্রয় করা হইয়াছে, তেমনই জলস্থল সহও হইয়াছে। একই লিপিতে একই ভূখণ্ড "সগর্ত্তোষর" এবং "সজলস্থল" দানের উল্লেখ লিপিগুলিতে অপ্রতুল নয়। কাজেই জল অর্থে এ ক্ষেত্রে গর্ত্ত বুঝাইতে পারে না ; খুব সম্ভবতঃ জলাশয়, পুষ্করিণী, কুণ্ড, বাপী ইত্যাদি বুঝায়, এবং ইহাদের উল্লেখও কোথাও কোথাও আছে। স্থল অর্থ সমতল ভূমি।

গোমার্গ, গোবাট, গোপথ, গোচর ইত্যাদি—গোচর সোজাসুজি গোচারণভূমি, যে ভূমিতে গরু মহিষ চরিয়া বেড়ায়। গোচরভূমি সুপ্রাচীন কাল হইতেই গ্রামবাসীদের সাধারণ সম্পত্তি, এবং সাধারণতঃ বহিঃসীমায়ই তাহার অবস্থিতি। এ সম্বন্ধে কৌটিল্য এবং ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতাদের সাক্ষ্য উল্লেখযোগ্য। কৌটিল্যের মতে গ্রামের চারি দিকে ১০০ ধনু (৪০০ হাত) অন্তর অন্তর বেড়া দেওয়া গোচরভূমি থাকা প্রয়োজন। মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানও অনুরূপ (মনু, ৮, ২৩৭ ; যাজ্ঞ, ২, ১৬৭)। ইহা কিছু আশ্চর্য নয় যে, লিপিগুলির ইঙ্গিতও তাহাই। যে-পথে গ্রামের ভিতর হইতে গরু মহিষ প্রভৃতি গোচর-ভূমিতে যাতায়াত করে, সেই পথই গোমার্গ, গোবাট অথবা গোপথ। গোবাট (পূর্ববাঙ্‌লায় কোথাও কোথাও এখনও গোপাট), গোপথ প্রভৃতি কথা এই অর্থে এখনও বাঙ্‌লা দেশের অনেক জায়গায় প্রচলিত।

যে গোচরের কথা এইমাত্র বলিলাম, অনেকগুলি লিপিতে, বিশেষতঃ অষ্টমশতকোত্তর লিপিগুলিতে তাহার সঙ্গেই উল্লেখ আছে তৃণযূতি অথবা তৃণপূতি কথাটির। সীমা নির্দেশ উপলক্ষেই কথাটির ব্যবহার ; যে-ভূমি দান করা হইতেছে, তাহার সীমা অনেক ক্ষেত্রেই "স্বসীমা(বচ্ছিন্না) তৃণযূতি অথবা তৃণপূতি গোচর পর্যন্তঃ"। এ কথা সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, গোচরের মত তৃণযূতির বা তৃণপূতির অবস্থানও গ্রামসীমায় বা দত্ত ভূমির সীমায়। তৃণযূতি এবং তৃণপূতি ও তাহাদের অর্থ লইয়া পণ্ডিত মহলে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনতর লিপিতে, যেমন সমুদ্রসেনের নিরমান্দ তাম্রপট্টে কথাটি হইতেছে তৃণ···যূতি (Fleet, C. I. I. III, p. 289, line 10)। কিন্তু সেখানে তৃণ ও যূতির মধ্যে আরও দুইটি শব্দ আছে, কাজেই তৃণ যূতি একটি কথা নয়। চাম্বা প্রদেশের লিপিতে একই প্রসঙ্গে গোযূতির উল্লেখ আছে ; এবং গরু যেখানে বাঁধা হয়, সেই

স্থানকেই বুঝাইতেছে (Vogel, Antiquities of Chamba, pp. 167-68)। পাল আমলের লিপিগুলিতে কিন্তু তৃণ এবং যূতি কথা দুইটি এক সঙ্গে এক কথা বলিয়াই পাইতেছি। সেন আমলের লিপিগুলির তৃণ-পূতি কথাটি কি তৃণ-যূতি কথাটির অশুদ্ধ রূপ? সমসাময়িক নাগর লিপিতে "য" ও "প" বর্ণের পার্থক্য খুব বেশী নয়। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে গোচরের সঙ্গেই তৃণ-যূতির উল্লেখ খুব অসার্থক নয়। গ্রামসীমায় যে তৃণাস্তীর্ণ ভূমিতে গরু মহিষ বাঁধিয়া রাখা এবং ঘাস খাওয়ান হইত, তাহাই তৃণ-যূতি এবং তাহারই পাশে গরু মহিষ চরিয়া বেড়াইবার গোচারণ ভূমি। আর যদি তৃণ-পূতি কথাটিও শুদ্ধ অবিকৃতরূপে আমরা পাইয়া থাকি, তাহা হইলে, কথাটিকে গোচরের বিশেষণরূপে ধরিয়া লওয়া যায় কি? কোষকারদের মতে পূতি এক ধরণের ঘাস, কাজেই তৃণ ও পূতি প্রায় সমার্থক। তৃণ-পূতিপূর্ণ যে গোচরভূমি, তাহাই তৃণ-পূতি গোচর এবং তাহা যে গ্রামসীমায় বা ক্ষেত্র ও খিলভূমির সীমায় অবস্থিত থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

বন, অরণ্য ইত্যাদি—বন, অরণ্য সকল ক্ষেত্রেই গ্রামের বাহিরে। একাধিক লিপিতে বনভূমি, অরণ্যভূমি দানের উল্লেখ আছে। অরণ্যভূমি পরিষ্কার করিয়া কি করিয়া গ্রামের পত্তন করা হইত, তাহার পরিচয় অন্ততঃ একটি লিপিতে আছে। লোকনাথের ত্রিপুরা-পট্টোলিতে দেখিতেছি, সুব্বুঙ্গ বিষয়ে রাজা লোকনাথ সর্প-মহিষ-ব্যাঘ্র-বরাহাধ্যুষিত আটবী ভূখণ্ডে চতুর্বেদবিদ্যাবিশারদ দুই শত এগার জন ব্রাহ্মণ বসাইবার জন্য প্রচুর ভূমি দান করিয়াছিলেন; দানের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন ব্রাহ্মণ প্রদোষ শর্মন্। কৌটিল্যের বিধানে বন, অরণ্য ইত্যাদি ছিল রাষ্ট্রসম্পত্তি; ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে অরণ্যভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা যাইতে পারে, কৌটিল্য এই বিধানও দিয়াছেন। অরণ্যভূমি পরিষ্কার করিয়া কি করিয়া নূতন জনপদের পত্তন করিতে হয়, কৌটিল্য তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন। লোকনাথের লিপিটি কৌটিল্যের বিধানের অন্যতম ঐতিহাসিক প্রমাণ।

মার্গ, বাট দুইই জনপদের লোক ও যানবাহন চলাচলের পথ। ইবুদা তাম্রপট্টের আবস্করস্থান ত আস্তাকুঁড় এবং সেই হেতু উষর ভূমির সঙ্গেই তাহার উল্লেখ।

২। ভূমির মাপ ও মূল্য—পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলিতে ভূমির মাপের ক্রম খুব সহজেই ধরিতে পারা যায়। সর্বোচ্চ ভূমিমান হইতেছে কুল্য অথবা কুল্যবাপ, তার পর দ্রোণ বা দ্রোণবাপ এবং সর্বনিম্ন মান আঢ়বাপ। কুল্য, দ্রোণ এবং আঢ় (পরবর্ত্তী লিপিগুলির আঢক; বর্তমান পূর্ববাঙলার আঢ়া) সমস্তই শস্যমান; এই শস্যমান দ্বারাই ভূমিমান নিরূপিত হইয়াছিল, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

কুল্য বা কুল্যবাপ—যে-ভূমিতে বপন করা হয়, তাহা বাপক্ষেত্র; "উপ্যতেঽস্মিন্ ইতি বাপঃক্ষেত্রম্" (Bhattoji on Panini, V. 1. 44)। যে পরিমাণ বাপক্ষেত্রে এক কুল্য শস্য বপন করা যায়, সেই পরিমাণ ভূমি এক কুল্যবাপ ভূমি। দ্রোণবাপ এবং আঢ়বাপও যথাক্রমে এক দ্রোণ ও এক আঢ় বা আঢক শস্য বপনযোগ্য ভূমি। কুল্য আমাদের পূর্ব-বাঙলার কুলা; এক কুল্য শস্য অর্থাৎ একটি কুলায় যত ধান বা শস্য ধরে। বর্তমানে প্রচলিত

কুড়বা (২ বিঘা) কুল্যবাপ কথারই অপভ্রংশ। মৈমনসিং শ্রীহট্ট অঞ্চলে এখনও কুলুবায় কথা প্রচলিত, তাহাও কুল্যবাপ কথারই ভগ্ন রূপ।

দ্রোণবাপ ও আঢ়বাপ—দ্রোণ (=কলস) বর্ত্তমানে পল্লীগ্রামে দোনে বা ডোনে রূপান্তরিত হইয়াছে। আঢ় এখনও আঢ়া নামে প্রচলিত। প্রাচীন আর্যা ও কোষকারদের মতে এক কুল্যবাপ ভূমি আট দ্রোণবাপের সমান এবং এক দ্রোণবাপ চার আঢ়বাপের সমান এবং এক আঢ়বাপ চার প্রস্থের সমান। এক কুল্যবাপ যে আট দ্রোণের সমান, তাহা লিপিপ্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত হয়। পাহাড়পুর-লিপিতে, ১২ দ্রোণবাপ যে ১½ কুল্যবাপের সমান, তাহা পরিষ্কার ধরা যায়। বৈগ্রাম-লিপির ইঙ্গিতও তাহাই।

কুল্যবাপই হোক, আর দ্রোণবাপ বা আঢ়বাপ যাহাই হোক, মাপা হইত নলের সাহায্যে; এই নলই হইতেছে প্রাচীন উত্তর ও পূর্ববাঙ্‌লার প্রচলিত মানদণ্ড। বৈগ্রাম, পাহাড়পুর এবং ফরিদপুরের তিনটি পট্টোলীতেই বলা হইতেছে, ৮×৯ (৮ প্রস্থে×৯ দৈর্ঘ্যে) নলে (অষ্টকনবকনলাভ্যাম্) এক মান। কিন্তু এই মান কি কুল্যবাপের মান, না প্রস্থের মান, দ্রোণবাপ না আঢ়বাপের মান, তাহা সঠিক বলিবার উপায় নাই। এই নলেরও দৈর্ঘ্য নির্ভর করিত ব্যক্তিবিশেষের হস্তের দৈর্ঘ্যের উপর : বৈগ্রাম-লিপি অনুসারে দরব্বীকর্ম্ম নামক জনৈক ব্যক্তির হাতের মাপে, ফরিদপুর-লিপিত্রয় অনুসারে শিবচন্দ্র নামক কোন ব্যক্তির হাতের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী। অবশ্য ইহাদের হাতের মাপ গড়পড়তা সাধারণ হাতের দৈর্ঘ্যের মাপ কিংবা তার চেয়ে একটু বেশী বলিয়া মনে করিলে কিছু অন্যায় করা হইবে না। এই ধরণের ব্যক্তিবিশেষের হাতের মাপের মান অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদেও বাঙ্‌লাদেশে প্রচলিত ছিল। রাজসাহীর নাটোর অঞ্চলে "রামজীবনী" হাতের মান ত সেদিনকার স্মৃতি।

ষষ্ঠ শতক ও অষ্টম শতকের দুইটি লিপিতে ভূমি-মাপের একটি নূতন মানের সংবাদ জানা যাইতেছে। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-পট্টোলী এবং দেবখড়্গের ১নং আস্রফপুর-পট্টোলিতে 'পাটক' নামে একটি মানের উল্লেখ আছে, এবং তাহার পরের ক্রমেই যে-মানের নাম উল্লেখ আছে, তাহা দ্রোণবাপ। দ্রোণের সঙ্গে পাটকের সম্বন্ধের ইঙ্গিত এই দুইটি পট্টোলীর দত্ত ভূমির পরিমাণ বিশ্লেষণ করিলে হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। আস্রফপুর-পট্টোলীটির বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ৫০ দ্রোণে এক পট্টোলী হয়। কিন্তু আস্রফপুর-পট্টোলীর পাঠের নির্দ্ধারণ সন্দেহাতীত নয়। তাহা ছাড়া, সন্দেহ করিবার আরও কারণ, গুণাইঘর লিপির সাক্ষ্য। এই পট্টোলী দ্বারা মহারাজ রুদ্রদত্ত পাঁচটি পৃথক্ ভূখণ্ডে সর্বসুদ্ধ ১১ পাটক ভূমি দান করিয়াছিলেন; এই পাঁচটি ভূখণ্ডের পরিমাপ তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :—

১ম ভূখণ্ড	—	৭ পাটক	৯ দ্রোণবাপ
২য় "	—	×	২৮ "
৩য় "	—	×	২৩ "
৪র্থ "	—	×	৩০ "
৫ম "	—	১¾ "	× "
		৮¾ "	৯০

আগেই বলিয়াছি, দত্ত ভূমির মোট পরিমাণ ১১ পাটক। তাহা হইলে ৯০ দ্রোণে হইতেছে ২¼ পাটক, অর্থাৎ ৪০ দ্রোণে এক পাটক, এ কথা সহজেই বলা চলে। আগে দেখিয়াছি, ৮ দ্রোণে এক কুল্যবাপ, তাহা হইলে ৫ কুল্যবাপ = ১ পাটক।

পাটক এখানে নিঃসন্দেহে ভূমি মাপের মান; কিন্তু আম্রফপুর-লিপি দুটিতেই প্রমাণ পাওয়া যাইবে, পাটক কথাটি গ্রাম বা গ্রামাংশ অর্থেও ব্যবহৃত হইত। তলপাটক, মর্কটাসী পাটক, বৎসনাগ পাটক, দর পাটক এবং এই জাতীয় পাটকান্ত যত নাম, সমস্তই গ্রাম বা গ্রামাংশের নাম। বস্তুত বাঙ্‌লা পাড়া কথাটি পাটক হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়, অথবা দেশজ পাড়া হইতে পাটক। তলপাটক = তলপাড়া, ভট্টপাটক = ভাটপাড়া, মধ্যপাটক = মধ্যপাড়া ইত্যাদি পাটকান্ত নাম ত এখনও বাঙ্‌লাদেশের সর্বত্র সুপরিচিত। এ জাতীয় নাম প্রাচীন বাঙ্‌লার লিপিগুলি হইতেও জানা যায়। বাঙ্‌লার বাহিরেও এই জাতীয় নামের অভাব নাই, যেমন—মূলবর্ম পাটক গ্রাম, বিশাল পাটক গ্রাম, ইত্যাদি। গ্রাম বা গ্রামাংশ (= পাড়া) অর্থে পাট, পাটক কথা উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে পড্র বা পড্রকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—বড় পড্রকাভিধানগ্রাম, শমীপড্রকগ্রাম, শিরীষপড্রকগ্রাম ইত্যাদি। *পাট = পড্র = গ্রাম; ক্ষুদ্র গ্রামার্থে "ক" প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয় পাটক > পড্রক = পাড়া* বা গ্রামাংশ বা ছোট গ্রাম।

পাল-সম্রাট্‌দের আমলে ভূমি পরিমাপের মান কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দানের বস্তু হইতেছে একটি বা একাধিক সম্পূর্ণ গ্রাম; বোধ হয়, ইহা অন্যতম কারণ। একাদশ শতকে শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রপট্টে দেখিতেছি, সর্বোচ্চ ভূমি-মান হইতেছে পাটক। অষ্টম শতকে এই মান ফরিদপুরে প্রচলিত ছিল; একাদশ শতকে বিক্রমপুরেও দেখিলাম। মোটামুটি এই শতকেই শ্রীহট্টে দেখি, উচ্চতম মান হইতেছে হল। গোবিন্দ কেশবের ভাটেরা-তাম্রপট্টে ২৮টি বিভিন্ন গ্রামে ২৯৬টি বাস্তুভিটা এবং ৩৭৫ হল ভূমি দানের উল্লেখ আছে। শ্রীহট্ট জেলায় এখনও উচ্চতম ভূমিমান হইতেছে হল, নিম্নতম মান ক্রান্তি। ক্রম এইরূপ :

৩ ক্রান্তি	=	১ কড়া
৪ কড়া	=	„ গণ্ডা
২০ গণ্ডা	=	„ পণ
৪ পণ	=	„ রেখা
৪ রেখা	=	„ যষ্ঠি
৭ যষ্ঠি	=	„ পোয়া
৪ পোয়া	=	„ কেদার বা কেয়ার
১২ কেয়ার	=	১ হল (= ১০½ বিঘা = ৩½ একর)

শ্রীচন্দ্রের রামপাল শাসনে উচ্চতম ভূমিমান দেখিয়াছি পাটক, কিন্তু এই রাজারই ধুল্লা শাসনে উচ্চতম মান দেখিতেছি হল, এবং দত্ত ভূমিগুলি ত বিক্রমপুরে বলিয়াই অনুমান

হয়। একাদশ শতকে বিক্রমপুরে কি পাটক ও হল, এই দুই মানই প্রচলিত ছিল? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পাটকের সঙ্গে হলের সম্বন্ধ কি? যাহাই হউক, ধুল্লা শাসন হইতে এই খবরটুকু পাওয়া যাইতেছে যে, হলের নিম্নতর ক্রম হইতেছে দ্রোণ; কিন্তু দ্রোণের সঙ্গে হলের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাইতেছে না। দ্বাদশ শতকে ভোজবর্মার বেলব লিপিতে উচ্চতম ভূমিমান পাটক এবং নিম্নতর মান দ্রোণ; এ দুয়ের সম্বন্ধ যে কি, তাহা আগেই দেখিয়াছি। সেন রাজাদের লিপিগুলিতেও উচ্চতম মান পাটক অথবা ভূপাটক। এই লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ভূমিমানের যে ক্রম পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ: (১) পাটক বা ভূপাটক, (২) দ্রোণ বা ভূদ্রোণ, (৩) আঢক বা আঢ়াবাপ, (৪) উন্মান বা উদান বা উয়ান, (৫) কাক বা কাকিণি বা কাকিণিকা। পাটকের সঙ্গে দ্রোণের এবং দ্রোণের সঙ্গে আঢক বা আঢ়বাপের সম্বন্ধ ইতিপূর্বেই আমরা জানিয়াছি, কিন্তু আঢকের সঙ্গে উন্মানের বা উন্মানের সঙ্গে কাকের সম্বন্ধের কোনও ইঙ্গিত লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে না। লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন-পট্টোলীতে উপরোক্ত ক্রমের একটু ব্যতিক্রম পাওয়া যায়; দ্রোণের নিম্নতর ক্রম দেওয়া হইয়াছে খাড়িকা (?), এবং তাহার পর যথারীতি উন্মান ও কাকিণি। খাড়ীকা মান যে ছিল, তাহার প্রমাণ এই রাজারই মাধাইনগর পট্টোলীতেও আছে; সেখানে উচ্চতর মান ভূখাড়ী এবং তার পরেই খাড়ীকা। কিন্তু খাড়ীকার সঙ্গে দ্রোণের অথবা ভূখাড়ীর সঙ্গে খাড়ীকার সম্বন্ধ নির্ণয়ের কোন ইঙ্গিত লিপিগুলিতে নাই।

এই সম্বন্ধ নির্ণয় এবং এ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত ভূমিমানের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার যথাযথ মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে প্রাচীন আর্যাশ্লোক এবং প্রচলিত ভূমি-পরিমাপ রীতির একটু পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

সংশোধন :—এই সংখ্যার ১৬০ পৃষ্ঠায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-কৃত 'গ্রীস ও ম্যাসিডোনিয়ার ইতিহাস'-এর প্রকাশকালে একটু ভুল আছে। প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইবার পর এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড দেখিবার সুবিধা হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপনে" "১২৬৪ সাল। ২৫শে অগ্রহায়ণ"—এই তারিখ পাইতেছি; সুতরাং স্পষ্ট জানা যাইতেছে, পুস্তকখানি ১৮৫৭ সনের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৫৭।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-কৃত 'উপদেশমালা', ১ম-২য় ভাগ (পদ্যে) ১২৯০ সালে প্রকাশিত হয়—চাংড়িপোতা বিদ্যাভূষণ-লাইব্রেরির গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ইহা আমাকে জানাইয়াছেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি কর্ত্তৃক রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকায়, ১৭৬৮ শকে সারসুধানিধি-যন্ত্র হইতে প্রকাশিত ও তর্কবাচস্পতি কর্ত্তৃক সংশোধিত 'লীলাবতী'র উল্লেখ থাকা উচিত ছিল।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতচন্দ্র ও ভূরস্টুরাজবংশ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ

১২৬১ সনে কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত ১০ বৎসর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনী প্রকাশ করেন। ঈশ্বর গুপ্তই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীবনী লেখার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। গুপ্ত কবির লেখার পর এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে ভারতচন্দ্রের জীবনী সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা হয় নাই। অথচ বহু স্থলেই গুপ্ত কবির লেখার পুনরালোচনা আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের জীবনী সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসলেখকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিব।

ভারতচন্দ্রের জন্মাব্দ

গুপ্ত কবির মতে ১১১৯ সনে (১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে) ভারতচন্দ্রের জন্ম। কারণ, ভারতরচিত "সত্যপীরের কথা"র (দ্বিতীয়টির) রচনাকাল "সনে রুদ্র চৌগুণা" অর্থাৎ ১১৩৪ সন এবং তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম "কতিপয় প্রামাণ্য লোকের" কথানুসারে পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। এই জন্মাব্দ নির্ণয় অভ্রান্ত নহে। "রুদ্র চৌগুণা" স্থলে অঙ্কের বামগতি নিয়ম রক্ষিত হয় নাই; রুদ্র শব্দে ১১, চৌশব্দে ৪ এবং গুণ শব্দে ৩ সংখ্যা ধরিতে হইবে সন্দেহ নাই।[১] সুতরাং উক্ত রচনাতারিখ হয় ১১৪৩ সন (১৭৩৬ খ্রীঃ) এবং তৎকালে ভারত-চন্দ্রের বয়স নিঃসন্দেহ ১৫ হইতে অনেক বেশী ছিল। তৎকালে তাঁহার বয়স ১৫ ধরিলে তাঁহার জন্মাব্দ হয় ১৭২১ খ্রীঃ এবং মৃত্যুকালে (১৭৬০ খ্রীঃ) তাঁহার বয়স দাঁড়ায় মাত্র ৩৯। অথচ ভারতচন্দ্রের "নাগাষ্টক" রচনাকালে তাঁহার বয়স ছিল ৪০ এবং নাগাষ্টক তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেই রচিত হইয়াছিল, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। নাগাষ্টকের ২য় শ্লোকে আছে—"**বয়শ্চত্বারিংশৎ** তব সদসি নীতং নৃপ ময়া।" দেখা যাইতেছে, "প্রামাণ্য লোকে"র উক্তিই এ স্থলে গুপ্ত কবির এবং তদনুসারী সমস্ত জীবনীলেখকের অপ্রামাণ্যের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুরে অনল্পকাল বাস করিয়াছিলেন। সত্যপীরের কথার প্রথমটির রচনাকালে তাঁহার "নায়ক" অর্থাৎ আশ্রয়দাতা ছিলেন "হীরারাম রায়"; ইঁহার সম্বন্ধে এ যাবৎ কোন গবেষণা হয় নাই। তৎকালে এই নামে ভূরস্টুরাজবংশীয় ভারতচন্দ্রের এক জ্ঞাতি ছিলেন, তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেবানন্দপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন অসম্ভব নহে। হীরারাম রায়ের মৃত্যুর পরই সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্র রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে আসিয়া পারস্য

১। স্বর্গত ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'চৌগুণা' শব্দে রুদ্রের চতুর্গুণ ৪৪ অর্থ করিয়া ১১৪৪ সন রচনাকাল এবং ১১২৯ সন (১৭২২ খ্রীঃ) জন্মকাল নির্ণয় করিয়াছেন :—(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সং, পৃঃ ৪৯৮-৯; *Hist. of Bengali Lit.*, pp 662-63)। কিন্তু চৌগুণা শব্দে রুদ্রসংখ্যার চতুর্গুণ অর্থ করা কষ্টকল্পনা; আর মৃত্যুকালে ভারতের বয়স হয় মাত্র ৩৮।

ভাষা শিক্ষা করেন এবং সত্যপীরের দ্বিতীয় কথা রচনা করেন। দেবানন্দপুরে আশ্রয় লইবার পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের জীবনের প্রধান ঘটনা বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের রাজত্বকালে (১৭০২—৪০ খ্রীঃ) পিতৃরাজ্য নাশ, মাতুলগৃহে আশ্রয়, (১৪ বৎসর বয়সে) পরিণয় এবং সংস্কৃত শিক্ষা লাভ। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যে কিরূপ কৃতবিদ্য ছিলেন, তাহা নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন :

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক ॥
পুরাণ-আগমবেত্তা নাগরী পারশী।
দয়া করি দিব দিব্য জ্ঞানের আরশী ॥

(মানসিংহ, বঙ্গবাসী সং গ্রন্থাবলী, ১৩১২, পৃ. ৪৬৬)

দেবানন্দপুরে আসিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষার পূর্ব্বেই অধিকাংশ সংস্কৃত শাস্ত্র তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় কথার রচনাকালে তাঁহার পারস্য শিক্ষাও শেষ হইয়াছিল; সুতরাং ১১৪৩ সনে তাঁহার বয়ঃক্রম ২৫।৩০ ধরাই যুক্তিসঙ্গত এবং তদনুসারে ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষার্দ্ধে (১৭০৫—১০ খ্রীঃ) তাঁহার জন্মকাল স্থূলতঃ নির্ণয় করিতে হইবে।

ভারতচন্দ্রের দেবানন্দপুরে বাস এবং পুরুষোত্তম যাত্রার মধ্যে বেশী কাল ব্যবধান ছিল না। পুরুষোত্তমক্ষেত্র তখন মারহাট্টার অধিকারে গিয়াছে অর্থাৎ বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাত হইয়াছে (১৭৪২ খ্রীঃ)। সত্যপীরের দ্বিতীয় কথার রচনাকাল যদি ১১৩৪ সন (১৭২৭ খ্রীঃ) ধরা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যবধান দাঁড়ায় অন্যূন ১৫ বৎসর—ইহা সম্ভব নহে। নাগাষ্টক রচনার কালনির্ণয় দ্বারাও উক্ত জন্মকাল সমর্থন করা যায়। নাগাষ্টক রচনাকালে বর্গীর হাঙ্গামার পূর্ণতাপ্রাপ্তি হইয়াছে এবং বর্দ্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র (১৭৪৪-৭০ খ্রীঃ)[২] বর্গীর

২। প্রচলিত সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থে তিলকচন্দ্রের রাজ্যারম্ভ ১৭৪৪ খ্রীঃ বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পৃষ্ঠপোষক পূর্ব্বতন রাজা "চিত্রসেন" ১৭৪৫ খ্রীঃ প্রারম্ভেও জীবিত ছিলেন। মুদ্রারাক্ষসের অনুকরণে বাণেশ্বর "চন্দ্রাভিষেক" নামে সপ্তাঙ্ক সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার রচনাকালসূচক শেষ শ্লোকটি এই :

ধ্যাত্বা শ্রীরামচন্দ্রং সহ জনকসুতালক্ষ্মণাভ্যাং প্রযত্না-
দাজ্ঞামাজ্ঞায় রাজ্ঞামপি মুকুটমণেশ্চিত্রসেনাহ্বয়স্য।
শাকে কালাঙ্গতর্কৌষধিপরিগণিতে চৈত্রিকীয়ে নবাংশে
পূর্ণং চন্দ্রাভিষেকং ব্যতনুত দিবসে শ্রীলবাণেশ্বরাখ্যঃ॥

প্রস্তাবনায় আছে, চিত্রসেনের অমাত্য মাণিক্যচন্দ্রের উৎসাহে "বসন্তমহোৎসবে" ইহা অভিনীত হয়। ১৬৬৬ শকের চৈত্র মাস ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পড়ে। বাণেশ্বররচিত সমস্ত গ্রন্থরাজি কাশীর জয়নারায়ণ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। চন্দ্রাভিষেকের একমাত্র পুথিতে (Tawney & Thomas : *Cat. of 2 collections of sans. Mss., I. O. Library*, 1903, p, 38) উদ্ধৃত শ্লোক নাই। সৌভাগ্যক্রমে রামচরণ বাবুর নিকট এই শেষ পত্রটি মাত্র রক্ষিত আছে।

ভয়ে নবদ্বীপরাজের অধিকারে আসিয়া মুলাজোড়ের নিকট কাউগাছি গ্রামে অধিষ্ঠিত হন। এতদনুসারে ১৭৪৫-৫০ খ্রীঃ মধ্যে নাগাষ্টকের রচনাকাল নির্ণয় করা যায়। তৃতীয় শ্লোকে আছে :

"পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী।"

অর্থাৎ তখন তাঁহার পিতা জীবিত এবং তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে প্রথমটির মাত্র জন্ম হইয়াছে। সুতরাং ১৭৫০ খ্রীঃ পরে বর্গীর হাঙ্গামার অবসানে নাগাষ্টক রচিত হওয়ার কথা নহে।

ভারতচন্দ্রের কুলপরিচয়

গুপ্ত কবির সময়ে ঘটকসম্প্রদায়ের অভ্যুদয়হেতু রাঢ়ীয় কুলীনসন্তানগণের বংশাবলী অতি সুপ্রাপ্য ছিল এবং তিনি ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের নাম সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। অর্দ্ধশতাব্দী পরে প্রকৃত বংশাবলী অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে কৃত্রিমতার ব্যূহ ভেদ করিয়া সত্যাসত্যনির্ণয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার কুলপরিচয় নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন :—

(১) ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায়। (মানসিংহ)
(২) ভরদ্বাজ-অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ। (সত্যপীরের কথা)
(৩) ভুরিশিটরাজ্যবাসী　　নানা কাব্য অভিলাষী
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ। (রসমঞ্জরী)

এতদনুসারে ভারতচন্দ্র ফুলিয়ার মুখবংশের আদিপুরুষ নৃসিংহ অর্থাৎ কৃত্তিবাসের "নরসিংহ ওঝা"র বংশধর, তাঁহার নিজধারার একজন পূর্ব্বপুরুষের নাম "ভূপতি রায়" এবং তাঁহার বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন (রাজা) "প্রতাপনারায়ণ"। গুপ্ত কবি ভারতচন্দ্র ও তাঁহার পিতার গৌরবখ্যাপনে অগ্রসর হইয়া ভুরসুট রাজ্যের মূল রাজবংশের বিবরণকথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে বাঙ্গলার শিক্ষিতসমাজ রাজা প্রতাপনারায়ণের কীর্ত্তি-কাহিনী প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে হুগলী ও হাওড়া জেলার ইতিহাস-লেখক শ্রীযুত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "রায় বাঘিনী" গ্রন্থে এই বংশের একটি বিস্তৃত বংশলতা সহ অনেক মূল্যবান্ বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, "রায় বাঘিনী" গ্রন্থখানি না ইতিহাস, না উপন্যাস—এত কল্পিত বস্তু ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে যে, বংশ-লতাটি ব্যতীত ইহা হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপকরণ উদ্ধার করা প্রায় অসাধ্য।

স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথম 'বিশ্বকোষে' (৪র্থ ভাগ, ১৩০০ সন, পৃ. ৩৩৬) ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের নামমালা মুদ্রিত করেন ; যথা—

নৃসিংহ, তৎপুত্র গর্ভেশ্বর, তৎপুত্র মুরারি ওঝা (কৃত্তিবাসের পিতামহ), তৎপুত্র মদন, তৎপুত্র রাঘব, তৎপুত্র দেবানন্দ, তৎপুত্র প্রয়াগ, তৎপুত্র জগদীশ, তৎপুত্র গোপাল, তৎপুত্র রামনারায়ণ, তৎপুত্র রামকান্ত, তৎপুত্র নরেন্দ্র রায়, তৎপুত্র ভারতচন্দ্র রায়।

একমাত্র "রায় বাঘিনী" ব্যতীত সমস্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত বংশাবলী গৃহীত হইয়াছে।[৩] কিন্তু এই নামমালার অধিকাংশ কল্পিত এবং অপ্রামাণিক। "ভূপতি রায়ে"র নাম ইহাতে পাওয়া যায় না। ৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় অনুমান করিয়া লিখিয়াছেন, "পিতামহ রামকান্ত ভূমিপাল হইয়া 'ভূপতি' এই উপাধি ধারণ করেন।"—(সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সং, পৃ. ৭৪৪)। কিন্তু ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, 'ভূপতি রায়' তাঁহার পিতামহের উপাধি হইয়া থাকিলে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের শেষে তাঁহার পিতৃপরিচয়কালে "ভূরিশিটে **ভূপতি** নরেন্দ্র রায় সুত" লিখিতে পারেন না।

"রায় বাঘিনী"তে মুদ্রিত বংশলতা সংক্ষেপে এই :

নৃসিংহ ওঝা, তৎপুত্র গর্ভেশ্বর, তৎপুত্র মুরারি, তৎপুত্র অনিরুদ্ধ, তৎপুত্র গোপাল, তৎপুত্র মদন, তৎপুত্র সদানন্দ, তৎপুত্র রাজা শ্রীমন্ত (পেঁড়ো), তৎপুত্র রাজা মহেন্দ্র, তৎপুত্র যোগেন্দ্র, তৎপুত্র অমরেন্দ্র, তৎপুত্র সুরেন্দ্র, তৎপুত্র গোপী রায়, তৎপুত্র রাজা ভূপতি, তৎপুত্র রাজা সদাশিব, তৎপুত্র রাজা নরেন্দ্র, তৎপুত্র ভারতচন্দ্র। (পৃ. ২)

এতদনুসারে ভারতচন্দ্রের প্রপিতামহের নাম "ভূপতি রায়" এবং আপাতদৃষ্টিতে এই বংশলতা প্রামাণিক মনে হইবে; কিন্তু ইহারও স্থলবিশেষে কৃত্রিমতা থাকায় সংশোধন আবশ্যক হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে বিলুপ্ত ভূরসুটরাজ্যের মূল রাজবংশের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

রাজা কৃষ্ণ রায়

প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অংশবিশেষ খ্রীঃ ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীতে বাগ্দিরাজাদের হস্তগত ছিল। শেষ বাগ্দিরাজা শনিভাঙ্গড়কে পরাজিত করিয়া গড়-ভবানীপুরনিবাসী চতুরানন নিয়োগী ঐ রাজ্য অধিকার করেন। চতুরাননের দৌহিত্র ফুলিয়ার মুখটিবংশীয় "কৃষ্ণ রায়" ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের প্রথম ব্রাহ্মণ রাজা। এই বিবরণ জনশ্রুতিমূলক হইলেও ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। "রায় বাঘিনী" মতে কৃষ্ণ রায়ের ঊর্দ্ধতন বংশলতা এই :

৩। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, প্রথমাংশ, উত্তরসংস্করণ; সম্বন্ধনির্ণয়, ২য় সং, পৃঃ ৫৯৭-৮, ৩য় সং, পৃঃ ৭৪৪, অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'হুগলী বা দক্ষিণরাঢ়', পৃঃ ৭২-৭৩, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর 'বঙ্গের ব্রাহ্মণরাজবংশ' পৃঃ ১০৬-৭।

এই বংশলতা প্রামাণিক নহে। ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' গ্রন্থে (৬৫ পৃ.) অনিরুদ্ধের সাত পুত্রের নামোল্লেখ আছে ; তন্মধ্যে গোপালের নাম নাই। রায় বাঘিনীর গ্রন্থকার এই বংশলতা পাটনার প্রবীণ উকীল রায়বংশীয় শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের নিকট সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; কিন্তু মুদ্রণকালে সামান্য ভুল করিয়াছেন। অতুলবাবু স্বগ্রামবাসী ঘটক ৺কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কুলগ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া যে বংশলতা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এই :—
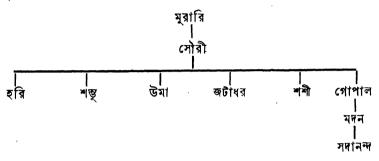
ইহাও ঠিক নহে ; কারণ, ধ্রুবানন্দ (৬৬ পৃ.) সৌরির ৫ পুত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে গোপালের নাম নাই। ধ্রুবানন্দ মতে (৩৯ পৃ.) মুরারি ওঝার তৃতীয় পুত্র "মদন" এবং পঞ্চম পুত্রই বনমালী (কৃত্তিবাসের পিতা)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত একটি কুলগ্রন্থে[৪] মুরারিসুত অর্থাৎ কৃত্তিবাসের জ্যেষ্ঠতাত মদন হইতেই রায়-বংশের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। আমরা "মুং ফুং মদন ভট্টাচার্য্য বংশে"র প্রারম্ভাংশ অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি :

(মুরারি-সুত) মদন ভট্টাচার্য্যস্য অকৃতী, তৎসুতো রাঘবকাকুস্থৌ। কাকুস্থস্য কুকর্ম্মণা কুলাভাবঃ, তৎসুতাঃ শ্রীধর-শ্রীহরি-কৌতুককাঃ। শ্রীহরিরায়স্য (সুতৌ) সদানন্দ-বৈদ্যনাথৌ, সদানন্দ সুত কৃষ্ণরায় রাজাখ্যাতি। (৩১৫ খ পত্র)

এই বিবরণে অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন কথা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ মদনই কুলক্রিয়ায় "অকৃতী" ছিলেন এবং তৎপুত্র কাকুৎস্থ হইতে এই বংশে কুলাভাব ঘটে। শ্রীহরি প্রথম 'রায়' উপাধি লাভ করেন। শ্রীহরির দ্বিতীয় পুত্র বৈদ্যনাথ "পশপুরে"র রায়বংশের আদিপুরুষ এবং ইহাঁরা এই বিস্তৃত রায়বংশের দূরতম জ্ঞাতি। সদানন্দের একমাত্র পুত্র "কৃষ্ণ" (কৃষ্ণচন্দ্র নহে) ভূরস্থটের প্রথম "রাজা"। পূর্ব্বসংখ্যায় কৃত্তিবাসের কুলকথায় যে কালবিচার করা হইয়াছে, তদনুসারে মদনের জন্মাব্দ ১৩৫০ খ্রীঃ পরে যাইবে না। অকুলীন 'রায়'-বংশে এক পুরুষে ৩০ বৎসর ধরিয়া মদনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র কৃষ্ণ রায়ের জন্মাব্দ হয় অনুমান ১৪৭০ খ্রীঃ এবং ভূরস্থটের এই ব্রাহ্মণরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল অনুমান ১৫০০ খ্রীঃ নির্ণয় করা যায়।

৪। পুথির সংখ্যা $\frac{M3/38}{7+8}$; এই বিপুলায়তন কুলগ্রন্থের পত্রসংখ্যা (ক্রোড়পত্রাদি ছাড়াই) ৫৩২।

গড়-ভবানীপুরের মণিনাথ শিবমন্দিরের ১৩০৬ শকাব্দের (১৩৮৪ খ্রীঃ) শিলালিপি এই কালনির্ণয়ের অত্যন্ত বিরোধী (রায় বাঘিনী, পৃ. ৪)। গ্রন্থকারের মতে এই মন্দির কৃষ্ণরায়ের পুত্র "দেবনারায়ণে"র রাজত্বকালে নির্ম্মিত। খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর মন্দির এখনও অক্ষতশরীরে বিদ্যমান আছে জানিয়া ঐতিহাসিকমাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। আমরা বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত শিলালিপি পরীক্ষার জন্য গড়-ভবানীপুর গিয়াছিলাম।[৫] মন্দিরটি ক্ষুদ্র এবং ১৫০।২০০ বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন নহে। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মনোহর শিবলিঙ্গ প্রাচীন বলিয়া বুঝা যায়, সম্ভবতঃ প্রাচীন মন্দির সংস্কার করিয়া নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের দ্বারোপরি নিম্নলিখিত শিলালিপি খোদিত আছে :

শ্রীভগবতঃ রাম	শুভমস্তু শকাব্দা
দেবনারায়ণ	১৩০৬।। ২১ শ্রাবণ

এই শিলালিপি অনিপুণ হস্তে উৎকীর্ণ এবং ইহার অক্ষর ১৫০ বৎসরের পূর্ব্বের নহে। নূতন মন্দির নির্ম্মাণকালে কল্পিত শকাব্দের উল্লেখ দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে মন্দিরের প্রাচীনতা সাধনের চেষ্টা হইয়াছে নিঃসন্দেহ। 'রাম' স্থলে 'রায়' পড়িলে ('বাস'ও পড়া যায়) কষ্টকল্পনা করিয়া "দেবনারায়ণ রায়" মন্দিরের স্থাপয়িতা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ কল্পিত। সম্ভবতঃ শিল্পী দেবতার নামই ("শ্রীভগবতঃ বাসুদেবনারায়ণস্য") খোদিত করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, তর্কস্থলে মদনের পুত্রই সদানন্দ ধরিলেও চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াও মদনের কোন প্রপৌত্রকে ১৪০০ খ্রীঃ পূর্ব্বে স্থাপন করা যায় না।

রাজা প্রতাপনারায়ণ

বস্তুতঃ রাজা কৃষ্ণরায়ের দেবনারায়ণ নামে কোন পুত্রের উল্লেখ নাই। রায় বাঘিনীর গ্রন্থকার উক্ত শিলালিপির সন্দিগ্ধ ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া প্রাপ্ত বংশলতামধ্যে কোন প্রমাণ নির্দ্দেশ না করিয়া ঐ নাম এবং আরও অতিরিক্ত তিন পুরুষের নাম যোজনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। আমরা তিনটি বংশলতার সমালোচনাদ্বারা সত্যোদ্ধারের চেষ্টা করিব।

১। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তৎপুত্র রাজা দর্পনারায়ণ, তৎপুত্র রাজা উদয়নারায়ণ (প্রভৃতি), তৎপুত্র রাজা প্রতাপনারায়ণ, তৎপুত্র রাজা নরনারায়ণ, তৎপুত্র (শেষ) রাজা লক্ষ্মীরনারায়ণ ...(পাটনার [illegible]ত অতুলকৃষ্ণ রায় সংগৃহীত)।

২। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তৎপুত্র রাজা দেবনারায়ণ, তৎপুত্র রাজা দর্পনারায়ণ, তৎপুত্র রাজা উদয়নারায়ণ (প্রভৃতি), তৎপুত্র রাজা সত্যনারায়ণ, তৎপুত্র রাজা শিবনারায়ণ, তৎপুত্র রাজা রুদ্রনারায়ণ (পত্নী রাণী ভবশঙ্করী 'রায় বাঘিনী'), তৎপুত্র রাজা প্রতাপনারায়ণ... (রায় বাঘিনী, পৃ. ৩)

৫। পশপুরের বিখ্যাত ভট্টাচার্য্যবংশীয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শিখরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের সহচর ছিলেন। শিখরবাবু বিষয়কর্ম্মের ক্ষুদ্র অবসরকাল নীরবে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে যাপন করিয়া থাকেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, তাঁহার নিকট গবেষণাকার্য্যে আমরা প্রচুর সাহায্য লাভ করিয়াছি।

৩। রাজা কৃষ্ণ রায়, তৎসুতাঃ বসন্তরায়-মহেন্দ্র-মুকুটরায়-দক্ষিণরায়-রামরায়-দুর্গাদাস-রায়-নারায়ণরায়াঃ। বসন্ত রায় সুত গোপাল রায়, তৎসুত রাজা দর্পনারায়ণ, তৎসুত উদয়নারায়ণ (প্রভৃতি), তৎসুতাঃ রাজা প্রতাপনারায়ণ-রমাবল্লভ-যাদর-রঘুনাথসিংহ-অমর-সিংহরায়াঃ। প্রতাপনারায়ণ সুত শিবনারায়ণ, তৎসুত নরনারায়ণ, তৎসুতৌ লছিরনারায়ণ-হিরারামৌ। লছিরনারায়ণসুতৌ রামনারায়ণ-রূপনারায়ণৌ সাং বসন্তপুর। (ঢাকার পুথি, ৩১৫ খ পত্র)।

ঢাকার পুথিতে শেষ রাজা লছিরনারায়ণের পুত্রের অধস্তন কোন নাম নাই; বুঝা যায়, খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই নামমালা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তিনটির মধ্যে ইহার প্রামাণ্য তজ্জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং ইহাতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অনেক নূতন নাম পাওয়া যাইতেছে। রাজা প্রতাপনারায়ণের বংশধরগণ এখনও বসন্তপুরে বাস করিতেছেন এবং বুঝা যায়, রাজা কৃষ্ণরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা বসন্ত রায়ের নামানুসারে ঐ গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল। এক পুরুষে ৩০ বৎসর গণনা করিয়া কৃষ্ণ রায়ের জ্যেষ্ঠানুক্রমিক অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রাজা প্রতাপনারায়ণের জন্মতারিখ হয় প্রায় ১৬২০ খ্রীঃ। প্রতাপনারায়ণের রাজত্বকাল নির্ণয়দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ সমর্থিত হইবে। পক্ষান্তরে প্রথম বংশলতায় ২ পুরুষের নাম বাদ যাওয়ায় একপুরুষে ৫০ বৎসর ধরিয়া গণনা করিতে হয়, যাহা রাজবংশের পক্ষে একান্তভাবে অসম্ভব। রায় বাঘিনী গ্রন্থে ৪ নাম (দেবনারায়ণ, সত্যনারায়ণ, শিবনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণ) যে কল্পিত ও পরবর্ত্তী যোজনা, তাহাতে সন্দেহ নাই।[৬] প্রতাপনারায়ণের কালনির্ণয় সহজ-সাধ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎপ্রকাশিত "অনাদিমঙ্গল" গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৮৪ শক ('তিন

৬। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় মহাশয় উদয়নারায়ণের ভ্রাতা অভিরামের অধস্তন ৮ম পুরুষ (রায় বাঘিনী, পৃঃ ৩)। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, অতুলবাবুই পঠদ্দশায় (১৮৯৫ খ্রীঃ) বসন্তপুরের ঘটকগৃহ হইতে বংশলতা উদ্ধার করিয়া বিধুবাবুকে প্রদান করেন। রূপনারায়ণের অধস্তন নামগুলি এই :

রায় বাঘিনী গ্রন্থানুসারে সারদা রায় রাজা উদয়নারায়ণের অধস্তন ১১শ পুরুষ অর্থাৎ সম্পর্কে অতুলবাবু সারদা রায়ের 'বৃদ্ধপ্রপিতামহ' হন, অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি সারদা রায়ের জ্ঞাতি 'ভ্রাতুষ্পুত্র' বটেন। সুতরাং উদয়নারায়ণ ও প্রতাপনারায়ণের মধ্যবর্ত্তী তিন পুরুষের নাম যে অলীক কল্পনা, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই তিন নাম বাদ দিলেও কিন্তু অতুলবাবু জ্ঞাতি 'ভ্রাতা' হন; অনুমান হয়, অভিরামের ধারায় প্রমাদবশতঃ একপুরুষের নাম পড়িয়া গিয়াছে। আমরা এ স্থলে অতুলবাবুর নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অতুলবাবুর পূর্ব্বপুরুষগণের নাম যথা, অভিরাম—চন্দ্রশেখর—মহাদেব—হরিদেব রায়—বৈদ্যনাথ—ঠাকুরদাস—কালীকুমার—অতুলকৃষ্ণ। হরিদেব রায় বসন্তপুরে বাস করেন, ইনি লক্ষ্মীনারায়ণের ভাই এবং বুঝা যায়, রাজ্যনাশের পরই বসন্তপুরে বাস ঘটে।

বাণ বসু বেদ শকে'—অঙ্কের বামগতিনিয়ম এখানেও উপেক্ষিত) অর্থাৎ ১৬৬২ খ্রীঃ, তৎকালে প্রতাপনারায়ণই ভূরসুটের প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। বিখ্যাত টীকাকার মহাপণ্ডিত **ভরত-মল্লিক** প্রতাপনারায়ণের সভাসদ্ ছিলেন। ভরতরচিত বৈদ্যকুলপঞ্জিকা "চন্দ্রপ্রভা"য় পাওয়া যায় :

ইতিপ্রজাধীশ্বরধীরবীর-**প্রতাপনারায়ণ**-সৎসদস্যঃ।
শ্রীকৃষ্ণখানস্য জগৎপ্রসিদ্ধাং বংশাবলীং শ্রীভরতো জগাদ ॥ (২১ পৃ.)

চন্দ্রপ্রভা ১৫৯৭ শকে (১৬৭৫ খ্রীঃ) সমাপ্ত হয়, তৎকালে ভরতমল্লিক প্রবীণ ; কারণ, চন্দ্রপ্রভায় (পৃ. ৩২) তাঁহার পৌত্র-পৌত্রীর উল্লেখ আছে। ভরতকৃত অনেক টীকাগ্রন্থ রাজাদেশে রচিত এবং তাঁহার মাঘটীকা রাজপুত্রের প্রীতির জন্য সঙ্কলিত হয়।[৭] এই রাজা ও রাজপুত্র নিঃসন্দেহ প্রতাপনারায়ণ ও নরনারায়ণ। ভরতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অমরকোষের টীকার রচনাকাল ১৫৯৯ শকাব্দ।[৮] তাহার অনেক পূর্ব্বে 'দ্রুতবোধ' ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল।[৯] সুতরাং ১৬৫০-৮৫ খ্রীঃ মধ্যে ভরতমল্লিক ও রাজা প্রতাপনারায়ণকে নিঃসন্দেহে স্থাপন করা যায়।

রায় বাঘিনী গ্রন্থে রাজা নরনারায়ণের মোহরাঙ্কিত ১০৯২ সনের (১৬৮৫ খ্রীঃ) এক দলীলের কথা আছে (পৃঃ ১৫৯)। সনটি দলীলের, না মোহরের, গ্রন্থকার তাহা ব্যক্ত করেন নাই। যদি মোহরের সনই হয়, তবে তাহা নরনারায়ণের অভিষেকাব্দ এবং প্রতাপনারায়ণের মৃত্যুসন।[১০] আমরা কুলগ্রন্থে রাজা প্রতাপনারায়ণ ও তাঁহার এক পিতৃব্যের কুলক্রিয়ার উল্লেখ পাইয়াছি। কাঁটাদিয়া বন্দ্যবংশে দেবাই প্রকরণে ভুবনানন্দের ধারায় 'বংশী' সম্বন্ধে একটি কুলগ্রন্থে লিখিত আছে :

"বংশীকস্য কন্যা ভূরসুট পরগণায়াং কস্মৈ দত্তা ন জানে।" [১১]

৭। 'ভূভৃন্নিদেশাৎ' (রঘুটীকা : Eggeling : *I. O. Cat.* p. 1415)
'প্রিয়গুণিগণ-ভূরিশ্রেষ্ঠ-ভূপালশিষ্টেরকৃত' (মেঘদূতটীকা *ibid.* p. 1422)
'তদপি পঠন্নৃপপুত্রপ্রীত্যৈ স্পষ্টামিমাং কুর্ব্বে ; (মাঘটীকা *ibid.* p. 1432)

৮। অস্মন্নিকটে রক্ষিত ১৭০৫ শকের সম্পূর্ণ প্রতিলিপিতে মনুষ্যবর্গের শেষে লিখিত আছে, "গ্রন্থকারস্য শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৯৯।৯।১৫।২৫ (১৬৭৮ খ্রীঃ)। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'কারকোল্লাসে'র ভূমিকায় ভ্রমবশতঃ অমরটীকার এক প্রতিলিপির কাল (১৬২৫ শকাব্দ) রচনাকাল বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

৯। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় 'দ্রুতবোধে'র একটি সুপ্রাচীন প্রতিলিপি রক্ষিত আছে—ইহা ১৫৮১ শকে (১৬৫৯ খ্রীঃ) লিখিত। ভরতের গ্রন্থরাজির ইহাই প্রাচীনতম প্রতিলিপি। (৮৮১ সং সংস্কৃত পুথি)।

১০। ঢাকার পুথি অনুসারে নরনারায়ণ প্রতাপনারায়ণের পৌত্র, কিন্তু ৬ পাদটীকায় লিখিত কারণবশতঃ উদয়নারায়ণের পর পুরুষসংখ্যা একটিও বাড়ান চলে না, বরং কমান আবশ্যক। আমরা তদনুরোধে বসন্তপুরের ঘটকগ্রন্থের অনুসরণ করিয়া শিবনারায়ণের নাম বাদ দিলাম।

১১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ নং সংস্কৃত পুথি, ৯৭থ পত্র।

অপর গ্রন্থে আছে :

"বংশীকস্য…পশ্চাৎ কন্যা ভূরস্যুটনিবাসী মুখ দর্পনারায়ণ সুতে গোবিন্দ রায়ে গতাঃ অতো নাসঃ অয়মপুত্রকঃ।"[১২]

সাগরদিয়া বংশে ভগীরথগোষ্ঠী জিতামিত্রপ্রকরণের বিষ্ণুদেব সম্বন্ধে লিখিত আছে :

"রাজ্ঞঃ প্রতাপনারায়ণস্য কন্যাগ্রহণাদ্ভঙ্গঃ।"[১৩]

কুলগ্রন্থে রাজবংশের অধস্তন পুরুষদের অন্যান্য কুলক্রিয়ার উল্লেখ আমরা বাহুল্যবোধে পরিত্যাগ করিলাম।

হাওড়া, হুগলী ও বর্দ্ধমান জিলার নানা স্থানে রাজা প্রতাপনারায়ণ প্রভৃতির দত্ত বহু দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি এখনও অনেকে ভোগ করিতেছেন। আমরা দুই একটি বিশিষ্ট ভূমিদানের উল্লেখ করিতেছি। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের নবরত্ন-সভার একজন রত্ন ছিলেন "পশপুরের স্মার্ত্ত কৃপারাম"। তিনি ১২০৯ সনের ৩ চৈত্র একটি তায়দাদে বিবরণ দিয়াছেন :

"সাবেক রাজা প্রতাপনারায়ণ রায় আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত আমার পিতামহ ঘনশ্যাম চট্টোপাধ্যায়এর বিবাহ দিয়া কুলভঙ্গ করিয়া বাটী বানাইয়া দিয়া গ্রামে২ যে জমী দিয়াছেন তাহা আজ পর্য্যন্ত ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি।"

কুলগ্রন্থে এই উক্তির যথাযথ সমর্থন পাওয়া গিয়াছে—

"ঘনেশ্যামস্য ভূরস্যুটনীবাসি রামবল্লভরায়স্য কন্যাবিবাহাদ্ভঙ্গঃ।"[১৪]

ঢাকার পুথিতে প্রতাপনারায়ণের ভ্রাতৃমধ্যে 'রমাবল্লভে'র নাম আছে।

১২। অস্মন্নিকটে রক্ষিত ঘটককেশরীর কুলপঞ্জীর কাঁটাদিয়া প্রকরণ, ১৪ক পত্র। নানা স্থানের পুথি মিলাইয়া কুলগ্রন্থেও কিরূপ লুপ্তোদ্ধার হয়, ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাজা দর্পনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দের নাম বংশলতায় আছে। (রায় বাঘিনী, পৃ. ৩)।

১৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৮১৫খ সং পুথির ৫০খ পত্র। ঘটককেশরী এ স্থলে লিখিয়াছেন : ভূরস্যুটনিবাসি ভরদ্বাজস্য কন্যাবিবাহাৎ নৈকস্যভঙ্গঃ "(সাগর° প্র° ৬ক পত্র)। বিষ্ণুদেব ভগীরথসুত জিতামিত্রের (ধ্রুবানন্দ, ১৩৩ পৃ.) অধস্তন ৫ম পুরুষ ; আর উল্লিখিতবংশী ভুবনানন্দসুত জগাইর (ধ্রুবানন্দ, ১৪০ পৃ.) পৌত্র অর্থাৎ ৩য় পুরুষ। এতদ্দারাও প্রমাণ হয়, দর্পনারায়ণ ও প্রতাপনারায়ণের মধ্যে এক পুরুষের বেশী ব্যবধান নহে।

১৪। কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত ১০৯০ সং পুথি, ৩৭১ক পত্র (লিপিকাল ১২১০ সন)। ঘনশ্যাম বিখ্যাত কুলীন অবসথী গঙ্গানন্দের (ধ্রুবানন্দ, ১৪২ পৃ.) অধস্তন ৪র্থ পুরুষ (গঙ্গানন্দ—খঞ্জগোপী—রামেশ্বর—ঘনশ্যাম)। ঘনশ্যামের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যালঙ্কার ১১৯৪ সনে কিম্বা অব্যবহিত পরে অন্যূন ১২০ বৎসর বয়সে স্বর্গী হন। তৎপুত্র কৃপারাম তর্কবাগীশ (১১০০-১২১১ সন) বাঙ্গালার এক জন শ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং ১১২ বৎসর পরমায়ু লাভ করেন। এই বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া পশপুরের খ্যাতি এক সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। কৃপারামের দুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠ রামসুন্দর তর্কপঞ্চানন (মৃত্যু ১২১০ সন, পত্নী সহগামিনী), কনিষ্ঠ রাম তর্কালঙ্কার (১২৫৯ সন, ১০৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু)। রামসুন্দরের পুত্র কালীপ্রসাদ শিরোমণি, রাজচন্দ্র ন্যায়ভূষণ (১১৮১-১২৭৭) ও কাশীনাথ তর্কভূষণ। রাম তর্কালঙ্কারের ৩ পুত্র—তারাচাঁদ তর্কসিদ্ধান্ত (১১৯৫-১২৭৫), হরিনারায়ণ চূড়ামণি (১২০৪-১২৯২) ও মদনমোহন সার্ব্বভৌম (১২২০-১৩০৩)। কৃপারামের

হাওড়া জেলার 'কুলটীকরি' গ্রামে বন্দ্যবংশীয় এক ব্রাহ্মণ-পরিবার একটি বৃহৎ দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। ১২০৯ সনের (৫১৯৩৪ সং) তায়দাদে ইহার বিবরণে লিখিত আছে :

"প্রতাপনারায়ণ রায় জমীদার মাতার স্থাপিত ৺রুদ্রেশ্বর সীব ঠাকুরের নির্ত্তসেবার কারণ" নিমানন্দ চক্রবর্ত্তীকে ১০০/০ বিঘা দেবত্তর দেন। আপাতদৃষ্টিতে ৺রুদ্রেশ্বর নাম রুদ্রনারায়ণের স্মরণার্থ রচিত হইতে পারে এবং রায় বাঘিনী গ্রন্থানুসারে রুদ্রনারায়ণই প্রতাপনারায়ণের পিতা। কিন্তু পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, কুলগ্রন্থের একটিতেও এই নাম নাই। "রায় বাঘিনী" গ্রন্থে রুদ্রনারায়ণ ও তাঁহার পত্নী বীরাঙ্গনা রাণী ভবশঙ্করীর যে সকল কীর্ত্তিকাহিনী উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাহার কোনই ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই—সমস্তই গ্রন্থকারের মনঃকল্পিত। তবে, সম্রাট্ আকবরের রাজত্বের শেষ ভাগে মোগল-পাঠানের সংঘর্ষকালে ভূরস্টের রাজবংশীয় কোন বীরাঙ্গনা অপূর্ব্ব যুদ্ধকৌশল দেখাইয়াছিলেন, প্রবল জনশ্রুতির এই সারাংশ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এ বিষয়ে সত্য নির্ধারণের কোন চেষ্টা এ যাবৎ হয় নাই। ঐ বীরাঙ্গনা রাজা দর্পনারায়ণ কিম্বা উদয়নারায়ণের পত্নী হওয়া সম্ভব।

ভূরস্টট পরগণায় তিনটি প্রধান গড় অবস্থিত ছিল। তন্মধ্যে ভবানীপুরের গড়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং রাজবংশের প্রধান শাখার অধিকারে ছিল। এই গড়ের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান এবং ইহার এক প্রান্তে ভগ্নপ্রায় ইষ্টকাময় বৃহৎ দ্বিতল একটি দেবমন্দির রাজাদের ঐশ্বর্য্যের নিদর্শনস্বরূপ এখনও পরিলক্ষিত হয়। ভূরস্টট রাজ্য অধিকার করিতে মোগলশক্তির যে সকল সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তন্মধ্যে রাজ্যের তিন প্রান্তে তিনটি অত্যুচ্চ "গীর্জ্জা" বা Monument বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—একটি খানাকুলের নিকট, একটি দিলাকাশ গ্রামে এবং আর একটি বড়গাছিয়া গ্রামে (বর্ত্তমানে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে)। আমরা দিলাকাশের 'গীর্জ্জা'টি দেখিয়াছি, ইহা ত্রিতল এবং বেশ উঁচু, সম্প্রতি প্রবেশদ্বারটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাজা লছীরনারায়ণের (লক্ষ্মীনারায়ণ ?) সময় অনুমান ১৭২০ খ্রীঃ বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচাঁদ ভূরস্টট রাজ্য আক্রমণ করিয়া ভবানীপুরের গড় অধিকার করিয়াছিলেন। রায়বাঘিনী গ্রন্থে ইহার জনশ্রুতিমূলক বৃত্তান্ত আছে। সম্ভবতঃ হৃতরাজ্য রাজপরিবার অতঃপর বসন্তপুর গ্রামে অধিষ্ঠিত হন।

ছাত্র তারাচাঁদও মহাপণ্ডিত ছিলেন। মহিষাদলের মাধব সার্ব্বভৌম তারাচাঁদের ছাত্র ছিলেন। কৃপারাম পাণ্ডিত্যবলে মহিষাদল-রাজবাটী হইতেও প্রভূত সম্মান, বৃত্তি ও ভূমিদান পাইয়াছিলেন (১১৮২ সন)। পাণ্ডিত্যের লীলাভূমি এই পশপুর গ্রাম দামোদর-বাঁধের সংলগ্ন হুগলী জেলার এক প্রান্তে নাগরিক সভ্যতার দূরে থাকিয়া অধুনা মৃতপ্রায় অবস্থান করিতেছে।

রাজা ভূপতি রায়

ভূরস্থট রাজ্যের দ্বিতীয় গড় পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রামে অবস্থিত ছিল। রাজবংশের একটি কনিষ্ঠ শাখা এই গড় অধিকার করিত এবং সেই শাখাতেই ভারতচন্দ্রের জন্ম। প্রবাদ অনুসারে সমগ্র রাজ্যের ৵০ দুই আনা অংশ মাত্র ইহাঁরা ভোগ করিতেন। সৌভাগ্য-ক্রমে ঢাকার কুলগ্রন্থে এই শাখার সম্পূর্ণ নামমালা পাওয়া যায়, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম:

রাজা কৃষ্ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্র রায়, তৎসুত গোপী রায়, তৎসুতাঃ ভূপতিরায়-শ্যাম-জগজ্জীবন-প্রাণবল্লভ-নরোত্তম-জনার্দ্দন-মধুসূদনাঃ। ভূপতিরায়সুতাঃ সদাশিব-চাকু-রাজবল্লভ-কীশোর-কন্দর্প-বাণেশ্বরাঃ। সদাশিবসুতাঃ নরেন্দ্র-বংশী-কাশী-রসিক-শুকদেবাঃ। নরেন্দ্রসুতাঃ চতুর্ভুজ-অর্জ্জুন-দয়ারাম-ভারতচরণাঃ। সাং পাণ্ডুয়া ভূরস্থট্ট। (৩১৫ খ পত্র)

বসন্তপুরের কুলগ্রন্থানুসারে কৃষ্ণ রায়ের ভ্রাতা শ্রীমন্ত রায়ের পুত্রই মহেন্দ্র রায়। রায় বাঘিনী গ্রন্থে অতঃপর এই শাখায়ও মূল শাখার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য মহেন্দ্র রায় ও গোপী রায়ের মধ্যে ৩ পুরুষের কল্পিত নাম যোজিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যত্র উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল আছে, কেবল ঢাকার পুথিতে প্রত্যেক পুরুষে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অনেক ভ্রাতৃপর্য্যায়ের নাম পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত শেষ হওয়ায় বুঝা যায়, এই তালিকাও ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য ইহাই অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া আমরা মনে করি।

এই শাখার ভূপতি রায় সম্ভবতঃ প্রতাপনারায়ণের অল্প পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কুলগ্রন্থে ইহাঁর একটি কুলক্রিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নপাড়ী বন্দ্যবংশীয় দুলাল সম্বন্ধে আছে—ভূরস্থটনিবাসি মুং ভূপতিরায়স্য (কন্যা) গ্রহণাদ্ভঙ্গঃ বংশাভাবঃ।" (বঙ্গীয় সা, প, ১৮১৫ খ পুথি, ১৫৯ ক পত্র)। দুলাল যদুসুত রতিনাথের (ধ্রুবানন্দ, ১২৬ পৃ.) বৃদ্ধপ্রপৌত্র বিধায় অনুমান ১৬৫০ খ্রীঃ পরবর্ত্তী নহেন। ভূপতি রায় যে কাহারও উপাধি নহে, সে বিষয়ে অতঃপর আর সন্দেহ থাকে না।

ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্র রায়ও রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে কুলক্রিয়া করিয়াছিলেন। পাটুলীর চট্টবংশীয় বিখ্যাত কুলীন রামজীবনের এক পৌত্র "অযোধ্যারাম বাচস্পতি" সম্বন্ধে লিখিত আছে, "মুং নরেন্দ্র রায়স্য কন্যা গ্রহণাদ্ভঙ্গঃ" (ঐ, ২৪৯ খ পত্র)। নরেন্দ্র রায় পেঁড়োর শাখার জ্যেষ্ঠ সন্তান বলিয়া রাজ্যভ্রংশকালে তাঁহারই সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'তে পাওয়া যায়:

রাজবল্লভের কার্য্য, কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য।

এই রাজবল্লভ কে, যাঁহার চক্রান্তে ভূরস্থটরাজ্য বর্দ্ধমানরাজের করতলগত হইয়াছিল? তখনও বৈদ্যবংশাবতংস রাজা রাজবল্লভ ঢাকায় এত দূর ক্ষমতাশালী হন নাই যে, পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ কাণ্ড ঘটাইতে পারেন। ১৭৩৭ খ্রীঃ সত্যপীরের কথা রচনার অনেক পূর্ব্বে এই

ঘটনা ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। আমাদের অনুমান, নরেন্দ্র রায়ের পিতৃব্য "রাজবল্লভ রায়"ই এই চক্রান্তের নায়ক ছিলেন। জ্ঞাতি-শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতা এ স্থলেও রাজ্যনাশের কারণ হইয়া থাকিবে। ভারতচন্দ্র ও তাঁহার জীবনী-লেখকেরা সমগ্র ভূরস্থট রাজ্যই নরেন্দ্র রায়ের অধিকারে ছিল, এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতঃ পাণ্ডুয়ার গড় অধিকার ঐ সংঘর্ষের একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র। কীর্ত্তিচন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল বীর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পরাজয় এবং জনশ্রুতি অনুসারে লক্ষ্মীনারায়ণ পূর্ব্বতন কতিপয় সংঘর্ষে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া জয়ী হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের পরাজয়ের পর পেঁড়োর অংশ অধিকার সহজসাধ্য হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

রায়বংশের অন্যান্য শাখার বিবরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত। পেঁড়োর ন্যায় ভূরস্থট রাজ্যের তৃতীয় গড় "দোগাছিয়া" অপর এক কনিষ্ঠ শাখার অধিকারে ছিল। প্রবাদ অনুসারে ইহাঁরাও ৴০ দুই আনা অংশ ভোগ করিতেন। রাজা কৃষ্ণ রায়ের তৃতীয় পুত্র মুকুট রায় এই শাখার আদিপুরুষ। কুলীনের কুলভঙ্গ তৎকালে ঐশ্বর্য্যের নিদর্শনস্বরূপ ছিল। কুলগ্রন্থে কুলক্রিয়ার উল্লেখ এই শাখারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাঁরাও প্রতাপশালী ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবির অভাব থাকায় ইহাঁদের কীর্ত্তিকাহিনী জনসাধারণের জ্ঞানগোচর হওয়ার অবসর পায় নাই। এই শাখার প্রধান পুরুষগণের নাম কুলগ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

মুকুট রায়, তৎসুত রূপরায়, তৎসুতাঃ জগদ্বল্লভ-চন্দ্রশেখর-নীলকণ্ঠ-চিন্তামণিকাঃ, জগদ্বল্লভসুতৌ শিবচরণ-শ্যামচরণৌ। শিবচরণসুতৌ বীরেশ্বর-নকুড়ৌ। নকুড়সুত বলভদ্র, তৎসুতৌ ভবানীশঙ্কর-রামরামরায়ৌ। সাং দোগাছ্যা।

চন্দ্রশেখর সুত গণেশ রায় সাং পুলসিট্ট্যা।

চিন্তামণি সুত গঙ্গাধর তৎসুতা ভিকারি-নিমু-রামচন্দ্রাঃ।

জগদ্বল্লভ রায় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় প্রত্যেকের কুলক্রিয়া ছিল, আমরা বাহুল্যবোধে উল্লেখ করিলাম না।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র কয়েকটি পাঠ বিচার

ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ এম্‌. এ., বি. এল.

প্রথমেই আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, লিপিকর স্বয়ং গ্রন্থকার নহেন। তিনি একখানি পুথি হইতে নকল করিয়াছেন মাত্র। নকল করিতে গিয়া ভুল করা খুবই সম্ভব। প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণে লিপিকরের কয়েকটি ভ্রান্ত পাঠ সংশোধন করা হইয়াছে। আমি নিম্নে কয়েকটি পাঠের আলোচনা করিব, যেগুলি লিপিকরের প্রমাদ কিংবা সুযোগ্য সম্পাদকের অনবধানতা অথবা মুদ্রাকরের ত্রুটিবশতঃ দ্বিতীয় মুদ্রণেও রহিয়া গিয়াছে।

১। দুঈ পাণি লঘু মধ্য তন্নত বিশালে। পৃ. ৩ক

ইহার অর্থ অসাধ্য না হইলেও কষ্টসাধ্য বটে। কবি রূপ-বর্ণনায় কেশ হইতে পদনখ পর্য্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটা পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে কপাল ও নাসার বর্ণনার মধ্যে হস্তের বর্ণনায় ক্রমভঙ্গ হয়। প্রথম মুদ্রণের পাঠই ঠিক—

দুঈ পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে। পৃ. ৫, ১ম মুদ্রণ।

২। করকুরুবিন্দমাল নির্ম্মিত কমলে। পৃ. ৩খ

কুরুবিন্দ শব্দের অর্থ চুনি (ruby) বটে। কিন্তু এই পাঠে চরণটির অর্থ হয়—কররূপ চুনি যেন কমলে নির্ম্মিত মালা। করের সহিত মালার উপমা হাস্যজনক। অঙ্গুলির সহিত মালার উপমা প্রসিদ্ধ। এই পুস্তকেই দুই স্থানে আছে—

আঙ্গুলী চম্পক কলিকা জালে। পৃ., ৩০ক, ১০৪খ

প্রথম মুদ্রণে পাঠ ছিল—

করঙ্গরুবিন্দ মাল নির্ম্মিত কমলে। পৃ. ৬, ১ম মুদ্রণ

করঙ্গরুবিন্দ—করাঙ্গুলিবৃন্দ। আমি প্রথম মুদ্রণের পাঠ সমর্থন করি।

৩। ফুল পিন্ধিলে সে খাইবে তাম্বুল। পৃ. ৭খ

এই চরণে মূলের লিপিকর অনেক কাটাকুটি করিয়াছেন। শুদ্ধ পাঠ "খাইলে" হইবে।

৪। নৈল। পৃ. ৭খ, শেষ চরণ

লিপিতে ন ল মধ্যে গোলযোগ আছে। কয়েক স্থলে ল স্থানে ন এবং ন স্থানে ল হইয়াছে। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বিশুদ্ধ পাঠে ল হইবে—

নৈল ৭, ৮, ৭৫, ১৬১, ১৬৪।

নৈলেঁ ৭১

নৈলোঁ ৫১, ১৩১

নয়িলোঁ ১৫৯

নহেঁ (—লহে) ৩৪ খ

আন জঞ্জাল ৩৭ক (তুং আল জঞ্জাল ৪০)

নাঙ্গন (=লাঙ্গন) ৪৩

নীলাএ (=লীলাএ) ৪৭

নাগ ৬৫

নাগিল ৬৬

তিনাঞ্জলী ৮৫, ১০৪, ১৫৬, ১৮২

তিন (=তিল) ১০৪

নেহানিলোঁ ১৫৫

মৈনাক ১৭১ (তুং মইল=মৃত, বৌদ্ধ গান) টীকা দ্রষ্টব্য।

নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে ল স্থানে ন কর্ত্তব্য—

লাম্বী ১১৭

লুণী ১৭৬

লুনীর ২৯

৫। দীঠে, পীঠে। পৃ. ৩৯

শুদ্ধ পাঠ দীঠি, পীঠি হইবে। তু পিঠী, দিঠী ১৯। লিপিতে এ-কার ও ই-কার প্রায় একরূপ। দিঠি, পীঠি প্রাচীন রূপ। প্রাকৃত দিট্ঠি, পিট্ঠী।

৬। এবেঁ বুঢ় নয়নে মো না দেখোঁ সুন্দরী। পৃ. ১৩৭খ

পুথিতে "বড়" ছিল। তাহাই ঠিক। হে সুন্দরী, এখন আমি চোখে বড় দেখি না—বড় শব্দের এইরূপ প্রয়োগ এখনও প্রচলিত।

৭। মাঞেঁ নিষধিল পুতা কাহ্নে ল

না করিহ গোঠ সঘনে। পৃ. ১৪৬ক

সয়নে (=শয়নে) বিশুদ্ধ পাঠ।

৮। রাধার বচন শুণী মাহামুনী

বসিলী যোগ ধেআনে।

জাণিল কদম তলাত বসিআঁ

আছেন্ত নাগর কাহ্নে। ৬। পৃ. ১৭৫ক

পুথির পাঠে বাসলী। তাহাই ঠিক। মহামুনি নারদ বাসলীর যোগধ্যানে জানিলেন—এই অর্থ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষায় কর্ত্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অকর্ম্মক ক্রিয়ার প্রথম পুরুষের একবচনে অতীতকালে স্ত্রীপ্রত্যয় হয়। "মাহামুনী" কর্ত্তা, সুতরাং ব্যাকরণমতে "বসিলী" অসম্ভব।

৯। দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।

ঝালিআর ডাল যেন তখনে পালাইল। পৃ. ১৮৩ক

লিপিতে জল ও ডাল একরূপ। সুতরাং লিপিকরের ভ্রম সম্ভব। প্রকৃত পাঠ "জল"। লিপিকর মূলের "যেহ্ন" স্থানে "যেন" আধুনিক পাঠ দিয়াছেন। যেন কুহকীর ডাল

তখনই পলাইল—এইরূপ উপমা কষ্টসাধ্য। টীকায় ঝালিআ অর্থে কুহকী লেখা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। এখানে ঝালিআ শব্দের দুইটী অর্থ সঙ্গত—(১) ঝারি=গাছে জল দিবার সচ্ছিদ্র পাত্র (চলন্তিকা)। (২) ঝালি=জলসেচন কালে জল জমিবার গর্ত্ত (নূতন বাঙ্গালা অভিধান, আশুতোষ দেব)। তুং মিছা কথা ছেঁচা জল, কোথায় টিকেছে বল।

১০। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে লিপিকরের প্রমাদ সংশোধন কর্ত্তব্য—সবসলি ৩৭ (=সর সলি), কঢ়ী ৫২ (=কড়ি), বধিবোঁ ৫১ (=বধিলোঁ), হোত্তিত ৫৬ (=হাতে ত), ঘাটোআল ৬৬ (=ঘাটিআল), ঘাঠিআল ৬৮ (=ঘাটিআল), পস্থথ ৭৮ (=পস্থত), পএর ২৯, ৩৭, ৭৯, ১৩৩ (=পাএর), যুগেঁ যুগেঁ ৮৫ (=আগেঁ আগেঁ), খরল ১৪৬ (=গরল, খরল খায়িআঁ, খায়িআঁ শব্দের খ এর জন্য লিপিকর প্রমাদ), যশোদর পোআল ১৬০ (=যশোদার পোআ ল)।

১১। কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডাইবোঁ মো ॥
কানড়ি খোঁপা বড়ায়ি মোর দুঈ তন। পৃ. ৪১ক

দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রথম পংক্তির "কানড়ী খোঁপা" লিপিকর প্রমাদে পুনর্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় "শ্রীফল সম" এইরূপ পাঁচ-অক্ষরযুক্ত কোন পাঠ ছিল।

১২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে মুদ্রাকর-প্রমাদ সংশোধন করা কর্ত্তব্য—পতি যোগ ১৬, ২০, ৩৩ ("পতিযোগ" হইবে ; অর্থ উপযুক্ত, একটী শব্দ), সর থীর ১৯ (সব থীর), হাক ২৫ (যাক), অঙ্কেত ৩৩থ (আঙ্কেত), বাবেঁ রারেঁ ৪২ (বারেঁ বারেঁ), ছাড়ে খারে ৬০ (ছারে খারে), কিছু ৬৯ (কিছু), পুষ্ট ৯৯ (অষ্ট), তোল ১০৩ (তো ল), ফল ৯৮, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪ (ফুল), ফরিল ১০৩ (ফুরিল), বাবত ১১৯ (যাবত), হাসো ১২০ (হাস), মাওঅ ১৬৭ (মাঅ)।

১৩। তরাসিনী ১২৩, ১৭৬

খুব সম্ভবতঃ প্রকৃত পাঠ তরাসিলী। তরাসিল (পৃ. ১০৭) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ।

১৪। চিন্তির পৃ. ২ক

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষায় চিন্তির শব্দের অর্থ চিন্তা কর। তুং দিআর, আণিআর, কহিআর, ইত্যাদি। কিন্তু এই অর্থ এখানে খাটে না। খুব সম্ভবতঃ প্রকৃত পাঠ চিন্তিল। লিপিকর ল স্থানে র লিখিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপ পোঁআর ৩খ। দ্বিতীয় চরণের শেষে "জাল" আছে। সুতরাং পোআল হইলে উত্তম মিল হয়। ১০৬ খ পৃষ্ঠায় পোআলেঁ শব্দ আছে। এই পোঁআর শব্দের সংশোধনে পোআল হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রসঙ্গক্রমে টীকা সম্বন্ধে দুই একটী বিষয়ে আমার মন্তব্য এস্থানে জানাইতেছি।

ক। করতেঁ তোহ্মা করিব চীর। পৃ. ২০খ

প্রথম মুদ্রণে "করেতেঁ" ছিল। দ্বিতীয় মুদ্রণের টীকায় "করেতেঁ" আছে। কর+তেঁ=করদ্বারা নহে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' কোন স্থানে করণকারকে—এতেঁ,—তেঁ বিভক্তি নাই।

করতেঁ—করত+এঁ=করাত দ্বারা। করাত দ্বারা মাথা চিরিয়া দণ্ডদানের কথা শূন্যপুরাণে আছে (পৃ. ৯৩, বসুমতী)।

খ। কথো দূর পথে, মোঁ দেখিলোঁ। সগুণী। পৃ. ১৪৭খ

টীকার অর্থ "ব্যাধ" ঠিক নয়। সংস্কৃত শাকুনিক হইতে "সাগুণী" হইতে পারিত। মধ্য বাঙ্গালায় অর্থ শকুন। তুং

ডালে বসিঞা রক্ত পিএ শগুনি গৃধিনী। রামায়ণ (সা প) উত্তর, পৃ. ৪২

গ। কাহ্ন মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী। পৃ. ১৬৬খ

টীকার অর্থ কষ্টসাধ্য। "মতী" শব্দের অর্থ মন্ত্রী, মন্ত্রণাদাতা। তু.

মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা। বৌদ্ধ গান নং ১২

মতি মহেস রেণুক দেবি কন্ত। বিদ্যাপতি (সা. প.) পৃ. ৩৬৮

ঘ। এ রূপ যৌবন কাহ্নেরেঁ থুয়িবোঁ রাখী। পৃ. ১৭৪ক

টীকার অর্থ "রক্ষা করিয়া" ঠিক নয়। ইহার প্রকৃত অর্থ আমানত্ security। রাখীবন্ধন, রাখী পূর্ণিমা—এই দুই প্রয়োগে রাখীর এই অর্থ। পূর্ব্ব চরণে সাক্ষীর কথা বলা হইয়াছে—

চান্দ সুরুজ দুয়ি সাখী।

মুদ্রাকরের ত্রুটি বশতঃ ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭১ পৃষ্ঠার শীর্ষকে "দানখণ্ড" মুদ্রিত হইয়াছে। "নৌকাখণ্ড" মুদ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষশেষে ইঁহারা বান্ধব আছেন—

১। মহারাজ স্তর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। মহারাজাধিরাজ স্তর শ্রীবিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর, এবং ৩। কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৭ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৭	...	৬
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৪	...	১৬
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	...	৭
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮২৬	...	৮০৯
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১৪	...	১২
		৮৭০		৮৫০

(ক) আলোচ্য বর্ষে নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচন হয় নাই। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য স্তর জর্জ এ. গ্রীয়ার্সনের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৬ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন—

১। স্তর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৫। স্তর শ্রীযদুনাথ সরকার, এবং ৬। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) আজীবন-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা এবং শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করায় এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১৪ স্থলে ১৬ হইয়াছে। আজীবন-সদস্যগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৫। ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১৬। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে।

(গ) আলোচ্য বর্ষে ৫ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন পরলোকগমন করিয়াছেন এবং নিম্নোক্ত তালিকার শেষ তিন জন অধ্যাপক-সদস্য-পদে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র হইতে তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৭ হইয়াছে।—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৩। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৪। শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য, ৫। শ্রীঅমূল্যচরণ ব্যাকরণতীর্থ, ৬। শ্রীনিশিকান্ত বিদ্যারত্ন, এবং ৭। শ্রীঅবনীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮২৬ ছিল। বর্ষমধ্যে ১২ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং বহুদিন হইতে চাঁদা অনাদায় হেতু ও পদত্যাগ করায় ১৫৪ জনের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৪১ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বে সদস্য ছিলেন, কিন্তু চাঁদা দিতে অক্ষমতাবশতঃ পদত্যাগ করিয়াছিলেন, এইরূপ ৮ জন ব্যক্তি পুনরায় সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮০৯ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১৪ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। সহায়ক-সদস্য সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্ত্তনের ফলে তন্মধ্যে দশ জনের পদ বর্ষশেষে শূন্য বিবেচিত হয় এবং তাঁহাদের মধ্যে ৮ জন বর্ষমধ্যে সহায়ক-সদস্য পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই হেতু এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ১২ ছিল।

পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—স্যর জর্জ এ. গ্রীয়ার্সন।

অধ্যাপক-সদস্য—পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন।

সাধারণ-সদস্য—১। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ২। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩। রাজা প্রমথনাথ মালিয়া, ৪। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, ৫। ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, ৬। রায় সাহেব বিপিনবিহারী সেন, ৭। ভবতারণ সরকার, ৮। রাখালদাস ঘোষ মজুমদার,

৯। শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ১০। সমরেন্দ্রমোহন রক্ষিত, ১১। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। রায় বাহাদুর ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ, এবং ১৩। গুরুসদয় দত্ত।

এই সকল পরলোকগত সদস্যের মধ্যে বিশিষ্ট সদস্য স্যর জর্জ এ. গ্রীয়ার্সনের এবং অধ্যাপক-সদস্য পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এত দূর বিস্তৃত যে, সে সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ-সদস্যগণের মধ্যে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত পরিষদের ইতিহাসের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ও সহকারী সম্পাদকরূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। শেষ-জীবনে পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে থাকিলেও পরিষদের প্রতি তাঁহার মমতাবোধ ও প্রীতি যে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহার পরিচয়স্বরূপ তিনি তাঁহার বহুদিনের সঞ্চিত গ্রন্থগুলি পরিষৎকে দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ পিতার সেই অভিপ্রায় পূরণ করিয়াছেন। পরিষৎ এই অকপট ও হিতৈষী বন্ধুর সেবা ভুলিতে পারিবে না। পরলোকগত সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে রায় সাহেব বিপিনবিহারী সেন, রাজা প্রমথনাথ মালিয়া ও ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় নানা ভাবে পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমধিক সাহিত্যিক খ্যাতি ছিল এবং তিনি আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী

(ক) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—ইনি পরিষদের বাল্যাবস্থায় একজন উৎসাহী সদস্য ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন ও 'বিদ্যাপতির পদাবলী'র (পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী) সম্পাদক ছিলেন।

(খ) কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী—এক সময়ে ইনিও পরিষদের সদস্য ছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল—(ক) ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন—৭ই শ্রাবণ। সভাপতি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। লেডী অবলা বসু-প্রদত্ত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর মূর্ত্তি (in bas-relief) এবং ৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত ৺বাণীনাথ নন্দীর চিত্র প্রতিষ্ঠার পর, ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ, আয়ব্যয়-বিবরণ এবং সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। তৎপরে সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হইলে পর নির্ব্বাচিত

সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয় এবং সাধারণ ও সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন—১। ১ ভাদ্র—(ক) স্বামী বিদ্যারণ্য-লিখিত "শুদ্ধাদ্বৈতবাদ" এবং (খ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

২। ১ আশ্বিন—(ক) ডক্‌টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া-লিখিত "শিবচরণের গীতপদ" এবং (খ) শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত "প্রগল্‌ভাচার্য্য" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

৩। ২৯ অগ্রহায়ণ—(ক) শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য-লিখিত "শব্দ ও অর্থ" এবং (খ) শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত "পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

৪। ২৭ পৌষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৫। ২৩ চৈত্র—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত "মহাদেব আচার্য্যসিংহ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৬। ২১ বৈশাখ (১৩৪৮)—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য-লিখিত "সর্ব্বজ্ঞ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

(গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—১। বর্ত্তমান বর্ষে ২৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বার্ষিক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীগণপতি সরকার, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য এবং সভাপতি বক্তৃতা করেন এবং ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার তিনটি পৌত্র শ্রীমান্ অজিতকুমার রায়, শ্রীমান্ মোহময় রায় ও শ্রীমান্ অশোককুমার রায় এক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২। বর্ত্তমান বর্ষের ১৩ আষাঢ় শুক্রবার বঙ্কিমচন্দ্রের ত্র্যধিকশততম জন্মদিনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী "বঙ্কিম-বন্দনা" পাঠ করেন এবং শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 'কমলাকান্ত' হইতে "আমার দুর্গোৎসব" পাঠ করেন। সভা ভঙ্গের পুর্ব্বে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে ও শ্রীহৃদয়রঞ্জন মণ্ডল 'বন্দে মাতরম্' গান করেন।

বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ আষাঢ় রবিবার প্রাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ত্র্যধিকশততম জন্মদিন উপলক্ষে কাঁটালপাড়ার বঙ্কিম-ভবনে পরিষদের আয়োজনে উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসব-সভায় নেতৃত্ব করেন স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার। এই উৎসবের সাফল্যকল্পে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দে ও তাঁহার বন্ধুবর্গের সহায়তার কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্য-সেবী এবং পরিষদের সদস্য কাঁটালপাড়ায় তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। সভারম্ভে শ্রীদেবদাস মুখোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম্' গান করেন। শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র,

শ্রীমঞ্জুকুমার সর্ব্বাধিকারী কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি, শ্রীরেজাউল করিম, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করেন এবং শ্রীঅতুল্যচরণ দে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে ও শ্রীহৃদয়রঞ্জন মণ্ডল 'বন্দে মাতরম্' গান করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রচুর জলযোগে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। ঈ. বি. রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য গাড়ীর বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই বঙ্কিম-উৎসবের সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী পরিষদের হস্তে ১০০৲ দান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

৩। মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-পূজা—বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ আষাঢ় রবিবার প্রাতে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীমন্মথমোহন বসুর নেতৃত্বে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিক্ষেত্রে সাহিত্যসেবিগণের এক সভা হয়। খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পরিষৎ, হেমচন্দ্র পাঠশালা, ওয়াই. এম. সি. এ. বিতর্ক-সভা, বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন, বঙ্গীয় নাট্য-পরিষৎ, বাগবাজার সঙ্ঘ, দিনাজপুর সম্মিলনী প্রভৃতি সভা সমিতির সভ্যগণ ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছাত্রগণ সমবেত হন। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, মৌলভী হাতেম আলী নৌরজী ও শ্রীসন্তোষকুমার বসু বক্তৃতা করেন।

ঐ দিন অপরাহ্নে কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের সভাপতিত্বে রমেশ-ভবন হলে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। স্বরচিত একটি সুদীর্ঘ কবিতা পাঠ করিয়া সভাপতি কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং পরিষদের সদ্যপ্রকাশিত মধুসূদনের সমগ্র বাংলা গ্রন্থাবলী প্রদর্শন করেন। শ্রী জে. কে. বিশ্বাস, শ্রীবিমান বসু ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। সভাপতি কবির 'মেঘনাদবধ-কাব্য' হইতে কিছু আবৃত্তি করেন।

(ঘ) শোক-সভা—৫ মাঘ শনিবার—১। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও ২। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য বিশেষ অধিবেশন হয়। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীযোগেশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত বক্তৃতা করেন এবং শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী একটি কবিতা পাঠ করেন।

(ঙ) বিশেষ অধিবেশন—১। ৪ঠা আশ্বিন শুক্রবার ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস "আফ্রিকা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ছায়াচিত্র দ্বারা তদ্দেশের নানা দ্রষ্টব্য বিষয় প্রদর্শন করেন।

২-৪।—৪ঠা, ৫ই ও ৬ই অগ্রহায়ণ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার তিন দিন ডক্‌টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় "বাঙ্গালীর ইতিহাসের কাঠামো" বিষয়ে তিনটি 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা' করেন।

৫। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৮১তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে বর্ত্তমান বর্ষের ২৫এ বৈশাখ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা কবির 'তপোধন' ও শ্রীত্রিদিবনাথ রায় কবির 'সামান্য ক্ষতি' আবৃত্তি করেন, এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে পরিষদে তিন দিনব্যাপী একটি রবীন্দ্র-প্রদর্শনী হয়। ইহাতে কবির দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণগুলি, তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, লিখিত পত্র ও পাণ্ডুলিপি এবং অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শিত হয়।

(চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা—পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং বক্তৃতাকালে এপিডায়োস্কোপের সাহায্যে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে; কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তারা যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং ঐ শাখার আহ্বানকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই সকল বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিম্নে বক্তৃতা ও বক্তার নাম দেওয়া হইল।

১। ৩১এ শ্রাবণ, "যমজের জন্মরহস্য"—ডক্টর শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার।

২। ১৫ই ভাদ্র, "সম্ভাবনাবাদ"—ডক্টর শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।

৩। ২৬এ ভাদ্র, "উল্কা"—ডক্টর শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৪। ১১ই আশ্বিন, "মনুষ্যের শরীরতত্ত্ব, মনুষ্যদেহে রক্তসঞ্চালন এবং পরিপাকক্রিয়া"—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার ভদ্র।

৫। ২৩এ বৈশাখ ১৩৪৮, "ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য জাতির লৌহশিল্প"—শ্রীশৈলেন্দ্র-বিজয় দাসগুপ্ত।

প্রীতি-সম্মেলন ও সম্বর্দ্ধনা

১। আলোচ্য বর্ষের ১৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার আয়োজনে এক শারদীয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রথম সভাপতি আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করিয়া নবীন বৈজ্ঞানিকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এই সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া উপদেশচ্ছলে সংক্ষেপে কিছু বলেন। পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার পরিষদের সহিত আচার্য্য রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা উল্লেখপূর্ব্বক নবীন বৈজ্ঞানিকগণকে সম্বোধন করিয়া বঙ্গভাষার মধ্য দিয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও গবেষণার উপযোগিতার বিষয়ে কিছু বলেন। এই উৎসব-সভায় 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে'র গবেষকগণ জীবতত্ত্ব এবং শরীরতত্ত্ববিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন ও তাহা ব্যাখ্যা করেন। কুমারী রেবা বসু উদ্বোধন-সঙ্গীত করেন এবং শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত সেতার ও শ্রীস্বরূপ দাস

দোতারা বাদ্য দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ দান করেন। উৎসবান্তে সমবেত সকলকে জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। বিজ্ঞান-শাখার সভ্যগণ এই উৎসবের সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিজেরাই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

২। গত ৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ্ণে পরিষদের প্রাণস্বরূপ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য আশীর্ব্বচন পাঠ করেন। শ্রীকালীপদ পাঠক উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করিলে পর পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার হীরেন্দ্রবাবুকে মাল্য অর্পণ করেন। সম্পাদক কর্ত্তৃক মানপত্র পঠিত হইলে পর মহারাজা স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত গরদের জোড় হীরেন্দ্রবাবুকে উপহার দেওয়া হয়। কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া হীরেন্দ্রবাবুর বন্দনা করেন এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস স্বরচিত "কবিপ্রশস্তি" পাঠ করেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত বাণী পঠিত হইলে সভাপতি হীরেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে কিছু বলেন। হীরেন্দ্রবাবু মানপত্র ও সভাপতির উক্তির সংক্ষেপে উত্তর দিয়া বলিলেন, "যে দিন আমি শেষ শয্যা গ্রহণ করিব, সে দিন এ কথা ভাবিয়া গৌরব বোধ করিব যে, পরিষদের সেবকরূপে দীর্ঘকাল বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া আমি পরমধামে যাত্রা করিতেছি।"

সভার শেষে শ্রীকালীপদ পাঠকের টপ্পা সঙ্গীত, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবৃত্তি ও শ্রীদুর্গাপদ দাসের ম্যাজিক সকলকে বিশেষভাবে তৃপ্ত করে। সর্ব্বশেষে জলযোগে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়। এই সম্বর্দ্ধনার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যাঁহারা অর্থ দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও সম্বর্দ্ধনার বিস্তৃত বিবরণ আলোচ্য বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠা-উৎসব

আলোচ্য বর্ষে ৮ই শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টচত্বারিংশবার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে উৎসব ও প্রীতি-সম্মিলনী হয়। এই উপলক্ষে প্রাপ্ত প্রাচীন পুথি, দুষ্প্রাপ্য ও আধুনিক পুস্তক, সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি ও দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্যগুলি প্রদর্শিত হয় এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ছাত্র শ্রীসুধীরলাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবীরেশ্বর রায়, এবং শ্রীঅসিতকুমার ঘোষাল, কুমারী প্রতিমা ও কুমারী সাবিত্রী রায় চৌধুরীর গান, শ্রীনাজির আলীর সানাই বাদন, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি এবং শ্রীরাজা বসুর ম্যাজিক সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দান করে। এই প্রীতি-সম্মেলনের জন্য চাঁদা-দাতৃগণকে, বিভিন্ন দ্রব্য উপহার-দাতৃগণকে এবং গায়ক ও বাদকগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

রমেশ-ভবন

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে মন্দির-সংস্কারকার্য্যের জন্য গ্রন্থালয়ের পুস্তকাদি ও পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী রমেশ-ভবনে স্তূপীকৃত অবস্থায় রাখিতে হইয়াছিল বলিয়া চিত্রশালার দ্রব্যগুলি সাজাইবার এবং প্রদর্শনযোগ্য করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত কিছু শো-কেস ও অন্যান্য আধার সংগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্য যথাযথ প্রদর্শনযোগ্য করা সম্ভব হইবে না। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে—

(ক) দুইটি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রদত্ত এবং শ্রীবিজয়কুমার দত্তগুপ্ত-প্রদত্ত শিবসিংহের রৌপ্য মুদ্রা। (খ) শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু-প্রদত্ত ৺জলধর সেনের ডায়েরি ও পত্র, (গ) শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী-প্রদত্ত প্রসন্নময়ী দেবীর ডায়েরি ও ব্যবহৃত ব্যাগ এবং প্রিয়ম্বদা দেবীর হস্তাক্ষর, (ঘ) শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী-প্রদত্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মপত্রিকা ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, (ঙ) শ্রীপুলিনবিহারী সেন-প্রদত্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের, কিশোরীচাঁদ মিত্রের, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও দীনেশচন্দ্র সেনের পত্র।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—

সভাপতি—স্তর শ্রীযদুনাথ সরকার; সহকারী সভাপতি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীমন্মথমোহন বসু, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী; সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, এবং শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীসজনীকান্ত দাস; চিত্রশালাধ্যক্ষ—গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের প্রাচীন কর্ম্মচারী শশীন্দ্রসেবক নন্দীর মৃত্যু হইয়াছে। পুস্তকালয়ের পুস্তক-তালিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার জন্য দুই জন অস্থায়ী কর্ম্মচারী ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজনকে (শ্রীঅমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্যকে) অস্থায়ী ভাবে উক্ত পুস্তকালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে ৺শশীন্দ্র-বাবুর স্থলে লেখক নিযুক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থাবলী অপহরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে সন্দেহক্রমে প্রাচীন দ্বারবান পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হওয়ায় তাহার স্থলে একজন এবং রমেশ-ভবনের জন্য একজন দ্বারবান নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন—

(ক) মূল-পরিষদ্ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—১। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ২। শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ৩। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৪। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫। ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, ৬। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ৭। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। রেভারেণ্ড শ্রী এ. দোঁতেন, ১০। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১১। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১২। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৩। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৫। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৬। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৭। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ১৮। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পরলোকগমন করায়) শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, ১৯। শ্রীশান্তি পাল, ২০। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—১। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ৩। শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, ৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ৫। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, ৬। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১২টি অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা চারি বার সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১) কমলা লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীত্রিদিবনাথ রায়কে, (২) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তকে, (৩) জগত্তারিণী পদক সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাসকে, (৪) ভুবনমোহিনী দাসী পদক-সমিতিতে শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে ও (৫) সরোজিনী বসু পদক-সমিতিতে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তীকে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হয়।

(খ) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-তহবিলের সর্ত্ত অনুসারে "নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস" বিষয়ে রচনার জন্য শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তকে 'রামপ্রাণ গুপ্ত পদক' দেওয়া হইবে। তিনি উক্ত তহবিলের সর্ত্তানুসারে "ইতিহাস ও ঐতিহ্য" বিষয়ে পরিষদে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

(গ) ১৯৪০।২৭এ হইতে ২৯এ ডিসেম্বর ধারওয়ারে অনুষ্ঠিত বিদ্যাবর্দ্ধক সঙ্ঘের সুবর্ণ জুবিলি ও কন্নড় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদানের জন্য পরিষদের সদস্য শ্রীনারায়ণস্বামী আয়ারকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়।

(ঘ) কতকগুলি পরিষদ্‌গ্রন্থ অপহৃত হওয়ায় তাহার অনুসন্ধানের ভার কলিকাতা পুলিসের উপর অর্পণ করা হয়।

(ঙ) যে সকল পরিষদ্‌গ্রন্থ বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা নাই বা যেগুলি কীটদষ্ট ও অব্যবহার্য্য হইয়াছে, সেগুলি ওজন-দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে দান করা হয়।

(চ) নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪। বিজ্ঞান-শাখা, ৫। আয়ব্যয়-সমিতি, ৬। পুস্তকালয়-সমিতি, ৭। চিত্রশালা-সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র নির্ব্বাচন সমিতি, ১০। কাঁটালপাড়া বঙ্কিমভবনে স্থানদান সমিতি, ১১। রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার নির্ব্বাচন-সমিতি, ১২। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি, ১৩। পুস্তক-অনুসন্ধান-সমিতি, ১৪। বঙ্কিম-জন্মোৎসব-সমিতি, ১৫। হীরেন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা-সমিতি।

(ছ) Indian Historical Records Commission-এর নূতন নিয়ম গঠন সম্বন্ধে পরিষদের মন্তব্য দিবার জন্য যে প্রস্তাব আসিয়াছিল, তদ্বিষয়ে পরিষদের মন্তব্য জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

(জ) বেঙ্গল লেজিস্লেটিব এসেমব্লি হইতে কতকগুলি বিল সম্বন্ধে পরিষদের মন্তব্য চাওয়া হইয়াছে। এগুলি এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

(ঝ) পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবন স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত—এই মর্ম্মে উক্ত দুই ভবনে দুইখানি প্রস্তর-ফলক দেওয়া হইবে। এই দুইটি ফলক প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যয়ভার মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে যে সকল পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্য হইতে ৬৫ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ক্রীত পুথির মধ্য হইতেও ১১ খানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। সাকল্যে এই ৭৬ খানি পুথির মধ্যে বাঙ্গালা ২১ এবং সংস্কৃত পুথি ৫৫ খানি।

যে সকল হিতৈষী ব্যক্তি উপরোক্ত পুথিগুলি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা এই,—৺নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত (২০ খানি), ডাঃ এস. গুপ্তের মাতা (১৩ খানি), শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী (১১ খানি), ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (১১ খানি), শ্রীভবেন্দ্রচন্দ্র রায় (৪ খানি), শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য (৩ খানি), শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায় (১ খানি), শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য (১ খানি), শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু (১ খানি)। উপহারপ্রাপ্ত ৬৫ এবং ক্রীত ১১, সর্ব্বসমেত ৭৬ খানি পুথি তালিকাভুক্ত করিয়া বর্ষশেষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে—

বাঙ্গালা পুথি	—৩২২৭	অসমীয়া পুথি	—৩
সংস্কৃত "	—২৩২৩	ওড়িয়া "	—৪
তিব্বতী "	— ২৪৪	হিন্দী "	—২
ফার্সী "	— ১৩		———
			৫৮১৬

আলোচ্য বর্ষে ৩০৩ খানি পুথিতে পাটা এবং ১৫২ খানি পুথিতে পাটা ও খেরো লাগান হইয়াছে। শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পুথি-দাতৃগণকে ও সংগ্রাহকগণকে পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও অনেকে পরিষদে আসিয়া পরিষদের নানা পুথি আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের শেষ দিক্ হইতে এই সমস্ত আলোচিত পুথির হিসাব রাখা হইতেছে। এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, পাঁচ মাসে ৮৪ খানি পুথি পরিষদে বসিয়া আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দুইখানি পুথি বাহিরে ধার দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা পরিষদের পুথি আলোচনা করিয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। হরিদাস তর্কাচার্য্য-কৃত শ্রাদ্ধবিবেকটীকা, কামদেব ঘোষকৃত ভট্টিটীকা ও মহাদেব আচার্য্যসিংহ দেবরচিত মালতী-মাধবটীকার যে পুথি পরিষদে আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকায় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থাগার

গত বৎসর পরিষদ্ মন্দিরের সংস্কারকালে গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া ছিল এবং সাময়িক পত্রিকাগুলিও স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রের ঘরের র‍্যাক সম্পূর্ণ হওয়ায় সাময়িক পত্রিকাগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। বহু নূতন সাময়িক পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছে ও ক্রীত হইয়াছে, সেই জন্য সাময়িক পত্রিকার জন্য যে নূতন র‍্যাক তৈয়ার হইয়াছে, তাহাতেও স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি তালিকাভুক্ত হইলেও স্থানাভাবে দ্বিতলের হলের মেঝেতে পড়িয়া ছিল। আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের নিম্নতলের হলের উত্তর-পশ্চিম দিকে (যেখানে পূর্ব্বে সিঁড়ি ছিল) নূতন আলমারী তৈয়ার হওয়ায় কিছু পুস্তক সাজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এখনও র‍্যাক অথবা আলমারীর অভাবে বহু বাংলা পুস্তক, সমস্ত ইংরেজী পুস্তক ও ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা সাজাইয়া তালিকাভুক্ত করিতে পারা যাইতেছে না। এ বিষয়ে পরিষদের হিতকামী সদস্য ও অনুরক্ত ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা যেন এ বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিতে মুক্তহস্ত হন। কারণ, যে অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহা কেবল অর্থাভাবে তালিকাভুক্ত করিতে না পারায় সাধারণের গোচরীভূত করিতে পারা যাইতেছে না।

স্থানাভাবে কিছু অপ্রয়োজনীয় পুস্তক ও পত্রিকা ফেলিয়া দিয়া নূতন করিয়া বাংলা পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন করা হইতেছে। মোট ১৩২২৫ খানি বাংলা পুস্তক তালিকাভুক্ত

হইয়াছে। পুস্তকগুলির নামের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকাও প্রস্তুত হইয়াছে; আলোচ্য বর্ষে উহার অ হইতে ন পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত, শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং শ্রীহরিহর মল্লিকের পুস্তক দান উল্লেখযোগ্য। (১) শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত তাঁহার পিতা পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পূর্ব্বে যে "রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থ-সংগ্রহ" পরিষৎকে দান করিয়াছিলেন, তাহাতে পুনরায় ৩৪১ খানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। (২) শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ পিতার শেষ ইচ্ছানুযায়ী ৭টি আলমারী সমেত প্রায় ১৮০০ পুস্তক ও পত্রিকা দান করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রদিগের ইচ্ছানুযায়ী পুস্তকগুলি "নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত পুস্তক-সংগ্রহ" ছাপযুক্ত হইয়া তালিকাভুক্ত হইলে সাধারণকে পাঠের জন্য দেওয়া হইবে। আলমারীগুলির অবস্থা জীর্ণ হওয়ায় প্রদাতৃগণ সেগুলি ফেরত লইয়া গিয়াছেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে নূতন আলমারী দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। (৩) শ্রীহরিহর মল্লিক মহাশয়ও ১৯৪ খানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু প্রতিষ্ঠান ও হিতৈষী বন্ধু এবং সদস্যের নিকট হইতে পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রদাতা: Keeper, Imperial Records—Bengal in 1756, Vols. I—III; Old Fort William in Bengal, Vols. I—II; Diaries of Streynsham Master, Vols. I—II; শ্রীসজনীকান্ত দাস—Johnson's Dictionary, Vol. II by J. Mendies, 1828; শ্রীশিবনাথ চক্রবর্ত্তী—Government Gazette, 1862; শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—Report of the Calcutta School Book Society, 1818 (1st year); Calcutta School Society Manuscript Proceedings (1818—1832); উড়িষ্যাপ্রবাসী শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—পাল বার্জ্জিনিয়া, ১৮৫৯, ২য় সং; বৃত্রসংহার কাব্য, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ১২৮৬; ঐ ২য় খণ্ড, ১ম সং, ১২৮৪; সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক, ২য় সং, ১২৮৭; সুলভ পত্রিকা, ১২৬০, ১ম খণ্ড (১ম—৯ম সংখ্যা), শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত—The Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East India Company, 1812; Do, First Report, 1808; Considerations on India Affairs by W. Bolt, 1772; Historical Account of Discoveries and Travels in Asia by W. Murray, Vols. I—III, 1820; History of Hindostan by A. Dow, Vols. I & II, 1770; Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India, Vols. I—III by H. Hebers, 1828; Selections from Several Books of the Vaidanta by Rajah Rammohun Roy, 1844; শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ও ভ্রাতৃগণ—জীবন-চরিত, ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা-কৃত, ১৮৪৯; বীরবাহু কাব্য, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত, ১২৭১; অন্নদামঙ্গল, ২য় খণ্ড, কৃষ্ণনগর সং, ১৭৬৯ শক; নীতিবোধক ইতিহাস by Rev. W. Adams & N.

Edgeworth, ১৮৪৯ ; সংগীত মাধুরী, রাম চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি প্রণীত, ১২৬৮ ; পাঁচালী, ২য় খণ্ড, দাশরথি রায়-কৃত, ১২৬৯ ; Grammar of the Bengalee Language by A Native, 1850।

ক্রীত সাময়িক পত্র ও পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি দুষ্প্রাপ্য—

দিগ্‌দর্শন or A Magazine for Indian Youth, No. 1 of 1818 to No. 16 of 1820 ; কল্পলতা ও প্রকৃতি, ১২৮৯ ; সুবোধিনী, ২য় বর্ষ, ১২৯৮ ; ধর্ম্মসাধন (সাপ্তাহিক) ১ম সংখ্যা হইতে ৩য় ভাগ ; বামারচনাবলী, ১২৭৮ ; কবিতাবলী, ১ম সং, ১২৭৭, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ; জ্ঞানাঞ্জন, গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য-কৃত ১৮৩৮ ; রঙ্গমতী, ২য় সং ; চন্দ্রশেখর, ১ম সং ; গীতা—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত, ১৮৩৩ ; পদ্মাবতী নাটক, ১২৮৩ ; বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, সংবৎ ১৯২৯ ; এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা, শক ১৮০০ ; রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, ১ম ভাগ, শক ১৭৯৩ ; রজতগিরি, ১৩১০ ; বিদ্ধশালভঞ্জিকা, বঙ্গাব্দ ১৩১০।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রন্থাগারে পুস্তক বা পত্রিকা উপহার দিয়াছেন।—

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publications, Delhi, ৫। Kern Institute, Holland, ৬। Bengal Library, ৭। Imperial Library, ৮। Government Printing, Bengal, ৯। Curator, Dacca Museum, ১০। Central Publicity Office, E. I. Ry-, ১১। Madras Government Oriental Manuscripts Library, ১২। Government Museum, Madras, ১৩। Curator, Prince of Wales Museum, Bombay, ১৪। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ১৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৬। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৭। বিশ্বভারতী।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্‌গ্রন্থাগার হইতে জামসেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের প্রদর্শনীতে ও রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে বালী সাধারণ পাঠাগারে পুস্তক ও পত্রিকা প্রভৃতি প্রেরিত হইয়াছিল এবং কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮১তম জন্মদিন উপলক্ষে পরিষদের রমেশ-ভবনের দ্বিতলে যে তিন দিন প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে কবির নানা সময়ে লিখিত বিভিন্ন সংস্করণের পুস্তক প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পুস্তক-ক্রয়ের জন্য ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য পরিষৎ করপোরেশনের নিকট কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় নিম্নোক্ত পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে—

১। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৩। রামরাম বসু, ৪। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, এবং ৫। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।

প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য চারি আনা মাত্র। এই সমস্ত গ্রন্থের লেখক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩য় ও ৪র্থ গ্রন্থ দুইখানি কলিকাতা 'সুবর্ণবণিক্ সমাজে'র সম্মতি অনুসারে পরিষদের অক্ষয়কুমার স্মৃতি-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত হইয়াছে। তজ্জন্য এই সমাজের ও ইহার সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ।

ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে আলোচ্য বর্ষে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদকতায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে—

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত—১। দেবী চৌধুরাণী, ২। বিষবৃক্ষ, ৩। ইন্দিরা, ৪। যুগলাঙ্গুরীয়, ৫। চন্দ্রশেখর, ৬। রাধারাণী, ৭। রজনী, ৮। রাজসিংহ, ৯। Essays and Letters, ১০। কৃষ্ণচরিত্র, ১১। ধর্ম্মতত্ত্ব, এবং ১২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(খ) মধুসূদন দত্তের সমগ্র বাংলা রচনা। মধুসূদন-গ্রন্থাবলীর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—১। কাব্য—তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী এবং বিবিধ কাব্য। ২। নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচনা—শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা?, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, পদ্মাবতী নাটক, কৃষ্ণকুমারী নাটক, মায়াকানন ও হেক্‌টর বধ। এই সকল গ্রন্থ দুই খণ্ডে বাঁধানো এবং পৃথক্ পৃথক্ কাগজের মলাটেও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের রাজ-সংস্করণ ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছে। মধুসূদন-গ্রন্থাবলীর যেরূপ চাহিদা দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইবে।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা ঝাড়গ্রাম তহবিল হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর পরিদর্শক হিসাবে এগুলির বিক্রয় ও প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদার্হ। ঝাড়গ্রামরাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বি. আর. সেন মহাশয় এই তহবিলের গ্রন্থপ্রকাশ-কার্য্যে পরিষৎকে বিশেষরূপ সহায়তা করিয়া থাকেন। পরিষৎ তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এতদ্ব্যতীত স্থির হইয়াছে যে, (ক) ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের সম্পাদকতায় 'বৌদ্ধ গান ও দোহা', এবং (খ) শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে প্রকাশ করা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে (ক) 'বাংলা পুথির তালিকা' মুদ্রণের কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থের সম্পাদক এবং (খ) শ্রীসুধাকান্ত দে-লিখিত রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞানের মুদ্রণকার্য্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই, (গ) 'বঙ্কিম-জীবনীর খসড়া' বর্ত্তমান বর্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

পরিশিষ্টে বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত গ্রন্থাবলীর ও গ্রন্থাবলীর আবাঁধা ফর্ম্মাগুলির হিসাব প্রদত্ত হইল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সপ্তচত্বারিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধ ও লেখকগণের নাম প্রদত্ত হইল—

(ক) **প্রাচীন সাহিত্য**—১। দেলপূজার ছড়া—শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ২। শিবচরণের গীতপদ—ডক্‌টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া।

(খ) **ইতিহাস**—১। কদলী রাজ্য—শ্রীরাজমোহন নাথ, ২। কাশ্মীরি জাতি কি আদিতঃ ইহুদি?—শ্রীবিমলাচরণ দেব, ৩। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ৪। পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫। প্রগল্‌ভাচার্য্য—শ্রীদীনেশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৬। প্রাচীন বাঙ্‌লার ধন-সম্পদ্—ডক্‌টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৭। প্রাচীন বাঙ্‌লার শ্রেণীবিভাগ—ডক্‌টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৮। প্রাচীন ভারতে ইতিহাসচর্চ্চা—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, ৯-১১। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ—শ্রীসজনীকান্ত দাস, ১২। 'বাংলা সাময়িক-পত্র'—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩। বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ১৪। ভোট-বীর কেসর্-এর কথা—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৫। মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, ১৬। মহাদেব আচার্য্যসিংহ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৭। রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, ১৮। সেকালের সংস্কৃত কলেজ (২-৫)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯। হরিদাস তর্কাচার্য্য—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(গ) **দর্শন**—১। শব্দ ও অর্থ—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য, ২। শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—শ্রীবিদ্যারণ্য স্বামী।

(ঘ) **বিজ্ঞান**—তৈল নিষ্কাষণের আরও কয়েকটি উপায়—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ বঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এই দানের জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ্‌ মন্দির ও রমেশ-ভবনের টেক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ ঋণী।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে, একজন সাহিত্যিকের পুত্রবধূকে এবং একজন গ্রন্থকর্ত্রীকে প্রতি মাসে নিয়মিত সাহায্য দান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একজন সাহিত্যিকের দৌহিত্রীকে এবং একজন বৈষ্ণব সাহিত্যিককে এককালে কিছু সাহায্য করা হইয়াছে। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থদ্বারা স্থাপিত 'দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে'র টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-শাখার ২টি, ইতিহাস-শাখার ১টি, দর্শন-শাখার ৩টি, বিজ্ঞান-শাখার ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য এবং ডক্‌টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য যথাক্রমে ঐ সকল শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী-প্রদত্ত প্রিয়ম্বদা দেবীর এবং ৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত বাণীনাথ নন্দীর চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের কর্ত্তৃপক্ষ রায় জলধর সেন বাহাদুরের তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। উহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। চিত্রপ্রদাতৃগণের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিষদ্ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের নিম্নতলের হলের উত্তর-পশ্চিম কোণে র‍্যাক প্রস্তুত হইয়াছে। এই র‍্যাকে পুস্তকালয়ের গ্রন্থাদি সংরক্ষিত হইয়াছে। পরিষদের যে সকল আসবাব-পত্র আছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

বঙ্কিম-ভবন

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবন সংস্কারের পর প্রতিষ্ঠা-সভায় ঐ ভবন সংরক্ষণের জন্য বঙ্গদেশ-বাসীর নিকট আবেদন জ্ঞাপন করা হয়। তাহার ফলে আলোচ্য বর্ষে কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। এই তহবিলের অর্থ হইতে ৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ করা হইয়াছে। নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটি আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিম-ভবনের ট্যাক্স আংশিকভাবে রেহাই দিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির নিকট কৃতজ্ঞ। সহকারী সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিম-ভবন সংরক্ষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন; তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ই আষাঢ় বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য সদস্য ও সদস্যেতর হিতৈষিগণের

নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।—

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)
২। ঐ ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)
৩। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান
৪। সাধারণ তহবিলে দান
৫। হীরেন্দ্র-সংবর্দ্ধনায় দান
৬। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান
৭। বিজ্ঞান-শাখার শারদীয় সম্মিলনে দান
৮। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংরক্ষণের জন্য দান
৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে সিরাপ ও এসেন্স, পুথিশালা ও গ্রন্থাগারের জন্য বহু ন্যাপথলিন, এবং কার্য্যালয়ের জন্য তিনটি ফায়ার-কিং দান করিয়াছেন। বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং, দাস এণ্ড কোং, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ ও শ্রী এইচ. এন. মুখার্জি বহু দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্য প্রতিষ্ঠা-দিবসে দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, চট্টগ্রাম, কাশী ও ভাগলপুর-শাখায় নানারূপ অধিবেশনাদি হইয়াছিল। সকল শাখার বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এ পর্য্যন্ত হস্তগত হয় নাই বলিয়া এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইল না।

আয়-ব্যয়

পরিষদের যে আয়-ব্যয়-বিবরণ ও উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-সীট) সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে পরিষদের আর্থিক অবস্থা ও সম্পত্তির পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তহবিলগুলির পৃথক্ পৃথক্ হিসাব খোলা হইয়াছে, তাহাতে হিসাব রক্ষার কার্য্য বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়ে সহকারী সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, এবং সংবৎসরের হিসাবপরিদর্শন-কার্য্যে সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

পদক ও পুরস্কার

(ক) আলোচ্য বর্ষের ৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার বিশেষ অধিবেশনে ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়কে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল হইতে "বাঙ্গালীর ইতিহাসের কাঠামো" বিষয়ে তিনটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবার জন্য "অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুরস্কার" দেওয়া হয়। পুরস্কারের অর্থ (১৫০৲) নীহারবাবু পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়াছেন।

(খ) গত ২৯এ অগ্রহায়ণ রবিবার পরিষদের মাসিক অধিবেশনে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পুরস্কারস্বরূপ "নারায়ণচন্দ্র মৈত্র পদক" প্রদান করা হয়।

উপসংহার

গত বৎসরে পরিষদের বিভিন্ন বিভাগে যে সকল কার্য্য আরব্ধ ও সমাপ্ত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার বিবৃতি দিলাম। পরিষদের যে সকল শুভাকাঙ্ক্ষী হিতৈষী বন্ধু আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য দিয়া কার্য্যপরিচালনে আমাদের সহায়তা করিয়াছেন, এই সুযোগে তাঁহাদিগকেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সহযোগী কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাষায় লিখিবার নহে। তাঁহাদের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে পরিষদের এরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হইত না। পরিষৎ বর্ত্তমানে নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস, অনুরূপ সহযোগিতা ও সহানুভূতি পাইলে অদূর ভবিষ্যতে ইহার আরও উন্নতি সম্ভব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাবের সহিত এই বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, অর্থের অপ্রতুলতা অনেকটা দূর হইয়াছে এবং বর্ষশেষে ঘাটতি ফিরিস্তি দিয়া আমাদিগকে লজ্জা পাইতে হইতেছে না। পরিষদের শুভাশুভ সম্বন্ধে বাংলা দেশের জনসাধারণ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী আগ্রহশীল হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া

যাইতেছে; তবে এখনও পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এমন আশানুরূপ হয় নাই, যাহাতে চাঁদার টাকাতেই পরিষদের সকল বিভাগের কাজ সুষ্ঠুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং আমাদিগকে বরাবরের মত পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয়। এই জন্য সকল সদস্যের নিকট আমাদের আন্তরিক নিবেদন, তাঁহারা যেন নিয়মিত-চাঁদাদানকারী সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখেন।

আলোচ্য বর্ষে আমাদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড প্রকাশ, সম্পূর্ণ বাংলা মধুসূদন-গ্রন্থাবলী প্রকাশ ও সাহিত্যসাধক-চরিতমালার উল্লেখ করিতে পারি। পাঠাগার-বিভাগে এতকাল আমরা একটি সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকার অভাবে নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছিলাম। আলোচ্য বর্ষে উক্ত তালিকা প্রকাশের কার্য্য আরম্ভ হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, মাসেক কালের মধ্যে এই তালিকা এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। আর দুইটি বিষয়ের উল্লেখে পরিষদের শুভানুধ্যায়িগণ আনন্দিত হইবেন। এতকাল অর্থাভাবে আমরা কর্ম্মচারিগণের বেতন নিয়মিত দিতে পারি নাই। আলোচ্য বর্ষে আমরা দুইজন আজীবন-সদস্যের প্রদত্ত চাঁদার সহায়তায় একটি সাধারণ গচ্ছিত তহবিলের সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর কর্ম্মচারীদের বেতনের অভাব হইলে উক্ত তহবিল হইতে কর্জ্জ করিয়া যথাসময়ে তাঁহাদিগকে বেতন দিতে পারিব। আমরা এই বৎসরে সমস্ত গচ্ছিত তহবিলের হিসাব স্বতন্ত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া বরাবরের অনুযোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি।

বিশেষ দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদের সহকর্ম্মিগণের মধ্যে দুই জনের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিষৎ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। পূর্ব্বে আমরা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই বিবৃতি লিখিবার কালেই আমাদের অন্যতম সহকর্ম্মী চিত্রশালাধ্যক্ষ গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টায় পরিষৎ-সংগৃহীত চিত্রগুলি সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত হইয়াছে। পরিষৎ মন্দিরের বর্ত্তমান সুদৃশ্য রূপসজ্জা তাঁহার শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কলিকাতা বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১০ শ্রাবণ	কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক

পরিশিষ্ট

(ক) শাখা-সমিতির সভ্য-তালিকা

সাহিত্য-শাখা

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত (সভাপতি), শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা (আহ্বানকারী)।

ইতিহাস-শাখা

পরিষদের সভাপতি (সভাপতি), শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী, সম্পাদক, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত (আহ্বানকারী)।

দর্শন-শাখা

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য (সভাপতি), শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র, শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, রেভাঃ শ্রী এ. দোঁতেন, শ্রীমন্মথমোহন বসু, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু (আহ্বানকারী)।

বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী (সভাপতি), শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীআশুতোষ গুহ ঠাকুরতা, শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ পালিত, শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবনবিহারী ঘোষ, শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার, শ্রীনলিনবন্ধু দাস, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (আহ্বানকারী)।

আয়-ব্যয়-সমিতি

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমণী-কান্ত বসু, শ্রীতিনকড়ি বসু, শ্রীকানাইলাল মিত্র, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ (আহ্বানকারী)।

ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীরামশঙ্কর দত্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

চিত্রশালা-সমিতি

গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশি, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীসজনীকান্ত দাস (আহ্বানকারী)।

পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীশান্তি পাল, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা (আহ্বানকারী)।

(খ) বর্ষশেষে মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর হিসাব

অনাদিমঙ্গল	৫০	চণ্ডীদাস-পদাবলী	৭৮
ইতিকথা	৫০	দুর্গামঙ্গল	১৪
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস	৫৮	ধর্ম্মপুরাণ (ময়ূরভট্টের)	১০০
ঋতুসংহারম্	১০	ধর্ম্মপূজাবিধান	১০০
কণারকের বিবরণ	৩৯	নবীন ও প্রাচীন	১০০
কবি হেমচন্দ্র	১৫০	নব্য রসায়নী বিদ্যা	২৭
কালিকামঙ্গল	১০০	নেপালে বাংলা নাটক	৩০
কৌলমার্গ-রহস্য	১০০	পুষ্পবাণবিলাসম্	৮০
উদ্ভিদ জ্ঞান, ১ম	৫১	বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়	৫৯
" ২য়	৫১	বৃন্দাবন কথা	১৫
গঙ্গামঙ্গল	৪০	ভারত ললনা	৪১
গোরক্ষবিজয়	৪৪	বাঙ্গালা ভাষা, ২য় ভাগ ৩য় খণ্ড	৮
গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	৭৭	" " ৪র্থ খণ্ড	৮৫
গ্রহগণিত	৫০	মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা	৫০
গৌরপদতরঙ্গিণী	২২৭	মনোবিজ্ঞান	

মন্দিরা	৫০
মহাভারত (আদি)	৬৯
মাথুর কথা	১৬০
মৃগলুব্ধ	৩০
মৃগলুব্ধ-সংবাদ	৩০
রসকদম্ব	৪৯
সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম, ১ম	১২
” ২য়	১২
” ৩য়	১২
লেখমালানুক্রমণী	১০১
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	২৬
	৭০
	৪৯
সংকীর্ত্তনামৃত	৫০
সর্ব্বসম্বাদিনী	৪৮
সারদামঙ্গল	৫০
সৌন্দর্য্যতত্ত্ব	৪০
আনন্দমঠ	৭৭৭
ইন্দিরা	১৮৬
কপালকুণ্ডলা	৭৪৬
কমলাকান্ত	৭৬৬
কৃষ্ণকান্তের উইল	৮১
গদ্যপদ্য বা কবিতা-পুস্তক	৩৪২
চন্দ্রশেখর	২০২
দুর্গেশনন্দিনী	৭৬৪
দেবী চৌধুরাণী	১১১
বিজ্ঞান-রহস্য	৭৯৩
বিবিধ প্রবন্ধ	৮২৫
বিষবৃক্ষ	১৯৫
মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত	৩০০
মৃণালিনী	৮১৬
যুগলাঙ্গুরীয়	১৮৭
রাজসিংহ	১৬০
রাধারাণী	১২৪
লোকরহস্য	৩২৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৫৯
সাম্য	৭৮৯
সীতারাম	১১২
রজনী	১৫৪
আলালের ঘরের দুলাল	৩০২
কালীপ্রসন্ন সিংহ	২৫১
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	৩৪৯
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য	২৮০
চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী	১৪৯
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	১২৭
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস	৫১
ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড	২৫২
” ২য় ”	৭৩
” ৩য় ”	৭৯
” ৪র্থ ”	৭২
” ৫ম ”	৭৬
পদকল্পতরু, ২য় ভাগ	১৮৪
” ৩য় ”	১৪৮
” ৪র্থ ”	১৮০
” ৫ম ”	২২৬
পরিষৎ-পরিচয়	২২০
প্যারীচাঁদ মিত্র	৫৩
বিবিধ—কাব্য	১৪৩
বীরাঙ্গনা কাব্য	১৮৬
ব্রজাঙ্গনা কাব্য	১২৪
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৪
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	২০৬
রামনারায়ণ তর্করত্ন	২১৮
রামরাম বসু	২৫০
শ্রীভাষ্য, ৩য় খণ্ড	২০
” ৪র্থ ”	২০
” ৫ম ”	৩০

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা, ৩য় খণ্ড	৫০
" " ৪র্থ	৫০
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড	৩০৪
" " ২য়	৫২
" " ৩য়	১৬২
মেঘনাদবধ কাব্য	১৮৮
একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ	১৪৪
পদ্মাবতী নাটক	১৪৫
হেক্টর-বধ	১৪২
হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা ১ম (কাগজে)	৮৬
" " কাপড়ে	২২
" ২য় "	৭০
Catalogue of Sans. Mss.	১১৮
Museum Catalogue	৫০
Rabindranath	৪১
Des. List of Sculptures & Coins	৫৫
Rajmohan's Wife	১৮৬
Essays and Letters	১৯১

Letters on Hinduism	১৮৭
মধুসূদন গ্রন্থাবলী (রাজ সং) ১ম, কাব্য	১৩
" সাধারণ সং	৪৯
বঙ্কিম-গ্রন্থ, বিশিষ্ট ১ম	৮৩
" " ২য়	১১২
" " ৩য়	১১৩
" " ৪র্থ	১৫
" " ৫ম, Eng.	২২
" " ৬ষ্ঠ	২৫
" " ৭ম	৩৩
রাজ সং ১ম	৭
" " ২য়	৩
" " ৩য়	৩
" " ৪র্থ	৫
" " ৫ম, Eng.	৬
" " ৬ষ্ঠ	৬
" " ৭ম	৮
জ্ঞানসাগর	৩৮
তীর্থমঙ্গল	৯০

(গ) বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ফর্ম্মার হিসাব

গ্রন্থের নাম	রাজ সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ	গ্রন্থের নাম	রাজ সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ
কপালকুণ্ডলা	১৪৫	৭৮৬	গদ্যপদ্য	৫০	৩০০
সাম্য	১৫০	৮০০	মুচিরাম গুড়	৫০	৩০০
বিজ্ঞান-রহস্য	১৫০	৭৯৮	দেবী চৌধুরাণী	৫০	৪০০
আনন্দমঠ	১৫০	৯০০	সীতারাম	৫০	৬৫০
দুর্গেশনন্দিনী	১৪০	৭৯৫	কৃষ্ণকান্তের উইল	৪৭	৬৪৯
কমলাকান্ত	১৫০	৭৯৯	Rajmohan's Wife	১৪৯	৬০০
মৃণালিনী	১৪৮	৮০০	Letters on Hinduism	৪৯	৬০০
বিবিধ প্রবন্ধ	১৫০	৭৯৯	রজনী	৪৯	৬০০
লোকরহস্য	৫০	৩০০			

গ্রন্থের নাম	রাজ সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ	গ্রন্থের নাম	রাজ সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ
রাধারাণী	৪৯	৬০০	বিষবৃক্ষ	৫০	৬০০
রাজসিংহ	৪৯	৫৯৭	চন্দ্রশেখর	৫০	৬০০
Essays & Letters	৪৯	৬০০	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১০০	৭০০
ইন্দিরা	৫০	৬০০	বঙ্গীয় নাটশালার ইতিহাস	—	৩৬৬
যুগলাঙ্গুরীয়	৫০	৬০০			

(ঘ) বর্ষশেষে আসবাব-পত্রাদির হিসাব

টেবিল	২৬	কাউণ্টার	২
চেয়ার	৩৯	ক্যাম্প চেয়ার	১
বেঞ্চ	৫৬	বাক্স	১৬
আলমারি—গ্লাসকেস	১০৪	মুদ্রাধার	২
কাঠের আলমারী	৯	ইজেল	২
সিলিং আলমারী	১	বক্তৃতা-মঞ্চ	১
শো-কেস	৭	Letter Printing Machine	১
র‍্যাক	৩৬	মূর্ত্তির পাদপীঠ	২৬
হোয়াটনট	১	ফায়ার কিং	৩
ষ্ট্যাণ্ড	৬	ঘড়ি	২
টুল	১০	সিলিং ফ্যান	১৬
সিঁড়ি	১০	টেবিল ফ্যান	৩
লোহার সিন্দুক	২		
ব্ল্যাক-বোর্ড	৩		৩৮৫

(ঙ) বিশেষ দান

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য—১২ ৲

২। ঐ (পরিষৎ-পত্রিকার মূল্য বাবদ) ২৩৷৷০

৩। কলিকাতা করপোরেশনের বাষিক দান ৬৫০৲

৪। সাধারণ তহবিলে দান ১৭৬৷০

৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ১।০ শ্রীনীহাররঞ্জন রায় ১৫০৲

শ্রীসজনীকান্ত দাস ২৫৲

৫। হীরেন্দ্র-সংবর্দ্ধনার দান ২০১৲

(দাতৃগণের নাম গত বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে)

৬। অষ্টচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে দান ৭৯৲

অনাথবন্ধু দত্ত	১৲	ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
অভিরাম মল্লিক	১৲	(ডাক্তার) বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১৲
ঈশানচন্দ্র রায়	১৲	বাহাদুর সিং সিংহী	২৲
এ. দোঁতেন	২৲	বিমল রায় চৌধুরী	১৲
কিরণচন্দ্র দত্ত	১৲	(কুমার) বিমলচন্দ্র সিংহ	৫৲
গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
(ডক্টর) গিরীন্দ্রশেখর বসু	১৲	ভুজঙ্গেশ্বর শ্রীমানী	১৲
গোকুলচন্দ্র লাহা	২৲	(স্তর) মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৲
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲	মৃগাঙ্কনাথ রায়	১৲
চন্দ্রকুমার সরকার	১৲	মৃণালকান্তি ঘোষ	১৲
চারুচন্দ্র বিশ্বাস	২৲	(স্তর) যদুনাথ সরকার	২৲
চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	১৲	রমণীকান্ত বসু	১৲
(কুমার) জগদীশচন্দ্র সিংহ	৫৲	রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৲
তিনকড়ি বসু	১৲	রাজশেখর বসু	১৲
ত্রিদিবনাথ রায়	১৲	লালবিহারী দত্ত	২৲
দেবপ্রসাদ ঘোষ	১৲	(মহারাজ) শ্রীশচন্দ্র নন্দী	৫৲
দেবেন্দ্রনাথ দাস	১৲	সজনীকান্ত দাস	১৲
(ডক্টর) নীহাররঞ্জন রায়	১৲	সতীশচন্দ্র ঘোষ	১৲
(ডক্টর) পঞ্চানন নিয়োগী	১৲	সতীশচন্দ্র বসু	১৲
পুলিনবিহারী সেন	১৲	সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
প্রফুল্লকুমার সিংহ	১৲	সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
প্রফুল্লকুমার সরকার	১৲	সুরেশচন্দ্র মজুমদার	১৲
(স্তর) প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৫৲	হরিদাস দত্ত	১৲
ফণিভূষণ তর্কবাগীশ	১৲	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲

৭। বিজ্ঞান-শাখার শারদীয় সম্মিলনে দান ২৲

অনাথবন্ধু দত্ত	১৲	(ডক্টর) গিরীন্দ্রশেখর বসু	১৲

(এই সম্মিলনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিজ্ঞান-শাখার সভ্যগণ নিজেদের মধ্যে অধিকাংশ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।)

৮। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংরক্ষণের জন্য দান ৬১০৮৶০

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	১০৲	অভয়পদ দে	১৲
অনাথবন্ধু দত্ত	১৲	অমরকৃষ্ণ ঘোষ	১০৲
(রায় বাহাদুর) অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲	অম্বিকাচরণ রায়	২৲

অরবিন্দ পাল	৫৲
অহিভূষণ লাহা	।॰
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য	১৲
উপেন্দ্রনাথ সেন	৫৲
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৲
(রাজা) কমলারঞ্জন রায়	৫০৲
করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
(ডাঃ) কার্ত্তিকচন্দ্র বসু	৫৲
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
কালীপদ দত্ত	২৲
কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲
কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
কুশীপ্রসূণ চট্টোপাধ্যায়	২৲
ক্ষেত্রনাথ গাঙ্গুলী	১৲
গোবিন্দপ্রসাদ পালিত	২৲
জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
জনৈক বন্ধু	১০৲
জানকীরাম খাণ্ডেলওয়ালা	১৲
জে. সি. মুখার্জি	১০৲
(কবিরাজ) জ্যোতির্ম্ময় সেন	১৲
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫৲
(ডাঃ) জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায়	১৲
দেবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৲
দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
দ্বিজপদ সেনগুপ্ত	১৲
ধনপতি চন্দ্র	১৲
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	২৲
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৲
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	।॰
নগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৲
ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়	২৲
নরেন্দ্রকিশোর মুখোপাধ্যায়	২৲
নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৲
নারায়ণচন্দ্র মৈত্র	১৶॰
নিরঞ্জন মল্লিক	।॰
নির্ম্মলচন্দ্র পাল	৫৲
নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৲
নৃপেন্দ্রনাথ সেন	৫৲
পার্ক বুক বুরো	১৲
প্রমথনাথ দে	৪৲
প্রভাসচন্দ্র ঘোষ	২৲
প্রবোধচন্দ্র সেন	১০৲
প্রিয়নাথ বসু	১৲
বসন্তকুমার বসু	১৲
বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	।॰
বসন্তবিহারী চন্দ্র	১৲
বাঁশরীমোহন সেন	৫৲
বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
বিরাজশঙ্কর গুহ	৫৲
বীরেন্দ্রকুমার বসু	৫৲
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
ভবনাথ চৌধুরী	১৲
ভবানীপ্রসাদ চন্দ্র	।॰
(রায় সাহেব) ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৫৲
ভূধরচন্দ্র দাঁ	১৲
মনীষিনাথ বসু	১৲
মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
মন্মথনাথ বসু	১৲
মহারাজাধিরাজ, বৰ্দ্ধমান	১০০৲
মহেন্দ্রলাল মিত্র	২৲
(রায় বাহাদুর) যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫০৲
যশোদানন্দন ঠাকুর	১৲
যোগেশনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
রামপদ দত্ত এণ্ড সন্স	।॰
শঙ্করীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	।॰
শচীন্দ্রচন্দ্র দেব	১০৲
শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৲
(ডাঃ) শশিভূষণ দত্ত	।॰
শৈলেশচন্দ্র তালুকদার	১৲
শ্যামসুন্দর ঘোষ	২৲
শ্যামাপদ চৌধুরী	২৲
শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য	১৲
শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৲
শ্রীশচন্দ্র রায়	১৲

সজনীকান্ত দাস	৫৲	সোমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৲
সত্যকিঙ্কর রায়	২৲	সৌরীন্দ্রনাথ রায়	২৫৲
সত্যনারায়ণ দে	১৲	হরেকৃষ্ণ ধর	১৲
সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲	হরেরাম মণ্ডল	
সুধীন্দ্রনাথ রায়	১০৲	হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	
(রায় বাহাদুর) সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ	১০৲	হেমচন্দ্র মিত্র	
সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲		

৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান ১৭৲

অনাথগোপাল সেন	১৲	দেবপ্রসাদ ঘোষ	
অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত	১৲	পঞ্চানন নিয়োগী	১৲
ঈশানচন্দ্র রায়	১৲	নীহাররঞ্জন রায়	১৲
এ. দোঁতেন	২৲	প্রফুল্লকুমার সরকার	১৲
কিরণচন্দ্র দত্ত	১৲	মনোরঞ্জন গুপ্ত	।০
গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲	(স্যার) যদুনাথ সরকার	২৲
চন্দ্রকুমার সরকার	১৲	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲
জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	।০		

সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১০ই শ্রাবণ ১৩৪৮, (২৬এ জুলাই ১৯৪১), শনিবার অপরাহ্ণ ৫॥ টা।

সভাপতি—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার।

১। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন,—

"আজ আমাদের পরিষদের জীবনের ৪৭ বৎসর শেষ হইয়া, ৪৮ বৎসর আরম্ভ হইল। এই সুদীর্ঘ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কালের মধ্যে পরিষদের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে সব দেশ-সেবক এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন তাঁহাদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই আজ বিদ্যমান নাই। পরবর্ত্তী অনেক কর্ম্মী ও সহায়ক অকালে আমাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অতুলনীয় সহায়কদিগের মধ্যে মহারাজ সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এখন স্বর্গগত, কিন্তু লালগোলার মহারাজা সার্ যোগীন্দ্রনারায়ণ এবং মণীন্দ্রচন্দ্রের উপযুক্ত পুত্র মাননীয় শ্রীশচন্দ্র নন্দী আমাদের নানা দিক দিয়া সাহায্য করিতে বিরত হইতেছেন না। আর আমরা অধুনা ঝাড়গ্রামের কুমার নরসিংহ মল্লদেবের মত জ্ঞানী সৌম্য ও বদান্য নবীন পৃষ্ঠপোষক পাইয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। এই দানবীরদিগের ধারা চিরপ্রবাহিত থাকিলেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বঙ্গ-সাহিত্যের প্রকৃত সেবা অবাধে করিতে সক্ষম হইবে। আরও অনেক দাতা আমাদের কাজে কার্য্যকরী উৎসাহ দিয়াছেন, যেমন সার্ জগদীশচন্দ্র

বসুর ফাণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দানের দ্রব্যাদি, তদ্ভিন্ন প্রাপ্ত মূল্যবান পুস্তকের কথা পরে বলিব।

এই যে পরিষদের উন্নতি এবং ধনবৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাতে অনেক নীরব কর্ম্মী সাহায্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন; তাঁহাদের নাম করিবার সময় আজ নহে, কিন্তু পরিষদের কর্ম্মচারিগণ, এবং পরিষদের গ্রন্থাগার যাঁহারা জ্ঞানবিস্তারের জন্য ব্যবহার করেন, তাঁহারা সকলেই ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

সুখের বিষয় আমাদের দীর্ঘকালব্যাপী এবং গভীর চিন্তাদায়ক আর্থিক ঋণ এতদিনে শোধ হইয়া, স্থায়ী তহবিল আদিকে পূর্ণ করিয়া রাখা সম্ভব হইয়াছে। ধীরে ধীরে বাৎসরিক আয়ও বৃদ্ধি হইতেছে। সেই সঙ্গে পরিষদ মন্দিরটি আমুল মেরামত, আলমারি সরানো এবং সিঁড়িটি বাহিরে দিবার ফলে পরিষদের নিজগৃহের প্রত্যেক তলটি আলো ও বাতাসে পূর্ণ এবং পরিষ্কৃত, মধ্যস্থল তুটি মাঝারি হল-ঘর রূপে ব্যবহারের উপযোগী করা হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী রমেশ-ভবনটিও ভাল করিয়া মেরামত এবং দ্বিতল সংযুক্ত করায় কলাচর্চ্চা এবং বক্তৃতা উভয় কাজের জন্যই, উত্তর-কলিকাতায় উহা একটি অতুলনীয় স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব ইমারতী উন্নতির ফলে আমাদের জ্ঞানী, গুণী ও দাতাদের চিত্র এবং গ্রন্থাগারের অমূল্য সংগ্রহ আর অন্ধকার গুদামে পচিবার ভয় নাই। বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের দান এবং হীরেনবাবু অধ্যক্ষতাই পরিষদগৃহের এই উন্নতি সম্ভব করে; এবং রমেশ-ভবন সম্বন্ধে লেডী প্রতিমা মিত্র এবং জজ চারুচন্দ্র বিশ্বাসের অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টা আমাদের চিরস্মরণীয় থাকিবে। যে সব অবৈতনিক কার্য্যনির্ব্বাহক সদস্য দিনের পর দিন খাটিয়া এই সব উন্নতি কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন তাঁহাদের নাম করিলাম না, কিন্তু তাঁহাদের ভুলি নাই।

এই পরিষদের পুস্তকাগার যে কত বৃহৎ, কত বিচিত্র এবং কত মূল্যবান তাহা বাহিরের খুব কম লোকই জানেন। এটা শুধু বঙ্গ-সাহিত্যের ও সংস্কৃত গ্রন্থের বিশেষতঃ হস্তলিখিত পুথীর অতুলনীয় সংগ্রহ নহে, এখানে ইংরেজী এবং অন্যান্য কোন কোন ভাষার অনেক মূল্যবান এবং আবশ্যক পুস্তক আছে। আমরা যে সব মনীষীদের আজীবন সংগৃহীত গ্রন্থ দান হিসাবে পাইয়াছি তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত। আরও অনেক পুরাতন ইংরেজী ইতিহাস, অভিধান, প্রামাণিক গ্রন্থ, সরকারী রিপোর্ট প্রভৃতি এখানে জমিয়াছে এবং নূতন নূতন জমিতেছে। সুতরাং এ দেশের ইতিহাস, সমাজ অথবা সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার সুযোগ এই পরিষদ মন্দিরে যত বেশী পাওয়া যায়, এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন সমস্ত বঙ্গদেশে আর কোথায়ও তাহা মিলে না; বঙ্গ সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে আমাদের গ্রন্থ ও পুথী সংগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রাচীন মূর্ত্তি ও মুদ্রা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।

আমাদের পরিষদের ফণ্ডগুলি, কলাদ্রব্য সংগ্রহ, প্রকাশিত গ্রন্থ, এবং কার্য্যক্ষেত্র যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, তাহাতে ইহার নিরপত্তা রক্ষণের জন্য দশ বিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে লোকবল ও বন্দোবস্ত চলিতে ছিল, তাহা এখন যথেষ্ট নহে এবং এই অভাবের জন্য আমরা

বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। প্রধান আবশ্যক (১) দারোয়ান বাড়ানো, (২) যে লাইব্রেরিয়ান একজন আছেন, তাঁহার সঙ্গে আর একজন কর্ম্মচারী গ্রন্থপরীক্ষক, তালিকা লেখক, অর্থাৎ চেকার ও ক্যাটালগার হিসাবে আবশ্যক, (৩) অফিসের জন্য আর একজন কর্ম্মচারী আবশ্যক, যিনি টাকা জামিন দিয়া প্রকাশিত গ্রন্থগুলির সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইবেন, প্রত্যহ ঠিকমত হিসাব লিখিবেন, বই এবং আসবাবের নিয়মিত মাসে মাসে ষ্টক লইবেন, এবং তাহার ও পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব মাসে মাসে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে দিবেন। ইহার মধ্যে দুইজন দারোয়ান রাখা হইয়াছে।

এ সবগুলি কাজ ব্যয়সাপেক্ষ এবং এই ব্যয় স্থায়ী—বৎসর বৎসর বহন করিতে হইবে; অতএব পরিষদের স্থায়ী আয় বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু যে পরিমাণে পরিষদের আদায় চাঁদা এবং গ্রন্থ-বিক্রয়ের আয় বাড়িতেছে তাহাতে আশা করা যায় যে, ঐ দুই সূত্র হইতে আর্থিক উন্নতি স্থায়ী হইলে, উপরের তিনটি দফার স্থায়ী ব্যয়ের অর্দ্ধেকের বেশী সঙ্কুলান হইবে। বাকিটুকুর জন্য এক নূতন স্থায়ী ফণ্ডের দান ভিক্ষা করিতেছি।

পরিষদের আধুনিক প্রকাশিত গ্রন্থগুলি, বিশেষতঃ ঝাড়গ্রাম-ফণ্ডের পুস্তক অত্যন্ত মূল্যবান, বাজারে সর্ব্বদা ইহাদের কাটতি আছে, সুতরাং এগুলি আমার নির্দ্দেশিত উপায়ে রক্ষা করিতে না পারিলে চুরি হইবে, এবং অতীতে হইয়াছে। আগামী বৎসরেই ইহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমরা সচেষ্ট।

আমি অনেক বৎসর ধরিয়া এই পরিষদের সহকারী-সভাপতি এবং কয়েক বৎসর সভাপতিরূপে কাজ করিয়া এবং ইহাতে ঘন ঘন উপস্থিত থাকিয়া একটা বিপদের সম্ভাবনা অনুভব করিতেছি। বহু পূর্ব্বে যখন পরিষদের কাজ ছিল বৎসরে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়া, কয়েকদিন আলোচনা করা এবং কয়েকখানি প্রাচীন হস্তলিপি ছাপান, এবং প্রত্যেক বিভাগে ইহার সংগ্রহ ও আয় অনেক কম ছিল, তখন যে বন্দোবস্তে ইহার কাজ এক রকম ভালই চলিয়া আসিতেছিল, তাহা বর্ত্তমান বিস্তৃতির ফলে অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনাও আছে। প্রথমতঃ, আমরা চাই যে একজন দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ কার্য্যাধ্যক্ষ প্রতি সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট দুই বা তিন দিন এখানে আসিয়া কাজকর্ম্ম ও হিসাবাদির তত্ত্বাবধান করিবেন। যদি সহকারী-সভাপতি মহোদয়গণ সম্মত হন, তবে তাঁহাদের পালাক্রমে উপস্থিতির একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা ঠিকমত অনুসরণ করিলে এই অভাব পূর্ণ হয়। দ্বিতীয়তঃ, নবীনতর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেখা যায় যে সদস্যগণ একসঙ্গে পদত্যাগ করেন না, প্রতি বৎসর সুর্ত্তি খেলিয়া এক-তৃতীয়াংশের নাম বাহির করিয়া তাঁহারাই পদচ্যুত হন এবং পুনর্নির্ব্বাচিত হইলে তাহার পর তিন বৎসর করিয়া থাকেন। ইহার ফলে প্রতি তিন বৎসর পরে পরে বিপ্লবের মত আমূল পরিবর্ত্তন হয় না, ঐ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নীতি ও কার্য্যধারা সুশৃঙ্খল স্থায়ীভাবে চলিতে থাকে। আমাদের পরিষদের সব নির্ব্বাচন বাৎসরিক, সুতরাং কার্য্যের যোগসূত্র বৎসরান্তে হঠাৎ একবারে ছিঁড়িবার সম্ভাবনা। যদি এই নিয়ম পরিবর্ত্তন আবশ্যক বিবেচিত হয়, তবে সাধারণ সভার দ্বারা, বিধিমত এবং

যথাসময়ে তাহা আপনারা করিবেন। তৃতীয়তঃ, আমরা এই পরিষদের দ্বারা সাহিত্যিক প্রতিভা সৃষ্টি করিতে পারি না, কিন্তু নানাপ্রকারে গবেষণার এবং জ্ঞান অর্জ্জনের সাহায্য করিতে পারি ও সে বিষয়ে যে আমাদের অতুলনীয় উপকরণ আছে, তাহা আগেই বলিয়াছি। বড়ই সুখের বিষয় যে, পরিষদ্ মন্দিরে দৈনিক পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে এবং সাধারণ পাঠ-গৃহের ভিড় ও গোলমাল হইতে দূরে কয়েকজন গবেষণাকারীর জন্য উপর তলায় নিরিবিলি পাঠের বন্দোবস্তও করা হইয়াছে। তাহার পর, যাহা পাঠকের পক্ষে অত্যাবশ্যক অর্থাৎ আমাদের এই গ্রন্থসমুদ্রের এক বিস্তৃত তালিকা, তাহাও রচনা হইয়াছে এবং ছাপাও প্রায় শেষ হইল। কিন্তু গবেষণার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট নয়। এই গত সপ্তাহে আগত বিলাতের 'টাইম্‌স' পত্রিকায় লণ্ডন লাইব্রেরির শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে যে এই পুস্তকাগারকে একটি হোষ্টেলবিহীন বিশ্ববিদ্যালয় বলিলেও চলে এবং এটাকে জ্ঞান ও বিদ্যা সৃষ্টির জন্য অতি প্রকাণ্ড বিদ্যুতের কারখানারূপে নিঃসন্দেহে গণ্য করা যায়।

বঙ্গের—শুধু বঙ্গের কেন, অনেকক্ষেত্রে সমস্ত ভারতের বিদ্যা, সাহিত্য, সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে যদি মৌলিক গবেষণা এই পরিষদ-পুস্তকাগারে এবং কলা-ভবনে পরিচালিত হয়, তবেই ইহার জন্ম সার্থক হইবে, তবেই ইহা লণ্ডন লাইব্রেরির সেই উচ্চ মহিমাতে পৌঁছিতে পারিবে। কিন্তু এইরূপ মহৎ কাজের জন্য আবশ্যক রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান, যেরূপ বিলাতের বড় বড় পুস্তকালয়ে আছে। এই সব সার্ব্বভৌম পণ্ডিতগণ লাইব্রেরিতে বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসু ছাত্রদের বলিয়া দেন, কোন্ বিষয়ে কোন্ কোন্ বই প্রামাণিক। আমরা টাকা দিয়া এরূপ পণ্ডিত নিযুক্ত করিতে পারিব না—আমাদের হিতৈষী পণ্ডিতগণ নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিয়া এই পরিষদ্-মন্দিরে ঘণ্টাখানেক করিয়া বসিয়া নবীন গবেষণাকারীদের পথ-প্রদর্শক হইলে এই কাজটি সম্পন্ন হইতে পারে। ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।"

২। সভাপতি মহাশয় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি রায় জলধর সেন বাহাদুরের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং এই প্রসঙ্গে জলধরবাবুর সহিত পরিষদের সম্পর্ক ও তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতির উল্লেখ করিলেন। এই চিত্র দানের জন্য তিনি মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সকে এবং তাঁহাদের অন্যতম কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদের পক্ষ হইতে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

৩। নিম্নলিখিত সাধারণ ও সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

(ক) সাধারণ-সদস্য—

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীবিনয়ভূষণ বসু, ডাঃ শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ, শ্রীনিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীনকুলেশ্বর রায়, শ্রীসুধাংশুকুমার রক্ষিত, শ্রীননীগোপাল ভৌমিক ও শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী।

(খ) সহায়ক-সদস্য।

১। শ্রীপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২। শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীঅমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্য।

৪। সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় বিতরিত সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ উপস্থিত করিয়া তাহার উপসংহার অংশ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয় ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৬। ভোট-পরীক্ষকগণের পক্ষে শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনের নিম্নলিখিত ফলাফল পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় ইঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন।

দেবপ্রসাদ ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, অনাথগোপাল সেন, রেভারেণ্ড ফাদার এ. দোঁতেন এস. জে, জগদীশ ভট্টাচার্য্য, যোগেশচন্দ্র বাগল, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রফুল্লকুমার সরকার, পুলিনবিহারী সেন, বিভাস রায় চৌধুরী, কিরণচন্দ্র দত্ত, অনাথবন্ধু দত্ত, জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রিদিবনাথ রায়, ঈশানচন্দ্র রায়, শান্তি পাল, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত ৬ জন সদস্য শাখা-পরিষৎ হইতে মূল পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী, মেদিনীপুর
২। „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া
৩। „ সত্যভূষণ সেন, গৌহাটী
৪। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, নদীয়া
৫। „ অমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান
৬। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, রঙ্গপুর

নিয়মানুসারে শাখা-পরিষদের ৬ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন কিন্তু শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু সমান সংখ্যক ভোট পাওয়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী শাখা-পরিষদের পক্ষে সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

কাউন্সিলার শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইলেন। সভাপতি এই সকল সভ্য যথারীতি নির্ব্বাচিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন।

৭। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবমত নির্ব্বাচিত সদস্যগণ পরিষদের অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার
সহকারী সভাপতিগণ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী
শ্রীমন্মথমোহন বসু
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত
পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা
পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবিত চিত্রশালাধ্যক্ষ গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্থলে চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনের ভার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পিত হইল।

এতদ্ব্যতীত শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন আয়ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, পরিষদের গচ্ছিত তহবিলের অন্তর্গত "হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিলের' উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা কবিবর হেমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থাবলী পরিষৎ হইতে প্রকাশ করা হউক এবং এ বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।

ঊনপঞ্চাশৎ প্রতিষ্ঠা-উৎসব

১১ই শ্রাবণ ১৩৪৮, (২৭এ জুলাই ১৯৪১), রবিবার—অপরাহ্ন ৪॥০টা।

অদ্য পরিষদের রমেশ-ভবনের হলে ঊনপঞ্চাশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস সংক্রান্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সভাপতি এই উৎসবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া সভাপতি বলেন, "আনন্দের সঙ্গে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এ বৎসর আমাদের দুই চারি জন সহৃদয় বন্ধু আমাদের এই প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ধর টিন ফ্যাক্টরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ধর মহাশয় তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা উমাসুন্দরী ধরের স্বর্গগতা মাতার নামে আজিকার উৎসবের ব্যয়নির্ব্বাহ-কল্পে ১০১৲ টাকা দান করিয়াছেন। আরও আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় যে, দিগম্বর জৈন সমাজের অন্যতম কর্ণধার শ্রীযুক্ত নেমিচাঁদ পাণ্ডে নানাভাবে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান ও তৎসম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি আমাদের আজীবন-সদস্য, সুতরাং আমাদের অতি আপনার জন, এজন্য স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব না, তাঁহার নিকট হইতে আমরা আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা করি। অন্যান্য যাঁহারা চাঁদা-দানে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদেরও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।"

তারপর গানের জলসা বসে। প্রথমেই রাওয়ালপিণ্ডী নিবাসী ওস্তাদ ফিরোজ খাঁ তবলা-লহরা বাজান। পরে শ্রীঅনাথ বসুর ঠুংরী, শ্রীমতী গৌরী মিত্রের ভজন, ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁর সেতার, কুমার শচীন দেববর্ম্মণের বাংলা গান, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুরের) রসকথা এবং শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন সকলকে মুগ্ধ করে। ইঁহাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

এই উৎসব সংক্রান্ত সঙ্গীতাদির আয়োজনের ভার শ্রীনলিনীকান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকেশবচন্দ্র বসু, শ্রীসারদা গুপ্ত ও শ্রীসুবোধকুমার পাল তাঁহাকে এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সমাগত সভ্যবৃন্দের জলযোগের ব্যবস্থার ভার শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে এবং তাঁহার কতিপয় উৎসাহী সহকারী গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষৎ ইঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। এতদ্ব্যতীত এই উপলক্ষে যে সকল সহৃদয় ও পরিষদের হিতৈষী গ্রন্থাদি বিভিন্ন দ্রব্য দান করিয়াছেন এবং যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়া এই উৎসবের সাফল্য সম্পাদনে পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। অর্থ ও উপহার-দাতৃগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উপহার ও উপহারদাতৃগণ

মুদ্রা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্তা সুধারাণী দেবী, শ্রীবগলাচরণ বসু, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রাচীন মৃৎশিল্প—শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুথি—শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য, শ্রীত্রিদিবনাথ রায় ও শ্রীলক্ষ্মীচরণ দাশগুপ্ত।

পাণ্ডুলিপি—শ্রীসত্যব্রত সান্যাল ও শ্রীঅমল হোম।

পুস্তক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবোধি সোসাইটি, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, শ্রী এস. ওয়াজেদ আলী, শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সুর, শ্রীরাইচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমল হোম, শ্রীবিজয়কুমার দত্তগুপ্ত, শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীঅবিনাশ ঘোষ, শ্রীবিজয়রত্ন সেন, শ্রীসুধাকান্ত দে, শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, মেসার্স এস্ কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দেব, শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রিয়লাল দাস, শ্রীখগেন্দ্রলাল মিত্র ও মেসার্স ইউ এন্ ধর এণ্ড কোং।

চিত্র—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

দপ্তর-সরঞ্জামী—বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড কোং, কেমিক্যাল এসোসিয়েশন (কলিকাতা), বেঙ্গল।

বিবিধ—বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ।

প্রতিষ্ঠা-উৎসবের চাঁদা

অজিত ঘোষ	১৲	প্রফুল্লকুমার সিংহ	১৲
অনাথগোপাল সেন	১৲	(স্যর) প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৫৲
অনাথনাথ ঘোষ	১৲	প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর	১০৲
অনাথবন্ধু দত্ত	১৲	ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৲	বলাইচাঁদ কুণ্ডু	১৲
ঈশানচন্দ্র রায়	১৲	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
উপেন্দ্রনাথ সেন	১৲	(কুমার) বিমলচন্দ্র সিংহ	১০৲
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲	বিভাস রায় চৌধুরী	১৲
ফাদার. এ. দোঁতেন	৩৲	ভূজঙ্গেশ্বর শ্রীমানি	১৲
কিরণচন্দ্র দত্ত	১৲	(স্যর) মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
গোকুলচন্দ্র লাহা	২৲	মৃণালকান্তি ঘোষ	১৲
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲	যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	২৲
চন্দ্রকুমার সরকার	২৲	যতীন্দ্রনাথ বসু	৫৲
চারুচন্দ্র বিশ্বাস	২৲	(স্যর) যদুনাথ সরকার	১০৲
চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	১৲	রমণীকান্ত বসু	১৲
(ডাঃ) চৈতন্যকিঙ্কর ঘোষ	১৲	রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৲
(কুমার) জগদীশচন্দ্র সিংহ	৫৲	রাজশেখর বসু	১৲
জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৲	(মহারাজ) শ্রীশচন্দ্র নন্দী	১০৲
জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	১৲	শান্তি পাল	।০
তিনকড়ি বসু	১৲	সজনীকান্ত দাস	৫৲
দেবেন্দ্রনাথ দাস	১৲	সতীশচন্দ্র ঘোষ	২৲
ধর টিন ফ্যাক্টরির		সতীশচন্দ্র বসু	১৲
স্বত্বাধিকারী শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর	১০১৲	সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী	২৲
নরেন্দ্রমোহন সেন	১৲	সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
নলিনীকান্ত সরকার	১৲	সুরেশচন্দ্র মজুমদার	১৲
(ডক্টর) নীহাররঞ্জন রায়	৩৲	(ডক্টর) সুহৃদ্‌চন্দ্র মিত্র	১৲
নেমিচাঁদ পাণ্ডে	৩০৲	রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫৲
(ডক্টর) পঞ্চানন নিয়োগী	২৲	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲
পুলিনবিহারী সেন	১৲		